ভারতী

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

(১৩২১ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

ভারতী কার্য্যালয়,

৩ সানি পার্ক (Sunny Park) ৬ন্ড বালিগঞ্জ রোড—কলিকাতা।

সন ১৩২১ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

চিত্র-সূচী

ভারতী

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

(১৩২১ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

ভারতী কার্য্যালয়,

৩ সানি পার্ক (Sunny Park) ৬নং বালিগঞ্জ রোড—কলিকাতা।

সন ১৩২১ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

চিত্র-সূচী



শকুন্তলা

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত

কান্তিক প্রেস]

[২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

ভারতী

৩৮শ বর্ষ]   বৈশাখ, ১৩২১   [১ম সংখ্যা

'জাগৃহি'

পাপ্‌ড়ি-ঝরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী,—
তার মাঝে কে ঘুমিয়ে আছ,—নয়ন মেল,—তোমায় ডাকি ;
জাগ, ওগো ! ধূসর ধরার হিরণ-বরণ জীবন-কণা !
জাগ পুরাতনের পুরে নূতনেরি সম্ভাবনা !

পুরাতনের ডিম্ব টুটে বাহিরে এস নূতন পাখী !
নূতন আঁখির আলোক দিয়ে অন্ধকারের ফুটাও আঁখি ;
জাগাও আশা নূতন আশা নূতন ছন্দ নূতন গতি
গরুড় যদি না হও তুমি সূর্য্যরথের হও সারথি !

শক্ত পাহাড় হচ্ছে গুঁড়া শক্তু সম পলে পলে
মহাকালের বজ্রকঠোর নিবিড় আলিঙ্গনের তলে।
মৌনমুখে যায় পুরাতন শক্তু-কলস মাথায় ক'রে,
তুমি এস নূতন জীবন ! কুম্ভ তোমার সুধায় ভ'রে।

তুমি এস নূতন বর্ষে নূতন হর্ষ ! নূতন জ্যোতি !
সর্ষে-পারা বটের বীজে ভবিষ্যতের বনস্পতি !
এস অজয় !—পরাজয়ে, এস অমর ! মৃত্যুপুরে ;
বস ধূলায়,—আসন পেতে দূর্ব্বা-লতার শ্যামাঙ্কুরে।

বিধাতা আর ধাতায় মিলে ঘুরায় মুহু অয়ন্-ঘড়ি,
সমীর ফেরে শমীবনে অগ্নিমন্থ মন্ত্র পড়ি' ;
প্রাচীন দিনের সূর্য্য চলে প্রলয়-জলে শয্যা পেতে,
জাগ তুমি নূতন সূর্য্য ! নীহারিকার বুদ্বুদেতে।

পুরাতনের স্তম্ভ চিরে বাহিরে এস সিংহতেজে
জাগ জড়ের সুপ্ত জীবন গোপন শিখায় নয়ন মেজে ;
অবিশ্বাসের হোক অবসান, তুমিই তাহার নিশ্বাস রোধ',
অন্তরে হও আবির্ভূত হে আত্মদ ! বলপ্রদ !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

অভিভাষণ*

কলিকাতা-মহানগরীর এই বিশাল পুরশ্রী-মণ্ডপে বঙ্গ-সরস্বতীর অনুরক্ত ভক্ত পুত্র-গণকে একত্রে সমাসীন দেখিয়া আমার কী যে আনন্দ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। আমার ইচ্ছা হইতেছে দুই দণ্ড নিস্তব্ধ হইয়া অকূল আনন্দ-সাগরে মন'কে ভাসাইয়া দিই। সেদিন বই না, আমার চক্ষের সম্মুখে ভারতী-মাতার জন দশ বাছা বাছা ভক্ত সেবক বঙ্গ-বিদ্যা'র পতিত ভূমিতে একটি ক্ষুদ্র চারা-গাছ রোপণ করিয়া সক্ করিয়া তাহার নাম দিলেন সাহিত্য-পরিষৎ। ইহারই মধ্যে তাহা একটা বৃক্ষের মতো বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার মনে আনন্দ ধরিতেছে না—বিধাতার কাণ্ড দেখিয়া আহ্লাদে আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না। সে দিন নিম্নে গ্রীবা নত করিয়া যাহাকে আমি দেখিয়াছি ক্ষুদ্র একরত্তি চারা-গাছ—আজ ঊর্দ্ধে নয়ন উন্মীলন করিয়া তাহাকে দেখিতেছি প্রকাণ্ড একটা বনস্পতি—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কী হইতে পারে ? ঈশ্বরের কৃপায় তাহার শুভ ফল বঙ্গের আপাদমস্তক জুড়িয়া যে কিরূপ প্রচুর পরিমাণে ফলিয়া উঠিয়াছে, তাহা আপনারা যতটা জানেন, ততটা জানা আমার পক্ষে সম্ভব নহে যদিচ ;—কেননা

---

* কলিকাতা সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।

প্রথমত ষোলো-সাতারো বৎসর বা ততোধিক কাল যাবৎ আমি লোকালয় হইতে বহুদূরে বোলপুরের নির্জন কুটীরে বাস করিতেছি, দ্বিতীয়ত আমি সংবাদপত্র ছুঁইনা; কিন্তু তবুও যখন ভাল ভাল লোকের মুখ দিয়া সময়ে সময়ে সাহিত্য-পরিষদের শ্রীবৃদ্ধির কথা—সুদূর আকাশ-মার্গে যেন শঙ্খ-ঘণ্টার মঙ্গলধ্বনি হইতেছে এইরূপ মৃদু-মধুর ভাবে—আমার কর্ণে পৌঁছিতে ক্ষান্ত হইতেছে না, তখনই আমি বুঝিয়াছি যে, এ আগুন খড়ের আগুন নহে—বাড়বানল যেমন জলে নেভে না, ঝড়ে টলে না, এ আগুন তাহারই ছোটো ভাই! অপার করুণার সাগর বিশ্ববিধাতার গূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে! কিন্তু সকলেই আমরা এটা বুঝিতে পারি যে, মঙ্গলের সূচনা যেখানে যত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহারই অভিপ্রেত, সুতরাং তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। **এখন** যাঁহারা আজিকের মতো এইরূপ ঘটাড়ম্বরকেই সাহিত্য-পরিষদাদি সভার সার সর্ব্বস্ব মনে করিতেছেন—কতিপয় বৎসর পরে যখন সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দৈবী শক্তির প্রভাবে বঙ্গলক্ষ্মীর বিষাদাচ্ছন্ন মলিন বদন মেঘমুক্ত শারদ পূর্ণিমার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর, তাহা দেখিয়া লোকে যখন সাহিত্য-পরিষদের জয়জয়কার করিতে থাকিবে, **তখন** তাঁহারা বলিবেন এ যাহা দেখিতেছি এ'কে তো শুধু কেবল ঘটা-আড়ম্বর বলা সাজে না—এ যে মঙ্গল মূর্ত্তিমান্! দশজন কলহ-প্রিয় বাঙ্গালীর সংসদ্ হইতে যাহা কস্মিন্‌কালেও হইয়া উঠিতে পারে বলিয়া স্বপ্নেও মনে করি নাই—এ যে দেখিতেছি তাহা চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ বিরাজমান! ধন্য জগদীশ্বর! তোমার লীলা অদ্ভুত! তোমার করুণা অপার!

বঙ্গবিদ্যার এই মহাসাগরে কী যে আমি আজ অর্ঘ্য প্রদান করিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আমার ঘটে যৎকিঞ্চিৎ সরস্বতীর প্রসাদ যাহা সংগোপিত আছে, তাহার মূল্য আমার নিকটে যদিচ নিতান্ত কম না, কিন্তু যাঁহাদের একত্র-সম্মিলনে আজিকের এই সভা গৌরবান্বিত হইয়াছে, সেই-সকল বড় বড় বিদ্যা'র জহরীগণের নিকটে তাহার মূল্য অতীব যৎসামান্য হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু আপনারা যখন আপনাদের মহত্ত্বগুণে আমার ক্ষুদ্রত্বের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আমাকে আজিকের এই শুভ সম্মিলনের সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমার পুতুল-খ্যালা-গোচের ছোটো খাটো নৈবেদ্যের ডালা সভা'র সমক্ষে অনাবৃত করিতে কুণ্ঠিত হওয়া এখন আর আমার পক্ষে শোভা পায় না; অতএব সাহসে ভর করিয়া তাহা-তেই এক্ষণে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমার একটি অবশ্যম্ভাবী অপরাধ যাহা আমার পক্ষে সাম্‌লানো দুষ্কর তাহার জন্য আপনাদের নিকটে অগ্রিম ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছি:—আমার বক্তব্য কথাটি আমি সংক্ষেপে সারিতে চাই; আর সেই জন্য তাহার বারো আনা ভাগ আমার মনের মধ্যে আটক পড়িয়া থাকিবে;—আমার এ অপরাধটি আপনারা যদি দয়ার্দ্র চিত্তে ক্ষমা না করেন তবে আমি নিরুপায়; কেননা আয়সংক্ষেপের সহিত যুঝিতে হইলে ব্যয়-সংক্ষেপ ব্যতিরেকে যেমন গৃহস্থের গত্যন্তর নাই—সময়-সংক্ষেপের সহিত

বুঝিতে হইলে তেম্নি বচন-সংক্ষেপ ব্যতিরেকে বক্তার গত্যন্তর নাই। আমার একটি অনতিক্রমণীয় ভাবী অপরাধের দায় হইতে কথঞ্চিৎপ্রকারে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষে একটু যাহা আমার বলিবার ছিল তাহা বলিলাম। এক্ষণে অনুমতি হোক্—সভাস্থ-সজ্জনগণকে সাদরে অভিনন্দন করিয়া অভি-ভাষণ কার্য্যটা প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ করি।

আর্য্য-সভ্যতা এখন এই যে মহা মহা সাগরকে গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া—মহা মহা পর্ব্বতকে বল্মীক জ্ঞান করিয়া—অজেয় বল-বিক্রমের সহিত পৃথিবীর উপরে আধিপত্য করিতেছে, এ সভ্যতার মূল-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমিতে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে অমরাপুরী হইতে কল্পতরুর একটা ডাল কাটিয়া আনিয়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে রোপন করা হইয়াছিল সমবেত অরণ্যবাসী ঋষিমহর্ষিগণের সামগানের সহিত তান মিলাইয়া; তাহাই এক্ষণে পাতালে মূল প্রসারিত করিয়া এবং আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া শত সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া অযুত সহস্র দল-পল্লবে এবং নানা রসের নানা রঙের ফলফুলে পৃথিবীর আপাদ-মস্তক ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর্য্য-সভ্যতা ভুঁইফোঁড়-শ্রেণীর নূতন সভ্যতা নহে; পুরাতন আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতা'র নামই আর্য্য-সভ্যতা। যেমন, হিমালয় যে দেখে নাই, সে পর্ব্বত কাহাকে বলে তাহা জানে না; ভাগীরথী যে দেখে নাই, সে নদী কাহাকে বলে তাহা জানে না; ভারতভূমি যে দেখে নাই; সে পৃথিবী কাহাকে বলে তাহা জানেনা; তেম্নি, আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্য-সভ্যতা যে দেখে নাই, সে সভ্যতা কাহাকে বলে তাহা জানে না। কেহ যদি আমাকে বলেন "বাক্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া এ যাহা তুমি বলিতেছ, তাহার প্রমাণ কি?" তবে আমি তাঁহাকে বলিব—ভারতের মহা সভ্যতার প্রমাণ ভারতেরই মহাভারত! প্রশ্নকর্ত্তা যদি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত মহাভারতখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তবে সভ্যতা যে বলে কাহাকে—সভ্যতা'র যে কতগুলি গঠনোপকরণ; সভ্যতার যে কোথায় কি দোষ, কোথায় কি গুণ; কাহাকে বলে রাজধর্ম্ম, কাহাকে বলে আপদ্ধর্ম্ম, কাহাকে বলে মোক্ষধর্ম্ম; কোন্ ধর্ম্ম কখন কী অংশে সেবনীয়—কোন্ ধর্ম্ম কখন্ কী অংশে বর্জ্জনীয়—সমস্তই তাঁহার নখ-দর্পণে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে। সভ্য-তার একটা সর্ব্বাঙ্গীন এবং সমীচীন আদর্শ মনোমধ্যে গঠন করিয়া তুলিতে হইলে তাহার জন্য যত কিছু মালমস্লার প্রয়োজন সমস্তই তিনি দেখিবেন—তাঁহার হাতের কাছে মৌজুত; তাহার কিছুরই জন্য তাঁহাকে দেশ বিদেশে ঘুঁটিয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তা যদি বলেন "তবে কেন আমাদের এ দশা?" তবে সে কথাটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে! আজ কিন্তু ঐ বৃহৎ মাম্লাটার একটা সরাসরি রকমের বিচার-নিষ্পত্তি ভিন্ন পাকাপাকি রকমের চরম নিষ্পত্তি এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে আমা-কর্ত্তৃক ঘটিয়া ওঠা অসম্ভব। কিন্তু তা বলিয়া একেবারেই হাল ছাড়িয়া দেওয়া আমি শ্রেয় বোধ করি না। আমার ক্ষুদ্র আদালতের মোটামুটি রকমের বিচার্য্য কার্য্য আমি

উপস্থিত মতে নির্ব্বাহ তো করি—তাহার পরে আপীল আদালতের সূক্ষ্ম বিচারের মালিক আপনারা আছেন—সেজন্য আমার মাথা ভাবাইবার আমি কোন প্রয়োজন দেখি না!

আমার এইরূপ ধারণা যে, আমাদের দেশের সভ্যতা'র মস্তক তত্ত্বজ্ঞান; পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সভ্যতা'র মস্তক বিজ্ঞান। কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—দুটার মধ্যে কোন্‌টা ভাল? তত্ত্বজ্ঞান ভাল—না বিজ্ঞান ভাল? তবে আমি তাঁহাকে বলিব—দুটাই ভাল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে:—প্রকৃতির সমস্ত ব্যাপারই ত্রিগুণাত্মক। সকল বস্তুরই দুই দিক্ আছে; ভাল'র দিক্‌ও আছে—মন্দের দিক্‌ও আছে। মন্দ জিনিসেরও ভাল'র দিক্ আছে—ভাল জিনিসেরও মন্দের দিক্ আছে। উচিত ব্যবহার দুয়েরই ভাল'র দিক্ ফুটাইয়া তোলে; অনুচিত ব্যবহার দুয়েরই মন্দের দিক্ ফুটাইয়া তোলে। ধোঁয়া-কলের নৌকা খুবই ভাল জিনিস; কিন্তু কখন্ তাহা ভাল জিনিস্? যখন তাহা পাকা মাঝির হাতে পড়ে তখনই তাহা ভাল জিনিস্; আনাড়ি মাঝির হাতে পড়িলে তাহা সর্ব্বনাশের মূল। তত্ত্বজ্ঞানও যেমন, বিজ্ঞানও তেমি, দুইই পরমোৎকৃষ্ট বস্তু, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু হইলে হইবে কি—তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে এবং হইতেছে; বিজ্ঞানের অপব্যবহার ইউরোপ-আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে এবং হইতেছে। বিজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগের ঘটিয়াছে যেরূপ ভয়ানক—আগে সেই কথাটা বলি; তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি আমাদের দেশের লোকদিগের ঘটিয়াছে যেরূপ বিসদৃশ—পরে তাহা বলিব।

ইউরোপ-আমেরিকায় মহা মহা বিজ্ঞান-প্রসূত কলকারখানার ঘূর্ণাচক্রের টানে পড়িয়া সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র শ্রমজীবী লোকের ইহকাল পরকাল ক্রমশই রসাতলের নিকট-বর্ত্তী হইতেছে—তাহাদের মা-বাপ বলিবার কেহই নাই। বড়লোকেরা দুষ্ট লক্ষ্মীর পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মকে গির্জার ফাটকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আর সেই-সব বড়লোকদিগের মনস্কামনা আশু সফল করিবার জন্য গির্জার কারাধ্যক্ষেরা ধর্ম্মকে বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করাইতেছেন; সংকীর্ণতা কৃত্রিমতা এবং আত্মগরিমা'র কালকূট মিশাইয়া ঈশা মহাপ্রভুর উদার সরল এবং সুধাময় উপদেশান্ন ভক্ষণ করাই-তেছেন। বড় বড় বণিক মহাজনদিগের হ্যাঁপায় পড়িয়া মধ্যবিধ শ্রেণীর কর্ম্মী লোকেরা ব্যবহার-বিজ্ঞানকে (political economyকে) ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থলাভিষিক্ত করিয়া লক্ষ্মীবেশধারিণী অলক্ষ্মীর পশ্চাতে, এক কথায়—আলেয়া-কিন্নরীর পশ্চাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছেন;—কেবল ঈশা মহাপ্রভুর গোটা চার-পাঁচ সেরা সেরা ধর্ম্মোপদেশের বাল্যসংস্কার তাঁহাদিগকে ভয়ানক অধোগতি হইতে এযাবৎকাল পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমেরিকা দেশের বড় বড় রুই-কাৎলা-শ্রেণীর বণিক্ জনেরা পুঁটিমাছ-শ্রেণীর বণিক্‌দিগকে গ্রাস করিবার

ছোটো মাছেরা বড় বড় মাছদিগের সঙ্গে বল-বিক্রমে এবং ফন্দিবাজিতে আঁটিয়া উঠিতে অক্ষম হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঙাচী-বেচারীগুলির উপরে ঝাল ঝাড়িতেছেন যমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ইহাই যদি সভ্যতা হয়, তবে সভ্যতাকে ধিক !

তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি আমাদের দেশের লোকের যাহা ঘটিয়াছে তাহাও শোচনীয় কম না। তাহা যে-সূত্রে যেরকম করিয়া ঘটিয়াছে তাহা বলিতেছি —প্রণিধান করুন্।

বহু পুরাকালে আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত তপোবনের চতুঃসীমার মধ্যেই অবরুদ্ধ ছিল। কিয়ৎ কাল পরে তাহা তপোবনের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বামিত্র জনক ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-কুলের মস্তক স্থানীয় কতিপয় মহাত্মার হস্তে ধরা দিয়াছিল; আর, সেই সঙ্গে বিদুরের ন্যায় দুই এক জন নিম্নবংশীয় সাধু পুরুষের কুটীরদ্বারেও মাথা নোয়াইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। কিন্তু তদ্ব্যতীত অপরাপর লোকের নিকটে—জনসাধারণের নিকটে—তাহা একপ্রকার প্রহেলিকার আকার ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিল; তবে যদি দৈবের কৃপায় উহার দুর্ভেদ্য রহস্যের ভিতরে প্রবেশের অধিকার সহস্রের মধ্যে এক ব্যক্তির ভাগ্যে কোনো গতিকে ঘটিয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে; কিন্তু তাহাও ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ। তত্ত্বজ্ঞানের দেবস্পৃহনীয় অমৃত মান্ধাতার আমল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বিদ্যার ভাণ্ডারে এত যে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং যত্ন সমাদরের সহিত সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সত্ত্বেও কেন-যে তাহা পূর্ব্বতন কালেও জনসাধারণের উচিত-মতো ভোগে আসে নাই এবং অধুনাতন কালেও জনসাধারণের উচিত মতো ভোগে আসিতেছে না, তাহার কোনো-না-কোনো কারণ অবশ্য থাকিবে। তাহার প্রধান একটি কারণ যাহা আমার বিবেচনায় সম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতেছি—প্রণিধান করুন্।

কাহাকে যে বলে বিজ্ঞান —অধুনাতন কালের পাঠশালার বালকদিগেরও তাহা জানিতে বাকি নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে আমাদের দেশ যেহেতু আমাদের দেশ নহে, এইজন্য ভারত-বর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মূর্ত্তি যে কিরূপ তাহা আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণেরও নিজ-বুদ্ধির অগোচর; কেবল তাহার এক-একখানি বিকলাঙ্গ ছবি যাহা তাঁহারা ছাত্র-পাঠ্য ইংরাজি পুস্তক হইতে আপন আপন মানস-পটে ফটোগ্রাফ্ করিয়া লইয়াছেন, সেই আব্ছায়া-গোচের ফটোগ্রাফের ফটোগ্রাফ্ তাঁহাদের নিকটে ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের সার সর্ব্বস্ব। প্রথমে আমি তাই ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মূল মন্ত্রটির মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলিব—কিন্তু খুব সংক্ষেপে; এইরূপে আমি আমার বক্তব্য কথাটি'র গোড়া ফাঁদিয়া তাহার পরে একটি ছেলেভুলানিয়া গোচের ছোটো খাটো গল্পের আকারে তাহাকে আমি সভা'র মাঝখানে উপস্থিত করিব। এ রকমের একটা বিসদৃশ ব্যাপার দৃষ্টে পাছে আপনারা আশ্চর্য্য হ'ন

এইজন্য আমি আগে ভাগে আপনাদিগকে তাহা জানাইয়া রাখিতেছি। ইহাতে আমার অপরাধ নাই; কেননা তাহা না করিয়া আমি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশের পুরাকালের ঐতিহাসিক বিবরণের গহন অরণ্যে ধৃষ্টতা'র সহিত প্রবেশ করি, তাহা হইলে দুই চারি পা অগ্রসর হইতে না হইতেই পথ হারাইয়া কোথায় যে কোন অন্ধকার অমানব পুরীতে গিয়া পড়িব তাহার ঠিকানা নাই।

ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মূল মন্ত্রটির প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য যাহা আমি বেদান্তাদি শাস্ত্রের মধ্য হইতে নিষ্কর্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে আমার বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :—

সত্য যদিচ এক বই দুই নহে, কিন্তু তথাপি তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশকালপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। বৈদান্তিক আচার্য্যেরা তাই বলেন—

সত্য তিন প্রকার,

(১) পারমার্থিক সত্য,

(২) ব্যাবহারিক সত্য,

(৩) প্রাতিভাসিক সত্য ;

আর, তদনুসারে তাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের পংক্তি-বিভাগ ধার্য্য করিয়াছেন তিনটি ;

(১) পরাবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান,

(২) অপরাবিদ্যা বা বিজ্ঞান,

(৩) অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞান।

বিজ্ঞান ব্যষ্টি-জ্ঞান বা শাখা-জ্ঞান ; তত্ত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান বা মোট জ্ঞান। মোট জ্ঞানের মোট সত্যের নাম পারমার্থিক সত্য। সে সত্য কী আপনারা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সত্য কথা যদি বলিতে হয়—তবে এ সভার মাঝখানে সহসা আমি তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু আবার—একটা কথা কোমর বাঁধিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়া পথের মাঝখানে থামিয়া যাওয়াও দোষ! অতএব জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির মোটামুটি-রকমের একটা মীমাংসা যাহা আমার মনে উপস্থিত হইতেছে,—সংক্ষেপে তাহা আপনাদের সুবিবেচনায় সমর্পণ করিতেছি, প্রণিধান করুন্।

সাম্প্রদায়িক দলাদলি এবং দার্শনিক মতামতের রাজ্যে নগর-সংকীর্ত্তনের ধুম বেজায় অতিরিক্ত! সে নগর-সংকীর্ত্তন কম নহে কীর্ত্তন! তাহা মতবাদীদিগের স্ব স্ব মতের এবং দলপতিদিগের স্ব স্ব দলের **মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন!** সে নগর-সংকীর্ত্তনের খোলপিটন হ'চ্চে **বাদের** বাদ্যোদ্যম, আর, করতালসংঘর্ষণ হ'চ্চে ISMএর ঝমাঝম ধ্বনি। **বাদের** বাদ্যোদ্যমের চরম পর্য্যাপ্তি হ'চ্চে **বিবাদের** উন্মত্ত কোলাহল; ISMএর ঝমাঝম ধ্বনির চরম পর্য্যাপ্তি হ'চ্চে SCHISMএর দম্ভ-আস্ফালন। আমাদের দেশে যত প্রকার বাদ আছে তাহার মধ্যে সদ্দারশ্রেণীর প্রধান দুই মল্ল হ'চ্চে **অদ্বৈতবাদ** এবং **দ্বৈতবাদ**। দেশসুদ্ধ লোকের এইরূপ ধারণা যে, উপনিষদের **তত্ত্বমসি** বাক্যটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ তাহা **অদ্বৈতবাদ**। আমার কিন্তু এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে, উপনিষদে এক যা বাদ আছে **সত্যবাদ,** তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় বাদ তাহার ত্রিসীমার মধ্যে নাই। তবে যদি উপনিষদ্-

মন্ত্রটকে কোনো দার্শনিক পণ্ডিত অদ্বৈতবাদের অঙ্গীভূত করিয়া সাজাইয়া দাঁড় করা'ন্—সে কথা স্বতন্ত্র; যিনি সাজাইয়া দাঁড় করা'ন তিনিই তাহার জন্য দায়ী, তা' বই উপনিষদ্ তাহার জন্য ঘুণাক্ষরেও দায়ী নহে। তত্ত্বমসি-বচনটি'র শব্দার্থ যে কি তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নিম্ন-শ্রেণীর বালকেরাও জানে যে, তৎ শব্দের অর্থ তাহা বা সে-বস্তু। ত্বং শব্দের অর্থ তুমি। "তৎ ত্বং" কি না সে-বস্তু তুমি। কথাটা ওটা-যে নিতান্তই একটা হেঁয়ালি-ঢঙের সংকেত-বচন, তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কাজেই, উহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্যটি তলাইয়া না বুঝিলে উহা কেবল একটা মুখের কথা হইয়া—ফাঁকা আওয়াজ হইয়া—বাতাসে উড়িয়া যায়। ত্বং শব্দের বাক্যার্থ তুমি—কথাটা খুবই সত্য, কিন্তু তাহার ভাবার্থ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আমি যেমন তোমাকে ত্বং বলিয়া সম্বোধন করি, তুমিও তেম্নি আমাকে ত্বং বলিয়া সম্বোধন কর; আর, বেদান্তের সেই যে দেবদত্ত ("সোঽয়ং দেবদত্ত") যিনি ভাগ্যক্রমে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, ইঁহাকে আমরা উভয়েই ত্বং বলিয়া সম্বোধন করি। তুমি ত্বং আমার নিকটে, আমি ত্বং তোমার নিকটে, দেবদত্ত ত্বং আমাদের উভয়েরই নিকটে। অতএব অ্যাকা কেবল তুমি যে ত্বং তাহা নহে; তুমিও ত্বং, আমিও ত্বং, দেবদত্তও ত্বং। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ত্বং আমি তুমি-তিনি'র প্রতিনিধি স্বরূপ; এক কথায়—সমষ্টি আত্মার প্রতিনিধিস্বরূপ। তবেই হইতেছে যে ত্বং শব্দের বাক্যার্থ যদিচ "তুমি" বই না, কিন্তু তাহার ভাবার্থ সমষ্টি আত্মা কিনা পরমাত্মা। এমতে দাঁড়াইতেছে, যে, "তত্ত্বমসি" বচনটির **বাক্যার্থ** যদিচ "সে বস্তু তুমি" কিন্তু তাহার **ভাবার্থ** "সে বস্তু পরমাত্মা।" উপনিষদে তত্ত্বংও আছে—তদ্‌ব্রহ্মও আছে—দুইই আছে। তার সাক্ষী "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম"; ইহার অর্থ এই যে, সে বস্তুকে বিশেষ মতে জানিতে ইচ্ছা কর—সে বস্তু ব্রহ্ম। সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতিই বিশেষ মতে জানিবার বস্তু, আর সেইজন্য সাংখ্যের পারিভাষায় ব্রহ্ম প্রকৃতিরই আর এক নাম। গীতাশাস্ত্রে ব্রহ্ম শব্দ স্থল-বিশেষে প্রকৃতি অর্থে এবং স্থল-বিশেষে পরমপুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন—

> "সর্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
> তাসাং ব্রহ্ম মহৎ যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ প্রকৃতি। আবার

> পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
> পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং আদিদেবং অজং বিভুং॥
> আহুস্ত্বাং ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।"

এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ পরম পুরুষ। বেদান্ত শাস্ত্রে কিন্তু তৎসৎ শব্দ এবং তদ্‌ব্রহ্ম শব্দের মধ্যে মূলেই কোনো অর্থ-ভেদ নাই। সৎ শব্দের অর্থ ধ্রুব সত্য। সকল শাস্ত্রের মতেই পুরুষ অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য—প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল। তবেই হইতেছে যে "তৎসৎ" বলাও যা (অর্থাৎ "সে বস্তু ধ্রুব সত্য" বলাও যা) আর, "সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্মা" বলাও তা, একই কথা। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, তিন স্থানের এই যে তিনটি উপনিষদ্ বচন (১)

তত্ত্বং, (২) তদ্‌ব্রহ্ম, (৩) তৎসৎ, তিনটিরই ভাবার্থ "সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্মা।" তৎ শব্দের সামান্য অর্থ হ'চ্চে চেয়ার-টেবিল-ঘটিবাটি'র ন্যায় যা-তা জ্ঞেয় বস্তু, আর, তাহার বিশেষ অর্থ হ'চ্চে পরম জ্ঞেয় বস্তু অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিবার বস্তু। সং শব্দের বহুবচন হ'চ্চে "সন্তঃ", সন্তঃ শব্দের অর্থ সৎপুরুষেরা। এতদনুসারে দাঁড়াইতেছে এই যে, সৎ শব্দের সামান্য অর্থ তুমি-আমি-তিনি প্রভৃতির ন্যায় যে-সে সৎলোক বা সৎপুরুষ; আর, তাহার বিশেষ অর্থ পরম-পুরুষ পরমাত্মা! বেদান্তাদি শাস্ত্রের মতে ব্রহ্ম শুধুই কেবল পরম জ্ঞেয় বস্তু নহেন—শুধুই কেবল তৎ নহেন; এক দিকে যেমন তিনি জ্ঞানের পরম লক্ষ্য তৎ,আর এক দিকে তেমি তিনি আত্মার পরম প্রতিষ্ঠা সদাত্মা বা পরমাত্মা। "তৎ" কিনা সত্যস্বরূপ পরম বস্তু; "সৎ" কিনা মঙ্গলস্বরূপ পরম আত্মা। ইংরাজি. দার্শনিক ভাষায়—তৎ হ'চ্চে Fundamental Substance, সৎ হ'চ্চে Supreme Subject। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আর বেশী বাক্যব্যয় এবং সময়-ব্যয় না করিয়া সংক্ষেপে আমার বক্তব্য কথাটার উপসংহার করি।

পারমার্থিক সত্যের মূল মন্ত্র ওঁ তৎ-সৎ; এই মহা মন্ত্রটির অর্থ আমার বুদ্ধির খদ্যোতালোকে আমি যেটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই :—

তৎ কিনা জ্ঞেয় প্রকৃতি।
সৎ কিনা জ্ঞাতা পুরুষ। }

তৎ উপাদান কারণ।
সৎ নিমিত্ত কারণ। }

তৎ সত্য; সৎ মঙ্গল।

"ওঁ তৎসৎ" কিনা যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা তিনি সত্য এবং মঙ্গল একাধারে; তিনি জানিবার বস্তু এবং জানিবার কর্ত্তা একাধারে; তিনি Substance এবং Subject একাধারে; তিনি উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ একাধারে; তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষ একাধারে; তিনি মাতা এবং পিতা একাধারে; এক কথায়; তিনি মোট জ্ঞানের মোট সত্য আর তাহারই নাম পারমার্থিক সত্য।

পারমার্থিক সত্য যেমন মোট জ্ঞানের মোট সত্য; ব্যাবহারিক সত্য তেমনি বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন সত্য; যেমন—জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের গ্রহাদি-ঘটিত সত্য; বীজগণিতের সংখ্যা-ঘটিত সত্য; ক্ষেত্রতত্ত্বের স্থানাধিকার-ঘটিত সত্য; রসায়ন বিজ্ঞানের দ্রব্যগুণ-ঘটিত সত্য; ইত্যাদি।

পারমার্থিক সত্য এবং ব্যাবহারিক সত্য ছাড়া আর এক রকমের সত্য আছে যাহার শাস্ত্রীয় নাম—প্রাতিভাসিক সত্য। "প্রাতিভাসিক" অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে Phenomenal। রীতিমত বুদ্ধি বিবেচনা খাটাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা সত্যকেই (যেমন পৃথিবী গোলাকার এই একটি সত্যকে) বিজ্ঞান-রাজ্যে যত্ন সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাহার জন্য যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; আর সেই সঙ্গে মনের সংস্কার-মূলক আপাত-সুলভ সত্যকে (পৃথিবী চ্যাপটা এই রকমের কাঁচা সত্যকে) দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। বিজ্ঞান-রাজ্যের সুপরীক্ষিত সত্য খুব কাজের সত্য

তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু তথাপি তাহা ব্যাবহারিক সত্য বই পারমার্থিক সত্য নহে। বিজ্ঞানের সত্যকে ব্যাবহারিক সত্য বলিবার কারণ কি—আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার বিবেচনায় সে কারণ এই :—

বড় বড় বণিক্ মহাজনেরা কিছু আর জাহাজ-বোঝাই-করা সমগ্র বিক্রেয় বস্তুর মোট ভাঙিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ পৌরজনের ব্যবহারার্থে আপনারা বিক্রয় করেন না, সে কার্য্যের ভার তাঁহারা খুচরা জিনিসের ব্যাপারী-দিগের হস্তে গছাইয়া থা'ন্। তত্ত্বজ্ঞানের সমগ্র সত্য বিজ্ঞানের বাজারে চলিতে পারে না এই জন্য—যেহেতু অত বড় মহামূল্য সামগ্রী যে মানুষ ক্রয় করিতে পারে তদুপযুক্ত ক্রোড়পতি বিদ্বজ্জন-সমাজে সুদুর্লভ। তাহা ক্রয় করিতে হইলে বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত শমদমাদির পরাকাষ্ঠা আবশ্যক—পাতঞ্জল শাস্ত্রোক্ত যমনিয়মাদির পরাকাষ্ঠা আবশ্যক! যিনিই যত বড় পণ্ডিত হউন্ না কেন তাঁহার ঘরপোরা বিরাট্ বিশ্ব-কোষেও অত মূল্যের তপস্যানিধির সিকির সিকিরও সংস্থান নাই। পৌরজনেরা যেমন স্ব স্ব ব্যবহার্য্য সামগ্রী-সকল ছোটো-খাটো দোকানদারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে, তা' বই বড় বড় বণিক্ মহাজনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে না, বিদ্যার্থী ব্যক্তিরা তেম্নি স্ব স্ব ব্যবহার্য্য সত্য-সকল বিজ্ঞানের দোকানদারদিগের নিকট হইতেই ক্রয় করেন, তা' বই তত্ত্বজ্ঞানের মহাজনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন না; আর সেইজন্য বিজ্ঞানের সত্যসকল ব্যাবহারিক সত্য নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে।

আমাদেরই এই ভারতবর্ষ যে, বিজ্ঞানের জন্মভূমি তাহার আমি সন্ধান পাইয়াছি নানা প্রকার লক্ষণ দৃষ্টে; কিন্তু তাহা কৃতবিদ্য সমাজের বিচারালয়ের প্রখরবুদ্ধি জুরি-মহোদয়গণের নিকটে প্রমাণ করিতে পারিবার মতো ঐতিহাসিক সাক্ষীর জোগাড় করিয়া ওঠা আমি বড় সহজ মনে করি না। যাহাই হো'ক্ না কেন—পূর্ণ বিচারালয়ের মাঝখানে দ্বাদশ শপথকার মহোদয়গণের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি এ কথা বলিতে একটুও ভীত নহি যে, পুরাকালে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের বয়স যদি চ খুব অল্প ছিল—কিন্তু তাঁহার সেই কচি বয়সেই তিনি যেরূপ তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাহার নিকটে বড় বড় প্রবীণ পণ্ডিত-গণের বিদ্যা-বুদ্ধির মাথা হেঁট হইয়া যায়। এ বিষয়ে বেশী ওকালতি করা আমার পক্ষে নিতান্তই একটা তেলা-মাথায়-তেল-দেওয়ার ন্যায় বাহুল্য কার্য্য; কেননা, পুরাতন ভারতে জ্যোতিষ-বিদ্যা, বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, রসায়ণ-বিদ্যা, পশুপালনী-বিদ্যা, স্থাপত্য-বিদ্যা, চিত্র-কর্ম্ম, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি অনেকানেক বিদ্যা কতদূর যে কালোচিত উৎকর্ষ লাভ করিয়া-ছিল তাহা ত্রিজগতে রাষ্ট্র। তা ছাড়া —রাবণের পুষ্পকবিমানের কথার ভিতরে যদি কোনো প্রকার ঐতিহাসিক সত্য চাপা দেওয়া থাকে—তবে তো ত্রেতাযুগেরই জিত। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার একটা তাম্রলিপি বা আর কোনো প্রকার মাতব্বর-গোচের ঐতিহাসিক দলিল ভারতবাসীর হস্তগত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোনো কথার উচ্চবাচ্য না করাই

ভারতের উকিল ব্যারিষ্টারগণের পক্ষে সৎপরামর্শসিদ্ধ।

ঘড়ি কি বলিতেছে তাহা জানি না—কিন্তু আমার কণ্ঠের তেজ নরমিয়া আসিতেছে দেখিয়া আমার মন বলিতেছে **সময় নাই**। অতএব আর কাল-বিলম্ব না করিয়া আমার অবশিষ্ট বক্তব্যটিকে একটি ক্ষুদ্র উপকথা'র বেশ পরিধান করাইয়া তাহার প্রতি আপনাদের কৃপাদৃষ্টি যাজ্ঞা করিতেছি। আপনাদিগকে মাঝে মাঝে হুঁ দিতে বলিতে আমি সাহস করি না—কেবল যদি আপনারা গল্পটিকে অযোগ্য-বোধে শ্রবণদ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দ্যা'ন, তাহা হইলেই আমি আজ আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত মনে করিব।

পুরাকালে আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ছিলেন সভ্যতা রাজ্যের রাজর্ষি। পরাবিদ্যা ছিলেন রাজমহিষী। বিজ্ঞান ছিলেন তাঁহাদের সবে-মাত্র একটি পুত্র। স্মৃতিপুরাণ ছিলেন রাজমন্ত্রী। রাজর্ষি তত্ত্বজ্ঞান মনে মনে সংকল্প করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির ন্যায় পত্নী সহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। বিজ্ঞানের বয়ঃক্রম সাত আট বৎসরের অধিক না—তা নহিলে রাজর্ষি বিজ্ঞানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইতেন। তাহা যখন দেখিলেন হইবার নহে, তখন তিনি বিজ্ঞানের বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত রাজ্যশাসনের ভার তাঁহার প্রবীণ মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণের হস্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বনে গমন করিবার পূর্ব্বে রাজ্যময় ধর্ম্মদুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণকে ডাকাইয়া প্রজারা যাহাতে অক্ষয় রাজ-ভাণ্ডারের অমৃতোপম ভক্ষ্য-পানীয়-সকল সুলভ মূল্যে পাইতে পারে তাহার একটা সদ্ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন, আর সেই সঙ্গে কিরূপে বিজ্ঞানকে ধীরে ধীরে সর্ব্ববিদ্যায় এবং সর্ব্বগুণে সম্ভৃত করিয়া তুলিয়া যথোপযুক্ত বয়সে রাজধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে এবং বিশেষত বিজ্ঞান যাহাতে বিপথে পদার্পণ না করে তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সেই বিষয়ের একটা সারগর্ভ উপদেশ-পত্র স্বহস্তে লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিবরের হস্তে তাহা সযত্নে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর রাজর্ষির আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রিবর ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া পুনঃ পুন শপথ করিলেন যে, তাঁহার জীবন থাকিতে উপদেশ-পত্রের একটি কথারও তিনি অন্যথাচরণ করিবেন না। অনতিপরে রাজর্ষি তত্ত্বজ্ঞান পত্নী সহ তপোবনে প্রয়াণ করিলেন।

মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজ-ভাণ্ডারের অপর্য্যাপ্ত ভক্ষ্য-পানীয়-সকল যাহাতে প্রজারা সুলভ মূল্যে পাইতে পারে, তাহার উচিতমতো ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অনেক কালের বহুদর্শিতা এবং বিচক্ষণতা রীতিমত কাজে খাটাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া এবং সব দিক বাঁচাইয়া যে দ্রব্যের যে মূল্য ধার্য্য করিলেন, তাহা প্রজাদিগের আদবেই মনঃপূত হইল না। কিয়ৎ পরে সমস্ত প্রজাবর্গ একযোট হইয়া মন্ত্রিবরের নিকটে এইরূপ আবেদন জানাইল যে, "ন্যায়মতে রাজ-ভাণ্ডারের ভক্ষ্য-পেয়-সকল আমরা বিনামূল্যে পাইবার অধিকারী। নিতান্তই যদি আমাদিগকে তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, তবে এক টাকার জিনিষ এক পয়সা মূল্যে

লইতে আমাদের মনকে কোনোমত প্রকারে লওয়াইলেও লওয়াইতে পারি; নচেৎ আমরা না খাইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি তার সিকি পয়সা বেশী মূল্যে আমরা তাহা লইব না।" মন্ত্রিবর ফাঁপরে পড়িলেন। মন্ত্রিবরের মন্ত্রিণী ঠাকুরাণী ছিলেন দুই সপত্নী। তাঁহার কৌশল্যা ছিলেন রক্ষানীতি, আর, তাঁহার কৈকেয়ী ছিলেন লোকরঞ্জনা। প্রজাদের ঐরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা উভয় মন্ত্রিণী ঠাকুরাণীরই কর্ণে পৌঁছিল। মন্ত্রিবর মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়া ভালো করিয়া আহার করিতেছেন না দেখিয়া বড় মন্ত্রিণী রক্ষানীতি বলিলেন "ভাব্‌চ কেন অত; প্রজাদের যারা প্রধান মোড়ল—যাদের বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, তাদের সবাইকে ডাকিয়ে এনে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লেই তারা বুঝ্‌বে, আর প্রধানেরা বুঝ্‌লেই ক্রমে ক্রমে সবাই বুঝ্‌বে; তা হ'লেই আপদ্‌ বালাই চুকে যাবে।" ছোটো মন্ত্রিণী লোকরঞ্জনা বলিলেন "দিদি যা ব'ল্‌চেন তা যদি ভাল বোঝো তবে তাই কর'। সখীমণি ঘাটে জল তুল্‌তে গিয়েছিল—জল তুলে এসে আমাকে ব'ল্লে যে, রাস্তায় লোকের ভিড় হ'য়েচে এম্নি যে, দুই দণ্ড তা'কে পথের একধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'য়েছিল; আর, প্রজারা সবাই মিলে যা ব'লছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব সে শুনেচে; তার চ'কের সাম্‌নে, প্রধান মোড়োলেরাই বা কি, আর খুচ্‌রো চাসাভুসোরাই বা কি, সবাই মিলে ব'ল্‌ছিল যে, তারা না খেয়ে মর্‌বে তবুও তারা এক টাকার সামগ্রী এক পয়সার বেশী দাম দিয়ে নেবে না। দেশসুদ্ধ লোক না খেয়ে ম'চ্চে—আমি তা চ'কে দেখ্‌তে পার্‌ব না; তার আগে যা'তে তা আমাকে দেখ্‌তে না হয়, আমি তা না-খেয়েই হো'ক্‌ আর যা-খেয়েই হো'ক—যেমন ক'রে হো'ক, ক'রে, ক'ম্মে চুকে নিশ্চিন্তি হ'ব। তা হ'লেই দিদি ঘরের একেশ্বরী হ'বেন আর তোমার সব আপদ বালাই চুকে যাবে।" মন্ত্রিবর তাঁর কৈকেয়ী ঠাকুরাণী লোকরঞ্জনা'র শক্ত আব্‌দার কিছুতেই থামাইতে পারিলেন না; তিনি আর কোনো উপায় না দেখিয়া রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ তত্ত্বান্নের সহিত নানা প্রকার অর্থহীন এবং অসার ক্রিয়াকর্ম্মের ভেজাল মিশাইয়া প্রজাদিগের মধ্যে এক টাকার জিনিস সিকি পয়সা মূল্যে বিলি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞানের বয়স তখন যদিও খুব কম তথাপি মন্ত্রিবরের ঐরূপ গর্হিত কার্য্য তাঁহার একটুও ভালো লাগিল না। বিজ্ঞানের মুখ ভার দেখিয়া মন্ত্রিবর তাঁহাকে বলিলেন "তুমি আমার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছ? কেন যে আমি এইরূপ দেশকাল-পাত্রোচিত বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনা করিতেছি, এখনো তোমার তাহা বুঝিতে পারিবার সময় হয় নাই; আমার মতো যখন তোমার চুল পাকিবে তখন তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিবে যে, বৃদ্ধ মন্ত্রিটি ছিলেন বলিয়া রাজ্য এখনো পর্য্যন্ত টেঁকিয়া আছে, নহিলে কোন্‌কালে তাহা রসাতলে যাইত।" বিজ্ঞান বলিল "আপনি ঐ যে কদর্য্য সামগ্রীগুলা বাজারে চালাইয়া দিতেছেন, ও যে বিষ!" মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ বলিলেন "ঐ-দ্রব্যগুলারই মধ্যে দুই চারি ফোঁটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত আছে তাহা অমনধারা দশ দশ হাঁড়ি বিষকে গিলিয়া

খাইতে পারে।" মন্ত্রিবরের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সূত্রে মনান্তর ঘটিল। বিজ্ঞান একদিন কথাপ্রসঙ্গে মন্ত্রিবরকে বলিল, "আমি বালক বলিয়া আমার কথা আপনি অগ্রাহ্য করিবেন তাহা আমি জানি, কিন্তু তবুও আমি বলিতেছি যে এ রাজ্যের মঙ্গল নাই! বছর-আষ্টেক পরে যখন আপনার দুর্নীতির ফল পাকিয়া উঠিবে, তখন আপনি বলিবেন যে "সত্য কথা বালকের মুখ দিয়া বাহির হইলেও তাহা সত্য বই মিথ্যা নহে, আর, অশুভ কার্য্য প্রবীণের হস্ত দিয়া বাহির হইলেও তাহা অশুভ বই শুভ নহে।" বছর আষ্টেক পরেই বিজ্ঞান কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার জননী ভারতভূমির নিকট হইতে জন্মের মতো বিদায় গ্রহণ করিয়া, আর, কিয়ৎপরে ঈশ্বরের কৃপায় এবং আপনার বাহুবলে নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আপনার আধিপত্য অটলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনতিবিলম্বে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের কথাই ফলিল। অসার এবং অধম সামগ্রী-সকল উদরস্থ হওয়াতে-করিয়া দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হাড়ে হাড়ে নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধির সঞ্চার হইতে লাগিল। অন্তঃসারশূন্য অলীক অপদার্থ এবং অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম্মের ভারে তত্ত্বজ্ঞানের রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আর্য্য-সভ্যতার জ্যোতির্ম্ময় মুখশ্রী তমসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়া আর্য্য-সভ্যতা অধম বর্ব্বরতায় পর্য্যবসিত হইল। তাই আমাদের আজ এই দশা!

বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহারের যে কিরূপ বিষময় ফল এই তো তাহা দেখিলাম। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণা অপার! পশ্চিমে বিজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্তু তথাপি তাহা বিজ্ঞানের সত্য জ্যোতিকে তিল মাত্রও খর্ব্ব করিতে পারেও নাই, পারিবেও না। আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্তু তথাপি তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সুমঙ্গল শান্তিকে একচুলও টলাইতে পারেও নাই, পারিবেও না।

প্রবীণ স্মৃতিপুরাণ নবীন বিজ্ঞান'কে এই যে একটি কথা বলিয়াছিলেন—যে রাজ-ভাণ্ডারের ভক্ষ্য-পেয় সামগ্রীতে সহস্র ভেজাল-মিশ্রিত থাকা সত্ত্বেও তাহার ভিতরে এক আধ ফোঁটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত রহিয়াছে তাহা সকল রোগের মহৌষধ, তাঁহার এ কথা সত্য বই মিথ্যা নহে; তা'র সাক্ষী—রামায়ণ এবং মহাভারত এখনো পর্য্যন্ত আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক সভ্যতা'কে মৃত্যুর হস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আবার, তা'ও বলি—মন্ত্রিবরের উপরে রাগ করিয়া বিজ্ঞান যে, তাঁহার পিতার অনভিমতে আপনার জননীতুল্য জন্মভূমিকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া পশ্চিম ভূগোলখণ্ডে আপনার রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এটা তাঁহার উচিত কার্য্য হয় নাই। ব্যাবহারিক সত্যের জ্ঞানোপার্জ্জন মনুষ্যবুদ্ধি কর্ত্তৃক হইয়া ওঠা যতদূর সম্ভবে—বিজ্ঞানের তাহা হইতে বাকি নাই যদিচ, কিন্তু তথাপি ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে যে, পারমার্থিক সত্যের ক-খ-গ-ঘও আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে ধরা

দিল না। বিজ্ঞানের উচিত ছিল—ভারত-ভূমি পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার দেবতুল্য পিতার নিকটে পারমার্থিক সত্যের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্রের যথাবিহিত সাধন দ্বারা তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের শূন্য উপর-মহলটা পুরাইয়া লওয়া। তাহা না করিয়া তিনি তাঁহার অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থায় ভারত-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা'তে তাঁহার রাজ্যমধ্যে এক্ষণে যেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাহা যে অবশ্যম্ভাবী—প্রবীণ মন্ত্রিবর তাহা তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বুঝিতে পারিয়া—কলিতে দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ, ক্লেশের পরে ক্লেশ, ভয়ের পরে ভয় যাহা যাহা ঘটিবে তাহা ভারতময় ঢ্যাঁঢ্রা পিটিয়া দেওয়াইয়া-ছিলেন। অতএব বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারত-মন্ত্রীর হিত-পরামর্শ শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন; ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার লোকপূজ্য পিতা'র নিকটে দীক্ষিত হউন্; দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যসভ্যতা'র যৌবরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার রাজর্ষি পিতার চিরপোষিত মনস্কামনা পূরণ করুন্; তাহা হইলে তাঁহার পৈতৃক প্রাচ্যরাজ্যেরও মঙ্গল হইবে, আর, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত প্রতীচ্য রাজ্যেরও মঙ্গল হইবে। আমার ক্ষুদ্র উপকথাটি ফুরাইল। আমারও শান্তি হইল, আপনাদেরও শান্তি হইল, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূতন বর্ষে

নূতন দেখিব বলি উঠিয়াছি জাগি,
প্রাণ কিন্তু হাহা করে পুরাণোর লাগি।
নয়নে সুন্দর রাগে রঞ্জিত প্রভাত,
হৃদয়ে জাগিয়া আছে অন্ধকার রাত!
কার তরে গাঁথি ফুল, কারে দিই মালা,
কি রহস্য দ্বন্দ্বময় জীবনের পালা!
নিদ্রা যবে ভেঙ্গে যায়, স্বপ্ন যায় ছুটে,
সত্যের আলোক-হাসি—সকৌতুকে ফুটে।
জীবন স্বপ্নের শেষ কে জানে কেমন?
মৃত্যু কি আনিবে নব স্মৃতি জাগরণ?

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।



শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি

প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু *

নৃপতি প্রভাকরবর্দ্ধন দারুণ দাহজ্বরে আক্রান্ত হইয়া আজ শয্যাগত।

রাজার পীড়ার সংবাদে নগরীর শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। নৃপতির জয় ঘোষণা আর শোনা যাইতেছে না। চারণগণের গীত ও তূর্য্যনিনাদ আজ কর্ণগোচর হইতেছে না। নগরের সমস্ত উৎসব থামিয়া গিয়াছে। নৃত্য গীত বন্ধ, বিপণিতে আর সেরূপ দ্রব্যসম্ভার বিক্রয়ার্থে সজ্জিত হয় নাই। নৃপতির রোগ শান্তির জন্য বহুস্থলে হোম আরম্ভ হইয়াছে। পবনচালিত সেই হোমানলের ধূমরাশি ঘুরিয়া ঘুরিয়া শূন্যে উঠিতেছে। রাজার অনুরক্ত বান্ধবমণ্ডলী রাজার আরোগ্যকামনায় শিবপূজায় নিরত। কোথাও কুলপুত্রগণ চতুর্দ্দিকে দীপ প্রজ্বালিত করিয়া তাহার শিখায় দগ্ধ-প্রায় হইয়া সপ্তমাতৃকার আরাধনা করিতেছে। কোথাও দ্রবিড় দেশীয় উপাসক নরমুণ্ড বলি দিয়া বেতালকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কোথাও চণ্ডিকামূর্ত্তির সম্মুখে বাহুযুগল উত্তোলিত করিয়া অন্ধ্রদেশীয় উপাসক রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে। তরুণ রাজসেবকগণ মস্তকে জ্বলন্ত গুগ্‌গুল ধারণ করিয়া মহাকালের উপাসনা করিতেছে। কোন আত্মীয়স্বজন তীক্ষ্ণ অস্ত্রে নিজ দেহের মাংস কর্ত্তিত করিয়া রাজার মঙ্গলার্থ হোমানলে তাহা আহুতি দিতেছে, কোথাও সামন্তরাজপুত্রগণ প্রকাশ্যে নরমাংস লইয়া পিশাচদিগকে বিতরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে (১)। থাকিয়া থাকিয়া আকাশে বায়সমণ্ডলী কটুস্বরে ডাকিতে ডাকিতে আসন্ন অমঙ্গল সূচনা করিতেছে।

প্রধান রাজপথে এক পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া একখানি যম-পট প্রদর্শন করিতেছে। দণ্ডের উপর হইতে চিত্রপট ঝুলিতেছে। চিত্রে ভীষণ মহিষের উপর অধিষ্ঠিত যমের মূর্ত্তি চিত্রিত। দক্ষিণহস্তে দীর্ঘ শরকাণ্ড গ্রহণ করিয়া সে চিত্রে পরলোক ব্যাপার প্রদর্শন করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিতেছে—

"যুগে যুগে সহস্র সহস্র মাতা পিতা, শত শত পুত্র দারা বিগত জীবন হইয়াছে! তুমি কার? কেই বা তোমার?" (২)

রাজপ্রাসাদে ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করা

---

* বাণভট্ট বিরচিত "শ্রীহর্ষচরিত" সংস্কৃত কথা সাহিত্যে একমাত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থ। বাণভট্ট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে সময়কার আচার ব্যবহার রীতি নীতির সুস্পষ্ট উজ্জ্বল চিত্র ঐ গ্রন্থে বিদ্যমান। খণ্ডচিত্রগুলিও অপূর্ব্ব। আজ এই খণ্ডচিত্রগুলির একটি সংক্ষেপে অনূদিত হইল। [হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকাল ৬০৬ হইতে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ।]

(১) নরমুণ্ড উপহার, নরমাংস বিক্রয় প্রভৃতি সেকালের এক বিশেষত্ব। মালতীমাধব নাটকেও মাধব শ্মশানে নরমাংস লইয়া পিশাচগণকে দিতেছেন বর্ণিত আছে।

(২) যমপট প্রদর্শন প্রাচীন ভারতের এক প্রথা ছিল। মুদ্রারাক্ষস নাটকেও এই যমপট প্রদর্শনকারীর চরিত্র-চিত্র বিদ্যমান।

হইতেছে। কুলদেবতার পূজা আরম্ভ হইয়াছে। রোগশান্তির জন্য দেবগণকে যে চরু উপহার দেওয়া বিধি, সেই চরু রন্ধন হইতেছে। হোমানলে দধিযুক্ত ঘৃত দ্বারা লিপ্ত দূর্ব্বাপল্লব নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোথাও মহামায়ূরী মন্ত্রপাঠ, কোথাও ভূতপ্রেত যাহাতে না আসিতে পারে, তজ্জন্য উপহার প্রদান, কোথাও শান্তিস্বস্ত্যয়ন বিধান, কোথাও বা সংযমী ব্রাহ্মণের বেদপাঠ হইতেছে। শিবমন্দিরে রুদ্রৈকাদশী মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে, নির্ম্মল শিবভক্তগণ সহস্র কলস দুগ্ধে শিবকে স্নান করাইতেছে—সকলেরই উদ্দেশ্য যাহাতে দেবতা প্রসন্ন হন।

প্রাঙ্গণে অধীন রাজমণ্ডলী উপবিষ্ট। প্রভুর অদর্শনে তাঁহারা দুঃখিত। মধ্যে মধ্যে প্রভাকরবর্দ্ধনের কক্ষ হইতে পরিচারকবর্গ নির্গত হইলে তাহাদের নিকট হইতে রাজার সংবাদ জানিতেছেন। নিজেদের স্নান, ভোজন, শয়নের কথা আর মনে নাই। নিজেদের দেহসংস্কারের প্রতিও দৃষ্টি নাই। বসন মলিন। দিন রাত্রি এইরূপে কাটিয়া যাইতেছে।

পরিজন সকল বিভিন্ন কক্ষে, দ্বারপ্রান্তে দলবদ্ধ হইয়া অনুচ্চস্বরে মলিন বদনে কথোপকথন করিতেছে। কেহ কোন চিকিৎসকের দোষ বাহির করিতেছে, কেহ অসাধ্য রোগের লক্ষণ সকল বলিতেছে, কেহ দুঃস্বপ্নের বর্ণনা করিতেছে, কেহ পিশাচের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছে। কেহ বা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কি গণনা করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিতেছে, কেহ বা অমঙ্গলসূচক কি কি লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছে। কোথাও বা একজন 'সংসার অনিত্য' 'কলিকালের মহাদোষ' 'দৈব কি নির্দ্দয়' এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। তখন আর একজন 'ধর্ম্ম কি আর আছে?' 'রাজকুলদেবতাই বা কি করিতেছেন?' বলিতেছে। কোথাও বা আশ্রিত কুলপুত্রগণ আশ্রয়-নাশ-শঙ্কায় নিজ নিজ ভাগ্যের নিন্দা করিতেছে।

অন্তঃপুরের মধ্যে বিবিধ ঔষধের গন্ধ। অগ্নিতে বিবিধ ঘৃত, তৈল ও ক্বাথের পাক হইতেছে।

তৃতীয় মহলে রাজার কক্ষ। সেখানে পীড়িত রাজা কক্ষমধ্যে শয্যায় শায়িত। সে মহলের দ্বারপথে বহু বেত্রধারী পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। তিনগুণ পর্দ্দা দ্বারা কক্ষে কক্ষে যাইবার পথগুলি ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। পক্ষদ্বার সকল রুদ্ধ। গবাক্ষ-রন্ধ্র দিয়া প্রবল বেগে বায়ু-প্রবেশ বন্ধ করা হইয়াছে। কবাট উন্মোচন বা বন্ধ করিবার শব্দ নিষিদ্ধ। কাহারও সোপানে উঠিবার সময় পদশব্দ হইলে প্রতিহারী ক্রুদ্ধ হইতেছে। সকল কার্য্য ইঙ্গিতে সম্পন্ন হইতেছে। বাক্য ব্যয় নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পাছে শব্দ হয় বলিয়া বর্ম্মধারী পরিচারক বহুদূরে অবস্থিত হইয়াছে। রাজার আচমন জল লইয়া পরিচারক এককোণে বসিয়া আছে, ইঙ্গিত মাত্রেই চকিত হইয়া উঠিয়া আসিতেছে।

অন্তঃপুরে বারাঙ্গনাদের অধর আজ তাম্বূলরাগহীন। কঞ্চুকীরা শোকে সঙ্কুচিত। বন্দিগণ নিরানন্দ। আশাহীন নিকটস্থ পরিচারক নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। চন্দ্রশালিকায় প্রধান ব্যক্তিবর্গ স্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন।

রাজবান্ধবসমূহের পত্নীগণ প্রচ্ছন্ন বাতায়ন দিয়া উঁকি দিতেছেন। দারুণ পীড়ার সংবাদে তাঁহারা শোকবিধুর। চতুঃশালিকায় উদ্বিগ্ন পরিজন সকল দলে দলে দাঁড়াইয়া আছে। মন্ত্রীরা বিমর্ষ। বিষম জ্বরের প্রকোপ দেখিয়া বৈদ্যেরা ভীত। পুরোহিতগণ বিষণ্ণ। বন্ধু-বান্ধব অবসন্ন। সামন্তরাজগণ সন্তপ্তচিত্ত। রাজার প্রিয় অধীনস্থ ভূপালগণ স্বামীভক্তিতে আহার পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীণদেহে অবস্থিত। সমস্ত রাত্রি জাগরণে দুর্ব্বলদেহ রাজপুত্রগণ ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন। চামরধারিণী হতচেতনা হইয়া বিলুণ্ঠিত, শিরোরক্ষী দুঃখে পাণ্ডুবদন। রাজার কক্ষের নিকটে কেবল অতিশয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় প্রবেশাধিকার পাইয়াছে।

একদিকে বিমর্ষ বৈদ্যগণ পাকশালার অধ্যক্ষকে পথ্যের বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, অপরদিকে দ্রব্যগুণজ্ঞ জনসমূহ ঔষধসমূহ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে।

পীড়িত রাজা ধবল-গৃহে শায়িত। তাঁহার অতিশয় তৃষা। সেই তৃষার কথঞ্চিৎ শান্তির জন্য রাজার সমক্ষে একজন অনুচর আর একজন অনুচরের মুখে উচ্চ হইতে জল ঢালিয়া দিতেছে। রাজার আজ্ঞায় বহু ব্যক্তিকে ভোজন করান হইতেছে। নিজে পানভোজনে অক্ষম, অপরের পানভোজন-দর্শনে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতেছেন। রাজাও অনবরত শীতলজল পান করিতেছেন। তাঁহার পানের জন্য বিবিধপ্রকার পানীয় রক্ষিত হইয়াছে। জলপাত্রে তক্র (ঘোল) রাখিয়া পাত্রটি তুষারে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। দেহে স্পর্শের জন্য শলাকায় শ্বেত বস্ত্রখণ্ডে স্থাপিত কর্পূরচূর্ণ লেপিত হইতেছে। গণ্ডূষ-গ্রহণের জন্য দধিমণ্ড সংগৃহীত, তাহা নব মৃন্ময়পাত্রে রক্ষিত হইয়াছে। পাত্রের উপর পঙ্কলেপন করা হইতেছে। একধারে মৃণাল-রাশি, সেগুলি জলার্দ্র নলিনীপত্রে আবৃত। যে স্থলে পানীয়পাত্র সকল রক্ষিত হইয়াছে সে স্থলটি নীলোৎপল সমূহে আচ্ছাদিত। কোথাও উত্তাপে শোধিত সলিল বারিধারা-পাতে শীতল করা হইতেছে। পাটল বর্ণের শর্করার গন্ধে কক্ষ আমোদিত। কাষ্ঠাধারে জলপূর্ণ বালুকানির্ম্মিত জলাধারের দিকে পীড়িত নরপতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। বহুচ্ছিদ্র জলপাত্রের চতুর্দ্দিকে জলার্দ্র শৈবাল বেষ্টিত করা হইয়াছে। মণিপাত্রে লাজ, শক্তু ও কর্কশর্করা রক্ষিত। চারিদিকে শীতজনক ঔষধ প্রক্ষিপ্ত। স্ফটিক, শুক্তি ও শঙ্খনিচয় বিরাজমান। মাতুলুঙ্গ, আমলকী, দ্রাক্ষা, দাড়িম প্রভৃতি বহু ফল সঞ্চিত হইয়াছে। নানা গ্রাম হইতে দলে দলে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া কক্ষমধ্যে শান্তিজল ছিটাইতেছেন। দাসীরা ললাটে লেপনার্থ পদার্থবিশেষ শিলাতলে চূর্ণ করিতেছে।

নরপতি বিষম জ্বরজ্বালায় অনবরত পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেছেন। শয্যার আস্তরণ অনবরত লুণ্ঠনে ভাঁজ হইয়া গিয়াছে। পরি-চারিকাগণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মুক্তাচূর্ণ ও চন্দন লেপন করিতেছে। অনবরত কমল, কুমুদ ও ইন্দীবররাশি তাঁহার গাত্রে স্পর্শ করান হইতেছে। মস্তকে দারুণ যন্ত্রণা; দৃঢ়ভাবে শিরোদেশ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত। ললাটে নীল শিরারাশি প্রকটিত, চক্ষুকোটর অন্তঃপ্রবিষ্ট, দন্তশ্রেণী অতিধবল, জিহ্বা কালিমাময়। নরপতি

অনবরত উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার বক্ষে মণি-মুক্তাহার, চন্দন, ও চন্দ্রকান্ত মণি। বেদনায় মধ্যে মধ্যে হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন। কখনও কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। বৈদ্যেরা সভয়ে তাঁহাকে দেখিতেছে। তাঁহার কান্তি আর নাই। দেহ ক্ষীণ, নিদ্রাহীন নিশাযাপনে বিবর্ণ। জৃম্ভা ও গাত্রসন্ধিতে বেদনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ নানা রসে লিপ্ত। সজলনয়নে চামরধারিণী চামর-ব্যজন করিতেছে। রাজমহিষী দেবী যশোবতী মুহুর্মুহুঃ মস্তক ও বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "আর্য্যপুত্র! ঘুমাইলে কি?"

নৃপতি প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র হর্ষবর্দ্ধন পিতার পীড়ারম্ভের সময় নগরে ছিলেন না। দূতমুখে সংবাদ পাইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনবরত অশ্বচালনায় নগরে উপস্থিত হইলেন। রাজভবনদ্বারে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়া রাজপুরী প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এমন সময় দেখিলেন সুষেণ নামক বৈদ্যকুমার রাজপুরী হইতে অপ্রসন্নমুখে বাহির হইয়া আসিতেছে। সুষেণ হর্ষবর্দ্ধনকে নমস্কার করিলে হর্ষবর্দ্ধন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুষেণ! বাবা একটু ভাল ত?" সুষেণ বলিল "এখনও ভাল লক্ষণ কিছু নাই। তবে আপনাকে দেখে যদি কিছু ভাল হয়!" হর্ষবর্দ্ধন একেবারে পিতার কক্ষে উপনীত হইয়া পিতার অবস্থা দেখিয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন। মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন। সেই অবস্থাতেও হাত বাড়াইয়া "আয় বাপ আয়" বলিয়া শয্যা হইতে অর্দ্ধশরীর উত্তোলন করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন সসম্ভ্রমে নিকটে গিয়া বিনয়ে অবনতশীর্ষ হইলে প্রভাকরবর্দ্ধন বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে তুলিয়া বক্ষে ধরিলেন এবং অঙ্গে অঙ্গ ও কপোলে কপোল স্পর্শ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়ন নিমীলন করিয়া জ্বরজ্বালা ভুলিয়া গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে হর্ষবর্দ্ধন পিতৃবাহুপাশমুক্ত হইয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া পিতার শয্যার পার্শ্বে আসনে উপবেশন করিলেন। নরপতি নিমেষরহিত নয়নে পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন এবং কম্পমান কর দ্বারা পুনঃপুনঃ তনয়ের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "রোগা হয়ে গেছ।" তখন হর্ষবর্দ্ধনের মাতুলপুত্র ভণ্ডি বলিলেন "দেব! রাজকুমার আজ তিনদিন কিছু আহার করেন নাই।"

তাহা শ্রবণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নরপতি বলিলেন "বৎস—তুমি পিতাকে ভালবাস তাহা জানি, তোমার হৃদয়ও অতি কোমল। তোমাতেই আমার সুখ, রাজ্য বংশ ও প্রাণ অবস্থিত। কেবল আমার কেন সকল প্রজার প্রাণ ও সুখও তোমার উপরই নির্ভর করিতেছে। যাও, স্নানাহার কর। তুমি আহার করিলে তবে আমি পথ্য গ্রহণ করিব।"

হর্ষবর্দ্ধন কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে পিতা পুনরায় আহার করিতে আদেশ করিলে, সেই ধবলগৃহ হইতে নির্গত হইয়া নিজ গৃহে গিয়া কয়েক গ্রাস অনিচ্ছার সহিত আহার করিলেন। আচমন করিতে করিতে চামর-

পিতা কেমন আছেন।" সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "দেব! সেইরূপই।" হর্ষবর্দ্ধন এই শুনিয়া তাম্বূল গ্রহণ না করিয়া নির্জ্জনে বৈদ্যগণকে ডাকাইয়া বিষণ্ণহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?" তাহারা বলিল "দেব! ধৈর্য্য ধারণ করুন। কতিপয় দিনের মধ্যেই পিতা সুস্থ হইয়াছেন শ্রবণ করিবেন।"

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রসায়ন নামক অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক রাজকুলে সংবর্দ্ধিত একজন বৈদ্যযুবা কোনও কথা কহিলেন না। সে প্রভাকরবর্দ্ধন কর্ত্তৃক সযত্নে লালিত হইয়াছিল। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ তাহার আয়ত্ত। তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ। সে অশ্রুপূর্ণনয়নে অধোমুখে নীরব রহিল দেখিয়া হর্ষবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই রসায়ন! কোনও কিছু খারাপ দেখ্‌ছ কি?" সে বলিল "দেব! কাল সকালে জানাইব।"

বৈদ্যেরা চলিয়া গেল। রজনীর প্রারম্ভে হর্ষবর্দ্ধন পুনর্ব্বার ধবল গৃহে গেলেন। সেখানে প্রভাকরবর্দ্ধনের তখন মহান্ প্রদাহ উপস্থিত। তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন "হারিণি! হার আন। বৈদেহি! মণিদর্পণ দাও। লীলাবতি! হিমচূর্ণ ললাটে লেপন কর। ধবলাক্ষি! চন্দনচূর্ণ দাও। কান্তিমতি! চক্ষে চন্দ্রকান্ত মণি স্পর্শ করাও। কলাবতি! কপোলে কুবলয় দাও। চারুমতি! অঙ্গে চন্দন মাখাইয়া দাও। পটলিকে! বস্ত্র দ্বারা ব্যজন কর। ইন্দুমতি! দাহ শান্তি কর। মদিরাবতি! জলার্দ্র অরবিন্দ দ্বারা সুখোৎপাদন কর। মালতি! মৃণাল আন। আবন্তিকে! তালবৃন্ত সঞ্চালন কর। বন্ধুমতি! শিরোদেশ ধারণ কর। ধারণিকে! গলদেশ ধর। তুরঙ্গবতি! বক্ষে সজল হস্ত দাও। বলাহিকে! হস্ত মর্দ্দন কর। পদ্মাবতি! পা টিপিয়া দাও। অনঙ্গসেনে! গাত্র মর্দ্দন কর। বিলাসবতি! কত রাত্রি? কুমুদ্বতি! ঘুম আস্‌ছে না, গল্প বল।"

হর্ষবর্দ্ধন পিতার এইরূপ কথা শুনিতে শুনিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন তখন নগরে ছিলেন না। তিনি সসৈন্যে হূণবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। প্রভাতে তাঁহাকে শীঘ্র আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে হর্ষবর্দ্ধন উপর্য্যুপরি দ্রুতগামী উষ্ট্রারোহী দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় হর্ষবর্দ্ধন শুনিলেন তাঁহার সম্মুখে স্থিত বিমলিন তরুণ রাজপুত্রগণ অনুচ্চস্বরে 'রসায়ন' বলিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "রসায়নের কথা কি বলিতেছ?" তাহারা তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া নীরব হইয়া গেল। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে তাহারা দুঃখে অতি কষ্টে বলিল "দেব! রসায়ন অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে।" হর্ষবর্দ্ধন এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে অপ্রিয় বাক্য শুনাইতে হইবে বলিয়া রসায়ন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দুঃসহ দুঃখে অভিভূত হইয়া উত্তরীয়ে মুখ আবরণ করিয়া হর্ষবর্দ্ধন শয্যায় নিপতিত হইলেন। রাজপ্রাসাদে আর গমন করিলেন না।

প্রজাবর্গ সকলে তখন দুঃখে অভিভূত। সকলে গালে হাত দিয়া কাঁদিতেছিল ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া 'হায় হায়' বলিয়া খেদ

করিতেছিল। তাহাদের নিদ্রা ছিল না। নৃত্য গীত, আমোদ প্রমোদ, হাস্ত পরিহাস, সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বসন ভূষণ প্রভৃতি সকল উপভোগের বস্তু অনাদৃত। আহার ও পানীয় পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

এই সময় অমঙ্গলসূচক উৎপাত সকল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। ধরিত্রী ভূমিকম্পে কাঁপিতে লাগিল। সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ উদ্ঘাত উপস্থিত হইল। দিকে দিকে দীর্ঘপুচ্ছ ধূমকেতু সকল দেখা দিল। সূর্য্য দীপ্তিহীন, তাহার মধ্যে কবন্ধকায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। (১) চন্দ্রের চারিদিকে দীপ্ত মণ্ডল দেখা দিল। দিগ্‌দাহ আরম্ভ হইল। রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল। অকালে মেঘোদয় হইয়া দশদিক অন্ধকার হইয়া গেল। প্রবল বায়ু ভীষণ শব্দে বহিতে লাগিল। পাংশু বৃষ্টিতে আকাশ ধূসর বর্ণ বোধ হইতে লাগিল। উল্কাপাত হইতে আরম্ভ হইল। শিবাগণের মুখে অগ্নি উদ্গীরিত হইতে লাগিল। রাজ-প্রাসাদে মুক্তকেশা কুলদেবতাগণের প্রতিমা দৃষ্ট হইল। সিংহাসন সমীপে ভ্রমরমণ্ডলী উড়িতে লাগিল। অন্তঃপুরের উপর বায়সের কর্কশ স্বর অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। শ্বেত রাজছত্রের প্রধান মণি একটা গৃধ্র মাংসখণ্ড ভ্রমে চঞ্চু পুটের আঘাতে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল।

সেদিন কাটিয়া গেল। তারপর দিন প্রভাতে হর্ষবর্দ্ধনের সমীপে রাজমহিষী দেবী যশোবতীর প্রতিহারী বেলা কাঁদিতে কাঁদিতে বেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূতলে হস্ত রক্ষা করিয়া অধোমুখী হইয়া বলিল "দেব! রক্ষা করুন্। রক্ষা করুন্। স্বামী জীবিত থাকিতেই দেবী কি করিতে যাইতেছেন।"

এই কথা শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া দ্রুতবেগে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। সেখানে রাজমহিষী-গণ অনলে প্রাণত্যাগের উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে একবার পরিচিতগণের সহিত শেষ সম্ভাষণ করিতে-ছিলেন। কেহ নিজ পালিত চূতবৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল "বাছা তোমার মা চলিল।" কেহ জাতীগুচ্ছকে বলিল "বাছি, আজ থেকে তোমায় দেখবার কেউ রইল না।" কেহ অশোক বৃক্ষে পাদপ্রহার করিয়াছিল, দাড়িমলতার পল্লবভঙ্গ করিয়া কর্ণভূষণ রচনা করিয়াছিল, আজ তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইল। কেহ যে বকুলবৃক্ষে গণ্ডুষে করিয়া মগু নিক্ষেপ করিত তাহার নিকট গিয়া শেষ দেখা করিল। কেহ প্রিয়ঙ্গুলতাকে শেষ আলিঙ্গন করিল। কেহ পিঞ্জরে স্থিত শুক সারিকার সহিত শেষ সম্ভাষণে রত হইল। কাহারও পালিত ময়ূর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, কেহ নিজ পালিত হংসমিথুন অন্যকে পালন করিতে অনুরোধ করিয়া গেল। কেহ চক্রবাক ও চক্রবাকীর বিবাহ দেয় নাই, তজ্জন্য অনুতপ্তচিত্তে বিদায় লইল—সে আর

(১) অনুরূপ বর্ণনা—ভট্টি কাব্য দ্বাদশ সর্গ ৭০ শ্লোক।

বিবাহ দেখিতে পাইবে না। কেহ অনুসরণরত গৃহহরিণকে ফিরাইয়া দিল। কেহ বা শেষবার বীণাকে আলিঙ্গন করিয়া লইল।

সঙ্গীগণ ও পরিচিত আত্মীয়গণের নিকট হইতেও সকলে বিদায় লইতেছিল। "চন্দ্রসেনে! একবার ভালকরে দেখে নাও।" "বিন্দুমতি! এই শেষ প্রণাম।" "চেটি! পা ছেড়ে দাও।" "আর্য্যে কাত্যায়ণিকে, কাঁদ্‌ছ কেন? দৈব আমায় নিয়ে যাচ্ছে।" "কঞ্চুকি, আমি অলক্ষণা, আমায় প্রদক্ষিণ করছ কেন?" "ধাত্রি! ধৈর্য্য ধর। পায়ে প'ড়ো না।" "ভগিনি! একবার গলা জড়িয়ে ধর।" "আহা, মলয়বতীকে একবার দেখ্‌তে পেলুম না।" "সানুমতি! এই শেষ প্রণাম।" "কুবলয়বতি! এই শেষ আলিঙ্গন।" "সখীগণ! প্রণয়বশতঃ কলহ করেছি, ক্ষমা করো।" চারিদিকে এইরূপ আলাপ শ্রুত হইতেছিল।

রাজমহিষী যশোবতী তখন স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই অনলে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া রাজপুরী হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। তিনি নিজের সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। সবে মাত্র স্নান করিয়া উঠিয়াছেন—পরিধানে রক্তবাস ও কাঁচলি। কণ্ঠে রক্তসূত্র ও হার। কর্ণে কুণ্ডল। সর্ব্বাঙ্গে রক্তিম কুঙ্কুমরাগ। বলয় স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। গলদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পুষ্পমালা ধারণ করিয়াছেন। পতির অস্ত্রকে আলিঙ্গন করিয়া রাজছত্রের সম্মুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সচিবগণকে উপদেশ দিতে দিতে আসিতেছিলেন। চারিদিকে শোকার্ত্ত বন্ধুবান্ধব রোদন করিতেছিল। কঞ্চুকীগণ তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। তিনিও সজলচক্ষে স্নেহভাজন অনুগত জনগণকে দেখিতে দেখিতে, পশুপক্ষীগুলিকে পর্য্যন্ত শেষ সম্ভাষণ করিয়া ও বৃক্ষগুলিকে পর্য্যন্ত শেষ আলিঙ্গন দিয়া বিদায় লইতেছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মাতার চরণে নিপতিত হইলেন। বলিলেন "মা, আমি হতভাগ্য, তুমিও আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ?" দেবী যশোবতী আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুত্রকে তুলিয়া তাহার নয়ন মুছাইয়া বহুবিধ আশ্বাস দিলেন। বুঝাইলেন, বিধবা হইয়া তিনি জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। তাই বিধবা হইবার পূর্ব্বেই প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন অধোমুখে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন দেবী যশোবতী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তকের আঘ্রাণ লইলেন এবং পদব্রজেই অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া সরস্বতী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। সেখানে দীপ্ত অগ্নিশিখায় পতিব্রতা আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন তখন পিতার নিকট গিয়া দেখিলেন তাঁহারও শেষ মুহূর্ত্ত আসন্ন। নেত্রের তারকা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রভাকরবর্দ্ধন ক্ষীণকণ্ঠে দুই চারিটি উপদেশ দিতে দিতে মরণের অঙ্কে চিরনিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

চন্দ্রোদয় হইলে হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং পিতার শবশিবিকায় স্কন্ধ অর্পণ করিয়া সামন্ত রাজবর্গ, পুরোহিত ও পৌরজনগণের সহিত সরস্বতী-তীরে উপনীত হইলেন। তথায় রাজোচিত চিতায় প্রভাকরবর্দ্ধনের দেহ ভস্মীভূত হইল।

হর্ষবর্দ্ধন সেই রজনী ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া জাগরণে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার চারিদিকে পরিজনেরা শোকে অভিভূত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। পিতৃদেবের অতুল গুণরাশির কথা চিন্তা করিতে করিতে হর্ষবর্দ্ধন রজনী যাপন করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া তিনি রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অন্তঃপুরে তখন নূপুর-ধ্বনি নীরব, কেবল কতকগুলি কঞ্চুকী বিচরণ করিতেছে। কক্ষমধ্যে বিষণ্ণ পিতৃপরিজন নিপতিত। রাজহস্তী নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। হস্তিপালক অনবরত রোদন করিতেছে। অশ্বপালগণের অবিরাম ক্রন্দনে মন্দুরায় অশ্বনিচয় নীরব। 'জয়' শব্দ আর উচ্চারিত হইতেছে না। রাজপ্রাসাদে কলকল রবও আর নাই।

হর্ষবর্দ্ধন সরস্বতীতীরে গিয়া পিতার উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। পরে স্নান করিয়া, মাথা না মুছিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। চামর, ছত্র পরিহার করিয়া পদব্রজেই ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

মৃত নরপতির অতিপ্রিয় ভৃত্য, বন্ধু ও সচিবগণ দারাপুত্র পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়-গণের নিষেধ না মানিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিল। কেহ উচ্চ পর্ব্বত হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। কেহ জ্বলন্ত অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিল।† কেহ তীর্থযাত্রা করিল, কেহ কুশশয্যায় অনাহারে শয়ন করিয়া রহিল। কেহ তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গে, কেহ বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপত্যকায়, কেহ বা বনে গিয়া মুনিব্রত অবলম্বন করিল। তাহারা শিরে জটা ও পরিধানে গৈরিক বসন ধারণ করিল। কেহ রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া কপিলপ্রচারিত মত অনুসরণ করিল।

পিতৃশোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য প্রাচীন কুলপুত্রগণ, গুরুগণ, শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পারদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, বিচক্ষণ অমাত্যগণ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীগণ, প্রশান্তচেতা মুনিগণ, ব্রহ্মবাদীগণ ও পৌরাণিককথাকুশল ব্যক্তিগণ হর্ষদেবকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

অশৌচদিবসগুলি অতিবাহিত হইয়া গেল। অগ্রদানীয় ব্রাহ্মণ প্রথমে মৃত নরপতির উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ডভোজন করিল। ব্রাহ্মণগণকে মৃত নরপতির ব্যবহারার্থ সংগৃহীত শয্যা, আসন, চামর, ছত্র, বস্ত্র, বাহন, শস্ত্র প্রভৃতি বিতরিত হইল। রাজহস্তীকে অরণ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যেখানে নৃপতির চিতা রচিত হইয়াছিল সেখানে সুধাধবলিত চৈত্য নির্ম্মিত হইল। নৃপতির অস্থিখণ্ডগুলি তীর্থস্থলে প্রেরিত হইল।

তখন দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে ক্রন্দন মন্দীভূত হইয়া আসিল। বিলাপও বিরল হইল। দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রু-প্রবাহও ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হইয়া গেল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

† জাপানের হেরি-কেরি প্রথা স্মরণ করুন।



আলো-ছায়া

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

রেডিয়মের আবিষ্কারকের সহিত সাক্ষাৎকার

(ফরাসী হইতে)

Pantheon মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে, একটা সরু রাস্তা,—অন্ধকারাচ্ছন্ন ও পরিত্যক্ত; সেই রাস্তার ধারে কতকগুলা কালো-কালো, পলস্তারা-ওঠা ফাট্‌ধরা বাড়ী—তার ধারে নড়নড়ে তক্তার একটা পদ-পথ; আর সেই বাড়ীগুলার মধ্যে একটা জঘন্য "ব্যারাক্"-বাড়ীর কাঠের দেয়াল খাড়া হইয়া আছে; ইহাই ভৌতিক-বিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যার ম্যুনিসিপাল-স্কুল। M. Pierre Curie কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করায় স্কুলের দরোয়ান একটা রাস্তা দেখাইয়া দিল। আমি একটা অঙ্গন পার হইলাম। সেই অঙ্গনের দেয়ালের উপর নিষ্ঠুর কাল যারপর নাই অত্যাচার করিয়াছে। তারপর একটা নিঃসঙ্গ খিলান; সেই স্থানটা আমার পদ-শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তার পরেই একটা স্যাঁতসেঁতে এঁধো গলি; তারই কোণে, কতকগুলা তক্তার মাঝখানে একটা আঁকা-বাঁকা মরা গাছ। সেইখানে, শাসি-ওয়ালা, দীর্ঘ, নীচু, কতকগুলা কাঠের ঘর বিস্তৃত; আরও সেইখানে কতকগুলা ঋজু অগ্নি-শিখা ও বিচিত্র গঠনের কতকগুলা কাচের যন্ত্রও দেখিতে পাইলাম। কোন শব্দ নাই; একটা গভীর ও বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা। যদৃচ্ছ-ভাবে উহার একটা দ্বারে আঘাত করিলাম, আঘাত করিবামাত্র দ্বার খুলিল—আর আমি একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে প্রবেশ লাভ করিলাম। পরীক্ষাগারটি এরূপ সাদাসিধা ধরণের যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। উহার মেজে মাটি-দিয়া দুর্মুস-করা ও ঢিবি-বিশিষ্ট; দেয়ালে চূণ বালীর পলস্তারা; লম্বা সরু সরু কাঠের নির্ম্মিত ছাদ; ধূলাচ্ছন্ন জান্‌লার ভিতর দিয়া অতি ক্ষীণভাবে আলোক প্রবেশ করিতেছে।

কতকগুলা জটিল যন্ত্র-সরঞ্জামের উপর ঝুঁকিয়া একজন যুবক কাজ করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া মাথা উঠাইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"M. Curie কোথায়?" সে উত্তর করিল—"ঐখানে আছেন।" এই কথা বলিয়াই আবার তাহার কাজে মন দিল। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইল। বড় ঠাণ্ডা। একটা বক-নলের ছিদ্র দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছিল; দুই তিনটা গ্যাসের বাতি জ্বলিতেছিল। অবশেষে একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন; লম্বা, পাত্‌লা, অস্থিময় মূর্ত্তি, কর্কশ কটা দাড়ী, মাথায় একটা গোলাকার চ্যাপ্‌টা ব্যবহার-জীর্ণ টুপি। ইনিই M. Curie।

হায়! তাঁহার প্রতিধ্বনি-মুখর নবোদিত খ্যাতি তাঁহার অনুশীলন-পথের কি বিষম অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। রেডিয়ামের আবিষ্কারক বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার নাম জগৎময় প্রচার হইয়া পড়িল, এবং

নোবেল-পুরস্কারের জয়মাল্যধারী সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি অচিরাৎ খ্যাতি-দেবীর অসংখ্য দূতকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। এখনও পর্য্যন্ত তিনি খ্যাতিতে অভ্যস্ত হন নাই। এই খ্যাতি তাঁহার কাজে ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল, তাঁহার সময় অপহরণ করিতে লাগিল, তাঁহার প্রয়োগ-পরীক্ষা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল.........লোকে তাঁহাকে সম্মান-চিহ্নে ভূষিত করিতে চাহিতেছিল না কি ? সম্মান-চিহ্নের তাঁহার কি-প্রয়োজন ? তথাপি,—তাঁহাকে বদ্‌-মেজাজের লোক বলিয়া না ঠাওরায় এবং ভাগ্য লক্ষ্মীর উৎপাড়নে স্বীয় অন্তরের উদ্বেগ না প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই মনে করিয়া তিনি যাহাতে দিনের মধ্যে কোন এক সময় অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল আপনাকে পরের হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারেন তাহার সুযোগ খুঁজিয়া থাকেন.........প্রাতঃকাল ?—অসম্ভব ; অপরাহ্ণ ?—অসম্ভব ; সায়াহ্ণ ?—অসম্ভব। ঈষৎ বক্রীভূত শ্মশ্রুরাশি হস্তের দ্বারা আলোড়িত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "একটু অপেক্ষা কর"--এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। তখনই আবার ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু এবার আট-পৌরে পরিচ্ছদ ছাড়িয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহার মাথায় যে ব্যবহার-জীর্ণ একটা বিশ্রী টুপি দেখিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে একটা নরম ফেল্টের টুপি পরিয়াছেন এবং কোর্ত্তার উপর একটা হাতা-হীন জোব্বা পরিয়াছেন : পকেট হইতে ঘড়িটা বাহির করিয়া এবং প্রয়োগ পরীক্ষার টেবিলের উপর হাতের কনুই রাখিয়া তিনি বলিলেন ; "আমি আপনাকে পনর মিনিটের সময় দিতে পারি।"

তাঁহাকে এইবার পাকড়াইয়াছি মনে করিয়া নিজেকে আমি অভিনন্দন করিলাম ; ইঁহার নিকট হইতে এইবার কিছু বৈজ্ঞানিক সংবাদ আদায় করিতে হইবে, মঃ-ক্যুরি আপনা হইতে কখনই ত আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেন না। আত্মসম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে জানেন না—সে কৌশল তাঁহার নাই। উত্তরে তিনি কেবল "হঁা" বলেন, "না" বলেন, একটু মাথা নোয়ান—তা ছাড়া আর কিছুই না।

আমি বলিলাম :—শ্রীমতী ক্যুরি সকল সময়েই আপনার সহকর্ম্মিণীরূপে আপনার সঙ্গে একত্র কাজ করিয়াছেন—না ? আমার বোধ হয় উনি পোলাণ্ডের লোক, এবং সেখানকার বিদ্যা-পরিষদের বিজ্ঞান-বিভাগে আপনার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় ; অথবা হয়ত এইখানেই হইয়াছিল—যে সময়ে আপনি, M. Schutzenberger-এর পরিচালনাধীনে পরীক্ষা-কার্য্যাদির কর্ত্তা ছিলেন। আমি যদি না ভুলিয়া থাকি,—বোধ হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী কুরি ভৌতিক বিজ্ঞানে ডাক্তার উপাধি লাভ করেন, এবং সেই সময়ে Radio-active বস্তুগুলি সম্বন্ধে তিনি একটি সন্দর্ভ লেখেন। এখন তিনি, Sevres-এ অধ্যাপক—না ?"

—"হঁা"—তিনি বলিলেন "হঁা"।

আবার আমি বলিলাম :—"আর আপনি ১৮৮০ হইতে এইখানেই কাজ করিতেছেন—অনেক গুরুতর বৈজ্ঞানিক আলোচনা

ক্রমাগত প্রকাশ করিয়াছেন, "Institute"-কর্তৃক অনেকবার আপনি জয়মাল্যও প্রাপ্ত হইয়াছেন। একথা কি সত্য নহে?"

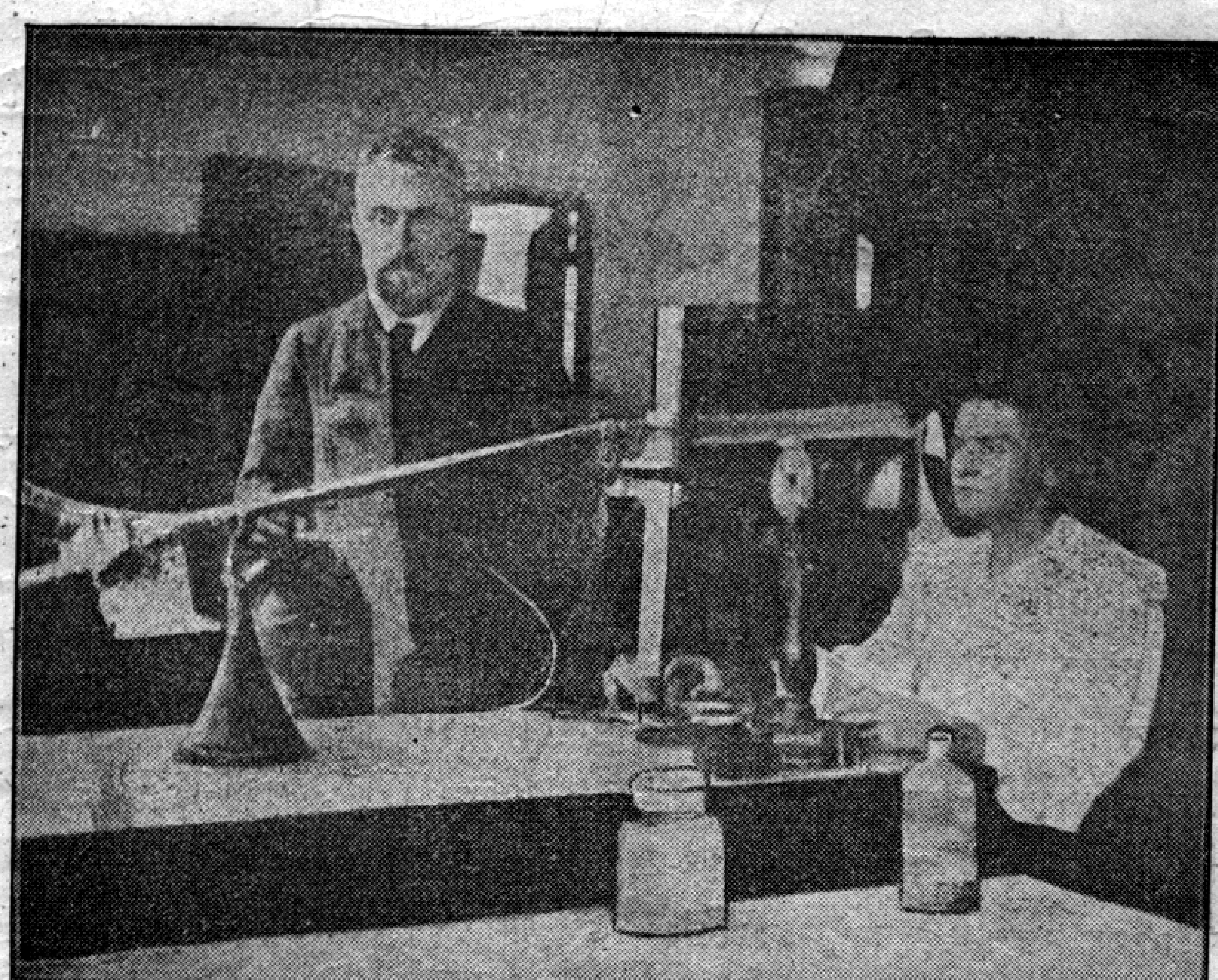
—"হাঁ," শুধু তিনি বলিলেন—"হাঁ"।

ইহা অপেক্ষা দীর্ঘতর উত্তর লাভের আশায় তৃষিত হইয়া, আমি ব্যক্তিগত ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষান্ত হইলাম। দেখিলাম, এইরূপ প্রশ্নে তিনি যেন একটু সংকোচ অনুভব করেন.........অতিনম্রতার মধ্যে গর্ব্বের সাদৃশ্য থাকিতে পারে।

রেডিয়মের সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে, তাঁহার যে একটু বেশী মুখ ফুটিবে না, ইহা অসম্ভব.........পণ্ডিতের প্রচণ্ড উৎসাহ বোধ হয় মানুষের ভীরুতার উপর জয়লাভ করিবে। তাই হঠাৎ আমার মুখ হইতে একটা প্রশ্ন বাহির হইয়া পড়িল:—কিরূপ প্রয়োগ-পরীক্ষার ফলে আপনি এই আশ্চর্য্য পদার্থটির আবিষ্কার করিলেন—যে-পদার্থের ধর্ম্ম কতকগুলি মূল-নিয়মকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে?" এক কথায় তিনি আমাকে থামাইয়া দিলেন:—"আমি আপনাকে একটা পুস্তিকা দিতেছি।"

অমনি তিনি কয়েক পদ দূরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আর হাত বাড়াইয়া আমাকে একটা উদ্ঘাটিত পুস্তিকা প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন:—এই দেখুন!

আমি সুবাধ্য সুবোধ বালকের ন্যায় উহা পড়িতে লাগিলাম। তা ছাড়া আমি আর কি করিতে পারি? পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া



শ্রীমতী ক্যুরী

আমি জানিতে পারিলাম—Becquerel যে Uranium-রশ্মির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শ্রীমতী ক্যুরি তাহার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন, এবং ঐ রশ্মি হইতে যে কতকগুলি পরীক্ষিত ফল তিনি প্রাপ্ত হন, সেই পরীক্ষার ফলগুলি তাঁহার স্বামীর গোচরে আসিলে, এই বিষয়ে তাঁহার স্বামীর খুব একটা ঔৎসুক্য জন্মিল। তিনি আপনার কাজ ছাড়িয়া, তাঁহার পত্নীর কাজে যোগ দিলেন। তাঁহারা উভয়ে এই প্রশ্নটি করিলেন, য়ুরানিয়মের কতকগুলি ধাতুর যদি এইরূপ কিরণ-নিঃসারণের শক্তি থাকে, তবে স্বল্প পরিমাণে তাহাদের মধ্যে আরও এমন কতকগুলি অজ্ঞাত পদার্থ কি থাকিতে পারে না যাহার কিরণ-নিঃসারণী শক্তি আরও প্রবল। এই পদার্থগুলি তাঁহারা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ২৭ মণ পরিমাণ Pechblende ধাতুর ভিতর এক গ্রেণের কিছু বেশী রেডিয়ম থাকে। এবং এই অল্প পরিমাণ রেডিয়ম বাহির করিতে ২০০০০ ফ্র্যাঙ্ক খর্চা পড়ে। যে য়ুরানিয়মের ধাতু হইতে রেডিয়ম বাহির হয়, সে সকল ধাতু ধরণীপৃষ্ঠে অতীব বিরল। বোহেমিয়া দেশের একটিমাত্র কারখানায় এই ধাতুর ব্যবহার আছে—ইহা হইতে কতকগুলি পীতবর্ণ রং বাহির করা হয়। এই রং শ্রমশিল্পের কাজে লাগে। আমেরিকায় ইহার আর একটি কারখানা আছে, কিন্তু ঐ কারখানার ধাতু-গুলি ততটা সমৃদ্ধ নহে। কেননা, এক গ্রেণ রেডিয়াম বাহির করিতে হইলে ৪০৫ মণ

আমার পাঠ শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার এখানে কি পরিমাণ রেডিয়ম আছে?"

টেবিলের ধারটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তিনি বরাবর টেবিলের উপর ভর দিয়া ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে যেন একটু হৃষ্ট হইয়াছেন এই ভাবের একটি স্মিতহাস্যে তাঁহার মুখমণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিল। আমার এই কথাবার্ত্তায় তিনি প্রায় নীরব হইয়াছিলেন; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত উহা বিরক্তিকর হইয়া উঠে নাই। এইবার যেন তাঁহার রূঢ়তা একটু কমিল—একটু বেশী মুখ ফুটিল। তিনি বলিলেন:—

"আমাদের নিকট এক গ্রেণ মাত্র রেডিয়ম আছে। উজ্জ্বল দিবালোকে দেখিলে মনে হয় যেন কোন-একপ্রকার লবণ; কেবল অন্ধকারে উহা ভাস্বর হইয়া উঠে। তখন মনে হয় যেন একটা জোনাকি পোকা। কিন্তু ইহার ক্ষয় নাই। উহা হইতে সমধিক পরিমাণে ও অবিরতভাবে শক্তি বিমোচিত হইলেও উহার অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। এক গ্র্যাম রেডিয়ম হইতে প্রতি ঘণ্টায় এতটা তাপ বাহির হয় যে তাহার দ্বারা সমান ওজনের বরফ গলিয়া যাইতে পারে। তথাপি এই এক গ্রেণ রেডিয়ম একই ভাবে থাকে। এত যে তাপ ক্রমাগত বাহির হইয়া যাইতেছে তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য কোনপ্রকার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হয় না। অতএব ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, আমরা এই এক গ্রেণ রেডিয়ম লইয়াই আমাদের সমস্ত প্রয়োগ-পরীক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিতেছি।"

এইবার হঠাৎ যে তিনি একটু বাচাল হইয়া উঠিয়াছেন—এ সুযোগ ছাড়া নহে। এতটা বাচালতা আমি প্রত্যাশা করি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, এইবার আমার কথা তাড়াতাড়ি বুঝি শেষ করিতে হইবে। এখন তাহার আর প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রেডিয়ম হইতে যে রশ্মি বাহির হয় তাহার প্রখরতা কি খুব বেশী? বোধ হয় য়ুরেনিয়মের রশ্মি অপেক্ষা ১০ লক্ষগুণ বেশী? এবং ইহার গুণও বোধ হয় য়ুরেনিয়মের মতই সংখ্যাবহুল ও বিস্ময়জনক?"

আলখাল্লার পকেটে হাত গুঁজিয়া এইবার তিনি একটু আগিয়া আসিলেন। বলিলেন; "হাঁ"।

আর আমি যে মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার বিস্ময়োক্তি করিতেছিলাম তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া তিনি তাড়াতাড়ি —খুব তাড়াতাড়ি—রেডিয়মের কিরণ-নিঃসারণী শক্তির প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলি বিবৃত করিলেন। তিনি অন্ততঃ মনে করিয়াছিলেন, ঐ কথাগুলি শুনিলেই আমি ক্ষান্ত হইব—আমার মুখ বন্ধ হইবে।

তিনি আমাকে এইরূপ বুঝাইলেন:— দেখিবেন খুব অল্পদিনের মধ্যেই, এই কিরণগুলি ফোটোগ্রাফ্-প্লেটের উপর ছাপ ফেলিবে; ঐ কিরণের সম্মুখে একটা পর্দা ধরা যাইতে পারিবে; পর্দা যতই অস্বচ্ছ হউক না কেন, উহা ঐ কিরণ শোষণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। যে বায়ুর মধ্য দিয়া উহা যাইবে সে বায়ু তড়িৎ-পরিচালক হইয়া উঠিবে।

ফটোগ্রাফি-ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর উপর আলোক যে ক্রিয়া প্রকটিত করে, রেডিয়মের কিরণও সেই ধরণে ক্রিয়া প্রকটিত করিয়া থাকে। কাচকে বেগ্নি রঙে বা শ্যামবর্ণে রঞ্জিত করে; কাগজকে, Celluloidকে পীতাভ করিয়া তুলে; কাগজকে ফাড়িয়া ফেলে। একটা অস্বচ্ছ বাক্সের মধ্যে, মোটা জমাট-কাগজে, ধাতুতে, একটু রেডিয়মের লবণ অর্পণ কর দেখি;—দেখিবে, উহা তোমার চোখের উপর ক্রিয়া প্রকটিত করিতেছে,—একটা আলোকের অনুভূতি উৎপাদন করিতেছে। এই ফলটি পাইবার জন্য,—যে বাক্সের মধ্যে রেডিয়ম-লবণ আছে, সেই বাক্সোটি তোমার নিমীলিত চক্ষুর সম্মুখে রাখ, অথবা কপালের রগে ঠেকাইয়া রাখ, দেখিবে, রেডিয়ম-রশ্মির প্রভাবে, তোমার চোখের ভিতরটা ফস্‌ফরস্-ধর্ম্মী আলোকে আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। সে আলোকের সূত্রস্থান চক্ষের মধ্যেই অবস্থিত। রেডিয়মের রশ্মি গাত্রচর্ম্মের উপরেও কাজ করে; যদি একটি ক্ষুদ্র শিশিতে রেডিয়ম পূরিয়া সেই শিশিটি গাত্রচর্ম্মের উপর কয়েক মিনিট ধরিয়া রাখ,—তোমার বিশেষ কোন অনুভূতি হইবে না; কিন্তু ১৪।১৫ দিন পরে, ঐ যায়গাটা লাল হইয়া উঠিবে, তাহার পর ঐখানকার চামড়াটা পোড়া-পোড়া হইয়া যাইবে। যদি রেডিয়ম উহার উপর একটু বেশীক্ষণ ধরিয়া কাজ করে, তাহা হইলে একটা ক্ষত গড়িয়া উঠিবে—এবং সে ক্ষত সারিতে অনেক মাস লাগিবে। আমার বাহুর উপর এই ধরণের একটা ক্ষত আছে। রেডিয়ম-রশ্মি স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের উপরেও কাজ করিয়া থাকে—এবং তাহার ফলে

পক্ষাঘাত ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। জীবিত ব্যক্তিদের যে সকল পেশী-তন্তু পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে, সেই সকল পেশী-তন্তুর উপরে এই রশ্মি অপূর্ব্ব প্রখরতার সহিত কার্য্য করে।

মঃ-ক্যুরি পকেটহইতে ঘড়ী বাহির করিয়া একবার দেখিলেন, তাহার পর আবার আরম্ভ করিলেন ;—লোকে যে বলিয়া থাকে, রেডিয়মের সাহায্যে অন্ধ চক্ষু ফিরিয়া পায় —সে কথা বিশ্বাস করিবেন না। লোকের আরও এই বিশ্বাস, উহা দ্বারা ক্যান্‌সার-রোগ আরাম হইতেছে। আরোগ্যলাভের আশায় কত ক্যানসার-রোগী যে আমাদের পত্র লিখিতেছে তার সংখ্যা নাই। ইহা বড়ই কষ্টজনক।—না, না, এখনও তা হয় নাই......হয় ত এমন একদিন আসিবে যখন উহার দ্বারা ক্যানসার আরাম হইবে।

সম্প্রতি প্যাষ্টার ইন্‌ষ্টিটুটে, ফ্রান্সের কলেজে, ক্যান্‌সারের চিকিৎসায় রেডিয়ম-রশ্মিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার মধ্যে এইটুকুমাত্র সত্য।

আবার তিনি ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন ; তাঁহার সুখের হাসিটী তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে পলায়ন করিল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার শিষ্যের সমীপে গিয়া তাহার কাজে আবার যোগ দিলেন। তাঁহার শিষ্য বরাবর সেই জটিল যন্ত্রজালের উপর এতক্ষণ ঝুঁকিয়া ছিল। মঃ-ক্যুরি বলিয়া উঠিলেন ;—এইবার শেষ হইয়াছে!

কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাঁহার এক বন্ধু নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশে তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন।

বন্ধু একটু পরিহাস ও মধুর মমতা সহকারে বলিলেন ; —

—ওহে তুমি ত এখন বিখ্যাত হয়ে উঠেছ।

মঃ ক্যুরি বাহুদ্বয় আন্দোলন করিয়া উত্তর করিলেন ;—আঃ! আঃ!

সামান্য দুই অক্ষরের অব্যয় শব্দে অতটা হৃদয়ের ভাব কেমন করিয়া প্রকাশ হয় আমি ত এখনও পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্রোতের ফুল

মথুরাপুরের দশ-আনির জমিদার হরিবিহারী বাবুর অন্দরমহলের দেউড়িতে একজন ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া আগমনী গান গাহিতেছিল—

"পুরবাসী বলে রাণী, তোর হারা তারা এল ঐ।
অমনি পাগলিনীপ্রায় এলোকেশে ধায়
বলে, কৈ আমার উমা কৈ?"

সেই সময়ে অন্দরের ছাদের উপর একজন বিধবা একাকী বড়ি দিতে দিতে সেই গান শুনিতেছিলেন।

বিধবার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয় ; একহারা ছিপছিপে সুন্দর চেহারা ; তাঁহার মুখশ্রীতে দুঃখ-অসন্তোষের একটি মলিন বিষণ্ণ কঠোরতার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের একটি

জ্যোতি কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার মতো ফুটিয়া রহিয়াছে।

শরতের প্রভাত। শারদাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্যই যেন এই গৌরবর্ণা বিধবা সদ্যস্নাত শুচি অবস্থায় শাদা ধবধবে থান কাপড় পরিয়া রৌদ্রকিরণে পিঠ দিয়া রূপার কাঁশিতে কলায়ের দাল-বাঁটা লইয়া শারদ-লক্ষ্মীর পূজার বড়ি দিতেছিলেন। চারিদিকে সমস্তই শুভ্র শুচি। বিধবার সুগৌর হস্তের ক্ষিপ্র তাড়নায় শুভ্র দাল-বাঁটা শুভ্রতর হইয়া সমুদ্রফেনের ন্যায় ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, এবং বিধবা অমনি বিছানো নূতন চটের উপর চুনকামকরা মঠমন্দিরের মতো সুঠাম সুডোল বড়িগুলি সারি গাঁথিয়া সাজাইয়া সাজাইয়া বসাইয়া দিতেছিলেন।

বড়ি দেওয়ার দিকে কিন্তু বিধবার মন ছিল না। ভিখারীর আগমনী গানে বঙ্গের মাতা ও কন্যার চিরন্তন প্রতিনিধি মেনকা ও উমার সোহাগ-পুলকের কাহিনীর স্পর্শে তাঁহার অন্তরে যে শুভ্র নির্ম্মল ভাবরাশি ফেনার মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, তাহারই দিকে তাঁহার মন পড়িয়া ছিল। এই আদর্শ মাতা-কন্যার আদর-আব্দার, অভিমান সোহাগ, অন্তরে অন্তরে কল্পনায় অনুভব করিয়া আপনার অজাত কন্যার কল্পিত মমতায় শরতেরই শিশিরসিক্ত কুবলয়ের মতো তাঁহার চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিতেছিল।

সেইখানে বছর তিনেকের ছোট্ট একটি মেয়ে সোনার মত ফুটফুটে, ননীর মতো নরম, মৃণালের মতো গোলগাল, এক-গা সোনার গহনা পরিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া একটি খাঁদা বোঁচা কাঠের পুতুলের সঙ্গে অনর্গল বকিয়া বকিয়া আপনার ভাবীকালের সন্তানটিকেই আদর করিতে শিখিতেছিল।

মেয়েটি কি মনে করিয়া বিধবার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য হঠাৎ আপন মনেই বলিতে লাগিল—কুলি-মা বলি দেবে, আল বিনি কাবে! কুলি-মা বলি দেবে, আল বিনি কুলকুল কলে কাবে!—না কুলি-মা ?

বিধবা তাহার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন—না বিনু, ও কথা বলতে নেই। এ বড়ি দুগ্‌গা ঠাকুরের। আগে ঠাকুর খাবে, তার পর বিনি পেসাদ খাবে। কেমন ?

ইহা শুনিয়া বিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আগে থাকুল কাবে, তা'পল বিনি পেচাদ কাবে। না কুলি-মা ?

—হ্যাঁ, বিনি আমার লক্ষ্মী মেয়ে।..... আমি বড়ি দি, তুমি চুপটি করে' বসে বসে দেখ, কথা কয়ো না। কেমন ?

বিনি ঘাড় কাত করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়া আপনার দারুময় সন্তানটির প্রতি শিশু-জননীর অকপট-স্নেহ-সিঞ্চিত সমস্ত মনোযোগ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে কোলে শোয়াইয়া কোল নাচাইতে নাচাইতে সুর করিয়া ছড়া বলিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল—

দুত্ত মেয়ে ঘুমুলো,
পালাতি দে দুরুলো;
আয় ঘুম আয়,
আমাল চোনাল চোকে ঘুম আয়!

এই শিশু-জননীর মাতৃত্বের অভিনয় দেখিয়া আর আগমনী গান শুনিয়া খুড়িমার অন্তরের নিস্ফল নিরবলম্ব মাতৃস্নেহ উদ্বেল

হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার সেই ক্ষুধিত স্নেহ কাহাকেও অবলম্বন করিবার ব্যাকুলতায় অক্ষিপল্লবে অশ্রুরূপে বার বার দুলিতে লাগিল এবং খুড়িমা তাড়াতাড়ি তাহা অঞ্চলে মুছিয়া মুছিয়া ফেলিতেছিলেন।

এমন সময় নীচের তলায় একটা কলরব উঠিল; বহু কণ্ঠ একই সঙ্গে আগ্রহ ও ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—ও রোহিণী, রোহিণী, ও রোহিণী, ও কার চিঠি রে?

জমিদারের অন্তঃপুরে চিঠিপত্র সচরাচর সাত দেউড়ি ডিঙাইয়া প্রবেশ করিতে সাহস পায় না। যদি কালে-ভদ্রে জমিদার-গৃহিণীর নামে এক-আধখানা চিঠি দুঃসাহসে ভর করিয়া অন্তঃপুরে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না; কে সেই চিঠি পড়িয়া জটিল অক্ষরজাল হইতে কুণ্ঠিত মর্ম্ম-টুকুকে উদ্ধার করিয়া শুনাইবে, তাহা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। চিঠি আসিলে ভুবন সরকারকে ডাক পড়ে; সে এত্তেলা পাঠাইয়া অন্দরে আসিয়া দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী চিঠির-মালিককে চিঠির মর্ম্ম উদ্ধার করিয়া শুনাইয়া দিয়া যায়।

সুতরাং রোহিণী দাসীর হাতে চিঠি দেখিয়াই পুরন্ধ্রীরা সচঞ্চল হইয়া জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল—ও কার চিঠি।

রোহিণী গম্ভীর ভাবে বলিল—এ চিঠি খুড়িমার।

খুড়িমার বড়ি দিবার একাগ্রতা নষ্ট হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া ছাদের আল্‌সের উপর ঝুঁকিয়া নীচে একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন; তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া নিবিষ্টমনে বড়ি দিতে বসিলেন, যেন তাঁহার কিছুমাত্র চাঞ্চল্যের কারণ ঘটে নাই। কারণ জমিদারের অন্তঃপুরে আশ্রয় যেদিন হইতে পাওয়া ঘটে সেইদিন হইতে বাহিরের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিতে হয়; বাহিরের সংবাদ পাইবার ব্যাকুলতা থাকে সকলেরই, কিন্তু অধিকার থাকে না কাহারও।

তাই নীচেকার পুরমহিলাদের আগ্রহ কলরবে বাড়িয়া উঠিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল—খুড়িমাকে আবার কে চিঠি দিলে? খুড়িমার তিনকুলে কেউ আছে নাকি?

রোহিণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—কে আছে না-আছে তা আমি কেমন করে জানব? আমি জানও নই, খুড়িমার এক প্রাণও নই।

রোহিণীর রকম দেখিয়া প্রশ্নকারিণী চুপ করিয়া গেল; আর কেহ কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

একজন কে গিন্নি ধরণের মোটা গলায় বলিলেন—ও চিঠি আমার বিপিন দিয়েছে হয়ত। নইলে ছোট বৌকে আর কে চিঠি দিবে?

তখন আবার কলরব উঠিল—দে রোহিণী চিঠি দে......খুড়িমাকে দিয়ে আসি......

ছোট ছোট বালকবালিকারা পর্য্যন্ত রোহিণীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া চিঠি কাড়িবার জন্য লাফাইতে লাফাইতে চেঁচাইতেছিল—রোহিণী, রোহিণী, আমায় দে।......ও রোহিণী আমায় দে।......ওকে দিসনে আমায় দে।......

রোহিণী বাঁ হাতে চিঠিখানি মাথার উপরে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া ডাহিন হাতে

ছেলের ভিড় সরাইতে সরাইতে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—নে নে সব থাম।......আমি যদি কাছারী-বাড়ী থেকে বয়ে আন্‌তে পেরে থাকি ত আমিই খুড়িমাকে গিয়ে দিতে পারব। ......ও খুড়িমা, তুমি কোথায় গো ?...

রোহিণী কথা টানিয়া সুর করিয়া ডাকিল।

তখন খুড়িমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছাদের আল্‌সের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন—কি রোহিণী ডাকছিস কেন ? আমি এই ছাতে বড়ি দিচ্ছি।

রোহিণী একখানা খামের চিঠি উঁচু করিয়া ধরিয়া খুড়িমাকে দেখাইয়া একটু মিহি সুর টানিয়া বলিল—তোমার চিঠি এয়েচে !

খুড়িমা কিছুমাত্র ব্যগ্রতা না দেখাইয়া বলিলেন—কাগে বড়ি খেয়ে যাবে, তুই এখানে দিয়ে যা না মা রোহিণী।

হেলিতে দুলিতে রোহিণী ছাদে আসিল। সে জমিদার-বাড়ীর সেরা চাকরাণী। স্বয়ং জমিদার বাবুও না কি এককালে তাহার নিতান্ত বশীভূত ছিলেন। তাঁহার উপর ইহার প্রভাব এখনো একেবারে লোপ না পাওয়ার সন্দেহে চাকর দাসী আশ্রিত পরিজন সকলেই তাহাকে একটু খাতির করিয়া সমঝিয়া চলে। তাহার আঁটসাঁট চেহারা; মেটে রং, সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনায় থাকার দরুণ পালিশকরা বাদামী জুতার মতো চকচকে; দুটি গালে মেচেতার কৃষ্ণচক্র; দাঁতগুলি মিসির প্রসাদে একেবারে আতার বিচির মতো। তাহার উপর হাতে সোনার মোটা অনন্ত; মণিবন্ধশূন্য, যেহেতু সে বিধবা। গলায় সোনার দমা হার; কোমরে সোনার বিছে, পাতলা কাপড়ের ভিতর হইতে চিকচিক করিতেছে—এ ত আর সখের জন্য পরা নয়, সে বিধবা মানুষ তাহার বাহারের দরকার কি ? চাবিকাঠিটাও দিনে পঞ্চাশ বার হারায়, তাই কোমরে একগাছা সুতার ঘুনসি না রাখিয়া একটু সোনা রাখিয়াছে, সময়ে অসময়ে কাজ দিবে, মানুষের গতরের কথা ত বলা যায় না; তাহার মুড়া চুলগুলি ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, আর দুই হাত অনাবৃত রাখিয়া তাহার আঁচল কোমরে জড়ানো; ছোট ছোট চোখ দুটি দম্ভভরে কাহারো প্রতি দৃক্‌পাত করিতে চাহে না; কিন্তু যাহার প্রতি একবার তাহার শুভদৃষ্টি পড়ে তাহার তখন শনির দৃষ্টিও শ্লাঘ্য বলিয়া মনে হয়।

রোহিণীর সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়ে বৌ ঝি দাসী চাকরাণী অনেকেই ছাদে আসিয়া সকৌতুকে খুড়িমার দিকে দেখিতে লাগিল। আজ এই অসাধারণ ঘটনায় খুড়িমা যেন রাজান্তঃপুরের ভিড়ের ভিতর হইতে নূতন করিয়া সকলের দৃষ্টিতে পড়িতেছেন।

বালক বিনোদ তাহার সঙ্গী পাঁচুকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ ভাই পাঁচু, মেয়েমানুষেরও চিঠি আসে ?

পাঁচু তাহার দশ বৎসরের দীর্ঘ জীবন এই অন্তঃপুরে অতিবাহিত করিয়াছে। তাহার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এরূপ ব্যাপার আজ এই প্রথম। সুতরাং সে তাহার প্রশ্নকারী সঙ্গীকে সাহস করিয়া কোনোই সদুত্তর দিতে পারিল না। পাঁচু খুব গম্ভীরভাবে ভাবিতে লাগিল—হুঁ! আশ্চর্য্য বটে, মেয়েমানুষেরও চিঠি আসে!

খুড়িমা বাঁ হাতে করিয়া চিঠিখানি লইয়া চকিতে একবার দেখিয়া লইলেন, এ কাহার হাতের লেখা। এ লেখা তাঁহার পরিচিত নহে। তার পর যেন নিরুপায়ের স্বরে বলিলেন—আমায় আবার কে চিঠি লিখলে? কাকে দিয়েই বা পড়াই?······বাবা পাঁচু, তুই পড়তে পারবি?

খুড়িমা অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানিতেন। তাঁহার স্বামী একালের তন্ত্রের লোক, তিনি স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। কিন্তু স্বামীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সে পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খুড়িমা জমিদার হরিবিহারী বাবুর সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ; তাঁহাকে অপুত্রক অসহায় দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া হরিবিহারী তাঁহার অভিভাবক হন; কিছুদিন পরেই তাঁহার সমস্ত জমিদারী, এমন কি স্বামী-শ্বশুরের ভিটাটুকু পর্য্যন্ত, যখন না জানি কেমন করিয়া হরিবিহারীর নিকট বিক্রয় হইয়া গেল, তখন খুড়িমাকে বাধ্য হইয়া হরিবিহারী বাবুর সংসারেই আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এই জমিদার-বাড়ীতে আসিয়া যখন তিনি দেখিলেন এখানে স্ত্রীলোকের লেখাপড়া জানাটা ভয়ানক নিন্দার কথা; এখানকার মেয়েপুরুষের ধারণা যে মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখিলে বিধবা, এমন কি অসতী হয়; গৃহলক্ষ্মীদের বাণীসেবা দেখিলে লক্ষ্মী চঞ্চলা হন; তখন হইতে খুড়িমা তাঁহার স্বল্প বিদ্যাও ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সযত্নে সকলের কাছে নিজের অক্ষর-জ্ঞান পর্য্যন্ত গোপন রাখিতেন। এই চিঠিখানি পাইয়া যদিও তাঁহার কৌতূহল হইতেছিল ফস করিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেখেন কে তাঁহাকে অকস্মাৎ চিঠি লিখিল, তথাপি তিনি সে কৌতূহল দমন করিয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবে সেখানে উপস্থিত পুরুষদিগের মধ্যে বর্ষীয়ান্ ও জ্ঞানে গরীয়ান্ পাঁচুর শরণাপন্ন হইলেন।

দশ বছরের ছেলে পাঁচু। মরুঞ্চে পোয়াতির ছেলে সে। পাঁচুঠাকুরের দুয়ার ধরিয়া, হাতে কোলে লইয়া পূজা দিবার মানত করিয়া, কত কবচ মাতুলি পরাইয়া তুকতাক করাতে শত্রুমুখে ছাই দিয়া ষেটের কোলে পাঁচু এই দশ বছরে পা দিয়াছে। তাহার মাথাটি প্রকাণ্ড, শরীরটি কৃশ, পেটটি বাতাসভরা ফুটবলের মতো, গলায় একগাছি ময়লা ঘুনসিতে অনেকগুলি মাতুলি—কোনোটার মৃদঙ্গের মতন আকার, কোনটার ঢোলের মতন, কোনোটা হরিতকীর মতন শিরাতোলা, কোনোটা বা চৌপলা যশমের মতন; তাহার কোনোটা তামার, কোনোটা লোহার, কোনোটা রূপার, কোনোটা সোনার, কোনোটা অষ্টধাতুর এজমালি; মাতুলির সঙ্গে একটা সোনায় বাঁধানো আমড়ার আঁঠি, ও একটা ঘসা ফুটো পয়সা; মাতুলিগুলির অষ্টেপৃষ্ঠে পাঁচুর পোকাধরা ক্ষয়া দাঁতের অত্যাচার-চিহ্ন অঙ্কিত। পাঁচুর মাথায় মানতের বড় বড় চুল, স্থানে স্থানে ছড়া ছড়া জট বাঁধিয়া তেঁতুলগাছে তেঁতুলের মতো নড়নড় করিয়া ঝুলিতেছে; অবশিষ্ট চুল টিপি করিয়া খোঁপা বাঁধা। তাহার ডাহিন হাতে সুতার তাগা, পায়ে লোহার বেড়ি, ডাহিন নাকে সোনার মাকড়ি। এমনি করিয়া অষ্টেপৃষ্ঠে রশারশি কষিয়া, সর্ব্বাঙ্গে নোঙর বাঁধিয়া কোনো মতে বেচা-

রাকে এই ভবসমুদ্রের তুফান হইতে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু যমের দৃষ্টির প্রবল আকর্ষণ হইতে পাঁচুকে ইহলোকে টানিয়া রাখিবার জন্য এত রকম বন্ধনও তাহার স্নেহ-শঙ্কাতুর মাতার কাছে যথেষ্ট মনে হইত না।

এহেন পাঁচু, খুড়িমার চিঠি পড়িবার আমন্ত্রণ পাইয়া এত লোকের মধ্যে আপনার বিশেষ গৌরব অনুভব করিল। উৎসাহে সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—হাঁ পারব খুড়িমা।

সকলে অবাক হইয়া পাঁচুর মুখের দিকে চাহিল। পাঁচুর এই অত্যাশ্চর্য্য সাহস দেখিয়া সকলে পাঁচুকে মনে মনে অভিনন্দন করিল—কোথায় কে কাগজের উপর যা-ইচ্ছা-তাই কালির কি হিজিবিজি আঁচড় কাটিয়াছে, আর পাঁচু এখান হইতে তাহার মনের কথাটি হুবহু বলিয়া দিবে। এ আর হারাধন দৈবজ্ঞের চেয়ে কম কি হইল। আহা; ছেলেটা বাঁচিয়া থাকিলে যে, একজন হাকিম হইয়া লোকের মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়া সুবিচার করিবে, সে বিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ রহিল না। সকলের সপ্রশংস ভাব দেখিয়া পাঁচুর মায়ের মন, পাঁচুর মনেরই মতো, আনন্দে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল; সেও আপনার ছেলের দিকে স্নেহ-গর্ব্বমিশ্র সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল।

পাঁচু পরম বিজ্ঞের মতন গম্ভীর ভাবে চিঠিখানা হাতে লইয়া মহা ফাঁপরে পড়িল—খাম হইতে চিঠি বাহির করিবে কেমন করিয়া। সে কোন্ পথে ব্যূহভেদ করিয়া বন্দী চিঠিকে উদ্ধার করিবে তাহাই স্থির করিবার জন্য খামখানি লইয়া দুচারবার উল্টাপাল্টা করিল।

তাহার মা সন্তানের বিপদ বুঝিয়া বলিল—দে, আমি খুলে দিচ্ছি।

মায়ের এই সাহায্যদানে পাঁচু আরামও অনুভব করিল এবং এত লোকের সামনে নিজের অক্ষমতা ধরা পড়াতে একটু লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণও হইল; মাতার উপর রাগও হইল, কেন সে তাড়াতাড়ি হাত হইতে চিঠি কাড়িয়া লইল—পাঁচু আর একটু ভাবিবার সময় পাইলেই গোটা খামের পেট হইতে চিঠি বাহির করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারিত। খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠি বাহির করিতে কে না পারে? পাঁচুকে বলিলেই হইত, খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে তাহার একটুও দেরী লাগিত না।

মা চিঠি বাহির করিয়া দিলে পাঁচু চিঠি প্রসারিত করিয়া ধরিয়া দেখিল চিঠির অক্ষর-গুলার ছাঁদ তাহার বর্ণপরিচয়ের অক্ষরের সহিত একটুও মেলে না; অক্ষরগুলা কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া পরস্পরে পুঁটুলি পাকাইয়া গিয়াছে তাহার সূত্র সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়াও কিছুতেই আবিষ্কার করিতে পারিল না। এর চেয়ে সে তালপাতে ঢের বড় বড় আর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া থাকে। পাঁচু পাঠে পরাস্ত হইয়া নিতান্ত অবজ্ঞার ভাবে চিঠিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"ছাই লেখা! ক্ষুদ্দি ক্ষুদ্দি, এমন এমন জড়ানো!"—এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের ভঙ্গি দ্বারা জড়ানো লেখার ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল।

ইহা দেখিয়া সকলে হো হো করিয়া সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। হাসির ধাক্কা পাইয়া পাঁচু সেখান হইতে দৌড় দিল।

তখন সকলে ভাবিল—নাঃ, ছেলেটা কোনো কর্ম্মেরই না! যেমন আকাট মুখ্খু বাপ শিবচরণ, তাহারই ত ছেলে!

পুত্রের পরাভবে পাঁচুর মা অপ্রতিভ হইয়া মাথা নত করিয়া পা দিয়া মাটিতে আঁক কাটিতে লাগিল, তাহার কালো মুখখানি লজ্জায় বেগুনে হইয়া উঠিয়াছে।

খুড়িমা আবার মুস্কিলে পড়িলেন।

রোহিণী বলিল—খুড়িমা, ঠাকুরঘরে ভটচাজ্জি মশায় পূজো করছেন, যাও না তাঁর ঠেঞে পড়িয়ে নেওগে না।

এই প্রস্তাব সকলেরই খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো মনে করেছিস রোহিণী!

এত লোকের মধ্যে রোহিণী নিজের উপস্থিত-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব-গৌরবে স্ফীত হইয়া বিনয়ের ভাবে স্মিত মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল, যেন এ প্রশংসায় তাহার কিছুই আসিয়া যায় না—এমন বুদ্ধির পরিচয় হামেশাই সে দিয়া থাকে এবং এমন প্রশংসাও সে নিত্যনিরন্তরই পায়। কিন্তু তাহার বিড়ালের মতন গোল গোল ছোট ছোট চোখ দুটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া সকলের মুখের উপর দিয়া প্রশংসার দৃষ্টি ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিতেছিল।

রোহিণীর পরামর্শ শুনিয়া খুড়িমা সমাগতা পুরন্ধ্রীদের মধ্যে একজনকে অনুরোধের স্বরে বলিলেন—ক্ষ্যামা, তুই বড়ি ক'টা দিয়ে দে না মা, ফেনা বসে যাচ্ছে, আমি চিঠিখানা পড়িয়ে নিয়ে আসি।

সকলে চিঠি শুনিতে যাইবে আর তাহাকে একলাটি রোদে বসিয়া বড়ি দিতে হইবে ভাবিয়া ক্ষেমঙ্করী ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল—খুড়িমা, যাক্‌গে ফেনা বসে, আমি এসে আবার ফেনিয়ে দেবো।......ডাল-বাঁটার কাঁশিটা চটের তলে ঢেকে রাখ, নইলে কাগে টাগে আবার মুখ দেবে।

খুড়িমা আর কিছু না বলিয়া কাঁশির কানায় হাতের ডাল যথাসম্ভব মুছিয়া কাঁশি ঢাকিয়া রাখিয়া বাঁ হাতে চিঠি লইয়া ভট্টাচার্য্যের সন্ধানে রওনা হইলেন।

জমিদারদের বাস্তুদেবতা লক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম শিলা। নন্দকিশোর স্মৃতিরত্ন জমিদার বাবুদের কুলপুরোহিত। তিনিই নিত্য অন্দরে আসিয়া বাস্তুদেবতার পূজা করেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় দীর্ঘায়ত সুন্দর সুগৌর পুরুষ; বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধ; মাথাভরা টাক, কেবল দুইকানের পাশ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত ঘন চুল আছে, কিন্তু শিখা নাই।

ভট্টাচার্য্য পুরু গালিচার আসনে সরল উন্নত হইয়া বসিয়া পূজা করিতেছেন। পরণে গরদের কাপড় ও উত্তরীয়, গরদের ও দেহের রঙে মিশিয়া যেন একাকার হইয়া গেছে। উপবীতগুচ্ছ সুশুভ্র। পাশে মারবেল পাথরের স্বচ্ছ শুভ্র মেজের উপর অমল শুভ্র একখানি গামছা ভাঁজ করা রহিয়াছে। পূজারীর ন্যায় পূজার স্থান, উপকরণ সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পূজার ঘরটি ধূপ ধুনা চন্দনের গন্ধে আমোদিত।

খুড়িমা ঘরে ঢুকিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রথমে নারায়ণকে, পরে পুরোহিতকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন, অপর সকলে তাঁহার পশ্চাতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় এতগুলি লোককে একসঙ্গে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মা ?

খুড়িমা ডান হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ঘোমটা একটু বাড়াইয়া দিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন—এই চিঠিখানা দেখুন ত কে দিয়েছে ?

স্মৃতিরত্নের সহিত বাড়ীর প্রায় সকল মেয়েই কথা বলিত। স্মৃতিরত্ন এ বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হিতৈষী বন্ধু। সকলে নিজের দুঃখবেদনা অকপটে ইঁহার নিকট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এবং ইনিও তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া উপদেশ দিয়া পরামর্শ দিয়া উপকার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই স্নিগ্ধচরিত্র সৌম্যমূর্ত্তি মিষ্টবাক্ ব্রাহ্মণ সেইজন্য সকলেরই পরমাত্মীয়।

খুড়িমা অগ্রসর হইয়া স্মৃতিরত্নের কাছে চিঠিখানা রাখিয়া দিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আগে দেখুন ত চিঠিখানা লিখেছে কে ?

চিঠিতে কি লেখা আছে তাহার চেয়ে কে দিয়াছে তাহাই জানিবার কৌতূহল খুড়িমার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

ভট্টাচার্য্য চিঠির পাতা উল্টাইয়া পড়িলেন—অভাগিনী মালতী।

খুড়িমা বলিলেন—ও! মালতী! মালতী আমার বোনঝি। আহা, মেয়েটা জন্ম-দুঃখিনী; অভাগিনীই বটে! বিয়ে হতে না হতে বিধবা হল; শ্বশুরবাড়ীতে একদিনের তরে লক্ষ্যস্থল পেলে না; বাপের ভিটেয় পা দিতে না-দিতে বাপ মরল; এখন ওরা মায়ে ঝিয়ে টিমটিম করচে। আমার বাপের সম্পর্কে আপনার বলতে এখন ওরাই।

প্রভাতের আগমনী গানের কথায় ও সুরে খুড়িমার চিত্ত স্নেহার্দ্র ও শোকার্ত্ত হইয়াই ছিল; এখন এই দূরগত ও অপরিচিত আপনার জনের দুঃখ স্মরণ করিয়া তাঁহার মন স্নেহে মমতায় একেবারে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল; এই নিঃসম্পর্কীয় পরের বাড়ীর মধ্যে বন্দী অবস্থায় দূরের আপনার জনকে স্মরণ হওয়াতে তিনি যেন অমৃতের আস্বাদ পাইলেন, তাঁহার অন্তরে নিষ্ফল মাতৃস্নেহ আজ অকস্মাৎ মালতীর নাগাল পাইয়া বুভুক্ষুর মতো দুই হাত বাড়াইয়া ধরিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। খুড়িমা অঞ্চল তুলিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন।

ভট্টাচার্য্য হস্ত প্রসারিত করিয়া আলোর দিকে চিঠি ধরিয়া চক্ষু একটু বিস্ফারিত করিয়া একটু চেষ্টার সহিত চিঠি পড়িতে লাগিলেন—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

মাসিমা, আমি অভাগিনী, আমার শেষ আশ্রয়ও হারিয়েছি; আমার স্নেহময়ী মা......

ভট্টাচার্য্য চিঠিপড়া বন্ধ করিয়া করুণ নেত্রে খুড়িমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—মা, আমার চশমা নেই, ভালো দেখতে পাচ্ছিনে, বিকেলে এসে চিঠি পড়ে দেবো, এখন এখানা আমার কাছেই থাক......

খুড়িমা চোখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—ভট্‌চাজ্জি মশায়, আমি সব বুঝতে পেরেছি, আমার দিদি আর নেই। ......আমি পাষাণী, আমার সব সইবে, আপনি চিঠি পড়ুন।

ভট্টাচার্য্য বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন—

আমার স্নেহময়ী মা আমাকে অকূলে ভাসিয়ে গত ২রা আশ্বিন স্বর্গে গেছেন। মাসিমা, এখন তোমার কাছ ছাড়া আর কোথাও আমার দাঁড়াবার স্থান নেই। তুমি আমাকে শীগগির তোমার কাছে নিয়ে যাবার উপায় কোরো। এখানে একলা থাকতে আমার বড় ভয় করছে। এক এক দিন যাচ্ছে, না এক এক যুগ যাচ্ছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি দেরী কোরো না। ইতি—অভাগিনী মালতী।

এক দণ্ড কাঁদিয়া খুড়িমা ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—আমি মেয়েমানুষ, পরাধীন; আমিই ত পরের দয়ার ওপর আছি, আমি তাকে কোথায় ঠাঁই দেবো? রাক্ষুসী সবাইকে খেয়ে এখন আমার ভরসা করছে!

রোহিণী সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল—হ্যাঁ, তাই ত বটে! তোমার হয়েছে আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।

দাসীর এই কথা বিষদিগ্ধ-শেলের মতন খুড়িমার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। অথচ আশ্রয়-দাতার আদরের চাকরাণীকে কিছু বলিবার সাহস তাঁহার ছিল না। খুড়িমা তাহার কথার বিষটাকে একটু সহনীয় করিয়া লইবার জন্য নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়া বলিলেন—সত্যিই ত! আমি নিজেই পরের গলগ্রহ, আমি আবার কাকে আশ্রয় দেবো? যা থাকে তার কপালে তাই হবে, আমি তার কি করব? পোড়াকপালী আমায় চিঠি দিয়ে শুধু আমার যন্ত্রণা বাড়ালে বৈ ত নয়!

রোহিণী বলিল—সত্যি বাপু! মেয়েটার কি আক্কেল! তুই ত তবু নিজের ভিটেয় পড়ে আছিস; আর খুড়িমার বলে চাল না [illegible]

স্মৃতিরত্ন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে মৃদু ভর্ৎসনা ভরিয়া বলিলেন—মা রোহিণী, তুমি একটু চুপ কর। ......দেখ বৌমা, তুমি ছোটরাণীমাকে একবার বলগে; তাঁর দয়ার শরীর—তিনি যেন মা বসুন্ধরা; এত লোকের ভার যখন অক্লেশে বহন করচেন, তখন আর একটি নিরাশ্রয়াকেও ঠাঁই দিতে তিনি কাতর হবেন না।......যাও মা! বিপদে অধৈর্য্য হতে নেই; স্থিরবুদ্ধিতে কাজ করলে বিপদ অধিকক্ষণ টিঁকতে পারে না। নারায়ণে ভক্তি রেখো মা! জেনো, যার কেউ নেই নারায়ণ তার সহায়। যাও একবার গিন্নি-মাকে বুঝিয়ে বলগে, আমিও একবার হরি-বিহারীকে বলব।

গিন্নির দয়া সম্বন্ধে খুড়িমার যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও এত লোকের সম্মুখে ভট্টাচার্য্যের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় তাঁহার ছিল না। তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন—অবিশ্যি, দিদির দয়ার শরীর। তিনি যেন রাজি হবেন। কিন্তু সেই আবাগীকে কলকেতা থেকে আনবে কে? সোমথ মেয়ে, যার-তার সঙ্গে আসা ত ভালো দেখাবে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—তার জন্যে ভেবো না মা! আমি নবকিশোরকে লিখে দেবো, সে-ই তোমার বোনঝিকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যাবে।......এখন তুমি যাও, ছোটরাণীমাকে বলে' রাজি করগে।

খুড়িমা আশা আশঙ্কা লজ্জা সঙ্কোচ অন্তরে ভরিয়া লইয়া গিন্নি-রাণীর সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। (ক্রমশ)

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমের খেয়াল

শ্রীমান্ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

(১)

প্রেমের দু'চার কবিতা লিখেছি
লিখিনি গান।
প্রেমের রাগের আলাপ শিখেছি
শিখিনি তান।
কত না শুনেছি প্রণয় কাহিনী,
কত না শুনেছি প্রেমের রাগিণী
পাতিয়া কান।
আপন মনের কখনো গাহিনি
কাঁপানো গান।

(২)

প্রেমের খেয়াল সহজে মানেনা
তাল ও মান।
ছোটা বই আর নিয়ম জানেনা
ফুলের বাণ।
প্রেম নাহি মানে আচার বিচার,
গীত নহে তার, সোনার খাঁচার
পাখীর গান।
প্রেম জানেনাকো দুবেলা মিছার
করিতে ভান।

(৩)

তুরিতে ভেরিতে কখনো বাজেনা
তরল তান।
পরীর শরীরে কখনো সাজেনা
জরীর থান।
আছে যা লুকায়ে ভাষার অন্তরে,
পার যদি দিতে মনের যন্তরে
হাল্‌কা টান,
তবে তা আসিবে সুরের মন্তরে
ধরিয়া প্রাণ।

(৪)

থাকেনা কবির সাজানো ভাষায়
ফুলের ঘ্রাণ।
পড়েনা কবির সাজানো পাশায়
মনের দান।
করো যদি তুমি আকাশ-ফুলের
করো যদি তুমি অনন্ত ভুলের
মদিরা পান।
তাহলে গাহিবে প্রাণের মূলের
রসের গান।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।



সঙ্কীৰ্ত্তন— মেদিনীপুরে প্রাপ্ত পুঁথির পাটা।



যুগলমূর্ত্তি—কালীঘাটের পট।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার প্রণীত "অজন্তা" গ্রন্থ হইতে

গান

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাইনে তোমারে।

বাতাস বহে মরি মরি,
আর বেঁধে রেখনা তরী,
এস এস পার হয়ে মোর
প্রেমের মাঝারে।

তোমার সাথে গানের খেলা
দূরের খেলা যে।
বেদনাতে বাঁশি বাজায়
সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি
বাজাবে গো আপনি আসি,
আনন্দময় নীরব রাতের
নিবিড় আঁধারে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মোগল-শাসনাধীনে ভারতের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা

মোগল-আমলে, লোকসাধারণের দারিদ্র্য-সত্বেও, এসিয়া ও য়ুরোপের সহিত খুব উদ্যমের সহিত বাণিজ্য চলিত।

ভারত হইতে গরম-মশলা, সোরা, চিনি, নীল, কাফি এবং কাপড় প্রভৃতি কতকগুলি তৈয়ারি মাল রপ্তানী হইত। রেশমের ও সূতার বস্ত্র-বয়নে হিন্দুরা সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ছিল। করমণ্ডল উপকূলে ও বঙ্গদেশে মস্‌লিন ও ছিটের কাপড় তৈয়ারি হইত। ঢাকায় লঘু ও অতি সূক্ষ্ম একপ্রকার মস্‌লিন হইত, তাহার নাম ছিল "প্রভাতের শিশির"। একদা অওরংজেব তাঁহার কন্যাকে এইপ্রকার স্বচ্ছ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি তাহাকে বলিলেন, "মুসলমান রমণীর সাত-ফের-দেওয়া ভাঁজের কাপড় পরা উচিত।" শাজাদী উত্তর করিলেন, "এই রকমই আমার পরিচ্ছদ। আমি প্রভাত-শিশির পরিয়া থাকি।" সকরি প্রদেশে ও

মসলিকাপত্তনের আশপাশে নানা-রঙ্গে-ছাপা ছিট কাপড় ও রঞ্জিত-সূত্রে-নির্ম্মিত গিংহাম-কাপড় তৈয়ারী হইত। সিন্ধুদেশে ছাপ-মারা চর্ম্ম; গুজ্‌রাটে বিশেষতঃ আহমদাবাদে কার্পাসের বয়ন ও রঞ্জন কার্য্য ভাল হইত। বারাণসী ও দিল্লি, রঞ্জিত রেশমের কাপড় ও সোনালি ও রূপালী কিংখাপের জন্য, এবং উত্তর পশ্চিম-অঞ্চল, কাশ্মীরী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল।

এই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে, ভারতে আম্‌দানি হইত;—জাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে লবঙ্গ, জায়ফল ও ডালচিনি; চীন হইতে চীনে-বাসন; সিংহল ও পারস্য-উপসাগর হইতে মুক্তা; আফ্রিকা হইতে দাস ও অশ্ব; ট্রান্‌সক্‌সিয়ানা ও পারস্য হইতে তাজা ও শুষ্ক ফল, ও ফ্রান্স হইতে কাপড়। তাছাড়া ভারত, আরবাদেশ হইতে সুগন্ধ দ্রব্য, এথিওপিয়া হইতে মৃগনাভি, এবং সিংহল হইতে হস্তী ক্রয় করিত। কেননা, সম্রাটের জন্য, রাজাদিগের জন্য, আমিরদিগের জন্য বহুসংখ্যক হাতীর প্রয়োজন হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, ইংলণ্ড ভারতের প্রধান খরিদ্দার হইয়া উঠিয়াছিল। (১)

ভারতে আমদানি অপেক্ষা রপ্‌তানির পরিমাণ বেশি হওয়ায়, ভারত সমস্ত পৃথিবীর বহুমূল্য ধাতুগুলাকে শোষণ করিয়া লইত। তথাপি, ভ্রমণকারীরা বলেন, মুদ্রা বিরল ছিল। রত্নালঙ্কারের প্রতি হিন্দুদের একটা স্বাভাবিক আসক্তি আছে। উহাদের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ উহারা রত্নাদিতে, সোনারূপার বলয়াদিতে পরিণত করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখে; উৎসবের দিনে এই সকল অলঙ্কার প্রদর্শন করে এবং শুকা-হাজার সময়ে বিক্রয় করিয়া থাকে। মোগল-রাজকর্ম্মচারীদিগের অর্থগৃধ্নুতাবশত ঐ সকল অলঙ্কার অন্তর্হিত হইত। কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই উহা লুকাইয়া রাখিত। এই অভ্যাসটা উহাদের এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ইংরাজদিগের অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপ প্রভূত অর্থ সঞ্চিত ছিল।

***

এক্ষণে মোগল-ভারতের কতকগুলি বিশেষ-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি। পঞ্জাবে, খাস হিন্দুস্থানে, বঙ্গদেশে, উড়িষ্যায়, গুজরাটে ঘননিবিষ্ট নিবিড় লোকপুঞ্জ। পারতপক্ষে

(১) ইংলণ্ডের ভারত কোম্পানী, ১৭৯২ হইতে ১৮০৯ পর্য্যন্ত—ভারত হইতে যে সকল দ্রব্য ক্রয় করে Murray তাঁহার Discoveries and Travels—গ্রন্থে একটা গড়পরতা হিসাব দিয়াছেন। যথা;—

কাপড়......	পৌণ্ড	১,৫৩৯,৪৭৮
রেশম......	”	১৩,৪৪৩
গোলমরিচ...	”	১৯৫,৪৬১
সোরা... ...	”	১৮০,০৬৬
গরম-মশ্‌লা...	”	১১২,৫৯৭
চিনি, নীল...	”	২৭২,৪৪২
কাফি... ...	”	৬,৬২৪

Traverniers ও কতকগুলি খরিদপত্রের এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—কাশিমবাজারের (বঙ্গদেশে) বার্ষিক দ্রব্যজাতের তালিকা;—২২ হাজার বস্তা রেশম (প্রতি বস্তার ওজন ১০০ পৌণ্ড) সুরাট ও আমেদাবাদের কিংখাপ; আগ্রার নিকটস্থ ফতেপুরের পশ্‌মি গালিচা; গোলকুণ্ডা ও মসলিপত্তনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের রঞ্জিত কার্পাস। লাহোর, সিরঞ্জ, বুর্‌হানপুর প্রভৃতি প্রদেশের ছাপা কার্পাস-কাপড়। আগ্রা ও আহামদাবাদে কাপড় রাঙ্গান হইত। লাহোর, আগ্রা- বরোদা, ব্রোচ্‌ ও বঙ্গদেশের সাদা কার্পাস-কাপড়।

সর্ব্বত্রই একই ভূমি পুনঃপুনঃ কর্ষিত হইত; কেননা, মনসবদার ও জমিদারেরা যতদূর সম্ভব ভূমিকে শোষণ করিবার চেষ্টা করিত।

সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাবে যবাদি শস্য, গাঙ্গের উপত্যকায় চাউল ও বাজরা, মালবার উপকূলে এবং মধ্যভারতের কতকগুলি প্রদেশে কার্পাস ও রেশম, গুজরাটে আগ্রার নিকটে, নীল, দাক্ষিণাত্যে গ্রীষ্মমণ্ডল-সুলভ গাছগাছরা।

আকবরের আমলে, এমন কি ঔরংজেবের আমলেও যে সকল বড় বড় রাস্তা সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই সকল রাস্তা পরিত্যক্ত হয়।

দস্যুর ভয়ে, বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়া পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া যাত্রা করিত। উত্তরাঞ্চলে উষ্ট্রপৃষ্ঠে এবং ভারতের অন্যান্য অংশে গরুর গাড়ী করিয়া মাল চালান হইত। গাড়ীর সাজসরঞ্জাম এখনকারই মত। গরুর স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া একটা হাঁসুলী এবং সেই হাঁসুলী ককুদের উপর ভর করিয়া থাকে। এই স্বার্থবাহদিগের সহিত শত শত শকট কখন-কখন শত সহস্র শকট চলিত। প্রধান শকটগুলিতে লবণ ও চাউল বোঝাই থাকিত। এক-এক জাতীয় চালানী মাল এক-এক বিশেষ জাতের একচেটিয়া ছিল। কোন কোন প্রদেশে যেখানে বন্যাপ্লাবিত ধান্যক্ষেত্র রাস্তার ধারে পড়িত, সেই সব স্থানে কিছুদিনের জন্য স্বার্থবাহদিগের গতিরোধ হইত।

আমীরেরা অশ্বপৃষ্ঠে, এবং অনেক সময়েই পাল্কীতে ভ্রমণ করিতেন। স্বার্থবাহদিগের পণ্যাদির সহিত, বিশেষত সামরিক দ্রব্যাদির সহিত একদল রক্ষী-সৈন্য চলিত। বণিকেরা

আসিয়া মাঠের মধ্যে মাটির ঘরে আশ্রয় লইত। সেখানকার হিন্দুরা চাউল, তরী-তরকারী ও ফলাদি উহাদিগকে বিক্রয় করিত; মুসলমান বণিকেরা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে মাংস খরিদ করিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইত। নগরে পান্থশালা ছিল। তন্মধ্যে দিল্লির পান্থশালাটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। উহা বাদ্‌সার ঘরোয়ানা একজন শাহাদি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

***

সমস্ত প্রদেশে, বিশেষত পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানে, বড় বড় লোকাকীর্ণ নগর। নগরের উপকণ্ঠগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। নগরের অভ্যন্তরদেশে কতকগুলি প্রাচীর—উহাই দরিদ্রদিগের অঞ্চল। কোন প্রকার নক্‌সার পরিকল্পনা নাই; বড় বড় গলি। সোজা রাজপথ, কতকগুলা আঁকা-বাঁকা গলি। এদিকে একস্থানে কতকগুলা মেটে ঘর—ঘরের উঠানে কলাগাছ পোঁতা; ওদিকে আর একস্থানে কতকগুলা কাঠের বাড়ী; গ্রীষ্ম-রজনীতে সেই সব বাড়ীর ছাদে লোকেরা নিদ্রা যায়।

য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীগণ অতি জঘন্য ও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া এই সকল অঞ্চলের বর্ণনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভারতীয় গ্রন্থকার-দিগেরও অভিমত কম কঠোর নহে।

লক্ষ্ণৌ সম্বন্ধে হসন এইরূপ বলিয়াছেন :—

"এই নগর? লক্ষ্ণৌ, এক ধ্বংসদশাপন্ন সহর। সর্ব্বত্রই উচ্চ স্থান ও নিম্ন স্থান :—একটা বাড়ী স্বর্গে, আর একটা বাড়ী পাতালে। লোকের বসতি এরূপ নিবিড় যে, দায়ে পড়িয়া যদি কোন নূতন অধিবাসীকে সেখানে আসিতে হয়, তখনি সে দম আটকাইয়া মরে। রাজপথে

জট্-পাকান চুলের মত হাজার হাজার আঁকাবাঁকা গলি......(২)

যে সকল অঞ্চলে রাশি-রাশি গৃহ, সেখানকার লোকেরা জ্বরে পচিয়া মরিত; প্রায় প্রতি বৎসরে ওলাউঠার মড়ক হইত। হাজার হাজার বাড়ী অগ্নিদাহে প্রায়ই দগ্ধ হইত (এক বৎসরের মধ্যে দিল্লিতে ৬০ হাজার বাড়ী দগ্ধ হয়); আর গ্রীষ্মকালে জলপ্লাবন।

কবি জুরাট বর্ষাঋতু সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

"মুষলধারে বৃষ্টি এবং নদী উচ্ছলিত......ফোপ্‌রা পিঠা জলে ভিজাইয়া লইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ বাড়ীর সংলগ্ন ভূমি; অল্প বাতাসেই কুটীরের চাল উড়িয়া যায়। আর কোঠাবাড়ীর কথা যদি বল, তাহার চূণ-কামকরা ছাদ ছাকুনী হইয়া দাঁড়ায়—তাহার ভিতর দিয়া জল চোয়াইতে থাকে......দোকানঘরের উপর দিয়া জলের স্রোত বহিতে থাকে; সেখানে কর্দ্দম ও বৃক্ষশাখা ভিন্ন আর কিছুই বিক্রয় করিবার নাই...... গৃহসমূহ মৃতদেহে পূর্ণ...সর্ব্বত্রই পরিপ্লাবিত ক্ষেত্র...... এই সমস্ত বিপদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরাই ভাল।"

যে বাজার মুসলমানদিগের খুব প্রিয় সেই বাজার নগরের মধ্যস্থলে। দুইটা বড় বড় পথ, তাহার ধারে ধারে খিলান-বারণ্ডা; এবং এই দুই পথ পরস্পরের উপর দিয়া আড়াআড়ি ভাবে সোজা চলিয়াছে। এই দুই পথের মধ্যে আবার আঁকাবাঁকা গলি এবং বারাণ্ডা-ওয়ালা গরাদে-বিশিষ্ট দ্বিতল কাঠের বাড়ী। এখানে জহুরী ও পোদ্দারেরা থাকে (গুজরাটে পার্শি ও ইহুদী)। আর একটু দূরে চিকণ-কাজের শিল্পী, খোদাইকর ও গজদন্তের ভাস্কর।

সর্ব্বত্রই হিন্দুর নিবিড় জনতা;—ক্ষুদ্রকায়, শীর্ণকলেবর, ক্ষীণাঙ্গ, শ্যামবর্ণ। কাহারো কোমরে জড়ান সাদা ধুতি, কেহ বা রঙ্গীন রেখা-বিশিষ্ট লম্বা কোর্ত্তা পরিয়াছে। বণিকদের একটা দীর্ঘ পরিচ্ছদ, একটা প্যাঁচাল পাগ্‌ড়ী। ব্রাহ্মণদিগের মাথায় শিখা, গায়ে সাদা চাদর, বক্ষের উপরে যজ্ঞোপবীত। কারিগরদিগের রমণীরা খুব উজ্জ্বল রং-এর কাপড় পরিধান করে; তাহাদের নাকে নথ, কাণে কাণ-বালা; নিম্ন শ্রেণীর রমণীরা সাদা 'ট্যানা' পরে, তাহাদের পা ও বাহু অনাবৃত; তাহাদের শিশুসন্তানেরা একেবারে নগ্ন। মুসলমানেরা আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত;—লম্বা চাপকান অথবা আজানু-লম্বিত ঢুলো পিরাহান, মাথায় সাদা বা সবুজ পাগ্‌ড়ী। মুসলমান-রমণীদের পরিচ্ছদ;—একটা ওড়্‌না; একটা চওড়া পাজামা—পাদ-মূল আঁটিয়া ধরিয়াছে। পার্সিদের কালো ফুলকাটা ধুচ্‌নী-টুপি; পার্সি রমণীদের গাত্র সুনম্য উজ্জ্বল রং-এর কাপড়ে জড়ান। চিকণ-কাজের পাড়ওয়ালা সাদা ওড়্‌না মাথায় সংলগ্ন। সে সময়ে ভারতে সকল দেশের লোকই দেখা যাইত:—তুর্ক ও মোগল অশ্বারোহী সৈনিকদিগের কটিবন্ধে তূণ; বেলুচি ও আফগানেরা পশমী চাদরে আবৃত—তাহার ভিতর হইতে উহাদের বহিরুন্মুখ থুতি ও শুক চঞ্চুনাসা পরি-দৃশ্যমান। নেপালী, তিব্বতী, চীনে, জাপানী, কাফ্রি ও য়ুরোপীয়। নগ্ন যোগীগণ, বিচিত্র-বর্ণের ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত দর্বেশগণ ভিক্ষা করিত, অথবা উহাদের দণ্ডের দ্বারা আঘাত

(২) Garcin de Tassy-র গ্রন্থ হইতে এই অংশ ও পরবর্ত্তী অংশ উদ্ধৃত হইল।

করিবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিত। সর্ব্বদাই অনুচরবর্গের সহিত কোন রাজা, অথবা রক্ষি-অনুসৃত অশ্বারূঢ় আমীরেরা এই জনতা ঠেলিয়া চলিত।

কবি হুসেনের কবিতায় (অষ্টাদশ শতাব্দী) আমরা ফৈজাবাদের এইরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হই :—

"একটি শ্রীবৃদ্ধিশীল নগর, অধিবাসীগণ হৃষ্টচিত্ত, সকলের হৃদয় গোলাপের ন্যায় উৎফুল্ল। বৃহৎ ও সুবিধাজনক বাজার ও রাস্তাগুলা চিত্ররক্ষণাধার পুস্তকের রেখার মত ঋজু রেখায় পরস্পরের উপর দিয়া গিয়াছে। দুই সারি বৃক্ষ......ত্রিদ্বার-বিশিষ্ট একটা চতুষ্ক......এই-এখানে জহুরিরা, ঐ-ওখানে কাপড়ের দোকানদারেরা; আর একটু দূরে পোদ্দার—আরও বেশী দূরে স্বর্ণকারগণ। যেন রজত কাঞ্চনের বৃষ্টি, নার্গেশ ফুলের তোড়ার মত স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রাসকল কাঠমঞ্চের উপর সজ্জিত রহিয়াছে। মিষ্টান্ন, সর্ব্বৎ, সরের পনির। এই কট্ কট্ শব্দ কিসের? চিনি বাহির করিবার জন্য ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গা হইতেছে। যেখানে স্তূপাকার জিনিষ সজ্জিত সেই দোকানের দফ্তরে দোকানদার বসিয়া আছে। উহারা বিক্রেয় দ্রব্যের নাম ধরিয়া সজোরে হাঁকে দিতেছে :—

"লঙ্কা," "নেবুর আচার," "আদা;" "চাউল চাই," "কাবাব চাই", "রুটি চাই", "দুধের রুটি চাই"। "এইখানে গাছগাছরা ঔষধের আরক"; "বরফ", "গোলাপী বাদাম"। "কাফি", "সুপারী", "তর্ম্মুজ"। পরিশেষে কাপড় :—কিংখাপ; জরির কাজ; ঝালর; চর্ম্মকার :—চন্দ্রমা-সদৃশ জুতা; ও জুতার অলঙ্কার তারকা-পুঞ্জের ন্যায়। পুস্তক ও চিত্র। পক্ষীজাতি :—টিয়া, পায়রা, বুলবুল। এইখানে একদল লোক। একজন গল্প-কথক। আরও দূরে ঐ জনতা কিসের? বংশীবাদক, কাশ্মীরের নর্ত্তকীবৃন্দ। এইখানে বাইজি ও বারাঙ্গনা :—সংখ্যায় হাজার-হাজার......তাহাদের নৃত্য-পরিচালিত পরিচ্ছদ হইতে যেন বিজুলী ছুটিতেছে। উহাদের কর্ণভূষণের পান্না দেখিয়া টিয়াপাখীরা হিংসায় মরিয়া যায়। উহাদের রঞ্জিত মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দু দেখা যাইতেছে—যেন ফুলের উপর শিশির-বিন্দু। কাহারও কাহারও জরির পরিচ্ছদের মধ্য হইতে গ্রীবা ও বক্ষ প্রকাশ পাইতেছে।"

বারাঙ্গনার সংখ্যা সম্বন্ধে ভারতের প্রায় সমস্ত নগরই ফৈজাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। Tavernier বলেন, হাইদ্রাবাদে ২০ হাজার বারাঙ্গণা ছিল। সায়াহ্নে তাহারা স্বীয় কুটীরের সম্মুখে আসিয়া থাকিত এবং রাত্রি-সমাগমে, উহাদের ঘরে দীপ জ্বালিত। উহারা তাড়ী বিক্রয় করিত।

হীনদশাপন্ন দাসত্বগ্রস্ত ইতরসাধারণ, কুসীদজীবি তস্কর-বণিকের দল—যাহারা অতিরিক্তহারে সুদ গ্রহণ করিয়া ধনোপার্জ্জন করিত এবং সেই ধন মাটিতে পুঁতিয়া রাখিত, সুরামত্ত পশুবৎ নিষ্ঠুর সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সৈনিক, সহস্র-সহস্র বারাঙ্গনা—ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় নগরসমূহের চিত্র।

ষোড়শ শতাব্দীর উন্নতি-প্রবণ মর্ম্মভাব এবং আকবরের প্রতিভা কিয়ৎকালের জন্য যে সমাজের উন্নতিসাধন করিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলির দ্বারা সেই সমাজের অবনতি ও আসন্ন উচ্ছেদ পরিসূচিত হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবাব

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোগীর দল

শীতের প্রভাত। কুয়াশায় চারিধার তখনও ঢাকিয়া রহিয়াছে। গৃহের দ্বারে সজ্জিত গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। রবার্ট জেঙ্কিন্স আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলে ভিতর হইতে নারী-কণ্ঠে কে কহিল, "বাড়ীতে এসে খাবে ত ?"

রবার্ট জেঙ্কিন্স শব্দ লক্ষ্য করিয়া পশ্চাতে ফিরিলেন। মুখে তাঁহার ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "না, মাদাম জেঙ্কিন্স।" সাধারণের সম্মুখে এই নারীকে 'মাদাম' বলিয়া সম্বোধন করিতে জেঙ্কিন্সের বিশেষ একটু চাড় দেখা যাইত। ইহাতে তিনি ভিতরে ভিতরে কেমন-একটু আনন্দ বোধ করিতেন! যে নারী অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দান করিয়া ফেলিয়াছে, তাঁহার অবসরটুকুকে আনন্দের উজ্জ্বলতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে মাদাম বলিয়া আপ্যায়িত না করিলে বিবেকও যে গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলে। জেঙ্কিন্স কহিলেন, "আমার জন্য তুমি বসে থেকো না। আমি আজ প্লাস্ ভাঁদোমে খাব। নিমন্ত্রণ আছে।"

মাদাম জেঙ্কিন্স কহিলেন, "ও! নবাবের ওখানে ?" মাদামের স্বরে ঈষৎ একটু শ্রদ্ধা মিশানো ছিল। সে শ্রদ্ধা এই নবাবের নামে! আরব্য উপন্যাসের নায়কের মতই যে নবাব দৈত্য-প্রদত্ত বিপুল ঐশ্বর্য্য-সম্ভার লইয়া অকস্মাৎ এই পারি সহরের বুকে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে, যাহার কথা, যাহার আলোচনা লইয়া সারা পারি আজ এই এক মাস ধরিয়া মাতিয়া রহিয়াছে, —সেই নবাব! তাহার নামে শ্রদ্ধা একটু হওয়া বিচিত্র নহে। পরে স্বর ঈষৎ নামাইয়া মাদাম কহিলেন, "কিন্তু মনে আছে—আমি যা বলেছি। আমার সে কথা রাখবে ত ? দেখো—কথা দিয়েছ !"

স্বরের ভঙ্গীতে বোধ হইল, কথাটা কিছু কঠিন এবং সে কথা রক্ষা করাও নিতান্ত সহজ নহে! জেঙ্কিন্স কোন উত্তর দিলেন না ; ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন। মুখে তাঁহার হঠাৎ একটা কাঠিন্যের ছাপ পড়িল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য। ধনী রোগীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া মিথ্যা আশ্বাস দিয়া সৌখীন ডাক্তারদিগের মুখ ও চোখ কেমন-একটা চতুরতায় অভ্যস্ত হইয়া উঠে। ডাক্তার জেঙ্কিন্স পর মুহূর্ত্তেই মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কথা যখন দিয়েছি, তখন তা রাখবই। এ তুমি নিশ্চয় জেনো, মাদাম জেঙ্কিন্স। নাও, এখন যাও। জানলাগুলো বন্ধ করে দাও গে —আজ ভারী কুয়াশা হয়েছে।" জেঙ্কিন্স বিদায় লইলেন।

রবার্ট জেঙ্কিন্স ডাক্তার, জাতিতে তিনি আইরিশ,—সস্মিত মুখ, উজ্জ্বল চক্ষু, সুস্থ সবল দেহ, সাজসজ্জাটুকু পরিপাটী,

বেশ-ভূষাতেও সৌখীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপাধি তাঁহার প্রচুর, খ্যাতি-প্রতিপত্তিও সামান্য নহে—বিস্তর বিজ্ঞান ও সেবা-সভাদির সদস্য ও সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সেগুলিকে তিনি অনুগৃহীত করিয়াছেন। বেথলিহাম আতুরাশ্রম-প্রতিষ্ঠাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কীর্ত্তি। অর্থাৎ এক-কথায় পার্লের আবিষ্কারক ডাক্তার জেঙ্কিন্স সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে বিরাজমান। একতিল বিশ্রাম নাই,—সারা পারি সহরে তাঁহার কার্য্যপটুতায় ধন্য-ধন্য রব উঠিয়াছে। পারির সমস্ত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য গৃহের তিনি চিকিৎসক। ক্ষুদ্র শিশুর দাঁত-ওঠা হইতে বৃদ্ধ ডিউকের সর্দ্দি অবধি সমস্তই ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে দেখিয়া বেড়াইতে হয়।

কুয়াশার রন্ধ্র ভেদ করিয়া ডাক্তার জেঙ্কিন্সের ব্রুহাম আসিয়া হোটেল স্তে মোরার সম্মুখে থামিল। প্রাসাদের মত অট্টালিকা, দীর্ঘ, সজ্জিত। গাড়ী থামিতেই দ্বারে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ডাক্তার জেঙ্কিন্স গাড়ীতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, ঘণ্টার শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন।

কুয়াশা থাকিলেও ডাক্তার স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, কাতার দিয়া পথে আরও দশখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। অপ্রসন্নভাবে তিনি ভাবিলেন, "যত সকালেই আসি না কেন, দেখি, আমার আগেই বিস্তর লোক এসে জমে গিয়েছে।" তথাপি এ বিশ্বাস তাঁহার মনে বেশই ছিল, যিনি যখনই আসুন না কেন, সংবাদ পাঠাইয়া ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে কখনও প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। তাঁহার জন্য দ্বার অবারিত।

এই প্রাসাদ-তুল্য গৃহে ডিউক স্তে মোরার বাস। ডিউকের খাস-কামরার সম্মুখে বড় একখানা ঘর। সেই ঘরে অসংখ্য উমেদার উদ্‌গ্রীবভাবে বসিয়া আছে,—কখন্ কাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়,—হুজুরে হাজির দিবার সেলাম আসিয়া পৌছায়!

ডাক্তার জেঙ্কিন্স কাষ্ঠ অভিবাদন করিয়া দ্বার-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার পালা চলেছে?"

রক্ষক মৃদু স্বরে যে নাম উচ্চারণ করিল, তাহা শুনিতে পাইলে উপস্থিত জন-সঙ্ঘে ক্রোধের একটা রক্ত শিখা বিদ্যুতের মত ঝিলিক্ হানিয়া যাইত, সন্দেহ নাই। এতগুলা সম্ভ্রান্ত লোক, কাজের জন্য কত ক্ষণ বসিয়া আছে, তাহার ঠিক নাই, আর ডিউক কি না থিয়েটারের নগণ্য একটা পোষাকওয়ালার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নামটা কাহারও শ্রুতিগোচর হইল না।

কতকগুলা শব্দের ঝঙ্কার,—আলোর একটা রশ্মি—জেঙ্কিন্স ডিউকের কক্ষে প্রবেশ করিলেন; একটা সংবাদ পাঠাইবারও প্রয়োজন বোধ করিলেন না। চিম্‌নির দিকে পিছন ফিরিয়া, উন্নত শির তুলিয়া কৌন্সিলের সভাপতি ডিউক একটা পোষাক হাতে লইয়া দর্জীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। আগামী বল্-নাচে ডঃচেস্ কি পোষাক পরিবেন, সেই সম্বন্ধেই ডিউক দর্জীকে গোটাকয়েক উপদেশ দিতেছিলেন। "গলার দিকে সামান্য ফ্রিল দিয়ো; ককে মোটে ফ্রিল হবে না।...এই যে, ডাক্তার জেঙ্কিন্স!...একটু আমায় মাপ করবেন।"

জেঙ্কিন্স অভিবাদন করিয়া ঘরের মধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জানালা খোলা ছিল। জেঙ্কিন্স আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইলেন। নিম্নে প্রকাণ্ড বাগান—সীন্ নদীর তীর অবধি শ্যামল তরুলতাগুলিকে কে যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে! তাহার অন্তরালে সেতু ও ও-পারের গির্জ্জার চূড়া ছায়ার মত ফুটিয়া রহিয়াছে। কুয়াশার পটে পেন্সিলের রেখায় কে যেন একখণ্ডে প্রকৃতির দৃশ্য আঁকিয়া রাখিয়াছে! ঘরের দেওয়ালে ডচেসের তৈল-চিত্র; চিমনির মাথায় ডিউকের মৃণ্ময় মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তি গড়িয়া ফেলিসিয়া গত সালোঁয় শ্রেষ্ঠ পদক লাভ করিয়াছে!

"হ্যাঁ, তারপর, জেঙ্কিন্স, খপর কি, বল।" দর্জ্জীকে বিদায় দিয়া ডিউক ডাক্তারকে সম্ভাষণ করিলেন।

ডাক্তার কহিলেন, "কাল রাত্রে থিয়েটারে থাকার দরুণ আপনাকে খারাপ দেখাচ্ছে।"

ডিউক কহিলেন, "রেখে দাও তোমার কথা! এর চেয়ে কবেই বা ভাল থাকি? তবে তোমার পার্লে মন্দ বোধ কচ্ছি না! একটু বল পাচ্ছি, তেজ পাচ্ছি···ওঃ, ছ'মাস পূর্ব্বে শরীরের যা দশা হয়েছিল।"

জেঙ্কিন্স ডিউকের বুকের উপর মাথা কাত করিয়া রাখিলেন। ডিউক গণিলেন, "এক, দুই, তিন, চার।" জেঙ্কিন্স তাঁহার বুকে কান পাতিয়া কহিলেন, "কথা কয়ে যান দেখি।"

ডিউক কহিলেন, "কাল ও কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে হে, ডাক্তার? সেই লম্বা লোকটা,—তামাটে রঙ, ভারী বিশ্রী জোরে হাসছিল!—সেই যে কাল থিয়েটারে যার সঙ্গে ষ্টেজ-বক্সে তুমি বসেছিলে,—কে সে?"

"ওঃ, তার কথা বলচেন? সেই ত নবাব—জাঁস্থলে, যথের ধন নিয়ে পারিতে এসেছে। সহরে হৈ-চৈ পড়ে গেছে, একেবারে!"

"বটে! ঐ সেই নবাব! আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম! সবাই ওর দিকে হরদম চাইছিল। অভিনেত্রীগুলোর অবধি আর অন্য দিকে নজর চলছিল না! তুমি তাহলে লোকটাকে জান—এ্যাঁ? লোকটা কেমন?"

"আমি? হ্যাঁ, ওকে জানি বৈ কি,—আমি হলুম গে, ওর ডাক্তার।...হ্যাঁ, বুক দেখা হয়েছে। না, বেশ আছেন আপনি। ও, হ্যাঁ, সে আজ এক মাসের কথা হতে চলল। পারির বাতাস নবাবের কেমন সহ্য হচ্ছিল না, তাই আমায় ডাকিয়ে পাঠায়। সেই অবধি আমার সঙ্গে আলাপ বেশই জমেছে। ওর সম্বন্ধে আমি এমন বিশেষ কিছু জানিনা বটে, তবে টিউনিস থেকে লোকটা একেবারে টাকার আণ্ডিল নিয়ে এসেছে। কোন্ বে'র কাছে কাজ করত। মনটা বড় ভালো, ভারী সাদা-সিধে লোক, দয়া ধর্ম্মও বেশ আছে—"

বাধা দিয়া ডিউক কহিলেন, "টিউনিসে? তা, নবাব নাম হল কেন?"

"বাঃ! ঐ ত হল গে মজা! পারির ধরণই ত তাই। বিদেশী পয়সাওলা লোক দেখলেই ওরা 'নবাব' খেতাব দিয়ে বসে থাকে, তা সে যেখানকারই লোক হোক্ না। যাহোক একে কিন্তু খেতাবটা মানিয়েছে।

তামাটে রং, জ্বলজ্বলে চোখ, আর অগাধ টাকা! তা হক্-কথা বলব, টাকাটা সৎকার্য্যে খুবই ব্যয় করছে! ওর কাছে আমি ঋণীও আছি”—ডাক্তারের স্বর কৃতজ্ঞতায় নম্র হইয়া পড়িল,—“ওরই সাহায্যে আমি বেথলিহাম আতুরাশ্রম খুলতে পেরেছি। আশ্রমটার সম্বন্ধে মেসেঞ্জার কাগজখানা খুব লিখেচে। লিখেচে, এত-বড় সদাশয়তার কাজ বোধ হয় এক শ' বছরের মধ্যে আর ছুটি হয় নি! দেখি, কাগজখানা বুঝি সঙ্গেই আছে।”

কথাটা শেষ করিয়া ডাক্তার পকেটের মধ্য হইতে ভাঁজ-করা একখানা খবরের কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন। ডিউক কিন্তু বাজে কথায় ভুলিবার লোকনহেন! বক্র দৃষ্টিতে কাগজখানার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, “তাহলে তোমার নবাবের অঢেল টাকা, বল। শুনচি কার্দ্দেলাকের থিয়েটারটা ওরই টাকায় ভাল করে ফের খোলবার ব্যবস্থা হচ্ছে। মঁপার্ভঁর দেনা ঐ লোকটাই শুধে দিয়েছে। বোয়া ল্যান্ড্র্ ওর জন্যে আস্তাবল খুলচে, বুড়ো সোলবাক্ ওকে বিস্তর ছবি এঁকে দিচ্ছে। এ সব ত অল্প টাকার খেলা নয়।”

জেঙ্কিন্স হাসিলেন; হাসিয়া কহিলেন, “তবে বলি, ডিউক সাহেব, নবাব বেচারা আপনার নামে একেবারে মরে আছে। এখানে এসে সহুরে বলে নাম কেনবার ঝোঁক ওর বেজায়। আপনাকেই ও আদর্শ ঠিক করে চলেচে। আপনার কাছে লুকোব না, আপনার সঙ্গে একবার মিশতে পেলে ও বেচারা যেন বর্ত্তে যায়।”

“জানি—আমি তা শুনেচি। মঁপার্ভঁ আমায় বলছিল, আমার মতও চাইছিল। ...কিন্তু কি জান? ছুদিন আরও সবুর করে আমি সব দেখতে চাই। লোকটার সত্যিই শাঁস আছে কি না! বিদেশের টাকা-কড়ির ব্যাপার—একটু সাবধান হয়েই মেশা উচিত।...তা বলে অন্য কিছু ভেবো না—আরে নাঃ, আমি তা বলচি না। ...কি জান, আমার নিজের বাড়ীতে অবশ্য নয়, তবে অন্য কোথাও, এই ধর,—থিয়েটারে, কি কোন পার্কে টার্কে, কি আর কারও বাড়ীতে—”ডিউকের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া ডাক্তার কহিলেন, “বেশ,—সুবিধেও হয়েছে। আসছে মাসে মাদাম জেঙ্কিন্স বাড়ীতে একটা পার্টি দিচ্ছেন—অনুগ্রহ করে সেই পার্টিতে যদি আপনি—”

“বাঃ! এ হলে ত চমৎকার ব্যবস্থা হবে, ডাক্তার। নবাব যদি সেখানে আসে, আলাপ করিয়ে দিও—ব্যস্!”

এই সময় দ্বার খুলিয়া ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, “মন্ত্রীসভার সভাপতিমহাশয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন—তাঁর শুধু হুজুরের সঙ্গে একটি কথা আছে।...নীচে পুলিশ সাহেবও বসে আছেন।”

ডিউক কহিলেন,“বলগে, আমি যাচ্ছি।... তার পর ডাক্তার, তোমার পাল্‌টাই আপাততঃ তা হলে চলবে?”

“হ্যাঁ চলবে। বিশেষ, যখন উপকার পাওয়া যাচ্ছে।” ডাক্তারের মুখে প্রসন্নতার একটা স্নিগ্ধ কিরণ ফুটিয়া উঠিল। ডিউক তাঁহার গৃহে পদধূলি দিয়া নিমন্ত্রণ-সভাটিকে আপ্যায়িত করিবেন! সঙ্গে সঙ্গে নবাবকেও তিনি ডিউকের সহিত পরিচিত করাইয়া দিবার সুযোগ লাভ করিবেন। এতখানি সৌভাগ্য!

সেদিনকার মত বিদায় লইয়া জেঙ্কিন্স জন-পরিপূর্ণ ডিউকের প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া কোচম্যানকে ইঙ্গিত করিলেন, "ক্লাবে চল।"

র্‍যু রয়েলের সীমানায় আসিয়া ডাক্তার গাড়ী হইতে নামিলেন। ভৃত্যের দল ভিতরে বড় বড় কার্পেটগুলা নাড়িয়া ধূলা ঝাড়িতেছিল, ঘর সাফ করিতেছিল। ডাক্তার জেঙ্কিন্স রুমালে নাক ঢাকিয়া মার্কুইস মঁপার্ভর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মার্কুইস কহিলেন, "ডাক্তার যে! আরে এস, এস।"

জেঙ্কিন্স কহিলেন, "নীচে চাকরগুলো যে ধূলো উড়িয়েছে, কার সাধ্য তার মধ্য দিয়ে উপরে আসে।"

মার্কুইস কহিলেন, "বসো।"

ডাক্তার বসিলে মার্কুইস এক নিশ্বাসে আপনার উপসর্গাদির তালিকা দিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে পার্লের গুণের কথাও বলিতে ভুলিলেন না। বলিলেন, পার্ল ব্যবহার করিয়া তিনি যেন আবার নবযৌবন লাভ করিয়াছেন। শুনিয়া মৃদু হাসিয়া ডাক্তার পার্লের পুনর্ব্যবহারে পরামর্শ দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমি এখন চল্লুম।...নবাবের ওখানে আবার দেখা হচ্ছে ত?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই। আজ ওখানেই খাবার কথা আছে! জান ত, মতলবখানা যা ঠাওরানো গেছে—সেটা ত সারা চাই,—না হলে ওখানে কি সাধ করে যাওয়া যায়? আঃ! বাড়ী ত নয়, যেন চিঁড়িয়াখানা।"

ডাক্তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় যাহা কহিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ দাঁড়ায়, যে নবাবের সঙ্গ শুধুই আনন্দের সৃষ্টি করে না, তাহার মধ্যে অস্বস্তিও বিলক্ষণ আছে, সত্য। তবু ইহার জন্য নবাবের উপর রাগ করাটা ভাল দেখায় না। বেচারা সভ্য-সমাজের আদব-কায়দা জানিবার অবসর ত কখনও পায় নাই! আর তাঁহাদের ত কাজ লইয়া কথা! একটু অসুবিধা হইলে আর—ইত্যাদি।

মঁপার্ভ কহিলেন, "আর শিখতেও পারবে না। যে যাবে, তার সঙ্গেই প্রাণ খুলে মিশবে,—একেবারে হলা-হলা গলাগলা ভাব! এতে কি আর মানুষের ভদ্রতা থাকে? ...দেখেচ ত, বোয়া ল্যান্দ্র্ কি রকম ঘোড়া গচিয়েচে, এক-দম্ অপদার্থ, কাগজের ঘোড়া বললেও চলে; আর তাই ও হাজার টাকায় কিনেচে! আমি বেশ বলতে পারি, বোয়া ল্যান্দ্র্ বড় জোর পাঁচশ টাকায় ঘোড়াগুলো কিনেচে!"

"যাক্—নবাব কিন্তু ভারী ভদ্রলোক।"

মঁপার্ভ কহিলেন, "কিন্তু নবাব কেন ঘোড়াগুলো নিয়েচে, তা জানো? ওগুলো এককালে ডিউকের ঘোড়া ছিল বলে—"

"সে কথা ঠিক। ডিউকের চলা, বলা, হাসি-কাশী সমস্ত ধরণগুলো নকল করবার জন্য নবাব যেন উঠে পড়ে লেগেছে। জানেন, আজ নবাবকে গিয়ে এমনএকটা খবর দেব যে শুনলে সে আহ্লাদে গলে যাবে।"

"কি খবর?"

"নবাবের সঙ্গে ডিউকের পরিচয় করিয়ে দেব। সে বিষয়ে ডিউক আজ আমায় অনুমতিও দিয়েছেন।"

মার্কুইসের মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল। স্থির দৃষ্টিতে ডাক্তারের পানে চাহিয়া তিনি

কহিলেন, "দেখ ডাক্তার,—আমাদের মধ্যে কোন রকম রাখারাখি ঢাকাঢাকি থাকাটা ঠিক নয়—তুমিও দাঁও বাগাতে চাও, আমিও তাই চাই। তোমার গণ্ডীতে আমি কখনও পা দিতে যাই না, তুমিও আমার গণ্ডীতে পা দিতে এসো না। আমি যখন নবাবকে কথা দিয়েছি, ডিউকের সঙ্গে তার পরিচয় আমি করিয়ে দেব—তোমার সঙ্গেও যে ডিউকের পরিচয় হয়, তা আমারই দ্বারায়, মনে আছে ত? তখন এ ভারও আমার। এতে তুমি হাত দিতে এসো না।"

জেঙ্কিন্সের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তাই ত! মার্কুইসের মত বন্ধু, ডিউকের কেহ নাই, এ কথা কে না জানে! মার্কুইস কহিলেন, "না, চুপ করে থেকো না। বল। আমাদের মধ্যে এর একটা বোঝাপাড়া হয়ে যাক্—"

"নিশ্চয়! ইজ্জতের জন্যও বোঝা-পড়াটা হওয়া দরকার—"

"ইজ্জত! অত বড় কথা নয়, ডাক্তার। ইজ্জত আবার কি? তার চেয়ে বল, কায়দা-কানুনের জন্য—"

ডাক্তার অপ্রতিভভাবে অস্পষ্ট দুই-চারিটি কথা কহিয়া বিদায় লইলেন। এখনও বিস্তর জায়গায় ঘুরিতে হইবে।

ডাক্তারের রোগীগুলি সহরের সেরা রোগী! ঐশ্বর্য্যের কাহারও সীমা নাই! ধনীর প্রাসাদে কার্পেট-মণ্ডিত সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া পুষ্প-বাস-ফুল্ল কক্ষে রেশমী কোমল কৌচে গিয়া ক্ষণিকের জন্য শুধু বসিতে হয়। রোগ যেখানে বিলাসের মূর্ত্তি ধরিয়াই সাজিয়া বসিয়া থাকে, রোগের শীর্ণ তপ্ত হস্ত যেখানে এতটুকু রুদ্রতারও আভাষ দিতে সাহস করে না, সেই সকল স্থানেই ডাক্তার জেঙ্কিন্সের প্রসার-প্রতিপত্তির সীমা নাই। অর্থাৎ এ সকল রোগীকে রোগী ঠিক বলা যায় না। হাঁসপাতালে গেলে এ সকল রোগীকে তখনই অসঙ্কোচে তাহারা বিদায় করিয়া দেয়। রোগের চিহ্ন শরীরের কোথাও নাই এবং ডাক্তারের সূক্ষ্ম নিপুণ যন্ত্রগুলা রীতিমত অভিনিবেশেও শরীরের কোথাও এতটুকু রোগ আবিষ্কার করিতে পারে না। বিলাসের জড়তায় মৃত্যু যেখানে বহুপূর্ব্বেই বাসা বাঁধিয়াছে, সেখানে আবার নূতন করিয়া কোন্ রোগ উঁকি দিবে? কি রোগ বাসা বাঁধিবে? মৃতের আবার রোগ কি! এ সকল রোগী ত বহুকালই মরিয়া গিয়াছে। প্রাণ কি কাহারও আছে? পোষাকের ভারে মৃত দেহগুলা শুধু সাজানো আছে বৈ ত নয়! মাথায় কাহারও চিন্তা নাই, প্রাণে আনন্দ নাই, জীবনে শৃঙ্খলা নাই—এ ত মৃতের দল! তাই ডাক্তারের পার্লের এতখানি নাম বাহির হইয়া গিয়াছে। সে যেন চাবুক মারিয়া ইহাদের জীবনে একটু সাড় আনিয়া দিয়াছে।

কোন রোগী বলে, "ডাক্তার, থিয়েটারে না গিয়ে ত আর থাকা যাচ্ছে না।" রোগিণী বলে, "কাল ভারী একটা জম্‌কালো বল্ আছে, যেতে পাব ত?" ডাক্তার মৃদু হাসিয়া আশ্বাস দিয়া আসেন, "তা যেয়ো। কিন্তু দু তিন ঘণ্টার বেশী থেকো না।" ইহাই তাঁহার রোগীর ইতিহাস, ইহাই তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালীর সার মর্ম্ম।

এমনই রোগীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া

ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া বিখ্যাত আর্টিষ্ট ফেলিসিয়ার ভবন-দ্বারে দাঁড়াইল। ডাক্তার নামিয়া উপরে গেলেন। গৃহখানি তেমন বড় নহে; তবে সজ্জিত সুন্দর ঘরগুলি দেখিলে গৃহ-স্বামীর সুরুচি ও ভব্যতার পরিচয় পাইতে এতটুকু বিলম্ব ঘটে না। কবির কুঞ্জের মতই পরিচ্ছন্ন গৃহ।

পদশব্দে চমকিয়া ফেলিসিয়া ঘাড় ফিরাইল। "কে,—ডাক্তার?"

ডাক্তার নম্র স্বরে কহিলেন, "তুমি কাজে এতই মন দিয়েছিলে যে, ডাকতে আমার ভরসা হত না। নতুন কিছু গড়ছ, বুঝি!"

ফেলিসিয়া মাটি দিয়া মূর্ত্তি গড়িতেছিল। কহিল, "কাল রাত্রে হঠাৎ কেমন খেয়াল হল! তাই আলো জেলেই কাজে লেগে গেলুম। কাদুরের কিন্তু এতখানি জবরদস্তি পছন্দ হচ্ছে না।"

কাদুর ফেলিসিয়ার কুকুর। একজন দাসী তাহার পা দুইখানা ধরিয়া রাখিয়াছিল, ফেলিসিয়া তাহা দেখিয়া কাদুরের মূর্ত্তি গড়িতেছিল।

ফেলিসিয়ার ললাটে হাত রাখিয়া ডাক্তার কহিলেন, "কিন্তু এখনও তোমার একটু জ্বর রয়েছে, দেখচি। অসুখ শরীরে রাত জাগা, পরিশ্রম করাটা ঠিক হচ্ছে না ত।"

ফেলিসিয়ার মুখে লজ্জার একটা রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল। চোখ দুইটি সরমের শান্ত শ্রীতে ভরিয়া গেল। ফেলিসিয়া কহিল, "কৈ! আপনার পালে ত কিছু ফল পাচ্ছি না। আর কাজ! কাজ করলেই আমি থাকি ভাল। চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে না, কেমন অস্বস্তি ধরে, কেবলই মনে হয়, জীবনটা যেন কিছু নয়! ঐ জলের মতই ঘোলাটে হয়ে উঠেছে! ঐ যে কঁস্তা,—ও তবু ঢের মনের সুখে আছে—একদিন ত ও সুখের মুখ দেখেচে—সেই সুখ মনে করে ও ভাল থাকে। কিন্তু আমার মনে করবার মত কিছু নেই। জীবনটা চিরদিনই একটানা বয়ে চলেছে—থাকবার মধ্যে আছে শুধু আমার কাজ, খালি কাজ। তাই কাজ করেই আমি থাকি ভাল।"

অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিটির পানে চাহিয়া, মূর্ত্তির গায়ে স্থানে স্থানে সরু তুলিটি বুলাইতে বুলাইতে কোনখানে মুছিয়া, কোনখানে মাটির লেপ আরও ঘন করিয়া দিয়া ফেলিসিয়া কথাগুলি বলিয়া গেল। তাহার মুখে মৌন কাতরতার একটা করুণ ছাপ ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার বিষাদ-করুণায় মাখা সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে শুনিতে জেঙ্কিন্সের প্রাণে এক নূতন ভাবের উদয় হইতেছিল। জেঙ্কিন্স কোন কথা বলিলেন না। তাহা লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ কি বলিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া ফেলিসিয়া আপনা হইতেই যেন অপ্রভিত হইয়া পড়িল। প্রসঙ্গটা উল্টাইয়া দিবার জন্য সে বলিল, "হ্যাঁ, আপনার নবাবকে যে সেদিন দেখলুম—শুক্রবার দিন অপেরায় গেছলেন।" কথাটা শেষ করিয়া ফেলিসিয়া জেঙ্কিন্সের পানে চাহিল।

"তুমিও বুঝি গেছলে—?"

"হ্যাঁ!—ডিউক একটা বক্সের টিকিট পাঠিয়ে ছিলেন।"

জেঙ্কিন্সের মুখে কে যেন এক ঘা চাবুক

মারিল। মুখ তাঁহার বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ফেলিসিয়া কহিতে লাগিল, "আমি কর্ত্তাকে কত করে বল্লুম, সঙ্গে যেতে। পঁচিশ বচ্ছর পরে সে আবার অপেরা দেখলে। ও যেন কি রকম হয়ে পড়ছিল! যখন নাচ হচ্ছিল ওর সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল—চোখ দুটো যেন জ্বলে জ্বলে উঠছিল—পুরোনো কথা বোধ হয় কিছু মনে পড়ছিল...হ্যাঁ, নবাবের চেহারাখানি বেশ,—আমার এখানে একদিন নিয়ে আসবেন না? আমি তাঁর মাথার একটা ছক্ গড়ব।"

"সে কি করে হবে! লোকটা ভয়ঙ্কর কুৎসিত যে।"

"মোটেই নয়। তিনি আমাদের ঠিক সামনের বক্সে বসেছিলেন--চমৎকার মূর্ত্তি —পুরুষের চেহারা বটে। মার্ব্বেলের মূর্ত্তির মত—সাধারণতঃ এমন একখানি মূর্ত্তি ত ফস্ করে কৈ চোখে পড়ে না। আর যখন কুৎসিত বলেই আপনার ধারণা, তখন ভাবনাটাই বা কিসের! ভয় নেই, ডাক্তার সাহেব, ভয় নেই।"

এ কথার উত্তরের আশামাত্র যেন না করিয়া ফেলিসিয়া আবার মূর্ত্তি গড়িতে মন দিল। ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার ফেলিসিয়ার নিকটে আসিলেন, কহিলেন, "তাহলে আজ আসি ফেলিসিয়া।"

ফেলিসিয়া তুলি রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "চল্লেন! তাহলে তাঁকে আন্‌চেন একদিন?"

"কাকে আনব?"

"কেন, নবাবকে।"

"নবাবকে?"

"হ্যাঁ, নবাবকে। না, আমি শুনচি না। আনতেই হবে। আনা চাইই। বাঃ, কেন আনবেন না?" ফেলিসিয়া আবার সহসা বসিয়া পড়িয়া ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া মূর্ত্তিটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

যেন আনন্দের পুতলি! কোন কিছুতে আকর্ষণ নাই, কোন কিছুর সন্ধান রাখে না, আত্ম-ভোলা সরলা বালিকা, ফেলিসিয়া! জেঙ্কিন্স বিদায় লইলেন। আজ তাঁহার মনের মধ্যে কাঁটার মত কি-একটা খচ্ খচ্ করিয়া ফুটিতে ছিল।

বিদায় লইয়া ডাক্তার সহরের সীমানায় এক দরিদ্র পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একখানা জীর্ণ বাটির দ্বারে গাড়ী থামিল। ডাক্তার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ছিন্ন মলিন বেশ পরিহিত অপরিচ্ছন্ন বালক বালিকার দল অদূরে ধূলা-মাটি লইয়া খেলা করিতেছিল,—সজ্জিত গাড়ী দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া সদলে আসিয়া তাহারা গাড়ীর সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

সিঁড়ি বাহিয়া বাড়ীর চতুর্থ তলে উঠিয়া একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাক্তার দাঁড়াইলেন। ঘরের সম্মুখে একটা তামার পাত আঁটা ছিল। তাহাতে লেখা ছিল, "এম. জুজ, একাউনটাণ্ট।" পাতটার পানে চাহিয়া দেখিয়া ডাক্তার মৃদু হাসিলেন, পরে দ্বারের হাতলে ঘা দিলেন।

ভিতর হইতে কে দ্বার খুলিয়া দিল। ডাক্তার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন, "ভালো আছ, আঁদ্রে?"

"আসুন মস্যুঁ জেঙ্কিন্স।"

ডাক্তার আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "তুমি দেখচ, আমার ব্যবহার। তুমি যে এই তোমার আত্মীয়দের ছেড়ে নিজের গোঁ-ভরে এতদূরে এসে বাসা নিয়েছ, তবু দেখ, আমরা এখানেও তোমায় দেখতে আসছি। আমার এতে মাথা হেঁট হয়, তা জানো! যত বড় বড় ঘরে আমার কাজ—আমায় এখানে নিত্য আসতে দেখলে লোকে কি ভাববে,—কিন্তু কি করব? না এলে তোমার মা ওদিকে কেঁদে কেটে অনর্থ বাধিয়ে দেয়। তাই না এসেও পারি না।"

ডাক্তার জেঙ্কিন্স ঘরের চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। বালি-চুণ-খসা দেওয়াল, ঘরের মধ্যে দুই-চারিখানা জীর্ণ চেয়ার, একটা ছোট টেবিল, একখানা খাট, নূতন একটা ক্যামেরা, ইহাই গৃহের প্রধান আসবাব পত্র। এক কোণে ধূলি-মাখা ছোট একটা জর্ম্মান্ ষ্টোভ্ পড়িয়া আছে, তাহারই পার্শ্বে লোহার একটা ছোট কেট্‌লি। পরে আঁদ্রের পানে তিনি চাহিলেন। শীর্ণ দেহ, পাণ্ডু মুখ, দাড়ি কবে কামানো হইয়াছে, ঠিক নাই,—খোঁচা খোঁচা কাঁটার মত সেগুলা আবার দেখা দিয়াছে। চোখে দারিদ্র্যের ছায়ার মধ্য হইতে একটা উজ্জ্বলতা উঁকি দিতেছে। জেঙ্কিন্স বলিলেন, "শোন আমার কথা। যেদিন তোমার মাকে আমি বিবাহ করেছি, সেই দিন থেকেই তোমাকে আমি নিজের ছেলের মত দেখে আসছি। আমার সঙ্গে থেকে তুমি কাজ কর, আমার এই ঘরগুলো হাত করে নাও, ডাক্তারি করে ভদ্রলোকের মত থাক, এই আমার ইচ্ছা ছিল। তোমার মারও সেই সাধ। কিন্তু তুমি,—কোন কথা নেই, বার্ত্তা নেই, কাকেও কিছু না বলে সটান আমার বাড়ী থেকে চলে এলে! লোকে এতে কি ভাবচে, বল দেখি। শুধু আমায় অপদস্থ করা! লেখাপড়া ছেড়ে দিলে, নিজের ভবিষ্যৎটা মাটি করলে—সব খোয়ালে। কেন? না, যাতে পয়সা নেই, নাম নেই, ইজ্জৎ নেই, দুনিয়ার যত হতচ্ছাড়া বখা নিষ্কর্ম্মাগুলো যা করে দিন গুজরান করে, সেই হাভাতে পেশা নেবে, ঠিক করেছ! ছিঃ!"

"এ কাজে আমার আনন্দ হয়, করে সুখও পাই। আর এতে পয়সা নেই, তাই বা আপনাকে কে বললে! মান খুবই আছে।"

জেঙ্কিন্স ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "ছাই আছে! আমায় আর তুমি বুঝিয়ো না—আমার কিছু জানতে বাকী নেই। সাহিত্য-চর্চ্চায় আবার ইজ্জৎ! ও সব পাগলের কথা! যাক্, শোন, আমি কি বলতে এসেছি। ও-সব লক্ষ্মীছাড়া খেয়াল ছাড়,—আমার পরামর্শমত কাজ কর, মান, সম্ভ্রম—সব হবে। একটা মস্ত সুযোগও উপস্থিত, হেলায় হারিয়ো না। আমি বেথলিহাম আতুরাশ্রম খুলেচি, জান ত! এত বড় সদনুষ্ঠান একশো বছরের মধ্যে কারও মাথায় আসেনি, তাও জানো! এ কথা আমার কথা নয়, খবরের কাগজে অবধি লিখেচে। এর জন্য নাতেঁঁয়ারে বিস্তর জমি কেনা হয়েছে, কাজও সেখানে সুরু হয়েছে। আমার ইচ্ছা, সেখানকার ভার তুমিই নাও, তুমি সেখানকার কর্ত্তা হবে। তোফা বাড়ী পাবে, লোকজন পাবে। একবার শুধু তুমি রাজী হও—আমি গিয়ে নবাবকে এখনি বলচি—আমার কথা সে তখনই রাখবে।"

সহজভাবেই আঁদ্রে উত্তর দিল, "না।"

"না!" জেঙ্কিন্সের ললাট কুঞ্চিত হইল। তিনি কহিলেন, "বেশ! আমিও ভেবেছিলুম, তোমার এ সুবুদ্ধি হবে কেন? তা বেশ, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ, ঠেল। এক দিন পস্তাবে! আমি অবশ্য নিজে থেকে তোমায় সাধতে আসিনি—তোমার মার জেদেই এসেছিলুম। তা তোমার জেদই বজায় থাকুক। আমরা ত কেউ নই! তাই হবে—তুমি নিজে যে পথ ধরেছ, সেই পথেই থাকো—অভাবের মধ্যে পড়ে এর পর যখন ছটফট করবে, তখনই তোমার উচিত শিক্ষা হবে! লিখে আবার মানুষের পয়সা হয়,—নাম হয়—! আরো জেনে রাখো, ছুতো-নাতায় যে আমার ওখানে গিয়ে পয়সার পিত্যেশ্ করে দাঁড়াবে, তা হবে না। আমি একটি কড়ি দিয়ে তোমায় সাহায্য করব না। আমার সঙ্গে যেমন, তোমার মার সঙ্গেও তেমনি তোমার সব সম্পর্ক চুকে গেল। সে আর আমি—দুজনে আমরা এক, এ জেনে রেখো!"

আঁদ্রের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কাশিয়া সে উত্তর দিল, "বেশ। তবে মা যদি কখনও আমায় দেখতে চান ত এখানে আসতে বলবেন। আমার দ্বার তাঁর জন্য চিরদিন খোলা থাকবে,—এইটুকু তাঁকে অনুগ্রহ করে জানাবেন। আপনার বাড়ীতে আমি আর কখনো যাব না, ঠিক জানবেন। এ কথার কখনও নড়চড় হবে না।"

ডাক্তার জেঙ্কিন্স কহিলেন, "কিন্তু, কেন—কেন—সে কথা শুনতে পাই না?"

"না। প্রয়োজন নাই।"

ডাক্তারের অস্বস্তি বোধ হইল। দারিদ্র্য যাহাকে পিষিয়া মারিতেছে, এতখানি তাহার তেজ যে তাঁহার সম্মুখে একবার সে শির নোয়াইতে চাহে না! বাহিরে যাঁহার এতখানি প্রতিপত্তি, সেদিনের একটা হতভাগা, সংস্থান-হীন ছোকরা সটান্ তাঁহার মুখের উপর সমানে জবাব দিয়া গেল! আশ্চর্য্য! তিনি ভাবিয়াছিলেন, বাড়ী ঢুকিতে দিবনা এই ভয় দেখাইলে আঁদ্রেকে হাতের মধ্যে আবার পাওয়া যাইবে। কিন্তু আঁদ্রের সেই সুদৃঢ়ভাব দেখিয়া পরাজয়ের ক্ষোভে প্রাণ তাঁহার পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

বিদায় লইয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ডাক্তার গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। কোচম্যানকে আদেশ করিলেন, "প্লাস্ ভাঁদোম্—" ডাক্তারের গাড়ী নবাবের গৃহোদ্দেশে ছুটিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পরিচয়

"রূপভেদাঃ প্রমাণাণি ভাব লাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতিচিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥"

বাৎস্যায়ন-কামসূত্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের টীকায় যশোধর পণ্ডিত আলেখ্যের এই ছয় অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—প্রথম রূপভেদ, দ্বিতীয় প্রমাণ, তৃতীয় ভাব, চতুর্থ লাবণ্যযোজন, পঞ্চম সাদৃশ্য, ষষ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ।

কামসূত্রের রচনাকাল কাহারো মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬৭১ কাহারো মতে বা খৃঃ পূর্ব্ব ৩১২ আবার কাহারো মতে ২০০ খৃঃ অব্দ বই নয়। যশোধর পণ্ডিত কামসূত্রের টীকা রচনা করেন ১১ শত হইতে ১২ শত খৃষ্ট অব্দের মধ্যে।

যে সকল প্রাচীন ও বৃহত্তর শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া বাৎস্যায়ন কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন সে সকল শাস্ত্র এখন লুপ্ত সুতরাং বাৎস্যায়ন-কথিত পূর্ব্ব শাস্ত্রসমূহে —যেমন বাভ্রব্যের সূত্রার্থ ও আগম ইত্যাদিতে এই ষড়ঙ্গের প্রয়োগ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই; কামসূত্রের টীকাকার যশোধর পণ্ডিতও কোন্ প্রাচীন টীকা অবলম্বন করিয়া নিজের জয়মঙ্গল টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করেন নাই। কাজেই চিত্রে এই ষড়ঙ্গ যে কত প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা বলা কঠিন; তবে কামসূত্রে যখন চিত্রকলার উল্লেখ আছে তখন বাৎস্যায়নের পূর্ব্ব হইতেই চিত্রবিদ্যার সহিত চিত্রের ষড়ঙ্গও এদেশে প্রচলিত ছিল এটা সহজেই মনে হয়। অন্তত বাৎস্যায়ন যে সময়ে কামসূত্র রচনা করিতেছিলেন সে সময়ে চিত্রের এই ষড়ঙ্গ যে জনসাধারণের নিকট সুবিদিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা কামসূত্রের উপসংহারে বাৎস্যায়ন স্পষ্টই বলিয়াছেন "পূর্ব্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপসৃত্য চ। কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্॥" অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রের সংগ্রহ ও শাস্ত্রোক্ত বিদ্যাদির প্রয়োগ অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ ঐ সকল বিদ্যাদি কার্য্যত কি ভাবে লোকে প্রয়োগ করিতেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া যত্নপূর্ব্বক সংক্ষেপে আমি এই কামসূত্র রচনা করিলাম। ইহা ছাড়া, আমরা দেখিতেছি যে বহু প্রাচীন কাল হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর, চিত্রকলা-চর্চ্চায় বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে; যশোধর পণ্ডিত যিনি কামসূত্রের টীকাকার তিনি এই জয়পুরাধিপতি প্রথম জয়সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং চিত্রের যে ষড়ঙ্গ জয়পুর চিত্রকরগণের মধ্যে আবহমানকাল প্রচলিত ছিল সেটির সন্ধান পাওয়া যশোধরের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না; কাজেই চিত্রের ষড়ঙ্গ যশোধরের বা তাঁহার কোন ছাত্রের কপোল কল্পিত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। আমাদের ষড়ঙ্গ, যশোধরের বহু পূর্ব্বে প্রাচীন কাল হইতেই ভারত শিল্পীগণের নিকট সুবিদিত ছিল;—কেননা দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় ৪৭৯ হইতে ৫০১ শাতব্দীর মধ্যে চীন দেশে শিল্পাচার্য্য Hsich Ho চিত্রের যে ষড়ঙ্গ—Six canons লিপিবদ্ধ করেন তাহা কার্য্যত আমাদের ষড়ঙ্গেরই অনুরূপ। ইহা ছাড়া আমরা আরও দেখি যে, চীন দেশে ৩০০ খৃঃ অব্দে অমিতাভ বুদ্ধমূর্ত্তি সবপ্রথম চীন শিল্পী Tai Kuci গঠন করেন। সুতরাং Hsich Hoর পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সহিত আমাদের চিত্রের ষড়ঙ্গও চীন দেশে নীত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। চীন চিত্র-বিদ্যাটি Hsich Ho তিন কিম্বা চার কি পাঁচ ভাগে বিভক্ত না করিয়া ষড়ঙ্গে বিভক্ত করেনই বা কেন তাহাও দেখিবার বিষয়। Hsich Hoর লিখিত ষড়ঙ্গ চীনে



ভিক্ষার্থী বুদ্ধের সম্মুখে সন্তান ও জননী

(শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার প্রণীত "অজন্তা" গ্রন্থ হইতে)

জাপানে এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত-সমাজে প্রাচ্য শিল্পের মূলমন্ত্ররূপে যেরূপ আদর পাইয়াছে ও পাইতেছে আমাদের ষড়ঙ্গের অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই; এমন কি যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাচ্য শিল্প লইয়া আজকাল বিশেষ আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহই ভারতীয় চিত্রের ষড়ঙ্গটির এপর্য্যন্ত কোনো উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, অথচ প্রায় সমস্ত ভাষাতেই কামসূত্র ও তাহার টীকার অনুবাদ হইয়া গেছে। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ ও চীন এই দুই মহাদেশে প্রচলিত চিত্রের ষড়ঙ্গ দুইটি যে নিকট-আত্মীয় তাহা নিম্নলিখিত চীন-ষড়ঙ্গের অনুবাদের সহিত আমাদের ষড়ঙ্গটি মিলাইলেই বোঝা যায়।

চীন দেশের ষড়ঙ্গ যথা—

(1) Chi-yün Shêng-tung = Spiritual Tone and Life-movement.

(2) Ku-Fa yung-pi = Manner of brush-work in drawing lines.

(3) Ying-wu hasiang hsing = Form in its relation to objects.

(4) Sui-lei Fu-tsai = Choice of colours appropriate to the objects.

(5) Ching-ying Wei-chih = Composition and Grouping.

(6) Chuan-mo i-hsich = The copying of Classic Models.

জাপানের শিল্প-সম্বন্ধে মাসিক-পত্রিকা 'কোকা'র ২৪৪ সংখ্যায় চীন ষড়ঙ্গের উপরি-উক্ত ইংরাজী অনুবাদের সহিত চীন ভাষাবিদ্ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ও জাপানের সুবিখ্যাত শিল্পী স্বর্গগত ওকাকুরার অনুবাদের সম্পূর্ণ মিল নাই; সুতরাং সেগুলিও নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল যথা :—

GILES—(Introduction to the History of Chinese Pictorial Art Page 24) :—

(1) Rhythmic vitality, (2) Anatomical structure, (3) Conformity with nature, (4) Suitability of colouring, (5) Artistic composition, (6) Finish.

HIRTH—(Scraps from a Collector's Note book. Page 58) :—

(1) Spiritual Element, life's Motion, (2) Skeleton-drawing with the brush, (3) Correctness of Outlines, (4) The colouring to correspond to nature of objects, (5) The correct division of space. (6) Copying models.

PATRUCCI—(La philosophie de la Nature dans l'Art de l'Extrême-Orient Page 89):—

(1) La consonance de l'esprit engendre le mouvement [de la vie]

(2) La loi des os au moyen du pinceau.

(3) La forme représentée dans la conformité avec les êtres.

(4) Selon la similitude (des objects) distribuer la couleur.

(5) Disposer les lignes et leur attribuer leur place hiérarchique.

(6) Propager les formes en les faisant passer dans le dessin.

• BINYON—(The Flight of the Dragon Page 12):—

(1) Rhythmic vitality, or Spiritual Rhythm expressed in the movement of life.

(2) The art of rendering the bones or anatomical structure by means of the brush.

(3) The drawing of forms which answer to natural forms.

(4) Appropriate distribution of the colours.

(5) Composition and subordination or grouping according to the hierarchy of things.

(6) The transmission of classic models.

OKAKURA—(Ideals of the East Page 52):—

(1) The Life-movement of the spirit through the Rhythm of things...the great Mood of the Universe, moving hither and thither amidst those harmonic laws of matter which are Rhythm.

(2) The Law of Bones and Brush work. The creative spirit, into a pictorial conception must take upon itself organic structure.

চীনদেশের ষড়ঙ্গটি নানা মুনির নানা মতের কুহেলিকার ভিতর দিয়া কেমন ভাবে প্রকাশ পাইতেছে ও দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সেটা কি ভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা যদিও আমাদের দেখিবার বিষয় এবং প্রাচ্য জগতের দুই মহাদেশে প্রচলিত দুই ষড়ঙ্গের মধ্যে কোনটা প্রাচীনতর তাহারও মীমাংসা করা যদিও আমাদের কর্ত্তব্য তথাপি চিত্র ও তাহার ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে যে স্বাধীন চিন্তা ও ধ্যানাদি বাৎস্যায়নের বহু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল তাহারই যথাসম্ভব আলোচনা আমাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

পঞ্চদশীর চিত্রদীপ অধ্যায়ে শাস্ত্রকার চিত্রপটের অবস্থা চতুষ্টয় দিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নির্ণয় করিতেছেন। চিত্রকলা নিশ্চয়ই আমাদের দেশে সখের খেলা ছিল না,—আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের সহিত তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। চিত্রকলাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে চক্ষে দেখিতেন এক চীন ও জাপান ছাড়া আর কোনো জাতি যে সে চক্ষে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না। আমাদের নিত্য-কর্ম্মের ভিতরে চিত্র ও আলিম্পন ইত্যাদির যেরূপ অধিকার দেখা যায় তাহাতে চিত্রের এই ষড়ঙ্গটির প্রয়োগ বহুকাল হইতে যে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল এবং সেটার সম্বন্ধে একটা চর্চ্চা এখনকার কালেও যে আমাদের প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য; এবং আমরা নূতন করিয়া

তেমনি চিত্রের ষড়ঙ্গটির সঙ্গেও নূতন করিয়া আর-একবার পরিচয় করিয়া লওয়া আমাদের আবশ্যক বোধে ইংরাজি অনুবাদের সহিত ইহা প্রকাশ করিতেছি, যথা :—

(১) রূপভেদাঃ—Knowledge of appearances. (২) প্রমাণানি—Correct perception, measure and structure of forms. (৩) ভাব—The action of feelings or forms. (৪) লাবণ্য যোজনম্—Infusion of grace, artistic representation. (৫) সাদৃশ্যং—Similitudes. (৬) বর্ণিকাভঙ্গ—Artistic manner of using the brush and colours.

চিত্রযোগের এই ষড়ঙ্গসাধনের যথাসাধ্য বিশদ্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভারত ও চীন শিল্পাচার্য্যগণের নির্দ্দিষ্ট দুই পন্থার পার্থক্য কতখানি সেটা জানা আবশ্যক। আমরা দেখিতেছি—ষড়ঙ্গ দুইটি পর্য্যায়ক্রমে পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে মিল না থাকিলেও সুরের একটা সামঞ্জস্য ধরিয়া লওয়া চলে। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটিই যে একই বস্তু তাহা বলা চলে না। নদীর এপার ওপার দুই পারকে যেমন একই পার বলিতে পার না, তেমনি চিত্রসম্বন্ধে চিন্তা-প্রবাহটির দুই পারে যে এই দুইটি ষড়ঙ্গ তাহাদের একই বস্তু বলা যায় না। আমাদেরটি যেন কর্ম্মের পার ও তাহাদেরটি যেন মর্ম্মের পার,—মাঝ দিয়া চিত্রসম্বন্ধে চিন্তা-প্রবাহটি কখনো এপার কখনো ওপার স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। আমাদের পারের পথটি রূপ-নারায়ণের বাঁধা ঘাটে গিয়া মিলিয়াছে আর ওপারের পথ সেই আঘাটাতে গিয়া মিশিয়াছে জীবনের অপরূপ ছন্দটি যেখানে উঠিতেছে, পড়িতেছে।

ভারতের ষড়ঙ্গটি যেমন বাঁধা-ঘাটের মত সুচারুভাবে ধাপে ধাপে সজ্জিত ও সুনির্ম্মিত—চিত্রের সবটুকু সেখানে যেমন বাঁধিয়া ছাঁদিয়া যেটির পর যেটি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, চীন ষড়ঙ্গটি মোটেই সেরূপ নয়। সেখানে ছাঁদের সঙ্গে বাঁধকে জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই,কাজেই আমাদের মন সেখানে অনেকটা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে এবং একটা বাঁধা-গণ্ডির ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। ভারতের ষড়ঙ্গটি যেন চিত্রের দিক দিয়া, আর চীন ষড়ঙ্গটি যেন চিত্রকরের দিক দিয়া ব্যাপারটার মীমাংসা করিতে চলা। চিত্র যখন আমাদের সম্মুখে রূপ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ভারত ষড়ঙ্গটি যেন তখনকার ইতিহাস, আর, চীন ষড়ঙ্গটি যেন সেখানকার কথা যেখানে চিত্রটির প্রাণের ছন্দ মহাশক্তিরূপে বিদ্যমান আছেন।

দুইটি ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ এই পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে যেটুকু মিল বা যেটুকু অমিল দেখা যায় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য হয় না কিন্তু ষড়ঙ্গ দুইটির শীর্ষস্থান যেমন—'রূপভেদাঃ' এবং Rhythmic Vitality (প্রাণছন্দ) —এই দুইটিতে যে আড়াআড়ি তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এখন বিচারের বিষয় এই যে, ছন্দ—যাহাকে চীন-শিল্পাচার্য্য চিত্রের প্রাণস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন সেই যথার্থই প্রয়োজনীয় কথাটি আমাদের ষড়ঙ্গকার উল্লেখ মাত্র না করিয়া

রূপভেদকেই প্রাধান্য দেন কেন? আমাদের আচার্যগণ, দেখিতে পাই, যখন যে তত্ত্বটি লইয়া পড়িয়াছেন তখন সেটির গভীর হইতে গভীরতর, সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্ম দিকটি পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন, কেবল আলেখ্য-তত্ত্বের বেলাই তাহার ব্যতিক্রম হয় কেন? আমাদের ষড়ঙ্গ সূত্রটি যে কোনো-বৃহৎ-এক সূত্রের অংশ মাত্র তাহা বলা চলে না, কেননা স্পষ্টই বলা হইয়াছে 'ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্'—চিত্রের এই ছয় অঙ্গ—ইহা ছাড়া আর নাই। ছয়ের উপর আরো কয় আমরা অপেক্ষাকৃত শিথিল-ভাবে-গ্রথিত চীন ষড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারি কিন্তু আমাদের ষড়ঙ্গে কোথাও সেরূপ শিথিলতা নাই যাহাতে শাস্ত্রকার যাহা বলিতে চাহেন নাই তাহাও সূত্রটিতে আমরা আরোপ করিয়া দিব।

প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ এই পাঁচ সাক্ষী এবং রূপভেদ এই সুমেরুটি দিয়া ষড়ঙ্গের যে জপ-মালাটি চিত্রসাধনার জন্য আমাদের শাস্ত্রকার গাঁথিয়া দিয়াছেন সে মালায় কোন্ মন্ত্র জপ করিবার উপদেশ রহিয়াছে তাহাই দেখিবার বিষয়। মালা ফিরাইবার কালে সাধকের অঙ্গুলি সুমেরু হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক সাক্ষীকে স্পর্শ করিয়া আবার সুমেরুতেই গিয়া বিশ্রাম করে,—সুমেরুতেই জপের গতি আরম্ভ এবং সুমেরুতেই আসিয়া জপের মুক্তি বা স্থিতি। এখন দেখা যাইতেছে যে, চিত্রের গতি মুক্তি ষড়ঙ্গের সুমেরুতেই; সেই সুমেরু আমাদের শাস্ত্রকারের মতে 'রূপভেদাঃ' আর চীন-শাস্ত্রকারের মতে Rhythmic Vitality বা জীবন-ছন্দ। এখন এই দুই সুমেরু একই পদার্থ কি না, অথবা একই পর্ব্বতের এপিঠ ওপিঠ কি না—সেটাই জানা আবশ্যক।

'রূপভেদ' আমাদের এবং 'জীবন-ছন্দ' চীনের যে মূলমন্ত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। রূপ এবং প্রাণ এই দুইটিই চিত্রের গোড়া এবং শেষ;—প্রাণ প্রকাশ পাইবার জন্য রূপের আকাঙ্ক্ষা রাখে, রূপ বর্ত্তিয়া রহিবার জন্য প্রাণের প্রতীক্ষা করে। শুধু রূপ লইয়া চিত্র হয় না, শুধু প্রাণ লইয়াও চিত্র হয় না। যদি বলা যায় শুধু রূপ তবে ভুল হয়, যদি বলা যায় শুধু প্রাণ তবেও ভুল হয়! এই জন্য চীন ষড়ঙ্গকার Vitality বা প্রাণের সঙ্গে Rhythm অর্থাৎ ছন্দ বা ছাঁদটি জুড়িয়া উভয় দিক বজায় রাখিয়াছেন, আর আমাদের ষড়ঙ্গকার শুধু 'রূপ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন না, বলিলেন 'রূপভেদাঃ'!

এখন এই 'ভেদ' কথাটি প্রয়োগের সার্থকতা বুঝা অথবা না-বুঝার উপরে আমাদের ষড়ঙ্গের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

যদি আমরা রূপভেদের অর্থ ধরি তাবৎ সৃষ্টবস্তুর বিভিন্নতা, তবে আমাদের ষড়ঙ্গটি নির্জীব ও জড়সাধনার উপায় হইয়া পড়ে; কিন্তু চিত্র তো জড় সামগ্রী নহে। চিত্র যে রচে এবং চিত্র যে দেখে উভয়ের জীবনের সহিত চিত্রিতের আত্মীয়তা, তা ছাড়া, চিত্রের নিজেরও একটা সত্তা আছে; সুতরাং রূপ-ভেদের অন্য অর্থ হওয়া সম্ভব কিনা তাহা দেখা কর্ত্তব্য। 'ভেদ' শব্দ বিভিন্নতা বুঝাইতেই সাধারণত ব্যবহার করা হয়, আবার হিন্দুস্থানীরা ভেদকে বস্তুর মর্ম্ম বা রহস্য

বলিয়া জানে। এখন 'রূপভেদাঃ' বলিতে এরূপে-ওরূপে ভেদাভেদ ইহা হইতে পারে কিম্বা রূপের মর্ম্মভেদ বা রহস্য-উদ্ঘাটন—ইহাও হয়। "সদ্গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে"! কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে যে সদ্গুরু চিত্রের ষড়ঙ্গে 'রূপভেদাঃ' এই কথাটি বসাইয়াছেন তিনি রূপভেদের ভেদ বা রহস্যটুকু আমাদের খুলিয়া বলেন নাই; কিন্তু তথাপি রহস্যটুকু আমরা যে ধরিতে পারিতেছি না, এমন নয়।

চিত্রকে আমাদের ষড়ঙ্গকার যে সজীব বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহার প্রমাণ ষড়ঙ্গেই বিদ্যমান,—চিত্রের ছয় অংশ নয়, ছয় দিকও নয়, ছয় অঙ্গ! আমাদের হাত-পা ইত্যাদির মত শক্তিশালী ছয় অঙ্গ দান করিয়া তবে ষড়ঙ্গকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। শুধু ইহাই নয়; ষড়ঙ্গটির রচনা-প্রণালী দেখিলেও চিত্রটাকে ষড়ঙ্গকার যে একটা জীবন শক্তির প্রকাশ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং সেই প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া ষড়ঙ্গ-সূত্রটিকে একটা সজীবতা দিয়া গড়িয়া যাওয়াই যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তাহাও বেশ বোঝা যায়। ষড়ঙ্গ-সূত্রটিকে ব্যাকরণের একটি নির্জীব সূত্রের মত করিয়া ষড়ঙ্গকার গড়িয়া যান নাই; চিত্র যে ছয়ের সমষ্টি সেই ছয়টিকে কোন প্রকারে কথায় গাঁথিয়া একটি সূত্র রচনা করাই যদি ষড়ঙ্গকারের উদ্দেশ্য হইত তবে আমরা দেখিতাম যে ব্যাকরণের 'সহর্ণের্ঘ্যঃ" সূত্রের মত ষড়ঙ্গটি খুব ছোট কাজেই দুর্বোধ আকারে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এখানে দেখিতেছি ষড়ঙ্গের একটি অঙ্গের সহিত আরেকের যোগ এবং সম্বন্ধ ইত্যাদি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া, যেটির পরে যেটি আসা উচিত, যেখানে যাহার স্থান সেইরূপভাবে তাহা সাজাইয়া, চিত্রের যেন একটা সজীব মন্ত্রমূর্ত্তি খাড়া করা হইয়াছে। ষড়ঙ্গের সমস্তটির ভিতরে ছন্দের স্রোত বহাইয়া রূপভেদকে প্রমাণ ভাবকে লাবণ্য সাদৃশ্যকে বর্ণিকাভঙ্গ দিয়া ও সকল অঙ্গের সহিত সকলের একটি অকাট্য ও অবিরোধ সম্বন্ধ ঘটাইয়া ষড়ঙ্গটিকে এমন একটা পরিমিত গতি ও ভঙ্গী দেওয়া হইয়াছে যে ষড়ঙ্গটি একটা ছন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন্তরূপে আমাদের কাছে প্রকাশ না পাইয়া থাকিতে পারে না।

রূপ প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা করে, সুতরাং প্রমাণ আসিয়া রূপে মিলিয়াছে। অমনি ভাবের উদয়, লাবণ্যের সঞ্চার, সাদৃশ্যের গলাগলি ও বিচিত্র রঙ্গ ভঙ্গ! যেন নট ও নটী আমাদের চোখের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে! ষড়ঙ্গটির এই স্বচ্ছন্দ গতিই সাক্ষ্য দিতেছে যে আমাদেরও ষড়ঙ্গের মূলে প্রাণের ছন্দ তরঙ্গায়িত এবং রূপভেদের অর্থ শুধু আকারের বিভিন্নতা দেওয়া বা বোঝা নয় কিন্তু আকার কোথায় সজীব, কোথায় নির্জীব রূপে দেখা যাইতেছে তাহাই বোঝা ও বোঝানো।

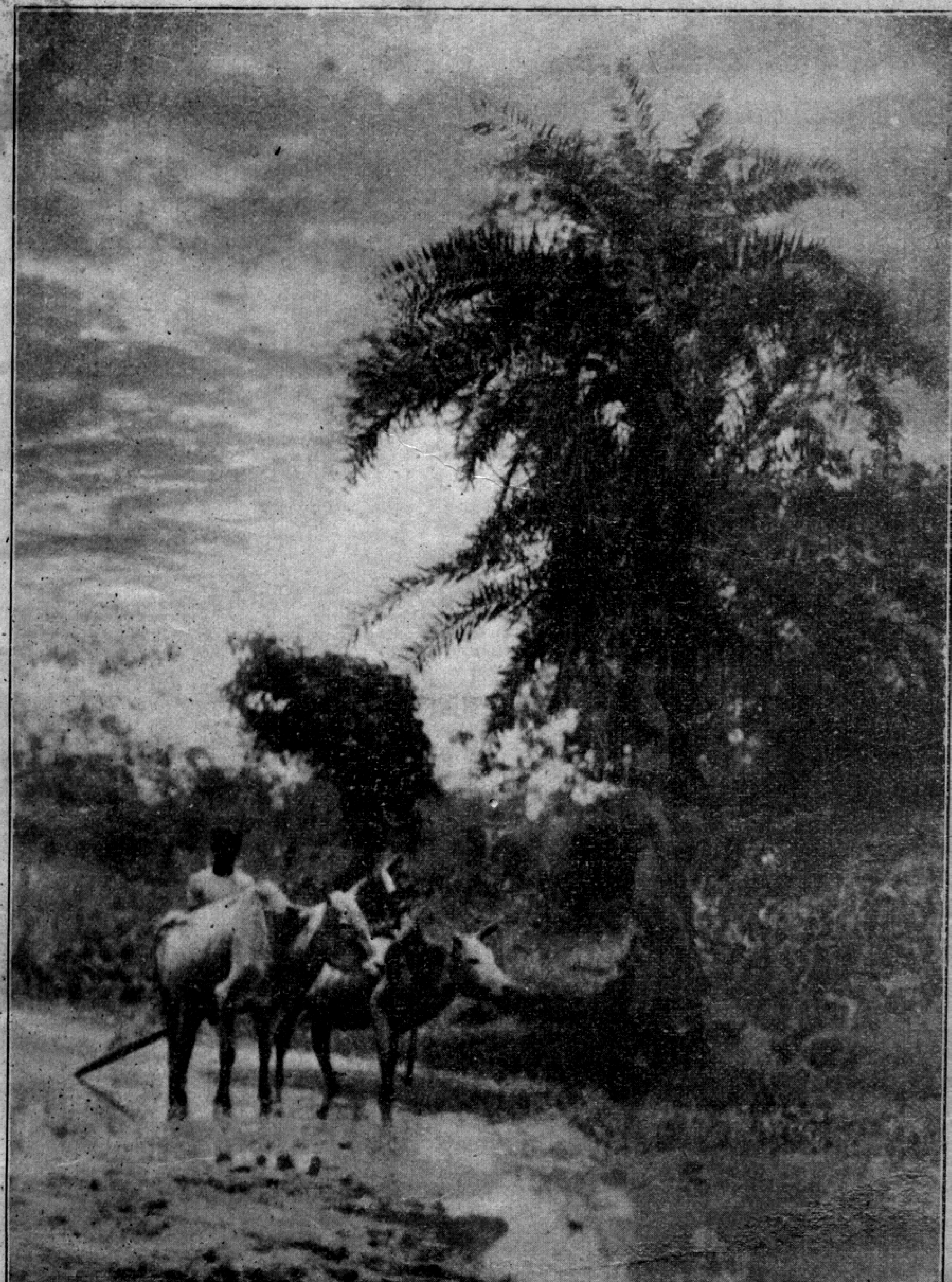
চেতন অচেতন উৎপত্তি নিবৃত্তি ইহারি ছন্দে বিশ্বজগৎ বাঁধা। তেমনি জীবিত রূপ ও নির্জীব রূপ ইহারই লয়ে আমাদের ষড়ঙ্গটি বাঁধা। বস্তুরূপটি চেতনার স্পর্শে কখন্ কোথায় প্রাণবান কোথায় বা চেতনার অভাবে সেটি ম্রিয়মাণ ইহাই আমাদের ষড়ঙ্গের মূল মন্ত্র। আর ষড়ঙ্গের গোড়াতেই যে 'ভেদ' আর সব শেষে যে 'ভঙ্গ' শব্দ দুইটি

রাখা হইয়াছে তাহারাই হইতেছে আমাদের ষড়ঙ্গ মন্ত্রণাগারের দুই কুলুপ অথবা ডবল তালাবদ্ধ দুই কবাট; ইহারি মধ্যে রূপকথার 'প্রাণ ভৃঙ্গের' মত ষড়ঙ্গের ছয় কৌটার অন্তরালে চিত্রের ও চিত্রকরের প্রাণের রহস্যটুকু গোপন রহিয়াছে। ভেদ আর ভঙ্গ দুই কবাটকে বাহিরের দিকে টানিয়া মিলাইলে বাহিরটাই দেখা যায়, মন্দিরের ভিতরটা আড়াল পড়ে, আবার সে দুটিকে একটু কষ্ট করিয়া ঠেলিয়া ভিতরের দিকে প্রবেশ করাইলে ভিতর বাহির হইয়া পড়ে বাহিরটা ভিতরে গিয়া মেলে। এই ভেদ আর ভঙ্গের ওঠা-পড়ার ছন্দটিই হচ্ছে ষড়ঙ্গের মরণ-বাঁচনের কাঠি এবং এই কাঠির স্বচ্ছন্দ প্রয়োগেই চিত্রকরের গুণপনা। তা ছাড়া ষড়ঙ্গকার 'যোজনম্' এই শব্দটি ষড়ঙ্গের ঠিক হৃদয়ের মাঝখানটিতে বসাইয়াছেন; ষড়ঙ্গের মস্তিষ্কে ভেদাভেদ জ্ঞান, দুই পায়ের গতি স্থিতি মাঝে, যোগানন্দের হৃদয়-গ্রন্থিটি দিয়া দুইকে এক করা হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রণালীতেও আলেখ্যের গোড়ার কথা হচ্ছে—Contrast, Unity, Variety অথবা ভেদ, যোজন ও ভঙ্গ বা ভেদ ও ভঙ্গের যোগসাধন পরিণয়।

ভেদ আর ভঙ্গের মাঝে যোজনম্ কথাটি যেন সাদা কালো জুড়ি ঘোড়ার মুখের লাগাম! ডাহিনের ঘোড়া ডাহিনে যাইতে চাহিতেছে, বামের ঘোড়া বামেই দৌড়িতে চাহিতেছে, রথ আর কোন দিকে অগ্রসর হইতেছে না, যেমনি যোজনের লাগামের টান পড়িয়াছে অমনি দুই ঘোড়ার মুখ এক হইবার দিকে ঝুঁকিয়া আসিয়াছে এবং সাদা কালো দুই ঘোড়া পাশাপাশি ভঙ্গী সহকারে সারথির মনোমত স্বচ্ছন্দ গতিতে মনোরথকে টানিয়া চলিয়াছে।

সারথি যেমন লাগামের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছাশক্তিটুকু সঞ্চালিত করিয়া দুই অশ্বের, উদ্দাম গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া, যান, বাহন ও নিজের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক স্থাপন করেন শিল্পীও তেমনি বর্ণিকা বা বর্ণবর্ত্তিকা—আমরা যাহাকে বলি তুলি তাহারই টানটোনের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছা-শক্তি বা বাসনাকে প্রবাহিত করিয়া বিশ্বচরাচরের সহিত নিজের সৃষ্টি যে চিত্র এবং নিজেকেও এক ছাঁদে বাঁধিয়া চলেন; এই কথা চীন ষড়ঙ্গকার স্পষ্ট করিয়া জোর করিয়া বলিয়াছেন আর আমাদের ষড়ঙ্গকার সেই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া ঠারে ঠোরে বলিতেছেন। চিত্রের সহিত, চিত্র যে দেখে, চিত্র যে লেখে, এবং চিত্রে যাহাদের লেখা যায় তাহাদের পরস্পরের প্রাণের পরিচয় ঘটানোই দুই ষড়ঙ্গ সাধনারই চরম লক্ষ্য।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



ক্ষেতের পথে

শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

ব্রাহ্মণ মহাসভা

কালীঘাটে সম্প্রতি বাঙ্গলার মহাব্রাহ্মণ-মণ্ডলী যে মহাগর্জ্জন করেছেন তাতে আমাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই! কেননা সে গর্জ্জনের অনুরূপ বর্ষণ হবে না; কিন্তু লজ্জিত হবার কারণ আছে, কেননা শাস্ত্রে বলে—বহু আরম্ভে লঘু ক্রিয়া অজা-যুদ্ধেই শোভা পায়। মানুষে ওরূপ ব্যবহার করলে, মানুষের তাতে হাসিও পায়—কান্নাও পায়।

আমি বিলেত-ফেরৎ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজের নাম-কাটা সেপাই; কিন্তু নাম-কাটা হলেও সেপাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা কালীঘাটে যে প্রহসনের অভিনয় করেছেন, তার জন্য লজ্জিত হবার আমার অধিকার আছে। শুধু তাই নয়, আমি ইংরাজি-শিক্ষিত এবং বাঙ্গালী, এবং এই দুই কারণেই এই বিনা-মেঘে গর্জ্জনরূপ ব্যাপারটিতে আমি ভীত না হই, স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

(১)

আমার একটি বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান কায়স্থ বন্ধু আমার প্রতি কটাক্ষ করে এই কথা বলেন যে, ব্রাহ্মণ যথেষ্ট ইংরাজি শিক্ষা লাভ করলেও, বিলেত গেলেও, তার ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার এবং তজ্জনিত মানসিক সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করতে পারে না। আমার অপরাধ এই যে, ব্রহ্মবিদ্যা যে ক্ষত্রিয়ের আবিষ্কার এবং কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমি ইতস্ততঃ করি। আমার বিশ্বাস,—সে আমি ব্রাহ্মণ বলে নয়, আইন ব্যবসায়ী বলে। কিসে কি প্রমাণ হয়, আর না হয়, সে বিষয়ে আমার কতকটা জ্ঞান আছে। সে যাই হোক, পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ যে কতক পরিমাণে সত্য, এ কথা কোনও ব্রাহ্মণ-সন্তান পৈতা-ছুঁয়ে অস্বীকার করতে পারবেন না। জাত্যভিমান আমাদের মনের কোণে, অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে এবং সময়ে অসময়ে বের হয়ে পড়ে। কুল-গৌরব করাটা এদেশে যদি কারও পক্ষে মার্জ্জনীয় হয় ত সে ব্রাহ্মণের পক্ষে। আমি জানি যে, আমরা যে মুনিঋষিদের বংশধর এ কথা আজকাল নির্ভয়ে বলা চলে না। কেননা তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন কিম্বা ক্ষত্রিয় ছিলেন তাই নিয়ে এমন একটি তর্ক উত্থাপিত করা হয়েছে যার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমাদের জাতিগৌরব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে এ মামলার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবার দরকার নেই। উপনিষদ, ক্ষত্রিয়ের পৈতৃক সম্পত্তি হলেও, ব্রাহ্মণে তা এতকাল ধরে ভোগদখল করে আসছেন যে সে দখলী সত্ব নষ্ট করবার জন্য কোনো পুরাণো দলিল দস্তাবেজ আর সমাজের আদালতে গ্রাহ্য হবে না। বহুকাল ধরে যে যোগসূত্র হিন্দুর অতীতকে তার বর্ত্তমানের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে—সে হচ্ছে যজ্ঞসূত্র। দূর অতীতের কথাও ছেড়ে দিলে, এ সত্য কারও অস্বীকার করবার যো নেই যে, ভারতবর্ষের সাতশ বৎসর ব্যাপী ঘোর অমানিশার মধ্যে যে জাতি বিদ্যার ঘীয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, অশেষ দুঃখ দৈন্য নৈরাশ্যের মধ্যে যে জাতি সাগ্নিকের অগ্নির মত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন, সে জাতির

নিকট ভারতবর্ষ চিরঋণী হয়ে থাকবে। হিন্দুজাতির মন নামক পদার্থটি যে এতদিন রক্ষিত হয়েছে, সে হচ্ছে ব্রাহ্মণের বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গুণে। সুতরাং হিন্দুমাত্রেরই নিকট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথা প্রামাণ্য না হলেও মান্য। সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে আজ অনাবশ্যকে নব্যশিক্ষিতসম্প্রদায়ের নিকট নিজেদের উপহাসাস্পদ করেছেন, এতে আমার জাত্যভিমানে আঘাত লাগে। শিষ্টের পালন ও দুষ্কৃতের শাসনের জন্য কালীঘাটে সভা আকারে অবতীর্ণ হয়ে নানারূপ লীলাখেলা কর্‌বার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এটি স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হলে, ভগবান আর যে রূপ ধারণ করেই অবতীর্ণ হোন না কেন, ইতিপূর্ব্বে কখনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ হন্‌নি। এ ভুল তাঁরা কখনও কর্‌তেন না, যদি না এ ব্যাপারে জনকয়েক ইংরাজি-শিক্ষিত বিষয়ী ব্রাহ্মণের প্ররোচনা এবং পৃষ্ঠ-পোষকতা থাকত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অবশ্য জানেন যে তাঁরা সমাজের শাসক নন, শাস্ত্রী;—তাঁরা ধর্ম্মের রক্ষক নন, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের রক্ষক। এক কথায় তাঁরা শুধু সমাজের Books of Reference, বড় জোর Guide Book। ধর্ম্মের উচ্চ আদালত গড়ে তাতে ফুলবেঞ্চ বসানো এঁদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র;—কারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যা খুসি তাই ডিক্রী দিতে পারেন, কিন্তু সে ডিক্রী সমাজের উপর জারি করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। উদাহরণস্বরূপে দেখান যেতে পারে যে, সমুদ্রযাত্রারূপ অপরাধের জন্য, আমার জ্ঞাতিকুটুম্বেরা যখন আমাকে সমাজচ্যুত করেন, তখন যদি আমি কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করে, নবদ্বীপ হতে, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এই মর্ম্মে একটি পাঁতি নিয়ে গিয়ে তাঁদের সুমুখে উপস্থিত হতুম, তা হলে তাঁরা সে বিধান সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর্‌তেন। বিষয়ী ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবনযাত্রা, বিষয়ী ব্রাহ্মণের দক্ষিণার উপরে নির্ভর করে; কারণ পণ্ডিতেরা গৃহস্থ; বিষয়ী নন্। আমি ইংরাজি-শিক্ষিত বলে, এ ব্যাপারে লজ্জিত, কেননা আমাদের একদলের প্রলোভনে পড়েই পণ্ডিত-সম্প্রদায় এই সব অযথা তর্জ্জন গর্জ্জন করেছেন।

ইংরাজি-শিক্ষিত ধর্ম্ম-রক্ষকেরা নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি, চরিত্র এবং অবস্থা অনুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু মোটামুটি ধরতে গেলে এঁদেরও চার বর্ণে বিভক্ত করা যায়।

যাঁরা হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন তাঁরা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। শুনতে পাই হার্বার্ট স্পেন্সর এঁদের গুরু। এঁরা প্রচার করেন যে, মনোজগৎ জড়জগতের অধীন, জড়জগৎ মনোজগতের নয়; অতএব যে সমাজ যত জড় সে সমাজ তত আধ্যাত্মিক। সুতরাং জড় বস্তুর নিয়মে এঁরা সমাজকে বাঁধতে চান, মানুষকে জড়ে পরিণত কর্‌তে চান। সাহিত্যে এই ব্রাহ্মণ পাচকের দল, সংস্কৃত শাস্ত্র এবং ইংরাজি বিজ্ঞান একত্র ঘেঁটে নিত্য খিচুড়ি পাকান, যাতে না আছে নুন্, না আছে ঘী, না আছে মশলা। সে খিঁচুড়ি গলাধঃকরণ করা, আর না করা, আমাদের স্বেচ্ছাধীন। এঁদের পাণ্ডিত্যের উপদ্রব, বাঙ্গালীর মনের উপর,

সমাজের উপর নয়। এঁরা যে কথা নিজে বিশ্বাস করেন না তাই অপরকে বিশ্বাস করাতে চান ;—অবশ্য লোক-হিতের জন্য।

আর একদল আছেন, হিঁদুয়ানি করা যাদের ব্যবসা। এঁরা হচ্ছেন বৈশ্য। এ শ্রেণীর লোক সমাজে চিরকাল ছিল এবং থাকবে ;—এঁরা সকলের নিকটেই সুপরিচিত, সুতরাং এঁদের বিষয় বেশি কিছু বলবার নেই। তবে কালের গুণে এঁদের ব্যবসা নতুন আকার ধারণ করেছে। এঁরা হিঁদুয়ানির লিমিটেড কোম্পানী করে বাজারে ধর্ম্মের সেয়ার বেচেন ;—অবশ্য গো ব্রাহ্মণের হিতের জন্য।

আর একদল আছেন, যাঁদের পক্ষে সমাজের বিধি-নিষেধের দাসত্ব করা স্বাভাবিক ;—এঁরা শূদ্র। এঁরা একটা কিছু না মেনে চল্‌লে, চলতে পারেন না ; এঁরা ভালবাসেন পরের দ্বারা যন্ত্রের মত চালিত হওয়া। এঁরা তর্কযুক্তিকে ভয় পান ; এঁরা আদেশের বশবর্ত্তী বলে কারও উপদেশ কানে তোলেন না। এঁরা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করেন,—নির্ব্বিচারে তার নিয়ম পালন করে'। এঁরা নিজে শাসিত হতে চান্‌, পরকে শাসন করতে চান না।

আর একদল হচ্ছে নব্য-ক্ষত্রিয় ; এঁরাই হচ্ছেন সকল নাটের গুরু। এঁরা শূদ্রের ন্যায় স্বর্গে যাবার সস্তা টিকিট স্বরূপে টিকি শিরোধার্য্য করেন না—করেন ধর্ম্মের ধ্বজা স্বরূপে, এবং তারই আস্ফালন করে' বীরত্বের পরিচয় দেবার জন্য। এঁদের বিশ্বাস, এঁদের মস্তকের শিখা চাণক্যের শিখা ;—যাতে গিঁট বাঁধলেই আমাদের মত প্রকাশ্য অনাচারীদের বংশ সবংশে উৎসন্ন হয়ে, অনাচারীদের গুপ্ত বংশ সমাজের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হবে। সে যাই হোক্, এঁদের ধর্ম্ম হচ্ছে, শুধু ভ্রাতৃবিরোধের সৃষ্টি করা। ধর্ম্মক্ষেত্রে একটা কুরুক্ষেত্তর না বাধিয়ে এঁরা স্থির থাক্‌তে পারেন না। অথচ এঁদের নব্য-তান্ত্রিকদের শাসন করবার ইচ্ছা যদ্রূপ, ক্ষমতা তদ্রূপ নেই। যাঁরা জুতো পায়ে দিয়ে জল খান, সেই মহাপতকীদের সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য বাঙ্গালী-সমাজের এই ধনুর্দ্ধরেরা সুমুখে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-রূপ শিখণ্ডী খাড়া করে তার পশ্চাৎ থেকে যে বাণ নিক্ষেপ করেছেন তাতে সে সম্প্রদায় যে আজ জুতো পায়ে দিয়ে শরশয্যায় শয়ান হয়ে, "জল" "জল" বলে চীৎকার কর্‌ছেন, তার ত কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রমাণ শুধু এরই পাওয়া যায় যে, এদেশে আজও এমন এক শ্রেণীর ভদ্র সন্তান আছেন, যাঁরা রীতিকে যতই নিরর্থক হোক নীতির অপেক্ষা, মিথ্যাকে যতই স্পষ্ট হোক সত্যের অপেক্ষা, আচারকে যতই কদর্য্য হোক সততার অপেক্ষা উচ্চ আসন দিতে লজ্জা বোধ করেন না। এরা সভা করে এই মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে চান যে, সামাজিক কপটতাই হচ্ছে সামাজিক ধর্ম্ম, অতএব আচরনীয়। অবশ্য লোকে বলে যে "ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না" কিন্তু ও কাজ করলে শিবের বাবা টের না পেতে পারেন্ কিন্তু শিব যে পান না, এ কথা কোন শাস্ত্রেই বলে না। যে যুগে সমগ্র শিক্ষিত সমাজের সকল চিন্তা, সকল যত্ন হচ্ছে জাতি গঠনের দিকে, সেই যুগের সেই সমাজের জনকয়েকের চেষ্টা যে

শুধু জাত মারবার দিকে, এর চাইতে ক্ষোভের বিষয় আর কি হতে পারে! অবশ্য এঁদের ছোঁড়া সংস্কৃত অক্ষরাঙ্কিত কাগজের গুলির ঘায়ে, কেউ আর বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌বেন না! কিন্তু সেই কারণেই ব্যাপারটি নিতান্ত হাস্যকর। তাঁদের হাতেই হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্‌ছে, যাঁদের চেষ্টা হচ্ছে সমগ্র হিন্দু সমাজকে একটি একান্ন-বর্ত্তী পরিবার করে তোলা। আর যাঁরা ছোঁয়ানাড়ার বিচার নিয়েই আছেন, যাঁদের চেষ্টা হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে চুলো পৃথক করে নেওয়া, তাঁদের হাতে পড়লে সমাজ চুলোয় যাবে।

(৩)

ব্রাহ্মণ মহাসভার এই লম্ফঝম্ফের দরুণ আমি বিশেষ লজ্জিত, কারণ আমি বাঙ্গালী। এই সব ছেলেখেলা আর-যারই পক্ষে শোভা পাক না কেন, বাঙ্গালীর পক্ষে শোভা পায় না। কারণ একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, বাঙ্গালী ভারতবর্ষে নূতন প্রাণ এনেছে, সমগ্র ভারত-বাসীকে নতুন সুর ধরিয়ে দিয়েছে। ইউ-রোপের কাব্য, ইউরোপের দর্শন, ইউরোপের বিজ্ঞান, বাঙ্গালীর মনে অইলক্লথের উপর জলের মত গড়িয়ে যায় নি; অল্প বিস্তর সে মনকে আর্দ্র ও সরস করে তুলেছে। অপর-দিকে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন সম্পূর্ণ অভিভূতও হয়ে পড়েনি। ইংরাজি সভ্যতার দুর্ব্বার শক্তি আমরা কতক পরিমাণে আয়ত্বও কর্‌তে পেরেছি। আমরা কতক বাধ্য হয়ে, কতক স্বচ্ছন্দ চিত্তে আমাদের এর কারণ, এই নব সভ্যতার শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য আমাদের মন প্রস্তুত ছিল।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা তিনটি মনো-ভাবের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা! এ তিনেরই বীজ-মন্ত্র, চৈতন্য বাঙ্গালীর কানে দিয়ে গেছেন। তিনি আপামরচণ্ডালকে কোল দিয়ে সাম্যের প্রতি, প্রেম ভক্তির উদ্বোধন করে মৈত্রীর প্রতি, এবং লোকাচারের অধীনতা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে স্বাধীনতার প্রতি বাঙ্গালীর মনকে অনুকূল করে গেছেন। তিনি যে উষর ক্ষেত্রে বীজ বপন করেন নি তার প্রমাণ, বাঙ্গলার অধিকাংশ লোক আজ চৈতন্য-পন্থী বৈষ্ণব এবং এই নতুন পন্থার প্রদর্শক তাঁদের কাছে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলে গ্রাহ্য। যে স্বল্প সংখ্যক লোকের মতে তিনি "ন চ পূর্ণ নচাংশ চ" তাঁদেরও যে চৈতন্য চেতন করে তোলেন নি—এ কথাও বলা চলে না। চৈতন্য কখনও ধর্ম্ম শাস্ত্রের দোহাই দেনও নি, মানেনও নি। এর জন্য অবশ্য তাঁর সমসাময়িক শাস্ত্রব্যবসায়ীরা তাঁকে বিধিমত জ্বালাতন কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি ভগবদ্ভক্তিকে মৃগী বলে, তাঁরা শচীমাতাকে, ওঝা ডাকিয়ে মহাপ্রভুকে ঝাড়াফুঁকো কর্‌বার, ব্যবস্থা দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য যে ভাবের বন্যা এনেছিলেন তাতে সমগ্র দেশ ভেসে গেছে;—শাস্ত্রের বাঁধ তাকে আটকে রাখ্‌তে পারে নি। ভারতবর্ষে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে 'যুগধর্ম্ম' বলে যে একটি জিনিষ আছে সে কথা স্বজাতিকে বুঝিয়ে দেন। এই "যুগ-

বিভিন্ন। শাস্ত্রের ধর্ম্ম হচ্ছে অতীতের "যুগ-ধর্ম্ম"; সুতরাং বর্ত্তমানের "যুগধর্ম্ম" শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অধীন হতে পারে না। আমরা বাঙ্গলা দেশের নব্য-তান্ত্রিকেরা বর্ত্তমানের "যুগধর্ম্ম" অনুসারেই জীবন গঠন করবার চেষ্টা কর্‌ছি। সে জীবন শাস্ত্রের দ্বারা কেউ সম্পূর্ণ শাসিত করতে পারবে না।

যদি কেউ বলেন যে, স্বয়ং চৈতন্যও যখন এ সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়্‌তে পারেন নি, তখন তোমরা কি ভরসায় হিন্দু সমাজকে ভেঙ্গে গড়্‌তে চাও? ও চেষ্টার ফলে বড় জোর তোমরা একটি নূতন ভেকধারীর দল গড়্‌বে। এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, কেবল মাত্র মনের জোরে সমাজের সম্পূর্ণ বদল করা যায় না,—যদি না সামাজিক অবস্থা সেই মনের সহায় হয়। চৈতন্যর সময় এমন কোনও বাহ্য ঘটনা ঘটে নি, যাতে করে সমাজকে পরিবর্ত্তিত হতে বাধ্য করতে পারত। তখনকার সমাজের গায়ে কর্ম্ম-জীবনের প্রবল ধাক্কা লাগে নি। কিন্তু আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। একদিকে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের মনের বদল করছে, অপর দিকে ইংরাজের শাসন আমাদের কর্ম্মজীবনে অভূতপূর্ব্ব নূতনত্ব দিচ্ছে।

আমাদের কর্ম্মজীবনের সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোনই যোগ নেই। ওকালতি, জজিয়তি, ডাক্তারি, মাষ্টারি,, এঞ্জিনিয়ারি, কেরাণি-গীরিতে বর্ণভেদ নেই, আশ্রমভেদ নেই। বিদ্যালয়ে ও কর্ম্মক্ষেত্রে সকলে সমান,—সেখানে ছোট বড়র প্রভেদ ব্যক্তিগত;—জাতিগত নয়। সে প্রভেদ কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে;—জন্মের উপরে নয়। সুতরাং জাতিভেদ এখন সমাজে নেই;—আছে শুধু ঘরে। তার পর তুমি চাও, আর না চাও, কর্ম্মজীবনের বাধাস্বরূপ অশনবসনের সামাজিক নিয়ম, নিষ্কর্ম্মা ছাড়া অপর সকলেই লঙ্ঘন করতে বাধ্য। সেই কারণে বাঙ্গলাদেশের যত নিষ্কর্ম্মার দলই, অর্থাৎ, জমিদার ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দলই খাদ্যাখাদ্যের বিচাররূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে বৃথা কালক্ষেপ করতে পারেন। সুতরাং শুধু জ্ঞানে নয়, কর্ম্মেও—এই নবযুগ আমাদের সমাজ-শাসনের বহির্ভূত করে স্বাধীন করে দিচ্ছে। যে জ্ঞানের ও যে কর্ম্মের স্রোত আমাদের সমাজের ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে—তার গতি কেউ ফেরাতে পারবেন না। ও যমুনা উজান বহাতে স্বয়ং ভগবানের বাঁশির আবশ্যক। কিন্তু আশা করি, ব্রাহ্মণের বংশধরেরা নিজেদের বংশীধারী বলে মনে করেন না। তা ছাড়া, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি ধরাধামে পুনরাগমন করে' বাঁশি বাজান, তাহলে, এ যমুনা যতক্ষণ সেই বাঁশি বাজবে ততক্ষণই উজান বইবে। সে বাঁশি যেই থামা, অমনি আবার স্রোত সুমুখের দিকে ছুটবে,—সম্ভবতঃ দ্বিগুণ বেগে। এ স্রোতের বলে সমাজে যে ফাট্ ধরেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই,—কিন্তু তা বলে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। যে ফাট দেখা দিয়েছে তা ভাঙ্গনে পরিণত হবে,—কিন্তু রাতারাতি নয়। তার পর পূর্ব্বকূলে যা শিকস্তি হবে পশ্চিম কূলে আবার তাই পয়স্তি হবে। এই নূতন জীবনের স্রোত সামাজিক মনের ও চরিত্রের ক্ষুদ্রত্ব ভেঙ্গে, কি মহত্ত্ব গড়ে তুল্‌ছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দামোদরের বন্যার

সময় পাওয়া গেছে। আমাদের যুবক সম্প্রদায়, ভাইকে অস্পৃশ্য করে তুল্‌তে চায় না; ছত্রিশ জাতকে ভাই করে নিতে চায়। যে সাম্য, যে মৈত্রী ও যে স্বাধীনতার ভাব চৈতন্য প্রথমে এদেশে প্রচার করেন—সেই ভাবের উপরই বাঙ্গালীর নবজীবন গঠিত হয়ে উঠ্‌ছে। ইউরোপীয় সভ্যতার উত্তর-সাধকতায়, নব্য-তান্ত্রিকেরা যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সমাজ কোন ছায়াময়ী বিভীষিকা দেখিয়ে তাদের সে সাধনা থেকে বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না।

(৪)

ব্রাহ্মণ-মহাসভা যে নিজেদের হাস্যাস্পদ করেছেন, তার বিশিষ্ট কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষে নিজের ক্ষমতার সম্পূর্ণ অতিরিক্ত কাজ কর্‌তে গেলে নিজে কাঁদতে পারে; কিন্তু অপরকে হাসায়।

প্রথমতঃ হিন্দুসমাজ শাস্ত্রশাসিত নয়; লোকাচার-চালিত। সমাজ আবহমানকাল যে এইভাবে চলে আস্‌ছে তার প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। মনু এ কথা স্বীকার করেছেন; শুধু তাই নয়, তাঁর মতে লোকাচার এত প্রবল যে তার উপর হস্তক্ষেপ কর্‌বার ক্ষমতা রাজারও নেই। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের পাতা একবার উল্‌টে দেখ্‌লেই দেখা যায় যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালী-হিন্দুসমাজ মনুর শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ শতকরা পাঁচটিও পালন করেন না। শাস্ত্রে বলে লোক সমাজ,—লোকাচার, দেশাচার ও কুলাচারের বশবর্ত্তী। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ এই তিনটির উপর আর একটিরও বিশেষ অধীন—সেটি হচ্ছে স্ত্রী আচার। সুতরাং হিন্দু-সমাজের বিধি-নিষেধ পুঁথিতে নেই, আছে পাঁজিতে। এ অবস্থায় শাস্ত্রের সাহায্যে সমাজকে কি করে শাসন করা যেতে পারে—তা আমার বুদ্ধির অগম্য। লোকাচার রক্ষা কর্‌বার জন্য শাস্ত্রের আবশ্যক নেই; লোকাচার নষ্ট কর্‌বার জন্য শাস্ত্র অনেক সময়ে আমাদের হাতে অস্ত্র। শাস্ত্রকে এই অস্ত্র হিসেবেই রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং দয়ানন্দ স্বামী ব্যবহার করেছেন। ব্রাহ্মণ মহাসভার প্রথম ভুল এই যে, তাঁরা শাস্ত্রের সাহায্যে লোকাচারের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চান।

এঁদের দ্বিতীয় ভুল এই যে, এঁরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজকে শাসন কর্‌তে চান। হিন্দুসমাজ বলে' কোনও একটা সমগ্র সমাজ নেই। আমাদের হাজারো-এক জাতির এবং তাদের শাখা উপশাখার সমাজ সব স্বতন্ত্র সমাজ। এই অসংখ্য খণ্ড সমাজসকল সব স্ব স্ব প্রধান, কোনও বিশেষ জাতির কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের শাসনাধীন নয়। অবশ্য এ সকল সমাজেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব আছে। কিন্তু সে হচ্ছে ধর্ম্মযাজক হিসেবে;—সমাজের শাসনকর্ত্তা হিসেবে নয়। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের নিকট ব্রাহ্মণের মত, ক্রিয়া-সম্বন্ধে গ্রাহ্য;—কর্ম্ম সম্বন্ধে নয়। বাঙ্গলার কায়স্থসমাজ বিলেতফেরতকে সমাজভুক্ত করে নিয়েছেন এবং যদৃচ্ছা উপবীত ধারণ করছেন। ব্রাহ্মণসমাজের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যাতে করে এর জন্য কায়স্থসমাজকে হিন্দু-সমাজ হ'তে বহিষ্কৃত করে দিতে পারেন; কিম্বা কায়স্থদের আবার শূদ্রত্ব অঙ্গীকার করাতে পারেন

তারপর ব্রাহ্মণ-সমাজ বলেও ভারতবর্ষে কোন একটি বিশেষ স্বতন্ত্র সমাজ নেই। আমরা শত শত খণ্ড-সমাজে বিভক্ত এবং তার একখণ্ডের সঙ্গে আর একখণ্ড সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত। হিন্দুদের জাতমারা-বিদ্যে কত দিন থেকে হয়েছে তা আমি জানি নে; কিন্তু সে বিদ্যেয় আমরা এমনি পারদর্শী হয়েছি যে, ব্রাহ্মণের মধ্যেও অধিকাংশ লোককে আমরা জাতিভ্রষ্ট করে রেখেছি। আমরা যে-শূদ্রের হাতে জল খাই সেই-শূদ্র-যাজক-ব্রাহ্মণের হাতে জল খাই নে। শুধু তাই নয়, বর্ণ-ব্রাহ্মণেরা যে দেবতার পূজা করেন সে দেবতারও আমরা জাত মারি। শূদ্রের ঠাকুরের সুমুখে আমরা মাথা নীচু করি নে; তার ভোগ আমরা স্পর্শ করিনে। যদি ব্রাহ্মণমাত্রকে একত্র করে আমরা একটি সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ গড়ে তুলতে পারতুম, তা হলেও নয় হিন্দুসমাজকে শাসন করবার কথা বলা চলত। কিন্তু আমরা আমাদের জাত-মারা-বিদ্যের গুণে পারি শুধু সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলতে। আমাদের গুণীপনার পরিচয় গুণে নয়, ভাগে। ব্রাহ্মণ-সভা কালীঘাটে শুধু সেই বিদ্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। বিলেত ফেরত প্রভৃতি অনাচারীদের জাত মেরে তাঁরা আর একটি খণ্ড-সমাজ গড়ে তুলতে চান। তাতে আর যার ক্ষতি হোক, আর না হোক্, এই নূতন খণ্ডের কোনও ক্ষতি হবে না। হিন্দুসমাজ পুরুভুজের ন্যায় জীব;—তার খণ্ডিত অঙ্গগুলি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়ায়। সত্যকথা বলতে গেলে, আমরা বিলেত যাওয়ার দরুণ সমাজ হতে যে মুক্তি লাভ করেছি তার জন্য হিন্দুসমাজের এই বহিষ্করণী শক্তির নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

আমার শেষকথা এই যে,—ইউরোপের সমাজের সকল আচার পদ্ধতি যে নির্ব্বিচারে গ্রাহ্য করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কিম্বা মঙ্গলকর তা অবশ্য নয়। জীবনের ধর্ম্মই হচ্ছে যে, তা মানুষকে ভালর দিকেও এগিয়ে দিতে পারে মন্দের দিকেও এগিয়ে দিতে পারে। জীবন্ত পদার্থের স্বেচ্ছা বলে' একটা জিনিষ আছে;—জড়পদার্থই কেবল ষোল আনা জড়জগতের নিয়মাধীন। কিন্তু স্বজাতির রক্ষা ও উন্নতির জন্য কি ভাল, আর কি মন্দ, সে বিচার করবার শক্তি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নেই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিচার—সে ত পুঁথিগত-বিদ্যার মল্ল যুদ্ধ—তার উদ্দেশ্য সত্যনির্ণয় করা নয়, বিপক্ষকে চিৎ করা। পণ্ডিতেরা শিক্ষা করেন শুধু ন্যায়ের প্যাঁচ ও কাটান্। এ মল্লযুদ্ধ দেখতে আমোদ আছে কিন্তু করে কোনও ফল নেই। কুস্তিগির পালোয়ানেরা যেমন আখড়ার বাইরে অকর্ম্মণ্য, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও তেমনি শাস্ত্রের গণ্ডির বাইরে অকর্ম্মণ্য। যে জ্ঞানের দ্বারা, যে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা—আমাদের নব-জীবনকে জাতীয় মঙ্গলের পথে চালিত করা যায়—সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি টোলে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। সে বিচার নব্য-তান্ত্রিকদেরই করতে হবে, যখন তা করা আবশ্যক হবে। এখন হচ্ছে আমাদের বাইরে থেকে শক্তি সঞ্চয় করবার যুগ;—ঘরে বসে ভয়ে ভাবনায় শক্তি অপব্যয় করবার নয়। আমরা যে হালখাতা খুলেছি তাতে বকেয়া টানা শুধু পণ্ডশ্রম। যদি প্রথম ঝোঁকে ভুল পথে যাই তবে ঠেকে শিখে সে পথ

ছাড়ব। উচ্ছৃঙ্খলতার অপবাদের ভয়ে ভীত হয়ে নব্য-তান্ত্রিকেরা যে সামাজিক শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করেছেন, সাধ করে আর তা পায়ে পরবেন না। বিদ্যাপতি বলে গেছেন "পানী পিয়ে পিছু জাতি বিচারি।" জ্ঞানের অভাবে, কর্ম্মের অভাবে আমরা শত শত বৎসর ধরে শুকিয়েছিলুম। সুতরাং যে জ্ঞানের ও কর্ম্মের স্রোত আমাদের দুয়োর দিয়ে বয়ে যাচ্চে আমরা অঞ্জলিভরে তার জীবন পান করব। জাতি বিচার হবে এখন নয়, তখন—যখন জাতির বিচারবুদ্ধি পরিপক্ক হবে।

আমি বিলেত-ফেরৎ সুতরাং স্বজাতির কাছ থেকে আমার ভয় নেই কিন্তু তার উপর আমার ভরসা আছে। শাস্ত্র আজও ব্রাহ্মণের হাতের অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে যদি আত্মহত্যা করতে চেষ্টা না করে' ব্রাহ্মণেরা প্রচলিত হিন্দুসমাজের লোকাচারের নাগপাশ ছিন্ন করেন তাহলেই তাঁরা তাঁদের বর্ণোচিত কাজ করবেন।

শাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে, হিন্দুসমাজে মানবজাতির "সামান্য ধর্ম্মের" পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে, ছত্রিশ জাতির ছত্রিশ রকমের "বিশেষ ধর্ম্ম" নষ্ট করতে হবে। ব্রাহ্মণ সমাজে আজও যে এমন অনেক যথার্থ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী ও নির্ভিক পণ্ডিত আছেন, যাঁদের সাহায্যে পূর্ব্বোক্তরূপ সমাজসংস্কার সাধিত হতে পারে, তার প্রমাণ এই ব্রাহ্মণ-মহাসভাতেই পাওয়া গেছে। কিন্তু এই আর একটি মহা লজ্জার কথা যে, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা উক্ত সভায় ধর্ম্মধ্বজী "বৈড়াল-ব্রতিক" এবং "বক-ব্রতিক" ব্রাহ্মণদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয়েছেন।—ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অথ টিকিমেধ যজ্ঞ

দেবতা দিলেন চুল, মানুষ কাটিয়া কৈল 'টিকি'!
খেয়ালে সে কৈল কাবু সুবিখ্যাত শেয়ালের বাপে
টিকির মাহাত্ম্য লিখি'! সমাচ্ছন্ন টিকির প্রতাপে
অর্দ্ধ ধরা; ব্যাখ্যা হইল "অহো! টিকি! কিবা বৈদ্যুতিকী!"
সেই পুচ্ছ আধ্যাত্মিকী...সেই টিকি...কালো ঝিকিমিকি
নির্ম্মূল করিল সিংহ,—তার রৌপ্য কাঁচিটির চাপে।
সর্পযজ্ঞে জন্মেজয় পোড়াইল যথা লক্ষ সাপে,—
সেই মত নষ্ট হৈল বহু টিকি...বৈদিকী...তান্ত্রিকী
টিকিমেধ যজ্ঞে তার;...নষ্ট হৈল সর্প সম ফুঁসি
বাহিরে দেখায়ে রোষ;...মনে মনে মূল্য পেয়ে খুসী
টিকির মালিক যত। অন্তরীক্ষে হাসিল দেবতা;—
অন্ততঃ এ-হেন কাণ্ডে দেবতার হাসিবার কথা।
সাব্যস্ত হইল চুল, শশব্যস্ত টিকি অন্তর্ধান;
কলিযুগে কালীসিংহ উদ্ধারিল দেবতার মান।

[illegible]

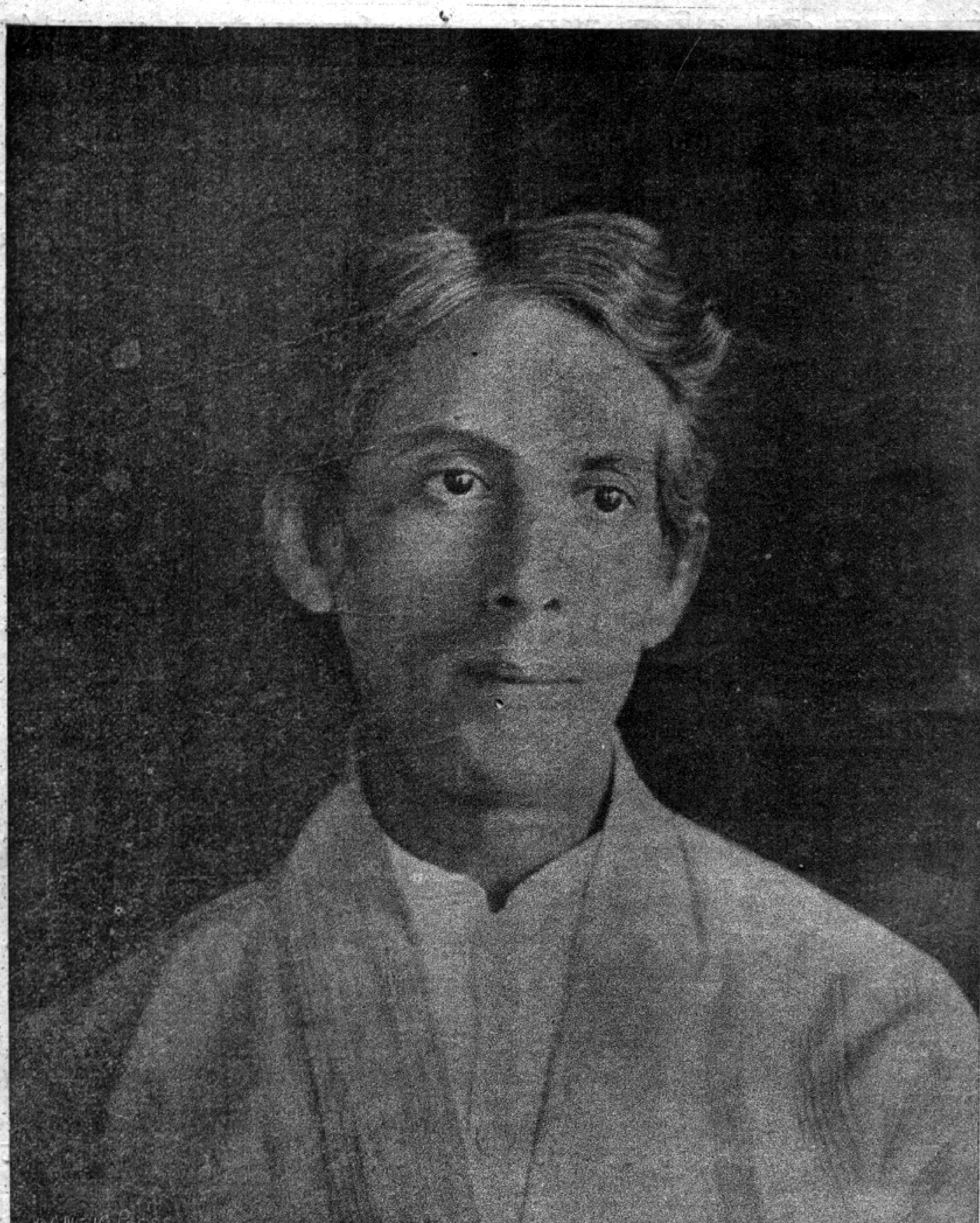
কালীপ্রসন্ন সিংহ

তারা নহে প্রবঞ্চক গরু যারা কাটে বক্‌রীদে;—
করুক্ যা' খুসী পরে,—প্রথমে তো মূল্য দিয়ে আনে,
মূল্যে হয় গৌণ শুদ্ধি। কিন্তু যারা বঞ্চি' যজমানে
গোদানে প্রবৃত্ত করে,—শেষে বেচে কসায়েরে সিধে
দুধ বন্ধে দ্বিধাহীন,—মুখে শাস্ত্র, স্বার্থপঙ্ক হৃদে—
নরকের গন্ধময়,—তাদের কী বলে অভিধানে?—
বল, খেয়ালীর রাজা! হে রসিক! বল কানে কানে
কিম্বা বল উচ্চকণ্ঠে;—যখন রেখেছ তুমি বিঁধে
গৃহভিতে,—মুখসর্ব্ব ভণ্ড যত গর্ব্বিতের টিকি—
করিয়াছ যজ্ঞ টিকিমেধ,—তখন কিসের দ্বিধা?
পুনঃ তুমি এস বঙ্গে পুণ্যশ্লোক সিংহ গুণধাম!
মোহর কিম্বৎ কার, কার টাকা, কার মূল্য সিকি
জেনে নাও, কর নব্য ব্রাহ্মণ্যের মূল্য মুসাবিদা,
কাট টিকি, লেখ নাম, রফা ক'রে ফেলে দাও দাম।

[illegible]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি *

জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে একজন গুরু-মহাশয় ছিলেন, তাঁহার নিকটই ইঁহার হাতে খড়ি হয়। সেই পাঠশালায় পাড়াপ্রতিবেশী-দিগের অন্যান্য ছেলেরাও পড়িতে আসিত।



শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

* এই প্রবন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কথা প্রসঙ্গে সংগৃহীত। অনেক স্থলে কোটেশন চিহ্ন দিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখের কথা অবিকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এই গুরুমহাশয়টি একবারে সেকেলে গুরুমহাশয়ের জলন্ত আদর্শ। রং কালো, গোঁপ-যোড়া মুড়া-খ্যাংরার ন্যায়, কাঁচা পাকায় মিশ্রিত। চুল লম্বা, উড়েদের মত পিছন দিকে গ্রন্থিবদ্ধ।

ঠাকুরদালানে একটা কালিপড়া মাদুরের উপর পাঠশালার ছেলেরা বসিত। গুরুমহাশয়ের মুখে কখনও হাসি দেখা যাইত না, যদি বা ওষ্ঠপ্রান্তে কখনও একটু হাসির বক্ররেখা দেখা দিত ত' সে সুতীব্র কুটিল হাসি। ছাত্রদের বেত মারিবার সময় সে হাসিটুকু ফুটিত। বোধ হয় সে শুধু হাতের সুখ অনুভব করিয়া। গুরুমহাশয় পড়াইবার সময় অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পা ছড়াইয়া "গুরুচ্ছাদি" তৈল মর্দ্দন করিতেন। সে তৈলের কি-এক বিট্‌কেল গন্ধ! তাঁর এক গাছি ছোট বেত ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সঙ্গে সেটিকেও তিনি সযত্নে তৈল মাখাইতেন। নিয়মিত তৈলমর্দ্দনে বেত গাছটিতেও বেশ একটা পাকা রং ধরিয়াছিল। এই বেত্রটির উপর গুরুমহাশয়ের পুত্রবাৎসল্য ছিল। একবার তাঁর সেজদাদা ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দুষ্টামি করিয়া এই বেতখানিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে গুরুমহাশয়ের ঠিক যেন পুত্রশোক উপস্থিত হয়। পরে অনেক খোসামুদি, সাধ্যসাধনা করিয়া বেতটি তাঁর নিকট হইতে ফিরিয়া পাইয়া তবে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েন। অপরাধে, বিনা অপরাধে, যখন তখন, এই বেত গাছটি ছাত্রদিগের পৃষ্ঠসংস্পর্শে আসিত। আশ্চর্য্য এমনি তাঁহার হস্তকণ্ডুয়ন যে, যখন ছুটি দিতেন তখনও দুই চারি ঘা পটাপট্ বেত্রাঘাত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, আর সেই সঙ্গে কতকগুলা অকথ্য গালিবর্ষণও যে না হইত, তাহাও নয়।

ইহার পর বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। তখন জ্যোতিবাবুর অভিভাবক তাঁহার সেজদাদা (স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। তাঁহার শিক্ষা-রীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর ঘাড় গুঁজিয়া টেবিলে বসিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেন না। যখন বাড়ীর অন্যান্য বালকগণকে খেলিতে দেখিতেন, তখন জ্যোতিবাবুর যে কি কষ্ট হইত, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার মনে হইত, তিনি যেন জেলখানায় আছেন—সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট অন্ধকারময়—তাঁহার হৃদয় ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন হইত। হেমেন্দ্রবাবু অবশ্য তাঁহার ভালর জন্যই করিতেন, কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। লেখাপড়ার উপর তাঁর একটা বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিল। হেমেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে মুগুর-ভাঁজা, ডন্ ফেলা প্রভৃতি অভ্যাস করাইতেন, এবং তাঁহাকে সন্তরণ-বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। এই সকল শিক্ষার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রবাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়াছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল, তিনি অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সদাসর্ব্বদাই তিনি সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির আলোচনায়



গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিযুক্ত থাকিতেন এবং আপন-মনে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিতেছিলেন—বেশ ব্যুৎপত্তিও একটু জন্মিয়াছিল।

হেমেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত অম্বু গুহ সেই সময়কার নামজাদা পালোয়ান ছিলেন। হীরা সিং নামক একজন পাঞ্জাবী উভয়েরই ওস্তাদ ছিল। তলোয়ার গৎকা কুস্তি জিম্‌ন্যাষ্টিক্ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম-ক্রিয়ায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর গুরুভার মুদ্গার অনেক হিন্দুস্থানী পালোয়ান্‌ও উঠাইতে পারিত না।

ছেলেবেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পায়ে "কাউর ঘা" ছিল। কত ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল কিছুতেই সারে নাই। পরে চৌদ্দ বৎসর বয়সে সে ঘা আপনিই সারিয়া যায়। অনেক সময় রোগ অপেক্ষা ঔষধই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইত। যে যাহা বলিত, ঘায়ে তাহাই 'লাগান' হইত। একদিন একজন হিন্দুস্থানী বৈদ্যের ব্যবস্থানুসারে এই ঘায়ে ব্রাণ্ডি দিয়া এক কড়াই গম্‌গমে আগুনের উপর পা ধরিয়া রাখা হইয়াছিল; সে কি যন্ত্রণা! এই রক্তস্রাবে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক সময়ে যাহার যাহা নাই, সেই দিকে তাহার মনের ঝোঁক হয়। বেশী বয়সে অশ্বারোহণ শীকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে যে তাঁহার মন গিয়াছিল, তিনি বলেন—অনেকটা এই কারণে।

তারপর তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখন বাড়ীর কঠোর শিক্ষাশাসন হইতে তিনি কতকটা অব্যাহতি পাইলেন। ফলতঃ শৈশবকাল তাঁহার সুখে কাটে নাই। কিন্তু একটা সুখস্মৃতি, কালো মেঘের ধারে রজত-কিরণ রেখার ন্যায় তাঁহার চিত্তপটে এখনও পরিস্ফুট রহিয়াছে।

তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে খুব ঘটা-পূর্ব্বক দুর্গোৎসব হইত। কুমোরেরা বাড়ীতেই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিত। প্রথম যখন গরুর গাড়ী করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণের 'কাঠাম' আসিয়া পড়িত, তখন হইতেই জ্যোতিরিন্দ্র নাথের ঔৎসুক্য আরম্ভ হইত। তারপর খড়বাঁধা, একমাটি, দোমাটি, রং দেওয়া মুণ্ড বসান' প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিমা খানি যখন ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিত তখন তাঁহার ঔৎসুক্য এবং আনন্দের আর সীমা থাকিত না। স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়াই তিনি ঠাকুরদালানে উপস্থিত হইতেন এবং তন্ময় হইয়া কারিকরদের গঠনকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেন। তারপর আবার "চালচিত্র।" কত হাতী ঘোড়া দেব দেবীর মূর্ত্তি পটুয়া-দিগের নিপুণ তুলিকায় নানারঙে সাদাজমির উপর ফুটিয়া উঠিত—তিনি একমনে বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ করিতেন; এবং পটুয়া-দিগকে মধ্যে মধ্যে পানের খিলি যোগাইয়া মনে-মনে একটা বালসুলভ গৌরব অনুভব করিতেন। এক বৎসর "চালচিত্রের" সময় একটা কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠাকুরদালানেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভগিনী ঐ পাঠশালায় তালপাতায় "ক" "খ" র দাগা বুলাইতেন। (সে ভগিনীর অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়।) পটুয়ারা চালচিত্র সম্পূর্ণ করিয়া কাপড় ঢাকা

দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—পূজার আর দুই এক দিন মাত্র বাকী,—এমন সময় সেই ভগ্নীটির কি এক খেয়াল চাপিল, তিনি চাল হইতে কাপড়খানার ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়া, দোয়াতের কালিতে কলম ডুবাইয়া সমস্ত চালখানি কালির পোঁচে চিত্রবিচিত্র করিয়া দিলেন। এতদিনকার সযত্ন-সম্পাদিত চিত্রকর্ম্ম সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। তখন আবার পটুয়া-দিগকে ডাকাইয়া যেমন-তেমন করিয়া চালচিত্রিত হইল।

তারপর পূজার তিন দিন বাড়ীর উঠানে যাত্রা হইবে। তাহার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সে কি আমোদ! উঠানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বড় বড় কাঠের থাম পোতা হইতেছে, তাহার সহিত কাঠের গরাদে' জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে! সেই ঘরের ভিতর যাত্রা গান হইবে! সেই স্তম্ভ পরিবেষ্টিত বিস্তৃত পরিসর



নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমির উপর বড় বড় গালিচা পাতা; পাড়ার ছেলেরা আসিয়া মহানন্দে বৈকাল হইতেই তাহার উপর ডিগ্‌বাজী খেলিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। কাষ্ঠস্তম্ভের মাথা হইতে বক্র লোহার শিকে ঝাড় ঝুলিতেছে। সায়াহ্নে যখন সেই সব ঝাড় জ্বালান' হইতে লাগিল, তখন কি আনন্দ! আরতির সময় ধূপধূমে সমাচ্ছন্ন দেবীর অস্পষ্ট মুখ তাঁহার মনে অজানা রহস্যের এক সুন্দর মোহ-জাল বিস্তার করিত। বাড়ীর ছেলেদের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া চাকরেরা সকাল সকাল বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিত যে, ভোরের সময় আসিয়া তাহারা আবার যাত্রা শোনাইতে লইয়া যাইবে। বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যাত্রা শুনিবার জন্য চোখে ঘুম নাই। এগারটা রাত্রে যেই ঢোলে চাঁটি পড়িল অমনি বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একছুটে বাহিরের মজ্‌লিশে গিয়া হাজির। উঠান লোকে লোকারণ্য। বাহিরের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই ভিড় করিয়া চারিদিকে দাঁড়াইয়া। এ তিন দিন অবারিত-দ্বার! অনেকগুলি মশালচী মশাল-হাতে উঠানের নানাদিকে রহিয়াছে। লালপাগড়ী-ধারী দারোয়ানেরা "বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে" করিয়া লোকদিগকে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে বেত্রচালনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। এই যাত্রা কেবল বাড়ীর ছেলেছোকরা এবং বাহিরের নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্য।

বৈঠকখানায় অভিভাবকদের মজ্‌লিশ্‌। সেখানে বাইনাচ চলিত। ছেলেদিগকে লইয়া যাত্রা দেখাইবার ভার ছিল দীনু ঘোষালের উপর। দীনু ঘোষাল জ্যোতিবাবুর পিতৃব্য-মহাশয়দের একজন মোসাহেব—সে ছেলেদেরও খুব প্রিয়পাত্র ছিল। দীনু ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদালানের রোয়াকে মজ্‌লিশ্‌ করিয়া বসিত এবং মধ্যে মধ্যে রুমালে টাকা বাঁধিয়া ছেলেদের হাত দিয়া "পেয়ালা" দেওয়াইত। তখনকার শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালা নিমাই দাস এবং নিতাই দাসের যাত্রাই এ বাড়ীতে হইত। যাত্রাওয়ালা ছোকরাদের পোষাক ছিল জরির চাপ্‌কান, জরির কোমরবন্দ্‌, পালকওয়ালা মুকুটের মত জরির টুপী। জরি অবশ্য ঝুটা। যে কালে যে পোষাকের ফ্যাশান্‌ যাত্রা-ওয়ালারাও তাহাই অনুকরণ করিয়া থাকে।

এই যাত্রার "কেলুয়া ভুলুয়া" প্রভৃতি সং ছেলেদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল। "শুম্ভ নিশুম্ভ"র পালায় যখন রক্তবীজ সাজঘর হইতে "রে রে রে রে" করিয়া ডাকাতি-হাঁক্‌ দিতে দিতে আসরে আসিত তখন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইত। ডাকাতদের মত তাহার লম্বা চুল, ইয়া চোগোঁপ্পা, মালকোঁচামারা রক্তবস্ত্র, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, হাতে ঢাল তলোয়ার—সে এক ভীষণ চেহারা। আর মুকুটভূষিতা আলুলায়িত-কেশা দুর্গা যে সাজিত সে যেন রূপে আলো করিয়া আসিত। আর তার তলোয়ার খেলার কি কস্‌রৎ। বন্‌ বন্‌ করিয়া তলোয়ার ঘুরাইত যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত। আবার রাক্ষসের মুখস্‌ পরা' ধূম্রলোচন পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য যখন ছেলেদের বসিবার স্থান দালানের রোয়াক দিয়া নামিত তখন ছেলেরা ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিত—কেহ কেহ একবারে কাঁদিয়া উঠিত।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিবাবু বলিলেন,

"বিজয়ার দিন প্রাতে আমাদের বাড়িতে বিষ্ণু গায়কের বিজয়া গান হইত। আমরা সকলে বসিয়া শান্তির জল লইতাম তারপর প্রতিমা বাহির করা হইত। অপরাহ্নে আমরা অভিভাবকগণের সহিত ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে বসিয়া প্রতিমা ভাসান দেখিতাম। প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর বাড়ী আসিয়া বড়ই ফাঁক ফাঁক ঠেকিত—মনটাও কেমন একটু খারাপ হইয়া যাইত।

"এই দুর্গোৎসবে—দেব,মানব ও দানব এই তিন ভাবের দৃশ্যই দেখা যাইত। বিজয়ার দিন, সকল শত্রুতা ভুলিয়া বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন, গুরুজন বলিয়া প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ এবং কনিষ্ঠদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদের যে ধুম পড়িয়া যাইত—আমার মনে হয় এ একটা স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণা। মানব ভাব,—যেমন কোন আত্মীয়ার আগমনে ও বিদায়-কালে অশ্রুপাত। দেবীকে "মা, মা" বলিয়া ডাকিয়া ভক্তিগদগদ চিত্তে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দ ও প্রীতি জন্মিত তাহা কথায় বলা যায় না। এইরূপে হৃদয়ের কি এক অপূর্ব্ব কোমলতা বিকাশিত হইত! অপর দিকে চালচিত্র-অঙ্কনে ও প্রতিমানির্ম্মাণে চিত্রশিল্পের ও ভাস্কর্য্য বিদ্যারও একটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণনগরের কুমোর পটুয়াদের এ বিষয়ে এত উৎকর্ষ লাভেরও ইহা একটা প্রধান কারণ বলিয়া আমার মনে হয়। এই উৎসবে, মানুষের হৃদয়ে দেবভাব ও মানব-ভাব যেমন উদ্বোধিত হয়, দানব-ভাবও তেমনি আর-একদিকে দৃষ্ট হয়। পূজার আরম্ভ হইতে চতুর্দ্দিবসব্যাপী মদ্যের ছড়াছড়ি। টেকচাঁদ ঠাকুর ঠিকই লিখিয়া গিয়াছেন "সিদ্ধিরস্তু" শুধু নয়, "অ-আ" পর্য্যন্ত গড়াইত। দ্বিতীয়তঃ পশু বলিদান। সে এক বীভৎস ব্যাপার! বড় বড় মহিষ ছাগ প্রভৃতির রক্তে পূজাঙ্গনে রক্ত বন্যা বহিয়া যাইত,—এই রক্ত-কর্দ্দমিত স্থান দেখিলে মনে এক অতি নিষ্ঠুর দানব ভাব জাগিয়া উঠিত সন্দেহ নাই। আমাদের বাড়ীতে অবশ্য পশুবলি হইত না, কুম্ড়া বলিতেই কায হইত।

"পূজার সময় আমার পিতৃদেব কখনও বাড়ীতে থাকিতেন না। কোথাও না কোথাও ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। পূজার ভার আমার দুই কাকা স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দের উপরই ন্যস্ত থাকিত।

"মেজ' কাকা (৺গিরীন্দ্রনাথ) বিজ্ঞানে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার একটি পরীক্ষাগার (Laboratory) ছিল, তাহাতে Battery প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র ছিল। তাহা দ্বারা তিনি অনেক বিষয়ের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিতেন। তিনি খুব ভাল গান রচনাও করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত "বাবুবিলাস" নামে যাত্রা, আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। আমরা তখন খুব ছোট উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতাম মনে আছে। উদ্যানরচনাতেও তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। শেষোক্ত সখটি শেষে গুণদাদাতেও (তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়) বর্ত্তাইয়াছিল। তিনিও খুব সুন্দররূপে বাগান গড়িতে পারিতেন।

"ছোট কাকামহাশয় ৺নগেন্দ্রনাথ

ঠাকুর আমার দাদামহাশয় ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার শিক্ষা হয়। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল এবং পরদুঃখ-কাতর ছিল। কেহ কোনও বিপদে পড়িলে অথবা ঋণ জালে জড়িত হইলে তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে ব্যস্ত হইতেন। এই পরোপ-চিকির্ষায় তিনি একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। নিজে ঋণ করিয়া অপরকে ঋণ-মুক্ত করিতেন। এইরূপে পরের জন্য তিনি বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন এমনি বিপন্ন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি Customs Houseএ Collectorএর কার্য্য গ্রহণ করেন। বাঙ্গালীকে তখন এ পদ দেওয়া হইত না। ছোট কাকা মহাশয়ই এ কার্য্যে প্রথম নিযুক্ত হয়েন।"

এই সময়কার আরও একটি ঘটনা জ্যোতিবাবুর বেশ মনে পড়ে। তিনি বলিলেন, "আমার বেশ মনে আছে একবার বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীযুক্ত মহাতাব্ চাঁদ বাহাদুর আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মহারাজকে দেখিবার নিমিত্ত সদর রাস্তা ও আমাদের গলি একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। এখন দেখা যায় রাজাদের মধ্যে একটা Democracyর Spirit জাগিয়াছে, তাঁহারা অনেক স্থলেই গমন করেন। ইহা অবশ্য ভালই তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তখন এ ভাব ছিল না। মহারাজ মহাতাব্ চাঁদের ব্রাহ্মসমাজের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। তিনি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের (মহর্ষি) একজন খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষির নিকট আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন এমন একটি লোক প্রার্থনা করেন। মহর্ষি ইতিপূর্ব্বে যে চারিজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একজনকে আচার্য্যের পদে বৃত করিয়া বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন। বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্ম্ম বেশ সুচারুরূপেই চলিতেছিল, এমন সময় কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। কেশব বাবুর কার্য্যকলাপ এবং আচার ব্যবহারে মহারাজা কেমন বিরক্ত হইয়া, বর্দ্ধমান হইতে ব্রাহ্মসমাজ উঠাইয়া দিয়া, সমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আত্মবলি

ইচ্ছা আছে শক্তি নাই, নিরুদ্যম যন্ত্রী,
স্বর্ণবীণা ভূমে লোটে, ছিন্ন সব তন্ত্রী।
ছন্দহীন মহাকাব্য, ভাবশূন্য ভাষা,
পুঞ্জীকৃত কর্ম্মরাশি, নাহি পুণ্য আশা।
হাসি শুধু দুঃখময়, ফুল গন্ধহীন,
হৃদি প্রেমভরা, কিন্তু নীরস মলিন।
দেহ সচেতন, তাহে নাহি রূপ কান্তি,
জীবন রয়েছে পড়ে হৃত সুখ শান্তি।
ভাল যাহা ছিল, চোর নিয়ে গেছে ছলি,
কি দিয়ে পূজিব দেব! লহ আত্মবলি।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

লাইকা

(হিন্দুস্থানী গানের ছায়া অবলম্বনে)

(১)

লাইকা তরুণ যুবা ; তাহার যত্নবিন্যস্ত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশিবেষ্টিত মুখশ্রী, চঞ্চল চক্ষু, মৃদুমধুর হাসি যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। সে সকলেরই প্রিয়। তাহার ঘর ছিল না বলিয়া ঘরের অভাব ছিল না, সমস্ত দেশের সকল ঘরেই তাহার সমান অধিকার ছিল। লাইকা যে দিন যাহার ঘরে অতিথি হইত তাহার ঘরে সেদিন উৎসব! বালক বালিকা লাইকার গল্প শুনিতে ছুটিত, নারীরা তাহার স্নেহের অভিমান গ্রহণ করিয়া প্রীত হইত, মালিনী তাহাকে মালা পরাইয়া যাইত—গোপিকা তাহার ক্ষীর সর লাইকাকে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইত! যুবকদলে লাইকার অপ্রতিহত প্রভাব—। তাহার গান তাহার কবিতা সর্ব্বোপরি তাহার সুকুমার কণ্ঠে দ্রুত ললিত গতিতে উচ্চারিত সুনিপুণ ভাষার রঙ্গরহস্য—যখন হাসিতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িত, প্রতি অঙ্গ চালনায় সঞ্চালিত হইতে থাকিত, সাগরজলে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত সে সুন্দর দেহে অপরূপ জ্যোতির খেলা দেখা যাইত, তখন এমন কোন নরনারী ছিল না যে, সে মাধুর্য্য দেখিয়া বা শুনিয়া ক্ষণেকের জন্যও আত্মবিস্মৃত মুগ্ধ না হয়! তাই যে দিন লাইকা যেখানে আতিথ্য গ্রহণ করিত সে ভবন সেদিন আনন্দ-গৃহে পরিণত হইত! সেদিন সেখানে বীণকার আসিয়া বীণা লইয়া বসিত, মালাকার আসিয়া সে গৃহের দুয়ারে মালা দোলাইয়া যাইত।

তরুণসমাজে লাইকা ভিন্ন আমোদ ছিল না,—শ্রাবণে ঘনপুষ্পিত কদম্বশাখায় হিন্দোলা দুলাইয়া তাহারা লাইকাকে লইয়া দুলিত;—ভাদ্রে নদীপ্লাবনে সুসজ্জিত নৌকায় লাইকাকে বসাইয়া সকলে দাঁড় টানিয়া জলক্রীড়া করিত! শরতের কোজাগর বসন্তে হোলির উজ্জল দিনগুলি লাইকা ভিন্ন কিছুতেই সুশোভিত হইত না!

কিন্তু তবু,—লাইকা কোথাও বাঁধা পড়িত না। দেখা যাইত, কখন কখন সেই জ্যোৎস্নাগঠিত সুরূপসুন্দর যুবা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! লাইকা নাই—তাহার প্রিয়বন্ধু চম্মনের নিমন্ত্রন উপেক্ষা করিয়া, তাহার প্রিয়তমা বালিকা সুরতিকে ঘুমের ঘোরে বিছানায় শোয়াইয়া লাইকা গভীর রাত্রিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

গ্রাম তখন বিষণ্ণতায় ভরিয়া যাইত, বয়োবৃদ্ধেরা লাইকার নাম করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, যুবকেরা কিছুদিন সঙ্গীতচর্চ্চা ত্যাগ করিত, শিশুরা সন্ধ্যার ম্লানজ্যোৎস্নায় মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইতে ঘুমাইতে তরুণ চাঁদের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিত "লাইকা আছে না?" সচিন্ত ম্লান হাস্যে জননী বলিতেন—"জানিনা যাদু, আর আসে কি না?"—

আর কি বনের পাখী ফিরিবে?—

কিন্তু লাইকা আবার ফিরিত। হঠাৎ

একদিন রোগীর রোগশয্যার পার্শ্বে, কি শিশুদের ক্রীড়াক্ষেত্রে আবার তাহার সেই চিরপরিচিত সহাস অম্লানমূর্ত্তি উদিত হইত! একবার সে প্রায় তিন চার মাস ফিরে নাই সকলে তাহার আশা ত্যাগ করিয়াছিল,—অবশেষে যেদিন ষাঁড়া নদীর প্রকাণ্ড বান পাশের বড়ুয়া নদীকে ছাপাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল,—আগন্তুক বিপদকে দেখিয়া ঘরে ঘরে বিপদের আর্ত্তনাদ উঠিল, কত ঘর দুয়ার মানুষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল—তখন দেখা গেল যে লাইকা ফিরিয়াছে! একটা কলার ভেলায় গ্রামের বৃদ্ধবৃদ্ধা'দের তুলিয়া লইয়া লাইকা বাঁশ বাহিয়া চলিয়াছে! মুখে সেই প্রসন্ন হাসি, ক্ষেপণি-ক্ষেপের তালে তালে লাইকার গান যেন উলটিয়া উলটিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে! তাহাকে দেখিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল, তাহার দেখাদেখি শত শত ভেলা ভাসিল,—গ্রামের বালক বালিকা রুগ্ন আতুর নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে চলিল!

(২)

ক্রমে পল্লী ছাড়াইয়া এই উদাসী যুবার কাহিনী মহারাজাধিরাজের কাণে প্রবেশ করিল। শুনিয়া রাজা বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। লাইকাকে আনিতে স্বর্ণমণ্ডিত দোলা চলিল, হস্তী চলিল, অশ্ব চলিল! সুবেশভূষিত ভৃত্য গিয়া তাহাকে মহারাজার আহ্বান জানাইল। লাইকা তখন তল্‌তা বাঁশকে সযত্নে একটি দীর্ঘ ছিপে পরিণত করিয়া তাহার গোড়ায় আপনার প্রিয় একটি গানের কয়টি ছত্র কুঁদিয়া তুলিতেছিল। তাহার মাথার উপর ঝাউ গাছের সরু সরু পাতা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—সম্মুখে কাশবনে শ্বেতবর্ণের হিল্লোলিত প্রবাহ! ঈষৎ শীতল বায়ুতে লাইকার অঙ্গের শেফালিসুবাসিত পদ্মরক্ত উত্তরীয় থর থর কাঁপিতেছে! রাজদূত মুগ্ধচিত্তে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। লাইকাও মৃদু হাসিয়া রাজাজ্ঞায় সসম্মান নমস্কার জানাইয়া তাহার সঙ্গী হইল।

শত সুধীসমাদৃত, বহুবিদ্যা ধনৈশ্বর্য্য পরিপূরিত রাজসভায় লাইকার বীণা বাজিয়া উঠিল, তাহার পর তাহার তরুণ কণ্ঠ কাঁপাইয়া গীতধ্বনি ছুটিল, তখন সেই বহুজনসমাকীর্ণ সভা মন্ত্রমুগ্ধ, সিংহাসনে রাজাধিরাজ মোহাচ্ছন্ন, একি দেবতা না মানব?—

সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মহারাজ আসিয়া লাইকাকে আলিঙ্গন করিলেন! কণ্ঠের মুক্তাহার খুলিয়া কবির শিরোভূষণ করিয়া দিলেন, তাহার পর প্রস্তাব করিলেন, লাইকা তাহার সভায় চির আসন গ্রহণ করুন! রাজসভা ভিন্ন তাহার উপযুক্ত স্থান নাই!—

লাইকাও মৃদু হাসিয়া একথা স্বীকার করিল, কিন্তু বলিল, আজ নয় কিছুদিন পরে আসিয়া সে মহারাজাধিরাজের এই অনুগ্রহ গ্রহণ করিবে।

রাজা লাইকার সমুদয় বিবরণ জানিতেন। এ বনের পাখী সহরে বাঁধা পড়িবে না তাহাও জানিতেন। কিন্তু এই অমানুষী কণ্ঠ—এই তরুণ মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছিল, এই যুবককে নিকটে রাখিবার জন্য তিনি বোধ হয় সর্ব্বস্বও দিতে পারিতেন।—

রাজা অপুত্রক,—অষ্টম বর্ষীয়া গৌরীকন্যা

বারি তাঁহার একমাত্র দুহিতা। সেদিন স্নানান্তে রাজা লাইকাকে সঙ্গে লইয়া আহারার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন কপালে চন্দনচর্চ্চিতা মুক্তকেশা বারি আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। হস্তে শিবপূজার নির্ম্মাল্য মাল্যচন্দন—সে প্রত্যহ পূজা করিয়া পিতাকে এই পূজার ফুল আনিয়া দিত।—অদ্য পিতার সহিত এই নবীন অতিথিকে দেখিয়া বালিকা পশ্চাদ্‌পদ হইল, শিশুপ্রিয় লাইকা মৃদু হাসিয়া বলিল—"মহারাজের কন্যা?"—

"হাঁ"—স্নেহপূরিত হাস্যের সহিত রাজা বলিলেন—"হাঁ, এই আমার বারি!—বারি মা!—এই যে ইনিই লাইকা! তুমি যাঁহার গান শুনিতে চাহিয়াছিলে?—

"বালিকা ঈষৎ সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়াছিল,—লাইকা গিয়া তাহাকে ক্রোড়ে চাপিয়া ধরিল—মুখের উপর লম্বিত চুলগুলি সরাইয়া কৌতুককোমল দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল,—"আমার গান শুনিবে তুমি—রাজকুমারি?—ভাল লাগিবে?"

ঘাড় নোয়াইয়া বারি জানাইল, হাঁ! প্রচুর হাস্যের সহিত আদর করিয়া লাইকা বলিল "না শুনিয়াই হাঁ বলিলে তুমি—রাজকুমারি তুমি কখনই চতুর হইবে না!"

রাজা হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "না, আমার বারি বড় বুদ্ধিমতী, লাইকা! এই বারেই মা আমার "সিংহাসনবর্ত্তিশি শেষ করিয়া সুখসাগর পড়িতেছে!—

লাইকা উচ্চ হাস্য করিল। বলিল—সিংহাসনবত্তিশী? হাঁ মহারাজ! সিংহাসনেরই এই গুণ! স্মরণ হয় কি—বত্রিশসিংহাসনের উপর বসিলে রাখালও রাজবুদ্ধি ধরিত! এই রাজকন্যা যে এই শিশু বয়সে এমন ধী শক্তির পরিচয় দেন তাহা ইঁহার নিজস্ব গুণ নয় তাহা আপনার সিংহাসনের গুণ,—ঔরসের গুণ মহারাজ!—কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখুন এই কুমারীকে দেখিয়া কি প্রতিভাময়ী দেবী সরস্বতীকে স্মরণ হয়? ইনি যে সাক্ষাৎ পদ্মবনের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী!

রাজা হাসিয়া উঠিলেন। বারিরও পেলব অধর হাসিতে স্ফুরিত হইল, সে সলজ্জে কোল হইতে নামিয়া গেল। রাজা বলিলেন, তোমার আশীর্ব্বাদ দিলে না বারি?" বারির রক্তচরণে নূপুর বাজিয়া উঠিল, অগ্রসর হইয়া বালিকা পিতার সম্মুখে তাহার হস্তধৃত স্বর্ণপাত্র ধরিল। একটি প্রকাণ্ড শতদল পদ্ম তাহার স্থানে স্থানে কুঙ্কুম চন্দনবিন্দুতে পূজাস্মৃতি অঙ্কিত, রাজা সেই কমল উঠাইয়া লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। বালিকা ফিরিয়া যায়—লাইকা অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমি কি নির্ম্মাল্যের অযোগ্য রাজকুমারি, একটি ফুল প্রসাদ পাইব না?"

হাসিয়া কন্যা দাঁড়াইল। একবার পিতার প্রতি চাহিয়া হাসিল—রাজাও আনন্দে হাসিয়া বলিলেন "দাওত মা লক্ষ্মি! ওই সরস্বতীর সন্তানকে তোমার আশীর্ব্বাদ দাও—যাহাতে" রাজার অসমাপ্ত কথা লাইকার হাসিতে ডুবিয়া গেল! "সরস্বতী আমার জননী কিন্তু শ্রীরূপিণী লক্ষ্মী যে আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহারাজ—"

এমন সময় বারি বলিল "আর ত পদ্ম আনি নাই!—

লাইকা আসিয়া আবার তাহার হাত ধরিল,

বলিল, কি মধুর স্বর ইহাঁর মহারাজ, বীণাপাণির বীণা যে আপনার কন্যার কণ্ঠে! আপনি কি তুচ্ছ লাইকার গান শুনিতে চান?—পদ্ম নাই? প্রয়োজন নাই আমায় দাও—তোমার হাতের ওই মালাগাছি। আমার মাথায় দাও, আমি ফুলের মালা বড় ভালবাসি!"—বলিয়া লাইকা তাহার সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া দিল।

বারি আর দ্বিরুক্তি করিল না—সর্ব্বজয়ার রক্তদলে গ্রথিত সেই ফুলমাল্য তুলিয়া কবির মস্তকে পরাইয়া দিল—মালা গড়াইয়া তাহার কণ্ঠে পড়িল। লাইকা সানন্দ নয়নে রাজার প্রতি চাইয়া বলিল, "মহারাজ আপনার আশীর্ব্বাদী মুক্তাহার বহুমূল্য ও বহু মান্যাস্পদ বটে কিন্তু রাজকুমারীদত্ত এই সর্ব্বজয়া হার কি সে গজমতি হার অপেক্ষাও মূল্যবান্ নয়?

রাজা এই দৃশ্য দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, লাইকার প্রশস্ত গৌর বক্ষে লোহিত মাল্য দুলিতেছিল—তাহার প্রতি চাহিয়া মধুর হাসিতেছিলেন। তাহার কথা শেষ হইলে বলিলেন—"নিশ্চয় মূল্যবান্! সে মুক্তামালা আমার ভাণ্ডারের একটি সামান্য দ্রব্য লাইকা! কিন্তু এই যে হার তুমি গলায় ধারণ করিলে ইহা যে আমার সর্ব্বস্ব! আমার বারি তোমার গলায় হার দিয়াছে—তুমিও আহ্লাদে তাহা গ্রহণ করিয়াছ—তুমি যে আজ হইতে আমার জামাতা! আমার পুত্র—!"

রাজা আসিয়া আবার লাইকাকে আলিঙ্গন করিলেন।—লাইকা বিস্মিত হইল—কি বলিতে গেল কিন্তু বাক্যস্ফুরিত হইল না! সদা সঙ্গীতপরায়ণ কলভাষী বনবিহঙ্গ

রাজা ডাকিলেন, "রাণি রাণি!"

পট্টবস্ত্রাবৃতা রাজমহিষী আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তখন কন্যার ক্ষুদ্র হস্তখানি লাইকার হস্তের উপর ধরিয়া কহিলেন "এই লও রাণী তোমার কন্যা জামাতা!—তোমার পুণ্যের সীমা নাই—তাই এই কন্যা গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে—তাই এই দেবতুল্য জামাতা লাভ করিলে!—" আবার লাইকা কি বলিতে গেল কিন্তু পারিল না!—

(৩)

শঙ্খ বাজিতে লাগিল!—রাজপুরী আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। রাজকন্যার বিবাহ—লাইকার সহিত!—

দেশবিদেশে মহারাজার নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, কে এমন গুণগ্রাহী আছে—?—কন্যার বিবাহে রাজা মুক্ত হস্তে দান করিলেন—তাহার দানে দেশ অদৈন্য হইল,—কে এমন দাতা?—সকলে উচ্চকণ্ঠে তাঁহার জয় ঘোষণা করিল—আর অকুণ্ঠিত চিত্ত-কণ্ঠে প্রার্থনা করিল রাজকুমারীর কুশল!

কিন্তু—যখন আলোকে সৌন্দর্য্যে গীতরঙ্গে রাজপুরী নবোদ্বোধিত রঙ্গমঞ্চের ন্যায় সুশোভন, তাহার অধিবাসী জনতা যখন আনন্দে মহাচঞ্চল সাগরের ন্যায় বিহ্বল,—তখন যাহার জন্য এত উৎসব সে ক্রমশঃ ম্লান হইতেছিল! এ কয়দিন লাইকার বাঁশী বাজে নাই—সদা চঞ্চল শিশুপ্রকৃতি লাইকা কয়দিন কেন নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া কাটাইয়াছে তাহা কেহ বুঝে নাই! আহারের সময় সে আহার করিত অন্যমনে;—রাজমহিষী উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন

গান করিত—কিন্তু তাহা যেন রোদনের ন্যায় শুনাইত!—

কেহ কিছুই লক্ষ্য করিল না—কেহই কিছু বুঝিলনা—হঠাৎ একদিন প্রভাতে দেখা গেল পাখী উড়িয়াছে! লাইকা নাই! শয্যায় একখানি পত্র পড়িয়া আছে—তাহাতে লেখা, আমার চিত্ত অত্যন্ত বিকল বোধ হইতেছে, তাহাই একবার ঘুরিয়া আসিতে চলিলাম—আমি আবার আসিব"।

পাঠ করিয়া রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—রাজপুরীর সকল আনন্দই যেন নিবিয়া গিয়াছিল! মুখ তুলিয়া রাজা কন্যার প্রতি চাহিলেন—সে তেমনি অম্লান চিত্তে বেড়াইতেছে! তিনি কন্যাকে ডাকিয়া ক্রোড়ে লইলেন। মূর্ত্তিখানি যেন নূতন,—চন্দ্রকলার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ললাটরেখার উপর ঘন কেশরাশির মাঝে তরুণ অরুণ বর্ণ সিন্দুর বিন্দু! তাহার পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া স্বর্ণমুক্তা গ্রথিত বসনাঞ্চল নামিয়া বালিকাকে নববধূর বেশ দিয়াছে, কর্ণে মুক্তাকুণ্ডল, নাসিকায় গজমতি বেসর ঝলমল করিতেছে,—পিতাকে দেখিয়া লজ্জায় চক্ষু দুটি যেন মুকুলিত হইয়া আসিল, ইহাও নূতন!—রাজা মুগ্ধ হইলেন,—তাঁহারও সেই নববিবাহিতা গিরিকন্যাকে স্মরণ হইল। পিতার অন্তর একবার যেন কন্যার দেবীমূর্ত্তির নিকট ভক্তিনত হইতে চাহিল—কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার ভাগ্য বিপর্য্যয় স্মরণ করিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল! শশব্যস্তে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া রাজা কন্যাকে ক্রোড়ে লইলেন।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল—লাইকা আসিল না। প্রত্যহ রাজা রাণী, দেশবাসী আশা করিতে থাকে এই বুঝি লাইকা আসে। কিন্তু সে আশার ধন আর আসিল না।

সে দেশেই আর সে নাই—মুক্তবায়ু কোন্ আকাশে সঞ্চরণ করে তাহা কে জানে? রাজদূত তাহাকে খুঁজিল, পাইল না।

বৎসর শেষ হইল, আবার নবীন বৎসর আসিল,—তাহাও চলিয়া গেল! আবার বসন্তসেনা সহ নবীন বর্ষ দেখা দিয়া শীতের বায়ুর সহিত চলিয়া গেল! কিন্তু কই লাইকা?—চঞ্চল ক্রীড়াশীলা বারির নয়নে একটি ম্লান ছায়া দেখা দিল—পিতামাতা তাহাও লক্ষ্য করিলেন।

(৪)

পাঁচ বৎসর অতীত। লাইকার আশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছে। রাজার অন্তঃকরণ অনুশোচনায় দুর্ব্বল, রাণী তরুণী কন্যার পানে চাহিলেই অবসন্ন হইতেন। আর বারি?—প্রভাতে স্নানশুচি শুভ্রবেশা বালিকা স্বহস্তে ফুল তুলিয়া শিবপূজা করিয়া সন্ধ্যায় দেবারতির প্রদীপ সাজাইয়া পিতামাতার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে আহার করাইয়া সানন্দ মনেই থাকিত—কিন্তু?—হায়—কিন্তু পিতামাতা সর্ব্বদাই তাহার উজ্জ্বল নয়নের কোলে কালিমা চিহ্ন দেখিতেন!—হায় তাঁহারা কি করিলেন!

সে দিন অপরাহ্নে,—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া বৃষ্টিসংরস্ত ঘনমেঘ প্রসারিত, অনতিদূরে গঙ্গাপ্রবাহে তাহার কৃষ্ণছায়া ভাসিতেছে—তটান্তে শ্যামল বনানী ঈষৎ

মুখরিত, নিম্নে আর্দ্র পথরেখায় বধূজনের অলক্তকরঞ্জিত পদচিহ্ন! তাহার উপর সারি দিয়া সিক্তপক্ষ রাজহংসশ্রেণী মৃদু চরণে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের পশ্চাতে ও কে? ভাগীরথীর পবিত্র ফেনহাস্যের মত উছলিত সহাসকান্তি মূর্ত্তি? ও কি লাইকা? হাঁ লাইকাই বটে!

রাজভৃত্য আসিয়া রাজার নিকট তাহার আগমন বার্ত্তা জানাইল। রাজভবনে মৃদু আনন্দ গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু রাজা পুলকিত হইলেন না, বরং আঘাতের উপর পুনরাঘাতের আশঙ্কায় তিনি বিষাদযুক্তই হইলেন।

প্রত্যেক পথিকজনের সহিত সম্ভাষণে কুশল বার্ত্তার আদান প্রদান করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যায় লাইকা আসিয়া রাজার চরণ বন্দনা করিল। গম্ভীর মুখে রাজাও আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

লাইকা বসিল; রাজা নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, তাহার মৃদু হাস্যযুক্ত সলজ্জ মুখখানিতে একটি মৃদু প্রশ্নের আভাষ পাওয়া যায়। তাহার চঞ্চল চক্ষে যেন ব্যগ্র আগ্রহ, সে মুহুর্মুহু আপনার ওষ্ঠাধর সঙ্কুচিত করিতেছে! বহুক্ষণ উভয়েই নীরব থাকিলেন, অবশেষে রাজা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কিছু বক্তব্য আছে?"

অতি মৃদু কণ্ঠে লাইকা বলিল "হাঁ মহারাজ!"

রাজা যেন একটা বিপদকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। বলিলেন "তোমার

লাইকা প্রথমত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, —রাজপুরীতে অবস্থান আমার পক্ষে অসাধ্য তাহা এ কয় বৎসর চেষ্টা করিয়া বুঝিয়াছি। এ অবস্থায়,—" বলিতে বলিতে লাইকা থামিল, আমার পত্নী বলিতে গিয়া সে বলিতে পারিল না। বলিল—"আপনার কন্যা কি আমার সঙ্গিনী হইতে পারিবে?"

চমকিত হইয়া রাজা বলিলেন—তোমার সঙ্গিনী? কোথায়?"

মাথা নীচু করিয়া লাইকা বলিল "আমি যেখানেই থাকি।"

সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ভিখারীর মুখে এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন—পরে বলিলেন, "তোমার স্ত্রী কে তাহা কি তুমি ভুলিয়াছ, লাইকা?

"না মহারাজ ভুলি নাই, তিনি সম্রাট-দুহিতা;—কিন্তু কিন্তু আমি যে তাঁহার সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রভু!—আমি যে রাজভবনে বাস করিতে পারিব না। এ অবস্থায়—

লাইকা আর বলিতে পারিল না—রাজা কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"এ অবস্থায় তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

"আর আপনার কন্যা?"

"সে যেভাবে আছে সেইভাবেই থাকিবে।"

লাইকা অধোবদন হইল। রাজার মুখে রোষচিহ্ন স্পষ্ট দেখা গেল! অনেকক্ষণ পরে লাইকা বলিল—একবার কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।"

রাজা বলিলেন—"কাহার সহিত? বারির সহিত?—না লাইকা ইহা চেষ্টা করিও না! সে বালিকা এখনও তোমায় চেনে না

তোমার সহিত আলাপ সাক্ষাৎ হইলে অভাগিনী চির দুর্ভাগিনী হইবে।"

বলিতে বলিতে সিংহাসনাধিষ্ঠিত রাজাধিরাজের নয়নও ভিজিয়া গেল! লাইকা অবনত মুখে ছিল তাহা দেখিতে পাইল না, বলিল,—মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করিলেন! তাহাই হইবে!" বলিতে বলিতে সে উঠিল রাজা বলিলেন,—"কোথায় চলিলে ?"

লাইকা বলিল—"আমি যাই মহারাজ! সম্ভবত আমার এখানে বাসও আপনাদের শুভদায়ক হইবে না!—কিন্তু একটি প্রশ্ন—"

লাইকার স্বর কাঁপিল, তাহার চির প্রসন্ন নয়নও সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হইল—সে আপনার পদনখরে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—ব্যগ্রস্বরে রাজা বলিলেন—"শোন লাইকা ?"

শরাহত পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুলস্বরে লাইকা বলিল—"না না—মহারাজ একটি প্রশ্ন! আর আমি এদেশে ফিরিব কি না তাহা—"

রাজা আবার ব্যগ্রস্বরে কি বলিতে গেলেন—বাধা দিয়া লাইকা বলিল,—"না এ প্রশ্নও নয়, মহারাজ—আপনি আমার প্রতি কৃপালু—আর আমি চির অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর হতভাগা! নত জানু হই—পিতা! সন্তানকে মার্জ্জনা করিবেন—আর এ পাপ মুখ আপনাকে দেখাইতে আসিব না।"

রাজার চিত্ত তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না! তিনি একবার লক্ষ্য করিলেন, যেন তাহার আসননিম্নে স্তূপীকৃত চন্দ্রকরের ন্যায় লাইকার দেহ নুইয়া পড়িয়াছে! তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।

বহুক্ষণে রাজা যেন সম্বিৎ লাভ করিলেন,—কিন্তু মুখের হাত খুলিয়া দেখিলেন লাইকা নাই। কি সর্ব্বনাশ—সে কি চলিয়া গেল ?

"লাইকা! লাইকা!" রাজা আসন ছাড়িয়া নামিয়া আসিলেন,—দ্বারপাল সসম্ভ্রমে জানাইল—রাজজামাতা বহুক্ষণ রাজপুরী ত্যাগ করিয়াছে!—

চলিয়া গিয়াছে ?—উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত রাজা দ্বারপথে ছুটিয়া চলিলেন,—কোথায় গেল সে ? —কে তাহাকে দেখিয়াছে ?—সকলেই বলিল তিনি গঙ্গাভিমুখে গিয়াছেন!—গঙ্গাতীর ঘনবনে ঘন থাকায়—আম্রবনে ঝিল্লিরব প্রবল হইয়াছে,—এই মৃদুবর্ষণ ক্ষুব্ধ অন্ধকারে লাইকা কোথায় গেল ? "কেন তোমরা কেহ তাহাকে বারণ করিলে না ?"—গভীর বিষাদে সকলেই নিরুত্তর,—সম্রাট উন্মাদের ন্যায় সেই বর্ষণ মধ্যে ছুটিয়া চলিলেন!—

রাজপুরে একি সর্ব্বনাশ! একটা কল্লোলধ্বনি উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রী সকলকে নিষেধ করিলেন—এ বার্ত্তা যেন প্রচার না হয়,—অন্তঃপুরে না যায়!—তাহাই হইল, একটি মাত্র আলোকধারী রাজার সহিত চলিল,—ছত্রধারী পশ্চাতে চলিল! সকলে গঙ্গাতীরে আসিলেন—অন্ধকার তীরে কোথায় লাইকা ? সে ত নাই!

(ক্রমশঃ)

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৭)

প্রার্থনাসমাজ

পরমহংসমণ্ডলী ধ্বংস হইবার পর তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বোম্বাই প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ 'প্রার্থনাসমাজ' নাম ধারণ করিয়া উত্থিত হইল। ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্ ও তাঁহার ন্যায় আর কতকগুলি সজ্জনের প্রযত্নে ১৮৬৭ সালে এই সমাজ স্থাপিত হয়। জাতিভেদ বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কু-রীতির উচ্ছেদ-সাধন মানসে সমাজ কার্য্যারম্ভ করেন। পরে সভ্যেরা বিবেচনা করিলেন সামাজিক বিধানে সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ করায় কোন ফল নাই। যেখানে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভের আশা নাই সেখানে আক্রমণের অন্যতর কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-সংস্কারের উপর দাঁড়াইয়া সমাজ-সংস্কার সহজসাধ্য, এই বিবেচনায় পৌত্তলিকতা পরিহার পূর্ব্বক একেশ্বরবাদ প্রচার সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন দুই একবার বোম্বাই আসিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা লোকের মন উত্তেজিত করিয়া যান। ক্ষেত্র প্রস্তুত, উপযুক্ত সময়েই বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। ১৮৬৭ সালে সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৭২ সালে উহার মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ও ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আসিয়া ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। সুবিখ্যাত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে সমাজের প্রথম সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন, পরে বামন আবাজী মোদক সেই পদে নিযুক্ত হন।

সমাজের প্রথম অবস্থায় শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বক্তৃতা ও উপদেশাদি দ্বারা তাহার উন্নতি সাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ হইতে ঐ সমাজ বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। সভ্যগণের যত্ন ও উৎসাহে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, শ্রমজীবিদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ, এই কয়েকটি শুভকার্য্য-অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়।

১৮৮২ সালে নারায়ণ গণেশ চন্দবারকর (এইক্ষণে যিনি নাইট উপাধিধারী বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি) (১) প্রার্থনাসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। বর্ত্তমানকালে তিনিই সমাজের অধ্যক্ষ ও প্রধান আচার্য্য। তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বগুণে প্রার্থনাসমাজ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার কার্য্য-প্রণালী রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল উভয় পক্ষেরই হৃদয়গ্রাহী। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত জষ্টিশ চন্দবারকরের কতক বিষয়ে সহানুভূতি দেখা যায়, কিন্তু আদি সমাজ যেমন সামাজিকক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট, তিনি সেরূপ নহেন। সমাজ-সংস্কার সাধনে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুরাগ আছে। হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ়

---

(১) ইনি সম্প্রতি ইন্দোরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।



নারায়ণ গণেশ চন্দবারকর

শ্রদ্ধা; সেই সকল শাস্ত্র হইতে যাহা কিছু সদুপদেশ ও সুশিক্ষা লাভ করা যায় তাহা গ্রহণ ও প্রচার করিতে তিনি সর্ব্বদাই তৎপর। অথচ আবার এই নবযুগে আমাদের এই জাতিবিমর্দ্দিত সমাজ-সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা তিনি সম্যক্ অনুভব করিতেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে সকল অংশ এ কালের অনুপযোগী—যাহা জাতীয় একতাবন্ধনের বিরোধী তাহা সংশোধন করা হয় এই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়, কিন্তু এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রের সহযোগিতা চাই, শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তি অবলম্বনে আত্মমত সমর্থন করা সুসাধ্য নহে ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝেন। উপনিষদ ও গীতাদি শাস্ত্রের যে সার শিক্ষা—যে শিক্ষা বলে সাম্য মৈত্রী মনুষ্যত্ব প্রশ্রয় পায়, যাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতাবন্ধনের সাধনীভূত, সেই বল প্রয়োগ করিয়া তিনি সমাজসংস্কার কার্য্যে সিদ্ধিলাভের আশা করিতেছেন। সেই অস্ত্র ধারণ করিয়া জাতীয় বন্ধন স্থাপন উদ্দেশে তিনি আর্য্য-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া জাতীয় সমিতি আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার এই সাধু চেষ্টা অভিনন্দনীয়। তিনি এই কার্য্যে জয়যুক্ত হউন এই আমার একান্ত কামনা।

আর্য্যসঙ্ঘের আমন্ত্রণপত্র নিম্নে পাদটীকায় প্রকাশিত হইল *:—

---

*THE ARYAN BROTHERHOOD.

AN ANTI-CASTE CONFERENCE

The following has been issued by the Aryan Brotherhood of Bombay, of which Mr. Justice Chandavarker is the President.—

It is generally felt by the enlightened portion of the Hindu community, and even the orthodox section of it have come to realise, to some extent, that a more sustained and organized effort than has up to now been attempted must be made to correct the evils of certain social customs, which either under cover of Shastras or of immemorial usage, have retarded the progress of the community, and checked the growth of a spirit of union and fellow-feeling among the numerous castes which compose it. Religious bodies and Social Reform Associations have indeed borne their share in propagating the principles of social reform suited to the requirements of the present times; and it is due to them, and to the enlightening character of British Rule, that public opinion in the Hindu community regards social reform with greater sympathy now than was the case 20 or 25 years ago.

The main cause of the weakness of the Hindu community is its institution of caste in the form in which it has existed for centuries. On this point no doubt a serious difference of opinion still prevails, but the more thoughtful of Hindus perceive that owing to its innumerable congeries of castes, the community has suffered from disintegrating forces that have sapped its energy and vitality.

This is the root of the social evil; and it is to it mainly that the propaganda of social reform must now be directed.

With this view the Aryan Brotherhood has been established. By bringing

প্রার্থনাসমাজের অধীনে শ্রমজীবিদিগের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে, মিলের নিকৃষ্ট কর্ম্মচারী প্রভৃতি শ্রমজীবি লোকদের রাত্রে শিক্ষাদান করা এই বিদ্যালয়গুলির কার্য্য। এইরূপ আটটি নৈশ বিদ্যালয় সহরের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে ৩০০র অধিক ছাত্র মারাটী গুজরাটী ইংরাজিতে শিক্ষা লাভ করিতেছে।

অন্ত্যজ জাতীয়দের শিক্ষাদান।

এই প্রসঙ্গে অন্ত্যজজাতীয় বালক বালিকাদিগের (depressed classes) শিক্ষোপযোগী যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের কথা না বলিলে এই কার্য্য বিবরণী অসম্পূর্ণ থাকে। সিন্দে যিনি পূর্ব্বে প্রার্থনাসমাজের প্রচারক ছিলেন, তিনি এই মিশনের প্রধান উদ্যোগী। তিনি ও তাঁহার দুই ভগিনী, যনাবাই, মুক্তবাই, এই শুভকার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন। বিদ্যালয় চারিটি; ও বালক বালিকা মিলিয়া বিদ্যার্থীর সংখ্যা চারিশত হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের শাখা আকোলা, অমরাবতী, ইন্দোর প্রভৃতি নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

আহ্লাদের বিষয় যে বোম্বাই অঞ্চলে এই মিসন সভার দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে এই সভা তাহার সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং এই অল্প কাল মধ্যে ইহার কার্য্যক্ষেত্র নানাদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার আর্থিক অবস্থাও সন্তোষজনক। স্বর্গীয় ওয়াডিয়া সম্পত্তির ট্রষ্টিগণ তিন বৎসর পর্য্যন্ত এই সভায় বার্ষিক ৬০০০ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ সাহায্যে অধ্যক্ষগণ পারেলে একটি শিল্প বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। পুণাক্ষেত্রেও বোর্ডিং শিল্পবিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সভার অধীনে সবশুদ্ধ ২৭ বিদ্যালয়, ১২০০র অধিক ছাত্র এবং ৫৭ জন বেতনভুক্ শিক্ষক আছেন। ছাত্রগণ ছয় ছয় বিভিন্ন প্রদেশে স্বদেশী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে ভজন-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে

---

together members of different castes of the Hindu community and setting a practical example in the matter of caste reform, it has initiated a work which, it is hoped, will materially further the cause of solid progress. Towards that end the Aryan Brotherhood has resolved to hold in Bombay a Conference of those Hindus who have recognized the evil of caste and attempted to reform the institution on modern lines by the light of the sacred and humanising principles which form the soul of the teaching of the Vedas, the Upanishads and the *Bhagawad Gita*. These, well-studied and dearly cherished, are fitted more than any other to give the message of *Brotherhood* and *Humanity* needed by the times.

The conference will be held on the 9th November. Leading members of the community in sympathy with the object of the Conference will be invited to take part in its deliberations. It will consider only the question of caste, its attendant evils and the measures to be adopted for their removal.

সাপ্তাহিক উপাসনা ও সময়ে সময়ে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

গত বর্ষে পুণায় এই সকল জাতির একটি প্রাদেশিক সমিতি উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ১৭ বিভিন্ন মারাঠা প্রদেশ হইতে অন্ত্যজ-জাতির পঞ্চশাখাভুক্ত সবশুদ্ধ ৩০০ লোক সমবেত হইয়া এই সভার কার্য্যে উৎসাহ পূর্ব্বক যোগদান করে। দুই দিন এই সভার অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে পুণায় নারী মণ্ডলীর যে একটি সভা হয়, শ্রীমতী রাণাডে-পত্নী তাহার অধ্যক্ষতা করেন। তথার অন্ত্যজ জাতীয় প্রায় ২০০ স্ত্রীলোক এবং শতাধিক উচ্চকুলমহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই সমবেত অনেক বর্ণ নারীকুলের পরস্পর সদ্ভাবে মেলা মেশা ও মিষ্টালাপ—ইহা পুণা সমাজে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। সাতারায় এইরূপ আর একটি সমিতি আহ্বান করিবার প্রস্তাব হইতেছে ও সেখানকার প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী।

এই সভার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে সর্ব্বসমেত ৮৫০০০ টাকার প্রয়োজন; তাহার মধ্যে মহারাজা তুকোজী হোলকর প্রাতঃস্মরণীয় অহল্যাবাই হোলকরের নামে পুণায় একটি অন্ত্যজ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। অতিরিক্ত যে টাকার প্রয়োজন বোম্বায়ের ধনকুবেরগণ স্বীয় ধন-কোষ মুক্ত করিয়া সে অভাব মোচন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

প্রার্থনা সমাজ যদিও 'ব্রাহ্ম' নাম গ্রহণে অনিচ্ছুক, তথাপি ইহার গতি ও বিশ্বাস ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরই অনুযায়ী। সমাজের কোন দীক্ষিত উপাচার্য্য নাই, সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা সুবক্তা ও ধর্ম্মোপদেশে সক্ষম তাঁহারাই অবকাশমতে আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ব্রাহ্মসমাজের শাখা প্রশাখা প্রেসিডেন্সির স্থানে স্থানে বিস্তৃত দেখিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইত। আহমদাবাদ যেখানে আমি প্রথমে যাই, সেখানকার সমাজের অধ্যক্ষ ছিলেন ভোলানাথ সারাভাই। মহীপত রাম রূপরাম তাঁহার সহযোগী। মহীপত রাম ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ড যাত্রা করেন, বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি হিন্দুসমাজ হইতে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন সহ্য করিতে-ছিলেন; ভোলানাথ ভাই তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া এই সকল অত্যাচার নিবারণে সাহায্য করেন। এই দুই বন্ধু মিলিয়া সমাজের কার্য্যারম্ভ করেন ও অন্যান্য কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্ম সেই কার্য্যে যোগ দেন। আমি যখন আহমদাবাদে ছিলাম, দেখি ভোলানাথ ভায়ের যত্নে ও উৎসাহে আহমদাবাদ প্রার্থনা সমাজ খুব জমকিয়া উঠিয়াছে। আমিও তাঁহাদের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনে সচেষ্ট ছিলাম। উপাসনার সময় ভোলানাথ প্রণীত প্রার্থনামালা ব্যবহারে আসিত ও তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইত আর আমাদের বাঙ্গলা সঙ্গীত অনুবাদ করিয়া গাওয়া হইত। আমার মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ এক সময় আমার ওখানে গিয়া দিন কতক ছিলেন। সমাজে আমরা দুই ভায়ে মিলিয়া সমস্বরে গান করিতাম। ১৮৮৬ সালে ভোলানাথ ভাই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

গেলেন, যেন নগরের একটি উজ্জলদীপ নির্ব্বাণ হইল। তাঁহার পুণ্য স্মৃতি আহমদাবাদ হইতে শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার মৃত্যুর পর মহীপতরাম সমাজের সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। মহীপতরাম পরলোকগত হইলে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রমণভাই ও পুত্রবধূ সমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মহাত্মার নাম উল্লেখযোগ্য—লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্কর। ভোলানাথ ভায়ের পর ইনি আহমদাবাদ প্রার্থনা সমাজের নেতৃদলের মধ্যে গণ্য। সম্প্রতি তিনি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। লালশঙ্কর একজন স্বদেশের পরম হিতৈষী সাধুপুরুষ ছিলেন। দেশহিতকর এমন কোন সৎকার্য্য ছিল না যাহার অনুষ্ঠানে তিনি উৎসাহের সহিত যোগ না দিতেন। তিনিই পণ্ডরপুর অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী, সুরাপান নিবারণী সভার প্রধান উদ্যোগী, সর্ব্বপ্রকার সামাজিক উন্নতি সাধনে তিনি সতত যত্নবান ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে মত-ভেদ বশতঃ যদিও হিন্দুসমাজ তাঁহাকে স্বীয় গণ্ডীর ভিতর স্থান দিতে সঙ্কুচিত হইত তথাপি তিনি সকলকেই তাঁহার ভ্রাতৃ-আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র জাতিনির্ব্বিশেষে এত প্রসারিত ছিল যে তিনি আপামর সকল লোককেই আপনার জালে আকর্ষণ করিতেন, কাহাকেও আপনা হইতে দূরে রাখিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা সরল সাধুচরিত্রগুণে সকলেরই চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাঁহার কোন শত্রু ছিল না, সকলকেই তিনি মিত্ররূপে বরণ করিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে প্রার্থনা সমাজ, এমন কি গুজরাটের সমগ্র হিন্দুসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গুজরাটে যে ব্রহ্মোপাসনার বীজ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা অল্পে অল্পে অঙ্কুরিত হইতেছে; কালক্রমে ফলবান্ বৃক্ষরূপে সমুত্থিত হইবে, এরূপ আশা করা দুরাশা নহে।

সাতারা, যেখানে আমার সর্ব্বিসের শেষ ভাগ অতিবাহিত হয়, সেখানেও একটি প্রার্থনা সমাজ ছিল। সেখানকার কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্ম মিলিয়া সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন ও তাহার সাম্বৎসরিক উৎসবে বোম্বাই পুণা প্রভৃতি স্থান হইতে বাহিরের লোকেরও সমাগম হইত। তাঁহাদের মধ্যে একটি সুগায়ক ইহুদী ব্রাহ্মকে আমার বেশ মনে পড়ে। চিন্তামণ নারায়ণ ভট, আমার একটি বন্ধু, এই সকল কার্য্যে সহায়তা করিতেন। সমাজ-সংস্কার-ব্রতী উন্নতিশীল যুবকবৃন্দের তিনি একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। শুধু মুখে নয়, অনুষ্ঠানেও তিনি তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। হায়, তিনিও আর এক্ষণে নাই।

পুণাপ্রার্থনাসমাজের অধিনায়ক আমাদের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক, ডাক্তার ভাণ্ডার-কর। তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্তবলে সেখান-কার সমাজ উন্নতির মার্গে পরিচালিত হইতেছে। শ্রদ্ধেয় ভাণ্ডারকর যতদিন হাল ধরিয়া আছেন ততদিন সে সমাজের ভবিষ্যতের জন্য কোন ভাবনা নাই। এক-দিকে যেমন ভাণ্ডারকর, অন্য দিকে তেমনি স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের পত্নী স্ত্রী-মণ্ডলের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। পুণা-

সমাজে তিনি তাঁহার মৃত পতির সুযোগ্য উত্তরাধিকারিণী। উচ্চশ্রেণী বালিকাবিদ্যালয়, বিধবাশ্রম প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান স্ত্রীদিগের শিক্ষা ও উন্নতিরকল্পে পুণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনি তাহাদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া যোগ্যতাসহকারে কার্য্য চালাইতেছেন। এই ক্ষেত্রে এমন কোন সৎকার্য্য নাই যাহার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট নহেন।



রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর

সিন্ধ্ দেশেও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। হাইদ্রাবাদে তাহার গোড়া পত্তন করেন—নবলরাও আড়বাণী। আমি সে সময়ে হাইদ্রাবাদে ডিষ্ট্রিক্ট জজের কর্ম্ম করি ও নবলরাওকে তাঁহার কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করি নাই। তাঁহার বিনয় নম্রতা ও সাধুতাগুণে সিন্ধিরা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। জেলের কয়েদীদের মধ্যে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিবার অনুমতি আনাইয়া তিনি প্রতি সপ্তাহে জেল পরিদর্শনে যাইতেন। সেখানে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনাদির সুফলও ফলিয়াছিল। নবলরাওয়ের পরবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহার ভ্রাতা হীরানন্দ। ইনি কলিকাতায় গিয়া বিদ্যাভ্যাস ও নববিধান শাখার সংস্রবে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। ইঁহার ন্যায় পরোপকারী সেবাপরায়ণ নির্ম্মল চরিত্র সাধুপুরুষ ঐ প্রদেশে অতি বিরল। সাধু হীরানন্দের স্মৃতি এখনও পর্য্যন্ত ও অঞ্চলে জাগরূক রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর

পর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র করাচীতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধ্যাপক বসওয়ানী কিয়ৎকাল করাচী সমাজের কার্য্য করেন, সম্প্রতি তিনি পঞ্জাবে দয়ালসিং কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া লাহোর গিয়াছেন। মোটের উপর সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ভালই চলিতেছে বলিতে হইবে।

বোম্বায়ের প্রার্থনাসমাজের উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাস সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে ওখানকার আধুনিক ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার চেষ্টা কিছু কিছু জানা যাইতেছে। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য আপন সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে অনেক কার্য্য করিতেছে কিন্তু বিরাট হিন্দু-সমাজে তাহা বিন্দুমাত্র। তাহার প্রভাব কতটুকু? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে ক্ষুদ্র বলিয়া তাহা হেয় নহে। কোন্ অল্পসূত্র হইতে কি বৃহৎ কার্য্য প্রসূত হয় তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিয়তই পাঠ করা যায়। আমরা অদূরদর্শী, বিশ্ববিধাতার কার্য্য প্রণালীর সকল দিক্ দেখিতে পাই না, সুদূর পরিণাম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেবল এ কথা অসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যায় যে ঈশ্বরের রাজ্যে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, যাহা সত্য মঙ্গল তাহা স্থায়ী, যাহা অসত্য শীঘ্রই হউক্ বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই তার পতন। যেমন গীতা বলিয়াছেন, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" যাহা অসৎ তাহা নশ্বর যাহা সৎ তার বিনাশ নাই।

বোম্বাই সমাজে যে সকল শক্তি অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করিতেছে প্রার্থনাসমাজ তাহার অন্যতর। আর আর শক্তির কার্য্য কতক আমাদের বোধগম্য, কতক বা দৃষ্টিবহির্ভূত। যাহা স্পষ্ট দেখা যায় তাহা ভারতের সর্ব্বত্রই সমান—সে হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষ; পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞানের আলোক-কিরণ, এক কথায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। এই শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজে কত না পরিবর্ত্তন হইতেছে, ভবিষ্যতেও কিরূপ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইবে তাহা আমাদের কল্পনাতীত। আমার মনে হয় আমাদের সকল প্রকার সামাজিক রোগের মহৌষধ—নরনারীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। আমাদের গোড়ার অভাব সেই শিক্ষার অভাব। লোকসাধারণে শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা—বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজ-সংস্কার চেষ্টা সর্ব্বৈব ব্যর্থ হইতেছে। শিক্ষা চাই, শিক্ষা চাই, এই আমাদের আর্ত্তনাদ। যাহা হইয়াছে তাহা অল্পই, আরো অনেক দরকার। এই কারণেই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি। তবে এইখানে বলিয়া রাখি যে, এই হিন্দু য়ুনিবার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষেরা যেন সব দিক দেখিয়া উদারভাবে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহারা যদি কালস্রোতের প্রতিকূলে উজান বহিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, যে সকল কুসংস্কার হইতে আমরা বহু তপস্যায় মুক্তি লাভ করিয়াছি সে সকলকে পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা করেন, যে সমস্ত সামাজিক নিয়ম আমাদের জাতীয় একতার বিরোধী, জাতীয় উন্নতির প্রত্যবায় সে সমস্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন, তাহা হইলে এই য়ুনিবার্সিটি স্থাপনের ফল হিতে বিপরীত হইবে। ঘড়ির কাঁটা উল্টা দিকে ফিরাইতে

গেলে ঘড়ি বন্ধ হইয়া যায়। যাঁহারা এই য়ুনিবর্সিটি চালাইবার ভার লইবেন তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে শাস্ত্র অপেক্ষা সত্য গরীয়ান্, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যেন সত্যের অবমাননা না হয়, ধর্ম্মের নামে গোঁড়ামি প্রশ্রয় না পায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বসন্ত-সায়াহ্নে

(গল্প)

সেদিন শনিবার। হাইকোর্টের ছুটি ছিল। বৈকালে গাড়ী চড়িয়া মাঠের দিকে বেড়াইতে বাহির হইলাম।

রেস্-কোর্স ছাড়াইয়া হেষ্টিংসের ভিতর দিয়া গাড়ী গঙ্গার ধারে ছুটিল। পথের এক পার্শ্বে বিস্তীর্ণ ময়দান। ময়দানে সাহেবদের ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল লইয়া খেলা করিতেছে; মেয়েরা দড়ি ঢুলাইয়া ডিঙ্গাইতেছে, লাফাইতেছে! যেন আনন্দের সজীব মূর্ত্তি! অপর পার্শ্বে সাহেবদের ছোট ছোট বাঙ্‌লো। সম্মুখস্থ পরিচ্ছন্ন খোলা জায়গায় বেতের চেয়ারে বসিয়া নর-নারীর দল চা খাইতেছে, গল্প করিতেছে। চারিধারেই যেন বিশ্রাম ও আনন্দের একটা কলধ্বনি ছুটিয়াছে!

অদূরে কর্ম্মশ্রান্ত যাত্রীর দল বুকে লইয়া ট্রামগাড়ী চলিয়াছে। কাতর দীর্ঘনিশ্বাস বায়ুতে মিশাইয়া ক্লান্ত ধরণী যেন আরাম ও বিশ্রামের সুমধুর সম্ভাবনায় ঈষৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে!

ফাল্গুন মাসের শেষ। মাঠের ধারে বড় বড় গাছগুলা নূতন চিক্কণ পত্র-পল্লবের মালা বুকে ঢুলাইয়া নায়িকার মতই সাজিয়া যেন কাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। কোন গাছে গোলাপী ও হরিদ্রা বর্ণের ফুল ফুটিয়া বাতাসকে মদির গন্ধে বিহ্বল, চকিত করিয়া তুলিয়াছে।

গাড়ী আসিয়া গঙ্গার ধারে পড়িল। ওপারের চিমনি হইতে গাঢ়-কৃষ্ণ ধূম নির্গত হইয়া আকাশটাকে কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। গঙ্গার নির্ম্মল বুকে সে কালিমার ছায়াপাত হইয়াছে। সেই ছায়া ঢুলাইয়া ভাঙ্গিয় মৃদু তরঙ্গ নাচিয়া খেলা করিতেছে! একটা বড় বাড়ীর আড়ালে থাকিয়া লোহিত সূর্য্য এ পারের পানে ম্লান দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। তাহার রশ্মিচ্ছটাগুলা চারিধারে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সূর্য্য যেন অসংখ্য বাহু বিস্তার করিয়া এ পারকে আঁকড়িয়া থাকিতে চাহিতেছে! তাহারই প্রতিবিম্ব জলে পড়ায় মনে হইতেছিল, জলের উপর স্থানে স্থানে কে যেন লাল কালির রেখা টানিয়া দিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য জাহাজ। নৌকা ও ষ্টীমার দ্রুত ছুটিয়াছে! সকলেই কাজ সারিয়া ঘরে ফিরিয়া বিশ্রাম-শান্তি পাইবার জন্য যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছে!

গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। চারি-ধারে মহিমাময় দৃশ্য চোখে পড়িল। প্রকৃতি

যেন গোপন কক্ষ খুলিয়া আপনার সযত্ন-সঞ্চিত সমস্ত সৌন্দর্য্য মুক্ত করিয়া জগতের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে! সে সৌন্দর্য্য-রস-ধারায় প্রাণ আমার স্নিগ্ধ হইল, মন জুড়াইয়া গেল।

সপ্তাহের কয়টা দিন, শুধুই পয়সার সন্ধানে বাক্-চাতুরী দেখাইবার মিথ্যা শ্রমে কাটিয়া যায়! নজীরের কেতাব ও মক্কেলের ব্রিফের মধ্যেই জগতের সর্ব্ব-সুখ ও সর্ব্ব-সম্পদের পরিচয় লইতে সমস্ত সময় ব্যয় করিয়া ফেলি,—জগতের পানে প্রকৃতির পানে চাহিবার মুহূর্ত্ত অবসরও খুঁজিয়া পাই না! আজ একটা আকস্মিক অবসরের শুভ-মুহূর্ত্তে বাহিরের কি অমর সম্পদ এ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল!

খানিকটা হাঁটিয়া আসিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিলাম। চোখের পলক যেন আর পড়িতে চাহে না। পাও সরিতে জানে না! সূর্য্যাস্তের মহিমাময় দৃশ্যে আমি কেমন তন্ময় হইয়া পড়িলাম। এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য এমনভাবে ছড়ানো রহিয়াছে! ইহার কাছে পয়সার দাসত্ব আজ নিতান্তই তুচ্ছ মনে হইল। কর্ম্ম-কাতর প্রাণের মধ্যে শান্তির একটা হাওয়া বহিয়া গেল।

সহসা একটা কথা কানে গেল,—"তুমিও যেমন! বড় বাবুটা সাহেবের ভারী খোসামুদি ধরেছে। দেখ না, নিজের সম্বন্ধীকে এনে কাজে লাগিয়ে দিলে, আর আমরা এতদিন মুখে রক্ত তুলে খাটচি, তবু সে যে ত্রিশ টাকা, সেই ত্রিশ টাকা! উন্নতির এতটুকু সম্ভাবনা অবধি নেই!"

আমি মুখ ফিরাইয়া চাহিলাম। দুইজন ভদ্র লোক ধীর পদে পথে চলিয়াছে। অপর জন কহিল, "বড়বাবুর খোসামুদি করতে পার, দু'বেলা তাঁর বাড়ীতে হাজিরে দাও, তাঁর সেই খোসে-ধরা ছেলেটাকে কোলে তুলে আদর কর, তবে যদি দু-চার টাকা মাইনে বাড়ে!" লোক দুইটি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। আমি তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলাম। তৈল-ঘর্ম্ম নিষিক্ত মলিন শার্ট পরিয়া রুক্ষ কেশে শুষ্ক মুখে ছিন্ন জুতায় পা ঢাকিয়া চলিয়া রাস্তা বাঁকিয়া চোখের আড়ালে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অন্তর মথিত করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। আহা, বেচারা!

পর-মুহূর্ত্তেই আবার চারি-পাঁচজন লোক দেখা দিল। মুখ দেখিয়া মনে হয়, কাজ হইতে তাহারা গৃহে ফিরিতেছে। একজন কহিল, "হেঁঃ! সত্য এসেছিল চালাকি করতে, বুঝলে নবীন! চেনেন না ত—আমা-হেন ধনী, তার চোখে ধুলো দেবে! আমার সঙ্গে এ? হেঁঃ!"

সঙ্গীর দল হাসিয়া উঠিল। আমি আবার তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিলাম। তখনই আবার আর এক দল দেখা দিল। একজন অপরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ভালো করিয়া কি-যেন বুঝাইতেছে! হাতে তাহার একটি শততালি-যুক্ত ছাতা,—পায়ে ছিন্ন চটি, হাঁটু অবধি ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে। সহসা তাহার কথা কানে গেল। সে বলিল, "জামাইটা রোজগার করে মন্দ নয়! তা হলে কি হবে! এদিকে যে মানুষ নয়! নেশা-ভাঙেই উচ্ছন্ন গেল। মেয়েটা আমার চোখের জলে দিন কাটাচ্ছে। আমার কি কম আদরের মেয়ে! ওর

বিয়েতে সাধ্যের অতিরিক্ত পয়সা খরচ করেছি। দুটো পাশ দেখে জামাই করি! বিয়ে দিতে আমায় ভিটে অবধি বাঁধা পড়ে। সে বাঁধা আর খোলসা করতে পারিনি। বাড়ী বিকুল, সব গেল। ছোঁড়াদুটোরও লেখাপড়া দেখতে পারলুম না,—সে-দুটোও বকে গেল। আর আমার সেই মেয়ে—"

লোক দুইজন চলিয়া গেল।

এ যেন সংসারের রঙ্গশালায় দৃশ্যের পর দৃশ্য-পরিবর্ত্তন হইতেছিল। শুধুই করুণ নাটকের মর্ম্মস্পর্শী ইঙ্গিত! সকলেই [illegible] প্রাণের তীক্ষ্ণ অভিশাপে বসন্তের এই মধুর সায়াহ্নকে চিরিয়া দাগিয়া পথ চলিয়াছে। সকলের মুখেই ক্ষুদ্র অভাব-অভিযোগের কথা। হারে অভাগার দল!

মনে একটা কেমন চাঞ্চল্যের তরঙ্গ উঠিল। আর একটু আমি অগ্রসর হইলাম। দুইজন ভদ্রলোক,—একজনের পরণে কোট্ পেণ্ট্‌লেন, মাথায় ক্যাপ, অপরের কালা-পাড় ধুতি,—গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি। পেণ্ট্‌লেন পরিহিত ভদ্রলোকটি কহিলেন, "বিষম ফ্যাসাদ! বড় ভাই এসে জুটেচেন। তাঁর অসুখ! তাঁকে দেখাও, চিকিৎসা করাও। কম হাঙ্গাম! যেমন আমি কোন ঝঞ্ঝাট ভালবাসি না—"

ধুতি-পরিহিত দুই নম্বরের বাবুটি কহিলেন, "কেন, তাঁর কি চাকরি বাকরি নেই?"

ভদ্রলোকটি রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। আমিও একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম। এক-নম্বর কহিলেন, "কেন থাকবে না? পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পান, তাও আবার মফঃস্বলের চাকরি! বুঝে চললে কখনও পরের গলগ্রহ হতে হয়! সেকালের এই জয়েণ্ট ফ্যামিলির ব্যাপার আমার ভারী বিশ্রী ঠেকে। ও বিলিতি ধরণ বেশ! যে যার নিজের পায়ে দাঁড়াও। আর আমাদের দেশে একজনের সময় ভালো হল ত, পঞ্চাশ জন জ্ঞাতি-কুটুম এসে অমনি ঘাড়ে চড়ে বসল!"

দুই নম্বর বলিলেন, "তা কি করবে বল? বড় ভাই!"

এক নম্বর রুক্ষ স্বরে কহিলেন, "হলেনই বা বড় ভাই! আমারও ত ছেলে-পিলে আছে—বিপদ আপদ আছে! আজ যদি আমি চক্ষু মুদি—?"

কে যেন আমার বুকের মধ্যে ফ্যাঁস্ করিয়া একখানা ছুরি টানিয়া দিল। এ কি কথা! বড় ভাই! তাহার দুর্দ্দিনে তাহাকে দুই দিন আশ্রয় দিতে হইয়াছে, অমনই মনের মধ্যে গরলের উৎস শতধারে উছলিয়া উঠিয়াছে। ইহারই নাম, জীবন-অভিনয়? কি ক্রূর পৈশাচিক এ অভিনয়!

এ জগৎ নাট্যশালা, সত্যই নাট্যশালা। কিন্তু কৈ, প্রমোদের মধুর নাটকের অভিনয় ত বড় দেখিতে পাই না। এমন সুন্দর মধুর বসন্ত-সায়াহ্ন, শুধুই করুণ নাটক, শুধুই বুক-ফাটা হাহাকারের তীব্র উচ্ছ্বাস! শুধু দুঃখ, শুধু শোক, শুধু দ্বন্দ্ব! শুধুই দুর্ম্মদ অহঙ্কারের মত্ত হুঙ্কার!

ওপারের পানে চাহিলাম। সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে! চারিধারে ছায়ার যবনিকা নামিয়া পড়িয়াছে! আমার মনে হইল, প্রকৃতি যেন অভিমান করিয়াই আপনার

সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু আবার গোপন-কক্ষে লুকাইয়া ফেলিয়াছে। মিথ্যা এ সৌন্দর্য্য লইয়া বাহিরে আসা! মানুষের চোখ নাই, মন নাই! কে এ সৌন্দর্য্য দেখিবে? কে বুঝিবে? শুধুই তর্ক তুলিয়া, পয়সার মাপ-কাটি লইয়া সকলে পথে চলিয়াছে। এ মুক্ত অবাধ সৌন্দর্য্যের পানে কেহ ত চাহিয়া দেখিল না! আপনাকে লইয়াই অহর্নিশি শুধু মত্ত রহিয়াছে! এতটুকু মুহূর্ত্ত, এতটুকু ক্ষণও তাহারা বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিবে না? আশ্চর্য্য।

আকাশে দুই-একটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। রাস্তার আলোগুলা কে ক্ষিপ্র জ্বালিয়া চলিয়াছিল। কোন দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া পথের উপর দিয়া অসংখ্য গাড়ী গম্-গম্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারই অন্তরাল ভেদ করিয়া প্রকৃতির মৌন অভিমানের বেদনা-কাতর ম্লান দীর্ঘ-শ্বাসের করুণ ঝঙ্কারটুকু আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। গাড়ী আলোক-উজ্জ্বল ঈডেন উদ্যানের দিকে ছুটিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

গান

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়
পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন।
তারি গলার মালা হতে
পাপ্‌ড়ি হোথায় লুটায় ছিন্ন।

এল যখন সাড়াটি নাই,
গেল চলে জানালো তাই,
এমন করে আমারে হায়,
কেবা কাঁদায় সে জন ভিন্ন!

তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো
পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত সে রঙিন বেশে
ধরায় সেদিন অবতীর্ণ!

সেদিন খবর মিল্‌ল না যে!
রইনু বসে ঘরের মাঝে।
আজকে পথে বাহির হব
বহি আমার জীবন জীর্ণ!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

বেহাগ—একতালা

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ ম II প া র্স। া ন া। পঃক্ষঃ ধঃপঃ া। ম গ া I
আ মার ভা ঙা ০ প থে র রা ঙা ০ ধূ লা য়

া ম ন। ধ পঃক্ষঃ প। ম গ া। ন্ র স I
প ড়ে ০ ছে কা র পা য়ে র চি ০ হ্ন

সঃন্ঃ স া। ম গ া। ন্ স ম। া গ রঃগঃ I
তা রি ০ গ লা র মা লা ০ হ তে ০

গঃপঃ া া। পঃক্ষঃ ধঃপঃ া। ম গ া। ন্ র স I
পা প্ ড়ি হো থা য় লু টা য় ছি ০ ন্ন

পঃক্ষঃ প া। পঃনঃ া র্স। র্স া া। র্সঃনঃ র্স া I
এ ল ০ য খ ন সা ড়া ০ টি না ই

পঃর্সঃ া া। র্র র্স া। ন নঃপঃ র্স। া ন া I
গে ল ০ চ লে ০ জা না ০ লো তা ই

প া র্স। া ন া। পঃক্ষঃ ধঃপঃ া। ম গ গ I
এ ম ন ক রে ০ আ মা ০ রে হা য়

গ া ম। পঃক্ষঃ ধঃপঃ া। ম গ া। ন্ র স II
কে ০ বা কাঁ দা য় সে জ ন ভি ০ ন্ন

স II স া প। পঃক্ষঃ ধঃপঃ া। স া ম। া গ া I
তখন ত রু ণ ছি ল ০ অ রু ণ আ লো ০

ন্ া স। গ া ম। প ম গ। ন্ র স I
প থ টি ছি ল ০ কু সু ম কী ০ র্ণ

। । ।। গ । ম। প । র্সা। । ন । I
ব স ন্ ত সে • র ঙি ন বে শে •

পঃক্ষাঃ ধঃপঃ ।। ম গ রঃপঃ। ম গ ।। ন্ র স II
ধ রা য় সে দি ন অ ব • তী • র্ণ

II প । না। । । র্সা। । । ।। র্সঃনঃ র্রঃসঃ । I
সে দি ন খ ব র মি ল্ ল না যে •

প র্স ।। র্সঃনঃ র্রঃর্সঃ ।। ন নঃধঃ পঃর্স। । ন । I
র ই নু ব সে • ঘ রে র মা ঝে •

প র্স ।। । ন ।। পঃক্ষাঃ ধঃপঃ ।। ম গ । I
আ জ কে প থে • বা হি র হ ব •

। । ম। পঃক্ষঃ ধঃপঃ ।। ম গ ।। ন্ র স I
ব হি • আ মা র জী ব ন জা • র্ণ

বিবাহ সমস্যা

আজ কাল বঙ্গদেশে বিবাহ সম্বন্ধীয় বহুবিধ আলোচনার উত্থাপন হইতেছে। পাঠ্য জীবনে এক সময়ে এই সমস্যাটি আমাদিগকে কতকটা চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। আজ সেই চাঞ্চল্যের যতটুকু ঢেউ এই আলোড়নে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহারই প্রতিঘাতস্বরূপ দুই একটি কথা বলিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

স্নেহলতা দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে কলিকাতায় বেশ একটা আন্দোলন চলিয়াছে; কেহ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, কেহ বা তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। সীমাবদ্ধ বয়সে বিবাহ দিতে বাধ্য হওয়ার দরুণ কন্যার পিতার নানা প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়; এই বয়সের সীমানা উপযুক্ত ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে কেহ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কেহ বা পণ গ্রহণ ইত্যাদি প্রথাকে কন্যার পিতার দুর্গতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, সে প্রথা উৎপাটিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কলিকাতায় যে ভাবের তরঙ্গ আন্দোলিত হইয়া ওঠে, সুদূর পল্লীগ্রামগুলিতে যে তাহার আঘাত কতকাংশে গিয়া পৌঁছায় না তাহা নহে। তবুও পল্লীগ্রামে সহরের প্রভাব বিস্তার করা তেমন সহজ নহে। অথচ পল্লীগ্রামই দেশের প্রকৃত সমাজ, সহরে ভাব তেমন জমাট বাঁধিতেই পারে না। ইহারই জন্য সহরের লোককে পল্লীবাসিগণ অনেক বিষয়ে উচ্চাসন দান করিয়াও, বিধি-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে তাহাদিগকে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। বিশেষতঃ সহরের লোক গ্রামে পদার্পণ করিয়া বসন্তকোকিলের ন্যায় ডালে বসিয়া গান গাহিয়াই চলিয়া আসে, ভূতলে নামিয়া গ্রামের সকল প্রকার সুখ দুঃখের স্থায়ী ভাগ লইবার তাহাদের

অবসর হয় না। অতএব কলিকাতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগ্মিতা, সমাজসংস্কারের প্রবল আন্দোলন, বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছায় কিনা এবং পৌঁছিলেও কার্য্যকর হয় কি না সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ।

আর এক কথা, কলিকাতার সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রকারের আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলন বাস্তবিক পক্ষে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কি না? আমার মনে হয়, অন্তরে যাহার দুঃখ রহিয়াছে বাহিরে তাহার মলম ব্যবহারে কি উপকার হইবে? অন্তরের ভিতরে যাহাতে মলম প্রয়োগ করা যায়, তাহার বন্দোবস্ত যতদিনে না হয়, অন্তর হইতে যতদিনে ঘা শুকাইয়া না উঠে, তত দিনে উপরের ঘা কিছুতেই ভাল হইবে না। ভিত্তি দৃঢ় না হইলে ছাদ কাহার উপর ভর করিয়া দাঁড়াইবে? বঙ্গদেশের সুধীবৃন্দ বিবাহ সংস্কারের জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিতেছেন, তাহাতে সমাজের অন্তরের ব্যাধি নির্ম্মুক্ত হইবে না, বরং বাড়িয়াই চলিবে। বিবাহোপযোগী বয়স নির্দ্ধারিত করিলে কি লাভ হইবে? চৌদ্দর স্থলে ষোল হইলে কন্যার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কন্যার পিতার ধন বৃদ্ধির কি কোনও সম্ভাবনা আছে? বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ বৃদ্ধির সম্পর্ক কোনও শাস্ত্রে আজও পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। অধিকন্তু যখন অধিক বয়স্কা কন্যা স্কন্ধের উপর বিরাজিতা থাকিবে, তখন কন্যাভারাবনত পিতার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইবারই সম্ভাবনা। তখন ফোর্থ ক্লাশ হইতে বিতাড়িত কুলরত্নগণও তাঁহাকে এক ধাক্কায় ধূলিসাৎ করিয়া দিতে সক্ষম হইবে। কন্যার পিতার ইহাতে দুর্গতি বাড়িয়া চলিবে বই কমিবার আশা বিন্দুমাত্রও আছে বলিয়া মনে হয় না। এবং এই সকল ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমতী কন্যাগণ পিতৃলাঞ্ছনা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করিবে।

তারপরে বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ারই বা কি প্রয়োজন আছে? কোনও নির্দ্দিষ্ট বয়সে বাংলায় বিবাহ পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে কি? এক বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন্ বয়সে না বাংলার হিন্দু সমাজে বিবাহ হইয়া থাকে? অষ্টম বর্ষে গৌরীদান কয়জনে এখন করিয়া থাকে? কচি বয়সে বিবাহ দেওয়া অকল্যাণকর জ্ঞান করিয়া যাঁহারা বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত করিতে উৎসাহিত তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। কিন্তু বিবাহকালীন কন্যার পিতার লাঞ্ছনা ইহাতে কমিবে বলিয়া ত মনে হয় না। পণগ্রহণ প্রথার সংস্কারেও বিবাহের দুর্গতি নিবারিত না হইয়া বরঞ্চ দৃঢ় হইবারই সম্ভাবনা। তবে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে এ দুর্গতি দূর হইবে তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য সমস্যা। অবশ্য আমি নিঃসন্দেহে স্বীকার করি যে পণ গ্রহণ প্রথাটি সামাজিক আত্মহত্যা বই আর কিছুই নহে। উহাতে বরের পিতা ধনী হন না এবং কন্যার পিতা রসাতলে গমন করেন। এক পাড় ভাঙ্গিয়া আর এক পাড় যদি ভরিয়া উঠিত, বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিবাহের পরের দিন পণের টাকা কোনও বরকর্ত্তার সিন্ধুকে জমা থাকে বলিয়া প্রায়ই শোনা যায় না। পরের রক্ত শোষণে টাকা উপায় করিয়া মানুষ সে টাকা সুখে ভোগ করিবে কেমন করিয়া! পাপে উপার্জ্জিত টাকা প্রায় সবই বৃথা ব্যয়িত হইয়া যায়। নিতান্ত গরীব ব্যক্তিও হাতে টাকা পাইয়া নানা প্রকার বড়মানুষী অবলম্বন করিয়া দিনেকের জন্য ছোট খাট একটি নবাব সাজিয়া বসেন। পরের হৃদয়ের রক্ত, জীবন মরণের সমস্যা লইয়া এমন ভাবে ছিনিমিনি খেলা যে ঘোর পাশবিক ব্যাপার তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

তথাপি আমাদের এ প্রসঙ্গেও কিছু কিছু বক্তব্য রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস এই পণগ্রহণের প্রথাটি বিদ্যমান আছে বলিয়া আমাদের মেয়েদের সামান্য কিছু মূল্য আছে। ইহার অভাবে আমাদের মেয়েগুলি রাস্তার নুড়ি খোয়ায় পরিণত হইবে। ইহার প্রধান কারণ, আমাদের কন্যাগণ পিতৃ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত। মেয়ে স্বামীর ঘরে আসিবার সময় কোনও পিতৃসম্পদ লইয়া আসে না। কাজেই তাহাকে আশ্রয় দিয়া এক বৃহৎ পরিবারের সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকট হইতে অর্থ সম্বন্ধীয় কোনও প্রকার সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। এই ভীষণ জীব

সংগ্রামের দিনে কোন্ শ্বশুর শাশুড়ী, বা কোন্ স্বামী ঘরের বউকে কোনও মূল্যবান জিনিষ জ্ঞান করিয়া আদর যত্ন করিতে পারে? মুসলমানের মেয়েরা পিতৃ সম্পত্তির অংশ পাইয়া থাকে, তাহাদিগকে সংসারের ভার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া কেহ অবহেলা করিতে পারে না। আমাদের মেয়েদিগকে শুধু বিবাহ দিলেই ত হইবে না। তাহারা যাহাতে সুখী হইতে পারে, তাহারও ত বন্দোবস্ত করা দরকার। শ্বশুর ঘরে গিয়া তাহারা কোনও প্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য না করে, তাহারও ত উপায় খুঁজিয়া বাহির করা কর্ত্তব্য। আমার ত মনে হয়, শুধু এই ভাবনার প্রেরণায় উত্তেজিত হইয়া অনেকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও শান্তি বোধ করেন। মনে করেন, কন্যার সঙ্গে এমন কিছু প্রদান করা হইয়াছে, যাহাতে কন্যাকে কেহ অবহেলা করিতে পারিবে না। পণগ্রহণ প্রথাকে তাড়াইয়া দিবার পূর্ব্বে আমাদিগের এই ভাবেও খানিকটা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে আইন করিয়া কন্যাকে পিতৃ সম্পত্তির অংশীদার করা হয়, অথবা যদি বঙ্গদেশীয় নেতৃবৃন্দ কন্যাকে সম্পত্তির অংশদান করিতে বদ্ধ পরিকর হন, তাহা হইলে যাঁহাদের সম্পত্তি আছে তাহাদের কন্যাগণের জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। কিন্তু ঐ সম্পত্তিই বা কয়জনের আছে? সহস্র সহস্র বাঙ্গালী বাবু আফিসে আফিসে দুঃসহ কেরাণী জীবন যাপন করিয়া মাসিক পনের বিশ টাকা উপায় করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করেন। সংসারে আর কোনও অবলম্বন নাই, শুধু ঐ বিশ টাকা। পাঁচডিগ্রী জ্বর লইয়াও ঐ চাকুরী করিতে হইবে, এক দিন শয্যাশায়ী থাকিলে তার পর দিন অন্ন জুটিবে না। এমন বাঙ্গালী বাবুর সংখ্যা ত নিতান্ত কম নহে। ইহাদের কন্যাদায় হইতে মুক্তির উপায় বাংলার নেতৃবৃন্দ কি ব্যবস্থা করিবেন?

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, সংসারের সকলেই কি সুখ ভোগ করিবে? বংলার সকলেই কি বর্দ্ধমানের মহারাজা বা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী হইবে? সুখী যেমন আছে দুঃখীও তেমনি থাকিবে। এ কথার কেহই প্রতিবাদ করিতে পারেনা। মানবের পৌরুষ যত দূরে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার বাহিরে গিয়া কোনও বিষয়ের আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু দুঃখীর দুঃখ কি ভাবে মোচন করা যায়? গৃহীকে আশ্রয়, অন্নহীনকে অন্ন, সন্তাপিতকে সান্ত্বনা, কি ভাবে দেওয়া যায়? সেই চিন্তাই সমাজের চিন্তা। সেই কার্য্যেই মানুষের পৌরুষ। আজ, এই ভাবেই দরিদ্রপিতার লাঞ্ছনা কি ভাবে দূর করা যায়, তাহা আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে। নতুবা দিনে দিনে কত স্নেহলতা আপনাকে উৎসর্গ করিবে, তাহার ইয়ত্তা থাকিবে না।

আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে এই একটি সামান্য দুর্ঘটনাকে দূর করিতে হইলে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। বিবাহপদ্ধতি সম্যক পরিবর্ত্তিত না হইলে অন্য কোনও উপায়ে হিন্দু সমাজের বিবাহ লাঞ্ছনা দূরীভূত হইবে না। ঘায়ের উপরিদেশে মলম দেওয়ার মতন সকল চেষ্টা বৃথা হইয়া যাইবে। আজ কাল কন্যার পিতার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, কিছুকাল পূর্ব্বে বরের পিতাকেও কিন্তু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। তখন নির্দ্দিষ্ট অর্থ পণ স্বরূপ কন্যাপক্ষকে প্রদান করিয়া বিবাহ করিতে হইত। আজ বরপণরূপ দুর্নীতিকে দূর করিতে হইলে আমাদের বহুবিধ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া না গেলে চলিবে না। যখন পঞ্জরের ভিতরে বন্দুকের গোলা প্রবেশ করিয়াছে, চামড়া, মাংস, হাড় কাটিয়া তবে সে গোলাকে বাহির করিতে হইবে।

কি পন্থা অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কল্যাণজনক সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমি অন্য দুই একটি কথা বলিব। এক সমাজে সকল লোকই বলবান হয় না, সকল লোকই সুন্দর হয় না সকল লোকই ধনী হয় না। কেহ দুর্ব্বল, কেহ কুৎসিত, কেহ দরিদ্র থাকেই। কিন্তু সমাজের সকলেরই যে বিবাহ করিতে হইবে, এমন আইন থাকা এই নিয়মের বাহিরের ব্যাপার। সকল মেয়েকেই বিবাহ করিতে হইবে, সময় মত বিবাহ না দিলে জাতিচ্যুত হইতে হইবে, এমন আইনের সৃষ্টিও অদ্ভুত ব্যাপার বই, কি? পশু পক্ষীদের সম্মুখে পৃথিবী উন্মুক্ত রহিয়াছে,

নিজেদের ভরণপোষণ তাহাদের যেমন সহজলভ্য মানুষের পক্ষে সেরূপ হইলে তাহাদের কর্ত্তব্যহীন বিবাহজীবন যাপন করা অপরাধযোগ্য হইত না। কিন্তু মানুষের জীবন সংগ্রাম বিভিন্ন শ্রেণীর। সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে যেখানে উদরান্নটুকু সংস্থান করা দুষ্কর, সেখানে মেয়ের জাতি-রক্ষার জন্য এত ব্যগ্রতা কেন? এই সকল বিবাহে লাভ কি? মানি, বিবাহ উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে শৃঙ্খল দান করে, উদ্দাম প্রবৃত্তিকে শান্তি দান করে, মানুষকে আশা উৎসাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া কার্য্যক্ষম করে। কিন্তু আমাদিগকে বিবাহ কি ভাবে উন্নতির পথে লইয়া যায়? য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশ, যে সকল জায়গায় ধনরত্ন ছড়ান রহিয়াছে, সে দেশের লোক বিবাহদ্বারা কি ভাবে উপকৃত হয়, এবং আমরাই বা কি ভাবে উপকৃত হই? আমরা কার্য্যক্ষম হইয়া দশ ঘণ্টার স্থলে পনের ঘণ্টা আফিসের কার্য্য করিতে রাজি হই, এবং বিশ টাকা স্থলে ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারি। পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে আমাদের কার্য্যক্ষমতা কি যথোপযোগী? আমাদের ত মনে হয়, উপযুক্ত পরিমাণ আয় করিতে অক্ষম হইয়া বিবাহ করিয়া আমরা সমাজের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করি। আমরা শুধু নিজেরাই যে উহাতে বিপন্ন হই এমন নহে; দেশকে এবং সমাজকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলি। বিবাহের অল্প দিন মধ্যেই আমরা এক এক ঘর কাঙালের সৃষ্টি করি, যাহারা দিন রাত হা অন্ন হা অন্ন করিয়া জীবনের খেলা খেলিতে আরম্ভ করে। তার পর দারিদ্র্যের যে সকল অবশ্যম্ভাবী ফল, ক্রমশঃ তাহাও ফলিতে আরম্ভ করে; এই ভিখারীর দল অন্ন সংস্থানের জন্য যে কোন প্রকারের হীনত্ব অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। দিনে দিনে সমাজ ভয়ানক কদর্য্য ভাব ধারণ করে। যাহারা যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া বিবাহ করে তাহাদের স্বপ্ন-কল্পনা নিতান্ত মূর্খতা এবং গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া ইহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিলেও বিশেষ অন্যায় কার্য্য হয় না।

মেয়েদিগকেও এই ভাবে আমরা বিচার করিতে পারি। এবং যাহারা তাহাদিগকে অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় তাহাদের ব্যবহারও বিচারের যোগ্য।

আমাদের মেয়েরা যেখানেই বাস করুন না কেন অনেকটা সমাজের বোঝাস্বরূপ। পিতামাতা মেয়েরূপ বোঝাকে যত সত্বর সম্ভব ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচেন। আজকালকার বাজারে মেয়ে তাই এত বেশি সস্তা যে কোনও প্রকারের ছেলের জন্য যথেষ্ট মেয়ে সংগ্রহ করা যায়।

আরও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। অর্থ সংস্থান ব্যাপারে মেয়েদের কি কোনই কর্ত্তব্য নাই? তাহারা ঘরে বসিয়া সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার করিবে, আর কি কোনও প্রকারে সহায়তা করিবে না? অথবা দেশের পুরুষগণ মেয়েদিগকে কি এত স্নেহমমতা করিয়া থাকেন, যে সংসারের কঠোরতার বিন্দুমাত্র আঘাত মেয়েদের গায়ে লাগিলে তাঁহারা কাতর হইয়া পড়েন? অবশ্য পুরুষ তাহার কাছে অনেক সুখ শান্তির আশা রাখে। তাহারা কি পুরুষের কাছে সুখ শান্তির আশা রাখে না? তাহারা দেবীর মতন কি শুধু দুই হস্তে বর প্রদান করিয়া পুরুষকে কৃতার্থ করে? ঘরের রান্না বান্না ও অন্যান্য অনেক কার্য্য করিয়া তাহারা সংসারের অনেক খরচ বাঁচাইয়া থাকে বটে। কিন্তু যাহার ঘরে একজনার অন্ন মেলা ভার, তাহার ঘরে খরচ বাঁচানর উদ্দেশ্যটা কি প্রকার?

যিনি মেয়ের জন্মদান করিয়াছেন, মেয়ের ভরণ পোষণের জন্য ত তিনিই দায়ী। ধনীর হস্তে মেয়ে দিতে পারেন দিন, নতুবা মেয়েকে পরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া পরকে বিপন্ন করেন কেন? আমার ত ইহার জন্য মনে হয়, পুত্রের পিতাই যে পুত্রকে বিবাহ দিয়া শাপগ্রস্ত হন, তাহা নহে; কন্যার পিতাও শাপগ্রস্ত হন।

তবে দরিদ্র পিতামাতার সন্তানগণের কি দশা হইবে? আমার বিবেচনায় বিবাহ করিয়া ভিখারীর দল পরিপুষ্ট করার চেয়ে অবিবাহিত থাকা অনেক প্রকারে কল্যাণ-কর। য়ুরোপীয় প্রথা বলিয়া অনেকে ইহা অবজ্ঞা করিবেন সন্দেহ নাই। ইহাতে সমাজের নৈতিক বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে এমন আশঙ্কা অনেকেই করিবেন কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজের ভিতরেই দেশ



—"সব চলে, তলে তলে!"

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

কালোপযোগী যেমন কতকগুলি প্রথা বিদ্যমান আছে, তেমনই সার্ব্বজনীন কল্যাণের অনুষ্ঠানও কিছু কিছু আছে। এই সার্ব্বজনীন্ অনুষ্ঠানগুলির সূত্রেই সমগ্র মানব সমাজ ঐক্যবন্ধনে গ্রথিত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া বিবাহ করার প্রথাটী নিশ্চয়ই একটি সার্ব্বজনীন্ অনুষ্ঠান। ঘৃণা করিয়া উহাকে উড়াইয়া দিবার আমাদের সাধ্য নাই। বিশেষতঃ যখন আমরা য়ুরোপীয় রাজ্যশাসনে বাস করি এবং য়ুরোপীয় জীবন সংগ্রাম আমাদের ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তখন য়ুরোপীয় সমাজের কতকাংশ আমরা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক গ্রহণ করিতে বাধ্য। য়ুরোপে ঐ প্রথা বর্ত্তমান থাকার দরুন তাহাদের সমাজ জাতীয়তা সৃষ্টি করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে; এবং এই কারণে য়ুরোপীয় জাতিবৃন্দ যে নরকগামী হইয়াছে, সচ্চরিত্রতা, সাধুতা যে য়ুরোপ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এমন কথা সাহস করিয়া কে বলিতে পারে?

বিবাহ সংস্কার বিষয়ে আমার প্রথম প্রস্তাবনা এই যে, যোগ্য ব্যক্তির সহিত মেয়ের বিবাহ দেওয়া সম্ভবপর না হইলে, মেয়েকে অবিবাহিতা রাখিলে জাতিচ্যুতি বা অন্য কোনও লাঞ্ছনা সমাজে বর্ত্তমান থাকা কর্ত্তব্য নহে।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবনা এ দেশে কোনও দিন প্রচলিত হইবে কি না জানি না, কিন্তু তাহা যে না হইলেই চলিবেনা একথা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বিবাহের মৌলিক উদ্দেশ্য সুখসম্ভোগ নহে, সমাজ সংরক্ষণ। মানবসমাজ শৃঙ্খলার সহিত যাহাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহারই জন্য সমাজের শাসন নিম্নে স্ত্রী পুরুষের মিলন সংঘটিত হইয়া থাকে। জঙ্গলের বর্ব্বর জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া, সুসভ্য আর্য্যজাতির মধ্যে সর্ব্বত্র কোন না কোনও ধরণে বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে। সমাজ সর্ব্বত্রই মানুষকে আপনার অনুশাসনে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। সমাজের এ অনুশাসন আকাশ হইতে নামিয়া আসে নাই, মানুষই আপনার সৃজিত চক্রে আপনি আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছে। আমরা যে অনুশাসনের নিম্নে মানুষ হইতেছি, তাহা যে আমরা ভাঙ্গিতে গড়িতে পারিব না এমন কোনও কথা নাই। আর বাস্তবিক পক্ষেও আমরা প্রতিদিন নূতন নূতন কত প্রকারের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে যে চলিয়া যাইতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। দিবারাত্রি সংসার শুদ্ধ পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তাহাকে রোধ করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। কিন্তু আমরা যে ভাবে পুরাতনকে আঁকড়িয়া ধরিতে উৎসাহিত, তেমন উৎসাহ কোনও ক্রমে সামাজিক এবং জাতীয়তার পক্ষে সুলক্ষণ বলিয়া মনে হয় না। যখন কোনও ভাবের বন্যা দেশে প্লাবিত হয়, তখন যে নীরবে বসিয়া থাকিতে চাহে, সে নিতান্ত মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করে। তাহাকে সমর্থন করিয়া তাহাকে বহাইয়া দিতে চেষ্টা করাই মানব ক্ষমতার সুযোগ্য ব্যবহার। বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধে আজ যে আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহাকে উদ্বেলিত করিবার জন্য সকলেরই আপন আপন শক্তি নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবনাটি সম্পূর্ণভাবে ইউরোপের আদর্শ। ইহা স্বেচ্ছা বিবাহ। আমাদের দেশে যে কোন কালে এই আদর্শ বর্ত্তমান ছিল না তাহা নহে। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি এই বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়া য়ুরোপীয় বালিকাদিগের নানাপ্রকার দুর্গতির ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ঐ সকল সংবাদ প্রদান করা সত্ত্বেও আমি এই প্রথাটিকে সমর্থন করিতেছি। আমরা যে ভাবে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকি, আমার মনে হয় তাহাতে আমরা প্রকৃতির অনুশাসনকে অবজ্ঞা করিয়া পুরুষকারকে বলীয়ান্ করিতে যত্নবান্ হই। এবং প্রকৃতিদেবী যে এই অনধিকার প্রবেশকে ক্ষমা করেন তাহাও নহে। সরলভাবে, আভিজাত্য পরিত্যাগ করিয়া সকলে এই বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে আমার এই প্রস্তাবটা বোধ হয় সহজে অগ্রাহ্য হইবে না। আমাদের বিবাহিত জীবনের চিত্র অঙ্কন নিষ্প্রয়োজন, তবু দুই এক কথা বলিব। অনেকে নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন যে শত শত পরিবার এই ভাবে বিরচিত হওয়ার দরুণ বেশ সুখে শান্তিতে দিনপাত করিতেছে, আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে তাঁহাদের সুখশান্তিতে জীবনযাপন করার ভিতরে নির্জ্জীব অবসাদ ছাড়া জীবন্ত কোনও মহৎ ভাব বা প্রাণের

প্রসারতা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ভেড়ার পালের মতন নীরবে চুপচাপে জীবন যাপন করিয়া তাঁহারা শুধু ভেড়ার বংশ বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহাদের মিলনে সিংহ শিশুর উৎপত্তি হওয়ায় সম্ভাবনা অতিশয় বিরল। ভাগ্যের জোরে যে স্থলে তেমন উত্তপ্ত মিলন ঘটিয়া থাকে সেই স্থলেই দুই একটি মানুষের মতন মানুষের আবির্ভাব হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। আমরা বিবাহিত না হইয়া স্বয়ং বিবাহ করিলে এক পক্ষে এই দীনতা ঘুচিবে, অন্য পক্ষে পূর্ব্বানুরাগবশত স্ত্রীগণও বিনামূল্যে রত্নস্বরূপ গৃহীত হইবে।

দেশীয় ও বিদেশীয় পুরাবৃত্তগুলি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও মহাপুরুষের এবং মহৎ ব্যক্তির জন্ম ইতিহাসের সহিত কোনও না কোনও রহস্য বিজড়িত রহিয়াছে। এমনকি আধুনিক মনীষী ব্যক্তিগণের জন্ম রহস্যও তাহাদের পিতামাতার গভীর প্রণয়ের কৌতুকপূর্ণ কাহিনীতে ঝলমল করিতেছে। এবং ইহাই নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের দ্রোণ কর্ণ পাণ্ডবদের জন্মবৃত্তান্ত, খৃষ্ট প্রভৃতি বহু মহাজনের জন্ম ইতিহাস এই বিধানটিকে সমর্থন করিবে। পুত্র কন্যার জন্মের সূক্ষ্ম বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিয়া বিশেষজ্ঞগণ ইহাকে অনুমোদন করিয়া থাকে। পিতামাতার প্রণয় অত্যন্ত গভীর আবেগময় হইলেই পুত্রকন্যাগণ, স্বাস্থ্যশালী, সৌন্দর্য্যশালী, এবং উন্নতচেতা হইয়া থাকে। নিতান্ত নির্জীবভাবে যে বিবাহ সংঘটিত হয়, আর সজীব প্রণয়াকাঙ্ক্ষা লইয়া যে মিলন ঘটিয়া থাকে, তাহাদের ফলাফলের তারতম্য ঘটিবেই। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে য়ুরোপে এবং স্বেচ্ছাবিবাহ প্রথা প্রচলিত অন্যান্য দেশসমূহে জাতীয় উন্নতি কি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে; ঐ সকল দেশে বৎসরে বৎসরে কত বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে তাহার আলোচনায় ভারতবর্ষের দীনতা বেশ স্পষ্টভাবে সপ্রমাণিত হইতে পারে। রোম্যান্স্ থাকিলেই যে সমাজ নরকগামী হইবে, এমন ধারণা ভুল ধারণা।

আমার মনে হয় স্বেচ্ছাবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকিলে বরকন্যার পিতৃদেবগণ আর কোনও প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিবেন না, এবং মেয়ের জন্ম সমাজের পক্ষে দুর্ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

কিন্তু আরও অনেক ভাবিয়া দেখিবার আছে। কঠোর অবরোধ প্রথা যে সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে, যে সমাজের মেয়েরা এত বেশি লজ্জাশীল, এত বেশি ভীরু সে সমাজে কি প্রকারে, কত দিনে এই প্রথা প্রচলিত হইতে পারিবে? এ প্রশ্নের মীমাংসা এ স্থলে করা সম্ভবপর নহে। সংক্ষিপ্ত ভাবে এই বলা যাইতে পারে, একদিন না একদিন জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় আমরা উহাকে ত্যাগ না করিয়াই পারিব না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমাজের উপস্থিত একটি মাত্র দুর্গতিকে দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইবে। ভিতরের ক্ষত আরোগ্য করিতে হইলে বাহিরে মলম প্রয়োগে বিশেষ কোনও উপকার হইবে না। সমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধন কল্পে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌরবকে (?) বিসর্জ্জন দিতে হইবে। অবরোধ প্রথা ইত্যাদি বহু প্রকার অতীত মাহাত্ম্যকে জলাঞ্জলি না দিলে আমাদের দুর্গতির অন্ত হইবে না। গৃহাভ্যন্তরে পরিষ্কার হাওয়া বওয়াইতে হইলে চারি দিকের দরজা জানালা উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে যে সমাজ শুদ্ধ সকলেই খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে এমন ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক, বরং হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহাতেই বজায় থাকিবে।

মোটামুটি আমার বক্তব্য এই যে, ছেলেরা যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া বিবাহ না করিলে এবং যোগ্য বর জোটান অসম্ভব হইলে মেয়েকে অবিবাহিত রাখিলে, সমাজ এই দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত হইলে কন্যাদের অবিবাহিত জীবন যাপন করিবার অন্যান্য বহু পন্থা আছে। সমাজের কর্ত্তব্য, সেই সকল পন্থা তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত রাখা। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়।

আর্ট—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক মিঃ লরেন্স বিনিয়ন্ লিখিত ইংরাজি প্রবন্ধের সারসঙ্কলন।

প্রাগৈতিহাসিক মানব-অঙ্কিত চিত্র য়ুরোপে প্রথম আবিষ্কৃত হয় প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। স্পেনদেশীয় জনৈক জমিদার স্পেনের উত্তরে তাঁহার জমিদারিতে একটি গুহা দেখিতে গিয়াছিলেন—প্রাগৈতিহাসিক মানবের কোনো নিদর্শন আবিষ্কারের আশায়। সেখানে গিয়া প্রথমে তিনি রাশীকৃত ঝিনুক, ভগ্ন অস্থি, প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ও রন্ধনের ধূমচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই। তাঁহার শিশু কন্যা তাঁহাকে গুহার ছাদে দৃষ্টিপাত করিতে বলায়, তিনি উপরে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণে অঙ্কিত একটা বাইসনের ছবি রহিয়াছে। আরো মনোযোগ পূর্ব্বক দেখাতে হরিণ, ঘোড়া, বন্যবরাহ প্রভৃতি নানা জন্তুর ছবি দেখা গেল।

এই সব বন্যজন্তুর চিত্ররচনা করিতে আদিম গুহাবাসী মানব এত সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়াছিল কেন? কিসের জন্য তাহাদের এই আর্টের প্রয়োজন? সে কোন্ প্রবল প্রেরণা যাহা শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবকে এই শিল্প সৃষ্টি করিতে বাধ্য করিয়াছিল? কেহ হয়ত বলিবেন, ইহা যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসের ফল। গুহাবাসীরা হয় ত ভাবিত যে, এই সব প্রতিকৃতি গুহাভ্যন্তরে অঙ্কিত করিলে ঋনিগুলি তাহারা সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিবে। এই কথাই সত্য? না চিত্ররচনা তাহাদের একপ্রকার ধর্ম্ম ছিল? অথবা তাহারা এইসব বন্য জন্তুগুলিকে ও সেই সঙ্গে তাহাদের নিজেদের মৃগয়া-শক্তিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিতেছিল? না ইহা তাহাদের অনুসৃষ্টি করিবার আনন্দ মাত্র?

জানিনা, হয়ত পূর্ব্বোল্লিখিত সকল উদ্দেশ্যগুলিরই কিছু কিছু একটু চিত্ররচনার মূলে নিহিত আছে। কিন্তু এটা নিশ্চয় যে শীকারের জন্তুগুলির সহিত প্রাগৈতিহাসিক মানবের একটা গভীর সম্বন্ধ ছিল;—সেই সকল জন্তুর মাংসে উদর-পূর্ত্তি, তাহাদের চর্ম্ম লইয়া দেহ রক্ষা না করিলে তাহাদের উপায় ছিল না। এই জন্তুই তখন তাহাদের জীবনের সহিত অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত হইয়া ছিল। তাহাদেরই চিন্তা সেই আদিম যুগের মানবকুলের মনের সম্মুখে নিয়ত জাগরিত হইয়া থাকিত—এবং হয় ত অন্য কোনো দিকে তাহাদের নজরই পড়িত না। সেই জন্য যাহাদের সহিত তাহাদের জীবনের এমন রক্তমাংসের সম্বন্ধ তাহাদের বিষয় চিন্তা তাহাদের কল্পনাকে পাইয়া বসিত এবং সেই কল্পনার স্বপ্ন, রঙে এবং রেখায় পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া এই আর্টের সৃষ্টি করিত; এবং এই আর্টের অর্থই তাহাই প্রকাশ করা যাহার সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আর্টের গোড়াকার কথাই হইতেছে ইহাই। মানুষের নিজের সহিত বিশ্বের যে সম্বন্ধ—সে বিশ্বটাকে যে ভাবে পাইয়াছে, তাহার কাছে বিশ্ব যে রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, বিশ্বের

সামগ্রী হইতে সে যে আনন্দ বা দুঃখ লাভ করিতেছে—যাহা তাহার প্রাণকে কেবলই নাড়া দিতেছে—তাহাই প্রকাশ করার চেষ্টাতেই আর্টের সৃষ্টি। এই সভ্যতার যুগেও কি আর্টের মূলে ঐ কথাই নাই? হইতে পারে এখন মানুষের সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ সেই প্রাগৈতিহাসিক মানবকুলের মতো সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধ নহে;—এখনকার মানব-সন্তানের কাছে আহার বিহারের সামগ্রীটা তত বড় হইয়া উঠে না—সেইটেই তাহার জীবনের একমাত্র প্রাণের সামগ্রী নহে; কিন্তু তাই বলিয়া কি অসভ্য মানব-সমাজের আর্ট এবং এখনকার সভ্যসমাজের আর্ট এই দুইয়েরই ভিতরকার কথা—এবং উভয়েরই প্রেরণা একই নহে?

একদিকে বিরাট বিশ্ব, প্রকৃতির নিত্য নূতন রূপ ও রহস্যের আনন্দ ও ভয় লইয়া বর্ত্তমান আর একদিকে মানুষ বিশ্বের সেই সকল জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় শক্তির আবর্ত্তে পড়িয়া কেবলই খুঁজিতেছে, কেবলই প্রশ্ন করিতেছে—কেবলই জানিতে চাহিতেছে—এ বিশ্বটা কি? আমার কাছে এ বিশ্বের সার্থকতা কি? এবং আমিই বা এ বিশ্বের কে?

আমাদের জীবনের এই কথাটিকে আমরা আর্ট দিয়া যথাসাধ্য ব্যক্ত করিয়া থাকি। প্যাটার্ণ বা নক্‌সা হইতেছে এই কথাটিকে ব্যক্ত করিবার ভাষা; কাজেই নক্‌সার ভিতরে একটা অর্থ থাকেই থাকে। জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর যে অভিজ্ঞতা, ধারণা, প্রত্যয় তাহা শিল্পীর রচিত চিত্রের বিষয় অপেক্ষা চিত্রটি নক্সা-করিবার-ধরণে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য নক্‌সার প্রধান লক্ষণ হইতেছে পরিপূর্ণতা ও অজস্রতা। ইহা পাশ্চাত্য মনেরই নিদর্শন,—যাহা সকল অভিজ্ঞতাই লাভ করিতে চায়, কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ রাখিতে চায় না। পাশ্চাত্য মন শূন্য স্থান বরদাস্ত করিতে পারে না—সর্ব্বদা নির্জ্জনতা হইতে দূরে থাকিতে চায়।

য়ুরোপে বহুদিন যাবৎ একটা ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে, মানুষের প্রকৃতিগত অনুকরণ প্রবৃত্তির ফলেই আর্টের জন্ম। এ ধারণা একেবারেই ভুল। নকল করায় একটা সুখ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু একটা-কিছু সৃষ্টিকরার ভিতর যে আনন্দ আছে সে আনন্দ অনুকরণের মধ্যে কোথায়? যাহা আছে তাহার নকল করিয়া তো মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না—সে বলে উহা তো আছে, উহাতে আমার কৃতিত্ব কোথায়! আমি জগৎকে কিছু দিব—যাহা আমার! স্বীকার করি যে, আর্টে বাস্তবতার প্রয়োজন আছে—বাস্তবতা আমরা চাইও। কিন্তু সেটা যে বাস্তবতার খাতিরে চাই তাহা নহে। কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে বাস্তবতা কিছুই নয়; যতক্ষণ না তাহা কোনো একটি বিশেষ আদর্শ বা আইডিয়াতে রূপান্তরিত হইতেছে।

য়ুরোপীয় চিত্ররচনার প্রথম জিনিস যাহা আমাদের চোখে পড়ে, তাহা হইতেছে বিষয়ের উপর অদ্ভুত দখল। এই কারণেই আর্ট যে স্বভাবের অনুকরণ, এই ধারণা লোকসমাজে এত প্রচলিত;—যদিও য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণ কখনই এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া চিত্ররচনা করেন নাই। Leonardo, Correggio, Rembrandt প্রভৃতি

চিত্রকরগণ ছায়া-সুষমার রহস্য আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন নাই। শারীর-বিদ্যা শিখিবার জন্য, বা চিত্ররচনার মাপজোখ যাহাতে নির্ভুল হয় সে জন্য Michaelangelo অ্যানাটমির রহস্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা এ সব বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন প্রকাশের একটা ভালোরকম পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য। কিন্তু অনেক অক্ষম চিত্রকর উপায়ের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া উদ্দেশ্যের কথাটা একেবারেই ভুলিয়া যান।

*
* *

চতুর্থ শতাব্দীতে চীনদেশে জনৈক চিত্রকর ছিলেন। তিনি আবার কবিও ছিলেন। একদা তিনি তাঁহার সংগৃহীত কতকগুলি চিত্র একটি বাক্সে ভরিয়া তাঁহার বন্ধুর নিকট গচ্ছিত রাখেন। বাক্সের তালা বন্ধ করিয়া তিনি তাহার উপর শীলমোহর করিয়া দেন। চিত্রগুলির উপর বন্ধুর লোভ জন্মিল। সে বাক্সের তলদেশের তক্তা খুলিয়া ছবিগুলি আত্মসাৎ করিল। বাক্স খুলিয়া চিত্রকর দেখিলেন বাক্সের মধ্যে একখানি ছবিও নাই,—সব লোপ পাইয়াছে। চিত্রগুলি যে চুরি গিয়াছে এ সন্দেহ তাঁহার হইল না—তিনি বিস্ময় প্রকাশও করিলেন না। তিনি বলিলেন, সুন্দর ছবি অলৌকিক জীবের নিকট যাতায়াত করে! মানুষ যেমন করিয়া অমরলোকে যাত্রা করে ছবিগুলিও তেমনি আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া উড়িয়া গেছে! চীনাদের ধারণার-জগৎ আমাদের হইতে কত বিভিন্ন তাহা দেখাইবার জন্যই এই ক্ষুদ্র গল্পের উল্লেখ করিলাম।

প্রাচ্যদেশে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, শিল্পী শক্তিশালী হইলে বিশ্বের জীবনী শক্তি তাহার দখলে আসিত। তাহাতে তাহার অঙ্কিত চিত্রে প্রকৃত জীবনের সৃষ্টি হইত! কথিত আছে, এমন সব অশ্ব অঙ্কিত হইত যাহারা গতির বেগে এত সজীব যে তাহারা চিত্রের গণ্ডি ভাঙিয়া শূন্যে ছুটিয়া যাইত! এবং ড্রাগনের চিত্রে ওস্তাদ যেই তুলিকার শেষ পোঁচ লাগাইয়াছিলেন অমনি তাহা বজ্রনাদে কক্ষের ছাদ বিদীর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধে উড়িয়া গিয়াছিল! চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ-চিত্রকরের জীবন-অবদান সম্বন্ধে যে গল্প শুনা যায় তাহার আদর্শ যে মহান্ সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ হইবে না। চিত্রকর শেষ বয়সে দেওয়ালের গায়ে একখানি দৃশ্যচিত্র রচনা করিয়া উহা সম্রাটকে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। সম্রাট যখন বিস্ময়মুগ্ধ নেত্রে চিত্রের প্রতি চাহিলেন তখন ওস্তাদ বলিলেন—পশ্চাতে আরো সৌন্দর্য্য আছে। এই বলিয়া তিনি হাততালি দিলেন। অমনি চিত্রমধ্যস্থ পাহাড়ে একটি গুহা প্রকাশিত হইল, চিত্রকর তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইলেন! দেওয়ালের উপরের চিত্র ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, শূন্য দেওয়ালে চিত্রের চিহ্নমাত্র রহিল না!

চিত্রকে প্রাচ্যদেশীয়েরা সেই অপার্থিব পদার্থই বলিয়া ভাবিতেন যাহা চিত্র-করের ব্যক্তিত্বকে একেবারে অভিভূত করিয়া তাহাকে তাহার নিজের জীবন অপেক্ষা এক মহত্তর ও অধিকতর শক্তিশালী জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিত।

পাশ্চাত্য চিত্রে পূর্ণতা দিবার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। ছবিটির সমস্ত কথা ছবির মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু চীনগণ এই পূর্ণতাকে আমল দেয় না। তাঁহারা বলেন যেখানে পূর্ণতা, যেখানে শেষ—সেখানেই মৃত্যু। তাই তাঁহারা সসীমকে স্বীকার করেন না। সেই জন্য চীনের চিত্রে এতটা শূন্য স্থান থাকে যাহার মধ্যে আমাদের কল্পনা অবগাহন করিয়া বাধা মুক্ত হইতে পারে। চীনশিল্পীগণ তাঁহাদের জীবনী-শক্তির কল্পনাকে মানুষের প্রতিকৃতিতে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন কখনো অনুভব করেন নাই। ভগবানকে তাঁহারা পথরূপে অর্থাৎ গতি বা শক্তিরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। এবং জীবনের অপরিবর্ত্তনীয় গতির মধ্যেও যে নিত্য নিয়ত পরিবর্ত্তন চলিতেছে এ তথ্য তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই আমরা প্রায়ই চীনা চিত্রে দেখি কোনো কবি বা জ্ঞানী জল-প্রপাতের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জলপ্রপাতই জীবনের স্বরূপ; উহার অসংখ্য বিন্দু প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ দেখিলে বোধ হয় যেন সেই জলধারার কোনো পরিবর্ত্তন নাই। আকাশে যে মরালের দল উড়িয়া যায় আমরাও তাহাদেরই মত যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি! কিন্তু আমরা পথশ্রান্ত নই, আমরা পথের অবসানের জন্য অধীর হইয়া নাই! যে গতির শেষ নাই, যাহা অনন্ত ও শাশ্বত সেই গতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি।

পাশ্চাত্যের আকৃতি-অঙ্কন ও প্রসাধন-চিত্রে দেখা যায় যে, চিত্রবর্ণিত বিষয়ের মধ্যে গিয়া কেন্দ্র রচনা করে। কিন্তু খাঁটি চীনা বা জাপানী চিত্রে একটা-কোনো প্রধান বিষয় নাই। চিত্রবর্ণিত বিষয়গুলির পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যই পরিকল্পনার অবিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করে।

পাশ্চাত্য চিত্রে চিত্র-বর্ণিত বিষয়গুলির যথামতো সমাবেশ দেখা যায়। চিত্রের প্রান্ত ও ফ্রেমের মধ্যে কতকটা শূন্য স্থান থাকে, তাহা কোনো-না-কোনো-প্রকারে ভরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাচ্য চিত্রে সেই স্থানটুকুতে এমন আভাষ জাগাইয়া দেওয়া হয় যাহা চিত্রের সীমাহীনতাই নির্দ্দেশ করে।

জীবন যেখানে, সেখানেই গতি। স্বাভাবিক গতি যেখানে সেইখানেই ছন্দ। মানুষ ছন্দ চায়, যেহেতু উহা জীবনেরই স্বাভাবিক প্রকাশ। চীনগণ জানেন যে জগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে এক অনন্ত জীবনধারা প্রবাহিত; তাই তাঁহারা বলেন, এই জীবনের ছন্দে ছন্দিত হওয়াতেই চিত্রের সার্থকতা; অন্যথা নয়।

প্রাচ্যভূমির আর্টে আমরা তিনটি প্রধান লক্ষণ দেখি যাহা পাশ্চাত্য আর্ট হইতে বিভিন্ন। সেগুলি হইতেছেঃ—(১) চিত্র বর্ণিত বিষয়ের যথাযথ সমাবেশের স্থানে উহাদের সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠান (২) শূন্য স্থানকে চিত্রের ভাষারূপে ব্যবহার (৩) গতির প্রকাশ।

বিজ্ঞানবিদেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে আমাদের যেমন অনুভব করিবার শক্তি আছে উদ্ভিদজগতেও সে শক্তি বিদ্যমান। তাই বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপীয় চিত্রকলায় কেবল যথাযথ প্রতিরূপ প্রকাশ করার বিপক্ষে

জন্য য়ুরোপীয় চিত্রকরেরা আজকাল চিত্রে কতকগুলা জিনিস অঙ্কিত করার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছেন, তাই তাঁহার গতি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন এবং চিত্রেরও যে একটা বিশেষ ছন্দ আছে, এই ধারণা হইতে নূতন জ্ঞান লাভ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনা

সাগর-সঙ্গীত।—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত। কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত মূল্য লিখিত নাই। এখানি কাব্যগ্রন্থ। ইহার কবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। নানা কারণে চিত্তরঞ্জন বাবুর নাম বাঙ্গালার ঘরে-বাহিরে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। সুদক্ষ ব্যারিষ্টার বলিয়া চিত্তরঞ্জন বাবুর যথেষ্ট সুনাম আছে—তিনি যে একজন ভাবুক কবি, এ কথা বোধ হয় সকলে জানিতেন না। সাগর-সঙ্গীত-পাঠে তাঁহারা চিত্তরঞ্জন বাবুর কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইবেন। বহিখানি হাতে পড়িলে প্রথমেই ইহার বাহ্য সৌষ্ঠবে চোখ জুড়াইয়া যায়। এমন উৎকৃষ্ট ছাপা, উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট বাঁধাই, কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে পূর্ব্বে আমাদের চোখে পড়ে নাই। প্রতি পৃষ্ঠাতেই সাগরের ভীষণ মধুর চিত্রাবলী; তরঙ্গভঙ্গের মৃদু আভাসের মধ্যে কবিতার ছত্রগুলি যেন ভাসিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। চমৎকার পরিকল্পনা! তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র কয়েকখানি সাগর-চিত্রও আছে। উপরে নিকষ-কালো মেঘ তাহারই পদতলে সমুদ্রের কালো জলে তরঙ্গের ফেনোজ্জ্বল হাসির ছটা! এ গ্রন্থের বহিঃ-সৌন্দর্য্য মধুর, অপূর্ব্ব! তাহার পর ভিতরের কথা। কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাব-ছায়া বড় নিবিড় রেখাপাত করিয়াছে। তাহা হইলেও এমন কবিতাও আছে যেগুলি পাঠ করিলে চিত্তরঞ্জন বাবুর স্বাধীন ভাবেরও সুগভীর কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাই। সাগর-সঙ্গীতের ভাষা শক্তিমানের ভাষা। সে ভাষায় গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য বেশ সরল-সহজভাবে মিশ্‌খাইয়াছে। কবিতাগুলির সমস্তই সাগরকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইলেও প্রত্যেকটি কবিতা স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এবং সে কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি। আইনের কঠোর দায়িত্বপূর্ণ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়াও যে চিত্তরঞ্জন বাবু বঙ্গ-বাণীর পূজার অর্ঘ্য সাজাইবার অবসর করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহার সে অবসর সার্থক হইয়াছে, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই। আশা করি, বঙ্গ-বাণীর পূজায় ব্যাপৃত থাকিয়া কালে তিনি সুন্দরতর চারুতর অর্ঘ্য সাজাইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিবেন, নিজেও ধন্য হইবেন।

অবসর-চিন্তা।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন প্রণীত। কটন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। প্রবন্ধ-পুস্তিকা। 'কামনা', 'সৎ প্রবৃত্তি' 'কৃপণতা', 'পিতাপুত্র,' 'ভদ্রতা' প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের কয়েকটি চিন্তা এই পুস্তিকায় সংগৃহীত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পরিচয় পত্র।—ট্রাষ্টীদের আদেশানুসারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। এই গ্রন্থখানি কলিকাতা মিউজিয়মের (যাদুঘর) গাইড্-পুস্তক। মিউজিয়মের কোন্ কক্ষে কি আছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি হাতে লইয়া মিউজিয়ম দেখিতে গেলে কোন বিষয় জানিবার জন্য 'আনাড়ির' মত পরের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না—এই গ্রন্থ দেখিয়া সহজেই সকলে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। কলিকাতা মিউজিয়ম-সংক্রান্ত সকল প্রকার জ্ঞাতব্য তথ্যে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ এবং ইহার উপযোগিতাও বিলক্ষণ। এ গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় প্রকাশ এবং সাধারণের অনায়াসে-লব্ধ হইবে এই ইচ্ছায় ইহার মূল্য যৎসামান্য করিয়া দিয়া মিউজিয়মের ট্রাষ্টীগণ প্রকৃতই সাধারণের উপকার করিয়াছেন,

পণগ্রহণে বিবাহ। অর্থাৎ বিবাহের আদর্শ, পণগ্রহণের অবৈধতা ও অপকারিতা এবং তাহা দূরীকরণের উপায়। কলিকাতা বনিক প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক আনা মাত্র।

নীরব সঙ্গীত।—বিজন-কুসুম রচয়িত্রী প্রণীত। কলিকাতা নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। কবিতা-পুস্তক।

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-কুমার গুহ রায় প্রণীত। কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। বিবেকানন্দ স্বামী একজন আদর্শ কর্ম্মী ও মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মত ব্যক্তি সমাজের পক্ষে guide-post স্বরূপ। এরূপ মহাপুরুষের কথা যত অধিক আলোচিত হয়, দেশের ও জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল। স্বামীজির জীবন ও শিক্ষার কয়েকটি স্থূল তত্ত্ব এই গ্রন্থে বিবৃত ও সংগৃহীত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় মহাপুরুষ ও সুলেখকগণের মহা-বাণী সকল সংগ্রহ করিয়া 'ডায়ারি' গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালায় সেরূপ চেষ্টা আজিও দেখিতে পাইতেছি না, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এই সকল মহাবাণী শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, তাপিতকে শান্তি, পথহারাকে পথের সন্ধান দেখাইয়া দেয়। কতকটা সেই ধরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। তবে প্রভেদ এই, গ্রন্থকার নিজের কথায় স্বামীজির শিক্ষা ও উপদেশাদির (teachings) সার-সঙ্কলন (epitome) করিয়াছেন।

ছায়াপথ।—শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম-এ-বি-এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী বি-এল, বসিরহাট। কলিকাতা নববিভাকর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। ইহার কবি ভুজঙ্গধর বাবু বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত। ছায়াপথ তাঁহার পরিণত রচনা। গ্রন্থের মুখবন্ধে সুধী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, কবি-চক্ষু যেন ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করিয়া সুদূর ঊর্দ্ধলোকের নক্ষত্র-দীপ্ত ছায়াপথের সন্ধান পাইয়াছে; সেই জন্যই বুঝি এই গ্রন্থের নাম হইয়াছে "ছায়াপথ।" আমরাও হীরেন্দ্র বাবুর কথার অনুমোদন করি। কবিতাগুলি পাঠ করিবার সময় পাঠকের মন সত্যই সংসারের গণ্ডী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করে। কবিতাগুলিতে আধ্যাত্মিকতা ও কাব্যের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আজকাল মাসিকপত্রিকার পৃষ্ঠে চড়িয়া অনেক তরুণ কবির আধ্যাত্মিক কল-কাকলী ছন্দাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ আধ্যাত্মিকতা সে শ্রেণীর নহে। এ আধ্যাত্মিকতায় স্বাতন্ত্র্যের ছাপ আছে, শক্তির ছাপ আছে, ভাবের ছাপ আছে! "শিশুর প্রতি" "আত্মবিৎ" "আত্মদীপিকা" "বীণা" "আনন্দলহর" প্রভৃতি বহু কবিতাই ভাব-সম্পদে সমধিক উজ্জ্বল। সনাতন প্রাচ্য ভাবে কবিতাগুলি ওতঃপ্রোত, উদার গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত। আধ্যাত্মিকতার কুয়াশায় কাব্য কোথায়ও ঢাকা পড়ে নাই। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল।

ভারতবাণী।—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং। কলিকাতা লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। ভারতবর্ষের বিশেষত্ব কি ইহাই কয়েকটি প্রবন্ধের সাহায্যে এই গ্রন্থে লেখক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং এই প্রসঙ্গে ভারতীয় আদর্শাদিরও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি হইতে লেখকের ভূয়োদর্শিতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাই; কিন্তু তাঁহার যুক্তি সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ হয় নাই। না হৌক, তথাপি এ গ্রন্থখানি স্বদেশ ও স্বজাতির হিতেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রকেই আমরা পাঠ করিতে বলি।

জয়নলোদ্ধার কাব্য—বা দমস্ক কারাগার হইতে হজরত জয়নল্ আবেদীনের মুক্তিলাভ। শ্রীআকুল মা আলী মহম্মদ হামিদ আলী প্রণীত। কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। কাপড়ের বাঁধাই ৷৵০ আনা। এখানি কাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহা পাঠে মুসলমান ইতিহাসের কিয়দংশ জানিতে পারা যায়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



মুনিমোহন

ভারতী

৩৮শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ [২য় সংখ্যা

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মৃচ্ছকটিকা—একটি সংকীর্ণ প্রকরণ-জাতীয় নাটক। ইহা কবির স্বকপোল-কল্পিত রচনা, এবং ইহা কোন মহাকাব্যমূলক কাহিনী বা পৌরাণিক কাহিনীর উপর সংস্থাপিত নহে। ইহার নায়ক একজন ব্রাহ্মণ এবং ইহার দুইটি নায়িকা। একটি বারাঙ্গনা, অপরটি ধর্ম্মপত্নী। আমরা যতদূর জানি, নাট্য-রচনায় এরূপ ধরণের নায়িকা প্রায়ই দেখা যায় না। মালবিকাগ্নিমিত্র ব্যতীত, নিম্নোক্ত এই প্রকরণগুলিও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি যথা ;—উদণ্ড-কবিকৃত "মল্লিকা-মারুত", "পুষ্পভূষিত" এবং "তরঙ্গ-দত্ত" বা "রঙ্গদত্ত" ; "সূক্তিমুক্তাবলী"র একটি শ্লোক হইতে আমরা অবগত হই, অবন্তি বর্ম্মনের আশ্রিত কবিগণের মধ্যে শিবস্বামিন্ নামক এক কবিকর্ত্তৃক কতকগুলি প্রকরণ রচিত হয়। (৮৫৭—৮৮৪ খৃঃ-পূঃ)। পুঁথির তালিকায় অল্পসংখ্যক প্রকরণের

ও প্রকরণের মধ্যে প্রায়ই একটা গোলযোগ দৃষ্ট হয়। ফলত মৃচ্ছকটিকা ছাড়া, বিদিত প্রকরণমাত্রই বিশুদ্ধ-জাতীয় প্রকরণ,—উহার পাত্রগণ উচ্চপদস্থ লোক; সুতরাং নাটক ও প্রকরণের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মৃচ্ছকটিকা—এই নামকরণ হইতেই দেখা যায়, উহা একটা প্রাসঙ্গিক কথার অন্তর্ভূক্ত একটি ক্ষুদ্র তথ্য। অর্থাৎ বসন্তসেনা বালক রোহসেনাকে শান্ত করিবার জন্য কতকগুলা অলঙ্কারে পূর্ণ করিয়া একটা মাটির খেলনা—শকট-দিয়াছিল। অবশ্য এই ছোট কথাটির গুরুত্ব বিলক্ষণ আছে; কেননা নবম অঙ্কে চারুদত্তের বিরুদ্ধে ইহা প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই নাটকের দৃশ্যে যে আচার ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

বলিয়াছি। মৃচ্ছকটিকায় ভারতীয় সমাজের যে ছবি আঁকা হইয়াছে তাহার সহিত বাস্তব সমাজের নিশ্চয়ই কোন সাদৃশ্য নাই। সেই প্রাচীন কালে শূদ্রকের আমলে, কতকগুলা গোয়ালা বিনা ষড়যন্ত্রে তিন দিনের মধ্যে যে রাজত্বলাভ করিতে পারে নাই তাহা বিশ্বাস করা বেশ স্বাভাবিক; অপূর্ব্ব রূপসী হইলেও উজ্জয়িনীর বারাঙ্গনা-গণের বাসবদত্তার ন্যায় এরূপ সুবিস্তৃত ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদ ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া চৌর্য্যবৃত্তিতে যতই সিদ্ধহস্ত হউক না কেন, সেই সময়কার চোরেরা শর্ব্বিকারের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চুরি করিবে ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। শূদ্রক, নাট্যকার্য্যের মধ্যে ও পাত্রগণের মধ্যে যেরূপ একটা তীব্র জীবন্ত ভাব আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তব বলিয়া একটা বিভ্রম উপস্থিত হয়। মনে হয় যেন আমরা ঠিক উজ্জয়িনীর মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু উপাখ্যান সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই এই ভ্রম অন্তর্হিত হয়। অন্যান্য ভারতীয় নাট্যরচনার ন্যায় এখানেও আমরা গতানুগতিকতার ও কল্পনালীলার পূর্ণ প্রতাপ দেখিতে পাই।

মৃচ্ছকটিকার আদর্শ-পাত্রগণ ও মৃচ্ছ-কটিকার বর্ণিত রীতি-নীতি, গল্প ও আখ্যা-য়িকাদি কাল্পনিক জগৎ হইতে গৃহীত এবং ঐ জাতীয় সাহিত্যের শাস্ত্র-নিয়মানুগত। ভারত যে স্বীয় শ্রেণী বিভাগের প্রতিভা ও পুঙ্খানু-পুঙ্খ রূপে লিখিবার ধৈর্য্য শুধু নাট্যসাহিত্যে প্রয়োগ করিয়াছে তাহা নহে, প্রত্যুত ললিত-বৃত্তি সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলঙ্কারিক গ্রন্থ ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছে।

জয়াপীড়ের রাজত্বকালে (অষ্টম শতাব্দী) দামোদর গুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত "কুট্টনী মাতার উপদেশ", ক্ষেমেন্দ্রের "কলাবিলাস" এবং ঐ গ্রন্থকারের "সময়মাত্রিকা"—যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাদির পদ্য-অনুকরণ মাত্র—এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে, এই সকল পারিভাষিক উপদেশের প্রকৃতিগত লক্ষণ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। দণ্ডীর দশকুমার চরিতে (সপ্তম শতাব্দী) কর্ণিসুত, বা কলাঙ্কুর বা মূলভদ্র, বা মূলদেব নামক এক পৌরাণিক তস্কর কর্ত্তৃক প্রণীত চৌর্য্যবৃত্তিবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

কোন দরিদ্রজনের প্রতি একান্ত আসক্ত এক বারাঙ্গনার আখ্যায়িকা—ইহা প্রাচীন কাহিনী সমূহের অন্তর্গত একটি কাহিনী—যাহা বারংবার শুনিয়াও লোকে ক্লান্ত হয় না। বৃহৎকথায় বর্ণিত হইয়াছে, কেমন করিয়া, স্বীয় পরিণামদর্শিনী জননীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া রূপিণিকা নামক এক ধনাঢ্যা বারাঙ্গনা লোহজঙ্ঘা নামক এক ব্রাহ্মণের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার বৃদ্ধা মাতা সে নিষ্ফল প্রেমিককে বিদূরিত করিয়াছিল এবং পরে তাহার উপর কিরূপ প্রতিশোধ লইয়াছিল। অন্যত্র আর একটা বর্ণনা মৃচ্ছকটিকাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। উজ্জয়িনীর রাজা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি কুমুদিকা নাম্নী এক রূপবতী রমণী আসক্তা হয়। সেই রমণী সিংহাসনচ্যুত রাজা বিক্রমসিংহের

সাহায্যে তিনি স্বীয় সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হন। সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন, এবং তাহার সহিত কুমুদিকার বিবাহ দিয়া দেন। দশকুমারচরিতে বর্ণিত রঙ্গ-মঞ্জরী নাম্নী এক বারাঙ্গনার কন্যা, এক সচ্চরিত্র দরিদ্র যুবকের সহিত বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু তাহার মাতা স্বীয় দুহিতার এই দুরাগ্রহে নিতান্ত ব্যথিত ও হতাশ হইয়া তাহাকে কর্ত্তব্য-পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রাজার নিকট আবেদন করে।

উক্ত আখ্যায়িকাদিতে রীতিনীতির যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কোন স্পষ্টতর ও স্ফুটতর চিত্র আমাদের এই আলোচ্য নাটকটিতে নাই। বৃহৎকথা ও দশকুমারচরিত জুয়ারীর গল্পে পরিপূর্ণ; পৌরাণিক যুগ হইতেই দ্যূতক্রীড়া ভারতে মারাত্মক ব্যাধিরূপে অবস্থিত। মহাভারতের নায়ক ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় স্বীয় পত্নী সাধ্বী দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছিলেন এবং ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীকে হারাইয়াছিলেন। যেখানে জ্বালাময় উদ্বেগ অশান্তি ও নিত্য বিবাদকলহ—দশকুমার-চরিতে এইরূপ একটা জুয়ার আড্ডার বর্ণন আছে; সোমদত্তের গৃহে, একজন জুয়ারী সর্ব্বস্বান্ত, নিজের ঋণ পরিশোধে একান্ত অসমর্থ, ও দ্যূত গৃহের সভিক-কর্ত্তৃক দারুণ প্রহারে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া পলায়ন করতঃ এক শূন্য শিবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায়ঃ—ইহাই মৃচ্ছকটির দৃশ্য-সংস্থান (২ অঙ্ক); যে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রবৎ বিবরণ, চৌর্য্যদৃশ্যে একটা জীবন্ত বাস্তবতার ভাব আনয়ন করিয়াছে উহা দণ্ডির আখ্যায়িকার বর্ণনার সহিত বর্ণেবর্ণে মিলিয়া যায় (দ্যূত-গৃহের বর্ণনার পরে)। এক প্রয়োগনিপুণ তস্কর কতকগুলি আবশ্যকীয় যন্ত্র যোগাড় করিল, যথা;—পরিমাপসূত্র ...দীপনির্ব্বাণের জন্য এক কৌটা পূর্ণ পক্ষযুক্ত কীট...ইত্যাদি, তাহার পর দেয়ালে সিঁধ কাটিয়া ধনরত্ন অপহরণ করতঃ অলক্ষিত ভাবে পলায়ন করিল। দেয়ালে সিঁধকাটা চোরদিগের একটা প্রচলিত প্রকরণ। (দশকুমারচরিত ও পূর্ব্বপীঠ দ্রষ্টব্য)। আমাদের সমসাময়িক মেলোমাড্রামায় বর্ণিত বিচার ও প্রাণদণ্ডের দৃশ্যের সহিত যেরূপ বাস্তবতার কোন যোগ নাই, মৃচ্ছকটিকায় বর্ণিত বিচার ও প্রাণদণ্ডের দৃশ্যও তদ্রূপ। যে রাষ্ট্রনৈতিক ষড়যন্ত্র নাট্যকার্য্যের সহিত একসঙ্গে বিকাশ লাভ করিয়াছে, শূদ্রক উহার ভাবটি সমসাময়িক বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত হন নাই, পরন্তু লোক-প্রচলিত কাহিনী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। Windisch বলেন, কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক আখ্যায়িকার সহিত আর্য্যকের ইতিহাসের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। দৈবজ্ঞদিগের ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে, গোপাল আর্য্যকা রাজা অধিকার করিবার চেষ্টা করায়, তৎকালীন রাজা তাহাকে কারাবদ্ধ করেন, কিন্তু পরিশেষে আর্য্যকই স্বীয় শত্রুর উপর জয়লাভ করিল। বাসুদেব-কংসের দ্বন্দ্ব-কাহিনীর সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু এই-রূপ ব্যাপার যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে কৃষ্ণ তাহার একটা বিশেষ প্রয়োগস্থল মাত্র।

M. Windisch যে সাদৃশ্য ঘটাইয়াছেন শূদ্রক ঐ অপূর্ব্ব সাদৃশ্যের কথা শুনিলে নিশ্চয়ই অবাক্ হইয়া যাইতেন। বসন্তসেনার সহিত যোগনিদ্রার, ও বাহন-বিনিময়ের সহিত শিশু-বিনিময়ের যে লেশমাত্র যোগ আছে, তাহা তিনি স্বপ্নেও মনে করিতে পারিতেন না। মোটকথা, মৃচ্ছকটিকা আর কিছুই নহে, একটা গল্পকে অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং ভারতীয় রীতি অনুসারে উহার মধ্যে কতকগুলা ঘটনা ও পল্লবিত কথা ঠাসিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। নাট্যকার্য্যের দশ বিভাগ-অনুরূপ দশ অঙ্ক সন্নিবেশ করিবার জন্য কবি প্রচলিত প্রকরণই অবলম্বন করিয়াছেন। উহার মধ্যে তিনি রাশি-রাশি গীতিকবিতা ও স্বভাব বর্ণনার শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কের প্রথম অংশটি দারিদ্র্য-দুঃখের বর্ণনায় পরিপূর্ণ; অনুসরণ দৃশ্যটিতে ভীতিবিহ্বলা বসন্তসেনার পলায়ন বর্ণিত হইয়াছে। শকার, বিট্ ও দাস একই ভাবের কথা বলিতেছে, কিন্তু উহাদের পরস্পর কথার ধরণের মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, বিশেষরূপে তাহা হইতেই হাস্যরস নিঃসৃত হইয়াছে। চন্দ্রোদয়ের বর্ণনায় প্রথম অঙ্কটি শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের শ্লোক-গুলিতে দ্যূতের পরিণামফল এবং তাহার পর একটা পলাতক হস্তীর মত্ততা বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের শ্লোকগুলিতে গায়কের গুণ, অস্তমান্ চন্দ্রের শোভা ও পরে চৌর্য্যবিদ্যাসম্বন্ধীয় উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে নারীজাতি ও বারাঙ্গনা সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশপরম্পরা প্রদত্ত প্রাসাদে যে অষ্ট অঙ্গন পার হইয়াছিল তাহার এক দীর্ঘ বর্ণনা আছে। নিশ্চয়ই এই স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী এক কবির রচনা শূদ্রকের স্মৃতিপথে পতিত হয়। কথাসরিৎ-সাগরের একস্থলে বারাঙ্গনা মদনমালার প্রাসাদের সপ্ত প্রাকার-বেষ্টনের বর্ণনা আছে। এই জাতীয় সাহিত্যে, ইহা বর্ণনার একটি সাধারণ বিষয় সন্দেহ নাই। পঞ্চম অঙ্ক, প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রেম-সংশ্লিষ্ট এক ঝটিকার বর্ণনায় পূর্ণ। চারুদত্ত, বসন্তসেনা ও বিট, পালা করিয়া পরপর এই অপূর্ব্ব বিষয়ের বর্ণনা করিতেছে। আর অধিক বিশ্লেষণ করা বাহুল্য। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কালিদাসের ন্যায়, ভবভূতির ন্যায়, শূদ্রক-কবিও মহাকাব্য-সুলভ বর্ণনা-প্রকরণ নাটকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের অন্যান্য "ক্লাসিক" রচনায় যেরূপ সাহিত্যিক বিকাশ উপলব্ধি হয়, মৃচ্ছকটিকা হইতেও সাহিত্যিক বিকাশ সম্বন্ধে সেই একই প্রকার অবস্থা অনুমান করা যায়। মৃচ্ছকটিকার ভাষা কালিদাসের ভাষার সহিত তুলনা করিলে, কোনও প্রকার লক্ষণগত পার্থক্য ধরা পড়ে না।

ইহার ভাষা বিষদ ও সরল, উহাতে পাণ্ডিত্য ফলাইবার চেষ্টা নাই। রচনাগুলি প্রায় তিন চারি চরণের অধিক নহে; ভবভূতির নায় উহাতে অপরিমিত দীর্ঘতা নাই। কিন্তু রচনাকাল সম্বন্ধীয় তর্কে, এই ভাষাগত সরলতার বিশেষ কোন মূল্য নাই। এইরূপে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, এই দুই কবি, দুই বিভিন্ন সাহিত্য-সম্প্রদায়ের

পোক্ত ও জমাট বাঁধুনীর সহিত তুলনা করিলে খুব একটা তফাৎ বুঝা যায়। নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত নিয়মগুলিসম্বন্ধে শূদ্রক যেন নিতান্ত বালকবৎ অনভিজ্ঞ। মৃচ্ছকটিকায় প্রতি দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে স্থানেরও পরিবর্তন হইয়াছে। কোন নাট্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে কালের অবকাশ আবশ্যক, সে সকল অবকাশ নির্দ্দয়রূপে লঙ্ঘিত হইয়াছে।

এইরূপ দশম অঙ্কে বিচারপতি, বসন্তসেনাকে হাজির করিবার জন্য রক্ষীকে আদেশ করিলেন। রক্ষী বাহির হইয়া বসন্তসেনার সহিত কথা কহিল ও তখনি তাহাকে আদালতে আনিয়া হাজির করিল। ঐ একই প্রকারে সাক্ষী চারুদত্তকেও হাজির করা হইল। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে এই প্রণালীর প্রয়োগে কোন নিষেধ নাই—প্রত্যুত এইরূপ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত কাহিনীতে, এই প্রণালীর আশ্রয় না লইলেও চলে না। এই নাটকে অনেকগুলি প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ আছে দেখিয়া অনেকে মনে করে, ইহা প্রাচীনত্বের একটা প্রমাণ:—১১ জন, সৌরসেনী ভাষায়, ২ জন, অবন্তিকা ভাষায়, একজন, প্রাচ্যভাষায়, এবং ৬ জন, মাগধী ভাষায় কথা কহিতেছে। শকার, চণ্ডালেরা, মাথুর ও তাহার সহচর কতকগুলি অপভ্রংশ ভাষার ব্যবহার করিতেছে—শাকারী-ভাষা, চাণ্ডালী-ভাষা ঢাক্কাভাষা। Cowell, weber ও de garrez এর গবেষণার ফলে, এই সকল প্রাকৃতের মধ্যে আধুনিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাকৃতের ব্যাকরণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রাচীন ব্যাকরণ সেই বররুচির ব্যাকরণে চারিটি মাত্র প্রাকৃতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার পর আলঙ্কারিক ও কবিগণ অতিসূক্ষ্মতার প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ উহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, এবং মূল-প্রাকৃতগুলি বিবিধ বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত হইল। যে দেশের যে ভাষা তদনুসারে নাটকের ছাত্রগণ ভাষা ব্যবহার করিবে, এবং স্থলবিশেষে কোন বিশেষ দেশের ভাষা না হইলেও কোন কোন পাত্র সেই ভাষা ব্যবহার করিবে এই যে ভরত মুনির নিয়ম—এই নিয়ম অনুসারেই মৃচ্ছকটিকায় পাত্রগণের ভাষা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্লাসিক যুগের কেবল একটিমাত্র নাটকে নিকৃষ্ট জাতীয় পাত্রগণের অবতারণা দেখিতে পাই; শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কে, কালিদাস একজন ধীবর, দুইজন নগর-রক্ষী ও রাজার এক শ্যালককে রঙ্গভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন। এবং নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে তাহাদিগকে বিশেষ-বিশেষ প্রাকৃত ভাষায় কথা কহাইয়াছেন। "দশ-রূপ" নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে যার নাম মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই "তরঙ্গদত্ত" নামক প্রকরণের ন্যায় যদি আরও দুই একখানি প্রকরণ আমরা পাঠ করিতে পাইতাম তাহা হইলে মৃচ্ছকটিকার ন্যায় তাহাতেও হয়ত আমরা বিচিত্র প্রকারের প্রাকৃত দেখিতে পাইতাম। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শকার ও বিট সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে। অন্যান্য বিদ্যমান নাটকের সহিত যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মৃচ্ছকটিকার উক্ত দুই ভূমিকার চরিত্র প্রচলিত নিয়মানুসারে অসঙ্গত, ও ব্যতিক্রম-স্থল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এইরূপ তুলনার প্রণালীটি ঠিক্ নহে। রাসীনের ট্রাজেডির

সহিত মোলিয়েরের কমেডির যেরূপ প্রভেদ,—নাটকের সহিত ও মালতীমাধবের ন্যায় শুদ্ধ জাতীয় প্রকরণের সহিত মৃচ্ছকটিকারও সেইরূপ প্রভেদ! Muscarell-এর চরিত্র রাসীনেয় নাটকে বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে বলিয়া রাসিনের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে যদি মোলিয়েরকে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে এই সমালোচনার প্রণালী অত্যন্ত হাস্যজনক ও অসঙ্গত হইবে সন্দেহ নাই। আর এই যুক্তি অনুসারেই শূদ্রকের অতিপ্রাচীনত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে।

মৃচ্ছকটিকায় বর্ণিত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে যে সিদ্ধান্ত বাহির করা হইয়া থাকে, তাহাও তত নিশ্চয়াত্মক নহে। নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত নিয়মানুসারেই নাট্যসাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবতারণা হইয়া থাকে। যেরূপ আখ্যায়িকাদিতে, সেইরূপ নাট্যসাহিত্যেও বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা বা কুট্টনীর ভূমিকা নিয়োজিত হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই, অষ্টাব্দী শতাব্দের আরম্ভে, ভবভূতিও এই প্রচলিত নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন। তাছাড়া, যখন শ্রীহর্ষ নাগানন্দ রচনা করেন, তখন হুয়েংসাং ভারতের বৌদ্ধতীর্থ সমূহে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; সেই সপ্ত শতাব্দীর মধ্য ভাগেও শাক্য-মুনির ধর্ম্মের বেশ উন্নত অবস্থা।

মোট কথা মৃচ্ছকটিকাকে কালিদাসের পূর্ব্বে স্থাপন করিবার পক্ষে কোন বলবৎ হেতু নাই, বরং উহাকে কালিদাসের পরবর্ত্তী কালে স্থাপন করিবার পক্ষে কতকগুলি হেতু আছে:—যথা;—কালিদাসের নীরবতা, রাজা শূদ্রকের প্রতি আরোপ করা। এরূপ বিশ্বাস করিতেও একটু প্রলোভন হয় যে, এই নাটকের প্রকৃত রচয়িতা বিক্রমাদিত্যের গৌরবান্বিত যুগের পরে জীবিত ছিলেন, কিন্তু একটা উচ্চতর খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রদান করিবার জন্য, একটা প্রাচীনত্বের মহিমাচ্ছটায় ভূষিত করিবার জন্য, গ্রন্থকার শূদ্রকের নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছেন। প্রাচীন কিম্বদন্তী শূদ্রককে বিক্রমাদিত্যের সমকক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

জাল-শূদ্রকের প্রকৃত আবির্ভাব-কাল যাহাই হউক না কেন, ভারতের নাট্যকবিদিগের মধ্যে কালিদাসের সহিত তিনি সমান আসন পাইয়াছেন। শকুন্তলার গ্রন্থকারের রচনায় যেমন অতিসূক্ষ্ম ও সুকুমার একটি কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, পরিপক বিদ্যা ও অব্যর্থ বাক্-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সেরূপ সৃষ্টিশক্তি ও জীবন-চিত্রাঙ্কনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, মৃচ্ছকটিকায় যে ১৭টি পাত্র নাট্য-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই চরিত্রে একটা প্রবল বিশিষ্টতা আছে। চারুদত্তের ন্যায় একটি সুন্দর চরিত্র-কুসুম ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রিত প্রভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি জগতের নশ্বরতা ও ও পার্থিব পদার্থের শূন্যতা এতটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে মৃত্যু কালে বিনা পরিতাপে সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অথচ তাঁহার হৃদয় স্নেহ মমতা ও মধুর রসের প্রতি কম উন্মুক্ত ছিল

অনিষ্ট হয়, তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এই ভয়ে তিনি শঙ্কিত। তিনি তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, এবং মর্ম্মস্পর্শী স্নেহভরে তাঁহার শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ভারতীয় নাট্য সমূহের নায়কের প্রেমে সচরাচর যেরূপ দেখা যায় সেরূপ তাঁহার প্রেমে রূপজ লালসানল দৃষ্ট হয় না। তিনি বসন্তসেনার হৃৎ-স্পন্দন নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বারাঙ্গনাকে তাঁহার হৃদয় উৎসর্গ করিবার যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আসক্তি মৈত্রীর দ্বারা বিশোধিত, প্রেমের দ্বারা পবিত্রীকৃত। তাঁহার প্রেমানল যতই জ্বলন্ত হউক না কেন, তাঁহার আত্মসম্ভ্রমবোধ তদপেক্ষা আরও প্রবল। বসন্তসেনার সহিত তাঁহার অবৈধ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে তিনি ইতস্তত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যে অভিযোগের কথা স্বীকার করিলে তাঁহাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, সেই অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াও তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। দারিদ্র্যই তাঁহার অপরাধ :— তিনি তাহা জানেন, বহুদিন হইতেই তাহার পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলেন, এবং জানিয়া-শুনিয়াই তিনি অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার পুত্রটি যে তাঁহার কলঙ্কিত নামের উত্তরাধিকারী হইবে, শুধু ইহার জন্যই তাঁহার কষ্ট। এবং যখন স্থাবরক দণ্ডিত ব্যক্তির নির্দ্দোষিতা ঘোষণা করিয়া বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল, তখন চারুদত্ত মৃত্যুকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বসন্তসেনাও সাধারণ রকমের প্রণয়িণী ছিলেন না। বহুকাল ধরিয়া তিনি তাঁহার তনু মন প্রাণ বিক্রয় করিয়াছেন, এবং তাহারই জন্য তিনি কষ্ট সহ্য করিতেছেন। কেবল চারুদত্ত ও তাঁহার পত্নীই বসন্তসেনার উচ্চতর হৃদয়ের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন। অন্যদের বিশ্বাস, বসন্তসেনা শুধু ইন্দ্রিয়লালসার আবেগে এই প্রণয়-আবর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই জন্য তাহারা বসন্তসেনাকে উপহাস করিতে, অবমাননা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই; এমন কি, বিচার-পতিও, ইহা অকপট প্রেম বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই, এবং চারুদত্তের অকলঙ্ক খ্যাতি সত্ত্বেও, শুধু অনুমানের হেতুবাদে, তিনি রায় প্রকাশ করিলেন,যে চারুদত্ত স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই বসন্তসেনাকে গুপ্তহত্যা করিয়াছে। শকারের চরিত্রেও একটা বেশ মৌলিকতা ও বিশিষ্টতা আছে :—শকার একটা নিছক পশু; বিটের ন্যায় বিদগ্ধদিগের সংসর্গে তাহার প্রকৃতিগত পাশবত্বের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। শকার রাজার শ্যালক, শকার ধন-শালী, শকার একজন গণ্যমান্য লোক, অতএব বসন্তসেনার প্রেমের উপর, বসন্তসেনার উপর তাহার অবিসম্বাদী অধিকার আছে, এইরূপ তাহার ধারণা; এবং বসন্তসেনা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায়, তাহার নিজের অবমাননা যত না হউক, তাহার অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া তাহার এত ক্রোধ। শকার যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ভীরু, যেমন বাক্যবীর, তেমনি কাপুরুষ; যেমন অজ্ঞ, তেমনি পণ্ডিতাভিমানী; মিথ্যা কথা ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারেই

তাহার বুদ্ধি বেশ খুলিয়া থাকে। বিটের চরিত্রে একটু মানসিকতার লক্ষণ আছে; এমন কি আমরা বলি, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে উহা একমাত্র সুরসিক পাত্র; ইহার কথার একটা সূক্ষ্ম ভাব আছে, সৌকুমার্য্য আছে, উচ্চ শিক্ষিত লোকের মত একটা স্বাধীন ভঙ্গী আছে। সর্ব্বত্রই ইহাঁর স্বাগত আহ্বান, সর্ব্বত্রই ইহাঁর সমাদর, এবং সকলেই ইহাঁর সংসর্গের অভিলাষী। তাছাড়া, ইহাঁর মহৎ অন্তঃকরণ। একবার তিনি শকারের কবল হইতে বসন্তসেনাকে উদ্ধার করেন, আর একবার উদ্যানে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন এবং সংস্থাপকের দারুণ কঠোর ব্যবহারে বিতৃষ্ণা জন্মায়, তিনি তাঁহার সেই নিষ্ঠুর প্রভুকে ত্যাগ করিয়া, আর্য্যকের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চারুদত্তের প্রতি মৈত্রেয়ীর অটল ভক্তি থাকায়, তাহার স্বাভাবিক চিত্তদীনতা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে! যখন ভাল ভাল উপাদেয় সুখাদ্য সকল আহার করিতে পাইত সে সুখের কাল গত হইয়াছে বলিয়া সে আক্ষেপ করে কিন্তু তথাচ প্রভুর প্রতি, প্রভুর পরিবারের প্রতি, সে সমানভাবে অনুরক্ত। বদ্‌মেজাজ সত্ত্বেও মৈত্রেয়ী মৃত্যুর দ্বারা পর্য্যন্ত চরুদত্তকে অনুসরণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং তাহার বন্ধুর পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে সম্মত হইয়াছে। আরো ছোটখাটো পাত্র অনেক আছে; তাহাদের চরিত্রও বেশ সুগঠিত ও সুনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু আমরা তাহাদের লক্ষণ নির্ণয়ে বিরত হইলাম। শর্ব্বিলক জাতিতে সে তাহার এই নূতন ব্যবসায়ে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়-সুলভ চাতুর্য্যপূর্ণ ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেকার সম্বাহন-ব্যবসায়ী সম্বাহক, প্রথমে জুয়া খেলায় জুয়াচুরী করিতে চেষ্টা করে, পরে নিজের দেনাশোধ না করিয়া পলায়ন করে। তাহার পর, বসন্তসেনার বদান্যতা ও ঔদার্য্যে এরূপ মুগ্ধ হয়, যে, হঠাৎ স্বীয় অতীত জীবনের কদর্য্যতা উপলব্ধি করিয়া, বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ ধারণ করে। মাথুর, জুয়ার আড্ডার 'সভিক', জুয়ারী-সুলভ ফিকির ফন্দিতে সুদক্ষ; কোন প্রকার রসিকতা বা অনুনয় তাহার হৃদয়কে আর্দ্র করিতে পারে না ইত্যাদি···মৃচ্ছকটিকা পাঠ করিতে করিতে, মোলিয়ের ও সেক্‌সপিয়ারের নাম স্বভাবতই মনোমধ্যে উদয় হয়, এবং শূদ্রকের প্রশংসার পক্ষে এই নৈকট্য ও সাদৃশ্যের উপলব্ধিই যথেষ্ট—ইহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর কি-হইতে পারে।

মৃচ্ছকটিকা, অনধিকার-হস্তক্ষেপণের হাত এড়াইতে পারে নাই। যার নাম ছাড়া আর কিছুই জানা নাই, সেই নীলকণ্ঠ নামক এক ব্যক্তি শূদ্রকের দোষ ত্রুটি সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রামাণ্য সংস্করণটিতে—দশম অঙ্কের শেষভাগে সমস্ত পাত্রগণ একত্র সমবেত হয় নাই। চারুদত্তের স্ত্রী, তাঁহার পুত্র, তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু মৈত্রেয় নাটকের উপসংহার-স্থলে প্রবেশ করে নাই। নীলকণ্ঠের কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, গ্রন্থকার সূর্য্যের উদয়কে ভয় করিতেন। ইহার যে হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা বড়ই অস্পষ্ট; Wilson ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "সূর্য্যোদয়কে ভয় করা"

ইহার গূঢ় অর্থ—রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইবার ভয়; কিন্তু অক্ষরে-অক্ষরে অনুবাদ করিলে যে অর্থ হয়, সে অর্থেও এই বাক্যটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। বরং সে অর্থটি আরও একটু স্পষ্ট হয়।

নাট্যাভিনয় সূর্য্যোদয়েই আরম্ভ হইত; এই অভিনয় যদি বেশীক্ষণ ধরিয়া চলিত তাহা হইলে, বেলা অধিক হওয়ায় প্রখর সূর্য্যোত্তাপে দর্শকের ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা ও আশঙ্কা ছিল। সুতরাং মৃচ্ছকটিকার গ্রন্থকার, অভিনয়সংক্ষেপ করিবার জন্য, শেষ দৃশ্যগুলিকে একটু সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ এই সমস্ত দৃশ্যে কি আবশ্যক কি অনাবশ্যক কিছুই পূর্ব্বে চিন্তা করেন নাই, প্রত্যুত গ্রন্থকারের উপর কলম চালাইয়া একটা নূতন দৃশ্য সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। চারুদত্তের স্ত্রী ও পুত্র চারুদত্তকে বধ্যস্থানে যাত্রা করিতে দেখিয়াছিল এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছিল;—তাহারা তাঁহার সহিত পরলোকে মিলিত হইবার আশায় তাঁহার সহিত একত্র চিতারোহণ করিতে ব্যগ্র হইল। বধ্যস্থানে যে জনতা উপস্থিত ছিল, তাহাদের চীৎকার শুনিয়া চারুদত্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারুদত্ত ঠিক সময়েই আসিয়াছিলেন, তাঁহার আগমনে এই তিন ভীষণ আত্মহত্যা নিবারিত হইল। তাঁহার আত্মীয় স্বজন সুখী হইল। এই প্রক্ষিপ্ত অংশের রচনা বেশ নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। সুরুচিসমন্বিত ব্যক্তির ন্যায় নীলকণ্ঠ, শূদ্রকের রচনাভঙ্গী ও প্রকরণের নকল করিয়াছেন; কিন্তু শূদ্রক অবশ্য এই নব যোজনাকার্য্যে কখনই সম্মতি দিতেন না। যে মুহূর্ত্তে বারাঙ্গনা শুদ্ধ চরিত্রের পুণ্য মহিমায় বিভূষিত হইল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই গ্রন্থকার, সুকুমার সংকোচ-বোধের প্রেরণায় ধর্ম্মপত্নীকে বারাঙ্গনা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিলেন। যাহা হউক, এই প্রক্ষিপ্ত রচনার ব্যাপারটি বেশ কৌতূহলজনক। একজন ওস্তাদের রচনা সুরুচির হাতে সংশোধিত হইয়া রচনার মূল্য কিছুমাত্র কমে নাই; বরঞ্চ নীলকণ্ঠের ধৃষ্টতা মৃচ্ছকটিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বম্বে হইতে পত্রাভ্যন্তরে আগত বনফুলের প্রতি

পত্রপুটে এলে কোথা বনবাসী ফুল?
অঙ্গরাগ হেরি তব সমুদ্রের নীল,
তোমার পরশে আছে মলয় অনিল,—
এ তো নহে কুঙ্কনের সাগরের কূল!
হিমের আলয়ে হেথা বড় অপ্রতুল
সুখস্পর্শ সমীরণ, তরল সলিল।
সুকুমার কুসুমের কি আছে দলিল
এত উর্দ্ধে উঠিবার, না হলে বাতুল ?

এ দেশে আকাশে ভাসে ধূসর কুয়াশা,
তারি মাঝে মাথা তোলে পর্ব্বতের শৃঙ্গ,
উজ্জ্বল কিরীটে যার হীরক তুষার।
ক্ষীণ প্রাণে ধরি কোন প্রস্ফুটিত আশা,
এসেছ এ পরদেশে, যেথা নাই ভৃঙ্গ?—
বরফের বুকে নাহি তোমার সুসার!

স্রোতের ফুল

(২)

গিন্নিরাণী অন্দরের পুকুর-ঘাটের মার্ব্বেল-বাঁধানো চাতালে একখানি অতি মিহি কাঠির বিচিত্র বুননের মছলন্দের মাদুর পাতিয়া বসিয়া তেল মাখিতেছিলেন। দুজন ঝি কাপড়ের উপর কোমরে গামোছা জড়াইয়া রাণীর স্থূল দেহে ডলিয়া ডলিয়া তেল মাখাইতেছিল।

গিন্নির আকার দীর্ঘেপ্রস্থে প্রায় সমান; গায়ের বর্ণ মেটে, অত্যধিক মার্জ্জন ও প্রসাধনের সাহায্যে জ্যোৎস্নারাতের মেঘের মতন; কষিয়া খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে সীঁথি এক আঙুল চওড়া হইয়া গিয়াছে,- কপাল দরাজ হইয়া উঠিয়াছে; চুল উঠিয়া গিয়া কপাল প্রশস্ত হইয়া পড়াতে মনে হয় চোখ নাক যেন যথাস্থানের অনেক নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং উল্কির তিলক যেন বঁড়শীতে নাকটিকে গাঁথিয়া ললাটসমুদ্রে তলাইয়া যাওয়া হইতে কোনো মতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। গিন্নির গলায় খুব মোটা হেঁসোহার; মণিবন্ধে মোটা হাঙরমুখো স্ক্রু-পাকের বালা ও বেঁকি চুড়ি; বাহুতে হাঁসুলির মতো প্রকাণ্ড অনন্ত; পায়ে একগাছা করিয়া মোটা বাঁকমল; নাকে সুদর্শন চক্রের মতো মস্ত নথ, মুক্তার ডোর দিয়া ছোট্ট খোঁপাটার সঙ্গে টানিয়া বাঁধা; কানে মাকড়ির সারি; কাঁকালে চার-আঙুল চৌড়া চন্দ্রহার। গিন্নির বয়স তেমন বেশী নয়, চল্লিশের কাছাকাছি। তাঁহার গর্ভজাত সন্তান তিনটি——দুটি পুত্র, পুলিনবিহারী ও

পুলিন আজন্ম রুগ্ন ছিল; সে যে বারো বৎসর বাঁচিয়াছিল একদিনের জন্যও রোগ-যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারে নাই; তাই তাহার মায়ের মনে একটি গভীর বেদনার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। বিনোদের বয়স এখন বছর আট, আর বিনোদিনীর বয়স বছর তিন। কিন্তু নিজের গর্ভজ সন্তান ছোট থাকিলে কি হয়, মৃত বড় রাণীর পুত্র বিপিন এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে; বিপিনকে আঁতুড়েই অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যখন তাহার মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন ছোটরাণীর বয়স অল্প, তখনও তিনি নিঃসন্তান; তবু তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া মাতৃহীন সপত্নীপুত্রের লালন পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকে যদিও তখন মনে করিয়াছিল যে ইহা সতীনের ছেলেকে বাঁচিতে না দিবার ফন্দি, ডাইনের মায়া, কিন্তু বাস্তবিক বিপিনই প্রথমে তাঁহার প্রাণে মাতৃস্নেহের অমৃত-উৎসের সহস্র বিচিত্র ধারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল; বিপিন তাঁহার প্রথম-লব্ধ স্নেহের ধন, তাঁহারই কোলে সে মানুষ হইয়া এখন অতবড়টি ডাগর হইয়াছে, এখন বরণ করিয়া বৌ ঘরে তুলিলেই হয়। তাঁহার বড় সাধ ছিল যে বিপিনের অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়া কিশোর কিশোরীর প্রণয়-লীলা দেখিয়া জন্ম সার্থক করিবেন; কিন্তু বিপিন এক-রোখা ছেলে, সে পাঠ সমাপ্ত না করিয়া কিছুতেই বিবাহ করিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে। এই

মাঘ মাসে না হয় ত ফাল্গুন মাসে তাহার বিবাহ দিতেই হইবে। বৌ ঘরে আসিলে ত অধিক সাজসজ্জা করা ভাল দেখাইবে না, তাই গিন্নিরাণী বিবিধ প্রকারের গহনা ও কাপড় সদাসর্ব্বদা পরিয়া থাকিয়া জন্মের সাধ মিটাইয়া লইতেছিলেন।

বামা দাসী হাতে তেল ডলিতে ডলিতে বলিতেছিল—রাণীমা, তাগাটা হাতে বড় কসে গেছে, এটাকে ভেঙে একটু ফাঁদালো করে' গড়তে দিয়ো।

অপর দাসী হাবার মা অমনি বলিয়া উঠিল—আ মর, তোর যেমন কথা! রাণীমার শরীর ত দিনকের দিন কাহিল হয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে ফাঁদে বড় হলে যে হাতে ঢনঢন করবে! এই ত...এই এতখানি ঢল!...তা মা, তোমাদের গায়ে কি পুরোণো গয়না মানায়? নিত্যি নতুন নতুন গড়াবে বৈ কি? কিন্তু ভেঙে গড়াতে যাবে কোন্ দুঃখে? আমরা গরিবগুরবো মানুষ, একখানা গহনা কষ্টে স্বষ্টে গড়াই, রোগা হয়ে ঢনঢন করলেও পরতে হয়, মোটা হয়ে এঁটে বসলেও পরতে হয়। তোমরা হলে রাজারাজড়া, পুরোণো গয়না কাপড় পেরসাদী করে চাকরদাসীকে হাত তুলে দিলে তারা বর্ত্তে যাবে আর তোমাদেরও নাম হবে।

গিন্নি ছোট বৌয়ের চিঠির সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক ও অন্যমনস্ক হইয়া ছিলেন। তিনি গিন্নি মানুষ, কৌতূহল তাঁহার সাজে না, তাই তিনি কোনো ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে করিতেছিলেন যে এইবার রোহিণী আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত সংবাদ শুনাইবে। দাসীরা যখন তাঁহার মোটা তাগা দুগাছার উপর নজর দিয়া তাঁহাকে দান করিয়া নাম কিনিতে পরামর্শ দিতেছিল তখন তাঁহার মন দাসীদের কথার দিকে ছিল না। গিন্নি অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—এসব গয়না আমি আর কদিনই বা পরব? বিপিনের বৌ এলে তাকেই ভেঙে গড়িয়ে দেবো।

দাসীরা অমনি সেই সূত্র ধরিয়া উল্লাস করিয়া বলিল—হ্যাঁ রাণীমা, দাদাবাবুর কবে বিয়ে? আমরা কিন্তু খুব ভালো রকম বকশিশ নেবো, তা বলে রাখছি। গরদের কাপড়, সোনার কণ্ঠী আর তাগা দিতে হবে বাপু।

গিন্নি বলিলেন—আমরা ত মনে করেছি, এই মাঘ ফাগুনে বিপিনের বিয়ে দেবো। দেখি সে বাড়ী এসে কি বলে। যুগ্যি ছেলের মত না নিয়ে ত আর কিছু করা চলে না।

হাবার মা বলিল—তাই ত মা, দাদাবাবুর কেমন এক ধারা, বিয়ে করতে চায় না কেন বল দেখি। কলকেতায় থেকে স্বভাব চরিত্তির বিগড়ে গেল নাকি?

রাণী বলিলেন—না না, বিপিন আমার সোনারচাঁদ ছেলে, ওর শরীরে এতটু; দোষ নেই। লেখাপড়া নিয়েই মেতে আছে, তাই বিয়ের দিকে মন যায় না। এইবার পড়া শেষ হবে; এখন বিয়ে করবে বৈ কি।

অমনি রাণীর কথার সূত্র ধরিয়া বামা বলিয়া উঠিল—দাদাবাবুর সাধু চরিত্তির তা আর একবার করে বলতে? কিন্তু বাপু রাতদিন শুধু পড়া আর পড়া, এ কি রকম বাই! তোমার কি বাপু চাকরী করে খেতে হবে, না দাদাঠাকুরের মতন টোল খুলতে হবে?

ঐ ছোট তরফের মেজবাবু ত আমাদের দাদাবাবুদেরই বয়সী; এর মধ্যে তিন তিনটে বিয়ে করেছে। তার ওপর আবার রঘুনাথ দেওয়ানের বিধবা ভাজ কালীতারাকেও ত বাড়ীতে এনে রেখেছে। হ্যাঁ মা শুনছি কি না যে তাকেও না কি বিয়ে করবে! ওমা বিধবার আবার না কি বিয়ে হয়! তা বড়লোকে ইচ্ছে করলে কি না করতে পারে! একেই ত বলে জমিদারী চাল! আর আমাদের দাদাবাবুর, কথা নেই বার্ত্তা নেই কারুর সঙ্গে, রাতদিন মুখে বইয়ে লেগে রয়েছে। রাত্তির দিন যদি কাগজই ঘাঁটলে ত মুহুরী গোমস্তায় আর জমিদারে তফাৎটা রইল কোথায়?

হাবার মা বলিল—আমাদের দাদাবাবুর চাল ত দাদাঠাকুর হতেই বেগড়াল; সে উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে! আমি শুনেছি নিজের স্বকর্ণে, দাদাবাবুকে সলা দেওয়া হয়—ছেলে মেয়ের অপ্প বয়সে বিয়ে দিতে নেই, বিধবার বিয়ে দিতে হয়, আমোদ আহ্লাদ করা খারাপ!......... শুনেছ একবার কথা! রাজার বেটাকে ফকিরীর পরামর্শ!......মা, তুমি দাদাবাবুকে দাদাঠাকুরের সঙ্গে আর বেশী মিশতে দিয়ো না।

রাণী বলিলেন—বিপিন ত মানা শুনবে না, ও যে নবকিশোরকে একেবারে ভাইয়ের মতন দেখে। জ্ঞানবুদ্ধি হলে আপনিই সামলে যাবে, বাঘের বাচ্চা বাঘই হবে।

বন্ধুবিচ্ছেদের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া হাবার মা ক্ষুণ্ণ মনে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ রাণীমা, দাদাবাবুরা কবে আসবে?

গিন্নিরাণী মাতৃগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—এইবার বিপিনের শেষ এগজামিন; অঘ্রাণ মাসে এগজামিন দিয়ে বাড়ী আসবে।

হাবার মা বলিল—ওমা! তবে কি এবার পূজোর সময় দাদাবাবু বাড়ী আসবে না? ......তবে দাদাঠাকুর এখন আসবে কেমন করে?

গিন্নি বলিলেন—না, নবকিশোর বিপিনের সঙ্গেই আসবে; এখন আসবে না।

হাবার মা বলিল—না, আসবে। ভটচায্যি মশায় বলছিলেন। আমি তেল নিয়ে আসতে আসতে শুনে এ্লাম।

গিন্নি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলছিলেন ভটাচায্যি মশায়?

হাবার মা বলিল—ছোট খুড়িমার বোনঝি এখানে আসবে কিনা! ছোট খুড়িমা ভাবছিল যে কে তাকে নিয়ে আসবে, তাই ভটচায্যি মশায় বল্লেন যে তার আর ভাবনা কি, নবকিশোর নিয়ে আসবে 'খন।

গিন্নি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—ছোট বৌএর বোনঝি? সে এখানে আসবে বুঝি?

হাবার মা এতবড় একটা নূতন খবর গিন্নিকে প্রথমে শুনাইবার সুযোগ পাইয়া আনন্দে ও গৌরবে স্ফীত হইয়া বলিল—ওমা! সবাই শুনেছে আর যার পর নাই তুমি কাণ্ডখানা শোননি বুঝি রাণীমা? খুড়িমার বোন যে মারা গেছে! বিধবা বোনঝি তাই এখানে আসবে বলে মাসিকে চিঠি দিয়েছে। এ খবর সবাইকে জানালে আর যার বাড়ীতে থাকবে তাকেই না জানিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেলা হল! ওমা, খুড়িমার ত ভ্যালা আক্কেল যা হোক!

দাসীর এই ইঙ্গিতে গিন্নির মন ভারী হইয়া উঠিল, তিনি মনে করিলেন ছোট বৌ তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই নিজের বোনঝিকে নিজের কাছে আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

গিন্নিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হাবার মা বলিতে লাগিল—রোহিণী যথার্থই বলছিল—আপনি শুতে ঠাঁই পান না, আবার শঙ্করাকে ডাকেন। রোহিণী আমার সঙ্গে ঝগড়া করে মরে, ওর ঐ যা এক দোষ; নইলে যা বল তা বল বাপু, ওর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে; এক-একটা কথা বলে ভাল!

গিন্নি লোকটি বড় সরল; কেবল, তিনি যে একজন মস্ত লোক, এই জমিদার সংসারের গিন্নি, এই অহঙ্কার তাঁহাকে অতিমাত্র প্রভুত্বপ্রিয় ও তোষামোদলিপ্সু করিয়া তুলিয়াছে। তিনি রাণী বলিয়া বাড়ীর পরিজনদের সহিত মিশিতে পারিতেন না, বাহিরের পাড়াপ্রতিবাসিনীদের মধ্যেও তাঁহার সমকক্ষ সঙ্গিনী হইবার মতন কেহ ছিল না; ইহাতে তাঁহাকে সর্ব্বদাই দাসীদের লইয়াই দিন কাটাইতে হইত; ছোট লোকের সংসর্গে থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনটি ভালোয় মন্দে জড়াইয়া জটিল হইয়া গিয়াছিল। কোনো একটা বড় বিষয়ে তিনি যে কেন উদার এবং এক-একটা সামান্য ছোট ব্যাপারে কেন যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ তাহা বুঝা যাইত না! তাঁহার সংসারে সম্পর্কীয়া ও নিঃসম্পর্কীয়া আশ্রিতার সংখ্যা ছিল না, কেহ আসিয়া আশ্রয় চাহিলেই সে পরিবারভুক্ত হইয়া রাজার হালে থাকিতে পাইত; কিন্তু খুড়িমার মুখে আবেদন শুনিবার পূর্ব্বেই দাসীর মুখে খুড়িমার

নিরাশ্রয়া বোনঝির আগমন-সংবাদটা বিরূপ ভাবে শুনিয়া তাঁহার মন বাঁকিয়া বসিল। অধিকন্তু খুড়িমা যে এককালে তাঁহারই সমকক্ষ শরিক ছিলেন, এ কথা রাণী কিছুতেই ভুলিতে পারিতেন না; তিনি তাই পদে পদে খুড়িমার অহঙ্কারের পরিচয় পাইতেছেন মনে করিয়া তাঁহার কোনো আচরণই সহজভাবে লইতে পারিতেন না; অপর আশ্রিতাদিগের যে ত্রুটি তিনি লক্ষ্যও করিতেন না, খুড়িমার পক্ষে সেই ত্রুটি কল্পনা করিয়াই তিনি মনকে বিরূপ করিয়া তুলিতেন।

সজলনেত্রা খুড়িমা যখন মালতীর চিঠি হাতে করিয়া সেই পুকুরঘাটে উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন রাণীগিন্নি মুখ ভার করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন, দাসীরা একমনে তেল মাখাইতেছে। খুড়িমার সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্বিতা রোহিণী ও রঙ্গদর্শিকা পুরাঙ্গনাগণ ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিও অবুঝ ঔৎসুক্যে খেলা ভুলিয়া এই জনতার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়াইয়া ফিরিতেছিল; তাহারা গিন্নির মুখের ভাব দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; এবং ছোট বৌএর বোনঝির ব্যাপার লইয়া বাড়ীতে এমন একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া গিন্নির মুখ অধিকতর অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

ব্যাপার বুঝিতে খুড়িমার বিলম্ব হইল না। ভিক্ষুকের দৈন্য ও লজ্জা তাঁহাকে কশাঘাত করিতে লাগিল। তাঁহার মুখ দিয়া একটিও কথা ফুটিল না,—কিন্তু চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল বিস্তর। আজ তাঁহার শোকের চেয়ে তাঁহার ভিক্ষার কথাটাই যে

লজ্জায় তাঁহার মর্ম্মবেদনা অতিশয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল; আর সেই সঙ্গে মনে হইতেছিল, এমন দিন তাঁহার চিরকাল ছিল না; তিনি গিন্নিরই একজন সমকক্ষ ছিলেন, তাঁহারও এমনই ঐশ্বর্য্য বিলাস দাসদাসী সব ছিল; তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া কত চাটুবাণী অহরহ তাঁহারও কর্ণে ধ্বনিত হইত। তারপর সে কী দুর্দ্দিন যেদিন তিনি অকস্মাৎ বিধবা হইয়া অসহায় হইলেন এবং হরিবিহারী বাবুর চক্রান্তে নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহারই সংসারে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হরিবিহারী বাবু ও তাঁহার গিন্নি ত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একেবারে পথে বসাইতেই চাহিয়াছিলেন, কেবল বিপিনের জেদে তাহা হইতে পায় নাই! বিপিনের ভক্তিযত্নে তিনি পরাধীনতার সকল গ্লানি একরূপ ভুলিয়া ছিলেন; কিন্তু আজ আবার যে রাক্ষসী মেয়েটার জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয়বার ভিক্ষার গ্লানি স্বীকার করিতে হইতেছে, তাহার দিক হইতে খুড়িমার মন কাজেকাজেই বিমুখ হইয়া পড়িতেছিল। তিনি দীনতার লজ্জার দ্বিধায় পড়িয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না তখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি? ভিক্ষা চাহিতেও মাথা কাটা যাইতেছিল, ভিক্ষা চাহিতে আসিয়া ফিরিয়া যাওয়াও অশোভন অহঙ্কার বলিয়া মনে হইতেছিল।

খুড়িমাকে নির্ব্বাক থাকিতে দেখিয়া রোহিণী আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল—কি হল গো খুড়িমা, রাণীমাকে বল না গো, চুপটি করে কাঁদলে রাণীমা জানবে কেমন করে?... রাণীমা খুড়িমা বল্‌তে খুড়িমার অপেক্ষা না করিয়া রোহিণী নিজেই খুড়িমার আবেদন গিন্নিকে জানাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া খুড়িমা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; রোহিণী কথাটাকে কেমনভাবে উপস্থিত করিবে তাহার ঠিক নাই, তাহার চেয়ে নিজের কথা নিজেই বলা ভালো মনে করিয়া খুড়িমা তাড়াতাড়ি রোহিণীর কথার উপসংহার করিয়া বলিলেন—দিদি, আমার দিদি মারা গেছে।

গিন্নি অপ্রসন্ন মুখে বসিয়া রহিলেন, সান্ত্বনার একটি কথাও উচ্চারণ করিলেন না।

হাবার মা বলিয়া উঠিল—তা রাণীমা সব কথা আগেই শুনেছে; তোমার বোনঝির আসবের কথাও শুনতে বাকি নেই।

খুড়িমা বুঝিলেন তাঁহার ভিক্ষার খবর তাঁহার বলিবার আগেই গিন্নির কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং সেইজন্যই গিন্নি অমন বজ্র-গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিয়া বসিয়া আছেন। গিন্নির এই নিষ্ঠুর নীরবতা ও দাসীদের ধৃষ্টতার মধ্যে বোনঝির আশ্রয়-প্রার্থনার কথা আর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারিল না। খুড়িমা তীব্র দৃষ্টিতে গিন্নির মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

খুড়িমাকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গিন্নি একটু ঝাঁঝের সহিত বলিয়া উঠিলেন—ওসব কিছু পিত্যেশ কোরো না ছোট বৌ। তোমার বোনঝির এখানে আসা সুবিধে হবে না।

খুড়িমা বলিলেন—আমায় ঠাঁই দিয়েছ দিদি; আমার নিতান্ত আপনার জন সে, তাহারও একটু ঠাঁই দাও।

গিন্নি মুখ বক্র করিয়া বলিলেন--তোমায় ঠাঁই দিয়েছি বলে কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি নাকি? আমার বাড়ী সরাই, না হোটেল, যে, যে আসবে তাকেই ঠাঁই দিতে হবে?

খুড়িমা মিনতির স্বরে বলিলেন—কত লোক ত তোমার আশ্রয়ে রয়েচে, আর একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে আশ্রয় দেওয়া তোমার পক্ষে এমনই কি ভার দিদি?

গিন্নি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—লোকের হিংসেতেই তুমি গেলে। কেন লোকের করব না, তাদের করলে দেশ বিদেশে আমার নাম হবে। আর তোমাদের কিছু করা সে ত ভস্মে ঘি ঢালা।

খুড়িমাকে কিছু সাহায্য করা যে দয়া করা নয়, খুড়িমার ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করা, এই বোধ গিন্নির মনে স্পষ্ট হইয়া থাকিয়া তাঁহাকে পীড়া দিত, তাঁহার প্রভুত্বকে সঙ্কুচিত করিত। এইজন্য তিনি খুড়িমাকে দেখিতে পারিতেন না, তাঁহাকে কোন প্রকারে সাহায্য করিতে তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন না। খুড়িমার স্বভাব সহজে হীনতা স্বীকার করিতে পারিত না, মিথ্যা খোসামোদের কথা সব সময় তাঁহার মুখে জোগাইত না। গিন্নির কথা শুনিয়া খুড়িমার বাক্যস্রোত আবার বন্ধ হইয়া গেল। তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রোহিণী বলিয়া উঠিল—তা খুড়িমা, তোমার বোনঝি ত কম মেয়ে নয় বাছা? নিজের ঘরবাড়ী থাকতে পরের বাড়ীতে আসবার এত সাধ কেন?

খুড়িমার উত্তর শুনিবার জন্য গিন্নি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

খুড়িমা লজ্জায় ব্যথিত হইয়া গিন্নির দিকে চাহিয়া বলিলেন—সোমথ মেয়ে একলা কেমন করে থাকবে, তাই তোমায় বলতে এসেছি।

রোহিণী বলিল—তা তুমি গিয়ে বোন্ঝির কাছে থাক গে না।

দাসীর স্পর্দ্ধা দেখিয়া খুড়িমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, চোখ মুখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। খুড়িমা রোহিণীর দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন—দেখ রোহিণী, দাসী তুই, দাসীর মতো থাক। আমি তোর কাছে ভিক্ষে করতে আসিনি।

খুড়িমার ভর্ৎসনায় রোহিণী অপ্রস্তুত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কিন্তু গিন্নি তাহার সাহস বাড়াইয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন--তা রোহিণী এমন মন্দ কথা কি বলেছে? তুমি গিয়ে বোনঝিকে আগলাও গে না।

খুড়িমা দৃপ্তভাবে বলিলেন—বিধবার সর্ব্বনাশ যারা করে তাদের মুখেই এমন বিদ্রূপ শোভা পায়। বড়ঠাকুর যদি আমার একবেলার হবিষ্যির একমুঠো ভাতেরও সংস্থান রাখতেন তবে এ বাড়ীতে আমার বাস যে একদণ্ডও উচিত নয় তা আর কাউকে বলে দিতে হত না। দিদি, শেষ কথা আমায় বলে দাও, আমার বোন্ঝিকে একটু আশ্রয় দেবে কি না।

খুড়িমা উত্তরের প্রত্যাশায় গিন্নির মুখের দিকে দৃপ্ত ভাবে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টির সম্মুখে গিন্নির দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া অবনত হইয়া পড়িল। তিনি নীরবে হাতের বালা খুঁটিতে খুঁটিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বিপিন যদি ঘুণাক্ষরেও এই সংবাদ জানিতে পারে তাহা

হইলে সে তাঁহার উপর রাগ ত করিবেই, হয়ত বা কাহারও মতের অপেক্ষা না করিয়া মালতীকে আনিয়া উপস্থিত করিবে। অতএব মালতীকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করাই ভালো। কিন্তু এত আপত্তির পর কেমন করিয়া হঠাৎ স্বীকার করা যায় তাহারই উপায় তখন ভাবিতে লাগিলেন।

উত্তর পাইতে বিলম্ব দেখিয়া খুড়িমা মনে করিলেন গিন্নির মত নাই। খুড়িমা ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছেন দেখিয়া গিন্নি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—ছোট বৌ, তোমার দেখছি একটুতেই রাগ হয়ে যায়। ওঁয়াকে একবার বলে দেখি, উনি কি বলেন...

খুড়িমা গিন্নির ধাত বুঝিতেন। তাঁহাকে একটু নরম হইতে দেখিয়া তিনিও নরম সুরে বলিলেন—দিদি, তুমিই ত কর্ত্তা। তুমি যা হুকুম করবে তাতে বড়ঠাকুর কখনো না বলবেন না। তোমার দয়া হলেই সব হবে···

গিন্নি এই কথায় প্রসন্ন হইয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—তবু ওঁকে একবার বলা ত উচিত, হাজার হোক একজন কর্ত্তা যখন মাথার ওপরে বসে আছে...বিকেলে যা হয় হবে।

—যা হয় না দিদি। মেয়েটাকে তোমার পায়ে আশ্রয় দিতেই হবে। পোড়াকপালী মেয়েটা একে সোমথ, তায় রূপের ডালি, তুমি আশ্রয় না দিলে তার জাতধর্ম্ম থাকবে না। দিদি তোমার দুটি পায়ে পড়ি।—বলিয়া খুড়িমা গিন্নির পায়ে ধরিলেন।

গিন্নি একেবারে গলিয়া গিয়া বলিলেন—আঃ, ও কি করিস ছোট বৌ, তোর বোনঝি আর আমার বোনঝি কি পৃথক। তোর কিছু ভাবতে হবে না, যা।

খুড়িমা অন্দরের দিকে ফিরিলেন। কাহারো মুখের দিকে চাহিতেও তাঁহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছিল তাঁহার মনে হইতেছিল সকলের দৃষ্টি যেন তাঁহার উদ্ঘাটিত হীন দীনতাকে উপহাস করিতেছে। নিজের দৈন্যের লজ্জা তাঁহার কাছে যত তীব্র হইতেছিল, তাঁহার মন মালতীর প্রতি ততই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। সেই সর্ব্বনাশীর জন্যই যে তাঁহাকে এত লাঞ্ছনা, এত অপমান সহ্য করিতে হইল, এই ধারণা প্রবল হইয়া স্নেহকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহার মন অধিকার করিতে লাগিল।

(৩)

সন্ধ্যার সময় স্মৃতিরত্ন মহাশয় লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের আরতি করিতে ও শীতল দিতে আসিয়াছেন। ঠাকুরঘরে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া খুড়িমা ঠাকুরদর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—রাণীমাকে বলেছিলে মা?

খুড়িমা বলিলেন—হাঁ বলেছি। তিনি ত রাজি হচ্ছিলেন না; অনেক করে' বলাতে শেষে বললেন বড়ঠাকুরকে বলে' যা হয় করবেন।

—আমি হরিবিহারীকে বলেছি। সে খুব সহজেই রাজি হয়েছে। এতে কিন্তু আমার মনটা দমে গেছে——কোনো ভালো কাজে তার উৎসাহ ত কখনো দেখা যায় না। তোমার বোনঝি এ বাড়ীতে টিকতে পারবে কি না তাই ভাবছি।

খুড়িমা কাতর স্বরে বলিলেন—এ বাড়ীতে

আমারও আর বেশী দিন টিকতে হবে না, ভটচায্যি মশায় তার পরিচয় আমিও যথেষ্টই পাচ্ছি।

ভট্টাচার্য্য আশ্বাস দিয়া বলিলেন—তা ভয় কি মা। আর দুমাস পরেই বিপিন বাড়ী ফিরবে, তখন তার ভয়ে তোমাদের ওপর কেউ কোনো অত্যাচার কর্‌তে পারবে না।

খুড়িমা বলিলেন—তা বটে, কিন্তু গিন্নির মেজাজ ত বোঝবার জো নেই, কখন কিসে বিগড়ে যায়। একবার বেঁকে বসলে তখন তাঁকে বোঝানো কারুর সাধ্যে কুলোয় না।

এমন সময় বাহির হইতে গিন্নি ক্রোধ-কর্কশ স্বরে ডাকিলেন --ছোটবৌ!

খুড়িমার মুখ শুকাইয়া গেল, বুক কাঁপিতে লাগিল, গিন্নি যদি আড়ি পাতিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া থাকেন তবেই ত সর্ব্বনাশ! গৃহিণীর আহ্বান শুনিয়া খুড়িমা হরিরলুট মানসিক করিতে করিতে ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—কেন দিদি?

খুড়িমা দেখিলেন যে গিন্নি ঠাকুরঘরের দিকেই আসিতেছেন, সুতরাং তিনি তাঁহার কথা শুনেন নাই, ইহাতে খুড়িমা একদিকে আশ্বস্ত হইয়া নূতন অজ্ঞাত আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

গিন্নি ঠাকুরঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—বোনঝির কথা বাবুর কাছে যখন নিজেই বলানো হয়েছে, তখন ঢং করে আবার আমার কাছে বলতে যাওয়া হয়েছিল কেন?......শুনেছ ত ছোটগিন্নি, বাবুর হুকুম হয়েছে! নিয়ে এস এইবার সুন্দরী বোনঝিকে, তোমার আর কোন

এই কথার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটি খুড়িমার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—দিদি!

গিন্নি খুড়িমার তেজস্বী স্বভাব খুব ভালো করিয়াই চিনিতেন। খুড়িমার একটি কথায় সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদের উগ্রতা অনুভব করিয়া গিন্নি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন খুড়িমা উচ্চকণ্ঠে গিন্নিকে শুনাইয়া বলিলেন—আমি এই ঠাকুরঘরে দাঁড়িয়ে বলছি, আমি যদি মালতীকে এবাড়ীতে আনি তবে......

ভট্টাচার্য্য তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন—ছি বৌমা, শপথ করতে নেই, থাম থাম, অনর্থক ক্রোধ করে' একজন নিরাশ্রয়ার সর্ব্বনাশ কোরো না মা!

করুণা ও স্নেহের স্পর্শে খুড়িমার ক্রোধ চোখের জলে গলিয়া পড়িল। তিনি সরোদনে বলিলেন—আমি তার ছন্দাংশে আর থাকব না ভটচায্যি মশায়; পোড়া-কপালীর অদেষ্টে যা থাকে হবে। নারায়ণ! কতকাল আর আমায় এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—ছি মা, মৃত্যুকামনা করা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ করা, মহা পাপ। নারায়ণে ভক্তি রেখ মা, সকল দিকেই কল্যাণ হবে। তুমি গিন্নির মন ত জানো, তিনি মাটির মানুষ, তাঁকে আর একবার তুমি বল্লেই তাঁর রাগ জল হয়ে যাবে।

খুড়িমা চোখ মুছিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন—

মশায়। মুখে উচ্চারণ না করি মনে মনেও ত দিব্যি করেছি। তার কপালে যা আছে তাই হবে।

ভট্টাচার্য্য চক্ষুমুদ্রিত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—নারায়ণ!

খুড়িমা গলবস্ত্র হইয়া নারায়ণকে প্রণাম করিলেন। তারপর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত রুদ্ধ বেদনার অশ্রুজল মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আপনার নিভৃত কক্ষটির উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত হইয়া গিন্নির নিকট নিবেদিত হইয়া গেল।

(ক্রমশ)

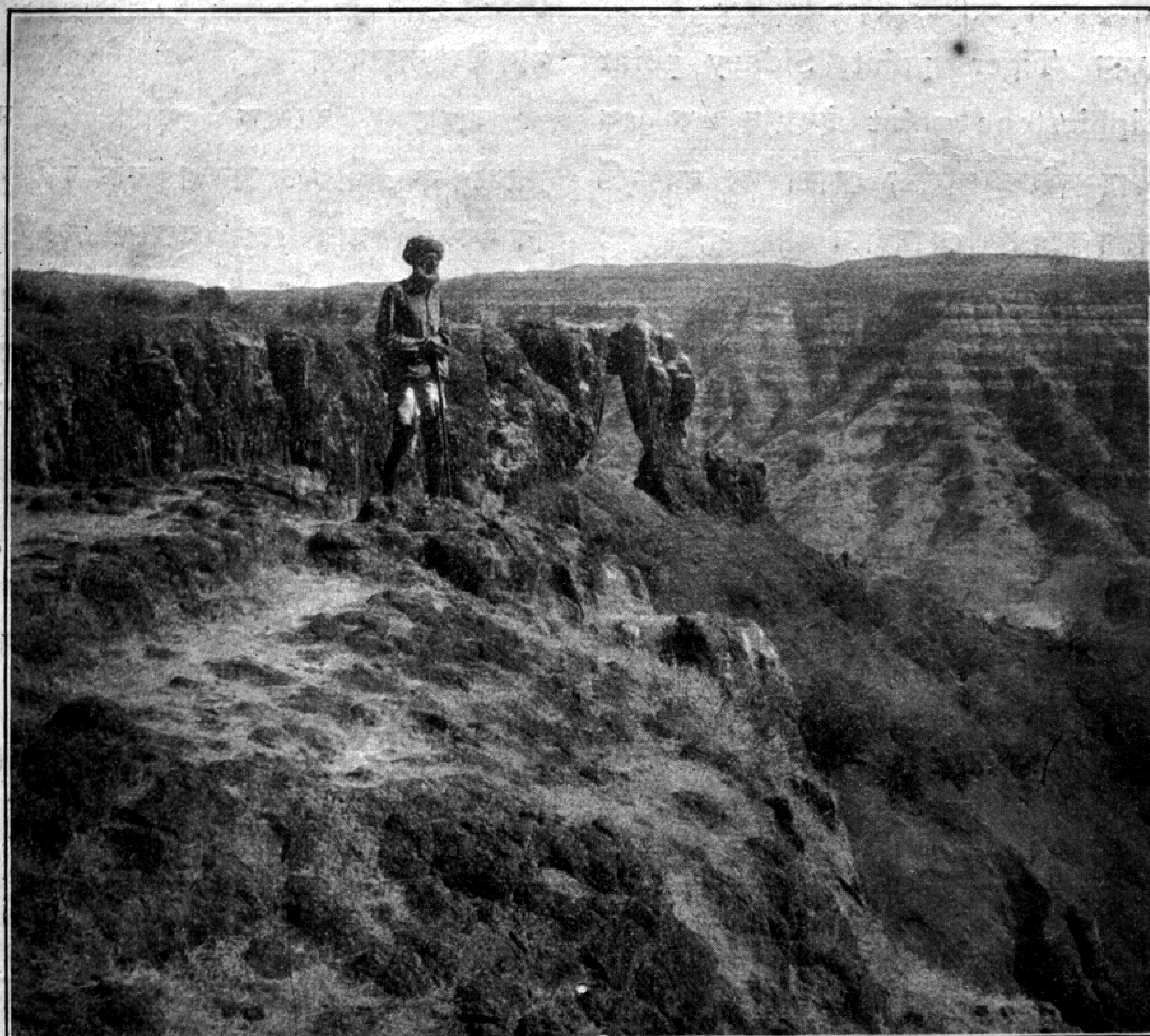
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৮)

বোম্বাই ও বাঙ্গলাদেশ

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন আমি বাঙ্গলাদেশ ছাড়িয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে আমার কর্ম্মস্থান কেন পছন্দ করিলাম? তাহার উত্তর এই যে বঙ্গদেশ নির্ব্বাচনের অধিকার আমার আদৌ ছিল না। পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ানদের মধ্যে যে শ্রেণীতে যাহার নাম সেই অনুসারে তাহার নির্ব্বাচন ক্ষমতা; আমার নাম যেখানে পড়িয়াছিল তাহাতে আমার বাঙ্গলাদেশ লইবার অধিকার হইল না। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই দুয়ের মধ্যে বাছিয়া লওয়া, এইটুকু আমার অধিকারের সীমা, এই দুয়ের মধ্যে আমি বোম্বাই বরণ করিলাম। তাতে আমার কোন দুঃখ নাই। আমার বিশ্বাস যে বাঙ্গলাদেশের তুলনায় বোম্বায়ের আবহাওয়া উৎকৃষ্ট। গ্রীষ্মকালে দুই তিন মাস যা গরম ভোগ করিতে হয় তাহা ধর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য যেখানে আমি অনেক বৎসর ধরিয়া বাস বর্ষার ত কথাই নাই। গ্রীষ্মকালও কষ্টদায়ক নহে। তা ছাড়া বোম্বাই মফস্বল কোর্টের গ্রীষ্মাবকাশের যে নিয়ম তাহাতে অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ কাল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে অনায়াসে দূরে থাকা যায়। বোম্বায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া ধার্য্য। শীতের সময় নিজ বোম্বাই সহর, বর্ষায় পুণা, গ্রীষ্মে মহাবলেশ্বর, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপুরুষেরা এই তিন স্থানে পালায় পালায় অধিবেশন করেন। আমরা অনেক সময় গ্রীষ্মকালে মহাবলেশ্বর পাহাড়ের আশ্রয় লইতাম। সে অতি মনোরম স্থান। পশ্চিমঘাট শ্রেণীর মধ্যে অনেক সুশোভন পাহাড় দৃষ্ট হয় কিন্তু মহাবলেশ্বর সকলের সেরা। এই পর্ব্বতের শিখর পঞ্চনদীর আকর স্থান। তথায় মহাবলেশ্বর নামে শিব মন্দির আছে, তাহা হইতেই এ পাহাড় স্বনাম গ্রহণ করিয়াছে। এ পাহাড় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিহার ভূমি

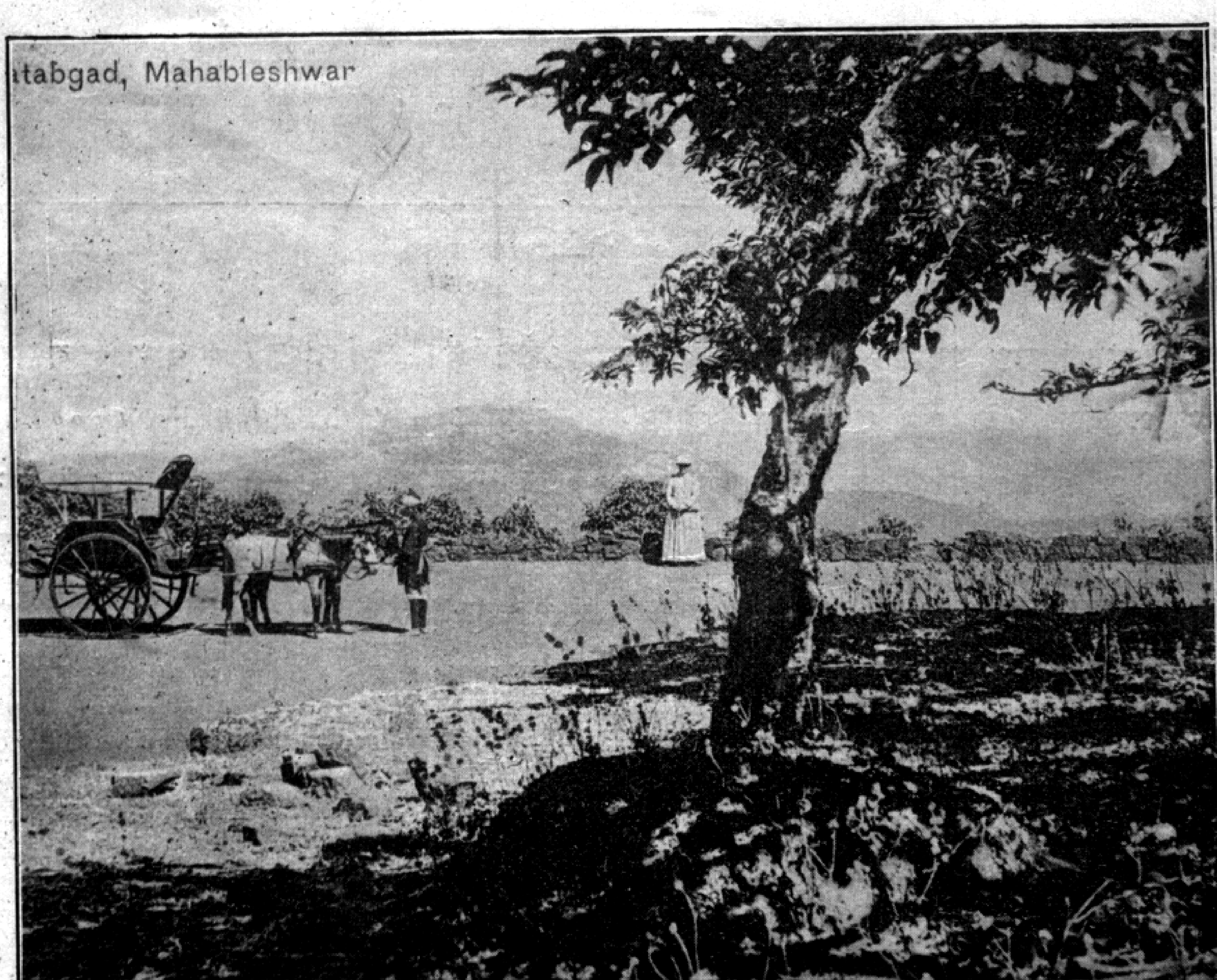


কার্লিশ পয়েন্ট—মহাবলেশ্বর

শৈলনিবাস সিলঙ যত উঁচু এও তার সমান উঁচু; সম্ভবত এই দুই পাহাড়ের শোভা-সৌন্দর্য্যও এক প্রকার। আমি নিজে সিলঙ দেখি নাই কিন্তু সে দিকে বেড়াইতে গিয়া আমার কন্যা সিলঙের যা বর্ণনা করিয়াছেন তা মহাবলেশ্বরেও ঠিক খাটে। তিনি লিখিতেছেন, "ছোট খাটোর মধ্যে সবই বেশ নিটনাট ফিট্‌ফাট্ যেন বড় মানুষের বাগান সাজিয়ে রেখেছে। প্রকৃতির বিরাট বা দুর্দ্দান্ত ভাব নেই, এখানে তিনি গৃহিণীরূপে মানুষের মত ঘরকন্না সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছেন। দৃশ্যের খুব গাম্ভীর্য্য না থাক্ সৌন্দর্য্য যথেষ্ট আছে। লাল লাল রাস্তা ব্যাড়াবার বেশ সুবিধা। ৫০০০ ফীট উঁচু সুতরাং বেশী ঠাণ্ডাও নয়।" মহাবলেশ্বরের ভাবও অবিকল এইরূপ। দেখিতে যেমন সুন্দর, ব্যাড়াইবার স্থানও অপর্য্যাপ্ত পড়িয়া আছে। গাড়ী চলাচলের কোন বাধা নাই, আবহাওয়া শীতোষ্ণের মাঝামাঝি! সুন্দর লাল রাস্তা, বিপনি, বাঙ্‌লা, উদ্যান পাহাড়ের গায়ে ছড়াইয়া আছে। উপরে সমান জমি এত আছে যে ঘরে থাকিয়া পাহাড়ে বাস করিতেছি মনেই হয় না। পাহাড়ের শোভা দেখিতে গেলে এক এক

প্রান্তে গিয়া দেখিতে হয়--এক এক Point যেমন Tiger point, Sidney point Elphinstone point ইত্যাদি এক এক কোন্ হইতে পার্ব্বত্য শোভা নব নব মূর্ত্তি ধারণ করে। কোনখানে গাছ পালা শূন্য কঠোর পর্ব্বত শ্রেণী। কোন পাহাড় "বপ্র-ক্রীড়া পরিণত গজপ্রেক্ষণীয়।" কোন কোন পাহাড় দুস্তর বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাতালে নামিয়া গিয়াছে। পশ্চিমে প্রতাপ-গড়ের পাহাড় বনরাজির মধ্য হইতে গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়ের উপর শিবাজী রাজা দুর্গ বাঁধিয়া বাস করিতেন। মহাবলেশ্বরের মত সুন্দর সুগম স্বাস্থ্যনিবাস এদেশে অল্পই পাওয়া যায়, কেবল বৃষ্টির আধিক্য বশতঃ বর্ষায় কয়েক মাস উহা বাসযোগ্য নহে।

আমাকে অনেকে খোঁটা দিতেন, বিদেশে সমস্ত জীবনটা চাকরী করে কাটানো কি ঝকমারি তার চেয়ে স্বদেশে কেরানীর কাজ করাও ভাল।" কিন্তু বিদেশে চাকরী করিবার যেমন কতকগুলি অসুবিধা আছে, তেমনি সুবিধাও বিস্তর। আত্মীয় স্বজন হইতে সুপারিসের দরখাস্ত আসেনা সেই এক মহৎ লাভ। বিচ্ছেদের পর মিলনের আনন্দ সে কি কম? স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে একটি বন্ধনসূত্র স্থাপন করিবার অবসর পাওয়া সেও কি সামান্য লাভ? যতদিন আমি ওদেশে ছিলাম, মনে হইত বোম্বাই



প্রতাপগড়—মহাবলেশ্বর

বাঙ্গলা যেন একটি যোগসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। বাঙ্গলাদেশ হইতে আমার পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের মধ্য হইতে একটা লোকের স্রোত একটানা বহিতেছিল, তাহাদের যাওয়া আসার বিরাম ছিল না। ইহাতে এই দুই দেশের লোক-দের পরস্পর সখ্যবন্ধন হইবার দিব্য সুযোগ হইত। আমি ওদেশে থাকিয়া বোম্বাই বাসীদিগের যে সকল সদ্‌গুণ তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম আর আমার যা দিবার তা দিতেও সক্ষম হইলাম। আমি যেখানেই কর্ম্ম করিতাম, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চার হয় সে বিষয়ে যত্নের কোন ত্রুটি করি নাই। আমার এইরূপ কর্ত্তব্য সাধনের যে পুরস্কার তাহাও যথেষ্ট পাইয়াছিলাম, আমার আত্মপ্রসাদ আর লোকের প্রসাদভাজন হওয়া এ দুইই আমার লাভ হইয়াছিল। কালক্রমে বোম্বাই আমার নিজের দেশ হইয়া গেল—সেখানকার অধি-বাসীদের আতিথ্যসৎকারে তাহা আমাদের বিদেশ বলিয়া মনেই হইত না।

উপসংহার

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে সিবিলিয়ন ও অপরাপর ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আমার সদ্ভাব ও হৃদ্যতার অভাব ছিল না। ইংরাজমহিলাদের সঙ্গেও আমাদের সর্ব্বদা দেখাশুনা মেলামেশা হইত। একসঙ্গে টেনিশ খেল', ভোজনগৃহে একত্র মিলন, মফস্বল ষ্টেশনে ইংরাজদিগের যে সমস্ত সমাজ-বন্ধনের নিয়ম, আমরাও সেই গণ্ডীর অন্তর্ভূত ছিলাম। ইঁহারা কেহই আমার সম্বন্ধে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণাদি ভদ্রব্যবহারের ত্রুটি করেন নাই। ইংরাজি-ক্লবের প্রবেশদ্বার আমার জন্য মুক্ত ছিল—এমন কি সোলাপুর ক্লবের প্রেসিডেন্টরূপে আমি কয়েক বৎসর কার্য্য করি। কিন্তু এই যে দেশী ও ইংরাজদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এ কেবল আমার নিজের সম্বন্ধে বলিতেছি। সাধারণতঃ দেশী ও আঙ্গলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে পরস্পর সামাজিক সম্বন্ধ তেমন সন্তোষজনক বলিতে পারি না। তাহাদের মধ্যে যে বৃহৎ প্রাচীর পরস্পরকে বিযুক্ত রাখে তাহা উল্লঙ্ঘন করা সহজ নহে। তার অনেকগুলি কারণ আছে—

প্রথম, যা কথায় বলে East is East West is West—পূর্ব্ব সে পূর্ব্ব পশ্চিম সে পশ্চিম, তাদের বিধাতাদত্ত প্রকৃতিগত যে পার্থক্য তাহা ঘোচাইতে পারে কাহার সাধ্য ? তাছাড়া ইংরাজেরা রাজার জাতি আমরা পরাজিত প্রজার জাতি। তার উপর 'এক গোরা এক কালা'। আবার এই বর্ণভেদের সঙ্গে সঙ্গে আচার ব্যবহার ভাষা ধর্ম্ম সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। এই জাতিগত বৈষম্য হইতে বিদ্বেষ ভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। বৈদিককালে আর্য্য ও দস্যুদের মধ্যে এই কারণে যে বিষম বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, বেদের মধ্যে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়, ইংরাজেরা এদেশে চারিদিনের যাত্রী। অর্থোপার্জ্জনের জন্য এ দেশে আসা ও টাকা করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাওয়া। তাঁদের শরীর এক দিকে মন অন্য দিকে। বিশেষত ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের এমন সুবিধা হইয়াছে তাহাতে

এদেশের উপর ইংরাজদের টান থাকিবার অল্পই সম্ভাবনা। আগেকার কালে দেশীয়দের উপর এক একজন ইংরাজের সময়ে সময়ে বিলক্ষণ মমতা দেখা যাইত। তাহার কারণ এই, তাঁহারা ভারতবর্ষে অধিককাল বাস করিয়া এদেশকে স্বদেশতুল্য জ্ঞান করিতেন; কিন্তু এক্ষণে আর সেভাব নাই। ইংরাজেরা এখানে প্রবাসীর মত থাকিয়া চলিয়া যান। "নানা পক্ষী এক বৃক্ষে নিশিতে বিহরে সুখে প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।"

তৃতীয়ত, ইংরাজের স্বভাব কতকটা সামাজিকতার বিরোধী। তাঁহারা আপনাদের জাতীয় ঔদ্ধত্য—John Bull ভাব কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। তাঁহাদের নিজের কবি যেমন স্বজাতির বর্ণনায় বলিয়াছেন তাঁহাদের দেখিয়া কাহার না মনে হয়—

চলন গরবে ভরা, ধরা সরা গণে,
পৃথিবীর পতি যেন চলে উর্দ্ধাননে!

আর এক কথা এই এখানকার অধিকাংশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, তাঁহাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশার সুবিধা হয় না। বোম্বায়ের মত সহরে যাহাই হউক, মফস্বল ষ্টেসনে ওরূপ হওয়া অসম্ভব। এই সকল নানা কারণে আমাদের উভয়তঃ যে বিচ্ছিন্নতা আসিয়া পড়িয়াছে তাহা অপসারিত হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আমাদের সম্রাট জর্জ যুবরাজ থাকিতে যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তিনি ইংরাজ ও দেশীয়দের মধ্যে এইরূপ বিচ্ছিন্নভাব দর্শন করিয়া ব্যথিত হন, ও দেশে ফিরিয়া গিয়া বলিয়া পাঠান যে সহানুভূতি (Sympathy) ... উচিত। এই Sympathy কি কেবল কথার কথা, কার্য্যত কখনই দেখা দিবে না? তাহা কে বলিবে? এক সময় আমাদের যাহা অসাধ্য মনে হয় বিধাতা তাহা কালেতে সুসাধ্য করিয়া দেন। কালক্রমে এই দুই জাতির অধিকতর চেনা পরিচয় হইলে কি হয় কে বলিতে পারে? ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগ ঈশ্বর মঙ্গলের জন্যই সংঘটন করিয়াছেন। ইহা শুধু শক্তির লৌহবন্ধন না হয়, প্রীতির বন্ধন হওয়াই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। কিন্তু এই উদ্দেশে উভয় জাতিরই যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। উভয়ের পরস্পর সহানুভূতি ও সাহায্য চাই। বিশেষতঃ ইংরাজেরা যেন মনে রাখেন যে তাঁহারা অল্প প্রয়াসেই আমাদের সদ্ভাব আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহারা যদি একপদ অগ্রসর হইয়া আসেন আমরা সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে প্রস্তুত। প্রেমদান করিলেই তাহার প্রতিদান পাওয়া যায়। যেমন উদারচরিত Revd. Andrews সাহেব বলিয়াছেন:—

"একটি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—আমি নিজের মনেও এখনো পর্য্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই, কিন্তু ইহা সত্য, যে কোন কোন অসাধারণ মনীষী পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, যাঁহারা এদেশের জীবনের মর্ম্মস্থলে তৎক্ষণাৎ যেন সহজ জ্ঞানের দ্বারা প্রবেশ লাভ করেন, প্রেমের দ্বারা তাহার সহিত এক হইয়া যান। এই যে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয়ের উদ্রেক তাহা অতীব বিস্ময়-

একজন ছিলেন; চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত রদেন্‌ষ্টাইন আর একজন। ভারতবাসীগণও তৎক্ষণাৎ এই সহজাত প্রীতির প্রতিদান করেন। প্রেম পূর্ণমাত্রায় প্রেমের আহ্বানে সায় দেয়। এই যে প্রচ্ছন্ন ভালবাসা এক মুহূর্ত্তেই জ্বলিয়া উঠিতে প্রস্তত, ইহা সুষুপ্ত মনের কোন্ গভীর প্রদেশে থাকে? মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ হয়ত আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম! কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন, আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষ এবং য়ুরোপের মূলগত ঐক্য ইহা দ্বারা সূচিত হয়, এবং ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এক বংশজাত ছিলেন বলিয়াই আজ আমরা এমন অবিলম্বে, এমন অভূতপূর্ব্বভাবে এই আত্মীয়তা অনুভব করিয়া থাকি," *

ভারতবর্ষের প্রতি প্রেম ও মমতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আগেকার কালে ডেভিড হেয়ার ও একালে অ্যালেন হ্যুম এই দুই মহাত্মারও নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; একজন আমাদের বিদ্যাগুরু, অন্যজন রাজনৈতিক মন্ত্রদাতা। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে যে সকল সহৃদয় মহাত্মা আমাদের হিতের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করেন, আমরা তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইয়া আত্মীয়ভাবে আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত। ভারতবন্ধু হ্যুম সাহেবের মৃত্যুতে আমাদের হৃদয়ের গভীর শোকোচ্ছ্বাস কি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে না? তাঁহার ন্যায় উদারচেতা মমতাবান্ কর্ম্মবীরেরাই এই বাঞ্ছনীয় মিলন ঘটাইবার পক্ষে অনেক করিতে পারেন। নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই, কেননা পূর্ব্বপশ্চিমে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, মনুষ্যত্বের উচ্চ শিখরে এমন একটা স্থান আছে যেখানে এই সমস্ত ভেদাভেদ বিলীন হইয়া যায়। যাঁহারা এই শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যায়—

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং
উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকং

এ নিজ এ পর লঘুচেতাদের এইরূপ গণনা; উদারচরিত যাঁহারা, তাঁদের আত্মপর নাই, বসুধাই তাঁহাদের কুটুম্ব সমান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাপানের শিক্ষা ও বাণিজ্য

জাপান অতি অল্পকাল মধ্যে শিক্ষা-বাণিজ্যে যেরূপ উন্নতি দেখাইয়াছে এরূপ পৃথিবীর কোনজাতি কোন বিষয়ে দেখাইতে পারে নাই। ইহাদের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে অনেকেই বলিয়া থাকেন যেন দৈব শক্তির প্রভাবে জাপানীরা ভেল্কিবাজীর ন্যায় অসম্ভব কার্য্যসমুদায় অতি সহজে নীরবে সুসম্পন্ন করিতেছে। সামরিক কৌশলে ইহারা চীন ও রুষকে পরাস্ত করিয়াছে। কিন্তু শিল্পবাণিজ্য-যুদ্ধে জাপানী-

---

* With Rabindranath in England—Modern Review for January 1913.

দের অসাধারণ নৈপুণ্য দর্শনে শিল্পবীর ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণি এবং মার্কিন জাতি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়াছেন।

২৫.৩০ বৎসর পূর্ব্বেও জাপানের শিল্প বাণিজ্যে বৈদেশিক জাতির ভিতর তেমন ত্রাসের লক্ষণ দেখা যায় নাই।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে চিকাগো প্রদর্শনীতে জাপানী সূতী ও রেশমী বস্ত্র, চীনামাটীর বাসন, বাঁশ ও বেতের জিনিষ মাদুর এবং বার্ণিশের কাজ দেখিয়া আমেরিকগণ অবাক্ হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাঁহাদের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা মনে করিয়া পর বৎসর তথাকার শিক্ষাবাণিজ্যসমিতি কর্ত্তৃক মিঃ পোর্টার জাপানী শিল্পের তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত জাপানে প্রেরিত হন। মার্কিন জাতি যে জাপানকে যথেষ্ট লাভজনক ক্ষেত্র মনে করিয়া ১৮৫৪ এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি স্থাপন করেন, আজ মিঃ পোর্টার আসিয়া দেখেন লাভজনক দূরের কথা বরং জাপানই মার্কিন দেশ হইতে অর্থশোষণের বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। তিনি তাঁহার বিবরণীতে প্রকাশ করেন যে আমেরিকানদের পক্ষে তাহার প্রাচ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত প্রতি-যোগিতা চালান সম্পূর্ণ অসম্ভব যেহেতু জাপানে অতি অল্প বেতনে সুচতুর, দ্রুত অনুকরণশীল, উৎসাহী ও কর্ম্মোৎসুক কুলির অভাব নাই, পক্ষান্তরে আমেরিকায় ঐরূপ সামান্য বেতনে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য কুলি পাওয়াই কঠিন।

মাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়েরা বলে আমরা তিন পুরুষের চেষ্টায় বস্ত্রবয়নে যে নিপুণতা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম জাপানীরা দশ বছরেই তাহা শিখিয়াছে! তাহাদের সহিত আমরা কিরূপে প্রতিযোগিতা চালাইব?

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে না হইলেও বস্ত্রাদি বহু জিনিস অনেক পূর্ব্বেই জাপানে প্রস্তুত হইত কিন্তু ইউরোপে ও আমেরিকার সহিত ঐ সকল দ্রব্য প্রতিযোগিতা সংরক্ষণে অসমর্থ হওয়ায় জাপান গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত দলে দলে ছাত্র বিদেশে পাঠাইতে থাকেন। তাঁহারাই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শিল্প বিজ্ঞানের স্কুল কলেজ এবং কারখানা স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করেন।

জীর্ণঘর সংস্কার করিলে ঠিক মনের মত না হইতে পারে বটে কিন্তু দশখানা বাড়ী দেখিয়া একখানা বাড়ী ইচ্ছানুরূপ প্রস্তুত করা তেমন শক্ত নহে। জাপানীদের শিল্প এবং বাণিজ্য অনেকটা নূতন বাড়ীর ধরণে গঠিত। বিভিন্ন সভ্যদেশের শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া যেটি সব চেয়ে সহজসাধ্য অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুন্দরভাবে সামান্য মূলধনে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত প্রতিযোগিতা সংরক্ষণে পারক জাপানীরা নব্যপ্রণালীতে তেমন পন্থাটিই অবলম্বন করিয়াছে।

জাপান অন্যান্য দেশের ন্যায় আমদানী রপ্তানী দুইই করিতেছে। শিল্পবাণিজ্যের নূতন দেশ, তাই ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য এখনও প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে বিস্তর কল কব্জা আনিতে হইতেছে। ক্ষুদ্র জাপানের শতকরা ৮৪ ভাগের অধিকাংশ পাহাড়াবৃত এবং বাসোপযোগী ভূমির তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কাযেই সভ্যদেশের আবশ্যকীয় সাংসারিক দ্রব্য এবং কারখানার জন্য দ্রব্য

পশম চর্ম্ম প্রভৃতি দ্রব্য (raw materials) সঙ্কুলান হইতে পারে না, এই সব কারণে জাপানকে যথেষ্ট টাকার জিনিস বিদেশ হইতে আনিতে হয়। কিন্তু বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জাপান সুদে আসলে সে সকল টাকা আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখানে শতকরা ৬০ জন কৃষিকার্য্যে, ৩৫ জন শিল্পবাণিজ্যে, এবং অবশিষ্ট ৫ জন অন্যান্য কার্য্যে লিপ্ত। বৎসরের যে সময়টায় কৃষি বন্ধ থাকে তখন কৃষকেরা শিল্প কর্ম্মে যোগ দেয়। জাপানে এমন লোক অতি বিরল, যিনি ঘরে বসিয়া অন্ন ধ্বংস করেন। সকলেই কিছু না কিছু করিতেছে।

জাপানীরা প্রথমতঃ ক্ষুদ্রাকারে কারখানা স্থাপন করে, ক্রমে কারবার বড় করিতে থাকে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় গবর্ণমেণ্ট নূতন কারখানা খুলিবার জন্য টাকা হাওলাত দেন; ক্রমে কারখানার আয়ের দ্বারা ঋণ পরিশোধ হইতে থাকে। কারখানাতে কার্য্য শিক্ষার পক্ষে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের পক্ষে জাপানই উপযুক্ত স্থান। কেন না ইউরোপীয় এবং আমেরিকার ধনাঢ্যের ন্যায় ভারতবাসী কেহই কোটী কোটী মূলধনে কারবার খুলিতে প্রস্তুত নহে। কাযেই শিল্প বাণিজ্যের প্রথম অবস্থায় ক্ষুদ্রায়তনে আরম্ভ করিবার পক্ষে জাপানী পন্থাই আমাদের অনুকরণীয়।

জাপানে শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক একটি মহাসভা আছে। ঐ সভায় প্রাদেশিক চেম্বার্শ অব কমার্শের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির উপায়



বাণিজ্য ও নৌবিদ্যালয়—তোকিও

আলোচনা করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে হাকোদাতে নামক স্থানে যে মহাসভার অধিবেশন হয় তাহাতে মিঃ কার্ণেকো বলেন,—

"যে যে কারণে দেশ শিল্প বাণিজ্যে উন্নত হইতে পারে আমাদের সে সমস্তই আছে। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারিব এইজন্যই বুঝি পরমেশ্বর কৃপা করিয়া ক্ষুদ্র দেশের তুলনায় জাপানে বেশী লোকের সৃজন করিয়াছেন। জাপানীদের কার্য্য করিবার শক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি অতীব প্রখরা। তাহারা সর্ব্ব বিষয়েই সূক্ষ্মদর্শী এবং পৃথিবীর মধ্যে সব জাতির চেয়ে চতুর। এই জন্যই সুচতুর মার্কিন জাতি পর্য্যন্ত আমাদিগকে ভয় করিয়া চলে"।

কৃষি ও শিক্ষা বিভাগীয় ভাইস মিনিষ্টার বলেন,

"মেইজি অব্দের (১৮৬৮ খ্রীঃ) প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পবাণিজ্য বিষয়ে সকলের চক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে। দেশে অনেক কুসংস্কার ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের (দাইমিয়োর) ক্ষমতা তখন অসাধারণ ছিল। তাঁহাদের জন্যই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দেশে রাজ-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, আবার তাঁহাদের চেষ্টাতেই উহার অবসান হয়। এবং প্রায় ঠিক সেই সময়ই তাঁহাদের যত্নে দেশের যাবতীয় লোক কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করে। ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে কসাই চামারের ব্যবসা অবলম্বনকারীগণ সমাজচ্যুত হইত, কালচক্রের আবর্ত্তনে সে ভাব এখন কিছুই নাই। এখন কোন্ ব্যবসা উচ্চ, কোন্ ব্যবসা নীচ এবং কোন্ ব্যবসা ছোট কোন ব্যবসা বড় তাহা নির্দ্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি মূলধন।

কল কারখানা সম্বন্ধে যে জাপানে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কোন জ্ঞানই ছিল না, যে জাপানীরা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কমোডোর পেরির জাহাজ জাপানউপকূলে দেখিয়া অবাক হইয়াছিল, সেই জাপানীরা এ কয়েক বৎসরে কলকারখানায় দেশকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তোকিও কিম্বা ওসাকা সহরের কোন উচ্চ-স্থানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে তাকাইলে কারখানার অসংখ্য চিম্‌নি দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যে জাপান শিল্প বাণিজ্যের দেশ। দুপুর ১২টা বাজিলে কারখানার বাঁশীর ধ্বনিতে ঘরে বসিয়াই টের পাইতাম জাপানে শিল্প বাণিজ্যের সংগ্রাম কি তুমুল ভাবেই চলিতেছে। শুধু বড় বড় সহরে নহে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে, এমন কি ঘরে ঘরেই কারখানা। ওসাকা সহর প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ম্যাঞ্চেষ্টার বলিয়া খ্যাত। জাপানের কত সহর কত গ্রাম কত রকম শিল্প জাতের জন্য বিখ্যাত। ক্রমেই আরো কতস্থান নূতন নূতন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। আর আমাদের ভারতের প্রাচীন শিল্প এবং শিল্প-প্রধান স্থান গুলির নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে শুধু বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, বাগবাজারের রসগোল্লা, ভীমনাগের সন্দেশ, জয়হরির কুল্পি বরফ, ফতুল্যার চিঁড়া, বিক্রম পুরের পাতক্ষীর এবং এই জাতীয় কিছু।

বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, আমরা সকলেই বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু বুঝিতে

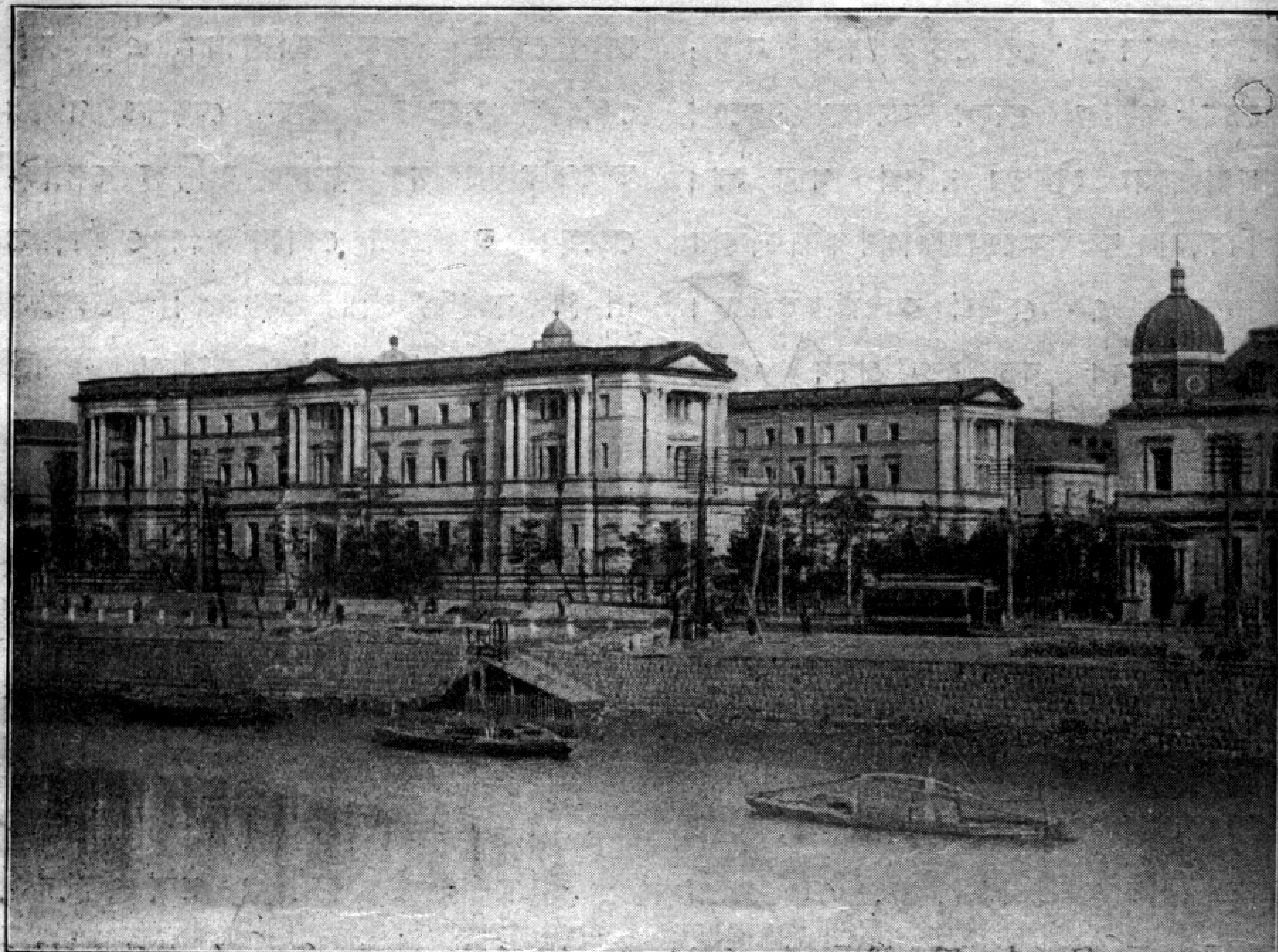
পারি না এ পর্য্যন্ত কেন ব্যবসা বাণিজ্যকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে শিখি নাই; ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশ ব্যবসাবাণিজ্যে হীনতর বলিয়া মনে হয়। এই বিকানীর মরুর মাড়োয়ারীগণ কলিকাতার বড়বাজারকে এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছে। সুদূর আসামের বড় বড় গ্রামে পর্য্যন্ত মাড়োয়ারীর দোকান। বিকানীর রাজপুতানার মরুভূমির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, অথচ এই একমাত্র বিকানীর মরুরাজ্যেই ছয় শতাধিক লক্ষপতির বাস। বৈদেশিক বণিকগণ বিকানীরকে ভারতের চিকাগো বলিয়া থাকেন।

পশ্চিম ভারতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় হিন্দু, এবং পার্শী মুসলমান প্রভৃতি সওদাগরগণ এসিয়ার এবং ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতেছে। সুদূর জাপানের এক ইয়োকোহামা সহরেই প্রায় দেড়শত পশ্চিম ভারতীয় সওদাগর ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতেছে। জাপানের কোবে সহরেও ভারতবাসীর সংখ্যা প্রায় তদনুরূপ। উহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিয়াছি যে অনেকেরই ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে কারবার আছে। চীনদেশে, ফিলিপ্পাইন দ্বীপে, শ্যাম, হঙ্কং এবং সিঙ্গাপুরে বিস্তর পশ্চিম ভারতীয় সওদাগর ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত আছে। কেবল একটি মাত্র বাঙ্গালী যুবককে সিঙ্গাপুরে ব্যবসা চালাইতে দেখিয়াছি।

বাণিজ্যের উন্নতি এবং প্রসারণ রেল, ষ্টীমার এবং ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সুবন্দোবস্তের



উচ্চ রাজনৈতিক বিদ্যালয়—তোকিও



জাপান-ব্যাঙ্ক,—তোকিও

উপর অনেকটা নির্ভর করে। ৪০.৫০ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জাপান এ তিন বিষয়েই বিশেষ পশ্চাৎপদ ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইয়োকোহামা হইতে তোকিও পর্য্যন্ত ১৮ মাইল রাস্তার উপর সর্ব্ব প্রথম রেলের লাইন বসে। তারপর ৯ বৎসরে আর এক মাইলেরও বৃদ্ধি হয় নাই। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে "জাপান রেল কোম্পানী নামক" একটি প্রাইভেট কোম্পানী ৪৫ মাইল রেলরাস্তা প্রস্তুত করে। ইহার পর রেলের কাজ এতই দ্রুত চলিতে থাকে যে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রেল পথের দীর্ঘতা ৫২৯৫ মাইলে দাঁড়াইয়াছে। বাষ্পীয় ট্রেন ছাড়া বড় বড় সহরে এবং সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে বিস্তর বৈদ্যুতিক ট্রাম এবং টেন চলিতেছে। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! বেশী দিনের কথা নয়, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জাপানের রেলগাড়ীতে যখন কাচের দরজাজানালা হয় তখন গাড়ীতে ঢুকিবার সময় সেগুলি খোলা দুয়ার ভ্রমে অনেক আরোহীকে আঘাত পাইতে হইয়াছে। আজ তাহারাই শিল্প বাণিজ্য এবং সমরকৌশল প্রভৃতিতে বড় বড় জাতিকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে আর তাহারাই বলিতেছে জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর জাতি। কাচের দুয়ার জানালায় আঘাতের কথায় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কথা মনে হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্বপ্রথম জাহাজ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে জাপানে ১৪০০ খানা ষ্টীমার ও জাহাজ ছিল। ষ্টীমার

ও রেলের সংখ্যা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৭৩৪০ থানায় দাঁড়াইয়াছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে দেখিয়াছিলাম কারবার এবং গতায়াতের সহায়তার জন্য সেই বৎসর ষ্টীমার ও জাহাজ লাইনের সংখ্যা ছিল ৭১টি। বলা বাহুল্য এ কয়েক বৎসরে ঐ লাইনের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

জাপানে নেশন্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপন মানসে প্রিন্স ইতো ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে তথাকার ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী সংগ্রহ করিয়া জাপানে প্রেরণ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নেশনাল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় আইন জারি হয়। উহার পর হইতেই স্থানে স্থানে উৎসাহী কর্ম্মবীরগণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপানে ৯৫০টি ব্যাঙ্ক ছিল, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে ২২৩০টি ব্যাঙ্কের উল্লেখ রহিয়াছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্টের অনুমোদনে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে স্থানে স্থানে কোম্পানী গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর সংখ্যা ৯০০৬ ছিল; ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা ১২৩০৮ দাঁড়াইয়াছে!

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কৃষি-শিল্প-জাত দ্রব্যের ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারণের সহায়তাকল্পে গবর্ণমেন্ট Businees guilds স্থাপন সম্বন্ধীয় আইন প্রণয়ন করেন। দেখিতে দেখিতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে উক্ত সভার সংখ্যা ৮৭০ হইয়াছে।

অনেক দিন পুর্ব্ব হইতে কো অপারেটিভ সোসাইটির প্রচলন থাকিলেও উহার প্রসারণ অতি ধীরে ধীরে হইতে থাকে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কোঅপারেটিভ সোসাইটি সম্বন্ধীয় আইন প্রণয়ন হয়। উহার পর হইতেই সোসাইটির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কোঅপারেটিভ সোসাইটির সংখ্যা ১৬৭১ ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা ৭৩০৮ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

স্থদূর

(গল্প)

নবীন কবির পক্ষে ভক্ত পাঠক-লাভ অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। কমলের সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

বিপিন ছিল কমলের আশৈশব বন্ধু। এক গ্রামে উভয়ের বাস। কমলের পিতা গ্রামের জমিদার, বিপিন সেই গ্রামেরই এক গৃহস্থের পুত্র। গ্রামের স্কুলে বিপিনের শিরে সরস্বতীর কৃপা অকুণ্ঠিত ধারে বর্ষিত হইলেও, কমলের ভাগ্যে তাহার অভাব ঘটে নাই। বিপিনের জন্য অনেকখানি কৃপা বর্ষণ করিয়া অবশিষ্টটুকু কমলকে দান করিয়া সরস্বতী দেবী প্রসন্নই ছিলেন। ক্লাসে বিপিন প্রথম স্থান অধিকার করিত, কিন্তু দ্বিতীয় স্থানটিতে কমলেরই অপ্রতিহত অধিকার

ছিল। স্কুলের ছুটির পর কমল যখন আপনাদের ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইত, বিপিনের তখন সে ছাদে অব্যাহত প্রবেশ-লাভ ঘটিত। বিপিন ধরাই দিত, কমল ঘুড়ি উড়াইত। সুতায় মাঞ্জা দিবার কল্পনা কমলের মনে উদিত হইবামাত্র বোতল-চুর ও বেলের আঠা প্রভৃতি সরঞ্জাম লইয়া বিপিন যে কোথা হইতে নিমেষ-মধ্যে আবির্ভূত হইত, তাহা দেখিয়া কমলেরও তাক্ লাগিয়া যাইত। সে শুধু বিস্ময়ে সম্ভ্রমে বিপিনের পানে চাহিয়া থাকিত।

এইরূপে অর্থগত দারুণ বৈষম্যের ব্যবধান-সত্ত্বেও এই দুইটি তরুণ-হৃদয় আশৈশব এক সঙ্গে পাশাপাশি থাকিয়া এক হইয়াই বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা একই স্রোতে বহিয়া চলিয়াছিল। তাহার পর এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া দুই বন্ধুতে কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিল।

গ্রামের স্নিগ্ধ পবন-শিহরিত কুঞ্জ-তলে শ্যামার শিষের মধুর স্পর্শ যে হৃদয়ে কাব্য-প্রতিভার উন্মেষ ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই, সহরের রুদ্ধ আকাশ ও রুদ্ধ বাতাস সে প্রতিভা জাগাইয়া তুলিল। সহসা একদিন নক্ষত্র খচিত আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া আপনার গ্রামের কথা ভাবিতে ভাবিতে পাথর ঠেলিয়া কমলের প্রাণে নির্ঝরের মতই ভাব ভাষা বিচিত্র ছন্দে কবিতার আকারে ঝরিয়া পড়িল। কমল কবিতা লিখিল। গ্রামের সেই ভাঙ্গা ঘাট, জীর্ণ শিব-মন্দির, খেলার মাঠ ও নিভৃত ছাদের কোণ এক অপরূপ মহিমায় সজীব সুন্দর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল। মায়ের আদর, ভাইয়ের ভালবাসা, আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ দূরত্বের ব্যবধান ঠেলিয়া ফেলিয়া কমলের মনকে এক অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিল।

সে রাত্রে কমলের নিদ্রা হইল না। কখন্ সকাল হইবে,—বিপিন আসিবে? কবিতা লিখিয়া সুখ নাই, কাহাকেও তাহা পড়ানো চাই! সে পড়ানোও আবার যাহাকে-তাহাকে নহে। প্রাণের যে প্রিয় জন, প্রাণের সমস্ত অলি-গলির যে সন্ধান জানে! যে শুধু কবিতার ছত্র দেখিয়াই তারিফ করিবে না, যে এই ছত্রগুলির অন্তরাল দিয়া একেবারে অতি সহজে কবির মনের মধ্যে প্রবেশ করিবে, কবিতার মর্ম্ম বুঝিবে, তাহাকে,—তাহাকেই পড়ানো চাই। সে লোক, বিপিন। এই রাত্রে যদি সমস্ত সহর-বাসী ছুটিয়া আসিয়া কমলকে বলে, ওগো তরুণ কবি, আমরা আসিয়াছি, শুনাও, শুনাও, তোমার কবিতা শুনাও! তাহাতে কমলের তত আনন্দ হইবে না, যতখানি হইবে, একবার যদি বিপিন শুধু আসে! নিভৃতে তাহার পার্শ্বে বসিয়া বিপিনকে যদি এ কবিতা সে পড়িয়া শুনাইতে পারে, তবেই তাহার কবিতা লেখা সার্থক হয়! অধীর আগ্রহে একরূপ বিনিদ্রভাবেই কমলের সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

সকালেই বিপিন আসিয়া কমলের বাসায় উপস্থিত হইল। নিত্য সে প্রাত-র্ভ্রমণ সারিয়া কমলের এখানে চা খাইতে আসিত। আজও আসিল। কিন্তু চায়ের

রিত যে আনন্দ-রস পান করিল, তাহাতে সে জুড়াইয়া গেল। মুগ্ধ বিস্ময়ে বন্ধুর ললাটে জয়টীকা পরাইয়া বিপিন সে দিন যখন বিদায় লইল, তখন বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

সেই দিন হইতে বিপিন ও কমলের মিলন-সূত্রে আর-একটা নূতন গ্রন্থি পড়িল। বন্ধন দৃঢ়তর হইল। তরুণ কবি বিহ্বল নেশায় কবিতা লিখিয়া যাইতে লাগিল এবং ভক্ত পাঠক নিত্য আসিয়া কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ চিত্তে কবির কণ্ঠে আশা-প্রশংসার বিজয়-মাল্য পরাইয়া দিতে এতটুকু অবহেলা রাখিল না।

২

তাহার পর ঝড় উঠিল। মানব-জীবনে এ ঝড় নূতন নহে,—এ ঝড় নিত্য বহে। এ ঝড়ে নিকট দূর হইয়া যায়, দূর নিকটে আসে। এ ঝড় বন্ধুকে বন্ধুর পার্শ্ব হইতে ছিনাইয়া দূরে ফেলিয়া দেয়, বন্ধুর সভায় নূতন আগন্তুককে টানিয়া আনিয়া মহা সমাদরে আসন বিছাইয়া বসাইয়া দেয়।

কমল ও বিপিনের জীবনেও এ ঝড় দেখা দিল। সহসা একদিন প্রাতে উঠিয়া কমল দেখে, বিপিন নাই—অর্থের জন্য, সংসারের জন্য বিপিন কোথায় কত দূরে সরিয়া গিয়াছে। এ দূরত্বকে চিঠির শৃঙ্খলে কিছুদিন বাঁধিয়া রাখা গেলেও চিরদিন বাঁধিয়া রাখা যায় না। চিঠি কাগজের শৃঙ্খল—কতটুকুই বা তাহার বল! সভায় নিত্য নূতন নূতন লোক আসিয়া দেখা দিতেছে—কত দিন তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা যায়! তাহাদের কোলাহলে বাধ্য হইয়া তাহাদের পানে চাহিতেই হইবে। তাহাদের দাবী তাহারা ছাড়িবে কেন? যখন তাহারা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাদের ঠেলিয়া চলিয়া যাইবার সাধ্য কি!

যশ! কি তাহাতে মোহ আছে। কি সে কুহক জানে! মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে চড়িয়া স্রোতের ফুলের মতই ভাসিয়া যখন কমলের কবিতাগুলি বঙ্গবাসী নরনারীর অন্তর-তটে ছুঁইয়া যাইতে লাগিল, তখন তাহার পক্ষে চিঠির দুর্গে বসিয়া দূর-গত বন্ধুর পানেই চাহিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া উঠিল। এখন কমল আর বিপিনের কবি নহে, এখন সে সকলের কবি, বাঙ্গালীর কবি! বিপিন শুধু আর তাহার একটিমাত্র পাঠক নহে, এখন তাহার পাঠক-সংখ্যা বহু। একের কাছে পূর্ব্বে সে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ধরিত, তাহাতে সুখ ছিল। এখন একের স্থানে অনেক আসিয়া জুটিয়াছে। অনেকেও সুখ আছে, তাহার উপর অনেকে আর-একটা অতিরিক্ত-কিছু আছে। সে অতিরিক্ত-কিছু, নেশা! নেশার শক্তি অসাধারণ—সে শক্তি এড়ানো তরুণ কবির সামর্থ্যের বাহিরে।

বেচারা বিপিন কোন্ সুদূর গৃহ-কোণে পড়িয়া আছে। যাহারা কলরব-কোলাহলের মধ্যে থাকে, তাহাদের একটা সুখ আছে। স্মৃতি তাহাদের জ্বালাইতে যায় না। স্মৃতি দুরন্ত হইলেও নারী। নারীর মতই তাহার সহজ কুণ্ঠা আছে। তাই সে ভিড়ে যাইতে ভয় পায়। কিন্তু যাহারা বিরহ-ম্লান নীরব গৃহ-কোণে পড়িয়া থাকে, স্মৃতি তাহাদিগকে বড় জ্বালায়! বিপিনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল।

একা সে এক কোণে নিরালায় পড়িয়া

থাকিত, স্মৃতি তাহাকে ছাড়িত না। নিভৃত বিজন ঘরের কোণ! বাহিরের কলরব সেখানে গিয়া পৌঁছায় না। নীরব অবসরে সে তাহার স্মৃতির দেওয়া পুঁথিখানা খুলিয়া বসে। পুঁথি জীর্ণ হইয়াছে, তবু তাহার কয়েকটা পৃষ্ঠা এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে! সেই পাতাগুলার পানে মৌন-মূক বিপিন চাহিয়া থাকে। চোখ তাহার জলে ভরিয়া যায়! ঝাপসা চোখে পুঁথির পাতাও মিলাইয়া আসে। নূতন ছবি অজ্ঞাতে তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। সে ছবি কমলের। পত্র-পুষ্পে খচিত আলোর লহরে ভূষিত বিরাট সভা-মণ্ডপ। সে মণ্ডপের এক পার্শ্বে উচ্চ বেদিকা। বেদিকায় বসিয়া কমল গান ধরিয়াছে। শিরে তাহার মণিময় মুকুট, ভালে ললাটিকা, ওষ্ঠে সস্মিত হাসি, মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ! আর তাহারই চারিধার ঘেরিয়া সারা বাঙ্গালার লোক বসিয়া আবেশ-বিহ্বল ভাবে সে গীতি-সুধা পান করিয়া ধন্য হইতেছে! সে সভায় সকলে আছে; সকলের উপর দিয়াই কবির প্রসন্ন স্মিত হাস্য অজস্র ধারে বহিয়া চলিয়াছে! শুধু নাই সেথা বিপিন! কৈ, কবির চক্ষু বিপিনকে একবারও খুঁজিতেছে না ত! না, আজ আর বিপিনকে তাহার প্রয়োজন নাই! সুর সাধিতে হয় নির্জ্জনে—সে সময় একজন,—একজনের শুধু পার্শ্বে থাকা প্রয়োজন! যদি ভুল হয়, সে শুধরাইয়া দিবে! যদি ঠিক হয়, সে তারিফ করিবে! আজ সুর সাধা হইয়া গিয়াছে,—আজ আর তাহাকে কি প্রয়োজন! উপরে উঠিবার সময় সিঁড়ির প্রয়োজন—কিন্তু উপরে উঠিয়া সিঁড়ির পানে চাহিয়া থাকা মূঢ়তা। সিঁড়ির কাজ তখন ফুরাইয়াছে। নামিবারও যখন প্রয়োজন নাই, তখন সে সিঁড়ি রহিল কি গেল, তাহা দেখিয়া কাজ কি!

৩

কমলের খ্যাতি কাব্যের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া ক্রমে নাটকের ক্ষেত্রে দেখা দিল! দুই মাস ধরিয়া বাঙ্গালার সংবাদ-পত্রে মাসিক পত্রে দুন্দুভি বাজিতেছিল, কবিবর কমলকুমার নাটক লিখিয়াছেন! বাঙ্গালার প্রধান নাট্যশালা হীরক রঙ্গমঞ্চে সে নাটকের অভিনয় হইবে—মহাসমারোহে নূতন নাটকের মহলা চলিতেছে।

সুদূর প্রবাসে বসিয়া বিপিন সে দুন্দুভি-নাদ কর্ণে শুনিল। তাহার মাথার মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। এ সেই কমল, তাহার কমল! সে আজ বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক! আর সে?

বিপিনের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। সে বাক্স খুলিয়া কমলের চিঠিপত্রগুলা বাহির করিল। এই তাহার হস্তাক্ষর, এই তাহার হৃদয়! চিঠির পর চিঠি খুলিয়া বিপিন পড়িতে লাগিল। কৃপণের ধনের মতই চিঠিগুলিকে সে বুকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই সেই প্রথম চিঠি! আট পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া চিঠি! ভাদ্রের কূলে কূলে ভরা নদীর মতই কমলের সমস্ত হৃদয়টুকু এই আট পৃষ্ঠায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে! তাহার পর—? চিঠির পাতার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও জুড়াইয়া গিয়াছে! শেষে—আজ তিন বৎসর চিঠির আর দেখা নাই। শেষ চিঠিখানি তিন বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা! শুধু দুইটি ছত্র —"মাসিক-পত্রের তাড়ায় চিঠি দিতে অবসর

পাই না। ক্ষমা করো। কেমন আছ?" শুধু এই কয়টি কথা! 'অবসর পাই না!'—একখানা চিঠি দিবারও অবসর হয় না—এত কাজ! বিপিনের সমস্ত বুকখানাকে নাড়া দিয়া একটা প্রবল নিশ্বাস ঝড়ের মতই বেগে ছুটিয়া বাহির হইল। এ চিঠি নয়, বিদ্যুৎ-শিখা! এ শিখা বিপিনের প্রাণখানাকে দলিয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে।

৪

বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিয়া এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বিপিন কলিকাতায় আসিল। সেদিন শনিবার। হাবড়ার পুল পার হইতেই রাস্তায় একটা বাড়ীর দেওয়ালের উপর বিপিনের নজর পড়িল। নানারঙের চিত্র-বিচিত্র-করা বড় অক্ষরে ও কি লেখা! কবিবর কমলকুমার রায়ের নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক, "মণি-হার"। উত্তেজনায় বিপিনের মাথার শিরা দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল, বুকের মধ্যে রক্ত নাচিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর নাট্যশালার সম্মুখে গিয়া সে দেখে, কি ভিড়! সারা সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! সকলের মুখেই মণি-হারের কথা, কমলের কথা! দলে দলে লোক টিকিট কিনিয়া নাট্যশালায় প্রবেশ করিতেছিল। বিপিন উদ্‌গ্রীব চিত্তে কাহার আশায় চারিধারে একবার চাহিয়া দেখিল! আলোর চমক্ দিয়া ট্রামগাড়ী থামিয়া আরোহী নামাইয়া আবার ছুটিয়া চলিয়াছে, মোটর, জুড়ি সশব্দে আসিয়া নাট্যশালার সম্মুখে দাঁড়াইতেছে, বিপিন চারিদিকে চাহিয়া নিতান্ত অপরাধীর মতই সঙ্কুচিতভাবে আপনার মনিব্যাগ খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিল। টাকাটি বাহির করিয়া আবার চারিধারে সে চাহিয়া দেখিল। যেন সে কত-বড় অপরাধী!—যেন সে চুরি করিতে যাইতেছে! এমনই বিবর্ণ তাহার মুখ, এমনই দীপ্তিহীন তাহার দুই চোখ! তাহার মনে হইল, ভিড়ের মধ্য হইতে যত লোক ব্যঙ্গ কৌতুক-দৃষ্টিতে তাহারই পানে যেন চাহিয়া রহিয়াছে। বিপিনের পা কাঁপিতেছিল, গা টলিতেছিল। মাতালের মত টলিতে টলিতে যাইয়া টিকিট-ঘরে কোনমতে টাকাটা ফেলিয়া দিয়া সে একখানি টিকিট কিনিল, কিনিয়াই দ্রুত পদে নাট্যশালার মধ্যে প্রবেশ করিল।

নাট্যশালা তখন লোকের ভিড়ে গম্-গম্ করিতেছে। অধীর দর্শকের কলরব-কোলাহল বিপুল জল-কল্লোলের মতই শুনাইতেছিল। কেহ সিগারেট টানিতেছে, কেহ পান খাইতেছে। সম্মুখস্থ পটের পিছনে এখনই যে বিরাট সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিবে, নিঃশেষে তাহা উপভোগ করিবার জন্য সকলেই যেন প্রস্তুত হইয়া লইতেছে।

ঐক্যতান বাজিল! এইবার! বিপিনের অঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ হইতেছিল। একবার সে উপরের পানে চাহিল। ঐ যে রাজাসনে বসিয়া - কমল! পার্শ্বে তাহার অসংখ্য ভক্ত! কমলের মুখে কুণ্ঠিত স্মিত হাস্যরেখা! দর্শকদের পানে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতেই যেন সে চাহিয়া দেখিতেছিল। কমল কি তাহাকে দেখিবে না? বিপিন কোথা হইতে আসিয়াছে! কেন সে আসিয়াছে? কিসের আকর্ষণে? সে কি তাহা বুঝিবে না? যদি না বুঝে? বিপিনের মনে হইল, একবার সে চীৎকার করিয়া বলে,— হে

বন্ধু, তোমার এ শুভ আনন্দের মুহূর্ত্তে তোমারই সহিত আনন্দের কণা উপভোগ করিতে আসিয়াছি। এই অযুত দর্শকবৃন্দের মুগ্ধ স্তুতি-কণ্ঠের সহিত আমিও আপনার কণ্ঠ মিলাইতে আসিয়াছি! কিন্তু হায়, সে কথা কেমন করিয়া সে বলে! সে কথা কে মানিবে? রাজাসনে কবির পার্শ্বে ত আজ তাহার ঠাঁই নাই! সে যে আজ এই সাধারণ দর্শকের মত নিতান্তই একজন এক টাকার দর্শক মাত্র।

পট উঠিল। একটা আনন্দ-সম্ভাবনায় দর্শকের দল স্তব্ধ হইল। অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রতি অঙ্কের প্রতি দৃশ্যের মধ্য দিয়া দর্শকের মন তন্ময়ভাবে চলিয়া কোন্ অদৃশ্য স্বপ্নলোকে বিলীন হইয়া গেল।

যখন অভিনয় থামিল, মুগ্ধ দর্শকদল সহসা তখন চেতনা-লাভে ক্ষুব্ধ হইল। ইহারই মধ্যে শেষ হইল! এ গান এখনই থামিল! এ যেন কোন্ নিপুণ ঐন্দ্রজালিক আপনার মায়া যষ্টির বলে ম্লান ধরণী-তলে স্বর্গের এক উজ্জ্বল অংশ ছিঁড়িয়া আনিয়াছিল! দর্শকের দল মুগ্ধ কৃতজ্ঞ চিত্তে নাট্যকারের জয়-গানে নাট্যশালা মুখরিত করিয়া তুলিল।

বিপিন আবার উপরের পানে চাহিল। কমল চলিয়া যাইতেছে—সার্থকতার বিরাট আনন্দে মুখ তাহার ভরিয়া গিয়াছে! বিপিন দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে বাহিরে আসিল।

নাট্যশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একখানা মোটর গাড়ী বিজয়-গর্ব্বে যেন ফুঁসিতেছিল! কমল আসিয়া গাড়ীতে বসিল, সঙ্গে আরও পোষাক-পরা কয়েকজন দর্শক আসিয়া কমলের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিল। প্রশংসার ঘটা পড়িয়া গেল। বিপিন দূরে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতে লাগিল। তাহার মনে একটা দারুণ জ্বালা গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল! চোর! চোর ইহারা! কমলকে তাহার কাছ হইতে ইহারাই চুরি করিয়া রাখিয়াছে! প্রশংসা ইহাদের ওষ্ঠাগ্রেই শুধু লাগিয়া আছে! হৃদয়ের গোপন তল অবধি তাহার শিকড়টা পৌঁছিয়াছে কি না, সন্দেহ! ইহাদেরই কথাতে, ইহাদেরই অলস চাটুবাণীতে কমল এতখানি ভুলিয়া রহিয়াছে। বিপিনের মনে হইল, দুরন্ত রোষে ইহাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকলকে সে তাড়াইয়া দেয়—কমলকে আপনার দুই বাহুর নিবিড় বন্ধনে চাপিয়া ধরিয়া সে বলে, বন্ধু, কাহাদের কথায় তুমি ভুলিয়া রহিয়াছ? ইহারা তোমার হৃদয়ের কি খপর রাখে! শুধু বাহিরের একটুখানি দেখিয়াছে বৈ নয়! তুমি এস আমার কাছে, তুমি এস আমার বাহুর নিবিড় বাঁধনে —তুমি এস আমার হৃদয়ের মধ্যে! যে হৃদয়ে শুধু তোমারই আসন, তোমারই ঠাঁই! ইহাদের কাজ আছে, কলরব আছে, আরও অনেক আছে, কিন্তু আমার শুধু তুমি আছ, শুধুই তুমি! কবি তুমি, মানুষ তুমি, কমল তুমি,—

কিন্তু কিছুই বলা হইল না! মোটর গাড়ী কমলকে বুকে লইয়া চলিয়া গেল। বিপিনের যখন চেতনা হইল, তখন সে দেখিল, দর্শকের দলে গাড়ী ভাড়া করিবার বিষম গণ্ডগোল চলিয়াছে—এবং কাঠের পুতুলের মতই

একটা থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে! তাহার চোখের সম্মুখে রাস্তার আলোগুলা কুয়াশা-ম্লান তারার মতই মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে এবং দর্শকের কোলাহল স্বপ্ন-শ্রুত অস্পষ্ট ধ্বনির মতই কানে আসিয়া লাগিতেছে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শান্তিবাদীদিগের সহিত সাক্ষাৎকার

(ফরাসী হইতে)

রুস্ জাপানীদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে, আল্‌বানীরা উত্থান করিয়াছে, হেরেরোরা জর্ম্মনদিগকে হত্যা করিতেছে, এবং তুর্ক-বুলগারীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে ...সাগর-গর্ভচর নূতন এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে, বাষ্পজাহাজ হইতে অনবরত বাষ্পধূম উত্থিত হইতেছে, সৈন্যদলের চলাফেরা আরম্ভ হইয়াছে, সমর-সরঞ্জাম চালান করা হইতেছে, দুর্গে খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত করা হইতেছে,—ইহা ভিন্ন আজকাল আর কোন কথা শুনা যায় না...যাঁহারা জাগতিক শান্তি ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের স্বপ্ন দেখিতেছেন এই সময় তাঁহাদের সহিত একবার সাক্ষাৎ করা কি উত্তম-কল্প নহে? এই সপ্তাহের প্রারম্ভে, শান্তিবাদীদিগের অভূতপূর্ব্ব সাফল্য ঘোষণা করিবার জন্য প্যারিস নগরে একটা আনন্দভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে প্রধান প্রধান সমস্ত শান্তিবাদীই উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তাহার পরদিনই,—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সমধিক বিখ্যাত ও উৎসাহী, তাঁহাদের সহিত আমি —যথা, মঃ-ফ্রেডেরিক পাসি, মঃ-দেতুর্নেল দে কঁস্তাঁ, মিঃ-টমাস্ বার্ক্লে; তাঁহারা সকলেই, সু-পরিবেষিত ভোজ-টেবিলের চারিধারে বসিয়া, পূর্ব্ব দিনে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারই অতিমাত্র শ্রমে এখনও যেন কম্পিত-কলেবর।

***

বিশ্বজনীন শান্তি স্থাপনের পূর্ব্বেই মঃ-ফ্রেডেরিক-পাসি তাঁহার নিজগৃহে শান্তি স্থাপনে সফল-কাম হইয়াছেন। বন-প্রান্তে, Neuilly-গ্রামে যে গ্রাম্য ধরণের একটি কুটীরে তিনি বাস করেন, নগরের কোলাহল সে পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। এবং প্রাচ্যখণ্ডের কামানের আওয়াজ তাঁহার উদ্যানের বহুদূরেই মরিয়া যায়।

তাঁহার নিকটে যাওয়া বড় সহজ নহে। দুর্গপতি সৈনিক যেরূপ জেদের সহিত স্বীয় দুর্গ রক্ষা করে, তিনি সেইরূপ জেদের সহিত তাঁহার গৃহের প্রবেশ দ্বার রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি যখন তাঁহার কামরায় গিয়া পৌঁছিলাম, কি-ভাবে তিনি যে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া-

আমার সম্বন্ধে কেমন উদার ভ্রাতৃভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বলিবার কথা নহে! তাঁহার মস্তকের চূড়াদেশ কেশশূন্য—পার্শ্বদেশ হইতে শুভ্র কেশরাশি গ্রীবা পর্য্যন্ত বিলম্বিত, ঝোঁপের মত দাড়ি বক্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে, বক্র-রেখ নাসিকা, চস্‌মার পশ্চাতে সংকীর্ণ নেত্রযুগল, দীর্ঘ শীর্ণকায় পুরুষ; তিনি আসন হইতে উত্থান করিলেন, এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ায় কোর্ত্তাটা পিঠের উপরে একটু উঠিয়া পড়িল; বাহু নাড়িয়া তিনি বলিয়া উঠিলেনঃ—

—"কি চাও? কি চাও? আমি কাগজ-ওয়ালাদের সঙ্গে কখন দেখা করিনে। আঃ! এই কাগজওয়ালারা!"

যিনি ফ্রান্‌সে সর্ব্বপ্রথমে নোবেল পুরস্কারের জয়মাল্য পাইয়াছিলেন, সেই উদারচিত্ত বৃদ্ধের প্রতি ভক্তিরসার্দ্রচিত্তেই আমি উপনীত হইয়াছিলাম। তাঁহার উপরোক্ত উক্তি শুনিয়া আমি খুব একটা আঘাত পাইলাম; সেইখানে একটা অস্থাবর সিঁড়ি ছিল, আমার এই আঘাত সামলাইবার জন্য সেই সিঁড়িটার উপর ভর দিয়া রহিলাম। তাহার পর অতি সাবধানে ও ভয়ে-ভয়ে আমার আগমনের কারণটা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম, এবং আমি যে এই শান্তিময় নিভৃত স্থানে বাহিরের দূষিত হাওয়া আনিয়াছি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

তিনি তখন পুনর্ব্বার উপবেশন করিয়া বলিলেনঃ—"যুদ্ধ, শান্তি!—তা বৈ আর কি! বর্ত্তমান যুদ্ধ শান্তির পক্ষে যেরূপ প্রয়োজনীয় এমন আর কিছুই না; কেননা, শান্তি কত প্রয়োজনীয় তাহা যুদ্ধই দেখাইয়া দেয়।

"১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে আমরা এরূপ বিরাট সফলতা লাভ করিব; আমাদের এখন একটা সালিশের আদালৎ হইয়াছে, সালিশের কমিটি আছে, সালিশের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে···এ এক অত্যাশ্চার্য্য ব্যাপার!"

এ সমস্ত বুদ্ধিবিহ্বলকারী চমৎকার বিভ্রম মাত্র;—আদালৎ আছে বটে কিন্তু সেখানে কেহ যায় না, কমিটি আছে বটে কিন্তু সেখানে কেবল ভোজেরই অনুষ্ঠান হয়, এবং সন্ধির নিয়ম আছে বটে কিন্তু তাহা কোন কাজে আসে না! আমি কথা কহিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু আমার প্রতি সুস্পষ্ট বিদ্বেষ প্রদর্শনপূর্ব্বক উপস্থিত একজন চিত্রকরের দিকে মুখ ফিরাইয়া, এবং সহসা সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চিত্রকরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমার ছবি আঁকিতে চান? কি রকম-ভাবে বসিতে হইবে? এই রকম ভাবে? না—এই-রকম ভাবে?" পরিশেষে তাঁহার আরাম-কেদারায় ভাল করিয়া বসিয়া লইলেন, পা ছড়াইয়া দিলেন, মাথাটা পিছনে হেলাইয়া রাখিলেন—এমন-ভাবে বসিলেন যাহাতে তাঁহার লেশমাত্র সৌন্দর্য্য নষ্ট না হয়। তাঁহার খাস-মুন্‌সী এক যুবতী রমণী এতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া ছিলেন সেই যুবতীকে তাঁহার নিকট সংবাদপত্রাদি হইতে পাঠ করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন। যুবতী পূর্ব্বদিনের ভোজে যুরোপীয় প্রথামত সুরাপানসহকৃত ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ করিয়া যে সকল স্তুতিবাদ হইয়াছিল সেই সকল বক্তৃতাদির বিবরণ পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন।

এই সকল বড় বড় কথা আমাদের কানে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল, যথাঃ—দয়া, ভ্রাতৃভাব, শান্তি, অস্ত্রবিসর্জ্জন, নবযুগ, সার্ব্বজনিক কল্যাণ। মধ্যে মধ্যে ভিন্ন সুরের কথাও আমাদের কানে আসিতেছিল যথাঃ—"শান্তিতে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা অতি নির্ব্বোধ, তাহারা কোন কর্ম্মেরই নয়... ; জাপানিদের ন্যায় রুসেরাও চোর..." M. Frederic Passy এই সব কথায় সায় দিয়া কখন কখন মাথা নোয়াইতেছিলেন এবং তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুল ঘুরাইতেছিলেন। আমি বাধ্য হইয়া যে কোণটি আশ্রয় করিয়াছিলাম, সেইখান হইতে একটু নড়িবামাত্র তাঁহার রোষকষায়িত কটাক্ষ আমার উপর নিপতিত হইল। একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, বিশ্বজনীন শান্তির একজন প্রচারক—তিনি এখন ছবি তুলাইবার জন্য বিশেষ ভঙ্গীতে বসিয়াছেন, এখন তাঁহাকে কোন প্রকারে বিচলিত করিতে নাই! এখন তিনি একজন চিত্রকর, একজন সংবাদপত্র-লেখক ও একজন যুবতীমহিলার সম্মুখে, চিত্রপটে অমরত্ব লাভের জন্য স্থিরভাবে উপবিষ্ট।

"লোকে বলে আমরা কতকগুলা পাগল কিন্তু সে কথা সত্য নহে।"

পকেটে হাত রাখিয়া, একটু মাথা হেলাইয়া M. d'Estournelles de constant উক্ত কথাটি বলিলেন। তাঁহার ললাট উদ্বেগ-রেখাঙ্কিত ; সে উদ্বেগ শুধু একটি দেশের জন্য নহে, শুধু নিজের দেশের জন্য নহে, পরন্তু সকল দেশের জন্য। সমস্ত অন্তর্জাতিক ফলাফলের বিরাট ভার নিজ স্কন্ধে বহন করিতেছেন থাকেন। তাঁহার ওষ্ঠের উপর একটি ক্ষীণ স্মিতহাস্য ভাসমান, ওষ্ঠের নীচে গোঁফ ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং চোখে একটুও উৎসাহের আগুন নাই। নব ধর্ম্মের নবীন প্রচারকদের মধ্যে যে জ্বলন্ত উৎসাহ দেখা যায়, ইনি যেন সেই উৎসাহ হারাইয়াছেন। সেই একই অলস কণ্ঠস্বরে, পূর্ব্ব কথার সূত্র ধরিয়া যদৃচ্ছাক্রমে, স্বগত উক্তির ন্যায় আবার তিনি আরম্ভ করিলেন :—

"একটা প্রধান কথা এই—মনোমধ্যে এ সম্বন্ধে কোন প্রকার বিভ্রম পোষণ না করা......Hagne নগরের অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল,—যাহাকিছুর সহিত কোন দেশের মানসম্ভ্রম বা জীবনযাত্রার সংস্রব আছে তাহা আলোচনার বাহিরে রাখিতে হইবে ...... আমরা এমন মনে করি না যে, যুদ্ধ একেবারেই উঠিয়া যাইবে...যদি কাল ফ্রান্সকে শত্রুরা আক্রমণ করে, আমি সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিব...Monetকর্ত্তৃক চিত্রিত ছবিগুলিকে প্রথম প্রথম লোকে বীভৎস-ভীষণ বলিয়া মনে করিত, কিন্তু এখন ঐগুলি মহার্ঘ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। তাই বল্‌চি! শান্তিও ঠিক এই রকম। যতদূর সম্ভব শান্তিমূলক উপায়ে আমরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনৈক্যের মীমাংসাচেষ্টা করি বলিয়া লোকে আমাদিগকে এখন উপহাস করে...আর কয়েক বৎসর পরে, উপহাস করিবে না। কিন্তু আমরা যেন কোন প্রকার বিভ্রম পোষণ না করি!

তিনি হস্ত উত্তোলন করিলেন, মাথা নাড়িলেন, গোঁফ ধরিয়া টানিলেন।—

উপর কি-প্রভাব প্রকটিত করিতে পারিয়াছি?"

* *
*

এইমাত্র আমি যে-শান্তিবাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম, তিনি শান্তিবাদীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম শান্তিপ্রবণ! আর তিনি আপনার ছবি তুলাইতেই ব্যস্ত। তাহার পর যে শান্তিবাদীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার শান্তির বিভ্রম-মোহটা ছুটিয়া গিয়াছে। এখন কেবল একজনের দর্শন বাকী রহিল—তিনি ইংরেজ,—Mr. Thomas Barclay, তিনি প্যারিসের ইংরাজি-চেম্বার-অফ্-কমার্সের সভাপতি এবং "হৃদ্যতা-মূলক সন্ধি" স্থাপনের প্রকৃত উদ্যোগী। Bedford-হোটেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেখানে চা-পানের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লোকটি বেঁটেখেটে, চট্‌পটে, চঞ্চল-প্রকৃতি, গ্যাঁটাগোঁটা, দাড়ী-ওয়ালা, একটু খঞ্জ। একটা টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্ট। তাঁহার সঙ্গে একজন মহিলাও সেইখানে বসিয়া আছেন। Barclay তাঁহার মন হইতে কোন আশা অন্তর্হিত হইতে দেন নাই, এবং ভবিষ্যতের উপর তাঁহার বিশ্বাসও অক্ষুণ্ণ ছিল। লোকটি খুব ব্যস্ত ও কাজের লোক। তিনি অকেজো গোড়া-পত্তনের কথা লইয়া সময়ের অপব্যয় করেন না! তিনি চায়ের পেয়ালায় চা ঢালিলেন, একটি মাখন-মাখা তোষ-রুটি গ্রহণ করিলেন এবং দোলনা-চৌকিতে বসিয়া আনন্দে দুলিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন;—বিভিন্ন আকারের শাসন-তন্ত্রের বাহিরে, গণতন্ত্রপ্রধান দেশ-সমূহের শিল্পী, বণিক ও শ্রমজীবিদিগকে লইয়া এমন একটি শক্তিশালী দল গড়িয়া তুলিতে চাই যাহারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন খাড়া করিয়া তুলিতে পারিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশ রক্ষার্থ ধর্ম্মযুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, সকল দেশেরই অধিকাংশ লোক সর্ব্বপ্রকার শান্তিময় উপায় অবলম্বন করিবার জন্য কৃতসংকল্প যুদ্ধবিগ্রহ গণতন্ত্রের অনুকূলে কখনই কিছু নিষ্পত্তি করে নাই। যুদ্ধ কেবল সরকারী ঋণ বাড়াইয়াছে মাত্র, অর্থাৎ প্রত্যেকের দেয় রাজকর বাড়াইয়াছে। আমিই গণতন্ত্র-মণ্ডলীকে এই মৎলবটা দিয়াছি যে, তাহাদিগের হাতেই তাহাদিগের অন্তর্জাতীয় ফলাফল নির্ভর করিতেছে। পররাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রনীতিপরিচালন এখন আর বিকৃতস্নায়ু, নারীপ্রকৃতি, শুধু পাঁচ ঘটিকার চা-প্রভৃতির নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে পটু সেই সব উচ্চ শ্রেণীর লোকের কাজ নহে।

মধ্যে মধ্যে তাঁহার সেই সঙ্গিনী মহিলাটি একটু মাথা নাড়িয়া, অথবা একটা ইংরাজি শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার কথায় সায় দিতেছিলেন। তাঁহার কথা আর ফুরায় না—অবিরাম গতিতে চলিয়াছে।—"আমি ব্যবসায়ী লোকদিগকে বিশ্বাস করি:—ইহারা বেশী খাঁটি—কাজকর্ম্মের ভিতর দিয়া তাহাদের চরিত্র পরিশোধিত হয়—তা ছাড়া উহারা বেশ কাজের লোক। এই জন্যই আমি ব্যবসায়ী লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছি। যেমন আমার মতে, তেমনি তাহাদের মতেও যুদ্ধ-জিনিষটা

কাজের লোকের মত' কাজ নহে। যেমন ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে তেমনি আমেরিকাতেও, আমার এই প্রচারকার্য্যে তাহাদের ঔৎসুক্য জন্মিয়া দিয়াছি, এবং সেই সঙ্গে Exchange ও Chamber of Commerceকেও কতকটা আমার মতে আনিয়াছি। অতএব মনে করিয়া দেখ, আমি তিন বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটা ঘনিষ্টতা আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি—আরও সমর্থ হইয়াছি......

হঠাৎ এইখানে থামিলেন—তাঁহার ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হইল, তাহার ললাটে একটা রেখা অঙ্কিত হইল। তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

—এই ইংগ্ল-ফ্রাঙ্ক সন্ধিটা আমার দ্বারাই হইয়াছে, অথচ যাহারা ইহার কিছুই করে নাই তাহারাই ইহার গৌরবের দাবী করিতেছে; তাহারাই ইহার জন্য সম্মান লাভ করিতেছে। মহিলাটি খুব আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিলেন:—

ঠিক্ ঠিক্! এই Estournellesকে ওরা মুদ্রা পুরস্কার দিতে চেয়েছিল। আপনাকে ফরাসী নাইটের উপাধি দিল না, আর এখন,—যে ব্যক্তি আপনার পরে এসেছে সেই এতুর্নেল্‌কে কিনা ওরা জয়মাল্যে ভূষিত কর্‌লে।

টমাস বার্ক্লে তাঁর দোলনা চৌকিতে আরও সজোরে দুলিতে লাগিলেন এবং ভঙ্গিসহকারে কাঁধ ঝাঁকাইলেন—(এই ভঙ্গির অর্থ—"এর উপায় কি?") তিনি বলিলেন:—

"—সোমবারের ভোজে, M. d' Estournelles-ই সমস্ত সম্মান পেলেন—"টোষ্টের" সময় আমার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত হল না। এ যেন প্যারিসে আমাদের রাজার ভ্রমণের মত':—আমিই সমস্ত প্রস্তুত করিলাম, আর যে কিছুই করে নাই সেই Avebury কি না সম্মান লাভ করিল। কিন্তু আমি এ সমস্তের বহু ঊর্দ্ধে; আমি গণমণ্ডলীর জন্য কাজ করিতেছি।" মহিলা বলিলেন:—ঠিক্ কথা, ঠিক্ কথা; কিন্তু ওরা...কি বলেন আপনি?...দুর্ব্বল মানুষ বই ত নয়; মানুষের স্বভাব কোথায় যাবে...... ওরা অবশ্য অনায়াসেই M. Barclayকে ফরাসী নাইট উপাধিতে ভূষিত করিতে পারিত।"

আমি মনে মনে করিলাম; বিশ্বজনীন শান্তিরূপ এই বিরাট ব্যাপারটা কাজে পরিণত করিবার পূর্ব্বে, Thomas Barclay ও M. d', estournelles এঁদের দুজনের মধ্যে কিরূপে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে তাহা ভাবা উচিত ছিল না কি?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লাইকা

(কাহিনী)

সেদিন অধিক রাত্রিতে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যে আশায় আসিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল না,—দেখিলেন দীপছায়ার নিকট নতনয়না তন্বী প্রতিদিনের ন্যায়ই অপেক্ষা করিতেছে! রাজা আসিয়া নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিলেন। সম্মুখে রাণী বসিয়াছিলেন,—অনেকক্ষণ মৌনের পর তিনি প্রশ্ন করিলেন—শুনিলাম জামাতা আসিয়াছিলেন—কথাটা কি সত্য?

রাজার মুখে বিরক্তিচিহ্ন দেখা দিল—তিনি ইঙ্গিতে জানাইলেন, "হাঁ"—

রাণী বলিলেন, "তবে গেলেন কেন?"—

"তাহার ইচ্ছা!"

বিস্মিতভাবে রাণী বলিলেন—"তাহার ইচ্ছা?—তুমি বারণ কর নাই?"—

"না"—; রাজার স্বরভঙ্গিতে রাণী আর প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না! আবার গৃহ নীরব হইয়া উঠিল, রাজা আচমন করিলেন,—স্বর্ণভৃঙ্গারে সুগন্ধি জলধারা কন্যা পিতার হাতে ঢালিয়া দিল। রাজা একবার অলক্ষ্যে কন্যার প্রতি চাহিলেন, তাহার মুখশ্রী পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত! সে অচঞ্চলচরণে গিয়া পিতাকে তাম্বুলপূর্ণ বিচিত্র পাত্র অগ্রসর করিয়া দিল,—তাহার পর মাতাকে প্রশ্ন করিল তিনি এক্ষণে আহার করিবেন কিনা? তিনি অনিচ্ছা জানাইলেন এবং তাহাকে আহার করিবার জন্য অনুমতি দিলেন,—সে পিতার আহার্য্য

তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রাজা বলিলেন, "রাণী কবে তোমার বুদ্ধি হইবে?—তুমি ওই প্রশ্ন কেন করিয়াছিলে?"—

একটু অপ্রস্তুতভাবে রাণী বলিলেন—"তাহা কি বারি জানে না মনে কর?"—

রাজা আর কিছু বলিলেন না; সে রাত্রি তাঁহার নিদ্রা ছিল না—পুষ্পকোমল সুখসেব্য শয়নে রাজরাজ সেদিন কণ্টকযন্ত্রণা ভোগ করিলেন—রাজমহিষী গোপনে কাঁদিয়া আকুল হইলেন!

দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, রাজভবন পূর্ব্ববৎ ঐশ্বর্য্যউদ্বেল,—জয়ধ্বনিমুখর! প্রভাতে সন্ধ্যায় তেমনি সানাইএ মধুর রাগিণী গাহে—তেমনি মধুর ভৈরবী, তেমনি কোমল পূরবী? কিন্তু হায়! ভৈরবীতে সে অরুণোজ্জ্বল প্রভাতালোকপুলকিত নব-জাগরণোল্লাস কই?—গঙ্গাবক্ষে প্রতিবীচি-বিক্ষেপে যাহা নাচিয়া ছুটিত—প্রতি লতান্দোলনে যাহা পুষ্প গন্ধ বিতরণ করিত সে জাগ্রৎ রাগিণী ত আর বাজে না!—এ কোন্ শোকগাথা, এ কোন্ রোদন-রাগিণী—যাহা প্রতি মূর্চ্ছনায় ভাঙ্গিয়া ডুব দিয়া—জাহ্নবীতটে প্রহত হইতেছে?—হায়, পুরবী যে এত তন্দ্রাময়, এত অলস, এমনভাবে সকল কার্য্যে উদ্যমহীনতা আনিয়া দেয় তাহাও কেহ জানিত না?—

বৎসর অতীত হইল। পরমাদরপালিতা

অঙ্গে শিশু শালতরুর পেলবসৌন্দর্য্য—কপোলে সদ্যস্ফুট পলাশের আরক্ত জ্যোতি,—কিন্তু—হায়! নয়ন দুটি বসন্তকানন প্রবাহিনী শীর্ণ-তটিনীর ন্যায় ম্লানকান্তিহীন। হায়!

বারি প্রত্যহ প্রভাতে জলে নামিয়া পদ্ম-চয়ন করিত, জাতির স্থূলহার গাঁথিয়া দিত, বিল্বদলে চন্দনচিত্র করিয়া শিবপূজার জন্য সাজাইয়া রাখিত,—কিন্তু নিজে আর মহা-দেবের পূজা করিত না! পুরোহিত পূজা করিতেন সে নিবিষ্টমনে বসিয়া দেখিত, পূজান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইত!—কিন্তু স্বয়ং আর পূজা করিত না!

তাহার জ্ঞাতিভগিনী ও বাল্যসহচরী শারি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল—একদিন প্রশ্ন করিল, বারি তুই আর পূজা করিস না কেন?—

বারি মৃদু হাসিল—কোন উত্তর দিল না। তখন শারি কাছে আসিয়া আবার বলিল "বলিবি না বহিন্?" সে আদরে বারি নত-মুখী হইল,—বলিল—,বলিব আর কি দিদি, ভোলানাথ কি আমার পূজা গ্রহণ করিবেন যে আমি পূজা করিব!"

"তোর পূজা গ্রহণ করিবেন না?—বারি তুই কি বলিতেছিস্?"

ঠিক বলিতেছি বহিন্! ভাবিয়া দেখ।" বারি অন্যমনা হইল,—শারি তাহার স্থির মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল,—বলিল, "কি ভাবিব বারি? ইহার মধ্যে ভাবিবার কি কথা আছে?—তোর পূজা মহাদেব লইবেন না;—ইহাও কি ভাবিবার কথা?—

বারির শুষ্ক মুখে বিদ্যুতের ন্যায় চকিত

"যে নারী স্বামী পূজা করে নাই—দেব-পূজায় তাহার কি অধিকার ভগিনি!"

শারি চমকিত হইল, ব্যস্তস্বরে বলিল—ও কি কথা—ও কি কথা বারি!—তুই স্বামীপূজা করিস্ নাই কি? স্বামীই তো তোর পূজা লইলেন না—সে নিষ্ঠুর——"

সর্পদংশিতের ন্যায় আহতভাবে বারি পশ্চাৎপদ হইল,—স্থির স্বরে বলিয়া উঠিল—"চুপ! তুমি জান না দিদি!—তিনি দেবতা—তিনি আমার পূজা লইতে আসিয়াছিলেন—আমি—আমি—"

বলিতে বলিতে বারি থামিয়া গেল; দুই হাতে মুখ চাপিয়া মাথা হেঁট করিল। শারি বিস্মিত হইল, তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"বারি বারি দিদি আমার!—"

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বারি বলিল "আমায় আদর করিস্ না দিদি, আমি কারও আদরের পাত্র নই।"

"তুই আদরের পাত্র নস্—? পিয়ারি! দুলালি!—"শারি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিল। তখন স্নেহের আদরে বারির শুষ্ক হৃদয় গলিয়া নয়নে উথলিয়া উঠিল,—সখীর সাক্ষাতে সে এই প্রথম অশ্রুত্যাগ করিল! শারি জানিত যে বারি অন্তরে অন্তরে ব্যথা পায়—কিন্তু এতটা জানিত না!—সে তাহার বেদনার আধিক্য দেখিয়া ভীত হইল।—

৬

শারির নিকট রাজরাণী সমস্তই শুনিলেন। তিনি এই বিবরণ অশ্রুজলে ভাসিয়া স্বামীকে

হইল শুধু ধনে কাহারও সুখ হয় না!—আরও বুঝিলেন স্বামী জীবিতমানে স্বামীত্যক্তার ন্যায় দুর্ভাগিনী জগতে বিরল! বিধবা পরকাল চাহিয়া ঈশ্বর চাহিয়া সুখী হইতে পারে—কিন্তু এই—জীবন্ত দেবতার অধিষ্ঠানেও তাহার পূজাবিহীনা নারী কি বলিয়া আপনার অন্তরকে প্রবুদ্ধ করিবে?—তখন—সেই একমাত্র অপত্যের পিতা—তাঁহার সন্তানের জীবনের অন্ধকার কল্পনা করিয়া সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখিলেন!—

গোপনে রাজদূত আবার ছুটিল, কিন্তু কোথায় লাইকা? সন্ধান হইল না, দূত ফিরিয়া আসিল! তাঁহার গুপ্তচর ভারতময় কিন্তু কেহই সন্ধান দিতে পারিল না, সকলেই বলিল, "তাঁহাকে দেখিয়াছি—কিন্তু এখন নয় বহুপূর্ব্বে। হতাশ হইয়া রাজা স্থির হইলেন, কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত কেহ জানিল না! রাজপুরে প্রকাশ্যে লাইকার নামগ্রহণে রাজার দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত ছিল!—

কাল চক্র আবার দুইবার ফিরিল,—দুই বৎসর চলিয়া গেল!—রাজকন্যার প্রতি আর চাওয়া যায় না, শরীরে অযত্ন এখন স্পষ্ট প্রকাশিত,—অন্তরের গ্লানি সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট।

অবশেষে মহারাজ তীর্থযাত্রার প্রস্তাব করিলেন। দুহিতা পত্নী সহিত স্বল্পমাত্র সঙ্গী সহায়ে তাঁহারা বহির্ভ্রমণে চলিলেন। রাণী দেখিলেন কন্যার মুখ যেন কতকটা মেঘমুক্ত হইয়াছে। দেবতার উদ্দেশ্যে করজোড় করিয়া তিনি শত প্রার্থনা করিলেন, যেন তাঁহাদের এই তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য বিফল না হয়!—

ছদ্মবেশে রাজপরিবার অনেক দেশ অর্দ্ধ ভারতের করগ্রাহী নরপতি সেখানে আগমন করিয়াছিলেন!—এইরূপে এক বৎসর কাটিল। অনেক দেশ ফিরিয়া তাঁহারা দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। এই সময় বাধা ঘটিল, বারি বলিল, সে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না তাহাকে তীর্থবাস করিতে আজ্ঞা হোক—! এই কথা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন, কন্যাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সংসারে স্বামীই কি সর্ব্বোপরি? পিতামাতা কি কেহই নহেন?—"

কন্যা পিতার স্বর শুনিয়া তাঁহার রোষের মাত্রা অনুভব করিল; সে বিবর্ণমুখে দাঁড়াইয়া থাকিল,—রাজা বলিয়া গেলেন—"শোন বারি! আমিই ইচ্ছা করিয়া তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছি, কিন্তু তথাপি বলিতেছি তুমি সে বন্যপশুকে ভুলিয়া যাও!—সে তোমার অযোগ্য—সে আমার জামাতা হইবার অযোগ্য! সে যাদুকর, আমায় মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল,—তাহাই আজ আমায় এ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে!—আর আর ইহাও শোন, যদি পুনর্ব্বার সেই নরাধমের প্রসঙ্গ আমার নিকট উপস্থিত হইবার কারণ ঘটাও বারি,—তুমি যে আমার কন্যা ইহাও আমি বিস্মৃত হইব!"

রাজা চলিয়া গেলেন; রাণী নিকটেই ছিলেন, কন্যার মুখ দেখিয়া তাহার অবস্থা বুঝিলেন,—তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন—"ওমা, ওমা! বারি, কি হইল মা?—"

বারি কিছু বলিতে পারিল না, রাণী কাঁদিয়া অধীর হইলেন।

গভীর রাত্রি, রাজার পটাবাসের সকলেই নিদ্রিত বারি উঠিয়া বাহিরে আসিল। গঙ্গার তীর বহিয়া কিছুদূর চলিল। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে দুইজন সন্ন্যাসিনী নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহাদের কে ঠেলিয়া তুলিল, একজন উঠিয়া বলিলেন, "একি মা তুমি আসিয়াছ?"

বারি বলিল, "হাঁ মা, আসিয়াছি, গৃহবাস আমার অসহ্য হইয়াছে!" সন্ন্যাসিনী মৃদু হাসিলেন,—বলিলেন "মা, তুমি রাজনন্দিনী—পথের কষ্ট সন্ন্যাসের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে কি?"

"পারিব! কি সুখে আছি মা! পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া আসিয়াছি—আর নিজের এইটুকু সামান্য কষ্টই কি এত বড়?" বলিতে বলিতে বারি কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী বলিলেন লাইকাকে আমি প্রায়ই দেখিতে পাই; এখন চল দেখি তোমার অদৃষ্ট যদি—"

বাধা দিয়া বারি বলিল, "অদৃষ্ট আর কি মা! যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই, এ দেহ আর রাখিব না। আমি যে রাজ-রাজেশ্বরের মুখ হাসাইয়া আসিলাম এ কথা কি ভুলিব?"

দ্বিতীয়া সন্ন্যাসিনী যুবতী,—সে এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল এইবার বলিল,—"আসিয়াছ, স্বামী অন্বেষণে, কিন্তু বার বার তুমি নিজের পিতৃপরিচয় কেন দিতেছ ভগিনি!—"

বারি বিস্মিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিল—বয়োধিকা সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "ছি সাবিত্রী! তুমি অন্যায় কথা বলিতেছ—এই বালিকা কি মনোকষ্টে গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহা তোমাদের বুদ্ধির অগম্য!"

বলিল, "না কিছু অন্যায় বলি নাই মা! কি বল তুমি ভগিনি!—"

অতি কাতরস্বরে বারি বলিল "না কিছু অন্যায় নয়—কিছু অন্যায় নয়?—কিন্তু আমি অহঙ্কার করিয়া বলি নাই ভগিনি!—কিন্তু আমি কি করিয়া ভুলিব যে আমার পিতা-মাতার আমি একমাত্র সন্তান!"

মৃদু হাসিয়া সাবিত্রী বলিল, "হিন্দু-কন্যা! কেন ভুলিতেছ যে তুমি সাবিত্রী গৌরী সীতার দেশে জন্ম লইয়াছ?—কেন ভুলিতেছ তুমি বেহুলার ভগিনি,—তাঁহাদের পিতার কয় সন্তান ছিল রাজকুমারি! যাহার নামে ঘর ভুলিয়াছ তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়া আজ সব ভুলিতে হইবে। তোমার—পিতা-মাতা?—তাঁহাদের নিয়তির ফল তুমি কি করিয়া খণ্ডন করিবে বল?—তাই বলিয়া কি আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে?—জান কি যে—"

অপরা সন্ন্যাসিনী এবারও তাহার কথায় বাধা দিলেন,—বলিলেন, "স্থির হও মা, রাজকুমারী এখন শোকাতুরা—"

তখন সবেগে বারি বলিল—"না না জননি! শোক ইহাতেই উপশম বোধ করিতেছি!—কে তুমি? দেবী সাবিত্রী?—কে তুমি আমায় ভগিনী সম্বোধন করিলে? বল আবার বল তোমার এই অমৃতময় কথা আমি আবার শুনিতে চাই?"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল!—বলিল, আমি মার মুখে তোমার কথা শুনিয়া অবধি ভগিনি, তোমায় বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। ভোগৈশ্বর্য্য-পালিতা রাজকুমারীর চিত্তবৃত্তি এমন

হই,—তাই তোমার মুখে ওই সব কথা শুনিয়া আমার বড় রাগ হইয়াছিল ভাই? বড় উঁচু কথা বলিয়াছি, তুমি কি রাগ করিলে দিদি!"

বারি বলিল "না না—আমি রাগিব কেন? আপনি"—

সাবিত্রী তাহার মুখে হাত চাপিয়া কহিল—"যাও ভাই, ওকি কথা?—আমি বুঝি তোমার অপেক্ষা কুড়ি বৎসরের বড়,—তাই আমায় আপনি মহাশয় করিতেছ?—"তাই হবে, তোমার নাম কি ভাই? তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?—"

"তা যাই নাম হোক্—শোন, আমায় কেহ বুড়ী বলিলে আমার বড় রাগ হয়, তাই আমার কাছে যখন থাকিবে তখন বুঝিয়া কথা বলিও!"—

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন "চুপ পাগলের মেয়ে! মা বারি? আমার এই পাগল মেয়েটি বড় বাচাল মা, ইহার কথা তুমি কাণে করিও না!"

বারি সেই স্বচ্ছ অন্ধকার ভেদ করিয়া তৃষিতনয়নে সাবিত্রীকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, সে ভাবিতেছিল—"অন্ধকারে এ কে আলোকময়ী?—মরুভূমে এ কোন মন্দাকিনী-ধারা?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন—চল মা! আমরা এই আঁধারেই চলিয়া যাই, নতুবা প্রভাতে তোমার পিতা তোমার সন্ধান করিবেন।—উঠ সাবিত্রী! বারিকে একখানি গৈরিক বস্ত্র দাও। যাও মা, তুমি বেশ পরিবর্ত্তন কর!—

অনতিবিলম্বে সেই তিন সন্ন্যাসিনী গঙ্গা-তীর প্রবাহী পথে অন্তর্হিত হইল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

ভাল তোমা বাসি যখন বলি

(১)

"ভাল তোমা বাসি" যখন বলি
তোমায় ছলি।
প্রেমের কলি,
মরমে আমার সরমে ভয়ে
ফোটেনা রক্ত কমল হয়ে॥

(২)

"ভাল নাহি বাসি" যখন বলি
আপনা ছলি।
প্রেমের কলি,
ভয়ের বাধার আঁধার ঘরে

(৩)

ভাল তোমা আমি বাসি না বাসি,
কাছেতে আসি।
তোমার হাসি,
মনের কোণেতে প্রদীপ জ্বেলে
নিতি নব দেয় আলোক ঢেলে॥

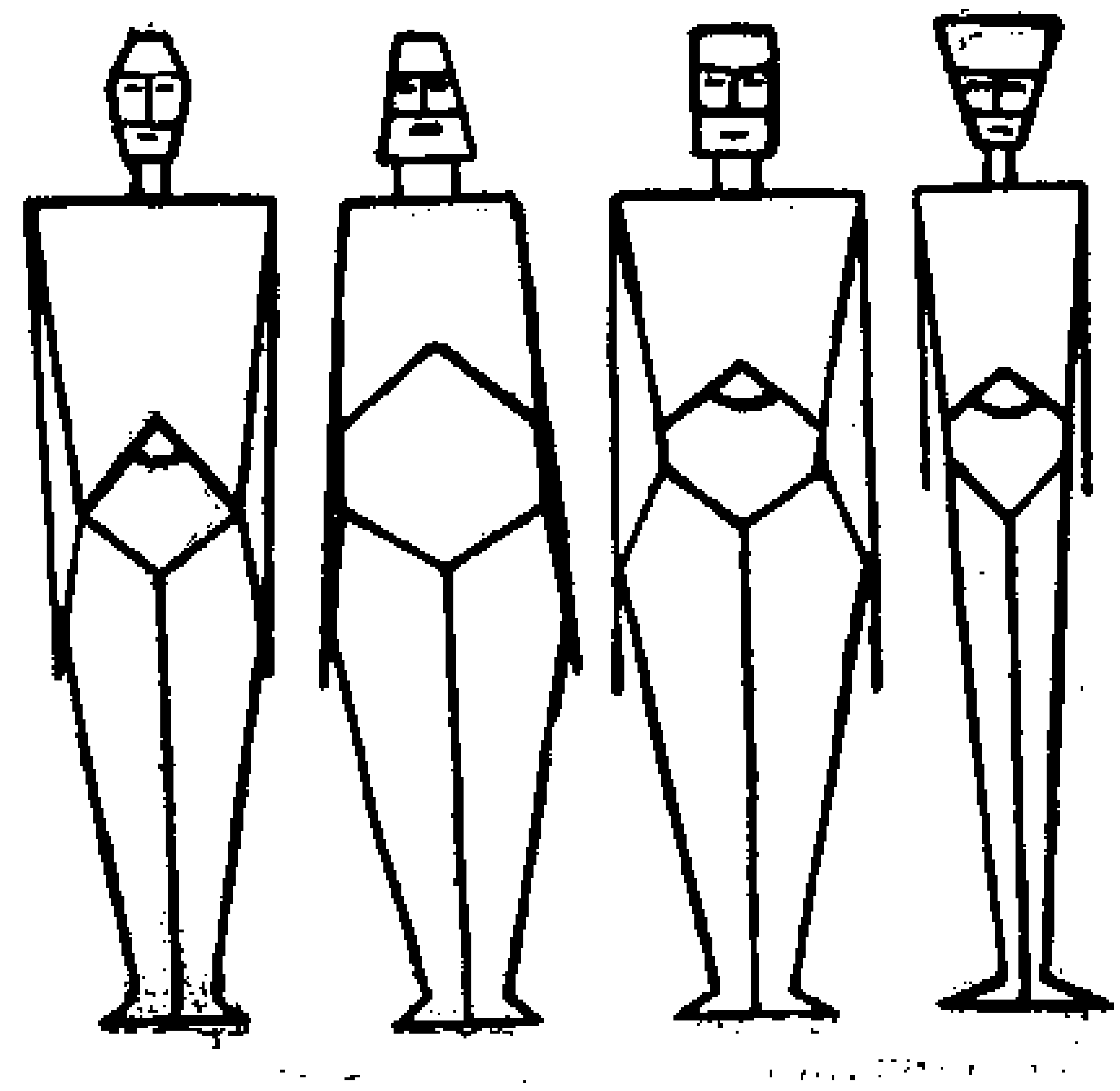
(৪)

তোমা ছেড়ে যবে দূরেতে আসি,
তোমার বাঁশি
আকাশে ভাসি,
করুণ সুখেতে ভোরে ও সাঁঝে

মেজর থুরির নবোদ্ভাবিত বিজ্ঞান

সম্প্রতি য়ুরোপে ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক গঠন প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহার শারীর-স্বাস্থ্যের মূল ভিত্তি নিরূপণ ও তাহার জীবন যাত্রাপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার এক বৈজ্ঞানিক রীতি প্রচলিত হইতেছে। জীব বিজ্ঞানের এই অভিনব বিদ্যার উদ্ভাবক লিয়েয়েঁ। প্রদেশের ফরাসী ডাক্তার সিগড্ (Dr Sigoud) নামক একজন অপেক্ষাকৃত অনতিপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক। মেজর থুরি (Major M. A. Thooris) ইহার নিকট এই বিদ্যার সন্ধান পাইয়া মনুষ্যের হিতার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইহার প্রতিষ্ঠান উদ্দেশ্যে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আমরা এই অভিনব বিদ্যাকে শারীর-গঠন-তত্ত্ব-বিজ্ঞান নামে (Morphology) অভিহিত করিতে পারি।

সকল মনুষ্যেরই দেহের গঠন ঠিক এক নহে। কাহারও মস্তক বৃহৎ, কাহারও কটিদেশ স্থূল, কাহারও বক্ষ প্রশস্ত এবং কাহারও বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সুগঠিত এবং মাংসপেশীবহুল! এইরূপ শারীরিক গঠনভেদে মানুষকে মূলতঃ চারি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মেজর থুরি এই চারি শ্রেণীর মনুষ্যের আদর্শ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে যথাক্রমে শ্বাসক্রিয়া প্রধান, (Respiratory,) পরিপাকক্রিয়া প্রধান, (Digestive) মাংসপেশী (Cerebral) নামে সংক্ষেপতঃ অভিহিত করিয়াছেন।



ক	খ	গ	ঘ
শ্বাসক্রিয়া-প্রধান	পাকক্রিয়া-প্রধান	মাংসপেশী-প্রধান	মস্তিষ্ক-প্রধান

প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট 'ক' চিহ্নিত চিত্র শ্বাস ক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির প্রতিকৃতি। ইহার স্কন্ধদেশ প্রশস্ত এবং দেহ পদনিম্ন পর্য্যন্ত ক্রমসূক্ষ্ম। এই আদর্শানুরূপ দেহধারী ব্যক্তির ফুসফুস তাহার শরীর যন্ত্রের মূলাধার। বায়ুকোষের সুস্থ সতেজ ক্রিয়ার উপরই ইহার জীবনের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে এইরূপ ব্যক্তির স্বাস্থ্যভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

'খ' চিহ্নিত মূর্ত্তি পরিপাকক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির আদর্শ প্রতিলিপি। ইহার শরীরের নিম্নাংশ স্থূল, উদরের তলদেশ স্ফীত ও বৃহৎ

ইহার শরীরের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় অংশ এবং ইহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে উদরের পরিচর্য্যার উপর নির্ভর করে। ইহার খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিলে, কিংবা ইহার শরীরের অনুপযোগী আহার্য্য ইহাকে প্রদান করিলে, এই ব্যক্তির দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ইহার মানসিক তেজ অন্তর্হিত ও কর্ম্ম-ক্ষমতা লুপ্ত হইবে।

'গ' চিহ্নিত ব্যক্তির শরীর মাংসপেশীবহুল। প্রকৃতি দেবী ইহাকে কর্ম্ম করিবার জন্যই যেন সৃষ্টি করিয়াছেন। সুগঠিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির যথোচিত পরিচালনা করিতে না পাইলে, এই ব্যক্তির স্বাস্থ্যভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। পরিপাকক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির অপেক্ষা অনেক অল্প খাদ্যে ইহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু ইহাকে কেরাণীর টুলে বসাইয়া আফিস ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে দেখা যাইবে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঘ) চিহ্নিত চিত্র মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তির প্রতিকৃতি। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপরিপুষ্ট কিন্তু মস্তিষ্কের শক্তি অপরিমিত। এই ধরণের লোক যখন জীবনে অবসাদ অনুভব করিয়া মুসড়িয়া পড়ে, তখন তাহার শরীরের পরিচর্য্যা করিয়া কিংবা তাহাকে তেজস্কর ঔষধাদি সেবন করাইয়া বিশেষ ফললাভ হয় না। মস্তিষ্কই এইরূপ ব্যক্তির শরীর যন্ত্রের মূলাধার। সুতরাং ইহাকে পুনর্জ্জীবন দিতে হইলে ইহার মানসিক চিন্তার ধারা বিভিন্ন প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়া ইহার মস্তিষ্ক নব নব ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে।

উপরে যে চারি শ্রেণীর বিভিন্ন মনুষ্যের

দেখিয়াও তাহাদের পার্থক্য উপলব্ধ করা যায়। শ্বাসক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির মুখমণ্ডল অনেকটা বিষমকোণ চতুর্ভুজের ন্যায়; গণ্ডের অস্থিদ্বয়ের নিকট উহা প্রশস্ততম। শ্বাসযন্ত্রই এই ব্যক্তির জীবনীশক্তির মূল ভিত্তি; এই হেতু নাসিকা এবং নাসারন্ধ্রই ইহার মুখমণ্ডলের প্রধান ভাবব্যঞ্জক অংশ। পাকক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির মুখ দন্তপাটির নিকট সমধিক প্রশস্ত, এবং মুখের সমগ্র ভাব মুখগহ্বরের নিকট কেন্দ্রীভূত। কোন আয়ত কটি, লম্বোদর ব্যক্তির বদনমণ্ডলের ঊর্দ্ধাংশ আবরিত করিয়া দেখিবেন, তাহার মুখ আননের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক ভাব অভিব্যক্ত করিতেছে। মাংসপেশীপ্রধান ব্যক্তির মুখমণ্ডল সমচতুরস্র; তাহার দৃষ্টি সরল এবং স্বচ্ছ। মস্তিষ্ক প্রধান ব্যক্তির আনন দীর্ঘ এবং মস্তিষ্ক গম্বুজাকৃতি। সুপ্রশস্ত ললাটদেশ এবং করোটি ছাড়িয়া দিলে, ইহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ভাবহীন।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে জীবন ধারণ করিতে মনুষ্যের যে চারিটি প্রধান উপাদান আবশ্যক—বায়ু, খাদ্য, গতি এবং ভাব—উপরি বর্ণিত চারি শ্রেণীর মনুষ্যে তাহার কোন একটির আবশ্যকতা অবশিষ্টগুলি অপেক্ষা অত্যধিক।

অতঃপর, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, এই নবোদ্ভাবিত বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের কত উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা। মনে করুন, কোন প্রশস্তবক্ষঃ শ্বাসক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে। ঔষধ প্রয়োগে ইহার বিশেষ কোন ফল হইবে না। কিন্তু

ক্ষেত্র হইতে পার্ব্বত্যদেশে প্রেরণ করুন, দেখিবেন শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া সতেজ হওয়ায়, ইহার অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হইয়াছে। আবার, কোন পরিপাকক্রিয়া প্রধান ব্যক্তির ক্ষয়কাশ রোগ দেখা দিলে, তাহার আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তন করিয়া পথ্যের উৎকর্ষ সাধন করিলেই, দেখা যাইবে তাহার ফুসফুস নীরোগ হইয়াছে। এইরূপ কোন মাংসপেশী-প্রধান ব্যক্তি মানসিক অশান্তি ও দৌর্ব্বল্যে কষ্ট পাইলে প্রতিদিন ২।৩ ক্রোশ ভ্রমণে তাহার ব্যাধি আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, কোন মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তি রক্তহীনতা ও মানসিক অবসাদে নির্জ্জীব হইয়া পড়িলে, যদি তেজস্কর, বীর্য্যবান্ ঔষধে ও কোন ফল লাভ না হয়, তাহা হইলেও পীড়িত ব্যক্তির মানসিক চিন্তা অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত করিলে, নানা সুন্দরভাবে মস্তিষ্ক পূর্ণ করিতে পারিলে, তাহার সুস্থভাব ফিরিয়া আসিবে।

কে কিরূপ পরিবেষ্টনের মধ্যে বাস করিবে এবং কাহার পক্ষে কিরূপ প্রণালীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ বাঞ্ছনীয়, তাহাও নিরূপণ করিতে শারীরগঠনতত্ত্ববিজ্ঞানের মূল্য বড় কম নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মাংসপেশী প্রধান মনুষ্যের ব্যাঙ্কে কাজ করা কখনও উচিত নহে। কারণ, প্রচুর অঙ্গ সঞ্চালনের উপরই যাহাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, কেরাণীর টুলে বসিয়া থাকিলে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য হানি অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে, ব্যাঙ্কের কেরাণী-গিরি কোন শ্বাসক্রিয়াপ্রধান বা পরিপাক-

অবশ্য যদি আফিসঘরে পর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু থাকে এবং অগ্নিপ্রধান ব্যক্তি জঠরাগ্নির প্রচুর ইন্ধন প্রাপ্ত হন। এদিকে মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তি প্রচুর অঙ্গসঞ্চালন ব্যতিরেকে এবং বিশুদ্ধ বায়ু ও খাদ্যাদি সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন থাকিয়াও মস্তিষ্কের সম্যক্ পরিচালনা করিয়া স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ।

বিভিন্ন শরীরগঠনবিশিষ্ট ছাত্রগণকে একই পরিবেষ্টনের মধ্যে এবং একই প্রণালী অনুসারে বিদ্যাদান যে কত দূষনীয়, তাহা এই নূতন বিদ্যার আলোকে ক্রমেই লোকের হৃদয়ঙ্গম হইবে!

এই অভিনব বিজ্ঞানের সারবত্তা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেজর থুরি তাঁহার গবেষণাপ্রসূত সত্য-সমূহের মূল্যবত্তা সম্বন্ধে ফরাসী দেশের সমর বিভাগের মন্ত্রীসভাকে এতদূর বিশ্বাস করাইয়াছেন যে তাঁহার পরামর্শমত শরীরগঠন দেখিয়া ফরাসী সৈন্যদিগের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিবার উপযোগিতা স্থিরীকৃত হইতেছে।

মেজর থুরির মতে শ্বাসক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তি পদাতিক সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। এইরূপ ব্যক্তির গভীর বক্ষঃ, প্রশস্ত পৃষ্ঠদেশ এবং সবল বায়ুকোষ পদাতিকের কার্য্যে ইহাকে স্বতঃই যোগ্যতা দান করে। আবার, পরিপাকক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তিকে প্রকৃতিদেবী স্বভাবতঃই অশ্বারোহী হইবার উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রশস্ত কটিদেশ শরীরের ভারকেন্দ্র নিম্নাভিমুখী করে; সুতরাং লম্বোদর স্থূলকটি ব্যক্তি অশ্বারোহণ

ঝুঁকিয়া পড়ে না পরন্তু অশ্বপৃষ্ঠে তাহার আসন দৃঢ় ও স্বাভাবিক ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, মাংসপেশীবহুল দেহই শরীর গঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি এবং এইরূপ দেহধারী ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈনিক হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। মাংসপেশীপ্রধান ব্যক্তির বিশেষত্ব এই যে যে কোন প্রকারের অঙ্গ সঞ্চালনে এই লোক নিজেকে উপযোগী করিয়া লইতে পারে। এইরূপ ব্যক্তিকে অশ্বারোহণ করিতে, প্রস্তর ছুঁড়িতে বা ভার তুলিতে দাও, দেখিবে যে অবস্থায় যেরূপ শারীরিক প্রক্রিয়া বিজ্ঞান সম্মত, এই ব্যক্তি স্বাভাবিক সংস্কার বশে অতি সহজ ভাবে তাহাই করিতেছে।

একজন বিখ্যাত চিকিৎসক মেজর থুরির গবেষণা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তিনি বলেন "মেজর থুরি চারি শ্রেণীর মনুষ্যের যে আদর্শ প্রতিকৃতি দিয়াছেন, তাহাতে পরিপাক-ক্রিয়া প্রধান ব্যক্তির মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র এবং মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তির শরীর শীর্ণ করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে দীর্ঘ ও শীর্ণ দেহ এবং প্রশস্ত ললাট দেহ মনঃশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু ইতিহাস নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণ করিতেছে যে প্রচুর মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি কোন বিশেষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই ধরায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা বরং অনেকাংশে পরিপাকক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির আদর্শের অনুরূপ। অথবা আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে, তাঁহাদের দেহ পরিপাক ক্রিয়া ও শ্বাসক্রিয়া প্রধান এই উভয় আদর্শের সমবায়। নেপোলিয়ন ব্যূঢ়োরস্ক ও বৃষস্কন্ধ ছিলেন অথচ তাঁহার কটিদেশ স্থূল ও বিস্তৃত ছিল। সিসিল রোড্‌স্ (Cecil Rhodes) এবং জনসনও ঐ একই প্রকার আদর্শের ছিলেন। ইঁহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি কেবলমাত্র উদরের পরিচর্য্যার উপরই নির্ভর করে নাই। অবশ্য ইঁহারা (বিশেষতঃ জনসন) ভোজ্য-অনুরাগী বড় কম ছিলেন না। কিন্তু তথাপি আবশ্যক হইলে ইঁহারা অতি সামান্য এবং অকিঞ্চিৎকর আহার্য্য গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতে ইঁহাদের মানসিক তেজ ও শক্তির কোন ব্যতিক্রম দেখা যাইত না।

"যাহা হউক, মেজর থুরি শ্বাসক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। অনেক প্রশস্তবক্ষঃ ব্যক্তি যে অবস্থায় ক্ষয়কাশ রোগগ্রস্ত হইয়াছে, সেই একই অবস্থায় পড়িয়াও অনেক ক্ষীণবক্ষঃ ব্যক্তি অব্যাহতি লাভ করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার মস্তিষ্ক-প্রধান ব্যক্তি পর্য্যাপ্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাহার বিশেষভাবে শারীরিক ব্যায়াম করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই, মেজর থুরির এই সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ সমর্থন যোগ্য।"

শ্রীদীনবন্ধু সেন।

মোগল-আমলের বিদ্বজ্জন ও কবিবৃন্দ

মোগল আমলের "নবজীবন"-যুগে (Renaissance) বিদ্বজ্জন ছিল, শিল্পী ছিল, কবি ছিল।

আইন-ই-আকবরী ঐ সময়কার বিদ্বজ্জনদিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে যথা—যাঁহারা বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের রহস্য বুঝিয়াছেন; যাঁহারা বাহ্যজগৎকে অবজ্ঞা করিয়া নিজ অন্তরাত্মার অনুশীলনে প্রীতিলাভ করেন; যাঁহারা একাধারে দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ত্ব-বেত্তার আসনে উপবিষ্ট হইয়া যে-সকল বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ও যে-সকল বিজ্ঞান সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এই উভয়বিধ বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন; যাঁহারা সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণকে সংশয়ের ধূলিজালে কলুষিত বিবেচনা করেন এবং এই হেতু কেবল মাত্র দর্শনের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকেন; যাঁহারা ধর্ম্মান্ধতা প্রযুক্ত প্রত্যাদেশের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখেন।

প্রথম শ্রেণীর ২১ জনের মধ্যে, আবুল-ফজলের পিতা শেখ-মুবারক সর্ব্বপ্রধান। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ১৪ জন পীর বা ধর্ম্মগুরু, তন্মধ্যে একজন মাত্র হিন্দু। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ১২ জন মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্য; তন্মধ্যে তস্কন্দের হাফিজই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত—তিনি তুর্কদিগের ন্যায় কটিবন্ধে তূণ বাঁধিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন,—এবং সমস্ত মুসলমান-জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেন। জ্ঞানী বলিয়া প্রদান করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। চতুর্থ শ্রেণীতে বিখ্যাত চিকিৎসকদিগেরই নাম পাওয়া যায় যথা;—শেখ-বীণা ও তাঁহার পুত্র শেখ-হসন। পঞ্চম শ্রেণীতে আবুল-ফজল তাঁহার বিপক্ষগণকে স্থাপন করিয়াছেন—ঐতিহাসিক বদাওনী তাহাদের মধ্যে একজন।

যাই হোক, আকবরের উৎসাহদান সত্ত্বেও এবং বিবিধ ধর্ম্মের বাদবিসম্বাদ ও বিচিত্র সভ্যতার সংঘর্ষ সত্ত্বেও ষোড়শ শতাব্দীর ভারতে কোন দার্শনিক প্রসূত হয় নাই; আরব, পারসীক ও য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে শিক্ষিত বিজ্ঞানাদির উন্নতি সাধন করিয়াছেন এরূপ কোন বিদ্বজ্জনও প্রসূত হয় নাই।

***

তদ্বিপরীতে, আকবরের যুগকে সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিক ও দার্শনিকেরা প্রায়ই ফার্সি ভাষায় গ্রন্থ লিখিতেন; তাহার মধ্যে প্রধান—আবুল ফজল ও বদাওনী; এই উভয় লেখকেরই শিষ্য ছিল, অনুকরণকারী ছিল।

সাদী ও হাফিজের অনুকরণে সাধু-সম্মত প্রাচীন ধরণে লিখিত হইলেও, তৎকালের কবিতা হৃদয়ের আবেগ ও মৌলিকতায় পূর্ণ ছিল।

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারেরা পারস্য-ভাষা ব্যবহার করিতেন; যথা—ফইজি (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়)।

দর্শন মধুরপ্রকৃতি, প্রফুল্ল উদারচিত্ত, অতীব কর্ম্মতৎপর ছিলেন; তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিতে ভালবাসিতেন...তাঁহার জীবনের গাম্ভীর্য্য, তাঁহার আচরণের মাধুর্য্য তাঁহার প্রতিভার মহিমাচ্ছটাকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। বিবিধ বিষয়ে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; আরবী ও ফার্সি গ্রন্থাদির জন্য আমরা তাঁহার নিকট ঋণী...তাঁহার মতে, ধনদৌলতের একমাত্র উদ্দেশ্য, মুক্তহস্ত দানের দ্বারা আপনাকে রিক্ত-হস্ত করা। এবং তাঁহার চক্ষে, দুঃখদুর্দ্দশা খোষ-মেজাজ-জাত একটি নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করে। চির-পরিচিত, অপরিচিত, শত্রু ও মিত্র, সকলেরই জন্য তাঁহার গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত ছিল। তাঁহার গৃহ দরিদ্রদিগের আশ্রম ছিল। আত্মরচনায় তিনি সহজে সন্তুষ্ট হইতেন না, তাই তাঁহার রচনাবলী সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেন না। তিনি গর্ব্বিত ছিলেন, তিনি কাহারও অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন না। তাঁহাকে কেহ আত্মশ্লাঘা করিতে দেখে নাই। নিজে প্রতিভাবান্ হইলেও পদ্যের প্রতি তাঁর বড় একটা আগ্রহ ছিল না, বিদগ্ধদিগের সমাজেও তিনি যাতায়াত করিতেন না। তাঁহার দর্শনতন্ত্র অতীব গভীর ছিল। স্বীয় নেত্র তৃপ্তির জন্য নহে, পরন্তু চিত্ত তৃপ্তির জন্যই তিনি গ্রন্থপাঠ করিতেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন; এবং বিনাদর্শনীতে দরিদ্র রোগীদিগের সেবা করিতেন।

যে সকল কবিতায় তাঁহার শুক্তিমুক্তাগুলি দীপ্যমান, সেই সকল কবিতা কেহ বিস্মৃত হইবে না। আমার কাজের মধ্যে যদি কখন একটু অবসর পাই, আমি তখনই স্বীয় যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই লেখকের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি বাছিয়া লই; এই নির্ব্বাচনকার্য্যে, যেমন এক দিকে সমালোচকের কঠোর দৃষ্টি প্রয়োগ করি, তেমনি বন্ধুর কোমল হস্তও প্রসারণ করি। আজ আমি যে কথা বলিতেছি তাহা ভাইয়ের হিসাবে,—সমালোচকের হিসাবে নহে। এই কবিতাগুলি আমার স্মরণ হইতেছে।"

তাহার পর, আবুল-ফজল কতকগুলি সুন্দর রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"হে মানব, মুদ্রার দুই পিঠের ন্যায়, তোমার উপর যুগল ছাপ মুদ্রিত:—আত্মা ও শরীর। তোমার প্রকৃতি?—দ্যুলোক হইতেও উচ্চতর, ভূলোক হইতেও নিম্নতর। চতুর্ভূতে গঠিত বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিও না, সপ্ত রাজ্যের দর্পণ বলিয়াও আপনার শ্লাঘা করিও না।

স্বর্গের প্রতিবিম্ব, মর্ত্ত্যের প্রতিবিম্ব যে তুমি, তুমি স্বর্গীয় হইতেও পার, পার্থিব হইতেও পার, নির্ব্বাচন-ভার একমাত্র তোমারই হাতে।

মুদ্রাটি সাবধানে ওজন করিয়া দেখ। তোমার বিবেকের তৌলদণ্ডটাই ঠিক:—অতএব এই তৌলদণ্ডই ব্যবহার করিবে।

প্রেমিক, তুমি কষ্ট পাইতেছ বলিয়া আক্ষেপ করিতেছ। কিন্তু তোমার জীবনটাই যে তোমার জ্বর-ব্যাধি, তোমার হৃদয়টাই যে তোমার জ্বর-ব্যাধি।

আমি ভালবাসি; আমার প্রিয়তমাই আমার ধমনীর রক্ত, আমার ক্ষত স্থানেরও রক্ত।

ওরে কাল, আমার 'সাকী'! এখনও কেন তুই খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিস্? এখন যে আকবরের রাজত্ব-দীপ্ত মহিমার রাজত্ব। ওরে কাল! আমার সাকী, এক-পেয়ালা সুরা দে!

যাহা মাথায় চড়ে, যাহা নিয়তি অপেক্ষাও খারাপ, যাহা জ্ঞানীকেও পাগল করিয়া তুলে, এমন সুরা আমি চাহি না।

সে সুরা নহে যাহা যুদ্ধের সময় পিত হয়। সেই সুরা পান করিয়া সৈনিকেরা ঘাড় নীচু করিয়া সবেগে চলিতে থাকে ও পশুবৎ প্রতীয়মান হয়।

সেই নির্লজ্জা সুরা নহে, যাহা হাত পা বাঁধিয়া বিবেককে প্রবৃত্তিরূপ তুর্কের হস্তে সমর্পণ করে।

সেই অগ্নিময়ী সুরাও নহে যাহা সুরাপাত্রকে গলাইয়া ফেলে; তবে সে সুরা কি?—না একটি মধুর দৃষ্টি, সে সুরাপাত্রটি কি?—না আমাদের হৃদয়।

না; সেই বিশুদ্ধ সুরা, সেই রহস্যময় মধুর সুরা যাহা খামখেয়ালী অদৃষ্টের উপর জয়লাভ করিতে আমাদিগকে সমর্থ করে।

সেই স্বচ্ছ সুরা যাহার মধ্যে সন্ন্যাসীরা নিষ্পাপ-অবস্থা লাভ করেন, সেই দীপ্তিময়ী সুরা যাহা রাজসভা-

সদ্‌কে সম্মানের পথ ও প্রকৃত রাজভক্তির পথ দেখাইয়া দেয়।

সেই মুক্তাময়ী সুরা যাহা চিত্তবিদূষণ সমস্ত চিন্তাকে ধরাশায়ী করে।"

ফইজি অপেক্ষা নিকৃষ্ট, শিরাজের উর্ফি (১৫৯১ অব্দে মৃত্যু হয়) কতকগুলি সুন্দর কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন।

"বুল্‌বুলের করুণস্বর যে হৃদয়কে বিগলিত করে সেই হৃদয়ের প্রতি আসক্ত হও। সেই হৃদয়ই জ্ঞানীর হৃদয়।

যদি তুমি প্লেটো না হও,—তোমার অজ্ঞতাকে রক্ষা কর; সমস্ত অর্দ্ধ বিজ্ঞানই মৃগতৃষ্ণিকা ও অতৃপ্ত তৃষ্ণা।

পৃথিবীতে এমন লোক নাই যে প্রেমের অনিষ্ট সহ্য করিতে পারে। প্রেমিক বলিলেই বুঝায়ঃ—পাণ্ডু-বর্ণ ও বিকৃত মুখমণ্ডল।

নিরুপায় জেলেখার মুখবর্ণের মত আমার হৃদয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। অপবাদগ্রস্ত জোসেফের অপবাদ কাহিনীর মত আমার দুঃখ।"

কিন্তু ক্রমে উর্দ্দু ভাষা সুমার্জ্জিত হইল; তখন মুসলমানেরা এই কথা বলিতে সমর্থ হইলঃ—"আরব ভাষা মাতৃস্বরূপা; তুর্ক ভাষায় লঘু সাহিত্য; পারস্য ভাষায় কবিতা; উর্দ্দু ভাষায় কথোপকথন।" উর্দ্দু সাহিত্য বিচিত্র বিষয়াত্মক। যথাঃ—

রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ও দর্শন সম্বন্ধীয় সন্দর্ভ, ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থ, গদ্য ও পদ্যে রচিত আখ্যায়িকা এবং ব্যঙ্গ-কাব্য।

দাক্ষিণাত্যের ওয়ালীই উর্দ্দু কবিতার প্রতিষ্ঠাতা (সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশ) ওয়ালী বলিতেন, তাঁহার কবিতা, সঙ্গীত-রাজ বুলবুলের গান অপেক্ষাও মধুরতর; এবং অনন্ত পুরুষের সিংহাসন-সমীপে সমুত্থিত হয়।

কতকগুলি প্রেম সংক্রান্ত গজলের জন্য আমরা উঁহার নিকট ঋণীঃ—যথা।

"তোমার কর্ণের মুক্তায় খচিত তোমার কৃষ্ণবর্ণ অলকদাম—মনে হয় যেন, সাতারার অবরোধে ভারতীয় সৈন্য।

তোমার অলকদাম যমুনার তরঙ্গরাজি এবং তোমার চখের কালো তারা যেন এক তাপস, পবিত্র জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।"

কিন্তু উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি, ভগবৎভাবে অনুপ্রাণিত সুফীদিগের লেখনীপ্রসূত।

"অনুক্ষণ ঈশ্বর চিন্তা—অনুক্ষণ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ।

কেন এই পার্থিব সাম্রাজ্যের অভিলাষী হইয়াছ? আমার সাম্রাজ্য তাহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর—পীর দিগের দারিদ্র্য।"

উর্দ্দু কবিতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। জামী ও নিজামীকে স্বকীয় গুরুরূপে বরণ করায়, ঐ সময়কার কবিতায় উচ্চ ভাবের কথা ও অতি সূক্ষ্ম ভাবের কথা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অনুকরণের অস্তিত্ব সত্বেও মৌলিকতার অভাব ছিল না, আবেগ ও উচ্ছাস-জনিত সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না।

সৌদার কবিতা। (১৭৮০ খৃঃ মৃত্যু হয়)

"তোমার যদি চক্ষু থাকে ত দেখিতে পাইবে,—গোলাপ হইতে কণ্টক পর্য্যন্ত ঈশ্বরের করুণা প্রকাশ করিতেছে। সেই পরম সখার সৌন্দর্য্য, তাঁহার সখারা প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থেই দেখিতে পান। ভক্তির সূত্র ভিন্ন ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করা যায় না।—নচেৎ মুসলমানদের জপমালাই বা কিজন্য? ব্রাহ্মণদিগের

"হে ঈশ্বর, আমার প্রিয়তম, তোমার কঠোরতা আমার আসক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করে। যেমন—তিক্ত ঔষধ রোগীর কল্যাণসাধন করিয়া থাকে।"

মীরের কবিতা। (১৯ শতাব্দীতে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু হয়)

"কাঁদিতে কাঁদিতে লোকে বলিয়া থাকে, কেমন করিয়া যৌবন পালাইল?—হায়। যৌবন পালাইল, যেরূপ মলয়ানিল পলায়ন করে, যেরূপ গোলাপের সৌরভ পলায়ন করে।—মীর, বার্দ্ধক্য ঝড়ের মত সহসা আসিয়া আমাকে ধরাশায়ী করিল। এই প্রচণ্ড আঘাত কে প্রতিরোধ করিতে পারে? আমরা যেন শরৎকালের বৃক্ষপত্র।"

হাতিমের কবিতা। (১৬৯৯—১৭৯১)

"আমার প্রিয়তমা যখন আমার গৃহের চৌকাঠ পার হইয়া যাইবেন, আমি আপনাকে বলিদান দিব। আমার বিরাম শয্যা আমার দুঃখশয্যায় পরিণত হইয়াছে। তোমার সুন্দর পদযুগল দ্বারা যে সকল গদি বিমর্দ্দিত হইত, সেই সব মখমলের গদিতে আমি কি করিয়া নিদ্রা যাইব?—প্রিয়তমে, এই দেখ আমার আত্মা তোমার পদবিক্ষেপের জন্য, তোমার সুন্দর গঠনের জন্য, তোমার সৌন্দর্য্যের জন্য, তোমার কুঞ্চিত অলকদামের জন্য লালায়িত হইয়াছে।"

সোজের কবিতা। (১৮০০ অব্দে বার্দ্ধক্যে মৃত্যু হয়)

"যাহারা ভালবাসিতে পারে না, প্রেমের নাম করিবার তাহাদের কি অধিকার আছে? প্রেম ত যাতনার ন্যায় একটা মারাত্মক মত্ততা। হাঁ! আমার কথায় বিশ্বাস কর, প্রেমের পেয়ালা স্পর্শ করিও না। একটি চুম্বন! তোমার ঐ মিথ্যাবাদী চুম্বন হইতেই সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি। প্রকৃত প্রেমের অপমানও ইহা অপেক্ষা ভাল। এইরূপ লেখা ছিল:—জীবনের যত কিছু লজ্জা আমার অদৃষ্টেই মিলিবে। হে ঈশ্বর কোন জীবকে প্রেমের দ্বারা অবমানিত হইতে দিও না।"

এই সকল আবেগময়ী কবিতার বিপরীতে, হসনের রচনায় (১৭৮৬ মৃত্যু হয়) একটা গতানুগতিক কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁহার কবিতায় আর সেরূপ আবেগ নাই, আন্তরিক ভাবস্ফূর্ত্তি নাই; উহা একটা আমোদের বিষয় মাত্র।

"ইরানের উদ্যান" হইতে এই অংশটী উদ্ধৃত হইল:

"এই দুই উদ্যান স্বর্গের উদ্যানকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রমণীগণ যেন কতকগুলি ফুল্ল কুসুম। কাহারও বা জল-চেক্নাই পরিচ্ছদ, কাহারও বা মস্‌লিন ও রেশমের পরিচ্ছদ। আবার কাহারও বা জরির পাড়-ওয়ালা লাল বা সবুজ পরিচ্ছদ। কিংখাপের কটিবন্ধ, শাল, একটি ওরনা স্কন্ধে লুটিয়া পড়িয়াছে। নূপুরে ভূষিত পদপল্লব প্রেমিকজনের মনোহরণ করিতেছে।

তাহাদের আঙ্গিয়ার মধ্য হইতে গ্রীবা ও বক্ষ প্রকাশ পাইতেছে। তাহাদের কাঁচুলী গাত্র চাপিয়া ধরিয়াছে এবং তাহাদের লাল পায়জামা তাহাদের গোলাপী-বর্ণাভ গাত্রেরই অনুরূপ। কিন্তু আর এক রূপসী পাল্কী আরোহণ করিয়া উপনীত হইলেন; তিনি অবতরণ করিবামাত্রই আলোকচ্ছটা মনে করিয়া প্রজাপতিরা ছুটিয়া আসিল এবং বুলবুল পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে রাজি হইল:—বুলবুল তাহার চিরবাঞ্ছিত গোলাপকে পাইয়াছে। (১)

উনবিংশ শতাব্দীতে উর্দ্দু কবিতা আরও গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ের কবিরা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কবিদিগের অনুকরণ করিতে লাগিল—সেই পূর্ব্ব যুগের কবিরাও আবার পারসীকদিগের অনুকরণ করিয়াছিল।

ব্যঙ্গ কাব্যের ক্রমবিকাশে চরিত্রের ক্রম-

(১) সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্দ্দ লেখকদের মধ্যে, দিল্লিতে যিনি বাস করিতেন সেই হাইদ্রাবাদের আজদ, আরজু, য়কীন, ফিগাম, দরদ আমজাদ্ সমস্তই দিল্লির—ইহাদেরও নামোল্লেখ করা আবশ্যক।

বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে, এই ব্যঙ্গ কবিতা উৎপীড়নকারী বা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত; মামুদের বিরুদ্ধে রচিত ফর্দ্দুসীর প্রসিদ্ধ কবিতা এই ধরণের। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিরা সাহিত্যিক কলহ ভিন্ন আর কোন কারণে উত্তেজিত হইতেন না।

কবি সৌদা স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ফিদুইর বিরুদ্ধে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

তিনি এক মূর্খের বিবরণ লিখিয়াছেন। ঐ মূর্খ বাজ পাখী মনে করিয়া এক পেচক কিনিয়াছিল:—

"এই পেচক যে বাজ পক্ষী সাজিয়াছে—সে কে? সে ফিদুই স্বয়ং....ফিদুইর পদ্য লিখিবার বাতিক হইয়াছে। ফিদুই গন্ধ-বণিক; কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "গরম মসলা আছে?" সে উত্তর করে "পদ্য" আছে। কেহ যদি কোন গাছগাছড়া চাহে তাহাকে সে বলিয়া উঠে:—"এই যে আমি ফিদুই।" পদ্য রচনা করিতে অসমর্থ, যশের জন্য তৃষিত, ফিদুই সেই গল্পপ্রসিদ্ধ বণিকের পেচক।"

পরে, আর একটি ব্যঙ্গ কবিতা,—পূর্ব্বোক্ত কবিতাটিরই মত আবেগময়ী,—এই কবিতায় মুসলমান হিন্দুদিগকে উপহাস করিয়াছে; এবং বলিয়াছে ভারত, ভারতের আইন, ভারতের রীতিনীতি, নূতন কেতা, তাহার মুসলমান ভ্রাতৃগণকে নীতিভ্রষ্ট করিয়াছে।

জুরার কবিতা। (১৮১০ অব্দে মৃত্যু) ঋতু বর্ণনা;

ইহার বাগ্‌বিন্যাসে কোন বিশেষত্ব নাই:—

"আমরা কি দেখিতেছি? বৃষ্টি? বিশ্বপ্লাবিনী বন্যা? সর্ব্বত্রই জল, জল ছাড়া আর কিছুই নাই। নদী ও স্রোতস্বিনী সকল উদ্বেলিত হইয়া ঘর বাড়ী ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে এবং অজস্র বর্ষণে আমা-দিগকে অভিভূত করিয়াছে।"

ভাবের কৃত্রিমতা:—

"আকাশ যেন তরঙ্গোপরি ভাসমান একটা জাহাজ; তারকাগণ, প্রেমিক নয়নের অশ্রু ধারার মত, জলের মধ্যে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তরঙ্গ সকল এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, পাখীরা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। এবং মৎসেরা চন্দ্রের নিকট গমন করিতেছে।

পরিশেষে গদ্যসুলভ আলোচনা:—

"শষ্যের মূল্য কম; তথাপি দুর্ভিক্ষ-সময়ের ন্যায় গৃহ সকল মৃত দেহে পূর্ণ।

কোন খাদ্য দ্রব্যের খরিদ্দার নাই, কোন তৌলদণ্ড নাই। কি ফলের দোকানে, কি কসায়ের দোকানে, কি পান্থশালার পাচকদের দোকানে, সর্ব্বত্রই হাহাকার ও সকল সামগ্রীই সচরাচর-সময় অপেক্ষা পাঁচগুণ মহার্ঘ।" (২)

এই সকল কবিতার দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, গদ্য-যুগের পর, কবিতার যুগ ও আবেগ-উচ্ছাসের যুগ আসিয়াছিল। ১৯ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক ও ভাষ্যকারগণই প্রধান উর্দ্দু লেখক ছিলেন। তা ছাড়া, মুসলমানের প্রাধান্য চলিয়া যাওয়ায়, হিন্দু ও দ্রাবিড়ীয় রীতির প্রভাবে পরাভূত হইয়া মুসলমান ভাষা অবনতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতেই এই সমস্ত ভাষাগত বিশেষ প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয়। গদ্য বিভাগে, দুইজন প্রধান ধর্ম্ম সংস্কারক—নানক ও চৈতন্য।

ভারতের সমস্ত চলিত ভাষাতেই সুন্দর

(২) Garcin de Tassy সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

সুন্দর কাব্য পরিদৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে তামুল ভাষায় সিত্তরদিগের গ্রন্থাদি রচিত হয়, মারাট্টাদিগের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থের গ্রন্থকার সমূহ এবং পরে জনপ্রিয় কবি তুকারাম (১৫৮৮—১৬৪৯) আবির্ভূত হন; রাজপুত কবিগণের মধ্যে একজন কবি বিহারী তাঁহার প্রেমাসক্ত রাজকুমারকে, এক নবযুবতীর কথা বলিতেছেন:

"যখন ফুলটি ফুটিয়া উঠিবে, তখন ভ্রমরের কি দুর্দ্দশা! কেননা তখন তাহাকে সৌরভ হীন, বর্ণ হীন, মাধুর্য্য হীন এক মুকুলের উপর বসিতে হইবে।"

বঙ্গদেশ হইতে মুকুন্দরাম প্রসূত হয়। (সপ্তদশ শতাব্দী) অসম্ভব অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনার মধ্যে তাঁহার রচিত পারিবারিক জীবনের বর্ণনাই অতীব মধুর! এইরূপ শ্রীমন্তের ইতিহাস।

ধনপতি নামক এক বণিকের দুই পত্নী; একটি বয়স্থা, আর একটি তরুণী—আর এই তরুণী অপূর্ব্ব রূপসী। ইহা হইতে দুই পত্নীর মধ্যে বিবাদকলহ। পতির অনুপস্থিতি কালে, এই তরুণী নির্য্যাতন সহ্য করিয়া পতির প্রত্যাগমনে তাঁহার ভালবাসা পাইবে বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিল। শ্রীমন্ত নামে তাহার একটি পুত্র জন্মিল। কিন্তু বণিক ধনপতি সিংহলে যাত্রা করিয়া সেখানে ১৪ বৎসর কাল কারাবদ্ধ রহিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীমন্ত পিতৃ-অন্বেষণে বাহির হইল। বিচিত্র অদ্ভুত কাণ্ডের পর, বঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডীর কৃপায় শ্রীমন্ত পিতাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল।

খাস হিন্দুস্থানে তিনজন লোক-গুরু:— সুরদাস, কেশবদাস, তুলসীদাস। সুরদাস (১৫২৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম) "বাল লীলা"র গ্রন্থকার। এই গ্রন্থে বিষ্ণুর উদ্দেশে কতকগুলি দোঁহা রচিত হইয়াছে। কেশবদাস (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী) ইনি একজন নীতি-উপদেশ-লেখক এবং পারসীক গ্রন্থকারদিগের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তুলসীদাস (১৫৪৩—১৬৪০) হিন্দু লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়।

তুলসীদাসের গুরু ছিলেন নাভাজী। নাভাজী একজন দরিদ্র ভগবদ্‌ভক্ত, ক্ষীণকায়, ও অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত। ইনি বৈষ্ণবধর্ম্ম সংক্রান্ত ভক্তমাল গ্রন্থের রচয়িতা। কাশী রাজের মন্ত্রী হইয়া তুলসীদাস কাশী নগরে বাল্মীকি রামায়নের স্বাধীন অনুকরণে এক রামায়ণ রচনা করেন। সপ্তকাণ্ড:—প্রথম বালকাণ্ড; গ্রন্থকার এই বালকাণ্ডে, রাম বিষ্ণুরই অবতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহার পর অযোধ্যা কাণ্ড; এই অযোধ্যা কাণ্ডে, ইচ্ছাপূর্ব্বক রামের আত্মনির্ব্বাসন, বনে রাম ও সীতার জীবনযাত্রানির্ব্বাহ, ও সীতাহরণ বর্ণিত হইয়াছে; যুদ্ধকাণ্ডে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দম্পতিযুগলের অক্ষুণ্ণ অটল প্রেম, সীতা উদ্ধার, রাবণের মৃত্যু এবং পরিশেষে, জনসাধারণ সীতার সতীত্বে সন্দেহ করায়, রামকর্ত্তৃক সীতার প্রতি বনবাসের আদেশ বর্ণিত হইয়াছে। বনে গিয়া সীতা দুইটি যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। পরে রাম অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় পত্নী ও পুত্র যুগলের অন্বেষণে বাহির হইলেন। এবং ১৮ বৎসর ব্যাপী বিচ্ছেদের পর তাহাদিগকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

নবযুগের প্রকৃত কবি তুলসীদাস,

রামায়ণকে স্বকীয় যুগে প্রত্যারোপিত করিয়াছেন। তাঁহার রামায়ণগত পাত্রগণের প্রতীতি, ভাব, ধারণা, রীতিনীতি সমস্তই ষোড়শ শতাব্দীর অনুরূপ; আর তিনি চিত্র আঁকিয়াছেন ষোড়শ শতাব্দীরই; সেই বড় বড় বাণিজ্য বহুল নগরাদি, সেই দুর্জ্জয় দুর্গসমূহ, সেই অশ্বারোহী সৈনিকের দল, সেই সামন্ত রাজাদিগের উৎসব ও মল্লক্রীড়া, সেই বিভিন্ন জাতিবর্ণ, সেই ব্যবসায়-সংঘ, সেই বিলাসিতা, সেই ভোগসুখ, সেই সংশয়বাদ ও সরল বিশ্বাসের সংমিশ্রণ, সেই বিজ্ঞান ও ভ্রান্ত সংস্কার, সেই বর্ব্বরতা ও মর্জ্জিতভাব যাহা সকল দেশের নবযুগেই পরিলক্ষিত হয়। এবং তাঁহার ভাষা—ব্রজভাষা; এই ভাষা যেমন একদিকে লোকব্যবহারোপযোগী তেমনি বিশুদ্ধ; ইহা নমনীয়, বিশ্লেষণাত্মক, সুরঞ্জিত; পুরাতন বিষয়ের আলোচনা ক্ষেত্রে, লোকপ্রিয় কবির বর্ণনার পক্ষে এমন উপযোগী ভাষা আর নাই। এইরূপ ইতালী দেশের Gozzolির কলাকৌশল যেমন জনতার উপযোগী সরল, তেমনি রোমক ও গ্রীসীয় এই দুই প্রাচীন সাহিত্য-যুগের অনুরূপ—মহান্! কিন্তু "নবজীবন" যুগের সাহিত্যের ইহাই বিশেষ ধর্ম্ম ও প্রতিভা যে, উহা ইতিহাসের গৌরবান্বিত ঘটনাসমূহকে ও পুরাণাদি বর্ণিত সরল ও ভক্তিরঞ্জিত ব্যাপারগুলিকে আধুনিক ভাবে গড়িয়া তুলে কিন্তু উহাদিগকে কথনই নীচে নামাইয়া আনে না।

ইহার বিপরীতে, নবযুগঅভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী কালে, যে সাহিত্যযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা সুসংযত ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচায়ক; কিন্তু পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুশীলিত না হওয়ায় তৎকাল প্রচলিত ভাষাগুলি হইতে নিকৃষ্ট রচনা সকল প্রসূত হয়। উহাদের যাহা কিছু গৌরব তাহা মুসলমান সভ্যতার অবনতি প্রযুক্তই হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-অনুশীলন আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অধিকারভুক্ত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবাব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবাব গৃহ।

নবাবের গৃহের ভোজন-কক্ষ সেদিন আড়ম্বর-সজ্জায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের সমুদয় উপাদানে আধুনিক কেতায় সজ্জিত বিরাট কক্ষ উজ্জ্বল শ্রীতে মণ্ডিত। প্রকাণ্ড টেবিলটাকে ঘেরিয়া প্রায় বিশজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক আনন্দ-কলরবে কক্ষটিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। পারি সহর যাঁহাদিগকে বক্ষে ধরিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সকলেই প্রায় এই নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন না শুধু ডিউক। মুখে এক টুকরা রুটি পুরিয়া মঁপার্ভঁ কহিলেন, "হাঁ, কাল ডিউক আমাকে ডেকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন,—বুঝলেন, নবাব বাহাদুর—?"

আনন্দে গর্ব্বে নবাবের বুকখানা ফুলিয়া

উঠিল। তিনি কহিলেন, "তাই না কি! আমার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন— ?"

"হাঁ। শীঘ্র একটা সুযোগ পেলেই তিনি আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌বেন।"

"বটে। এ কথাও তিনি বলেছেন ?"

"তা না ত কি। এই যে গবর্ণর সাহেব রয়েছেন, ইনিও সে কথা শুনেছেন।"

যাঁহাকে গবর্ণর বলা হইল, তিনি একজন খাটো ধরণের লোক, নবাবের অপর পার্শ্বে টেবিলের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। মাথায় টাক। একমনে তিনি ভোজ্যবস্তুর সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। নাম তাঁহার পাগানেতি; কর্সিকা প্রদেশের তিনি গবর্ণর। মঁপাভঁ তাঁহাকে নবাবের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণর কহিলেন, "ডিউক তাই বলছিলেন বটে!"

এই নিমন্ত্রণ-সভাটি দেশের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন ধরণের সম্ভ্রান্তগণ-সম্মিলনে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। টিউনিসের বে'র প্রধান কর্ম্মচারী ব্রাহিম বে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। দেউলিয়া-গ্রহণে সমধিক খ্যাতিপরায়ণ কার্দ্দৈলাক, চিত্র-ব্যবসায়ী সোল্‌বাক, তদ্ভিন্ন নবাবের মুর ও মিশর-বন্ধুগণ নিমন্ত্রিতের দলভুক্ত ছিল। বিভিন্নশ্রেণীর লোকজন থাকিলেও সভায় এতটুকু কলরব ছিল না। সকলেই নিঃশব্দে ভোজন করিয়া চলিয়াছিলেন; চোখের কোণে বক্র কটাক্ষে পরস্পরের পানে চাহিতেও কেহ ভুলেন নাই। সহসা নবাব বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ডাক্তার জেঙ্কিন্স! এত দেরী যে!" মৃদু হাসিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আমরা ডাক্তার মানুষ। বাঁধাধরা সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করি, এমন আমাদের সাধ্য কি।"

নবাব কহিলেন, এঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন, কাজেই আপনার জন্য অপেক্ষা করাটা — "

ডাক্তার কহিলেন, "তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। আমি এখনই সকলকে ধরে ফেলছি—"

ডাক্তার নবাবের সম্মুখস্থ শূন্য আসনে বসিয়া গেলেন। ক্ষিপ্রভাবে কয়েকটা জিনিষ মুখে পুরিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আজকের মেসেঞ্জার কাগজখানা দেখেছেন, নবাব বাহাদুর ?

নবাব কহিলেন, "না।"

"সে কি! দেখেনইনি মোটে! আপনার সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড প্যারা বেরিয়েছে যে!"

নবাবের মুখে সরমের একটা রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তিনি কহিলেন, "আমার সম্বন্ধে আবার কি বেরুল ?"

"দু কলম লিখেচে! মোসার কোথায় ? আপনাকে দেখায় নি! এই যে মোসার!"

মোসার অপ্রতিভভাবে কহিল, "অতটা মনে ছিল না।"

মোসার একখানা ছোটখাট সংবাদ-পত্রের মালিক। তরুণ বয়সেই তাহার শীর্ণ মুখে-চোখে দারিদ্র্য ও অভাবের একটা রুক্ষ ছাপ পড়িয়াছে। আর কোন জায়গায় অর্থ উপার্জ্জনের কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া সে এই সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া বসিয়াছে। বুকে দুনিয়ার প্রতি ঈর্ষা-পীড়িত একটা জ্বালা লইয়া সে এই কাজে নামিয়াছে। যেখানে অর্থ পাইবে, সেখানেই সে প্রশংসা ও স্তুতির মধু বর্ষণ করিবে। যেখানে সে সম্ভাবনা নাই, সেখানকার জন্য তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত আছে,

শুধু হুলের বিষ! অর্থশালী লোকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের কালিমা-লিপ্ত চরিত্রে যশের চুণকাম করাই তাহার কাজ। এই কারণেই মঁপার্ভ জেঙ্কিন্সের দলে অবাধ প্রবেশের অধিকার সে লাভ করিয়াছিল। জয়-দুন্দুভি বাজাইয়া আপনাদের পানে সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এমনই একজন সংবাদ-পত্র-পরিচালকের অভাব মঁপার্ভ-জেঙ্কিন্সের দল বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিল। তাই মোসারকে পাইয়া তাহারা যেন বর্তাইয়া গিয়াছে। এবং অর্থ-আহরণের উদ্দেশ্যেই জেঙ্কিন্স-কোম্পানি নবাবের সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য যখন এক, তখন সমবেত সম্মিলনেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নবাব কহিলেন, "তাহলে একখানা কাগজ আমায় এখনই আনিয়ে দিতে হবে যে। কি লিখেচে, জানবার জন্য আমি ভারি অস্থির হচ্ছি।"

মোসার কহিল, "ব্যস্ত হবেন না, নবাব বাহাদুর। কাগজ—আমার কাছেই আছে। আপনাকে দেখাবার জন্য একখানা কাগজ পকেটে করে আমিও এনেওচি। এই নিন।" বলিয়া মোসার একখণ্ড ভাঁজ-করা কাগজ নবাবের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল।

নবাব কাগজখানা টানিয়া লইলেন। নীল পেন্সিলে দাগ-দেওয়া একটা স্থান সহজেই তাঁহার নজরে পড়িল। তিনি নীরবে পড়িতে লাগিলেন। জেঙ্কিন্স কহিলেন, "না, না, চুপি চুপি পড়লে চলবে কেন! এঁরা সকলে জানতে পারবেন না যে। দিন আমায়—আমি চেঁচিয়ে পড়ি!"

কাগজখানা টানিয়া লইয়া জেঙ্কিন্স পড়িতে লাগিলেন। দুই কলম ধরিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য। "বেথলিহাম আতুরাশ্রম ও এম্ বার্ণার্ড জাঁসুলে।" তাহার পর ভাষার ছটায় মাতৃস্তন্যের নানাবিধ অপকারিতা ও অনুপযোগিতার উল্লেখ করিয়া ছাগদুগ্ধের অশেষপ্রকার কল্যাণকর গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এ-সমস্ত কথাই ডাক্তার জেঙ্কিন্সের কপোল-কল্পিত এবং ভাষায় যেটুকু আড়ম্বর ফলানো হইয়াছে, তাহাতেও জেঙ্কিন্সের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ! এই সকল কথার উল্লেখান্তে নাস্তেয়ারের জমি ও জল-বায়ুর বিশদ সুখ্যাতি এবং তাহারই অব্যবহিত পরে জেঙ্কিন্সের মস্তিষ্ক ও জাঁসুলের দান-মুক্ত হস্তের প্রতি প্রশংসা-বৃষ্টি হইয়াছিল! জাঁসুলেকে অসহায় রোগ-পীড়িত শীর্ণ শিশুর দেবোপম রক্ষক ও অভিভাবক বলিয়া সম্পাদক আপনার মন্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন।

সংবাদটুকু যখন মজলিসে পড়িয়া শুনানো হইতেছিল, শ্রোতৃবর্গের মন তখন বিরক্তি ও ঘৃণায় কতখানি পূর্ণ হইয়াছিল, মুগ্ধ জাঁসুলের তাহা লক্ষ্য করিবার অবসরই ছিল না। সকলেই ভাবিতেছিল, কি পাজী শয়তান এই, মোসারটা। যাউক, ব্যাপারটা কিন্তু খুব সে গুছাইয়া লইয়াছে! মিথ্যা চাটুবাণীতে কাগজের এই দীর্ঘ স্তম্ভ ভরাইয়া কে জানে সে আপনার তহবিল কতখানি পূর্ণ করিবে। তথাপি তহবিল যে রীতিমত ভারী হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। ঘৃণা ও ঈর্ষা-মিশ্রিত বক্রদৃষ্টিতে সকলেই মোসারের পানে চাহিয়া দেখিল।

কাগজ পাঠ শেষ হইলে নবাব অধীরভাবে কহিলেন, "আঃ! আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা বলতে পারি না! শুধু আনন্দই বা কেন—গর্ব্বও কি কম হচ্ছে।"

শুধু হুলের বিষ! অর্থশালী লোকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের কালিমা-লিপ্ত চরিত্রে যশের চুণকাম করাই তাহার কাজ। এই কারণেই মঁপার্ভ জেঙ্কিন্সের দলে অবাধ প্রবেশের অধিকার সে লাভ করিয়াছিল। জয়-দুন্দুভি বাজাইয়া আপনাদের পানে সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এমনই একজন সংবাদ-পত্র-পরিচালকের অভাব মঁপাভ-জেঙ্কিন্সের দল বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিল। তাই মোসারকে পাইয়া তাহারা যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছে। এবং অর্থ-আহরণের উদ্দেশ্যেই জেঙ্কিন্স-কোম্পানি নবাবের সহিত তাহার পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য যখন এক, তখন সমবেত সম্মিলনেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নবাব কহিলেন, "তাহলে একখানা কাগজ আমায় এখনই আনিয়ে দিতে হবে যে। কি লিখেচে, জানবার জন্য আমি ভারি অস্থির হচ্ছি।"

মোসার কহিল, "ব্যস্ত হবেন না, নবাব বাহাদুর। কাগজ—আমার কাছেই আছে। আপনাকে দেখাবার জন্য একখানা কাগজ পকেটে করে আমিও এনেওচি। এই নিন।" বলিয়া মোসার একখণ্ড ভাঁজ-করা কাগজ নবাবের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল।

নবাব কাগজখানা টানিয়া লইলেন। নীল পেন্সিলে দাগ-দেওয়া একটা স্থান সহজেই তাঁহার নজরে পড়িল। তিনি নীরবে পড়িতে লাগিলেন। জেঙ্কিন্স কহিলেন, "না, না, চুপি চুপি পড়লে চলবে কেন! এঁরা সকলে জানতে পারবেন না যে। দিন আমায়—আমি চেঁচিয়ে পড়ি!"

কাগজখানা টানিয়া লইয়া জেঙ্কিন্স পড়িতে লাগিলেন। দুই কলম ধরিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য। "বেথলিহাম আতুরাশ্রম ও এম্ বার্ণার্ড জাঁসুলে।" তাহার পর ভাষার ছটায় মাতৃস্তন্যের নানাবিধ অপকারিতা ও অনুপযোগিতার উল্লেখ করিয়া ছাগদুগ্ধের অশেষপ্রকার কল্যাণকর গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এ-সমস্ত কথাই ডাক্তার জেঙ্কিন্সের কপোল-কল্পিত এবং ভাষায় যেটুকু আড়ম্বর ফলানো হইয়াছে, তাহাতেও জেঙ্কিন্সের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ! এই সকল কথার উল্লেখান্তে নান্তেয়ারের জমি ও জল-বায়ুর বিশদ সুখ্যাতি এবং তাহারই অব্যবহিত পরে জেঙ্কিন্সের মস্তিষ্ক ও জাঁসুলের দান-মুক্ত হস্তের প্রতি প্রশংসা-বৃষ্টি হইয়াছিল! জাঁসুলেকে অসহায় রোগ-পীড়িত শীর্ণ শিশুর দেবোপম রক্ষক ও অভিভাবক বলিয়া সম্পাদক আপনার মন্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন।

সংবাদটুকু যখন মজলিসে পড়িয়া শুনানো হইতেছিল, শ্রোতৃবর্গের মন তখন বিরক্তি ও ঘৃণায় কতখানি পূর্ণ হইয়াছিল, মুগ্ধ জাঁসুলের তাহা লক্ষ্য করিবার অবসরই ছিল না। সকলেই ভাবিতেছিল, কি পাজী শয়তান এই, মোসারটা। যাউক, ব্যাপারটা কিন্তু খুব সে গুছাইয়া লইয়াছে! মিথ্যা চাটুবাণীতে কাগজের এই দীর্ঘ স্তম্ভ ভরাইয়া কে জানে সে আপনার তহবিল কতখানি পূর্ণ করিবে। তথাপি তহবিল যে রীতিমত ভারী হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। ঘৃণা ও ঈর্ষা-মিশ্রিত বক্রদৃষ্টিতে সকলেই মোসারের পানে চাহিয়া দেখিল।

কাগজ পাঠ শেষ হইলে নবাব অধীরভাবে কহিলেন, "আঃ! আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা বলতে পারি না! শুধু আনন্দই বা কেন—গর্ব্বও কি কম হচ্ছে!"

জাঁস্থলে আজ দেড়মাসমাত্র পারি সহরে আসিয়াছেন। দুই-চারিজন পুরাতন সঙ্গী ব্যতিরেকে আজ যে সকল বন্ধুর বন্ধুত্ব গর্ব্বে আপনাকে তিনি সমধিক গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন, পারির মাটীতে পা দিবার পূর্ব্বক্ষণে তাঁহাদের কাহারও সহিত জাঁস্থলের এতটুকুও জানা-শুনা ছিল না! কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়! সূর্য্যোদয় হইলে জগতের লোককে যেমন সে সংবাদটুকু বলিয়া দিতে হয় না, সূর্য্যকে দেখিয়া আলোক ও উত্তাপ লাভ করিবার জন্য সকলেই আঁধার ছাড়িয়া গৃহ-কোটরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, তেমনই এই নবাবের অজস্র ঐশ্বর্য্য-রশ্মির ছটায় পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ পুলকিত চিত্তে সে ঐশ্বর্য্য-রশ্মির সংস্পর্শ-লাভের জন্য এক নিমেষে নবাবের চতুর্দ্দিকে আসিয়া সমবেত হইল। টাকার মোহিনী শক্তি আছে! টাকা ধার দিয়া অচিরেই নবাব বন্ধু-সংগ্রহে সক্ষম হইলেন।

নবাব বলিলেন, "কাগজে যা ছাপা হয়েছে, তা ত দেখলুম। কিন্তু এর উপর যখন দেখি, পারির বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লোকেরা আজ আমার বন্ধু, তখন আমার পুরানো দিনের কথা সব মনে পড়ে। আমার বুড়ো বাপের কথা, তাঁর সেই ছোট দোকানখানির কথা মনে পড়ে। আমার বাবা ঘোড়ার ক্ষুর বিক্রী করতেন। আপনারা চমকাবেন না। সত্যই তাই। এক অজ পাড়াগাঁয় চটির ধারে আমার বাপের ছোট্ট দোকান ছিল। রোজগার-পাতিও এত কম ছিল যে পেটে দিতে একখানা আস্ত রুটিও কোন দিন আমার ভাগ্যে জোটেনি। বিশ্বাস না হয়, আপনারা এই কাবাস্থকে বরং জিজ্ঞাসা করুন। কাবাস্থ পুরানো লোক, ও সব জানে। সে যে কি দিন ছিল—!" নবাব ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ রহিলেন। পরে অন্ধকার অতীতের পার্শ্বে এই আলোকোজ্জ্বল বর্ত্তমানের কথাও তাঁহার মনে পড়িয়া গেল! ঈষৎ গর্ব্বে বুকখানাও ফুলিয়া উঠিল। নবাব আবার কহিলেন, "কাল কি খাব, আজ তার সংস্থান থাকত না! খিদের জ্বালায় দিন-রাত জলতুম! না খেয়ে কতদিন বিছানায় পড়েই কাটিয়ে দিছি। শীতকালে বেরুতে পারতুম না। গায়ে দেবার মোটা জামা একটা ছিল না। তার পর বাপ মারা গেলেন —বুড়ো মাকে নিয়ে বিপদের সাগরে ভাসলুম। এ রকমে দিন কাটানো যায় না—কখনও না—শেষে একদিন শেষ-রাত্রে পালালুম। তখন আমার বয়স ত্রিশ বৎসর। এখনও পঞ্চাশ বৎসর পার হইনি—সেই ত্রিশ বৎসর বয়সে ভিখিরির অধম ছিলুম—একটা কড়িও সম্বল ছিল না—কি সে অসহ্য কষ্ট!"

শ্রোতার দল অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কেন এ অতীতের ধূলি-জঞ্জাল টানিয়া বাহির করা! বিশেষ এই বিলাসের মধ্যে, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে! দারিদ্র্যের এ ভয়ঙ্কর কঙ্কালসার মূর্ত্তিখানা দেখিবার জন্য ত তাহারা দিব্যবেশে সাজিয়া আজ এখানে আসে নাই! দৈন্যের এ কদর্য্য কুৎসিত মূর্ত্তিখানা বাহির করিয়া আনিয়া সজ্জিত সভায় দারুণ বীভৎসতা সৃষ্টি করিবার অধিকারও কাহারও নাই। নবাবেরও না। তবুও সেকথা সাহস করিয়া কে বলিবে? নেটের পর্দ্দা ঝালর-মণ্ডিত সভাগৃহে নবাবের কবেকার সেই ছিন্ন দীন বস্ত্রখণ্ড অবাধে ঝুলিতে লাগিল। অগাধ টাকার মালিক—তাহার উচ্ছ্বসিত ভাব-স্রোতে বাধা দিতে যাওয়া মূঢ়তা! অসহ্য

বোধ হইলেও তাহা শুনিতে হইবে! নহিলে আদব দুরস্ত থাকে না! তাই সকলে আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে কোনমতে আপনাদিগকে অচপল রাখিলেন।

নবাব বলিতে লাগিলেন, "মার্শেলের বন্দরে ঘুরে ঘুরে কত দিন কাটিয়ে দিলুম। এক দোকানির দয়া ছিল, সে ডেকে দু'চার দিন পোড়া রুটি খেতে দিয়েছে। কি করব, কি হবে, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছিলুম না। এমন সময় এক সঙ্গী জুটল। সঙ্গী বটে—কিন্তু আজ সে আমার পরম শত্রু। তার নাম করলে এখনই তাকে আপনারা চিন্‌তে পার্‌বেন। আজ তার মস্ত নাম, কিন্তু সে ভণ্ড—নিরেট ভণ্ড। তার নাম হেমার-লিঙ। ঐ যে হেমারলিঙ্‌ এণ্ড সনের প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ক, তারই মালিক বড় হেমার-লিঙ্‌। আজ সেও অনেক পয়সা করেছে, কিন্তু তার সেদিনকার দশা আমারই মত ছিল। সে-ও ভাগ্য-পরীক্ষায় বেরিয়েছে। দুজনে ভারী মিশ খেয়ে গেলুম। শেষে পরামর্শ করলুম, দুজনেই বিদেশে যাব। কিন্তু যাই কোথায়? কাগজে কতকগুলো দেশের নাম লিখে লটারি কর্‌লুম। একটা কাগজ উঠল, 'টিউনিস।' ব্যস্‌ আর কথা নেই, বার্ত্তা নেই, একদম টিউনিসে রওনা হলুম। কোনমতে জাহাজে জায়গা করে নিলুম। যেদিন বেরুলুম, হাতে সে দিন একটাও পয়সা ছিল না, কিন্তু ফিরলুম পঁচিশ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে।"

ঘরশুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল। পঁচিশ লক্ষ টাকা! আরব্য উপন্যাসের কাহিনী যে। কার্দেলাক বলিয়া উঠিল, "অদ্ভুত!" মঁপাভঁ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবাব কহিলেন, "হাঁ, সাহেব, পঁচিশ লক্ষ নগদ। তা ছাড়া টিউনিসে আমার দেদার টাকা ছড়ানো আছে! গোলেতার বন্দরে খানকতক জাহাজ আছে, তা-ছাড়া মণি মুক্তো হীরে এ-সবের ত কথাই নেই। এ পঁচিশ লক্ষ যদি আজ হঠাৎ উড়ে যায় ত কালই আবার পঁচিশ লক্ষ আমার হাতে মজুত দেখবেন!"

শুনিয়া সকলে যেন জ্বলিয়া উঠিল। এই বর্ব্বরের এত অর্থ! মনের ভাব গোপন রহিয়া গেল। চারিধারে কলরব উঠিল, "অদ্ভুত!"

"চমৎকার!"

"খাসা!"

"এতক্ষণ যেন আরব্য উপন্যাসের গল্প শুনছিলুম!"

জেঙ্কিন্স কহিলেন, "এই লোকেরই ডেপুটি কাউন্সিলর হওয়া উচিত।"

পাগানেতি কহিলেন, "আমি বলছি একদিন হবেনও নিশ্চয়।" সকলেই সসম্ভ্রমে নবাবের করমর্দ্দন করিলেন।

উত্তেজনাটা কিছু কমিলে নবাব কহিলেন, "একটু কফির ফরমাস করা যাক—কি বলেন?"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়!"

কফি আসিল। নিমেষেই পাত্রগুলা নিঃশেষ হইল। জেঙ্কিন্স কহিলেন, "তাহলে নবাব বাহাদুর, আজ ওঠা যাক। ইতিমধ্যে আমি একবার আতুরাশ্রমের প্ল্যানখানা আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব। আপনি শেষ একবার না দেখে দিলে আমি ত কিছু ঠিক করতে পাচ্ছি না। কোথাও যদি কিছু বদলাতে চান ত বদ্‌লাবেন।"

প্রসন্নভাবে নবাব কহিলেন, "বেশ!"

জেঙ্কিন্স কহিলেন, "এ হপ্তায় ওদের টাকাও কিছু দিতে হবে। ওঃ, কাজ যা হচ্ছে, কি বলব! আপনি একবার চলুন, দেখে আসবেন—কেমন হচ্ছে সব।"

নবাব সে কথা কাণে না তুলিয়াই কহিলেন, "কত টাকা চাই? আজই নিন না।"

"আপাততঃ হাজার পনেরো হলেই চলবে!"

"মোটে হাজার পনেরো!" বলিয়া নবাব জনৈক ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্য চেক্-বহি লইয়া আসিল। নবাব চেক কাটিলেন, "ডাক্তার জেঙ্কিন্স—পনেরো হাজার টাকা—" তাহার পর নবাব মার্কুইসের পানে চাহিয়া কহিলেন, "ডেপুটি হতে কত খরচ পড়তে পারে?"

মার্কুইস কহিলেন, "কত আর—এক লাখ—?" বলিয়া মার্কুইস পাগানেত্তির পানে চাহিলেন। পাগানেত্তি সে চাহনির অর্থ বুঝিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এক লাখ! কর্সিকার ডেপুটি কাউন্সিলর। তা হবে—হাঁ হবে বৈ কি! আমি বলছি নবাব বাহাদুর, এবার সমস্ত কর্সিকা দেশটাকে আপনার পায়ের তলায় ফেলে দেব। দেখে নেবেন, আমার কথার নড়চড় হয় না!"

নবাব কহিলেন, "আপনাদের অনুগ্রহ! তাহলে টাকাটা আপনার নামে আজই কেটে ফেলি। ও আর দেরি করা কেন?"

আবার চেক-বহিতে কালীর আঁচড় পড়িল। এক লাখ টাকা! চেক কাটিয়া নবাব মোসারের পানে চাহিলেন, কহিলেন, "ও কাগজের কলম দুটোর জন্য আমার ধন্যবাদ জানবেন। কাগজটার ফণ্ডে আমি কিছু

মোসের কহিলেন, "আপনার দয়াতেই ত কাগজখানা টি'কে আছে, নবাব বাহাদুর, আপনিই ত এর পেট্রন। এর জন্য আবার আমায় কিছু দিতে চাইছেন কেন? এ ত আপনারই কাগজ! তা দিতে চান দিন, আপনার কথার উপর আবার আমার কথা কি! আর আপনার এ ছিটে ফোঁটা কিন্তু মেসেঞ্জারের পক্ষে পাহাড়ের সমান।"

আবার চেক কাটা হইল। দশ হাজার!

তাহার পর আরও দুই-চারিটা সদ্ব্যয়ের বন্দোবস্ত হইলে অভ্যাগতের দল বিদায় লইলেন। নির্জ্জন কক্ষে জানালার ধারে বসিয়া নবাব তখন আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি স্পষ্ট শুনিলেন, পারি সহরের বুক চিরিয়া যেন একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিয়াছে। সে ধ্বনি যেন তাঁহারই বিজয় সঙ্গীত! কি সে মধুর, প্রাণারাম! তিনি দেখিলেন, পারি নগরী স্বয়ং আসিয়া দুই কোমল ভুজ বাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে সাদরে বক্ষে ডাকিতেছে।

সহসা একজন ভৃত্য আসিয়া অভিবাদন করিয়া নবাবের হাতে একখানি কার্ড দিল। কার্ডের সঙ্গে একখানি পত্র। খামের উপর নারী-হস্ত-লিখিত অক্ষর দেখিয়া নবাব কহিলেন, "এ যে আমার মার চিঠি,—কে আনলে?"

ভৃত্য জানাইল, পত্রবাহক এক তরুণ যুবা, বাহিরে নবাবের আদেশ-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।

নবাব কহিলেন, "যাও, তাঁকে এখানে নিয়ে এস।"

ভৃত্য চলিয়া গেলে নবাব পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

বোধ হয় এম স্তে গেরিকে মনে আছে। আমাদেরই এই বুর্জ স্যাতে দোঁলে এঁদের বাড়ী। এক-কালে এঁদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। এখন নানা বিপদ-আপদে তাঁরা গরিব হয়ে পড়েছেন। গেরি সাহেব মারা গেছেন। তোমার কাছে যিনি চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন, ইনি তাঁর বড় ছেলে। ছেলেটির ঘাড়েই এখন সংসার পড়েছে। সে ঠিক করেছিল, উকিল হবে,কিন্তু এ অবস্থায় পড়াশুনার জন্য ছেলেটির আর এক দিন বসে থাকা চলে না। এঁরা মানুষ বড় চমৎকার। এই ছেলেটির যদি কোন উপায় করে দিতে পার ত এরা প্রাণ পায়। চেষ্টা করে একটা উপায় তোমার করে দেওয়া চাইই। আমি এদের বড় মুখ করে কথা দিয়েছি—দেখো বাবা—এদের সংসার যাতে চলে, তার একটা কিনারা তুমি করে দিও। তুমি কেমন আছ? অনেক দিন তোমায় দেখিনি—" ইত্যাদি—

মা! মা! জাঁস্থলের সেই চিরস্নেহময়ী মা! পারির এই বিলাস-বিভবের মধ্যে পড়িয়া দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটিয়া জাঁস্থলে মাকে হারাইয়া বসিয়াছে—মার কথা এক দিনের জন্যও ত মনে পড়ে নাই। ছার ঐশ্বর্য্য! ছার সম্মান! বিস্তর অনুরোধেও মা তাঁহার সেই পল্লীর নিভৃত বিজন কোণটুকু ছাড়িয়া আসিতে রাজী হন নাই। আজ ছয় বৎসর মার সঙ্গে দেখা নাই। দীর্ঘ ছয় বৎসর! আজ যেন নূতন করিয়াই জাঁস্থলে সুমধুর মাতৃস্নেহ-স্পর্শ লাভ করিলেন।

মুখ তুলিয়া জাঁস্থলে দেখিলেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক তরুণ যুবা। সুন্দর সুশ্রী মুখে স্বাভাবিক দীপ্তিটুকু একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। দিব্য দীপ্ত চক্ষু! জাঁস্থলে বলিলেন, "তুমিই মার চিঠি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?"

যুবা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।" সেই ক্ষুদ্র কথাটির মধ্যে আর্ত্তের আশ্রয়-প্রার্থনার ব্যাকুল সুর ফুটিয়া বাহির হইল। জাঁস্থলে যুবার পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তোমার বাবার নাম আমার খুবই মনে আছে। তাঁর কাছ থেকে একদিন অনেক পরামর্শ, অনেক সাহায্য পেয়েছি। তা থাক, তুমি আমার কাছে যখন এসেছ, তখন যতটুকু আমার সাধ্য, তোমার আমি ভালো করব! তুমি আমার সঙ্গে এখানেই থাকো—অন্য কোনখানে পয়সার সন্ধানে তোমায় যেতে হবে না। তুমি লেখা-পড়া শিখেছ—সুতরাং আমার অনেক উপকার করতে পারবে। আমিও তোমারই মত একজন লোক খুঁজছিলুম,—যার উপর আমি বিশ্বাস রাখতে পারি, সকল বিষয়ে যার পরামর্শ নিতে পারি, এমন লোক! তোমার মুখ দেখেই আমার মনে হচ্ছে, তুমি সেই লোক। আমার সঙ্গে মিশ খাবে! আমার মাথায় অনেক মতলব আছে, অনেক কাজ আমি করতে চাই। সেই সব কাজ করতে তুমিই আমার ডান হাত হবে। আমার প্রকৃত বন্ধু হবে তুমি। অর্থাৎ আমার একজন সেক্রেটারির দরকার। যে সব পুরানো লোক আছে, তাদের মাথায় এত কাজ এত মতলব ঢোকে না। তুমিই ঠিক লোক। এই পারি সহরে তুমি আমায় চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে। কেমন, বুঝলে! পারবে ত?

ঠাঁই করে দাঁড়িয়েছি, আমার সঙ্গে থাকো, তুমিও ঠিক এমনি-করে আমারই মত দাঁড়াতে পারবে। আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব।"

আনন্দের অধীরতায় গেরির বুক কাঁপিতে ছিল। একেবারে এতখানি!

নবাব কহিলেন, "কেমন, রাজি ত? তুমি আমার সেক্রেটারি হবে! একটা বাঁধা বন্দোবস্ত তোমার জন্য করে দেব—কথাবার্ত্তা কয়ে এখনই সেটা ঠিক করে ফেলছি! আমি তোমায় যে সুযোগ দিচ্ছি, তার সদ্ব্যবহার করলে কালে তুমি ক্রোড়পতি হবে,—"

অনিশ্চয়তার সকল দুর্ভাবনা গেরির মন হইতে দূর হইয়া গেল। নবাবের প্রতি শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে হৃদয় তাহার লুটাইয়া পড়িল, কৃতজ্ঞতার চোখে তাহার জল আসিল। সে নির্ব্বাক্ নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

গেরির হাত ধরিয়া নবাব একটা কৌচে তাহাকে বসাইলেন, পরে নিজেও তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, "এখন কিছু খাবার আনতে বলে দি—তুমি বসে বসে খাও আর আমার মার কথা বল, শুনি—আমার মার কথা!" (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভিটের মাটি

১

দীঘির পাড়ের বাঁশের ঝাড়ে
পড়ো' বাড়ী পড়্ছে খসে',
বাদুড় চেঁচায় দেখ্ছে পেঁচা
ভাঙ্গা নীড়ে ধীরে বসে'।
স্বচ্ছ গভীর জলে রবির
দ্বিপ্রহরের কিরণ পড়ে,
ললাট ভাগের চিন্তা দাগের
মতন, কাটা রেখার পরে।
আজ্‌ও জলে দীঘির জলে
তেম্‌নি বরণ সূর্য্য-করে;
হীরার কুচির দীপ্তি রুচির
উঠ্‌ছে ফুটে রেখার স্তরে।
বাঁশের ছায়ে জলের গায়ে
বাতাস লুটায় শ্বাসের চাপে;
স্বচ্ছ শীতল দীঘির দ্বিতল
তলায় তলায় আকাশ কাঁপে।

২

সঙ্গোপনে বাঁশের বনে
দীঘির তটে ওগো বিধি!
পড়ো' বাড়ীর ধূলা ঝাড়ি
খুঁজি লুপ্ত সুখের নিধি।
সৌর করে জলের পরে
উঠ্‌ছে ফুটে উজল স্মৃতি;
দীঘির তলায় গলায় গলায়
ঐ যে ঘুমায় প্রাচীন প্রীতি।
দাগে দাগে চিন্তা জাগে
রেখার গায়ে রেখার প্রকাশ;
জলের মাঝে শুয়ে আছে
আমার ছায়া আমার আকাশ।
আমার বক্ষের কক্ষে কক্ষে
ভাঙ্গা ঘরের আঁধার জড়ায়;
বাঁশের ঝাড়ে প্রাণের পাড়ে
মায়ায়-রচা ছায়া গড়ায়।



বর্ণাশ্রমে বর্ণপরিচয়

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

চিত্রে ছন্দ ও রস

'ইতি চিত্রম্ ষড়ঙ্গকম্!'

ছয়টি সুশিক্ষিত ঘোড়ার মত ষড়ঙ্গ যাহাকে রথের ন্যায় আমাদের সম্মুখে বহন করিয়া চলিয়াছে সেই চিত্র কি? তাহার নির্ম্মাতা কে এবং সেই চিত্র বিচিত্র রথের অধিষ্ঠাতাই বা কোন্ দেবতা?

প্রথমেই দেখা যাক্ চিত্র কাহাকে বলি। যাহাতে রূপের ভেদাভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ এই ছয়টি বর্ত্তমান তাহাই চিত্র যদি এই কথা বল তবে আমার ঘরের মেঝেতে পাতা এই বিলাতি গালিচা-খানিকেও চিত্র বলিতে হয়; কেননা ইহাতেও নানা ফুলফলের রূপভেদ, গালিচাখানির চতুষ্কোণ মানপ্রমাণ, গালিচায় লিখিত এক এক ফুলের ও ফলের ভাব ও লাবণ্য, ঠিক টাটকা ফুলের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য এবং যাহার যে বর্ণটি তাহা পুরামাত্রাতেই দেখা যাইতেছে। যদি বল যে গালিচা দেওয়ালে খাটানো চলে না,—পুস্তকেও দেওয়া চলে না সুতরাং তাহা চিত্র নয়। কিন্তু আমি যদি চমৎকার সূক্ষ্ম করিয়া বুনিয়া একখানি গালিচা দেওয়ালে খাটাই অথবা পুস্তকে দিই, তখন কি হইবে তাহা চিত্র? দেওয়ালে খাটাইলেই, পুস্তকে দিলেই চিত্র হয় না। তুলির দ্বারা যাহা চিত্রিত হয় তাহাই চিত্র। কিন্তু তুলির দ্বারা লাঠিমটি চিত্রিত হইয়াছে, তুলির দ্বারা ঘরখানি নানা বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে তবে এগুলিকে কি বলিবে চিত্র? সুতরাং দেখ যাহাই তুলি দিয়া চিত্রিত হয়—মৃত্তিকা কিম্বা কাষ্ঠ কিম্বা একখণ্ড বস্ত্র—তাহাই চিত্র নয়; কিম্বা বাহ্য বস্তুর নকল যেমন ফটোগ্রাফ বা এই বিলাতি গালিচা ইহাও চিত্র নয়।

অভিধান লিখিলেন 'চীয়তে ইতি চিত্রম্'। চিত্রকর চয়ন করেন সত্য;—বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ উভয়ের ভাব চয়ন করেন, লাবণ্য চয়ন করেন, রূপ প্রমাণ সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ চয়ন করেন। কিন্তু এই চয়ন কার্য্য কিম্বা এই চয়নের সমষ্টিকেও তো চিত্র বলিতে পার না; —ফুল বাছিয়া সাজি ভরান মালীর বাহাদুরি কিন্তু সেই বাহাদুরিটুকু তো চিত্রের সব নয়। পাঁচটা সংগ্রহ একত্র করিয়া প্রকাশ করিলে এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ প্রস্তুত হয়, চিত্র তো হয় না! কাজেই বলিতে হইতেছে যে চিত্রকরের চয়নের স্বাভাবিক পরিণতি যে চিত্ত-হরণ অকৃত্রিম ষড়ঙ্গমালা তাহাই চিত্র।

বাহিরে বিশ্বজগৎ, রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে ছায়াতপে আলোআঁধারে পাঁচ-ফুলের মালঞ্চের মত প্রকাশ পাইতেছে, অন্তরে পদ্মসরোবর, সুখ-দুঃখ আনন্দ-অবসাদ ভাব-ভক্তির সুরে লয়ে লহরীতে ভরপুর রহিয়াছে; চিত্রকর এতদুভয়ের মধ্যে যাতায়াত করিয়া পুষ্প চয়ন করিতেছেন ও মনন্-সূত্র দিয়া অপূর্ব্ব হার গাঁথিতেছেন এবং সেই হারে সাজাইয়া পুষ্পক-রথ নির্ম্মাণ করিতেছেন। কিন্তু কাহাকে বহন করিবার জন্য, কোন দেবতাকে মালা পরাইয়া এই রথে অধিষ্ঠিত করিয়া

আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া দিবার জন্য? আমি বলি আত্ম-দেবতাকে;—চিত্রকরের নিজের আত্মাকে। এই আত্মা যদি পটে চিত্রিত বা অধিষ্ঠিত রহেন তবে তাহাই চিত্র,—যদি গালিচায় অধিষ্ঠিত হয়েন তবে তাহাই চিত্র,—যদি গৃহভিত্তিতে অথবা যদি গ্রন্থের কাগজে অধিষ্ঠিত হয়েন তবে তাহাও চিত্র।

আত্মা আত্মীয়তার জন্য ব্যাকুল;—চারিদিকের আত্মীয়তার ভিতর আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার ভিতরে বিপুল একটা প্রকাশ-বেদনা উদয় হইয়া নিয়ত কার্য্য করিতেছে। এই প্রকাশ-বেদনের—এই উদয়ের অভিব্যক্তিই হচ্ছে চিত্র। এই উদয়ের রং, এই বেদনের শোণিমা যখন আসিয়া সাদা কাগজকে রাঙাইতেছে;—তাহাকে রূপ দিতেছে, প্রমাণ দিতেছে, ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ দিতেছে, তখনই হইতেছে চিত্র। সূর্য্য উদয় হইতেছেন কোন অন্ধকারের অন্তরালে তাহা কে জানে? আমরা তখনি তাঁহাকে দেখি যখন উদয়ের রশ্মিজালে আকাশপটকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে,—যখন সূর্য্যোদয়, জলস্থল অন্তরীক্ষের বিচিত্র রূপ, প্রমাণভাবলাবণ্যাদিকে সোনার এক জাগ্রৎ স্বপ্নে উদ্বোধিত করিয়া আপনার উদ্বোধন আমাদের জানাইতেছে। সুতরাং দেখিতেছি চিত্র যাহা তাহার গোড়াতে হচ্ছে গোপন একটি উদয়-উৎস যাহার ভিতরে প্রকাশ-বেদন আছে; আর শেষ একটি অনির্ব্বচনীয় রসোদয় যেখানে হচ্ছে চিত্রের পরিণতি। এবং এই দুই উদয়ের মধ্যে আছে রূপ ভাব লাবণ্য ইত্যাদির ছন্দ ছাঁদ ছাঁচ বা আচ্ছাদন। চিত্র হয় তখন যখন চিত্রকরের অন্তর্নিহিত উদয়-বাসনা বা প্রকাশ-বেদনা ছন্দের নিয়মে আপনাকে বাঁধিয়া অন্তর্বাহ্য দুই রূপে নিজেকে সঙ্গত করিয়া রসোদয়ে পরিণত হয়। শব্দচিত্র, সঙ্গীত, বাচ্য-চিত্র, কবিতা, দৃশ্যচিত্র, পট ও মূর্ত্তি ইত্যাদি কেহই সৃষ্টির এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ না করিয়া প্রকাশ পাইতেই পারে না। যদি কিছু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া উদয় হয় তাহাকে বলিবনা সঙ্গীত, কবিতা কিম্বা চিত্র;—তাহাকে পাগলের খেয়াল, মাতালের প্রলাপ বলিতে পারি। পাগলের এবং মাতালের অন্তরের উৎকট প্রকাশ-বেদনা, উদয়-বাসনা কিছুতেই আপনাকে ছন্দে বাঁধিতে পারিতেছে না;—ছন্দের আবরণ ও আচ্ছাদন সে দূরে ফেলিয়া উলঙ্গ হইয়া দেখা দিতেছে; কাজেই বেদনাতেই তাহার পরিসমাপ্তি রসোদয়ের আনন্দে নয়।

চিত্র প্রথমোদয়ে বা প্রকাশ-বেদনের অবস্থায় অরূপ বা অব্যক্তরাগ শব্দরহিত; উদয়ের দ্বিতীয় অবস্থায় সে প্রনূন,—ছন্দের মধ্যে সংপ্রেষিত প্রচলিত বা কল্পিত; আর উদয়ের তৃতীয় অবস্থায় সে অনূন, অখণ্ড সমগ্র অর্থাৎ রূপে প্রমাণে ভাবে লাবণ্যে সাদৃশ্যে বর্ণিকাভঙ্গে পরিপূর্ণ সূর্য্যের ন্যায় অখণ্ডমণ্ডলাকারে উদিত।

এখন দেখা যাইতেছে চিত্রের প্রথমোদয় এবং পূর্ণোদয়ের ঠিক মর্ম্মস্থানটিতে আছেন ছন্দ—ঊষার ন্যায় দীপ্তিমতী, শোভার জন্য জলোর্ম্মির ন্যায় উত্থিতা—সমস্ত স্থান সুপথ বিশিষ্ট ও সুখে গমনযোগ্য করিয়া। চিত্রকরের মনের প্রকাশ-বেদন এবং চিত্রের প্রকাশ ইহারই মাঝখানটিতে ঊষার আনন্দ কাকলীর মত ছন্দ; এইজন্য ছন্দকে বলা হইয়াছে

'চন্দয়তি ইতি ছন্দ'। কেননা ইনি আনন্দিত করেন। ইনি উদয়ের উন্মেষ এবং উদয়ের শেষ এই দুয়ের শুভদৃষ্টির উপরে প্রচ্ছদ-পটখানির মত দোদুল্যমান; সেই জন্য বলা হইয়াছে 'আচ্ছাদয়তি ইতি ছন্দ'। উহার ভিতরে যেমন উদয়ের অভিপ্রায় নিহিত রহে, তেমনি ছন্দের ভিতর দিয়া চিত্রকরের মনোভি-প্রায় আপনাকে ব্যক্ত করে; সেই জন্য ছন্দকেই বলা হয় 'অভিপ্রায়'। এখন দেখিতেছি, ছন্দ সে আনন্দকারী, ছন্দ, সে আচ্ছাদনকারী। ছন্দ অভিপ্রায়, ছন্দ অভিপ্রায়কে বহিত করিবার সুপথ, ছন্দ নদীজলে তরঙ্গমালার শোভা। "ছন্দস্ত নানা বিধম্।" ছন্দ বহুবিধ; —রূপের প্রমাণের ভাবের লাবণ্যের সাদৃশ্যের বর্ণিকাভঙ্গের ছন্দ। ছন্দ—ছাঁদ্ বা ছাঁচ। ছন্দ—ছাঁদিয়া বাঁধা বা বাঁধা ছাঁদা। ছন্দ কিসে নাই? কোথায় নাই? ছন্দ ছেঁদো কথায়, ছন্দ ছাঁদ্‌না তলায়, ছন্দ নববধূটির তাড় ও কঙ্কণের রিণিঝিণির মাঝখানে, ছন্দ সমুদ্র ও চন্দ্রের পূর্ণ মিলনে, ছন্দ দিনমণির বিরহে, কমলিনীর ম্লানমুখে, ছন্দ আহ্লাদে, বিষাদে, শুষ্কতায়, পূর্ণতায়; ছন্দ হাসিকান্নাভরা থরা পূর্ণিমা অমাবস্যা,—শীতে বসন্তে জগৎ জুড়িয়া উঠিতেছে পড়িতেছে; ছন্দ আমাদের নিজের নিজের মনে; ছন্দ বাহিরে বিশ্ব জগতে এককে অনেকে, অনেককে একে মিলাইয়া—

তুম হম দো তুম্ব বীচ সুর।
বাজে তাজা তাজা,
উজ্জর কবহি কাজর কবহি
রঙ্গ রঙ্গ নিত বাজা।

অন্তর এবং বাহির এই দুই তন্ত্রির মাঝে

অসীম বিরহ, অনন্ত মিলন নূতন নূতন ছাঁদে বাঁধা পড়িয়া, বর্ণ গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইত্যাদির বৈচিত্র্যে যেন আলো-ছায়ার রূপ ধরিয়া ঝঙ্কৃত হইতেছে, তরঙ্গায়িত হইতেছে! এই তরঙ্গ এই ঝঙ্কৃতিই হয় ছন্দ। এবং কবি ও চিত্রকার এই তরঙ্গিত ঝঙ্কৃত রেখা ও লেখার বর্ণ-মালার বরমাল্যে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রূপে রস, রসে রূপ সম্প্রদান করেন। অন্তর বাহিরের দিকে এবং বাহির অন্তরের দিকে হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিতেছে;—এই দুই হাত যেখানে আসিয়া বাঁধা পড়িতেছে সেইখানেই রহিয়াছে। ছন্দ-মালাটি দোদুল্য-মান। এক সুর প্রাণের কূল হইতে অকূলের দিকে ছুটিয়াছে, আর-এক সুর কোন্ অকূল হইতে প্রাণের কূলে আসিতে চাহিতেছে;—এই দুই কূলের দুই সুরের আকুলি-ব্যাকুলি যেখানে আসিয়া মিলিতেছে সেইখানেই দেখি ছন্দের শুভ্র তরঙ্গমালা রূপ ধরিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, গড়াইয়া পড়িতেছে। অন্তর হইতে পিচকারি ছুটিয়া বাহিরকে রাঙাইতেছে, বাহির হইতে পিচকারি আসিয়া অন্তরকে রাঙাইতেছে;—এই ছুটিয়া-বাহির-হওয়া ও ছুটিয়া-ভিতরে-আসার মধ্যে যে দোল, দোলা বা দোললীলা তাহাকেই বলি ছন্দ।

আমরা যে লোকে বাস করিতেছি তাহাকে বলা হয় ব্রহ্মলোক। এখানকার যাহা কিছু সকলি ছায়াতপ দিয়া আমাদের গোচরে আসে। 'ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে'। সুতরাং ছন্দটিও দেখি ছাঁদ এবং বাঁধ এই ছায়াতপে আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। ছন্দের ছায়ার দিকটি যেন বধূ;—অনেকটাই অবগুণ্ঠনে ঢাকা; আর আতপের দিকটি যেন

বর—গোপনতার লেশমাত্র তাহাতে নাই। ছন্দের এই ছায়াতপের যুগল মিলন ও সমস্ত রহস্যটির চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত আমরা ঘরে ঘরে ছাঁদনা তলায় বর-বধূকে ছাঁদিয়া বাঁধার আগুন্ত ব্যাপারটির মধ্যে পাইয়া থাকি। ছাঁদনা তলা—আচ্ছাদন তলা বা ছন্দস্থলীতে যে ব্যাপারটা ঘটে তাহাকে বলা হয় ছাঁদনী নাড়া—ছন্দনী শক্তিকে নাড়া দিয়া জাগাইয়া তোলা বা ছন্দের নাড়া (মঙ্গল সূত্র) বাঁধা।

এই ছাঁদনা তলা বা ছন্দস্থলী পাতা হয় বাড়ীর উঠানে গৃহস্থালীর সাত-মহলের সাত ছন্দের যেন প্রাচীর ঘেরিয়া। আর মাথার উপরে থাকে একবারে খোলা আকাশের চন্দ্রাতপ—লক্ষ কোটী গ্রহ-উপগ্রহের বিরাট ছন্দে দোদুল্যমান; পায়ের নীচে রহে সমস্ত উঠান জুড়িয়া রেখা ও বর্ণের ছন্দে বাঁধা পদ্ম ও ভ্রমরের, নয়তো রাজহংস মৃণালের, চক্রবাকচক্রবাকীর মিলন-বিরহের ছন্দ-কল্পনাটি।

এই ছন্দ বন্ধন ব্যাপারের সমস্তটুকু যাঁহারা পরিণীতা এমন রমণীদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহ হওয়া বিধেয়—কুমারী কিম্বা বিধবা যাঁহার জীবন-ছন্দ অন্য একটি জীবন-ছন্দে গিয়া এখনও মিলিত হয় নাই বা মিলিয়া আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে এরূপ কাহাকেও এই ব্যাপারে যোগ দিতে দেওয়া হয় না।

প্রথমেই বর বা ছন্দের আতপের দিকটিকে সভায় আনিবার পথে ধুতুরার বা নবরসের নেশার, নয় তো সাত বর্ণের বা সাত সুরের ত্রিসপ্তকের সংখ্যানুসারে নয়, সাত, কিম্বা একুশ প্রদীপ কুলায় সাজাইয়া বরের মাথার উপর দিয়া লাজাঞ্জলি বা পুষ্পবৃষ্টির মত নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর বরকে ছাঁদন তলায় রাখিয়া রমণীগণ অপরিণত নবাগত ছন্দটির অন্তর বাহির দুই ছাঁদেরই মাপটুকু গ্রহণ করেন,—প্রথমে একটি সরল বেণুযষ্টি দিয়া ছন্দটির হ্রস্ব দীর্ঘ প্রমাণ, তৎপরে নিমুখ লতা যাহার কাঁটা নাই ও যাহার পাতার মুখ সূচ্যগ্র ও তীক্ষ্ণ নয় এমন একটি লতাবল্লরী দিয়া ছন্দের ভঙ্গিটুকু, ও পরিশেষে এক-গাছি রঞ্জিত মানসূত্র দিয়া ছন্দের অন্তরের রং ও গভীরতা—জলে যেন রশি ফেলিয়া—দেখিয়া লওয়া হয়। অন্তরের এই মানসূত্র যিনি রঞ্জিত করেন তিনিও সধবা বা পরিণীতা ছন্দ। তারপর যেন বর্গের পাঁচ পাঁচ অক্ষরকেই ছন্দটির সহিত একত্র গাঁথিয়া পাঁচ পান, পাঁচ ফল, পাঁচখানি আল্‌তা ইত্যাদি দিয়া লতা এবং রক্তসূত্র—যেন প্রমাণ লাবণ্য এবং ভাব দিয়াই ছন্দের বন্ধন করা—বরের হাত বাঁধা হয়। ইহার পরে সমস্ত ছন্দটিকে যেন সুশীতল মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশেই দুই রমণীতে—স্বামী সোহাগিনী বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি আছে এমন দুই রমণীতে—মিষ্টান্ন মুখে দিয়া বা মাধুর্য্য রসের আস্বাদ লইতে লইতেই নিরালায় বসিয়া 'আই আমলা'—সখীর প্রেমের মধ্যে যে সুশীতল অম্লরসটুকু তাহাকেই যেন বণ্টন করিয়া মাধুর্য্যে মিশাইয়া যে অমৃতরসটুকু প্রস্তুত করিয়া রাখেন তাহাই সাতটি পানে রাখিয়া যেন বর্ণ-সপ্তকে ও সুর-সপ্তকে মিলাইয়া বরকে বা ছন্দকে শ্রবণ আঘ্রাণ দর্শন স্পর্শন করান হয়। যেন বলা হয় ছন্দ তুমি মধুর হও, তোমার রূপ, তোমার স্পর্শ, ধ্বনি ও সৌরভ মধুর

হোক, তোমার স্বাদ মধুর হোক, তোমার আপাদমস্তক, অন্তর-বাহির, মধুর ও শীতল হইয়া বহুক। এইরূপে বর বা ছন্দকে মাধুর্য্য প্রদান করিয়া, সাত রমণী বা সপ্ত ছন্দ এক একজন এক একটি রাং-চিত্রের আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া জ্যোতির এক ছন্দ-মালার মত বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া ছাঁদন তলার বা ছন্দ-বাঁধার প্রথম রীত সম্পন্ন করেন।

ছাঁদন তলার দ্বিতীয় রীতে ছন্দ-বন্ধন ব্যাপারটি স্পষ্টতর হইয়া আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। এই রীতের প্রথম অঙ্কে হয় সাত পাক; প্রথমা জলের ঝারি লইয়া জলোর্ম্মির ছন্দে, দ্বিতীয়া সাতটি আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া সূর্য্যের সপ্ত-রশ্মির ছন্দে, তৃতীয়া শ্রী লইয়া, চতুর্থী মধ্যমা বা প্রধানা একটি আচ্ছাদিত ভাণ্ডে জ্বলন্ত প্রদীপ—মঙ্গল ভাঁড় বা বউ ভাঁড় কিম্বা আইভাঁড়—যেন নববধূর মনের গোপন ছন্দকেই বহন করিয়া, পঞ্চমা বরণ ডালা যেন ষড়-ঋতুর বর্ণিকা-ভঙ্গের সবটুকু ছন্দ লইয়া, ষষ্ঠা শঙ্খ-ধ্বনির মঙ্গল ছন্দটি বহিয়া এবং সপ্তমা উলু দিয়া বা বাণীর ঝঙ্কার রচিয়া সাত পাকে বরকে বেষ্টন করেন।

এই রীতের দ্বিতীয় অঙ্কে সাত ছন্দের এক-একটি দিয়া বরণ। ইহার প্রথমেই জল-হাত বা জলোর্ম্মি এবং সব শেষে নয় প্রদীপের সেঁক বা নবরসের অভিসিঞ্চন।

তৃতীয় অঙ্কে কন্যাকে বা অনূঢ়া ছন্দকে বরের দিকে, বায়ু-তরঙ্গের ছন্দটির উপর

ছন্দস্গণ বহন করিয়া আনেন আচ্ছাদন (ছন্দের?) আড়াল দিয়া এবং বধূছন্দ বা ছন্দের ছায়ার দিকটিকে লইয়া বরছন্দ বা ছন্দের আতপের দিকটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করান। পিতার সহিত কন্যার মনের ছন্দ, ভাবের ছন্দ যেন হইতেছে ছিন্ন সেই কারণেই পিতা-মাতা ইঁহারা এ সময়ে কন্যা-ছন্দকে বহন করেন না।

রীতের চতুর্থ অঙ্কে শুভ দৃষ্টি! এপারে যাহা ওপারে যাহা তাহাদের শুভ দৃষ্টি—ছায়াতপের শুভ দৃষ্টি? আচ্ছাদনকে (ছন্দকে) মাথায় ধরিয়া।

পঞ্চম অঙ্কে মালা-বদল বা দুই পারের, অথবা ছায়াতপের গান্ধর্ব্ব-পরিণয়ে, ছন্দ-বন্ধন সার্থক হয়। "যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে"—গন্ধর্ব্বলোকে সমস্তই যেমন বায়ু-তরঙ্গের, শব্দ-তরঙ্গের, রস-তরঙ্গের উপরে তরঙ্গিত ভাবে দেখা দেয় তেমনি ছাঁদনাতলার এই গন্ধর্ব্বপরিণয়ের সমস্তটা ছন্দময়-একটা-হিল্লোলের ভিতর দিয়া যেন ছন্দকেই আমাদের গোচরে আসিতেছে দেখি।

এদেশে স্ত্রীলোকদের হাতে পরিবার অনেকগুলি গহনা আছে, তাহার মধ্যে একটির নাম হচ্ছে ছঁদ্ বা ছন্দ। এই ছাঁদটি ধারণ করিবার নিয়মে এবং এই আভরণটির গঠন-কল্পনাতে ছন্দ ও ছন্দ-বোধের সমস্ত রহস্য-টুকু নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। প্রথমত ছাঁদটির গঠন একটি পূর্ণচন্দ্র এবং একটি বিকশিত পদ্মফুল পরে পরে সাজাইয়া—যেন অরুণোদয়ের ছন্দ এবং চন্দ্রোদয়ের ছন্দের সহিত পদ্মের ছন্দটির গোপন-সম্বন্ধ প্রকাশ

হচ্ছে—একদিকে টাঁড় * অর্থাৎ তট তাহার কোলে তিন জল-তরঙ্গ চুড়ি, আর-একদিকে পহুঁছা এবং কঙ্কণ তাহার কোলে আর তিন জল-তরঙ্গ। দুইদিকে দুই ভূষণ-তরঙ্গ ও তাহার দুই কূল উপকূলের ঠিক মাঝখানটিতে থাকে ছঁদ্ বা ছন্দটি—দুই কূলের মিলন ঘটাইয়া—টাঁড় ও কঙ্কণের উভয় ঝঙ্কারকে একটি সুমধুর নিক্কণে নিয়ন্ত্রিত করিয়া। এই ছঁদ্‌টি না দিয়া ভূষণ পরা যেমন, আর ছন্দ না দিয়া চিত্রলেখাও তেমনি অশোভন।

অলঙ্কার পরিধানের আর একটি নিয়মে আমাদের দেশের সেকালের স্ত্রীলোকদের ছন্দ জ্ঞানের পরিচয় আমরা পাইতেছি। সমস্ত গহনা পরিয়া সমস্তটির চাকচিক্যের উপরে অতি সূক্ষ্ম মলমলের আচ্ছাদন দেওয়া সেকালে প্রথা ছিল;—যেন আভরণের পূর্ণ-প্রকাশের মাঝে শুভ্রবর্ণা ঊষার আবরণ, আচ্ছাদন বা ছন্দটি।

এই ছন্দকে পরিত্যাগ করিলে ঘরে ছিরি ছাঁদ থাকে না, কাজে ছিরিছাঁদ রহেনা। ছাঁদ হচ্ছেন শ্রী। তাঁহাকে বাঁধাই হচ্ছে ছাঁদে বাঁধা বা শ্রীরাধিকার কাণড়া-ছাঁদে কবরী বাঁধা। শুধু যে বাঁধা সে কষ্টের বাঁধা,—হাতকড়ির বন্ধন। আর যে ছাঁদিয়া বাঁধা সে হচ্ছে যেন শীত-গ্রীষ্মের মাঝে বসন্ত তিলকের মত মনোহর। ছাঁদ না দিয়া যে বাঁধা তা কে না পারে? এক রসিক ছাড়া ছাঁদিয়া বাঁধা আর কাহারও কর্ম্ম নয়।

এত ছাঁদে কে না বাঁধে চুল
তোমার চূড়ায় মজাইল জাতি কুল।

* * *

কেবা নাহি গাঁথে বনমালা
তোমার মালায় সে এতেক কেন জ্বালা

* * *

কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া
প্রাণ কান্দে এরূপ হেরিয়া।

* * *

কেবা নাহি কহে কথা খানি
তোমার চাঁদমুখে সুধা খসে জানি।

এই যে যাহা জাতিকুল মজায়, জ্বালা দেয়, প্রাণ কাঁদায়, মুখের কথায় সুধা খসায়, রূপকে ভঙ্গিমা দেয় তাহাই হইতেছে ছন্দ। এই ছন্দের শক্তি বোধ করা ও বোধ করানই হচ্ছে ছন্দ-বোধ এবং এই ছন্দ-শক্তিকে রূপ প্রমাণ ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই হচ্ছে চিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

এখন, চিত্রের যে প্রাণের প্রাণ যে রস তাহা কি? ছন্দ। যাহাকে চিত্রকারের চিত্ত হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আবার আমার চিত্তে বাহিত করিতেছে! 'রসো-বৈসঃ!' রসনা, রসের আস্বাদ গ্রহণ করাই যাহার কাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে 'রস সে রসই'। বলিতে কহিতে রসনা কোনো কালেই নিরস্ত নয়, কিন্তু কেবল রসের বেলাই সে বলিতেছে ব্যস্। ছন্দের পরিণতি রসে, কিন্তু রসের পরিণতি কিসে? বলিতে হয় তাই বলি 'ব্যস্'এ,—নয় তো দুই ফোটা অশ্রুজলে। ইহা

* হিন্দিতে টাঁড়কে তট বলে।

অপেক্ষা রসকে অধিকতর পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জো নাই। এই হ'ল রস—একথা বলা চলে না। কেননা 'স চ ন কার্য্যঃ নাপি জ্ঞাপ্য'! তবে কি সে আকাশ-কুসুমের মত অলীক? কখনই না। রস যে হচ্ছে। রস যে পাচ্ছি! রস যে রয়েছে দেখছি। 'পুরইব পরিস্ফুরণ'—যেন সম্মুখে। 'হৃদয়মিব প্রবিশন্'—যেন বুকের ভিতরে, 'সর্ব্বাঙ্গীনমিবমালিঙ্গন' সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করে।

রসোন্মত্ত ময়ূরের সকল গায়ে রস, মণি-মাণিক্যের জ্যোতির মত ফুটিয়া উঠিতেছে—এ যে চোখে দেখিতেছি, রসে তাহার বুক সুরা-পাত্রের মত ভরিয়া উঠিতেছে, রস তাহার বিচিত্র পিচ্ছের রোমে রোমে শিহরণ দিয়া নির্ঝরের মত ঝরিয়া পড়িতেছে! রসকে যে দেখিতেছি, রসকে যে শুনিতে পাইতেছি, কেমন করিয়া বলি রস অলীক? নব নব চিত্র বিচিত্র রঙ্গ ও ভঙ্গ যে রসের শৃঙ্গার বেশ। 'অয়ম্ শৃঙ্গারাদিকো রসঃ অলৌকিক চমৎকারি'—সে অলৌকিক এক চমৎকার সামগ্রী। সে রহিয়াছে, সে আসিতেছে। 'অন্তৎ সর্ব্বমিব তিরোদধৎ'—তাহার সম্মুখে কিছু আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, রসে সব ভাসাইয়া লইতেছে, রসের মধ্যে সকলি ডুবিয়া যাইতেছে! বিরাট প্লাবনের মত সকলের উপরে 'ব্রহ্মস্বাদমিব অনুভাবয়ন'—যেন বৃহতের আস্বাদে আমাদেরও বড় করিয়া তুলিয়া রহিয়াছে সেই প্রকাণ্ড আস্বাদ-রস।

রস যখন চিত্রের সর্ব্বস্ব, তাহার প্রাণেরও প্রাণ তখন এক প্রাণ-রসনা ব্যতিরেকে আর কোন ইন্দ্রিয়—না চক্ষু না শ্রোত্র—চিত্রের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে, চিত্রিতব্যের স্বাদ পাইতেছে। চিত্রের উৎপত্তি চিত্রের পরিণতি এই দুইটিই যখন রহিল প্রাণের ভিতরে, তখন প্রাণ দিয়াই তাহাদের উভয়কে দেখিতে হয়, শুধু চোখ দিয়া নয়,—এমন কি যেটুকু চোখে দেখিতেছি, হাতে ধরিতে পারিতেছি তাহাকেও চোখ দিয়া দেখা শুধু নয়, হাত দিয়া ছোঁয়া শুধু নয়,—প্রাণ দিয়া দেখা, প্রাণ দিয়া স্পর্শ করা।

"চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধূলো আর মাটি।
প্রাণ রসনায় দেখরে চাইখা রসের সাঁই খাটি।
চোখে ধূলো আর মাটি, প্রাণে রসের সাঁই খাটি।

রূপের রসের ফুল ফুইটা যায়
আমার পরাণ সুতা কই।
বাইরে বাজে সাঁইয়ের বাঁশি
আমি শুইনা আকুল হই।
আমার মিলন মালা হইল নারে
লাজে পথ হাঁটি
কেবল হাঁটি আর হাঁটি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অরণ্য ষষ্ঠী

পঞ্চমীর একটুখানি চাঁদ পশ্চিম-আকাশের এক কোণ হইতে ম্লান আলোকের ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র কর প্রসারণ করিয়া, গৃহস্থের অঙ্গনের তুলসী-তলার মৃৎ-প্রদীপের নিকট পড়িয়া, বালিকা বধূটির মত সঙ্কুচিত ভাবে যেন প্রণাম করিতেছিল; ঠাকুর-ঘরে শঙ্খশব্দ নীরব

হইয়াছে। সমস্ত দিনের গুমো গরমের পর, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বায়ু একটু উদ্দাম ভাবেই উঠানের পার্শ্বস্থিত কদলী বৃক্ষের দীর্ঘ দীর্ঘ পাতাগুলা লইয়া খেলা করিতেছে। আম্র বৃক্ষের পল্লবরাশির মধ্যে লুকাইয়া একটা কোকিল পক্ক আম্রের স্বাদে তুষ্ট হইয়া এক এক বার ডাকিতেছে কু-উ! বাড়ীর বাহিরে পথি পার্শ্বস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে সেই কু-উ শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী সাড়াও একবার একবার আসিতেছে 'চোখ গেল'।

প্রভাতে "অরণ্য" বা "জামাই ষষ্ঠী"। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের এই ষষ্ঠীই বারো-মাসের তেরো ষষ্ঠীর মধ্যে "রাজষষ্ঠী"! তাই আজিকার ঐ বালচন্দ্র ও তারাসনাথ আকাশখানির মত গৃহস্থের অঙ্গনখানিরও বড় শোভা। সেখানে আনন্দ কোলাহলের সঙ্গে বালকবালিকারা মা ষষ্ঠীর "কোল বায়নার" সজ্জা তৈয়ারী করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত! কেহ কলার "পেটো" (খোলা) গুলি একহাত দেড় হাত পরিমাণ কাটিয়া রাখিতেছে, কেহ নারিকেলের খিল্ ভাঙ্গিয়া তাহাতে শুষ্ক কদলী-ত্বকের "ছেটো" বাঁধিয়া খিলগুলি বাঁকাইয়া ধনু-এবং নারিকেলের খিলের দুইধারে কড়ি পরাইয়া তীর তৈয়ারী করিতেছে; কেহবা শুষ্ক 'বাস্না' টুকরা টুক্রা করিয়া কাটিয়া লইয়া ঐরূপে পাখা তৈয়ারী করিতেছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্থা কিশোরী "দিদি" বা "বৌদিদিরা" আতব চাউলের গুড়ি বা পিটালীর সঙ্গে কয়লার গুড়া মিলাইয়া "পোনা"ঘেরা একটা সোল মাছ আর গৃহস্থের বাড়ীর সেই "কাঁলো বিড়াল" ও তাহার বাচ্ছা গড়িতেছে; এবং পিঠালিতে হলুদ-গুঁড়া মিশাইয়া মা ষষ্ঠীর খাড়ু কঙ্কণ ও গায়ে সিঁদুরের ডোরা টানিয়া শঙ্খ চিত্রিত করিতেছে। কেহবা ষষ্ঠ গাছি দূর্ব্বা ও ধানের শিষ সংগ্রহে ব্যস্ত। কিন্তু তাহাদের সময়ই সব চেয়ে কম। বাড়ীর জামাই দুইটি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন;—তাঁহাদের জল-খাওয়ানো পান-দেওয়ার জন্য অনো-গোনায় মাঝে মাঝে কিশোরীদের চপলগতি চরণের রুণুঝুণুর সঙ্গে আনন্দের কলকণ্ঠও বাড়িয়া উঠিতেছে "মাগো! বারে বারে এমন করে ফরমাস খাট্‌তে হলে, কেবল পান সাজা আর জল খাবার যোগাতে হ'লে আমাদের কাজ এগোবেনা দেখ্‌ছি, আমরা কখন্ কি করব!"—"ওঃ—বেজায় কাজের লোক যে সব"—উত্তর দিবার অছিলায় মধুর সম্পর্কীয় কেহ এই কোন্দলটি একটু জাঁকাইয়া তুলিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ঝঙ্কারে প্রতিবাদ উঠিতেছে—"নাঃ তা কেন! দাবা টেপা আর পান চায়ের শ্রাদ্ধ করাই সব চেয়ে গুরুতর কাজ!" বাড়ীর বধূও জ্যেষ্ঠা কন্যারা রন্ধন ও তাহার উদ্যোগাদিতে ব্যস্ত। গৃহিণী ঠাকুর ঘরের দ্বারে বসিয়া খানিকটা ক্ষীর লইয়া ক্ষীরের নাড়ু ও পুতুল গড়িতে গড়িতে কিশোরী কন্যাদের রহস্য কোন্দল শুনিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ষাট্ ষাট্!—বাছারা আমার কতদিন পরে আমার কত ভাগ্যে এসেছে! মেয়েগুলো যেন দিন দিন ধিঙ্গি হচ্ছেন!" বড়বধূ রন্ধনগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া কনিষ্ঠা ননদের কোন্দল শুনিয়া হাসিয়া অঞ্চলে হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন "ওরা কেবল দাবা বড়ে টেপো আর তোরা বুঝি কলেজ কাছারীর কাজট

সেরে দিস্।" প্রতিবাদী পক্ষ এতবড় একটা পৃষ্ঠপোষক পাইয়া খুশী হইয়া বলিল "বলুন ত বৌদিদি?" তাহাতেও নিস্তার নাই!—"তাই কি না পারতাম নাকি? এমনি করে টাকা ঢেলে পড়াতে পারনি?" গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া প্রতিপক্ষরা বহির্বাটীতে গিয়া আশ্রয় লইল।

আনন্দে রহস্যে পানভোজননিদ্রায় বাকী রাত্রিটুকু শেষ হইতে না হইতে গৃহিণী বধূ ও কন্যাদের লইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ষষ্ঠী পূজার উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলেন। পল্লী গ্রামের মত সহরের মধ্যে তাঁহারা ষষ্ঠীতলায় পূজা দিতে যাইতে পারেন না, তাই গৃহের মধ্যেই অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষের ডাল পুতিয়া তাহার চারিদিকে আলপনা দিয়া ষষ্ঠীর 'ভার' 'বাটা' ও "কোলবায়না" সাজাইতে লাগিলেন। ষষ্ঠী বৃক্ষের বিকল্পে অশ্বত্থ বটের প্রোথিত ডাল দুটির দুই পাশে বড় বড় কাঁঠাল, কদলীছড়া, বোঁটাসহ পক্ক আম্র, নারিকেল, জাম, খেজুরকাঁদি, ও দধির 'কোর্' দিয়া ষষ্ঠীর 'ভার' সাজানো হইল এবং বাড়ীর প্রত্যেক 'পোয়াতির' (সন্তানের মাতার) ছয়খানি হিসাবে "কোল্ বায়না" দুই ধারে লম্বা সারি দিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইল! 'কোল্ বায়না'-গুলির সাজও বড় সুন্দর। নারিকেলের কাঠিতে লাল নীল নানা রঙের ফুল গাঁথিয়া নৌকাকার মোচার খোলার দুই পাশে বিঁধিয়া বিঁধিয়া মাথাগুলি দুইটি দুইটি একত্রে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে! তাহার ভিতরে নানা রকম ফলের টুক্‌রা, পক্ক আম্র, ছোট ছোট দধির ভাঁড় মিষ্টান্ন প্রভৃতি এবং তাহার উপরে পূর্বদিনের নির্মিত তীর ধনুক ও পাখা প্রভৃতি

শোভা পাইতেছে। তাহার পাশে জামাতৃ অর্চ্চনের জন্য নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন সজ্জিত রেকাবীর উপরে কোঁচান ধুতী চাদর সমন্বিত "ষষ্ঠীর বাটা"। এইজন্যই এদিনের নাম "জামাই ষষ্ঠী"! বাড়ীর নূতন জামাতাটিকে অন্ততঃ এ ষষ্ঠীতে আনা চাইই। ষষ্ঠীগাছটি ঘেরিয়া কয়েক ফের্ হরিদ্রা-রঞ্জিত সূত্র জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে! গাছ-তলায় সেই কয়লার গুঁড়া ও পিঠালিরঞ্জিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিড়ালটি শাবক সহ মোচার খোলার উপরে বিরাজ করিতেছেন, তা ছাড়া গোলা সিন্দুর শাঁখা ও কঙ্কণের নিকটে পিঠালির শোলমাছ, করমচা, ক্ষীরের ভাঁটা প্রভৃতি দ্রব্যগুলি বঙ্গের আদর্শ সন্তান—মা ষষ্ঠীর দুলাল "ষাটের বাছা"দের কীর্ত্তি কাহিনীর স্মৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনার্থে শোভা পাইতেছে! ইহা ছাড়া পুষ্প পত্র, তৈল হরিদ্রা, আমান্ন, চিনির নৈবেদ্য ও কর্ত্তিত ফল মূলাদি উপকরণে গৃহের মধ্যে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ'! তথাপি গৃহিণীর মনের খুঁৎখুঁতানি যাইতেছে না। "ঘোষাণি মাগী বেশী দুধ দিতে পারলে না, যা দিয়েছে তাও শুধু জল! মণির মাপে মা ষষ্ঠীকে ক্ষীরের পুতুল দেব মানৎ ছিল তা পুতুলের ছিরি হল দ্যাখ্! মণির কি সেবার বাঁচ্‌বার কথা ছিল! মা যাই মুখ রক্ষা করেছেন তাই! হাঁরে মার ডানে বাঁয়ে চিনির নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছে তো? বিনুর অসুখেও মেনে ছিলাম! সে সব অদিনে আমার মা বই কিছুরি ভরসা থাকে না! কপালে যা ছিল হয়েছে, এখন এই যমের

বত্তিয়ে” রাখুন! ওরে তোরা ভাল করে মনে করে দ্যাখ্ পূজোর কিছু অঙ্গহানি হয়নি তো মা-র, সব দেওয়া হয়েছে ত? “ষাট্ বাঁচানো”র পাখা কই? এই দ্যাখ্‌ দিকি যা আমার মনে না পড়্‌বে তা আর কারুর মনে আসবে না! এখনি কি হত আমার?” —বধূ কন্যারা আস্তে আস্তে ষাট গাছা দুর্ব্বা ও ষাট গাছি বাঁশের শিষবাঁধা একখানি নব তালবৃন্ত আনিয়া মা ষষ্ঠীর পায়ের গোড়ায় রাখিল। “সবই ত হয়েছে মনে হচ্চে এখন পুরুত ঠাকুর এলেই যে হয়! আমার পাঁচ্‌টা বাচ্চা কাচ্চার ঘর, ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করে সব, পুরুত ঠাকুরের আগে আমার বাড়ী আসা উচিত—তা বল্লেত তিনি শুন্‌বেন না! ওরা যে চা খেতে পায়না।”—ছোট বধূটি হাসিয়া বলিল “এতক্ষণে মার তাড়াতাড়ির আসল কারণটা বেরিয়ে পড়্‌ল! মণি বিনুতো ক্ষিদেয় এখনো কাঁদেনি, কিন্তু চায়ের জন্যে যে কি হচ্ছে কি রকম গলা শুকুচ্চে ওদিকে, তা কেবল মা-ই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন!” গৃহিণী কৃত্রিম কোপে বলিলেন “তোরা চুপ্ কর্‌তো বাপু! তোদের ঝগড়ার জ্বালায় আর বাঁচিনা! বাছারা আমার কত ভাগ্যে এসেছে! মা যে আমায় এমন দিন দেবেন এ কি কখনো আশা কর্‌তে পেরেছি!”

পুরোহিত আসিয়া পূজা করিতে বসিলেন! সেই নধর শ্যামল বৃক্ষশাখার তলে “দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গী” অঙ্কাশ্রিত সুতশোভী—বঙ্গ মাতাকে আবাহন করিয়া ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচারে পূজা করিতে লাগিলেন। চিরজীবি মার্কণ্ডও ষষ্ঠী দেবীর সহিত অদ্য বঙ্গের গৃহে পূজা পাইয়া থাকেন।

পূজান্তে গৃহিণী জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বলিলেন “ওদের স্নান করতে বল—মাষষ্ঠীর এই তেল হলুদ মাখিয়ে দিয়ে আয়!” বড়বধূ হাসিয়া ফেলিল “মা যেন কি!—ওরা কিনা কচি খোকা! তোমার তেল হলুদই তো মাখবার জন্য বসে আছে!”—“আহা কপালে একটু ছুঁইয়ে দিয়ে ‘লক্ষণ’ করতে বলছি, তোদের জ্বালায় আর বাঁচিনা ত!”—বধূ সপরিহাসে বলিল “যাও ঠাকুরঝি! মার খোকাদের হলুদ কাজল দিয়ে এস!—আমার হাতে একটু দিয়ে যাও আমি ছোটগুলোর কপালে ছুঁইয়ে দি!” ঠাকুরঝি জ্যেষ্ঠার দায়িত্ব পূর্ণ গাম্ভীর্য্য সহকারে হলুদ তেলের বাটী লইয়া মাতৃনির্দ্দেশ মত ভ্রাতা ও ভগ্নিপতিদিগের কপালে ছোঁয়াইতে গেল।

গৃহিণী তখন বাড়ীর এবং প্রতিবাসী “পোয়াতি দোয়াতি”দের ডাক্ দিলেন “আয় সবাই ষষ্ঠীর কথা শুনবি আয়।”

স্নানান্তে পুত্রকন্যাদের “হাতে কোলে” লইয়া পট্টবস্ত্র পরিহিতা তরুণী জননীগণ, নাতি নাতিনীর হাত ধরিয়া দিদিমা ঠাকুরমারা—সকলে আসিয়া সেই কৃত্রিম ষষ্ঠীতলায় সমবেত হইল!—“কালো বেড়ালের” অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী শুনিবার জন্য বালক বালিকারা যথাসাধ্য সংযত ভাবে মায়ের বা দিদিমা ঠাকুরমার কোলে পিঠে পার্শ্বে স্থান করিয়া লইয়া উৎসুক ভাবে চাহিতে লাগিল। মাতৃহস্তের সদ্যঃ যত্ন-বিন্যস্ত কালো চুল গুলি ও ঈষৎ হরিদ্রারঞ্জিত ললাটের নীচে কাজলের রেখা টানা ড্যাবডেবে চোখগুলি—সেই তীর ধনুক ও পুষ্প নিশানে শোভিত কলার থোলা, ক্ষীরের পুতুল, এবং ক্ষীরের ভাঁটার পানে চাহিয়া ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল! বধূ ও কন্যাদের আশে

পাশে লইয়া গৃহিণী পুরোহিতপরিত্যক্ত আসনের উপর বসিয়া অশ্বত্থ শাখার গাত্রস্থ হরিদ্রারঞ্জিত সূতার "খেই" নিজ হস্তে ধরিলেন এবং বধূ-কন্যাদেরও হস্ত স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। প্রত্যেক "পোয়াতির" হস্তে ছয়টি করিয়া ক্ষীরের শিশু এবং তাহাদের দুইটি জনক জননী পুতুল ধরিতে দিয়া মা ষষ্ঠীকে প্রণাম করিয়া গৃহিণী ষষ্ঠীর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এক থাকেন "গেরোস্তো। গেরোস্তর একটি বেটা একটি বৌ! গেরোস্তোর গোলায় ধান মড়্ মড়্ করছে, ঔরি চৌরি দক্ষিণ দুয়ারি ঘর, গোয়াল ভরা গরু বাছুর, একখানা ভুঁয়ে সাতখানা নাঙোল, রাখাল কৃষাণে বাড়ী ভরা অতুল সুখ সম্পদ, কিন্তু কর্ত্তা গিন্নির মনে সুখ নেই!—একটি বেটা একটি বৌ, সেই বৌয়ের সন্তান হয় না! সন্তান হবে কি বৌটা বড় "আলিষি! বড় 'নোলা'! গেরোস্তের অটাল্ ভরপূর ঘরকন্না—কিন্তু বৌটোর স্বভাব বড় মন্দ। বৌটো করে কি কড়াভরা দুধের সরখানা তুলে টপ্ করে খায়, "কোচ"ভরা দইয়ের সরখানা তুলে গালে দ্যায়, হেঁসেলের ভাজা মাছের আগ্ তুলে খায়, ঠাকুর দেবতা মানা নেই, বামুন বৈষ্ণব মান্য নেই, ভাল জিনিষ দেখলেই তার আগ তুলে খায়, আর যেই "কি হ'ল—কে খেলে" বলে খোঁজ পড়ে অমনি বাড়ীর "কালো বেড়ালটার নামে দোষ দ্যায়!—" কে আর খাবে ঐ কালো বেড়াল্ খেয়ে গেল!"—তখন ধর্ কালো বেড়ালটাকে, মার্ কালো বেড়ালটাকে!—

নিত্যি নিত্যি বিনি দোষে এই রকম 'প্রহার' কালো বেড়ালের ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠ্ল! কালো বেড়াল—মা ষষ্ঠীর বাহন। সে বনে গিয়ে মাষষ্ঠীকে জানালে "মা গেরোস্তদের বৌটা বড় বজ্জাত। নিজে খায় আর বিনি দোষে আমার এই রকম লাঞ্ছনা করে, মা আমার আর সহ্য হয় না! বৌটাকে তোমায় জব্দ করতেই হবে।" মাষষ্ঠী বল্লেন বটে? আহা! বৌটা তো বাঁজা হ'য়ে আছে এইবার তার সন্তান সম্ভাবনা হবে। যে দিন ছেলে হবে সেই রাত্রেই তুই ছেলে চুরী করে এনে আমার ছেলে আমার কাছে দিয়ে যাবি। তাহ'লেই গেরোস্তর বৌ জব্দ হবে!" কালো বেড়াল খুসী হয়ে চলে এল; এদিকে অল্পদিনের ভেতরই সবাই টের পেলে বৌ পোয়াতি হয়েছে। কর্ত্তা গিন্নির আর আনন্দের সীমা নেই,—একে একে বৌকে পঞ্চামৃত সাধ সোমন্তন সব দিলে। বৌটা একেই বজ্জাত, তাতে সকলের আদরে আরও আদুরে হয়ে ঠাকুরদের নৈবিদ্যির মণ্ডা পর্য্যন্ত নিয়ে খেতে লাগল এবং কালো বেড়ালের দোষ দিতে লাগ্ল! কালো বেড়াল মার্ ধোর খেয়েও বৌমাকে জব্দ করবার জন্য গেরস্তর বাড়ী পড়ে রইল। তারপরে দশমাসে গেরস্তদের বৌর একটি চাঁদের মত ছেলে হ'ল, আনন্দে আহ্লাদে দিন কেটে গেল, রাত্রে সবাই যেমন ঘুমিয়ে পড়েছে "কালো বেড়াল" অমনি নিঃশব্দে আঁতুরে ঢুকে ছেলেটিকে মুখে ক'রে নিয়ে বনে মাষষ্ঠীর কাছে দিয়ে এল। (এইখানে সকলে এক একটি ক্ষীরের পুতুল কালো বেড়ালের নিকট ষষ্ঠীর গাছতলায় রাখিয়া দিল।

সকালে গেরস্তর বাড়ী হাহাকার পড়ে গেল। কত ভাগ্যে একটি ছেলে,—সে ছেলে

আঁতুর থেকে কোথায় গেল ? খোঁজ খোঁজ, আর খোঁজ, মা ষষ্ঠী যাকে নিয়েছেন মানুষে তাকে কোথায় খুঁজে পাবে! "ভগবানের মার দুনিয়ার বার!" অনেক কেঁদে কেটে আর কি কর্বে ক্রমেই সকলে চুপ্ করলে! আবার দিন যায় কিন্তু গেরস্তর বৌর স্বভাব শোধ্রালো না! "কালো বেড়াল"ও প্রতিশোধ দেবার জন্য মাষষ্ঠীকে নালিশ করে করে ঐ রকমে আরও ৪টি ছেলে গেরস্তর বৌর কোলে থেকে আঁতুর ঘর থেকেই চুরী করে মাষষ্ঠীর কাছে দিয়ে এল। গেরস্তর বাড়ীতে শোকের সীমা নেই, বছর বছর বৌর একটি করে চাঁদের মত ছেলে হয় আর ২।১ দিন না কাট্তেই আঁতুর থেকে ছেলেটি যে কিসে নিয়ে যায় কেউ টের পায় না। গেরস্তরা কত পাহারা বসিয়ে কত তন্ত্র মন্ত্র তুক্তাক্ করে, কিছুতেই ৫টি ছেলের একটিকেও রক্ষা কর্তে পার্লে না! (এইখানে সকলে হাতে একটি মাত্র পুতুল অবশিষ্ট রাখিয়া বাকী সব কটি বেড়ালের মুখে ধরিয়া মাষষ্ঠীর নিকটে পৌছাইয়া দিল) বৌটা কাঁদে কাটে প'ড়ে থাকে—তবু স্বভাব যায় না! কালো বেড়াল গিয়ে মাষষ্ঠীকে বল্লে "মা গেরোস্তর বৌএর এত দুঃখেও শিক্ষা হ'লনা। তুমি আবার তাকে একটি ছেলে দাও।" মাষষ্ঠী বল্লেন "তথাস্তু।" ছয় বারের বার গেরস্তর বৌ আঁতুরে ঠায় জেগে বসে রইলো,—কে এমন করে ছেলে নিয়ে যায় ধর্ব এবার! তিন দিনের দিন রাত্রে আঁতুরের বাইরের লোক যেমন ঘুমিয়ে পড়েছে গেরস্তর বৌ ছেলে কোলে

কর্ছে, মাষষ্ঠীর ছলনায় মানুষের সাধ্য কি যে জেগে থাকে! বসে থাক্তে থাক্তে যেমন তার ঢুল এসেছে অমনি কাল বেড়াল আঁতুরে ঢুকে নিঃশব্দে ছেলেটি মুখে করে নিয়ে বনের দিকে ছুট্ল। অনেক দুঃখের পর ভগবানের দয়া আপনিই আসে, গেরস্তর বৌয়েরও অমনি ছ্যাঁৎ করে ঘুম ভেঙ্গে গেল, তার মনে হোল কিসে যেন তার কোল থেকে ছেলে তুলে নিয়ে পালাচ্চে, গেরস্তর বৌ অমনি "আচ্ কাটিয়ে" উঠে কারুকে ডাক্বারও অপেক্ষা না করে বেড়ালের পেছনে পেছনে বনের মধ্যে চলল। প্রাণ যায় আর থাক্ কিসে এমন করে আমার ছেলে নেয় ধর্তেই হবে! হয় ছেলে ফিরিয়ে আন্ব নচেৎ প্রাণই দেব আজ—"এই সঙ্কল্প করে বৌ নিসুঁতি অন্ধকার রাত্রে সেই বেড়ালের পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। বিজন বন ডাল পড়ে ঢেকী হয় পাত্ পড়লে কুলো হয়, এমন যে বিজন অরণ্য তার মধ্যে পড়ে গেরস্তর বৌ আর রাস্তা খুঁজে পায় না। তখন মাষষ্ঠীর দয়ায় হাতে একগাছা সুতো ঠেক্লো; সুতো গাছটা ধরে একপা একপা করে এগিয়ে দেখে বেশ রাস্তা, বৌ সেই সুতো ধরেই চলতে লাগল। খানিক গিয়ে দ্যাখে বনের মধ্যে আলো, ছেলের জন্য সেদিন বৌ প্রাণকে পণ করেই বেরিয়েছে, নির্ভয়ে এগিয়ে দ্যাখে প্রকাণ্ড বট অশ্বথর ডালে বনের মধ্যে আঁধার হ'য়ে রয়েছে—তার তলায় "হোলা শাখা গোলা সিঁদুর কঙ্কণ লাল পেড়ে সাড়ী" প'রে কে একজন মেয়ে মানুষ বসে আছেন তারই অঙ্গের ছটায় বন

আশে পাশে কত সুন্দর ছেলে মেয়ে খেলা করছে! কালো বেড়াল তাঁর পায়ের তলায় একটি ছোট ছেলে মুখ থেকে নামিয়ে দিলে, গেরস্তর বৌ দেখেই বুঝলে এইটি তার এবারের ছেলে। (এইখানে অবশিষ্ট পুতুলটিও ষষ্ঠী তলায় দেওয়া হইল।) গেরস্তর বৌকে দেখে কটি ছেলে মেয়ে যেন চম্‌কে উঠল, মাষষ্ঠী হেসে বল্লেন "গেরস্তর বৌ তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?"—গেরস্তর বৌ গলায় কাপড় দিয়ে জোড় হাতে বল্‌লে "মা তুমি কে তা আমি জানিনা, কিন্তু কালো বেড়াল আমার ছেলে চুরী করে এনে তোমার পায়ের কাছে দিলে দেখছি। এমনি করে আমার আর পাঁচটি ছেলেত এনে দিয়েছে বুঝতে পারছি। মা তুমি কে? তুমি কেন এমন করে আমার ছেলে হরণ কর! আমার ছেলেগুলি দেবে ত দাও নইলে এইখানে আমি 'হত্যা হব!'—মাষষ্ঠী বল্‌লেন "তোর মত পাপিষ্ঠিকে কি আমি ছেলে দিই। তোকে সাজা দেবার জন্যেই বছরে বছরে তোর কোলে দিয়ে আবার আমার ছেলে আমি কেড়ে নিই!—আমি মাষষ্ঠী!—বেড়াল আমার বাহন! তুই এত বড় "আলিক্ষি" পাপিষ্ঠি যে দেবতা বামুন মানিসনে, ঘরকন্নার সব জিনিষের "আগবেড়ে" খাস্ আর কালো বেড়ালের দোষ দিস,—বেড়ালকে মার খাওয়াস্ তুই রাক্ষুসী! তোকে দেব ছেলে?"—গেরস্তর বৌ গলায় কাপড় দিয়ে মার পায়ের ওপর পড়ল "মা যত অন্যায় করেছি তার ঢের সাজা হ'য়েছে, এই নাক কানে খত দিচ্ছি মা; তুমি আমার ছেলে ফিরে দাও! না যদি দাওত আমি

তোমার পায়ে "হত্যা" হব!" মাষষ্ঠী তখন বললেন "আচ্ছা ওঠ, তোর এবারের ছেলেটি ফিরিয়ে নিয়ে যা! কিন্তু দেখিস্ ছেলের যদি কোন দোষঘাট নিস্, হতাদর করিস্ "ষাট বাঁচিয়ে না চলিস তাহলে তক্ষণি আমার ছেলে আমি কেড়ে নেব। আমি আগে থাক্‌তে তোকে বলে দিচ্চি; ছেলে যত দামালি করবে, যত যার নষ্ট অপচয় করবে তখনি "ষাট্ ষাট্" বলে তাদের তা তিনগুণ করে পুরিয়ে দিবি, যেন লোকে ছেলেকে গাল না দিয়ে উল্টে আশীর্ব্বাদ করে—"ষাট্ ষাট্" বলে। ছেলে ভাতের সময় পিসীর কোলে গিয়ে কাপড় নষ্ট করে দেবে। পিসী মুখ ভার করবার আগেই "ষাট্ষাট্" বলে পিসীকে গরদ বার করে দিবি, পিসী "ষাট্ ষাট্ বলে ছেলে কোলে তুলে নেবে। পৈতের সময় নাপিতের কাণ কেটে নেবে নাপিতকে সোনার কাণ গড়িয়ে দিবি, নাপিত হেসে ষাট্ ষাট্ করবে। বিয়ে করতে যাবার সময় নৌকায় চড়ে মাঝ সুমুদ্রের মধ্যে ছেলে করম্‌চা দিয়ে সোল মাছের অম্বল খেতে চাইবে—তীর ধনুক কোল বায়না ক্ষীরের ভাঁটা নিয়ে খেলতে চাইবে তক্ষণি তা দিবি। এই রকম করে "ষাট্ বাচিয়ে" কারু মন্তি "না কুড়িয়ে—ছেলের সব দামালি স'য়ে যদি ছেলে মানুষ করে তুলতে পারিস তখন তোর সব ছেলে ফেরত দেব তোকে!"—গেরস্তর বৌ রাজী না হ'য়ে আর কি করবে, ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে মাষষ্ঠীকে নমস্কার করে বাড়ী ফিরে এল! (সকলে একটি শিশু

তার পরে মাষষ্ঠী যেমন করে ব'লে দিয়ে ছিলেন তেমনি করে "ষাট্‌বাঁচিয়ে" গেরস্তর বৌ ছেলে মানুষ করে তুলতে লাগল,—ছেলে লোকের হাজার নষ্ট অপচয় করলেও কেউ কিছু আর বল্‌তে পারতনা! ছেলের বিয়ের সময়ও বেচারী গেরস্তর বৌ শোল করমচার অম্বল রেঁধে তীর ধনুক "কোল্‌ বায়না" ক্ষীরের ভাঁটা নিয়ে নৌকার খোলের ভেতর লুকিয়ে থেকে ছেলেকে মাঝ সমুদ্রে বায়না জুড়ে দিলে! ডাঙ্গায় নৌক লাগ্‌লে ছেলে ডাঙ্গায় উঠেই এক গেরস্তর বাড়ীর মাচা ভরা ফলন্ত কুমড়ো সুদ্ধ কুমড়ো গাছ কেটে নিলে, গেরস্তরা বেরিয়ে গাল দেবার আগেই মা তাদের কাছে সোনার কুমড়ো নিয়ে হাজির করলে। তারা খুসি হয়ে বল্‌লে "কে কেটেছে কুমড়ো গাছ? ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস? বেশ করেছে, বেঁচে থাকুক শতেক বছর পরমায়ু হোক্‌।" মাষষ্ঠী যখন দেখলে যে হ্যাঁ গেরস্তর বৌ ছেলে মানুষ কর্‌তে পার্‌বে, আর কোন অলক্ষণ হবে না তখন একে একে তার সব গুলি ফেরত দিলেন। পোয়াতির ছেলে মরে না বেড়াতে যায়। গেরস্তর বৌ এর ঘর ছেলে মেয়েতে ভরে গেল মাষষ্ঠির বরে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হয়ে গেরস্তরা ঘর ঘরকন্না কর্‌তে লাগ্‌ল—"জয় দেবী জগদানন্দ কারিণী প্রসীদ মম কল্যাণী ষষ্ঠীদেবী নমোঽস্তুতে।" ঘর সুদ্ধ লোক ভূমিষ্ঠ হইয়া ষষ্ঠীদেবীকে প্রণাম করিলেন। মাতাদের সভক্তি ও সভীত প্রণাম শেষ হইতে না হইতে শিশু অশ্ব দলের মুখের সংযম রশ্মি শিথিল হইয়া গেল। "আমার কোল বায়না আমার তীর ধনুক "ওমা আমার ওই টুকুটুকে আমটা" প্রভৃতি রবে মাতারা যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ মাতাদের অঞ্চল ও হস্ত ধরিয়া টানাটানি বাধাইয়া কিঞ্চিৎ তিরস্কার লাভ করিবা মাত্র তাহাদের মাতারা দিদিমা ঠাকুরমাদিগের দ্বারাও আক্রান্ত হইলেন। "এই এখুনি শুনলি বাপু তবু তোদের দুদণ্ডও তা মানতে নেই। একালের মেয়েদের এ সব কথা এ কাণ দিয়ে ঢুকে ও কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়! প্রাণে ভয় থাক্‌লে তো!"

"দেখ দেখি কি জ্বালাতন কচ্চে একটু তর্‌ সয় না যে ওদের!" বলিয়া নবীনা মাতারা অপ্রতিভ ভাবে চুপ করিলেন। গৃহিণী বলিলেন আর একটু থামো তো দাদুরা! "ষষ্ঠী যাচাই" ছাখ! তার পরে সব দেব—চুপ কর এখন একটু!"—সেই বংশ ও দুর্ব্বাগুচ্ছ সমন্বিত তালবৃন্ত খানিতে খানিক দধি ও জল দিয়া গৃহিণী মাষষ্ঠীর গাত্রে বাতাস দিতে দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—

"জ্যোষ্টি মাসে অরণ্য ষষ্ঠী ষাট্‌ ষাট্‌ ষাট্‌, শ্রাবণ মাসে খণ্ড ষষ্ঠী ষাট্‌ ষাট্‌ ষাট্‌, ভাদ্র মাসে চাপ্‌ড়া ষষ্ঠী ষাট্‌ ষাট্‌ ষাট্‌, আশ্বিন মাসে দুর্গা ষষ্ঠী ষাট্‌ ষাট্‌ ষাট্‌; অঘ্রাণ মাসে মূলো ষষ্ঠী ষট্‌ ষাট্‌ ষাট্‌, পৌষ মাসে নোটন ষষ্ঠী ষাট্‌ ষাট্‌ ষাট্‌, মাঘ মাসে শেতল ষষ্ঠী ষাট্‌ ষাট্‌ ষাট্‌।

চৈত্র মাসে অশোক ষষ্ঠী ষাট্‌ ষাট্‌ ষাট্‌।

বারো মাসে তের ষষ্ঠী ষাট্‌ ষাট্‌ ষাট্‌।"

তার পরে নিজ পুত্রকন্যাদের জ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের নামে "আমার অমুকের ষাট্‌ অমুকের ষাট্‌; বলিয়া "ষাট্‌ যাচাইতে লাগিলেন। পুত্রকন্যার পরে জামাতা পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী বধূদের

নামে এবং তৎপরে "আমার ঝি চাকরের ষাট্, আমার গরু বাছুরের ষাট্, আমার রাখাল কৃষাণের ষাট্, আমার আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে আছে সকলের ষাট্। এইরূপে সকলের 'ষাট্ বাঁচাইয়া' গৃহিণী তাহাদের গাত্রে সেই পাখা দ্বারা বাতাস করিয়া আশীর্ব্বাদনির্ম্মাল্য ও ষষ্ঠীর ডোর (সেই হরিদ্রা রঞ্জিত সূত্র) একটু একটু করিয়া ছিঁড়িয়া সকলের গলায় বাঁধিয়া দিলেন। তখন "ঠাকুমা আমার ঐ কোল বায়নাটা, ও দিদিমা আমায় ঐ গিন্নি পুতুলটা 'আমায় সন্দেশ' 'আমায় নাড়ু'—'আমায় সেই টুকটুকে আমটা'—হাঁ ঠাকুমা ষষ্ঠীর কালো বেড়াল, শোল মাছ আজ বুঝি নাড়তে নেই' এইরূপ গোল থামাইতে তাঁহাদেরও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইল। ক্বচিৎ কেহ মাষষ্ঠীর কোন অনিবেদিত ভোগের প্রতি লোলুপতা প্রকাশ করিতেই মাতারা শিহরিয়া শিশুর মুখ চাপিয়া ধরায় গৃহিণী বলিলেন "তা বলেছে?—মারিসনে, মাষষ্ঠী ওদের অপরাধ নিলে কি ওরা বাঁচে! কোন ছেলে আগ তুলে নিলে ষষ্ঠী দেবী দোষ নেন না। বালকদের হাঙ্গাম থামাইয়া বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র ও জামাতাদিগকে ডাকাইয়া আশীর্ব্বাদি নির্ম্মাল্য সহ মস্তকে পাখার বাতাস দিয়া তাহাদিগকে প্রসাদ ও জলযোগে বসাইয়া দিলেন মধ্যস্থলে জামাতাদিগের নির্দ্দিষ্ট আসন পড়িল, এবং বস্ত্রযুক্ত বাটার রেকাবী তাঁহাদের হস্তে স্পর্শ করাইয়া পার্শ্বে রাখা হইল। ভাগ্যবানের গৃহে সে দিন আনন্দ ভোজনের ধূম পড়িয়া যায়! পুত্র জামাতা পৌত্র দৌহিত্র ঘর ভরিয়া সারি সারি আহারে বসে এবং আনন্দ রহস্যে বঙ্গের অন্তঃপুর মুখরিত হইয়া উঠে।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সবুজ পরী

সবুজ পরী! সবুজ পরী! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও।
তরুণ-করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে,
পাগল আঁখির পরে তোমার যুগল আঁখি ঢুলিয়ে চাও।

ঘাসের শীষে সবুজ ক'রে শিস দিয়েছ, সুন্দরী!
তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি'!
যৌবনেরে যৌবরাজ্য
দেওয়া তোমার নিত্য কার্য্য,
পাঞ্জা তোমার শ্যামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী।

যাদুকরের পান্না জ্বলে তোমার হাতের আংটিতে,
হিয়ার হাসি কান্না জাগে সবুজ সুরের গানটিতে।
কুণ্ঠাহরা তোমার হাসি,—
ভয় ভাবনা যায় যে ভাসি' ;
যায় ভেসে যায় পাংশু মরণ পাতাল-মুখো গাংটিতে।

এই ধরণীর অস্থি বুঝি সবুজ সুরের আস্থায়ী
ফিরে ঘুরে সবুজ সুরে তাই তো পরাণ লয় নাহি' !
রবির আলোর গৈরিকেতে
সবুজ সুধা অধর পেতে
তাই তো পিয়ে তরুর তরুণ—তাই সে সবুজ সোমপায়ী।

সবুজ হ'য়ে উঠ্‌ল যারা কোথাও তাদের আওতা নেই,
চারদিকেতেই হাওয়ার খেলা আলোর মেলা চারদিকেই ;
স্ব-তন্ত্র সে বহুর মধ্যে
পান করে সে কিরণ মদ্যে ;
তরুণ বলেই ত্যায় সে ছায়া গহন ছায়া দ্যায় গো সেই !

সবুজ পরী! সবুজ পরী! তোমার হাতের হেম ঝারি
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী!
সবুজ পাখীর বাবুই ঝাঁকে—
দেখ্‌তে আমি পাই তোমাকে—
ছাতিম-পাতার ছাতার তলে—আঁখির পাতা বিস্ফারি'।

সব্‌জে তোমার দোব্‌জাখানি—আলো ছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল্ বিভ্রমে!
সবুজ শোভার সারে গামা

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নিখিল জীবন তোমার বশ,
আলোর তুমি বুক-চেরা ধন অন্ধকারের রভস-রস।
রামধনুকের রং নিঙাড়ি
রাঙাও ধরার মলিন শাড়ী,
মরুভূমির সবজী-বাড়ী নিত্য গাহে তোমার যশ।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নূতন সুরের উদ্গাতা,
গাঁথ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয়-গাথা,
ভরা দিনের তীব্র দাহে—
অরণ্যানী যে গান গাহে—
যে গানে হয় সবুজ বনে শ্যামল মেঘের জাল পাতা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গলা এবং মাষ্টারমহাশয়ের নিকট একটু ইংরাজী পড়িয়া, তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। প্রথমে St. Paul's School, তার পর Montague's Accademy তার পর হিন্দুস্কুল। এইরূপ ঘনঘন স্কুলপরিবর্ত্তনে যে ভাল ফল হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। কেন যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইত, তাহাও তিনি জানেন না, অভিভাবকেরাই জানিতেন। বলিয়াছি, বাড়ীর কঠোর শিক্ষাশাসনের চাপে শিক্ষার প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; সুতরাং স্কুলেও তিনি পড়ায় তেমন মনোযোগ দিতেন না।

ছেলেবেলার একটা কথা তাঁহার মনে পড়ে, তাতে বেশ একটু মজা আছে। উপনয়নের সময় অন্তঃপুরের একটা ঘরের মধ্যে যথারীতি তিন দিন তিনি বদ্ধ হইয়া আছেন। একদিন হঠাৎ ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন "হনুমান্" "হনুমান্"! দাসদাসীদের মধ্যে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। ব্যাপার কিছুই নয়—একটা হনুমান্ ছাদের প্রাচীরের উপর আসিয়া বসিয়াছিল। এমন একটা অপূর্ব্ব দ্রষ্টব্য পদার্থ দর্শনের লোভ অতিক্রম করা অশ্মশ্রুম্পশ্রু বালকব্রহ্মচারীর পক্ষেও অসাধ্য হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচারী দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া নিষিদ্ধদর্শন শূদ্রদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তখন অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে আরও বেশী হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাড়া খাইয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় আবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

জ্যোতিবাবু তখন হিন্দুস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেন। যে রেখা-চিত্রকলার জন্য বিলাতেও আজকাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রশংসিত হইতেছেন তাহার বীজ অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বের সেই বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ক্লাসে বসিয়া তিনি একবার তাঁহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইতেছিল, এ ব্যাপার মাষ্টার মহাশয় কিছুই জানিতেন না। সে ছবি শেষে এমন ঠিক হইয়াছিল যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাই লইয়া একটা খুব হাসি তামাসা পড়িয়া গিয়াছিল। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় একবার জ্যোতিবাবুর মেজ্‌দাদাকে (সত্যেন্দ্রনাথ) তাঁহার কর্ম্মস্থান মণিরাম-পুরে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যোতিবাবুও তাঁহার মেজ্‌দাদার সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলেন। একদিন, কেন কে জানে, প্রতাপ-বাবুর ছবি আঁকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল, ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কখনও ছবি আঁকেন নাই, বা আঁকিতে চেষ্টাও করেন নাই। এই ছবি এত ঠিক হইয়াছিল যে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চিত্র-বিদ্যার জন্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া-ছিলেন। এই তাঁর প্রথম ছবি আঁকা। তখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ছবি আঁকিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তাহার উপর তাঁহার প্রথমচিত্র দেখিয়াই যখন সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে



শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

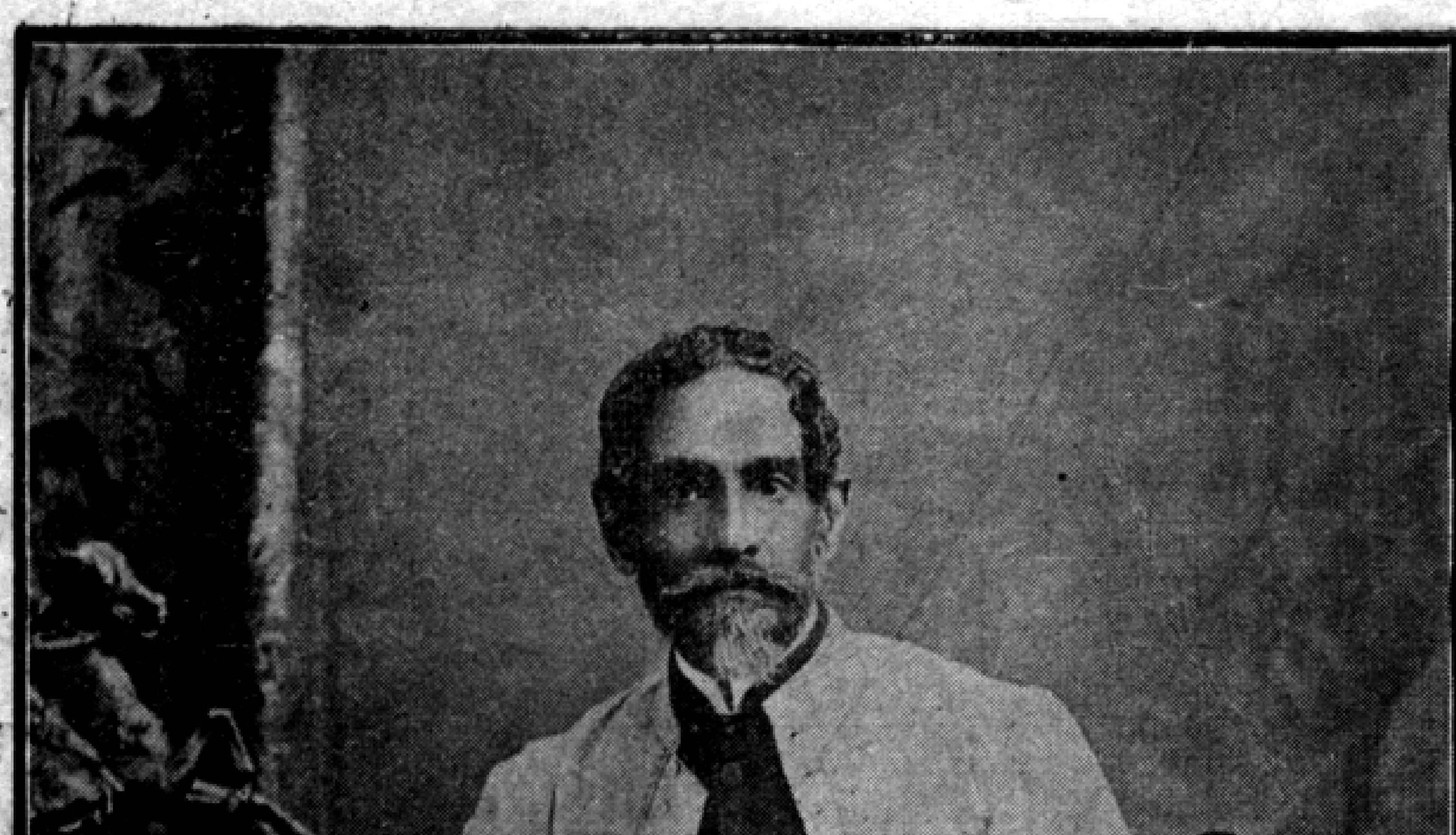
বাড়ীর লোকদেরও চেহারা আঁকিতেন। সে সকল চিত্র চোঁতা কাগজে অঙ্কিত হইত, এবং তাহা সযত্নে রক্ষা করাও আবশ্যক মনে করিতেন না, কাজেই সেগুলি এখন সব হারাইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি ছবি হারানোতে তিনি বিশেষ দুঃখিত—সে ছবি ব্রহ্মানন্দ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের। রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া তিনি এখন দুঃখ করেন।

থাক্, যাহা বলিতেছিলাম,—পূর্ব্বকথিত জয়গোপাল শেঠ নামে তাঁহাদের যে শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। শিক্ষক মহাশয় যেমন পাত্‌লা তেমনি অসাধারণ রকমের লম্বাও ছিলেন। গরুড় পক্ষীর প্রসিদ্ধ নাসিকাটির মত তাঁহার কণ্ঠনালীটি সম্মুখ দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছিল; হাত দু'টি দুই পাশে প্রসারিত করিয়া আঙ্গুলগুলি মেলিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতেন হাড়গিলের মত; কণ্ঠস্বর একটু অনুনাসিক; হাসিলে তাঁহার মিশি দেওয়া কালো কালো দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িত; তাঁহার দেহবর্ণ একটু ফর্সা ছিল। মাষ্টার মহাশয়ের পরিচ্ছদও ছিল এক অদ্ভুত রকমের। পরিধানে ধূতি, অঙ্গে একটা সাদা লংক্লথের চাপ্‌কান, বুকে ভাঁজ করা একখানা চাদর, পায়ে ফুল্ মোজা এবং মাথায় পর্দ্দায় পর্দ্দায় ভাঁজ করা একটা সাদা পাগড়ী;—এমনি পাগ্‌ড়ীই নাকি তখন সব আফিসের কর্ম্মচারীরা ব্যবহার করিতেন। তাম্বুলরাগ অধরওষ্ঠ ত্যাগ করিয়া চিবুক এবং বক্ষস্থ উত্তরীয় পর্য্যন্ত কখন' কখন'

একদিন ক্লাসের কতকগুলি ছাত্র পরামর্শ করিয়া, এই শিক্ষক মহাশয় আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার চেয়ারের আসনটিকে বেশ করিয়া মসীরঞ্জিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় তত লক্ষ্য করেন নাই, যেমন বসিয়াছেন অমনি কালির ছাপে তাঁহার চাপ্‌কান্‌টি বিচিত্ররূপে চিত্রিত হইয়া গেল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি একে একে সমস্ত বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ কার্য্য কে করিয়াছে। সকলেই অস্বীকার করিল কিন্তু জ্যোতি বাবু, যে করিয়াছিল তাহার নাম বলিয়া দিলেন। এ জন্য জ্যোতিবাবুকে তাঁহার সহাধ্যায়ীগণের হাতে অনেক লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল! ছাত্রেরা তাঁহার বই লইয়া এরূপভাবে লুকাইয়া রাখিত যে অনেক সময় খুঁজিয়াই পাওয়া যাইত না। পুস্তক অভাবে অনেকদিন পড়া না বলিতে পারায়, স্কুলের মাষ্টারদের নিকট তিরস্কৃত এবং এত ঘন ঘন বই হারান'র জন্য বাড়ীতেও অভিভাবকগণের নিকট ভর্ৎসিত হইতেন। এ সময়ে হিন্দু স্কুল ও সংস্কৃত কলেজের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ চলিত। কারণ কিছুই নহে বালসুলভ চাপল্যমাত্র। তখনকার দিনে এ এক প্রকার ফ্যাশানের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কখন-কখন এই দুই দলের লড়াইয়ে রক্তারক্তি ও মাথা-ফাটাফাটি পর্য্যন্ত হইত। হিন্দুস্কুলের ইংরেজ হেডমাষ্টারের নিকট নালিস আসিলে তিনি বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। বোধ হয় সে সময়ে তাঁহার স্বদেশের দুর্দ্দান্ত ছাত্রদের কথা মনে পড়িত!

মধ্যে হিন্দু স্কুল একবার শ্যাম মল্লিকদের

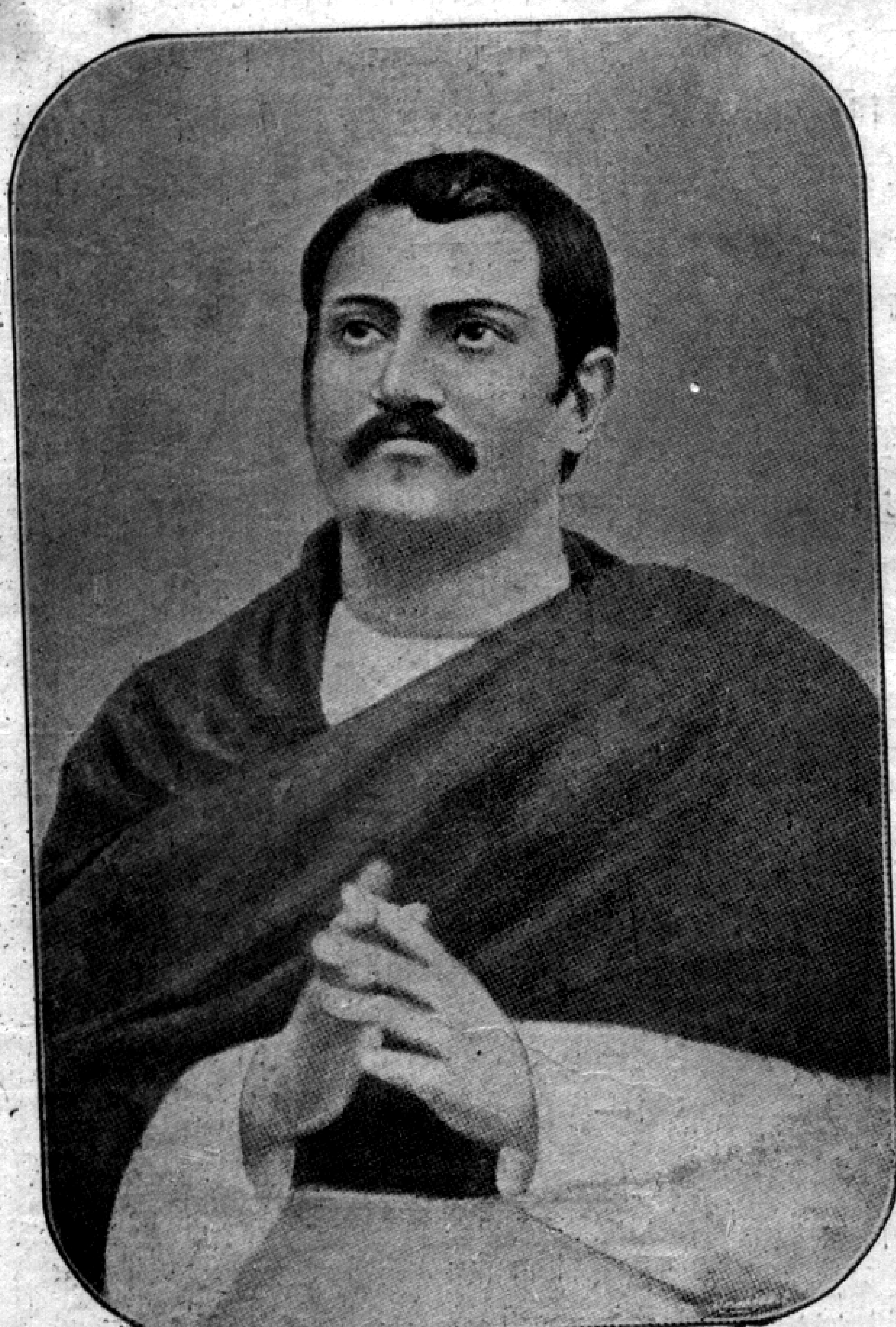
দিনের জন্য স্থানান্তরিত হয়। সেই সময়ে একদিন টিফিনের ছুটিতে জ্যোতিবাবু দেখিলেন যে একটা লোককে স্কুলের হাতার ভিতর হইতে জনৈক কনেষ্টবল ধরিয়া টানা-টানি করিতেছে—থানায় লইয়া যাইবে। প্রথমোক্ত লোকটা নাকি কি একটা অপরাধ করিয়াছে তাই তাহাকে ধরিতে কনেষ্টবল স্কুলঘর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। জ্যোতি বাবু প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র প্রথমতঃ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলেন, কিন্তু কনেষ্টবল মহাশয় যখন কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন সকলে মিলিয়া নিকটের একটা ইটের ঢিবি হইতে ইট লইয়া কনেষ্টবলের দিকে ছুঁড়িতে লাগিলেন। শেষে পুলিশের সিপাহী মহাশয় এমনি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন যে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপালন না করিয়াই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন—আর এই ফাঁকে সে লোকটাও পলাইয়া গেল।



শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিবাবু একবার তাঁহার মেজদাদা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺মনোমোহন ঘোষের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেও তাঁহার একটি সুখের স্মৃতি। তখন মিষ্টার ঘোষের পিতা মাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ যত্ন করিতেন তাহা ভুলিবার নহে। তখন ঘোষ-পরিবারের মধ্যে অবরোধপ্রথা পূর্ণ মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও অন্তঃপুরে তাঁহাদের অবাধগতি ছিল। মিসেস্‌ঘোষ তখন বালিকা বধূ। বারাণ্ডায় মাদুর পাতিয়া তাঁহার

সঙ্গে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাস খেলিতেন। মনোমোহন বাবুর পিতা লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ রামলোচন বাবু যেরূপ গভীর কণ্ঠস্বরে এবং তাঁহার বড় বড় চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া "অ—ম—ন্—ম·—হ—ন" বলিয়া ডাক দিতেন, তাহা ভুলিবার নয়। আর ভুলিবার নয় কৃষ্ণনগরের দুগ্ধফেননিভ শুভ্র ফুরফুরে সেই "গঙ্গাজলী" সন্দেশ এবং তাঁহাদের বাড়ীর চা'! সে চা'য়ে কি সুগন্ধ! এমন চা', জ্যোতিবাবু বলিলেন, আর কখনও খান নাই। আসল কথা ছেলে বেলার সকল অনুভূতিই একটু বেশী মাত্রায় তীব্র হইয়া থাকে। তিনি লালমোহন বাবুর সঙ্গে একটা বড় খাটে একসঙ্গে শয়ন করিতেন। একদিন তাঁহাদের বাড়ীসংলগ্ন দীর্ঘ তরুবীথির মধ্যে মনোমোহন বাবু ও সত্যেন্দ্র বাবু দুইজনে পায়চারী করিতে করিতে বিলাত যাইবার মৎলব আঁটিতে ছিলেন—লালমোহন বাবু তাই শুনিয়া অমনি হাসিতে হাসিতে আসিয়া পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন "দাদা, the Steamer is ready!"



কেশবচন্দ্র সেন

তখন কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কি উৎসাহ ও আনন্দ! কেশব বাবুর সহিত খৃষ্টান পাদ্রী লালবিহারী দে ও কৃষ্ণনগরের Dyson সাহেবের সহিত খুব বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল! আজ লালবিহারী বাবু কেশব বাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা দিবেন! আজ কেশববাবু আবার সেই প্রতিবাদের উত্তর দিবেন! উভয় পক্ষই বাগ্‌যুদ্ধে মজবুত। লালবিহারী দে সুন্দর ইংরাজীতে কেশববাবুকে ঠাট্টা করিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পরিহাস-বাণ প্রয়োগে কেশব বাবুও কম দক্ষ ছিলেন না। লালবিহারীর বক্তৃতা লিখিত, কেশব বাবুর মৌখিক

সুতরাং সেই বক্তৃতার তোড়ে রেভারেণ্ড লালবিহারীর সমস্ত ঠাট্টা মস্করা ভাসিয়া যাইত। কেশব বাবুর দলই জয়লাভ করিত। তাঁহার ছেলের দল, এই জয়োল্লাসে মাতিয়া উঠিতেন।

এই সময়ে ১১ই মাঘে ইঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ব্রহ্মোৎসবের ঘটা হইত। সমস্ত বাড়ী পুষ্পমালায় ভূষিত হইত। প্রত্যূষে যখন রশুন্‌চৌকিতে প্রভাতী বাজিয়া উঠিত তখন তাঁহার যে কি আনন্দ হইত তাহা তিনি কথায় বর্ণনা করিতে পারেন না। আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালের উপাসনা হইয়া গেলে দলে দলে ব্রাহ্মেরা জোড়াসাঁকোর বাটীতে আসিয়া সমবেত হইতেন। টেবিলের উপর বড় বড় দরবেশী মিঠাই ও কমলা লেবুর পিরামিড সাজান থাকিত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপ মজুমদার, ভাই মহেন্দ্রনাথ, ভাই উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায়—ইঁহাদের উৎসাহদীপ্ত আনন্দ বিকশিত মুখ জ্যোতিবাবুর চিত্তপটে এখনও সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যাহ্ণভোজনের পর বৈঠকখানার ঘরে সকলে মিলিয়া গগনভেদী উচ্চকণ্ঠে "সবে মিলে মিলে গাও" "আজ আনন্দের সীমা কি" "আজি সবে গাও আনন্দে" প্রভৃতি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত গান সকলে মিলিয়া গাওয়া হইত। জ্যোতিবাবু বলিলেন "তারপর হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন মহা উৎসাহের সহিত স্বরচিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিল" প্রভৃতি গান গাহিতেন, তখন যে কি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে আমাদের মন ভরিয়া উঠিত তাহা বর্ণনাতীত। সেকালের সেই দুর্গপূজার আনন্দ এবং এ কালের এই ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ। এ উভয়ের মধ্যে যেন স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ। এ এক ছবি আর সে এক ছবি।"

এই খানে হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় জ্যোতিবাবু বলিলেন। "উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে ইহাঁর জন্ম। ইনি ইংরাজী শিক্ষা পান নাই। সেকেলে রীতি-অনুসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটু বাঙ্গলা ও একটু ফার্শী জানিতেন। কিন্তু প্রাচীন তন্ত্রের লোক হইলেও ইনি খুব সৎসাহসী ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। যখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন স্কুল খোলা হয়, ইনিই সর্ব্বাগ্রে সাহসপূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে বেথুন স্কুলে পাঠাইয়া দেন। ইনি গৃহী হইয়াও ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসী। ইঁহার গোঁপদাড়ি কামানো, মস্তক মুণ্ডিত এবং একটি শিখা ছিল। ভূতে দয়া এবং বিশ্বপ্রেমে তাঁহার চক্ষুদুইটি যেন জল্ জল্ করিত। মুখটি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। পরিধানে গৈরিক বসন। একটা ঔষধের কৌটা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তিনি দীন দুঃখীগণকে ঔষধ বিতরণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি ধর্ম্ম ও সামাজিক গান নিজেই রচনা করিয়া গাইতেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাহাতে সৎসাহসের আবির্ভাব হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশের সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গান বাঁধিতেন; যথা—

"ব্যাটা ছেলের * * * কড়ি সর্ব্বলোকে কয়
কলম্বস্ নাবিক ছিল সাহসে আমেরিকা গেল
দেশের বার্ত্তা জেনে শেষে দেশটি করলে জয়।"

ইত্যাদি।

ইহার রচিত গানগুলি শেষে ৺প্যারিচাঁদ মিত্র নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া দেন।" তিনি কি সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা জ্যোতিবাবু জানেন না। ইহার দুই কন্যার সহিত শেষে পর পর ৺হেমেন্দ্রনাথের সহিত এবং বীরেন্দ্রনাথের (জ্যোতিবাবুর ন' দাদা) সহিত বিবাহ হয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বেদে উষা

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের অন্যতম প্রমাণ)

উষা বেদের অতি প্রাচীন দেবতা। বেদ রচয়িতা ঋষিগণের কবিতা ইঁহার স্তুতিতে যেরূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে অন্য কোনও দেবতার স্তুতিতে সেরূপ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। ঋষিগণ এই দেবতাতে যেরূপ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাইয়াছেন—এরূপ আর অন্য কোনও দেবতাতে দেখিতে পান নাই। রমেশ বাবু উষা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের অনুবাদে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"উষা" আর্য্যদিগের বড় আদরের দেবী ছিলেন, ঋগ্বেদে উষা সম্বন্ধে ঋক্‌গুলি যেরূপ সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও স্নেহকবিত্বপূর্ণ অন্য দেবগণের সম্বন্ধে সেরূপ দেখা যায় না।

উষা স্বভাবতঃই রমণীয় কাল—ইহাতে আরও কোন বিশেষ সময়ের যোগ দ্বারাই ইহার রমণীয়তা বিশিষ্টরূপে ঋষিদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের নিকট উষার এরূপ মহিমা। সেই বিশেষ সময় আমরা বসন্তকাল বলিয়াই মনে করি। বসন্ত ঋতু ছয় ঋতুর মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া 'ঋতুরাজ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বসন্ত সময়ের উষাকালই আবার উৎকৃষ্ট কাল। সুতরাং বেদের উষা বসন্তকালের প্রভাত সময়কে বুঝাইলে ইহার অতি চমৎকার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে ঋষিদিগের কবি-হৃদয় যে কবিত্বের নূতন আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিবে এবং তাহাতে তাঁহাদের কবিতায় নূতন ভাব প্রতিধ্বনিত হইবে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

উত্তর মেরুমণ্ডলপ্রদেশে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন গতির ছয় মাস এক ক্রমে রাত্রিকাল থাকিয়া উত্তরায়ণ গতির ছয় মাস এক ক্রমে দিবা থাকে তাহা সকলেরই বিদিত আছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হইতেই সূর্য্যের উত্তর গতি আরম্ভ হইয়া সূর্য্য বিষুবরেখায় আসিতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে। সূর্য্য বিষুবরেখায় না আসিলে আর উত্তর মেরুমণ্ডলের নিকট উদিত দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বিষুবরেখায় আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূর্য্যের আলোক স্পষ্ট দৃষ্ট না হইয়া যে উষালোকরূপে দৃষ্ট হইবে তাহা আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মেরুমণ্ডলে সূর্য্যালোকের

উত্তর কুরু প্রদেশ উত্তর মেরুমণ্ডলের অতি সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহাতেও মেরুমণ্ডলেরই ন্যায় যে উষাকাল ও সূর্য্যোদয় হইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বেদের উষা আমাদের নিকট প্রধানতঃ উত্তরকুরু প্রদেশের মাস- ত্রয়ব্যাপী এই উষাকাল বলিয়াই বোধ হয়। আশ্বিন মাসে সূর্য্য বিষুবরেখার নিম্নে গমন করিলেই উত্তর কুরু প্রদেশে প্রকৃত রাত্রি আরম্ভ হয় এবং পৌষ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই রাত্রি স্থায়ী হয় তৎপর সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতি হইতেই উত্তর কুরুতে রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া আলোর বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই উত্তর কুরুতে উষার বিকাশ হইতে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত সূর্য্য চৈত্র মাসে বিষুবরেখায় আসিয়া উদিত না হয় সেই পর্য্যন্ত এই উষা স্থায়ী হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমস্ত ফাল্গুন ও চৈত্রমাসেরও কিছুকাল ব্যাপিয়া উষা বর্ত্তমান থাকায় ইহা বসন্তকালের যোগে যে সাতিশয় রমণীয়তা প্রাপ্ত হইত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; এবং বিষুবরেখা ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে সূর্য্যের সমস্ত চৈত্রমাসই লাগে বলিয়া তৎকালে উত্তরকুরু প্রদেশ হইতে যে সূর্য্যকে "বালার্ক সিন্দুর ফোঁটার" ন্যায় উষার 'ভালে' শোভা পাইতে দেখা যাইত তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং উত্তরকুরু প্রদেশের উষা যে প্রকৃত পক্ষে বসন্তকালেরই প্রভাত তাহা আমরা পরিষ্কারই বুঝিতে পারিতেছি। বেদের উষা যে বসন্তকালের [illegible]কে কিরূপে বুঝাইতে পারে তাহার স্পষ্ট আভাসও আমরা এখানে পাইতেছি।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বেদের মধ্যে কিরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব।

উষা যে পূর্ব্বে বহুকাল ব্যাপিয়া বিদ্যমান থাকিত নিম্নোদ্ধৃত ঋক্‌টিতে তাহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"শশ্বৎ পুরোষা ব্যুবাস দেব্যথো অদ্যেদং ব্যাবো মঘোণী।"

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১১৩ সূক্ত।

"উষাদেবী পূর্ব্বকালে নিত্য উদয় হইতেন, ধনবতী উষা এখনও এই (জগৎ) অন্ধকার বিমুক্ত করিতেছেন।"

রমেশবাবুর অনুবাদ।

Ragozin তদীয় Vedic India (বৈদিক ভারত) নামক গ্রন্থে ইহার এইরূপ ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছেন—

Perpetually in former days did the divine Ushas dawn; and now to-day the radiant goddess beams upon this world.

'শশ্বৎ' ও 'পুরা' ও 'ব্যুবাস' এই কয়টি শব্দ দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে এক সময়ে উষা অবিচ্ছিন্নভাবে বহুকাল স্থায়িনী হইত—সাধারণ উষার ন্যায় ক্ষণ-স্থায়িনী ছিল না। এই উষা বর্ণনার সূক্তেই আমরা ইহার সর্ব্বত্র সুমধুর আনন্দ ধ্বনির প্রবর্ত্তিকা রূপে উল্লেখ পাই যথা—

"ভাস্বতীনেত্রী সূনৃতামচেতি চিত্রা বিদুরোন আবঃ।"

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১১৩ সূক্ত।

আমরা প্রভাসম্পন্না সূনৃত বাক্যের নেত্রী বিচিত্রা উষাকে জানি।"

রমেশ বাবুর অনুবাদ।

এস্থলে রমেশবাবু "সুণৃত বাক্যের নেত্রী

সম্বন্ধে সায়নের টীকার অনুবাদ এইরূপ প্রদান করিয়াছেন—

উষার প্রাদুর্ভাব হইলে পশুপক্ষী মৃগাদি শব্দ করে এইজন্য তিনি "সুনৃত বাক্যের নেত্রী।"

শীতের পর বসন্তকাল সমাগমে জীব-জগতে যে নবজীবনের নবস্ফূর্ত্তির ভাব প্রতিধ্বনিত হয় এস্থলে তাহারই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। শীত-প্রধান স্থানের প্রচণ্ড শীতে অন্ধকারময় কুজ্ঝটিকা দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া নিরানন্দ জীবগণ বসন্তের প্রথম উজ্জ্বল আলোক সন্দর্শনে ও উষ্ণ বায়ু সেবনে যে অনির্ব্বচনীয় হর্ষাবেগের দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তাহা কি প্রকারে সঙ্গীতে নৃত্যে ক্রীড়ায় হাবভাবে প্রকাশিত হয় তাহার একটি চিত্র শীতপ্রধান দেশের কবির তুলিকাতে কিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি :—

"Spring, the sweet spring,
Is the year's pleasant king ;
Then blooms each thing ;
Then mads dance in a ring,
Cold doth not sting,
The pretty birds do sing,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, towitta-woo !
The palm and may
Make country houses gay,
Lambs frisk and play,
The shepherds pipe all day,
And we hear aye
Birds tune this merry lay,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, towitta-woo ;
The fields breathe sweet,
The daisies kiss our feet,
Young lovers meet,
Old wives a sunning sit,
In every street these tunes
our ears do great,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, towitta-woo ;
Spring ! the sweet Spring"—*J. Nash.*

বেদে আমরা পুরুরবা ও উর্ব্বশীর প্রণয় কাহিনীর যে উজ্জ্বল বর্ণনা প্রাপ্ত হই—তাহা উত্তর কুরুর উষাকালেরই বিচিত্র কাব্য-চিত্র বলিয়া আমরা মনে করি। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ ৯৫ম সূক্তে আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রণয়কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই। এই সূক্ত সম্বন্ধে রমেশবাবু ঋগ্বেদানুবাদে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—

এই সূক্তে উর্ব্বশী ও পুরুরবার বৈদিক উপাখ্যান আখ্যাত হইয়াছে। পুরুরবা অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত কিছুকাল সহবাস করিয়াছেন,. উর্ব্বশী এক্ষণে পুরুরবাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা, পুরুরবার আদি অর্থ সূর্য্য। সূর্য্য উদয় হইলে উষা আর থাকে না।"

রমেশবাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ১৫৮৩ পৃঃ।

পুরুরবা যে সূর্য্য তাহা তাহার নামের 'রব' অংশ দ্বারাও প্রমাণিত হয়—কারণ সূর্য্যবাচক রবি শব্দ ও এই 'রব' এক ধাতু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আচার্য্য মোক্ষমূলর এইরূপ আলোচনা করিয়াছেন :—

That Pururavas is an appropriate name of a solar here hardly requires any proof. Pururavas meant......ended with much light ; for though rava is generally used of sound, yet the root ru, which means originally to cry, is also applied to color in the sense of a loud or crying colour, *i.e*, red * * * (Sanskrit Ravi, sun). Besides Pururavas calls himself Vasishtha (১৭ ঋক্), which as we know, is a name of the Sun ; and he is called Aida (১৮ ঋক্), the son of Ida, the same name is elsewhere (Rig Veda III, 29, 3) given to Agni, the fire.—Maxmuller's Selected Essays (1881), Vol. I, pp. 407, 408. রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ১৫৮৪ পৃঃ।

পুরুরবার সহবাসে উর্ব্বশী কিছুকাল

ছিলেন রমেশবাবু লিখিয়াছেন। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর আখ্যান হইতেই আমরা কতকাল পুরুরবার সহবাসে ছিলেন তাহা জানিতে পারি। যথা

"যদ্বিরূপাচরং মর্ত্তেষ্ববসং রাত্রীঃ শরাশ্চেতস্রঃ।
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ধৌত সূক্ত।

"আমি পরিবর্ত্তিতরূপে ভ্রমণ করিয়াছি, মনুষ্যাদিগের মধ্যে চারি বৎসর রাত্রি বাস করিয়াছি।"

রমেশবাবুর অনুবাদ।

রমেশবাবুর অনুবাদ আমাদের নিকট পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয় না। আচার্য্য মোক্ষমূলর যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহাই আমাদের নিকট স্পষ্ট ও প্রকৃতার্থক বলিয়া বোধ হয়। আচার্য্য মোক্ষমূলরের মতে

অবসং রাত্রীঃ শরদঃ চতস্রঃ॥" ইহার অনুবাদ—"I dwelt with thee four nights of the autumn." (রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ১৫০৬ পৃ) "আমি শরৎকালের চারি রাত্রি তোমার সহিত বাস করিয়াছি।

দক্ষিণায়ণ গতিতে আশ্বিন হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের বিষুবরেখার নিম্নে গমন হেতু অদর্শনের দ্বারা উত্তরকুরুতে যে চারি মাস ব্যাপিয়া অন্ধকার বা রাত্রিকাল বর্ত্তমান থাকে—এখানে চারি শরৎ রাত্রি তাহাই বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির সহিত সূর্য্যের উত্তর গতিতে উত্তর কুরুতে উষার বিকাশ হইতে থাকিলে তাহার পর ক্রমে সূর্য্যের প্রকাশে উষা যে চলিয়া যাইতে উদ্যত হয় তাহাই পুরুরবার সহিত উর্ব্বশীর বিচ্ছেদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং শরতের চারি মাসের সহবাসের পর বসন্তকালেই যে উষা বা উর্ব্বশী সূর্য্যের নিকট প্রকাশ্যরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যতা হন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। শরতের চারি মাস রাত্রি থাকাতে উষার বিকাশ না হওয়ায় তাহা যে সূর্য্যের সহিত উষার রাত্রিতে সহবাস বলিয়া বর্ণিত হইবে তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। তৎপরে বসন্তকালে উষা সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইলে বালারুণের সহিত তাহার যে প্রথম সংযোগ হয় এই অরুণই পুরুরবা ও উর্ব্বশীর সহবাসোৎপন্ন পুত্র বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দাধদ্যোত্তরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।
জনিষ্টো অপো নর্য্যঃ সুজাতঃ প্রোর্ব্বশী তিরত
দীর্ঘমায়ুঃ॥" ১০
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৯৫ সূক্ত।

"যে উর্ব্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল, এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উর্ব্বশী তাহাকে দীর্ঘায়ু করুন্।"

উষাকে আমরা অরুণঅশ্ববাহিতরথে যে আগমন করিতে দেখি তাহাতেও অরুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়, যথা—

প্রবোধয়ন্ত্যরুণেভিরশ্বৈরোষাযাতিসুযুজা রথেন॥ ১৪
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১১৩ সূক্ত।

"(সুপ্ত প্রাণীদিগকে) জাগরিত করিয়া উষা অরুণ-অশ্বযুক্ত রথে আগমন করিতেছেন।

সূর্য্য এই বালারুণ অবস্থা হইতে তরুণ বা তরণি অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেই উষা অন্তর্হিত হয়। তাহাতেই পুত্রজন্মের পর উর্ব্বশী আর পতির নিকট থাকিবেন না বেদে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

"প্রস্তত্তে হিনবা যত্তে অস্মে পরে হ্যস্তং নহি মূরমাপঃ॥" ১৩
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৯৫ সূক্ত।

"আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছ, তাহাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। হে নির্ব্বোধ! গৃহে ফিরিয়া যাও, আমাকে আর পাইবে না।"

পুরুরবা ও উর্ব্বশীর পৌরাণিক আখ্যানে আমরা যে শাপ বিবরণ প্রাপ্ত হই তাহার মূল আমরা এইখানেই দেখিতে পাই।

পুরুরবা ও উর্ব্বশীর বৈদিক আখ্যানে আমরা যে সূর্য্য ও উষার প্রণয়ভাব চিত্রিত দেখিতে পাই তাহা বসন্তকালে লোকের মনে যে নব প্রেমভাব সঞ্চারিত হয় তাহা হইতেই কল্পিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বস্তুতঃ বসন্ত ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কাম ও তৎপত্নী রতির আদর্শ পুরুরবা ও উর্ব্বশী হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বেদের একস্থলে ইন্দ্র, উষার রথ ভগ্ন করিয়া দিতেছেন ও উষার সহিত শত্রুভাবে ব্যবহার করিতেছেন এমন কি তাহাকে বধ করিতেছেন এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—

"এতদ্ঘেদুত বীর্য্যমিন্দ্র চকর্থ পৌংস্যম্।
স্ত্রিয়ং যদ্দুর্হণায়ুং বধী দুহিতরম্ দিবঃ ॥৮
দিবশ্চিদ্ঘা দুহিতরং মহান্মহীয়মানাং।
উষাসমিন্দ্র সং পিণক্ ॥৯
অপোষা অনসঃ সরৎ সং পিষ্টাদহ বিভ্যুষী।
নিষৎসীং শিশ্নথদ্বষা ॥১০

ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৩০ সূক্ত।

"হে ইন্দ্র! তুমি এই প্রকার বীর্য্যশালী বল প্রদর্শন করিয়াছিলে। তুমি দ্যুলোকের দুহিতা হননাভিলাষিনী স্ত্রীকে বধ করিয়াছিলে।"৮

"হে মহান্ ইন্দ্র! তুমি দ্যুলোকের দুহিতা পূজনীয় উষাকে সংপিষ্ট করিয়াছিলে।'৯

"অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্র) যখন উষার (শকট) ভগ্ন করিয়াছিলেন, তখন উষা ভীতা হইয়া ভগ্ন শকট হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন।১০

এখানে ইন্দ্রের দ্বারা উষার নিগ্রহের

প্রকৃতার্থ কেবল উষাপ্রকৃতির মূল রহস্যের দ্বারাই পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। উষা বসন্তকালের প্রভাত বা উজ্জ্বল পরিষ্কার প্রভাতের নাম হইলে তাঁহার সহিত যে মেঘ-বাহন ইন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে তাহা স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে। বসন্ত-কালীন উষা অনার্দ্র ও নির্ম্মল বলিয়া মেঘ-বর্ষণকারী ইন্দ্র যে ইহাকে মেঘবর্ষণের প্রতিবন্ধিকা বলিয়া ইহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইবেন তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। সুতরাং বর্ষাকালের মেঘাড়ম্বরের মধ্যে উষার সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইলে তাহাই যে ইন্দ্র কর্ত্তৃক উষার নির্য্যাতন বলিয়া কথিত হইবে তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত হইতে আমরা জানিতে পারি যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া বৃষ্টির প্রাচুর্য্যদর্শন করেন। তাহা হইতেই বেদে প্রথম ইন্দ্রের কল্পনার উৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষে উত্তরকুরুর ন্যায় ছয়মাসী দিন না হওয়ায় বসন্তকালের উষাই একমাত্র উষা নহে। এখানে যেমন প্রতি ষাইট্ দণ্ডেই একবার দিন রাত্রি হয় তদ্রূপ দৈনিক উষাও হইয়া থাকে। তাহাতেই বর্ষাকালের উষার সহিত ইন্দ্রের প্রতিদিনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখিতে পাই। পূর্ব্বোক্তরূপে ইন্দ্র যেমন উষার শত্রু তেমনই সূর্য্যেরও শত্রু। কিন্তু ইন্দ্র যে সর্ব্বদাই উষার শত্রু তাহা নহে কোন কোন সময়ে ইন্দ্রকে উষার পথ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে আলোক প্রদানে নিয়োজিত করিয়া বা উজ্জ্বলতা প্রদান করিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বর্ষাকালের বর্ষণ দ্বারা উষার সৌন্দর্য্য

আচ্ছন্ন থাকিলেও অন্য সময়ে মেঘের উপর ঊষার অপূর্ব্ব কিরণচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যের বিশেষ সৌষ্ঠবই সম্পাদিত হইত।

ঊষার প্রতি ইন্দ্রের ব্যবহার সম্বন্ধে রেগোজিন (Regozin) যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করি।

"On the same principle we can understand how the Dawn herself—Ushas, the beautiful, the auspicious could be treated by Indra at times with the utmost severity; in seasons of drought, is not the herald of another cloudless day, the bringer of the blazing sun, a wicked sorceress, a foe to gods and men, to be dealt with as such by the Thunderer, when, Soma-drunk, he strives with his friends the Maruts to storm the brazen stables of the sky, and bring out the blessed milch-kine which are therein imprisoned; Indra's treatment of the hostile Dawn is as summary as his treatment of Surya though at other times he is as ready to help her, and lay out a path for her and "cause her to shine" or "light her up".

Vedic India p 220.

বেদে আমরা ঊষাকে যে "শুক্রবাসা" (১।১১৭।৭) 'কৃশদ্বাসঃ' (৭।৭৭২) রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই তাহাতে বাস শব্দটী আমাদের নিকট কিরণার্থক বলিয়াই বোধ হয়। কারণ বাস শব্দের বস্ ধাতুটি আমাদের নিকট কিরণবাচী বলিয়াই মনে হয়। বিবস্বৎ শব্দে আমরা এই ধাতুরই যোগ দেখিতে পাই এবং ইহার অর্থও কিরণই দেখিতে পাই। কিরণ পর্য্যায় 'উস্র' শব্দটীও আমরা বস্ ধাতু হইতেই সিদ্ধ

যোগ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে ইহার প্রকৃতিগত অর্থ "কিরণোজ্জ্বল" হয়। এই প্রকারেই উজ্জ্বলতাবাচক এক বস্ ধাতু নিষ্পন্ন বাস ও বস শব্দের যোগের দ্বারা ঊষা ও বসন্তের মধ্যে যোগ প্রতিপাদিত হইতে পারে।

বসন্তের সহিত ঊষার যোগের আর একটি ভাষার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত ঋক্ হইতে পাওয়া যায়ঃ—

"আস্নো বৃকস্য বর্ত্তিকামভীকে যুবং নরানাসত্যা মুমুক্তম্॥১

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১১৬ সূক্ত।

"হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়! তোমরা বৃকের মুখ হইতে বর্ত্তিকাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলে।

রমেশবাবু এস্থলে এইরূপ টীকা করিয়াছেন—

"সায়ন ঋকের এই শেষার্দ্ধের অর্থ করেন নাই। বর্ত্তিকা চড়াই পাখী (চটকা) সদৃশ পক্ষীর স্ত্রী। অরণ্যের একটি বুকুর (বৃক) পুরাকালে তাহা ধরিয়াছিল, অশ্বিদ্বয় তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন।" সায়ন।

কিন্তু যাস্ক ইহার অন্য অর্থ করেন। বার বার প্রত্যাবর্ত্তন করে সেই "বর্ত্তিকা" অর্থাৎ ঊষা। আলোকদ্বারা জগৎকে আবরণ করে সেই বৃক অর্থাৎ সূর্য্য। সেই বৃক ঊষার পশ্চাতে আসিয়া অর্থাৎ ঊষার পর উদয় হইয়া ঊষাকে ধরেন। অশ্বিদ্বয় উহাকে ছাড়াইয়া দেন। রমেশবাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ২৬৭ পৃঃ।

"আচার্য্য মোক্ষমূলর—বর্ত্তিকানামক পক্ষী বসন্তকালে আগত প্রথম পক্ষী এইরূপ মন্তব্য করিয়া তৎপর যাস্ককৃত ব্যাখ্যা অনুসরণ করতঃ ইহাকে ঊষা অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

"The quail in Sanskrit is called Vartika, i.e. the returning bird, one of the first birds which return with the returning spring. The same name is

beings delivered or revived by the Asvins i. e. by day and night, and I believe, the returning is again, one of the many names of the dawn. The science of Language (1882). Vol II, p 553—রমেশবাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ২৬৭ পৃঃ

এস্থলে বসন্তপক্ষীবিশেষ ও উষা এই উভয় অর্থ হইতে বসন্ত কালের উষাই যে বিশেষ রূপে বর্ত্তিকা নামে অভিহিত হইয়াছে তাহাই আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে আমরা ইষ্টার (Easter) নামে এক বাসন্তী দেবীর উল্লেখ পাই। ইহার সম্বন্ধে Chamber's Twentieth Century Dictionaryতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে Eastera agoddess whose festival was held at the spring equinox." এই ইষ্টার নাম গ্রীক্‌দিগের ইওস্ (Eos) নামেরই অনুরূপ। ইওস্ (Eos) গ্রীক্‌দিগের উষাদেবী সুতরাং ইষ্টার বসন্ত কালেরই উষাদেবী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নামের এই সাদৃশ্য হইতে ইঁহাদের আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষগণ যে উত্তর কুরুতেই একত্রে বাস করিতেন তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি।

মেরুমণ্ডলে সূর্য্য, যে ছয়মাস অদৃষ্ট থাকে তখন যে বিদ্যুতাত্মক জ্যোতি দ্বারা লোক দিগের জীবনব্যাপার নির্ব্বাহিত হয় তাহার সাধারণ নাম Aurorra বা মেরুজ্যোতিঃ। এই Auroa নামের মূল ইতিহাস ইংরেজী অভিধানে যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—তাহাতে ইহার সহিত উষা নামের স্পষ্ট যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। Chamber's Twentieth Century Dictionaryতে ইহার মূল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

According to Curtius, a reduplicated form for aurora from a root seen in Sanskrit ush, to burn cognate with greek eos dawn.

মেরুজ্যোতিঃ যেরূপ ভাবে বিস্তার প্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়, বেদে আমরা উষারও তদ্রূপ বর্ণনাই প্রাপ্ত হই যথা—

প্রতিকেতবঃ প্রথমা অদৃশ্রন্নূর্দ্ধা অস্যা অঞ্জয়ো বিশ্রয়ন্তে॥
উষা অর্ব্বাচা বৃহতা রথেন জ্যোতিষ্মতা বামস্মভ্যং বক্ষি।
৭ম মণ্ডল ৭৮ সূক্ত।

"প্রথম কেতুসকল দৃষ্ট হইয়েছে। উহার ব্যঞ্জকরশ্মিসকল উর্দ্ধমুখ হইয়া সর্ব্বত্র আশ্রয় করিতেছে। হে উষাদেবি! আমাদের অভিমুখে আগত হও, বৃহৎ জ্যোতিষ্মান্ রথদ্বারা আমাদের জন্য রমণীয় ধন বহন কর।"

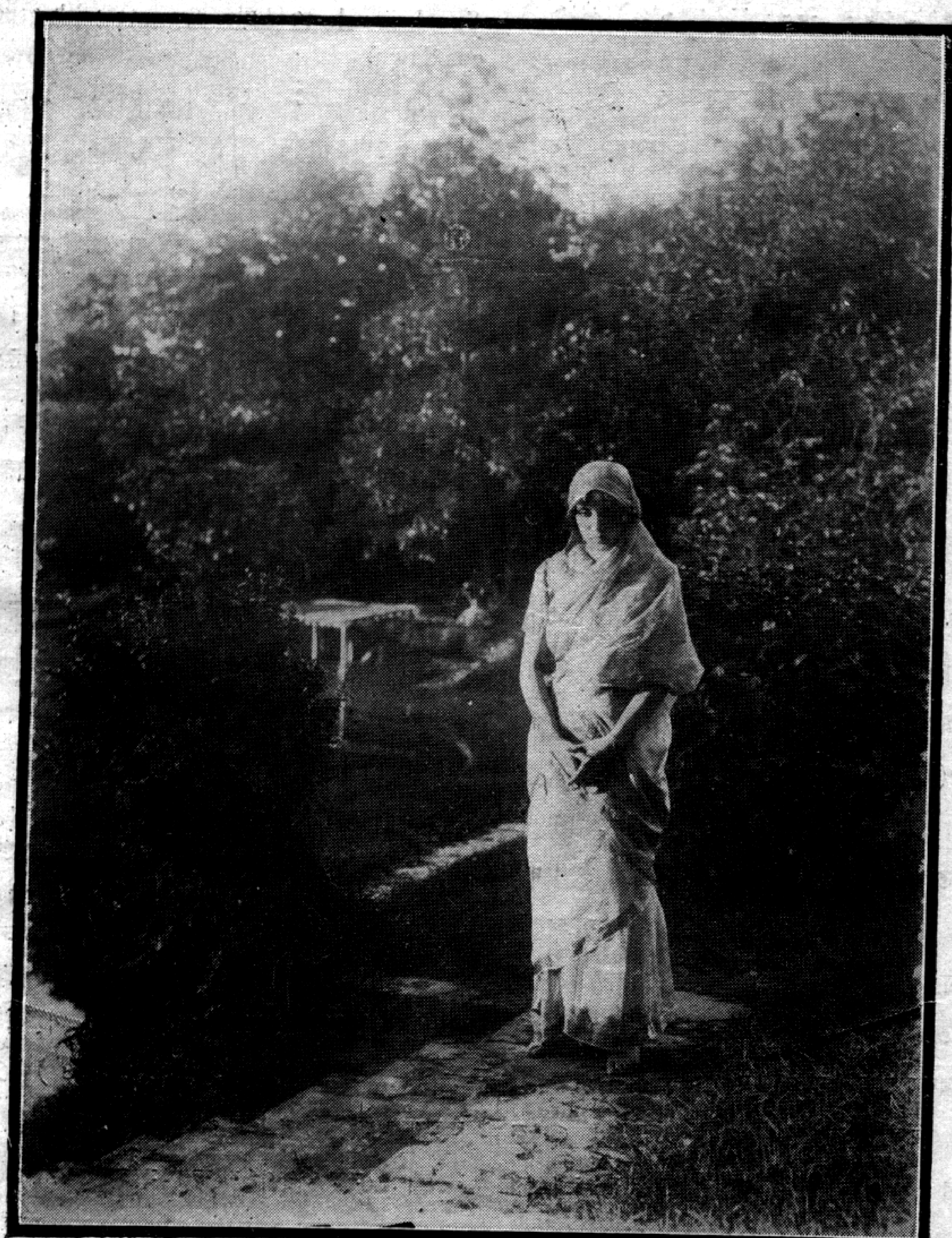
এইরূপ সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকিলেও আমরা কিন্তু Aurora শব্দটী উর্ব্বশী শব্দেরই অধিক অনুরূপ বলিয়া মনে করি। উর্ব্বশীর বর্ণনায় আমরা তাঁহাকে স্পষ্টই Aurorar ন্যায় বিদ্যুতাত্মিকা রূপেই বর্ণিত দেখি যথা—

বিদ্যুন্ন যাপতন্তী দবিদ্যোত্তরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।" ১
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৯৫ সূক্ত।

যে উর্ব্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল।

উষার সহিত যে অরুণাশ্বের যোগ আমরা বেদে দেখিতে পাইয়াছি (১।১১৩।১৪) সেই অরুণ অশ্ব, অরুণ কিরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই অরুণ শব্দের সহিতও Aurora শব্দের সবিশেষ সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়।

এইরূপে উষার নাম ও বর্ণনা উভয় প্রকারেই উত্তরকুরুর সহিত ইহার প্রথম সংযোগের সুস্পষ্ট নিদর্শনই আমরা উপরে দেখিতে পাইলাম।

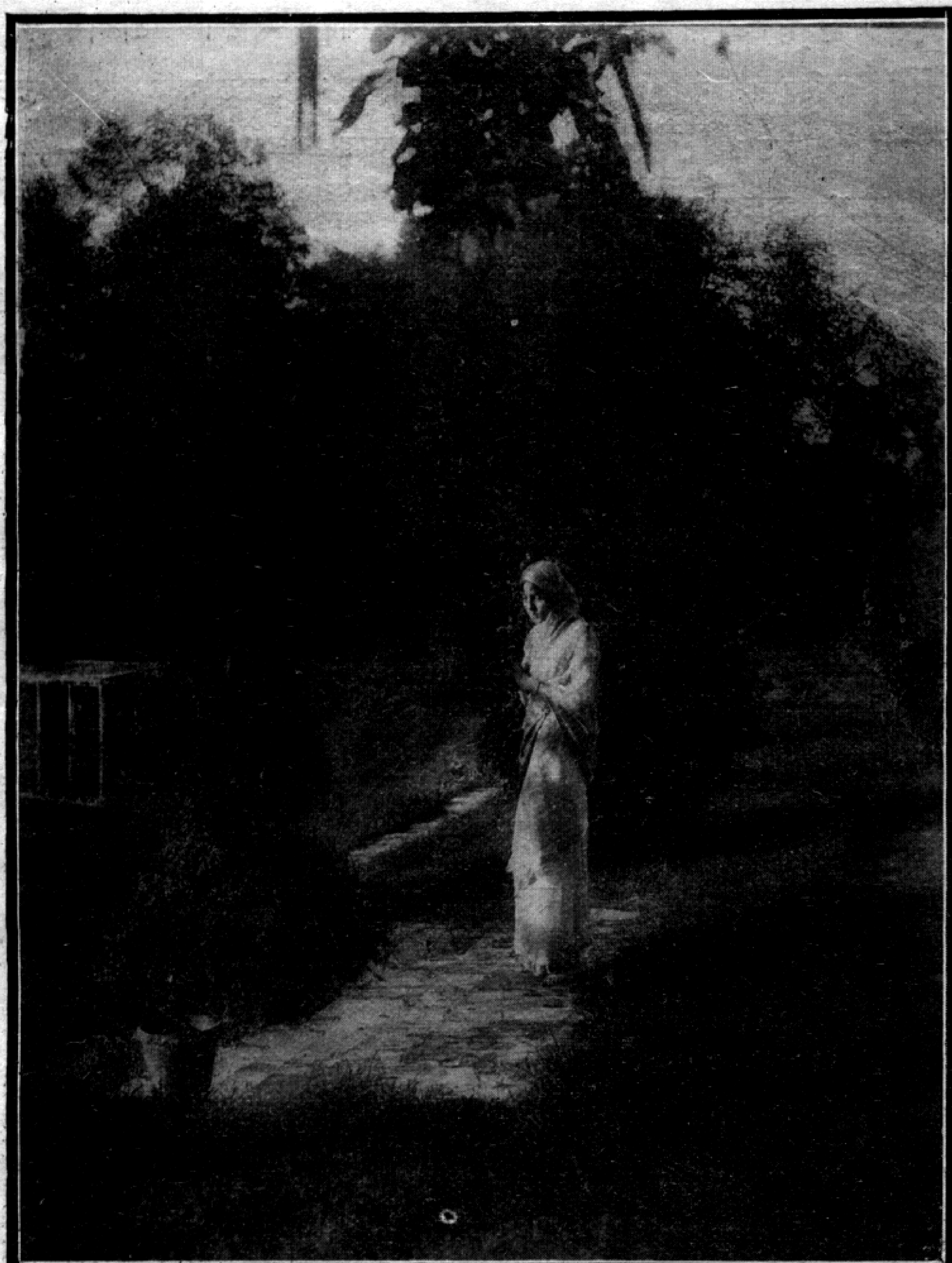


ফটোচিত্র

ক্যামেরার দ্বারা বিবিধ মনোভাবের প্রকাশ

আমরা সকলেই কিছু কবি হইতে পারি না; বিধাতা এ অক্ষমতার বিধান করিয়া, অধিকাংশ লোকের উপকারই করিয়াছেন বলিতে হইবে। তবুও কবির মত মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার ব্যাকুল বাসনা, আমরা অনেকেই অন্তরে পোষণ করিয়া থাকি। আকাশে আলো-ছায়ার খেলার মত, মনে কত ভাবেরই উদয় অবসান হয়; কখনো অকারণ বিষাদ, কখনো বা আনন্দের আভাসমাত্র, কখনো ভাবটি ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণস্থায়ী ;—তাহা সুখ কি দুঃখ, আশা কি আশঙ্কা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না! নির্জ্জন পল্লীপথে ভ্রমণকালে আকাশে মেঘের সমারোহ, প্রান্তর-প্রান্তে ধূপছায়া কুহেলিকা-ওড়নার লীলা, দিগ্‌বলয়ে বিলীয়মান গিরিমালার সুষমা দেখিয়া মন ক্রমে অপূর্ব্ব বিচিত্রভাবে ভরিয়া ওঠে। সে ভাব স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া বুঝানো কঠিন, তাই কবি বলিয়াছেন,—"যে অভিনব ব্যাকুলতায় হৃদয় পরিপূর্ণ তাহাকে দুঃখ কিম্বা বেদনা বলিতে পারি না; বৃষ্টির সহিত বাষ্পের যে সাদৃশ্য আমার এই মনোভাবের সহিত দুঃখেরও তেমনি সম্বন্ধ।" মন যখন এই "সুখমিতি দুঃখমিতি"র ভাবে ভরিয়া ওঠে আমরা যাহা প্রকাশ করিতে উৎসুক অথচ অপারগ, তখন যে প্রতিভাবান কবি কাব্যের বর্ণে অনির্ব্বচনীয়ের ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, ভাবকে ভাষায় বন্দী করিয়া রাখেন, তাহাকে ঈর্ষ্যা না করিয়া থাকিতে পারি না। ব্যাকুলতার যখন অবসান হয় তখন উহা পাগলামি মনে করিয়া আবার হাসিও আসে। প্রকাশ করিতে পারি আর নাই পারি, ক্ষণিক হইয়াও এই অনুভব, আমাদের মনকে ঐশ্বর্য্যবান করিয়া দিয়া যায়। প্রকাশ যে করিতে পারিলাম না তজ্জন্য ক্ষতি বিশ্বজগতে আমার ভিন্ন আর কাহারও হইল না—কেননা অনুভবের তীব্রতা হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের সে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যছবি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া যায়, সেই অপূর্ব্ব-আনন্দ মুহূর্ত্তটিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য স্মৃতির আর কোন সহায়ই থাকে না। তুষার-শুভ্র মেঘরাজি বাতাসে অমল পাল উড়াইয়া আকাশ-সাগর হইতে কখন যে অদৃশ্য হইয়া গেল ;—কোন্ সুদূরের দেশে তৃষা তপ্ত কাহাকে সঞ্জীবিত, কোন্ বিরহীর নেত্রকে অভিনন্দিত করিল জানিতেও পারিলাম না। গিরিমালার মুখ হইতে গোধূলির রহস্য-আবরণখানি অপসারিত হইয়া যেমনি কঙ্কর দুর্গম পাষাণ প্রকাশ হইল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন হইতেও ভক্তহৃদয়ে দেবদর্শন-ব্যাকুলতার মত যে পুণ্য অনির্ব্বচনীয় ভাবরসধারা উদ্বেলিত হইতেছিল তাহাও না জানি কোথায় বিলীন হইয়া গেল!

আমাদের এই যে নিরন্তর ক্ষতি তাহা পূরণের একটি অতি সহজ উপায়,—ক্যামেরার সাহায্যে আলোক চিত্রের মধ্যে সুন্দর মনোরম দৃশ্যগুলিকে চিরস্থায়ী করিয়া লওয়া। কবির লেখনী, চিত্রকরের তুলিকার সহিত আলোকচিত্রকরের ক্ষুদ্র যন্ত্রটি ও তাহার ক্রিয়াকলাপের তুলনা করিতে সাহস হয় না; তবুও বলিব, যাহাদের



ফটোচিত্র

মনে বিচিত্র ভাব সঞ্চার হইয়া থাকে, অথচ কবির মত তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য যাহাদের নাই, তাহাদের এ অভাব দূর করিতে ক্যামেরার মত বন্ধু ও সহায় বড় দুর্লভ। কবি, যে প্রতিভার বলে বাক্যের বিন্যাসে ভাবকে মূর্ত্তিমান করিতে পারেন, সে শক্তি তাহাদের নাই বটে; কিন্তু তাহাদেরও দেখিবার এবং অনুভব করিবার শক্তি আছে। যাহা দেখিল, যাহা অনুভব করিল তাহা যে রমণীয়, পবিত্র ও মহিমান্বিত, তাহাও যে অনন্তেরই ক্ষণিক বিকাশ সে বোধ তাহাদের আছে। ক্যামেরা এই বোধকে প্রত্যক্ষ প্রকাশ ও এই সৌন্দর্য্যকে বাস্তব আকারে পরিণত করে। মেঘের সৌন্দর্য্য, কুহেলিকার রহস্য, দর্শকের মনোভব নয় সত্য, ভাষায় তাহাদের বর্ণনা করিতে হইলে যে বাক্য-সম্পদে অধিকারী হওয়া আবশ্যক, অনেকেরই সে সৌভাগ্য নাই; তবুও এই মেঘ-তরঙ্গ, এই ধূসর কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন পর্ব্বতব্যূহের ছবি, যাহা মন হইতে হারাইয়া যায় তাহাকে ধরিয়া রাখে। কত সুদীর্ঘ বৎসর পরে, সে মেঘ যখন কবেকার বৃষ্টিধারায় গলিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, যখন সেই কুয়াসা কত প্রভাত প্রদোষের বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে —তখনও ছবিখানি সেই আনন্দ কিম্বা বিষাদ-মুহূর্ত্তের সাক্ষ্যস্বরূপে জীবিত থাকে; তাহার দৃষ্টি চিত্রকরের মনে বিস্মৃত-প্রায় অতীতকে বর্ত্তমানে জাগরূক করিয়া তোলে। বীণার মূর্চ্ছনা ঝঙ্কারের মত অন্তরকে জাতিস্মর করে;—যে সঙ্গীত একদিন তাহার অন্তরের সঙ্গোপনে বাজিয়াছিল, সে আবার তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়।

সাধারণের প্রতিপত্তিলব্ধ কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফোটোগ্রাফ দেখিয়া দর্শকের মনে যে ভাবোদয় হয়, চিত্রকর নিজে যখন তাহা দেখেন, তখন তাঁহার মনে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবের সঞ্চার হয়। তাহার কাছে সে ছবিখানি কেবলমাত্র একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য,—নদীর স্রোতধারা, কিম্বা সূর্য্যকরোজ্জ্বল সাগরের বিস্তার নয়, তাহা তাঁহার মনের আকাঙ্ক্ষা ও কামনা, অন্তরে সঞ্চিত চির-সুন্দর—সুমধুর স্মৃতি, তাঁহার জীবনের পরশ-মণি,—একবার যাহার ক্ষণিক আবির্ভাবে হৃদয়ের সকল দৈন্য দূর হইয়াছে। দৃশ্যটি যে সুন্দর একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই যে-কেহ সে কথা বুঝিতে পারেন, কিন্তু চিত্রকরই একমাত্র জানেন, প্রকাশের অপেক্ষা তাহার ভাব আরো কত সুন্দর ছিল। এই জ্ঞানই তাঁহার নিজস্ব আনন্দ;—পারিলেও তিনি আর কাহারও সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই ছবিখানিই তাঁহার মনোনিহিত অব্যক্ত কবিতা, তাঁহার ইষ্ট সাধনার সঙ্গোপনমন্ত্র। অন্যের নিকট হয়ত বা তাহা ছন্দলালিত্যবর্জ্জিত নিতান্ত প্রাকৃত-বলিয়াই মনে হইতে পারে, তাহার গঠন-পারিপাট্যে অনেক ত্রুটি প্রকাশ পাইতে পারে; তবুও সেখানি দেখিয়া রচয়িতার মনে যে অনুপম সৌন্দর্য্য ছবি, যে অপূর্ব্ব রাগিণী জাগরিত হয়, আর কোথাও তিনি তাহা খুঁজিয়া পান না।

ক্যামেরার সাহায্যে এই উপায়ে আমরা সকলেই আমাদের সীমাগত সামান্য ক্ষমতার যোগ্য কবি হইতে পারি। যদি অন্যে আমাদের মনের এই ভাব-নিমেষ



ফটোচিত্র



ফটোচিত্র

গুলি, এই চিত্র-শ্লোকগুলি বুঝিতে না পারে ক্ষতি নাই! নিমেষের সেই অতুলন মনোভাব, সেই পরিপূর্ণ আনন্দ, নিমেষের মধ্যেই পুষ্পের মত ঝরিয়া গিয়াছে, তাহার সুগন্ধ হৃদয়ে বসতি করিতেছে, চিত্রখানির সাহায্যে আবার তাহাকে যে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি তাহাই আমাদের পরম সুখ, তাহাই আমাদের সাধনার চরম সার্থকতা।

শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী।

সাফ্রেজিষ্ট প্রসঙ্গ

সমাজে রমণীজাতির যত স্বাধীনতা বাড়ে—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক নিয়মে ঘরকন্না করা শিশুপালন ও গৃহস্থালি শিক্ষা বাড়ে সমাজের ততই উন্নতি হয়। ঘরকন্নার সর্ব্ববিষয়ে, (domestic life) তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে পারিলে গৃহের পক্ষে মঙ্গল যেমন অবশ্যম্ভাবী সেইরূপ রাজ্যের অন্যান্য বিষয়েও রমণীদের মতামত দেওয়ার ক্ষমতা থাকিলে সমাজের ও রাজ্যের অভিব্যক্তি উচ্চতর হইবারই সম্ভাবনা। আজকাল বিলাতের সাফ্রেজিষ্ট প্রসঙ্গও এই ভাবে বিচার করিতে হইবে।

স্ত্রীজাতির সমুন্নত অবস্থাই আমেরিকার দেশহিতৈষিতার প্রকৃষ্ট কারণ। এত হিতব্রত ইউরোপের কোন দেশে নাই। তাঁহাদের দেশের মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী সকলেই সমাজের হিতকর কার্য্যে তৎপর। স্ত্রীজাতিসুলভ দয়া দাক্ষিণ্য গুণে "কারনিজীর ইনস্টিটিউটে"র কত লক্ষপতির ধনী কন্যাগণ স্বদেশের ও বিদেশের কতই না হিতকরী কার্য্য করিতেছেন। ইঁহাদেরই জন্য দেশের দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কত রকমের অনুষ্ঠান হইয়াছে। কতদিকে জ্ঞানচর্চ্চার পথ খুলিয়াছে!

কারনিজী ইনস্টিটিউসনে "ক্রেল নামক" এক শরীরবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত (Physiologist) জীবজন্তু মরিয়া গেলেও তাহাদের অনেক দিন কৃত্রিম উপায়ে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন। এই অবস্থায় সেই জন্তুগুলির সম্পূর্ণ সজীবতা থাকে। আর তিনি "কর্কট" cancer রোগের কোষগুলিকে লইয়া এমন কৃত্রিম উপায়ে রাখিতে পারিয়াছেন যে তাহাতে তাহারা বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে এককালে মানুষকে এইরূপে অন্তত কতদিনের জন্যও বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যাইবে এবং কর্কট রোগেরও প্রতিকার সম্ভবপর হইয়া উঠিবে।

বিদেশের মঙ্গলের জন্য আর কোন দেশ এমন করিয়া প্রাণপাত করে না। তাঁহাদের দেশের রমণীসমিতি কত খরচ করিয়া দেশের পুরুষ ও রমণী প্রচারকগণকে বিভিন্ন দেশে পাঠাইতেছেন।

আমাদের দেশের 'পুষা' কৃষি কলেজ এক আমেরিকা রমণীর অনুষ্ঠান। স্বামীর সঙ্গে ভারতবর্ষে দেশভ্রমণে আসিয়া তিনি

এ দেশের লোক সকলকে দেখিয়া বড়ই ম্রিয়মান জাতি বলিয়া ধারণা করিলেন ও স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি করিলে ভারতবর্ষের লোকদের এমন বিমর্ষতা ঘুচে। তাঁহার স্বামী বলিলেন, ভারতবর্ষ এত উর্ব্বরা হইলেও তাহারা কৃষিকার্য্যে আধুনিক অনুষ্ঠানগুলি এখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই অভাবের প্রতিকার করিলেই তাহাদের অন্নকষ্ট ঘুচিবে, চিত্ত হৃষ্ট হইবে। স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া সেই রমণী তৎক্ষণাৎ ভারতের কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষের জন্য বিপুল অর্থ দিলেন। সেই বিদেশের দান হইতেই পুষা কৃষিকলেজের ভিত্তিস্থাপন। এখন তাহা হইতে ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞানের কত নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সার দেওয়ার প্রথা ও জমীর কি উপাদান উপকারী—ইত্যাদি ইত্যাদি। পুষা কৃষিকলেজের বাৎসরিক রিপোর্ট সব পরে পরে দেখিলে ভারতীয় কৃষি কত শীঘ্র শীঘ্র উন্নতির পথে যাইতেছে তাহা বুঝা যায়। এ কি "বিশ্বজনীন উদারতা।"

ইংরাজজাতিতেও উদার ভাবের অভাব নাই। বহু দেশের বীর শোণিত ইংরাজজাতিতে মিশ্রিত। জর্ম্মান, নর্ম্ম্যান, ডেনস্ স্যাক্সন্ প্রভৃতি ইউরোপ ভূমিখণ্ডের বীর জাতিরা বারবার ইংলণ্ড জয় করিয়া ও এইখানে বসবাস করিয়া, বিবাহসূত্রে ক্রমশ একজাতি হইয়া পড়িয়াছেন। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র স্থান কিন্তু দূর দূরান্তরে ইহার রাজ্য-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া রহিয়াছে। বাণিজ্যে সুনিপুণ বলিয়াই তাঁহাদের শক্তি এত

লইতে চান না। অনেক দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্য দেশের অবস্থা দেখিয়া তবে ইহারা ধীরে ধীরে পা ফেলেন।

ইংরেজের জাতীয় ইতিহাসে কত অপকর্ম্ম পূর্ব্বে পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এখন তাহার অনেক সংশোধিত হইয়াছে। একটি উদাহরণ "Slave Trade" দাস ব্যবসা। যখন ইউরোপীয় জাতিসকল আমেরিকার উর্ব্বর প্রদেশ লাভ করিবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া জমী দখল করিলেন তখন সে জমীগুলি খনন কর্ষণ ও তাহাতে শস্য উৎপাদনের জন্য আফ্রিকার সমুদ্রের ধার হইতে রাশি রাশি নিগ্রো জাতিকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহারা পশুর মত তাহাদিগকে খাটাইতে লাগিলেন। এই দাস ব্যবসা ইংলণ্ডে শত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। পরে ইংরাজই আবার কত লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া এই ব্যবসা বন্ধ করিয়াছেন।

আবার এসিয়াতেও এইরূপ অপকর্ম্মের এখন সংশোধন চলিতেছে। আফিমের ব্যবসায়ে ১২ ক্রোড় টাকা ভারত-গবর্ণমেণ্টের লাভ ছিল। কিন্তু তথাপি এ ব্যবসায় তাঁহারা উঠাইয়া দিতেছেন। ইংরাজ জাতির ধর্ম্ম বুদ্ধি এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে চীনকে নিজেদের বাধ্য করিবার জন্য যুদ্ধ বাধে ও জয়ী হইয়া ইংরাজ হং কং দ্বীপ চীনের রাজ্য হইতে কাড়িয়া লন। সেই সময় সেখানে দুর্জয় কেল্লা বানাইয়া—এই ব্যবসা এতদিন চালাইয়াছেন। এখন তাহাদের চির-বর্ত্তমান ধর্ম্মবুদ্ধিতে তাহা বন্ধ হইতে চলিল।

গোলমাল ক্রমে ক্রমে মিটিবে এবং তাহাদের পার্লামেণ্টে ভোট মিলিবে। অনেকের আপত্তি যে তাঁহারা "Unsexed" হইয়া পড়িবেন। অর্থাৎ সংসার-করা ছেলে- মানুষ-করা এ সকল প্রবৃত্তি তাঁহাদের চলিয়া যাইবে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এ আপত্তি টিকিবে না।

কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে আমাদের দেশে রাজ্যশাসনেও ভবিষ্যতে ঐরূপ অনেক পরিবর্ত্তন হইবে।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

সমালোচনা

অন্নপূর্ণার মন্দির। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। এখানি উপন্যাস; ইহার লেখিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবী উপন্যাস-রচনায় অতি অল্পকাল মধ্যেই সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। "অন্নপূর্ণার মন্দির" ১৩১৮ সালে ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়,তখনই সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া লেখিকার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' বাঙ্গালার একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস, কলা-সাহিত্য-বিভাগে সম্পদস্বরূপ হইয়াছে; সেই জন্যই এ গ্রন্থ-সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, নচেৎ 'ভারতী'তে প্রকাশিত উপন্যাস-সম্বন্ধে ভারতীতেই বিশদ আলোচনা করাটা ততখানি শোভন হইত না।

এ গ্রন্থখানি উপন্যাস-বিভাগে অভিনব শ্রেণীর। ইহাতে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগের এতটুকু কাহিনী নাই, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পেয়ালার ঠিন্‌ঠিনি রবটুকুও ইহার মধ্যে কোথাও ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই অথচ এ উপন্যাসখানি পাঠ করিতে ধৈর্য্য পীড়িত হয় না, পাঠ করিয়া আনন্দ ও পরিতৃপ্তিই বরং পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা যায়। এখানি বাঙ্গালা দেশের প্রাণের কথা, বাঙ্গালীর সংসারের নিপুণ ফটো। দেশের ক্রন্দন ছুটিয়াছে, বক্তৃতার প্লাটফরম্ কাঁপাইয়া বক্তার দল আজ সহসা যে বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টির দুই-চারিটা কণা নিক্ষেপ করিতেছেন, সেই কন্যাদায়টুকু ভিত্তি-স্বরূপ করিয়া দরিদ্র সংসারের এক সকরুণ কাহিনী এই গ্রন্থে প্রকৃত আর্টিষ্টের নিপুণ তুলিকাপাতে উজ্জ্বল বর্ণেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহিনীটির মধ্য দিয়া করুণ রসের বেশ একটি শান্ত ধারা বহিয়া গিয়াছে। সে ধারা সরস, সজীব। চরিত্র-চিত্রণে লেখিকার হাতে কোথাও অসতর্ক টান্ নাই, ভাষাকেও কোথাও অযথা ফাঁপাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয় নাই। লেখিকার ভাষা বেশ স্বচ্ছ, সরল, অনাবশ্যক ভারের পীড়নে পীড়িত নহে। গার্হস্থ্য চিত্রাঙ্কনে লেখিকার দক্ষতা অসাধারণ। চিত্র স্বাভাবিক ও সুন্দর। গ্রন্থখানি যে সর্ব্বাংশে বাঙ্গালার অদ্বিতীয় গার্হস্থ্য চিত্র এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। উপন্যাসখানি ইংরাজী ও মৈথিলী ভাষায় অনূদিত হইতেছে—আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ছাপা কাগজ পরিষ্কার হইয়াছে।

ভাতের জন্মকথা। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। এ বইখানি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত। কি করিয়া মাটি চষিয়া তাহাতে ধান্যের বীজ বপন করা হয়, এবং ক্ষেতে মই চালাইয়া সেই

হয় এবং সেই ধান কি করিয়াই চাল হইয়া দাঁড়ায়, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পয়ার-ছন্দে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভাষা সহজ ও সরল; ছন্দও লঘু, তাহাতে বেশ সহজ প্রবাহ আছে; কবিত্বেরও অপূর্ব্ব সমাবেশ করিতে লেখক ত্রুটি করেন নাই। বহিখানির ছাপা ছবি প্রভৃতি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। পাতায় পাতায় ছবি। ছবি রঙিন, ক্রমোলিথো-প্রণালীর; বাঙ্গালা বহিতে এরূপ ছবি পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ছবিগুলি অবান্তর নহে, বিষয়টিকে তাহারা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া রচনাটিকে সম্পূর্ণ সার্থকতাই দান করিয়াছে। গ্রন্থখানি শিশুদিগকে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দান করিবে। রচনা-পারিপাট্যে এবং চিত্র-সৌষ্ঠবে গ্রন্থখানি সবিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

খোকার গান। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। এখানিও ছেলেমেয়েদের জন্য ছন্দে রচিত বহি। এ গ্রন্থেও ছবি অসংখ্য এবং ছবিগুলি ক্রমোলিথো-প্রণালীর। ছড়ার ধরণে লিখিত কয়েকটি এবং ব্যঙ্গরসাত্মক কয়েকটি কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছবি ও ছাপা প্রভৃতির উৎকর্ষে বইখানি সুন্দর, চিত্তাকর্ষক।

নিমীলন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত। চট্টগ্রাম ইম্পীরিয়ল প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না। এখানি কবিতা-পুস্তক; পত্নীবিয়োগে বিলাপের উচ্ছ্বাস-সমষ্টি। লেখকের ভাষা সুন্দর, উচ্ছ্বাসটুকু নিতান্তই ব্যক্তিগত হা-হুতাশ নহে, তাহাতে কবিত্ব আছে।

কেশব-জননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা।—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর বি-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। একটা কথা অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্ব জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে যে সন্তানের উপর মাতার প্রভাব বড় অল্প নহে। তাই সন্তানকে বুঝিতে হইলে মাতাকেও বুঝিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের মনীষীগণের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দেশেও দেখিতে পাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণ যে বড় হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের জননীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। নববিধান-উপাসনা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্রের উপরও তাঁহার জননীর প্রভাব বড় অল্প ছিল না। কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা ৺কৃষ্ণবিহারী সেনের কন্যা ও জামাতার অনুরোধে ও আগ্রহে কেশব-জননী স্বর্গীয়া সারদাসুন্দরী তাঁহাদের নিকট আপনার জীবনকাহিনী যে-ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তাঁহারা তাহা লিখিয়া লন; এবং সেই বিবরণীই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। ইহাতে এক তেজস্বিনী নিষ্ঠাবতী নারীর সহজ সরল ঘরোয়া কথার মধ্য দিয়া সেকালের বহু তথ্য আভাসে-ইঙ্গিতে মনোজ্ঞভাবে সুশৃঙ্খল পর্য্যায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বক্তব্যটুকুর অন্তরালে এক করুণাময়ী নারীর শান্ত সংযত ও সশ্রদ্ধ হৃদয়ের পরিচয়ও সুস্পষ্ট রেখায় জাগিয়া উঠিয়াছে—সে হৃদয় ত্যাগে পবিত্র, ভক্তিতে সমুজ্জ্বল, বিনয়ে সুকোমল! বস্তুতঃ সুমাতারই হৃদয়। গ্রন্থখানি উপন্যাসের মতই সরস কৌতূহলোদ্দীপক; সমাজ ও ইতিহাস-রচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণাদিও ইহাতে যথেষ্ট আছে।

পদ্মিনী।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্। মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। চিতোরের রাণা লক্ষ্মণ সিংহের পিতৃব্য ভীমসিংহের পত্নী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পদ্মিনীর কাহিনী অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই প্রভৃতি চমৎকার। কয়েকখানি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে—কিন্তু রচনা কৌতূহলোদ্দীপক হয় নাই।

রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়।—শ্রীযুক্ত হরিচরণ বক্সী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, বর্দ্ধমান। কলিকাতা ভৈষজ্য ষ্টীম মেসিন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য লিখিত নাই। রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয় জাতি প্রাচীন কালের ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত, ইহাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। স্বযুক্তির সমর্থনকল্পে লেখক শাস্ত্র-পুরাণাদি হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; এবং উভয় জাতির সংস্কার ও আচার-ব্যবহারে বিস্তর সৌসাদৃশ্যও প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থাদি

হইতে লেখক প্রমাণ করিয়াছেন, রাজা মানসিংহের সহিত বিস্তর উগ্রক্ষত্রিয় সৈন্য বঙ্গদেশে আগমন করে তাহাদের কয়েকজনকে বঙ্গদেশে রাখিয়া মানসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই কয়েকজন সৈনিকই বঙ্গীয়-উগ্রক্ষত্রিয়গণের আদিপুরুষ। উগ্রক্ষত্রিয়গণ আগরা হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা এ দেশে 'আগুরি' বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। গ্রন্থকারের যুক্তি সুনিপুণ এবং তাঁহার প্রমাণ-সংগ্রহও বিপুল।

রস-মঞ্জরী। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম,এ অনুবাদক। শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, মডেল লাইব্রেরী, ২৭।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। জয়ন্তী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো' আনা, বাঁধাই এক টাকা। এ গ্রন্থখানি ভানু দত্ত রচিত সংস্কৃত "রস মঞ্জরী"র বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থকার ভূমিকায় 'রস-শাস্ত্র' সম্বন্ধে সুনিপুণ আলোচনা করিয়া ভানুদত্তের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। 'রসমঞ্জরী'তে অলঙ্কার-শাস্ত্রানুযায়ী নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণীভেদ বিবৃত হইয়াছে। সে বিবরণী অপূর্ব্ব কবিত্বরসে মণ্ডিত। সতীশ বাবু তাহারই অনুবাদ বাঙ্গলা ছন্দে গ্রথিত করিয়াছেন। 'ভূমিকা'য় তিনি সত্যই বলিয়াছেন, "রসমঞ্জরীর কবিত্বের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া আমরা ভূমিকার কলেবর বর্দ্ধিত করিব না। যে গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই কবির অপূর্ব্ব কবিত্বের পরিচয় সুপরিস্ফুট, সেই গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি উদাহরণ দেখাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।" আমরা দুই-একটি মাত্র স্থল—অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। নায়িকার সখী, স্বামী তাহাকে ভালবাসিয়া কত রত্ন অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়াছে, তাহা নায়িকাকে দেখাইতে যাওয়ায়, প্রেমগর্ব্বিতা নায়িকা যে তাহার সখী অপেক্ষা অনেক সৌভাগ্যবতী, তাহাই কৌশলে প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছে,—

"স্বামী তব কলেবর রত্ন অলঙ্কারে
সাজায়েছে,—ধন্য তুমি,—কী বলিব আর?
দেখার আড়াল হবে—ভয়ে কান্ত মোরে
না দেয় পরিতে সখি! কোনো অলঙ্কার।"

ছন্দানুবাদের নিম্নে ফুটনোটে লেখক যে ব্যাখ্যা দ্বারা শ্লোকগুলি বুঝাইয়াছেন, সে ব্যাখ্যাগুলি বিশদ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে, তবে অনুবাদে ছন্দের সুরটুকু সর্ব্বত্র সুরক্ষিত হয় নাই। সেজন্য স্থানে স্থানে বাঙ্গলা ছন্দ নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। এই সামান্য ত্রুটিটুকু ঘটিবার একটি কারণ, অনুবাদক শ্লোকগুলির যথাযথ অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। অতএব এ ত্রুটি মার্জ্জনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। যাহা হউক, 'রস শাস্ত্র' বিষয়ক এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন —এ শ্রম-স্বীকারের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বহিখানির ছাপা কাগজ ভালই হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বুদ্ধ

কান্তিক প্রেস]   [২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

ভারতী

৩৮শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২১ [৩য় সংখ্যা

মল্লিনাথ

সংস্কৃত সাহিত্যে ভাষ্য, বৃত্তি ও টীকাকারগণ সর্ব্বদা সম্মানিত। তাঁহারা না থাকিলে এতদিনে শাস্ত্রমর্ম্ম লুপ্ত হইয়া যাইত। তাঁহাদের উদ্যম না থাকিলে বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থ দূরে থাক্, সামান্য কাব্যাদির আলোচনাও আজ অতি আয়াস-সাধ্য এমন কি অসম্ভব হইয়া উঠিত। সেকালে বিস্তৃত গ্রন্থ রচনার সুবিধা ছিল না। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি স্মৃতিশক্তি সাহায্যেই প্রচারিত হইত। কাজেই স্বল্পাক্ষর সূত্রাকারে শিক্ষা দিবার প্রণালীই তখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই ছোট ছোট সূত্রগুলি অল্প আয়াসে কণ্ঠস্থ হইত বটে কিন্তু তাহার মহৎ দোষ ছিল অর্থের অস্পষ্টতা। গুরুর নিকট হইতে উপদেশ না পাইলে আর কেহ সূত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিত না। গুরুগৃহে অধ্যয়নই তখন জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় ছিল। এই সূত্রাকারে গ্রন্থ রচনার এত প্রচার হইয়াছিল যে শেষে গ্রন্থকার বিশদ গ্রন্থ না লিখিয়া কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়া নিজেই তাহার বৃত্তি রচনা করিতেন। কিন্তু লিখন প্রণালীর বহু প্রচলনে ব্যাখ্যা ও টীকারচনা সহজ হইয়া আসিল। ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজনও হইল কেন না অনেক স্থলে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পণ্ডিতগণ সূত্রগুলির বিকৃত অর্থ করিতে লাগিলেন, কোথাও বা কোনও শাস্ত্রের দুরূহতা প্রযুক্ত ব্যাখ্যার অভাবে তাহার পঠন-পাঠনও বন্ধ হইয়া গেল। তখন ভাষ্য, বৃত্তি, টীকা, টীপ্পনীর যুগ আসিল। যাঁহারা স্বেচ্ছায় এই ভার গ্রহণ করিলেন তাঁহাদের ন্যায় মনীষী ভারতে আর জন্মে নাই। বেদের ভাষ্য কর্ত্তা—সায়ণাচার্য্য, উপনিষদ বেদান্ত গীতার ভাষ্যকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্য, ন্যায় দর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা বাৎস্যায়ন। কয়জনের আর নাম করিব ?

শাস্ত্র গ্রন্থ গুলির এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে থাকিলেও কাব্যগুলি বহুদিন অনাদৃত হইয়া রহিল। বহুদিন পরে কেহ কেহ প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া দুই একখানি কাব্যের টীকা রচনায়

চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকলে সফলকাম হইলেন না। কারণ প্রতিভাবান্ মনীষীগণ সাধারণতঃ এ ভার গ্রহণে অগ্রসর হইতেন না। কাব্যালোচনাকে তাঁহারা বিশেষ সমাদরের চক্ষে দেখিতেন না। কাজেই প্রকৃত ব্যাখ্যা অপেক্ষা দুর্ব্ব্যাখ্যারই আবির্ভাব হইল। মহাকাব্যগুলি এই অত্যাচারে যখন জর্জ্জরীভূত তখন দাক্ষিণাত্যবাসী এক মহা প্রতিভাবান পুরুষ "দুর্ব্ব্যাখ্যা বিষমূর্চ্ছিত" কাব্যগুলির গৌরব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম—মল্লিনাথ।

তখন চতুর্দ্দশ শতাব্দী শেষ হইয়া আসিতেছে। কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির মহাকাব্যগুলি বহুপূর্ব্বে রচিত হইলেও বিশদ টীকার অভাবে সর্ব্বজনবোধ্য ও বহুল আদৃত ছিল না। মনীষী মল্লিনাথ একে একে এই মহাকাব্য গুলির টীকা রচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিনব প্রণালীতে রচিত পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরাকাষ্ঠা পূর্ণ টীকাগুলি এত সমাদৃত হইতে লাগিল যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারগণের নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল। মল্লিনাথের টীকার প্রতি এত শ্রদ্ধা ও আদর হইল যে মহাকাব্যগুলি পাঠ করিতে বসিলে মল্লিনাথ টীকা পাঠও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। সমগ্র ভারতে এই টীকার প্রচার হইয়া পড়িল। এ টীকার বিশেষত্ব এই যে টীকাকার কোথাও নিজ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়া মূল গ্রন্থ অপেক্ষা টীকাকে দুর্ব্বোধ করিয়া তুলেন নাই। অথবা নিকৃষ্ট টীকাকারগণের ন্যায় দুরূহ স্থল সকলের অর্থ না চেষ্টা করেন নাই। প্রসঙ্গ ক্রমে যখন যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, কি শ্রুতি, কি স্মৃতি, কি দর্শন, কি ব্যাকরণ, কি ছন্দ, কি অলঙ্কার, কি হস্তিশাস্ত্র, কি দণ্ডনীতি, সকল স্থলেই মল্লিনাথ প্রামাণ্য গ্রন্থ সকল হইতে পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া কবির অভিপ্রায় স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। কাব্যের টীকা রচয়িতাদের মধ্যে মল্লিনাথ সকলের শীর্ষস্থানীয়। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাই বা কয়জনের থাকা সম্ভব? অভিধানগ্রন্থরাজি তাঁহার নখদর্পণে, অমর, যাদব হলায়ুধ, বিশ্ব প্রভৃতির উল্লেখ পদে পদে। স্মৃতিশাস্ত্রে মনু ও পরাশর, দণ্ডনীতিতে কামন্দক ও চাণক্য, হস্ত্যায়ুর্ব্বেদে পালকাপ্য প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। টীকার মধ্যেই নৈয়ায়িকসুলভ তর্কজালের অবতারণা, সাংখ্য ও বেদান্তের গূঢ়মর্ম্ম প্রকাশ। তিনি নিজেই বলিয়াছেন কণাদ, অক্ষপাদ, ব্যাস প্রভৃতি রচিত গ্রন্থ ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার সমান অধিকার—

> "বাণীং কাণভুজীমজীগণদবাসাসীচ্চ বৈয়াসিকী-
> মন্তস্তন্ত্রমরংস্ত পন্নগ-গবী-গুম্ফেষু চাজাগরীৎ।
> বাচামাচকলদ্রহস্যমখিলং যশ্চাক্ষপাদস্ফ রাং
> লোকেহভূদ্ যদুপজ্ঞমেব বিদুষাং সৌজন্যজন্যং যশঃ॥"

পাণিনি ব্যাকরণ তাঁহার কণ্ঠাগ্রে। প্রতি শ্লোকের ছন্দঃ ও অলঙ্কার লক্ষণসহ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোথাও দ্ব্যর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা, কোথাও অতি সংক্ষেপে শ্লোকের ভাবার্থ, কোথাও বা প্রক্ষিপ্তপাঠ নির্দ্ধারণ তাঁহার টীকাকে বহুমূল্য করিয়া তুলিয়াছে।

কালিদাস যে দিঙ্‌নাগ ও নিচুলের সমসাময়িক তাহা তাঁহার টীকা হইতেই জানিতে পারা যায়। প্রতি শ্লোকের অন্তর্নিহিত পৌরাণিক বার্ত্তা তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বহুবিধ গুণসন্নিবেশে মল্লিনাথের টীকা এরূপ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে যে ইহার সমতুল্য আর কোন টীকার নাম করা দুরূহ। সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ, সকল স্থলেই প্রমাণস্বরূপ বিবিধ শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হওয়াতে মূল্যবান মল্লিনাথটীকা চিরদিন কাব্যরসিকগণের চিত্তরঞ্জন করিতে থাকিবে।

কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থকর্ত্তৃগণের ন্যায় টীকাকার মল্লিনাথেরও জীবনচরিতের বিশদ ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। প্রবাদ বা উপকথায় মল্লিনাথের জীবনচরিতের কতকগুলি ঘটনা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে কিন্তু সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য নহে। উপকথায় মল্লিনাথের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধারানগরীর অধীশ্বর মহারাজ ভোজ কবি-বৃন্দ-পরিবৃত হইয়া রাজসিংহাসনে সমুপবিষ্ট আছেন এমন সময় দ্বারপাল আসিয়া বলিল "মহারাজ, দ্বারে একজন কবি দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি একটি গাথা লিখিয়া সভায় প্রেরণ করিয়াছেন।" নৃপতি ভোজের চতুর্দ্দিকে তখন কালিদাস, ভবভূতি, দণ্ডী, বাণ, ময়ূর, বররুচি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণ সমাসীন। রাজা তাঁহাদের সমক্ষে সেই গাথা পাঠ করিলেন—

"কাচিদ্বালা রমণবসতিং প্রেষয়ন্তী করণ্ডং
দাসীহস্তাৎ সভয়মলিখদ্ব্যালমস্যোপরিষ্টম্।
গৌরীকান্তং পবন-তনয়ং চম্পকং চাত্র ভাবং
পৃচ্ছত্যার্য্যো নিপুণতিলকো মল্লিনাথঃ কবীন্দ্রঃ॥

মল্লিনাথ-কবিপ্রেরিত এই গাথা পাঠে সমস্ত সভা বিস্মিত হইলেন। তখন কালিদাস বলিলেন "মহারাজ, মল্লিনাথকে শীঘ্র আহ্বান করুন।" তখন রাজার আদেশে দ্বারপাল মল্লিনাথকে সভার মধ্যে প্রবেশ করাইল। মল্লিনাথ "স্বস্তি" এই বলিয়া রাজার অনুরোধে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা কালিদাস ও ভবভূতি, মল্লিনাথের বহু প্রশংসা করিলেন ও রাজাজ্ঞায় মল্লিনাথকে লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা পঞ্চ হস্তী ও দশ অশ্ব প্রদান করা হইল। তাহাতে প্রীত হইয়া মল্লিনাথ এইরূপে রাজার স্তব করিলেন—

"দেব ভোজ তব দানজলৌঘৈঃ
সোঽয়মদ্য রজনীতি বিশঙ্কে।
অন্যথা তদুদিতেষু শিলাগো—
ভূরুহেষু কথমীদৃশদানম্॥"

এই শ্লোক শুনিয়া রাজা মল্লিনাথকে আরও তিনলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা দিবার আদেশ করিলেন।(১)

---

(১) ততঃ কদাচিৎ সিংহাসনমলঙ্কুর্ব্বাণে শ্রীভোজে কালিদাসভবভূতি-দণ্ডী-বাণ-ময়ূর-বররুচি প্রভৃতি কবি—তিলককুলালঙ্কৃতায়াং সভায়াং দ্বারপাল এত্যাহ "দেব কশ্চিৎ কবির্দ্বারি তিষ্ঠতি, তেনেয়ং প্রেষিতা গাথাসনাথা চীঠিকা।...রাজা গৃহীত্বা তাং বাচয়তি।...তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বাপি বিদ্বৎপরিষৎ চমৎকৃতা। ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ "রাজন্, মল্লিনাথঃ শীঘ্রমাকারয়িতব্যঃ।" ততো রাজাদেশাদ্দ্বারপালেন স প্রবেশিতঃ কবী রাজানং "স্বস্তি" ইত্যুক্ত্বা তদাজ্ঞয়া উপবিষ্টঃ।......ততঃ প্রীতেন রাজ্ঞা তস্মৈ দত্তং সুবর্ণানাং লক্ষম্। পঞ্চ গজাশ্চ দশ তুরগাশ্চ দত্তাঃ।...ততো লোকোত্তরং শ্লোকং শ্রুত্বা রাজা পুনরপি তস্মৈ লক্ষত্রয়ং দদৌ।

[ভোজ প্রবন্ধঃ]

ভোজপ্রবন্ধে এই কাহিনী বর্ণিত আছে, কিন্তু ভোজপ্রবন্ধের উপাখ্যানগুলি একটিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। কালিদাস, ভবভূতি, বাণ, ময়ূর, দণ্ডী মল্লিনাথ প্রভৃতিকে সম-সাময়িকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এই একটিমাত্র হেতু হইতেই ভোজপ্রবন্ধের উপর আমাদের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস থাকে না। তবে এই উপাখ্যানে মল্লিনাথের প্রতি কালিদাসের অনুরাগ বেশ দেখান হইয়াছে। মল্লিনাথের শ্লোকটি শুনিয়া রাজা যখন মল্লিনাথকে বলিলেন "সাধু রচিতা গাথা।" তখন কালিদাস বলিলেন "কিমুচ্যতে সাধ্বিতি? দেশান্তরগতকান্তায়াশ্চারিত্র্য-বর্ণণেন শ্লাঘনীয়োঽসি। বিশিষ্য তত্তদ্ভাব-প্রতিভটবর্ণনেন।" যাক্—এ কাহিনীর আর আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে ইহা হইতে এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে মল্লিনাথ যে কেবল টীকা রচনা করিতেন তাহা নয়। তাঁহার মৌলিক কাব্য লিখিবার শক্তিও ছিল, আমরা পরে দেখাইব মল্লিনাথের একখানি বিলুপ্ত প্রায় কাব্যের কিয়দংশ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আর দাক্ষিণাত্যদেশে প্রচলিত আর একটি উপকথার অনুসরণ করা যাক্। কানাড়ী ভাষায় রচিত কথাসংগ্রহ নামক গ্রন্থে পেদ্দ-ভট্টচরিতম্ নামক এক উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। মল্লিনাথেরই অপর নাম পেদ্দভট্ট। এই পেদ্দভট্টচরিত মল্লিনাথেরই উপকথাময় জীবনচরিত। সে কাহিনী এই—

দেবপুর গ্রামে মল্লিনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দেববর্ম্মণ। তিনি দেববর্ম্মণ মল্লিনাথকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু মল্লিনাথ এত স্থূলবুদ্ধি যে কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মল্লিনাথ বিবাহ করিলেন। প্রথম যেদিন শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিবেন, সেদিন মল্লিনাথের পিতা উপদেশ দিলেন যে কেহ কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে নীরব হইয়া থাকিবে, কোনও পুস্তক সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিলে বলিবে "গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে কি?" শ্বশুরালয়ে উপনীত হইলে কৌতুক করিবার জন্য একখানি সাদা পুঁথি তাঁহার হস্তে দিয়া তাঁহাকে কোনও প্রশ্ন করা হইল। মল্লিনাথ বলিলেন "গ্রন্থখানি কি শেষ হইয়াছে?" তাহাতে সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। মল্লিনাথ পূর্ব্ব হইতেই নিজ মূর্খতার জন্য পেদ্দভট্ট নামে কথিত হইতেন। এখন শ্বশুরালয়ে বহুবিধ বিদ্রূপ তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। পত্নীর উপদেশে মল্লিনাথ শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া কাশী-ধামে উপনীত হইলেন ও এক অধ্যাপকের গৃহে পাঠার্থে গমন করিলেন। অধ্যাপক তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন পথে বসিয়া "ওঁ নমঃ শিবায়" এই কয়েকটি কথার উপর দাগা বুলাও। মল্লিনাথ তাহাই করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক নিজ পত্নীকে আদেশ দিলেন মল্লিনাথের খাদ্যে ঘৃতের পরিবর্ত্তে নিম্বতৈল দিবে। দেখ সে ঘৃতের অভাব বুঝিতে পারে কি না। এইরূপ ক্লেশ ও অবমাননা সহ্য করিতে করিতে বহুদিন কাটিয়া গেল। মল্লিনাথ ক্রমশঃ বর্ণমালা শিখিলেন। নিম্বতৈল তখন

নিকট এ কথা জানাইলেন। অধ্যাপক এ কথা শুনিয়া মল্লিনাথের বুদ্ধির উদয় হইয়াছে বুঝিয়া মহাআনন্দে তাহাকে সমীপে আহ্বান করিলেন ও প্রাণপণে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সদ্‌গুরুর অসীম চেষ্টায় মল্লিনাথ মহাপণ্ডিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তারপর প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অক্ষয় গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের উপাখ্যান এই। ইহা কালিদাসের জীবনের অনুরূপ। কালিদাস সম্বন্ধেও প্রবাদ আছে প্রথমে তিনি মূর্খ ছিলেন পরে সরস্বতীর কৃপায় জ্ঞানলাভ করেন। টীকাকার মল্লিনাথ সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

এখন মল্লিনাথের বিশ্বাসযোগ্য কিছু পরিচয়ের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব। মল্লিনাথ প্রায় সকল টীকাতেই নিজনাম উল্লেখ করিবার সময় লিখিয়াছেন "মহোপাধ্যায়কোলাচলমল্লিনাথসূরি।"

কোলাচল, কোলচল বা কোলচলম্ কাহারও মতে মল্লিনাথের বংশনাম কাহারও মতে মল্লিনাথের বাসস্থলের নাম। ভোজরাজ প্রণীত চম্পুরামায়ণ নামক একখানি গ্রন্থ আছে। পদযোজনা নামক তাহার একখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচয়িতা বেঙ্কটনারায়ণ। এ টীকা অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। পুঁথির পরিচয় Hultzsch সম্পাদিত Reports on Sanskrit Mss. গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। বেঙ্কটনারায়ণ মল্লিনাথের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পদযোজনার প্রারম্ভ শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে কোলচলম্ মল্লিনাথের বংশ-নাম। পদযোজনার ষষ্ঠ শ্লোকে আছে—

"কোলচলম্‌মান্বয়াব্ধীন্দুম ল্লিনাথো মহাযশাঃ।"

নিজ পরিচয় দানকালে বেঙ্কট লিখিয়াছেন

"শ্রীমৎকোলচলম্‌মান্বয়দুগ্ধাব্ধি-কৌস্তুভেন শ্রীনাগেশ্বরযজ্বসূনুনা বেঙ্কটনারায়ণেন।"

এই গ্রন্থেরই একখানি পুঁথিতে আছে,

"নারায়ণেন বিদুষা কোলচলমান্বয়েন্দুনা।"

এই সকল পংক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কোলচলম্ নামে একটি বংশ ছিল। ঐ বংশেই মল্লিনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

কে, পি, ত্রিবেদী কোলচল বা কোলাচলকে মল্লিনাথের বাসস্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখনও মল্লিনাথের দুইজন বংশধর জীবিত আছেন। দুইজনেই বেলারি জেলার কাদাপ্পা নামক স্থলের উকীল। তাঁহাদের নাম কোলচলম্ বেঙ্কটরাও ও কোলচলম্ শ্রীনিবাস রাও। তাঁহাদের একজনের কথার উপর নির্ভর করিয়া কে, পি, ত্রিবেদী বলিয়াছেন, কোলচল বা কোলাচল একখানি গ্রামের নাম। (২) কিন্তু এই গ্রামখানি যে কোথায় এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কাজেই এ মতে আমরা ততদূর আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। তবে ইহা সম্ভব হইতে পারে যে কোলচলম্ বংশ যেখানে বাস করিতেন সেই স্থলই পরে কোলচল বা কোলাচল প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। আমরা পূর্ব্বোক্ত

(২) "Kolachala is the name of a village. It is also called Kola-charla."

পুঁথি দুইটির শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া কোলচল নামটি মল্লিনাথের বংশনাম বলিয়াই ধরিয়া লইব।

মল্লিনাথ নামের অর্থ মহাদেব। প্রচলিত অভিধানে 'মল্লিনাথ' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না! কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মল্লিনাথের বংশধর বলেন যে মহাদেবের স্থানীয় নাম—মল্লিনাথ ও তাঁহাদের বংশে অনেকেই মল্লি ও মল্লিয়া নামে আখ্যাত হইতেন। (৩)

মল্লিনাথ মহোপাধ্যায় নামক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মাঘকাব্যের টীকার মঙ্গলাচরণে মল্লিনাথ লিখিয়াছেন।

"মল্লিনাথঃ সুধী সোঽয়ং মহোপাধ্যায়শব্দভাক্।
বিধত্তে মাঘকাব্যস্য ব্যাখ্যাং সর্ব্বঙ্কষামিমাম্॥"

এতদ্ব্যতীত প্রতি টীকার শেষে 'মহোপাধ্যায়' উপাধির উল্লেখ আছে।

মল্লিনাথের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম পেদ্দযার্য্য ও কুমারস্বামী। পেদ্দযার্য্য পিতার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কুমারস্বামী বিদ্যানাথ রচিত প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের এক টীকা রচনা করেন, তাহার নাম—রত্নাপণ। প্রতাপরুদ্র কাকতীয় নৃপতি ছিলেন তাঁহার স্তুতিমূলক শ্লোক উদাহরণে প্রয়োগ করিয়া বিদ্যানাথ প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ রচনা করিয়াছিলেন। মল্লিনাথ-পুত্র কুমারস্বামী এই গ্রন্থের টীকার প্রারম্ভে নিজ পিতা ও ভ্রাতার নিম্নলিখিত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"ত্রিস্কন্ধশাস্ত্রজলধিং চুলুকীকুরুতে স্ম যঃ।
তস্য শ্রীমল্লিনাথস্য তনয়োঃ জনি তাদৃশঃ॥
কোলচলপেদ্দযার্য্যঃ প্রমাণপদবাক্য পারদৃশ্বা যঃ।
ব্যাখ্যাতনিখিলশাস্ত্রঃ প্রবন্ধকর্ত্তা চ সর্ব্ববিদ্যাস্ব॥
তস্যানুজন্মা তদনুগ্রহাপ্তবিদ্যানবদ্যো বিনয়াবনম্রঃ।
স্বামী বিপশ্চিদ্বিতনোতি টীকাং প্রতাপরুদ্রীয়রহস্য
—ভেত্রীম্।"

অর্থাৎ মল্লিনাথের কোলচল পেদ্দযার্য্য নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমগ্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা। তাঁহার অনুজ কুমারস্বামী। ইনি পেদ্দযার্য্য কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছিলেন। এই কুমারস্বামী প্রতাপরুদ্রীয় বা প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন।

মল্লিনাথ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত এইটুকু মাত্র অবগত হইতে পারা যায়! পূর্ব্বে পদযোজনা নামক টীকারচয়িতা বেঙ্কট নারায়ণের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার পদযোজনার পুঁথির প্রারম্ভে মল্লিনাথের বংশাবলীর এক তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেন না তিনি মল্লিনাথের অধস্তন অষ্টম পুরুষ। তিনি মল্লিনাথ বা মল্লিনাথপুত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার শোনা কথা। তা ছাড়া মল্লিনাথের পুত্র কুমারস্বামী নিজ পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অধস্তন অষ্টম পুরুষ বেঙ্কটনারায়ণের উক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এরূপস্থলে মল্লিনাথ-পুত্র কুমারস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। পাদটীকায় আমরা বেঙ্কটনারায়ণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে বুঝা যাইবে বেঙ্কট নারায়ণের

(৩) Mallinatha is a local name of God Siva......some of our ancestors are Known as Malli or Malliah."

[Introduction to Ekavali.]

বলিয়াছেন বীররুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কোলচলম বংশসম্ভূত মল্লিনাথ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম কপর্দ্দী, ইনি শ্রৌত-কল্পসূত্র সকলের কারিকাবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র মল্লিনাথ ও পেদ্দ ভট্ট। পেদ্দ ভট্ট মহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ও নৈষধচরিত জ্যোতিষ প্রভৃতির ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। পেদ্দ ভট্টের পুত্র কুমারস্বামী। ইনি প্রতাপরুদ্রীয় নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। (৪) বলা বাহুল্য স্বয়ং কুমারস্বামীর উক্তির সহিত ইহার বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং আমরা এ বংশপত্রিকা সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

শালিবাহন শক, ১৪৫৫ অব্দে (খৃষ্টীয় ১৫৩৩) উৎকীর্ণ এক ফলক লিপিতে মল্লিনাথের নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে [Indian Antiquary Vol 5. P. 20 দ্রষ্টব্য] :—

"অন্তরায় তিমিরোপশান্তয়ে শান্তপাবনমচিন্ত্যবৈভবম্।
তং নরং বপুষি কুঞ্জরং মুখে মন্মহে কিমপি তুন্দিলং মহঃ॥"

কানাড়া লিপিতে এই ফলকটি খোদিত। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে অচ্যুতরাজের সেনাপতির আদেশে বাদাবির দুর্গাভ্যন্তরে কতকগুলি মন্দিরের সংস্কার সাধিত হইল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে "একাবলী" নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচিত হয়। মল্লিনাথ তাহার টীকা করিয়াছেন। সুতরাং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের মধ্যেই মল্লিনাথ বর্ত্তমান ছিলেন। মল্লিনাথ-বসন্তরাজীয় নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারও রচনাকাল ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ।

মল্লিনাথ যে সকল টীকা রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা এ যাবৎ এই কয়খানির সন্ধান পাইয়াছি। মহাকবি কালিদাসের তিনখানি কাব্যের টীকা মল্লিনাথের প্রধান কীর্ত্তি।

কালিদাসের কাব্যগুলি ব্যাখ্যা করিবার সময় মল্লিনাথ নিজ পাণ্ডিত্যের অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। না হইবেই বা কেন? কালিদাসকে তিনি কবিশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেন রঘুবংশ টীকায় তিনি লিখিয়াছেন "সকলকবিশিরোমণিঃ কালিদাসঃ।" অন্যান্য কবিগণের বেলায় বলিয়াছেন "তত্রভবান্ মাঘকবিঃ" (শিশুপালবধ টীকা) "তত্রভবান্ ভারবি নামা কবিঃ" (কিরাতার্জ্জুনীয় টীকা), একটি উদ্ভট শ্লোকও মল্লিনাথ রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে "কালিদাস কবিতা...সম্ভবন্তু মম জন্ম জন্মনি" জন্ম জন্ম যেন কালিদাসের কবিতা পাই। কালিদাসের প্রতি মল্লিনাথের

---

(৪) "কোলচল্মান্বয়াব্ধীন্দুর্ম্মল্লিনাথো মহাযশাঃ।
শতাবধান বিখ্যাতঃ বীররুদ্রাভিবর্ন্দিতঃ॥
মল্লিনাথাত্মজঃ শ্রীমান্ কপর্দ্দী মন্ত্রকোবিদঃ।
অখিল শ্রৌত কল্পস্য কারিকাবৃত্তিমাতনোৎ॥
কপর্দ্দিতনয়ো ধীমান্ মল্লিনাথোঽগ্রজঃ স্মৃতঃ।
দ্বিতীয়স্তনয়ো ধীমান্ পেদ্দ ভট্টো মহোদয়ঃ॥
মহোপাধ্যায় আখ্যাতঃ সর্ব্বদেশেষু সর্ব্বতঃ।
মাতুলেয়কৃতৌ দিব্যে সর্ব্বজ্ঞেনাভিবর্ন্দিতঃ॥
গণাধিপপ্রসাদেন প্রোচে মন্ত্রগণান্ বহূন্।
নৈষধজ্যোতিষাদীনাং ব্যাখ্যাতাভূজ্জগদ্গুরুঃ॥
পেদ্দ ভট্টসুতঃ শ্রীমান্ কুমারস্বামি সংজ্ঞিকঃ।
প্রতাপরুদ্রীয়াখ্যান ব্যাখ্যাতা বিবুধাগ্রিমঃ॥"

কতদূর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল তাহা রঘুবংশের টীকার প্রারম্ভে মল্লিনাথের নিজ রচিত শ্লোকগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন "অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে ইচ্ছুক হইয়া এই সেই মল্লিনাথ কবি কালিদাসের তিনখানি কাব্যের ব্যাখ্যা রচনা করিতেছে। কালিদাসের রচনার মর্ম্ম স্বয়ং কালিদাস সাক্ষাৎ সরস্বতী বা ব্রহ্মাই নির্ণয় করিতে পারেন, আমার ন্যায় মানব কিরূপে তাহাতে সমর্থ হইবে? তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার দক্ষিণাবর্ত্তনাথ প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া আমি কালিদাসের কবিতা ব্যাখ্যা করিব। কালিদাসের কবিতা ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যারূপ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে। আমার সঞ্জীবনী নামক টীকা অমৃতের ন্যায় সেই বিষের প্রভাব দূর করিয়া কালিদাসের কবিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিবে।" (৫)

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে মল্লিনাথের টীকার পূর্ব্বে কালিদাসের কাব্যের অন্যান্য টীকা বিদ্যমান ছিল। তাহার মধ্যে কতকগুলিতে কবির যথার্থ অভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হয় নাই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এই ব্যাখ্যাগুলিতে মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্যগুলির গৌরব হ্রাস হইবার আশঙ্কায় মল্লিনাথ প্রকৃত ব্যাখ্যা রচনায় প্রবৃত্ত হন। দক্ষিণাবর্ত্তনাথ প্রভৃতি কয়েকজন প্রশংসনীয় টীকাকারের কথা মল্লিনাথ উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ইহাঁদেরই অনুসরণে টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। কাজেই বলিতে হইবে যে মহাকাব্যের টীকা রচনায় মল্লিনাথ প্রথম পথ প্রদর্শক নন। তাঁহার পূর্ব্বেও অন্যান্য টীকাকারগণ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু মল্লিনাথের যশের জ্যোতিতে তাঁহাদের গৌরবদীপ্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে।

যে তিনখানি কালিদাসের কাব্য মল্লিনাথ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত। তিনখানি টীকার নামই সঞ্জীবনী।

মল্লিনাথের চতুর্থ টীকা ঘণ্টাপথ নামে বিখ্যাত। ইহা মহাকবি ভারবি-রচিত কিরাতার্জ্জুনীয় নামক মহাকাব্যের টীকা। ভারবির দুরূহ শব্দ ও দুর্ব্বোধ রচনাপ্রণালীর ভয়ে ভীত হইরা যাঁহারা কিরাতার্জ্জুনীয় পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন না, মল্লিনাথ তাঁহাদিগকে সহজে কবির মর্ম্ম অবগত করাইবার জন্য ঘণ্টাপথ টীকা রচনা করিয়াছেন (৬) ও বলিয়াছেন নারিকেল ফলের উপরে কঠিন আবরণ দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া যেমন তাহার অভ্যন্তরস্থ রস

---

(৫) "মল্লিনাথকবিঃ সোঽয়ং মন্দাত্মানুজিঘৃক্ষয়া।
ব্যাচষ্টে কালিদাসীয়ং কাব্যত্রয়মনাকুলম্॥
কালিদাসগিরাং সারং কালিদাসঃ সরস্বতী।
চতুর্ম্মুখোঽথবা সাক্ষাদ্বিদু- র্নান্যে তু মাদৃশাঃ॥
তথাপি দক্ষিণাবর্ত্তনাথাদ্যৈঃ ক্ষুণ্ণবর্ত্মসু।
বয়ং চ কালিদাসোক্তিষ্বকাশং লভেমহি॥
ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্যাখ্যাবিষমূর্চ্ছিতা।
এষা সঞ্জীবনী টীকা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি॥"
[রঘুবংশ—মল্লিনাথের টীকার প্রারম্ভ।

(৬) নারিকেলফল-সম্মিতং বচো
ভারবেঃ সপদি তদ্বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং
সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্॥

আস্বাদন করিতে হয় তেমনি ভারবির শব্দগুলি দেখিয়া ভয় করিলে চলিবে না, তাহাদের মর্ম্ম অবগত হইতে হইবে। (৭) অর্থগৌরবই ভারবির বিশেষত্ব।

মল্লিনাথের পঞ্চমটীকা মাঘ কবিরচিত শিশুপাল বধকাব্যের সর্ব্বঙ্কষা নামক ব্যাখ্যা। গুণ, অলঙ্কার, ধ্বনি প্রভৃতির উদাহরণ অবগত হইতে হইলে, ভাবলহরী বিক্ষুব্ধ রসসমুদ্রে অবগাহন করিতে হইলে শিশুপালবধ পঠনীয়। মল্লিনাথ কাব্যরসিকগণের জন্য সর্ব্বঙ্কষা নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মাঘ কবি ধন্য, আমরাও তাহার অমৃতোপম উক্তি পাঠে কৃতার্থ হইয়াছি। (৮)

মল্লিনাথের আর একখানি টীকা মহাকবি শ্রীহর্ষ-রচিত নৈষধীয়চরিতের জীবাতু নামক ব্যাখ্যা। সম্প্রতি সর্ব্বপথীনা নামক মল্লিনাথকৃত ভট্টিকাব্যের টীকাও প্রচারিত হইয়াছে।

এখন দেখা গেল সংস্কৃত সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি মল্লিনাথ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত, ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘের শিশুপালবধ, শ্রীহর্ষের নৈষধীয়চরিত ও ভট্টিকাব্য এই সমস্ত কাব্যগুলিই আজ মল্লিনাথকৃত টীকার সাহায্যে সহজ বোধ্য ও সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছে। এই সকল কাব্য পাঠার্থীর পক্ষে মূল কাব্যের সহিত মল্লিনাথ-টীকাও অবশ্যপাঠ্য ও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে ইহা টীকাকারের কম গৌরবের কথা নহে।

এই মহাকাব্যগুলির টীকা ব্যতীত মল্লিনাথ বিদ্যাধর বিরচিত 'একাবলী' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার নাম তরল। একাবলী নামক অলঙ্কার-গ্রন্থখানির বহুল প্রচার ছিল না। ইহা প্রায় লুপ্তই হইয়া গিয়াছিল। মল্লিনাথ তাই ইহার টীকা রচনা করিয়া ইহাকে সহজ বোধ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল এইরূপে ইহা বহুজন কর্ত্তৃক আলোচিত হইবে। কিন্তু কাব্য প্রকাশ, সাহিত্য দর্পণ প্রভৃতির ন্যায় একাবলীর সমাদর হয় নাই। (৯)

---

(৭) নানানিবন্ধ বিষমৈকপদৈর্নিতান্তং সাশঙ্কচঙ্ক্রমণ খিন্নধিয়ামশঙ্কম্।
কর্ত্তুং প্রবেশমিহ ভারবিকাব্যবন্ধে ঘণ্টাপথং কমপি নূতনমাতনিষ্যে ॥
[কিরাতার্জ্জুনীয় টীকার প্রারম্ভ।

(৮) যে শব্দার্থপরীক্ষণপ্রণয়িনো যে বা গুণালঙ্ক্রিয়া শিক্ষাকৌতুকিনীবিহর্ত্তু মনসো যে চ ধ্বনেরধ্বগাঃ।
ক্ষুভ্যদ্ভাবতরঙ্গিতে রস-সুধা-পূরে নিমজ্জন্তি যে তেষামেব কৃতে করোমি বিবৃতিং মাঘস্য সর্ব্বঙ্কষাম্ ॥

....

ধন্যো মাঘকবির্বয়ন্তু কৃতিনস্তৎসূক্তি সংসেবনাৎ।
[শিশুপালবধটীকার প্রারম্ভ।

(৯) মল্লিনাথকবিঃ সোঽয়মেকাবল্যামলংকৃতৌ।
টীকারত্নং নিবধ্নাতি তরলং নাম নামতঃ ॥
একাবলী গুণবতীয়মলঙ্ক্রিয়াপি
যদ্দেশসাদজনি কোশগৃহেষু গুপ্তা।
তেনোজ্জ্বলেন তরলেন সমেত্য ধন্যৈঃ
কণ্ঠেষু চাস্য হৃদয়েষু চ ধার্য্যতাং সা ॥
[একাবলীটীকার প্রারম্ভ।

এতদ্ব্যতীত তার্কিকরক্ষা নামক গ্রন্থের একখানি টীকাও মল্লিনাথ রচনা করিয়াছিলেন ইহার নাম নিষ্কণ্টিকা।

এই কয়খানি গ্রন্থই অধুনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মল্লিনাথ আরও তিনখানি টীকা ও একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মল্লিনাথ নিজেই এই গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করিয়া এগুলি তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং এই নামে যে তাঁহার কতিপয় গ্রন্থ ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ব্যতীত বিশদ পরিচয় কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই নামমাত্রাবশিষ্ট টীকাগুলির নিম্নলিখিত উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

মল্লিনাথ একাবলীটীকা তরলে লিখিয়াছেন "আমি তন্ত্রবার্ত্তিকটীকায় এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।" (১০)

মল্লিনাথের পুত্র কুমার স্বামীও নিজ রচিত রত্নাপণ নামক "প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ" গ্রন্থের টীকায় লিখিয়াছেন "পিতৃদেব একাবলী টীকা তরলে ও তন্ত্রবার্ত্তিক টীকা সিদ্ধাঞ্জনে লিখিয়াছেন।" (১১)

এই দুই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সিদ্ধাঞ্জন নামে তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থের একখানি টীকা মল্লিনাথ রচনা করিয়াছিলেন।

এইরূপ স্বরমঞ্জরী পরিমল নামক একখানি গ্রন্থের টীকা মল্লিনাথ কর্ত্তৃক রচিত হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একাবলীটীকা তরলে মল্লিনাথ ইহারও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "আমি স্বরমঞ্জরীপরিমলটীকায় ইহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি। (১২)

নিষ্কণ্টিকা নামক মল্লিনাথ তার্কিক রক্ষা গ্রন্থের যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আছে "দিক্‌কাল সাধনের বিস্তৃত বর্ণনা মৎপ্রণীত প্রশস্তপাদ ভাষ্য টীকায় দ্রষ্টব্য।" (১৩) ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে প্রশস্তপাদভাষ্যের একখানি টীকাও মল্লিনাথ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রশস্তপাদভাষ্য বৈশেষিকদর্শনের ব্যাখ্যা। মল্লিনাথ এই ভাষ্যের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

এতক্ষণ আমরা মল্লিনাথ রচিত টীকাগুলিরই তালিকা দিতেছি। তাঁহার মৌলিক কোনও রচনার পরিচয় দিই নাই। কিন্তু তাঁহার মৌলিক কবি প্রতিভাও অসাধারণ ছিল। তিনি টীকাগুলির মধ্যে মধ্যে মঙ্গলাচরণার্থ যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহার কবিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার প্রধান মৌলিক রচনা রঘুবীর-চরিত নামক কাব্য। এ গ্রন্থের কিয়দংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। একাবলীটীকায় একস্থলে মল্লিনাথ উল্লেখ করিয়াছেন "যথা চন্দ্রোদয় বর্ণনাত্মক

(১০) "তদেতৎ সম্যগ্ বিবেচিতমস্মাভিস্তন্ত্রবার্ত্তিকটীকায়াং বাজপেয়াধিকরণে।" [একাবলীটীকা]

(১১) "তদুক্তং তাতপাদৈরেকাবলীতরলে তন্ত্র বার্ত্তিক-ব্যাখ্যানে সিদ্ধাঞ্জনে চ—
স্বার্থত্যাগে সমানেঽ পি সহ তেনাস্ত লক্ষণা।
যত্রেয়মভজৎস্বার্থা জহৎস্বার্থা তু তংবিনা॥
[রত্নাপণ। প্রতাপরুদ্র যশোভূষণটীকা।]

(১২) "তদেতৎ সম্যক্ বিবেচিতমস্মাভিঃ স্বরমঞ্জরী পরিমলটীকায়াম্।" [একাবলীটীকা।

(১৩) "দিক্‌কালসাধন প্রপঞ্চস্তু অস্মৎ প্রণীত প্রশস্ত পাদভাষ্যটীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ।" [নিষ্কণ্টিকা।

মৎপ্রণীত শ্লোক।" (১৪) এই শ্লোকটি মল্লিনাথের অধুনা দুষ্প্রাপ্য "রঘুবীর-চরিত" নামক কাব্যের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী সম্প্রতি মহাকবি ভাসের বিলুপ্ত প্রায় নাটকগুলি আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিদিত হইয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে তিনি মল্লিনাথরচিত "রঘুবীর চরিতের" কয়েক পৃষ্ঠা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এ চেষ্টা যদি সফল হয় তাহা হইলে মল্লিনাথের কবিপ্রতিভার উপযুক্ত আলোচনার উপায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন আমাদের মল্লিনাথকৃত টীকার মঙ্গলাচরণের শ্লোকগুলি হইতেই তাঁহার কবিত্বের ধারণা করিতে হইবে। বহুবিধ অলঙ্কারযুক্ত শ্রুতি-মধুর শ্লোকে মল্লিনাথ মঙ্গলাচরণ করিতেন। রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গের টীকায় অনুপ্রাস যুক্ত যে শ্লোকটিতে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন তাহা অতি শ্রুতিমধুর।

আশাসু রাশীভবদঙ্গবল্লী—
ভাসৈব দাসীকৃতদুগ্ধসিন্ধুম্।
মন্দস্মিতৈর্নিন্দিত-শারদেন্দুং
বন্দেঽরবিন্দাসনসুন্দরি ত্বাম্॥

রঘুবংশের পঞ্চম সর্গের মঙ্গলাচরণও ঠিক্ এইরূপ শ্রুতিমধুর—

ইন্দীবরদলশ্যামমিন্দিরানন্দকন্দলম্।
বন্দারুজনমন্দারং বন্দেঽহং যদুনন্দনম্॥

শিশুপালবধের টীকাপ্রারম্ভে মল্লিনাথ এই শ্লোকটিই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিরোধাভাস অলঙ্কারের অনুপম উদাহরণ মল্লিনাথের নিম্নলিখিত শ্লোক –

উপাধিগম্যোঽপ্যনুপাধিগম্যঃ
সমাবলোক্যোঽপ্যসমাবলোক্যঃ।
ভবোঽপি যোঽভূদভবঃ শিবোঽয়ং
জগত্যপায়াদপি নঃ স পায়াৎ॥

রঘুবংশ, ৩য় সর্গ টীকার মঙ্গলাচরণ

এইরূপ যমকের উদাহরণ ৪র্থ সর্গে—

শারদা শারদাম্ভোজবদনা বদনাম্বুজে
সর্ব্বদা সর্ব্বদাস্মাকং সন্নিধিং সন্নিধিং ক্রিয়াৎ॥

শিশুপালবধ টীকার মঙ্গলাচরণেও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনুপ্রাসবহুল আরও দুইটি শ্লোক এই—

বন্দামহে মহোদ্দণ্ডদোর্দ্দণ্ডৌ রঘুনন্দনৌ।
তেজোনির্জিতমার্ত্তণ্ডমণ্ডলৌ লোকনন্দনৌ॥

[রঘুবংশ ১২শ সর্গটীকার মঙ্গলাচরণ

বৃন্দারকা যস্য ভবন্তি ভৃঙ্গা
মন্দাকিনী যন্মকরন্দবিন্দুঃ।
তবারবিন্দাক্ষ পদারবিন্দং
বন্দে চতুর্ব্বর্গচতুষ্পদং তৎ॥

[রঘুবংশ ১৬শ সর্গটীকার মঙ্গলাচরণ।

আমরা মল্লিনাথের একাবলীটীকা তরলের মঙ্গলাচরণের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব :—

অধ্যারূঢ়ঃ কপর্দ্দং পিতুরমরধুনীং হেলয়া গাহমানঃ
কর্ষন্ হর্ষাতিরেকাৎ কনক-কমলিনীষণ্ডমুদ্দণ্ডবৃত্ত্যা।
অন্তর্ম্মগ্নং করাগ্রং ফণিপতিশিরসি স্বৈরমাধায় তোষং
মুঞ্চন্ সিঞ্চন্নধস্তাৎ প্রমথপতি শিশুর্ভাতি বালো গণেশঃ॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

(১৪) যথাস্মদীয় শ্লোকে চন্দ্রোদয়বর্ণনে—
নিশাকরকরস্পর্শান্নিশয়া নির্ব্বৃতাত্মনা।
অমী স্তম্ভাদয়ো ভাবা ব্যজ্যন্তে রজ্যমানয়া॥
[একাবলীটীক

৭

দ্বিতীয় অংশ

রাজভবন হইতে বাহির হইয়া লাইকা গঙ্গার জলে সাঁতার দিল।—গঙ্গায় খর স্রোত, সাঁতার দেওয়া যায় না,—সে অবশ ভাবে ভাসিয়া চলিল।—আর বুঝি সেদিন তাহার বলিষ্ঠ বাহুও কেমন অবশ হইয়া গিয়াছিল। কর্ম্মে এখন বিন্দু মাত্রও প্রবৃত্তি নাই,—সমস্ত অন্তর যেন অন্তরে লুকাইতে চাহিতেছিল।—সে কি করিল? যাহা করিল তাহা ভাল না মন্দ?—যাহা ত্যাগ করিল তাহা কি সুখ নয়? লাইকার চির প্রবাসী হৃদয় ঘৃণায় মুখ ফিরাইল!—গৃহবাস সুখ?—ছিঃ! কিন্তু তখনই সেই বিস্তৃতহৃদয় আকাশের এক প্রান্ত ভেদ করিয়া একটি মৃদু রক্ত রেখা —একটি ম্লান পুষ্পগন্ধ নব বিবাহের বিচিত্র স্মৃতি তাহার সম্মুখে এক অভিনব দৃশ্যের আভাষ দিয়া গেল!—সে কি?—অর্কজ্যোতিঃসিন্দূরশোভিতা ও কার মূর্ত্তি? সমস্ত জগৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন ঐ ঊষা প্রকাশের সহিত আপনার বিপুল শোভায় বিকসিত করিয়া দিবে!—এ কি সত্য?—বিরোধী অন্তর উগ্রস্বরে ডাকিয়া বলিল—না, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধন!

লাইকা সেই জলমধ্যে চক্ষু মুদিল!—কেন এ চিন্তাজালে সে আপনাকে জড়াইল,—সেত বেশ ছিল—এই পাঁচ বৎসর কাল সে,—কখনও পাইবে কি?—না না এই জাল ক্রমেই শক্ত হইতেছে—ক্রমে ইহা লৌহশৃঙ্খলে পরিণত হইবে!—না তাহা কেন হইবে! লাইকা কিছুতেই রাজপুরীর ইষ্টক বেষ্টনে বাধা পড়িবে না—ভয় কি?—ভাবিয়া সে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল।

চাইয়া সে দেখিল,—চারিদিক যেন মৃদু বাতান্দোলনে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।—আকাশে অগণ্য তারকা—জলে তাহার ছায়া জাগিতেছে। জলপ্রান্তে বিস্তৃত বাঁশবনে মৃদু মর্ম্মর ধ্বনি, তটপ্রহত ঊর্ম্মিভঙ্গের সুমধুর কল্লোলে মিশিয়া এক বিভিন্ন শঙ্করাভরণ রাগিনীতে বাজিতেছে!—ইহার মধ্যে কোথায় এক বিরহ ব্যথাতুরা চক্রবাকবধূ ভগ্নস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাঝে মাঝে অস্ফুট চীৎকার করিতেছে।—সহসা লাইকার স্মরণ হইল- সেই স্বল্পভাষিণী মৃদু-হাসিনী বালিকা কে?—তাহার দেহ তখন অবশ হইয়া গেল—হাত পা নিশ্চল হইল, লাইকা ডুবিয়া গেল।

অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড ঘূর্ণা—দূর হইতে জল উথলিয়া পড়িতেছে। লাইকার অবশ ভাসমান দেহ সেই টান অনুভব করিল,—তাহার অর্দ্ধনিমজ্জিত শরীর সবেগে সেই দিকে আকৃষ্ট হইল!—তখন লাইকার জ্ঞান হইল। সে সবলে বাহু সঞ্চালন করিয়া প্রবল জলস্রোত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—স্রোত বড়

তৃণ পড়িলেও যেন শতখণ্ড হয়—জলের ভিতরের গম্ভীর কল্লোল লাইকার কানে বাজিতে লাগিল,—দেহ যেন ক্রমেই নিম্নাভিমুখী হইতেছিল ! সে তখন মরণ বলে ঘুরিয়া আপনাকে ফিরাইল,—শ্বাস রোধ করিয়া ডুবিয়া মাথা দিয়া জল ঠেলিয়া ঘূর্ণীর বাহিরে আসিল !—তখন হাতে পায়ে জল ঠেলিয়া সে তীরাভিমুখে চলিল।—তীরেও খর স্রোত তরতর বেগে ছুটিতেছে,—জলে সাঁতার দেওয়া লাইকার নূতন হয়—কিন্তু নিকটের সেই জলাবর্ত্তের ভয়ে সে এখানেও স্থির ভাবে ভাসিতে পারিল না—বলে জল কাটাইয়া মুহূর্ত্তে তীরে উঠিল,—কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইতে বা বসিতে পারিল না—তাহার অবশ দেহ সেই ভগ্নপ্রবণ তটে লুটাইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ সে সেই ভাবেই রহিল, বনমধ্যে মহাশব্দে শৃগালের দল ডাকিয়া গেল, রাত্রি প্রহরাতীত।—ধীরে ধীরে তাহার দেহে বল আসিতেছিল—এই সময় সে দেখিতে পাইল দূরে গঙ্গাবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা চলিয়াছে—তাহাতে কয়েকজন আরোহী বসিয়া আছে, একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। লাইকা ভাবিল ইহাদিগকে ডাকি,—কিন্তু তখনই শুনিল তাহারা বলিতেছে—"এই আঁধার রাত্রি, লাইকা আসিয়াই আবার চলিয়া গেল কেন বলিতে পার ?"

অপরে বলিল—জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয় মহারাজ তাহাকে কোন মন্দ কথা বলিয়াছেন বা অপর কোন অপমান করিয়াছেন, শোন নাই কি রাজপুরে কাহারও তাহার নাম করিবার উপায় নাই ?"

প্রথম বলিল,—তাহাই ত শুনিয়াছি তবে আবার এখন—

লাইকা আর শুনিতে পাইল না, নৌকা ভাটীর মুখে অনেক দূরে চলিয়া গেল। সে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল—স্বর মৃদু হইয়া গেল, আর শোনা যায় না,—নৌকা চলিয়া গিয়াছে। তাহার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

তখন হাসিয়া লাইকা বলিল, তুচ্ছ জীবনের এত মায়া ?—হায় !—তাহার পর সে আবার একটি নিশ্বাস ফেলিল—ভাবিল এই তুচ্ছ লাইকার জন্য বিশাল রাজসংসারে এত বিশৃঙ্খলা ?—না আর এ মুখ এ দেশে দেখাইতে আসিব না !—

কিন্তু সেই বালিকা !—আবার লাইকার অবশ দেহে রক্তস্রোত স্তিমিত হইল,—সে যেন মস্তকের ভিতর কি অস্বস্তি বোধ করিল, সেই সিক্ত বালুকার উপর তাহার মাথা লুটাইতে লাগিল,—সে জানে যে, সে সম্রাটনন্দিনী, সংসারে তাহার জন্য একের পরিবর্ত্তে সহস্র স্নেহদৃষ্টি মিলিবে—কিন্তু ?—এ কিন্তুর মানে কি ?—এ কিন্তুর অর্থও লাইকা বুঝিল, ইহা আর কিছু নয়—এ কিন্তু এতদিন জন্মায় নাই—যখন রাজা তাহার কন্যাকে ভিখারীর সঙ্গিনী হইতে দিতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন,—তখনই ইহার জন্ম হইয়াছে !—লাইকা বুঝিল—আপনার হৃদয়ের প্রতি চাইয়া বুঝিল, আজি তাহা শূন্য !—একটি বালিকার কোমল নয়নালোক ব্যতীত তাহার সমস্ত প্রাণ সমস্ত জগৎ আজ নিবিড় অন্ধকার !

একি নিদারুণরূপে সর্ব্বনাশ !—রাজভবনের নিবিড় বেষ্টন কল্পনা করিয়াও সে শিহরিল !—এখন উপায় ?—অরণ্যবিহারী

সরল বিহঙ্গ একবার পিঞ্জর রাজ্যের কোমল শয্যা সুমিষ্ট পানীয় স্মরণে লুব্ধ এবং তৎক্ষণাৎ তাহার স্থূল লৌহশলাকা ও রুদ্ধদ্বার স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল!—

ভগবান্! এ বিপদের তুমিই একমাত্র কাণ্ডারী!—লাইকার রুদ্ধ চক্ষু ভেদ করিয়া জলধারা গড়াইল। জ্বরগ্রস্ত রোগীর ন্যায় সে সেই কর্দ্দমের উপর পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল।

সে ভাবিতেছিল, বিবাহের পূর্ব্বে কেন বাধা দিই নাই? কেন এত কথা ভাবি নাই;—সেই অস্তমুখী শশীকলার ন্যায় লাবণ্যময়ী বালিকাকে দেখিয়াই কি?—সে সময় একদিন কবে—কেমন সে মোহময় ছায়াময় মৃদুরক্ত সন্ধ্যালোকে মর্ম্মরধবল দেবালয়ের সোপানতলে সেই নীলবসনা বালিকাকে সে দেখিয়াছিল তাহা বিশদরূপে মনে পড়িল!—তাহার পর একদিন প্রভাতে গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানে, প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মবনে কুঙ্কুমের তটাঙ্কলেখাঙ্কিত শ্বেতবসনা বালিকা শেফালী রাশির উপর বসিয়া জীবন্ত শেফালিকা রূপে ভ্রম জন্মাইতেছিল—সহসা মুখ তুলিবামাত্র পুষ্পচয়নপ্রয়াসী লাইকার নয়নে দৃষ্টি পড়িবামাত্র প্রচুর হাস্যাবেগ বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া দৌড়িয়া পলাইল—সখীজন হাসিয়া উঠিল,—সেই উচ্ছ্বাসিত হাস্য কল্লোলের মধ্যে লাইকা পলাইবার পথ পাইল না!—পরে সেদিন আর সে কিছুই ভাবিবার অবকাশ পায় নাই,—সকল কার্য্যে সকল বিষয়ে সেই দ্রুতধ্বনিত নূপুরনাদে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের রক্ত তালে তালে বাজিয়াছিল!—

কেন সে তখনই রাজভবন ত্যাগ করে নাই তাহার কারণ আজি সে বুঝিল!—

কিন্তু সে তবে ফিরিতে চায় না কেন? সে ঈপ্সিতা ত তাহারই পত্নী?—লাইকার শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল—সেই শীতল সৈকতশয়নে সে কেমন একটি ঈষদুষ্ণ কোমল স্পর্শানুভব করিল,—সে সহর্ষে নয়ন মেলিল।—চাহিয়া দেখিল, গঙ্গাবক্ষ যেন মৃদু আলোকজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, তাহার হৃদয় রক্তের তালে তালেই যেন গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি ভাঙিয়া পড়িতেছে—লাইকা তখন ঊর্দ্ধে চাইয়া দেখিল চন্দ্রোদয় হইয়াছে!—দূরে পূর্ব্বপ্রান্তে যেখানে গঙ্গা বিস্তৃত কলেবরে পার্শ্ববর্ত্তিনী দুইটি ক্ষুদ্রা নদীকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া আছেন—সেইখানে বিপুল আলোক-রাশির মধ্য দিয়া সপ্তমীর অর্দ্ধচন্দ্র উদয় হইয়াছেন!—

কি সুন্দর—কি সুন্দর!—লাইকা সমস্ত দুঃখ সুখ ভুলিয়া গেল—আপনার সৈকত শয্যা ভুলিয়া গেল, আপনার শরীরের অবসাদ ভুলিয়া গেল!—চারিদিকে তাহার আশে পাশে খণ্ড খণ্ড মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া জলে পড়িতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহার পদতলের কতকাংশ ভুমি ফাটিয়া গেল, জলে তাহার চরণ ডুবিয়া গেল—সে তাহা লক্ষ্যও করিল না; কটির বসন শিথিল করিয়া আপনার ক্ষুদ্র বাঁশী বাহির করিল;—তখন সেই নির্জ্জন বনপুষ্প, নীরব নদীতট ও চন্দ্রা-লোকবিস্তৃত জলরাশি প্লাবিত করিয়া লাইকার অনুপম বংশীধ্বনি ঝিঁঝিটখাম্বাজ রাগিণীর প্রতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনে লীলায়িত মূর্চ্ছনায় এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে আবিষ্ট করিয়া দিল।

৮

প্রভাতে বুল্‌বুল্ ডাকিতে লাগিল; সমস্ত রাত্রির ক্লান্তিতে অবশদেহ লাইকা তখন তীরে উঠিয়া এক বৃহৎকাণ্ড সজিনা বৃক্ষের তলায় শয়ন করিল। ক্রমে আলোক পরিস্ফুট হইতে লাগিল,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাল স্কন্ধে ধীবর রমণীরা বনপথে আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের আগমনে ভীত হইয়া কতকগুলি বক কর্কশ চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল—এবং সেই সঙ্গে লাইকারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

সে উঠিয়াই চমকিত হইল,—এ কোথায় শুইয়া আছে?—গঙ্গায় তখন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা চলিতেছে, জালুক রমণীগণের কলহধ্বনিতে তীর ঝঙ্কৃত। লাইকা আবার কূলে নামিয়া আসিল,—ঐ সেই প্রকাণ্ড ঘূর্ণা তাহার পাশ দিয়া খর স্রোতে ছুটিয়াছে,—তীরে রাত্রিকালে সে যেখানে শুইয়া পড়িয়াছিল সেখানকার মৃত্তিকা বসিয়া গিয়া সেখানে অগাধ জল উথলিয়া উঠিয়াছে! লাইকা তখন বড় হাসিই হাসিল! যদি সে ডুবিয়া মরিত—সে মন্দ কি হইত?—তাহার পর সেই জলযুদ্ধ সেই সাঁতার দেওয়া সব মনে পড়িল, তাই লাইকা আপন মনে বড় হাসিল। তাহার পরেই স্মরণ হইল সেই রাজপুরী—সেই সব গত কথা—আরও মনে পড়িল তাহার বর্ত্তমান চিন্তা—তখন তাহার প্রফুল্লকান্তি মুখ ম্লান হইয়া গেল!

রাজপুরী এবং রাজকথা—দুইটিই এক সঙ্গে তাহার স্মরণ হইল—কি মধুর কি সুন্দর সেই বালিকা! অহো! বজ্রাধিক কঠোর সেই চিত্রাংশুক বস্ত্র স্বর্ণশৃঙ্খলপরিশোভিত পিঞ্জর। লাইকা আর ভাবিতে পারিল না, ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল। শত ডুব দিয়া স্নান করিয়া আবার উঠিল, তাহার পর উপরে উঠিয়া বনপথ ধরিয়া চলিল।

পথে তাহার কষ্ট ছিল না, বনের ফল গঙ্গার জল তাহার পক্ষে অতি উপাদেয়;—সে ইচ্ছা করিয়াই গ্রামের পথে গেল না,—সে বুঝিয়াছিল যে এখন সম্প্রতি তাহার চিত্ত বিভ্রান্ত আছে—কিছু দিন নির্জ্জনে থাকিলেই বোধ হয় সে আরাম পাইবে!

আরামও পাইল! কিন্তু হায় সে যে সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছে তাহা দুই চারি দিনেই বুঝিতে পারিল! শ্যামল বনখণ্ডে নির্জ্জন তরুচ্ছায়ায় বসিয়া প্রিয়চিন্তায় সুখ আছে কিন্তু বিরাম নাই তৃপ্তি নাই—সে চিন্তা নদীজলের ন্যায় নিয়ত প্রবাহিতা—সে চিন্তা যেন ভাবুকের সম্মুখ হইতে সমস্ত জগৎ সমস্ত অন্যান্য চিন্তাকে ভাসাইয়া লইতে চায়! সে ভাবনা যেন মুহূর্ত্ত তাহাকে বিশ্রাম দিতে চায় না—তিলমাত্র তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চায় না—স্বপ্নে সে সংজ্ঞারূপিনী, জাগরিত অবস্থায় সে মোহময়ী! কি সুন্দর কি অনুপম চিন্তা! কিন্তু হায়!

তবু হায়! লাইকার এতদিনের গঠিত চিত্তবৃত্তি ধিক্কার দিয়া বলিল—হায় হায়!—তাহার চিরজীবনের শিক্ষা ঘৃণাভরে বলিল—হায় হায়! লাইকাও কাঁদিয়া বলিল—হায় এ কি হইল!

এই দিক্‌বিদিকব্যাপী ধিক্কারের মধ্যে অন্তর মেলিয়া সে বুঝিল—সেই চিন্তাসহচরী নির্জ্জনতাও তাহার কারাসদৃশ! এই

কয় দিন একা থাকিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে আরও আপনার মনোবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছে। এ নির্জ্জনতা এবংএ চিন্তা উভয়েই তাহার ত্যজ্য!—

পরিত্যাজ্য কিন্তু পরিত্যাগ করিতে পারিবে কি? এ চিন্তা ব্যতীত সংসার তাহার তাহার পক্ষে অসহ—এই চিন্তা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে যেন একটা রুদ্ধ বায়ু-হীনতা আসিয়া সবলে তাহারে কণ্ঠরোধ করিতেছে! জলের মৎস্যকে স্থলে আনিলে সে বোধ হয় এমনি কষ্ট বোধ করে!—কি ভয়ানক কি দুর্ব্বিসহ এই অবস্থা!—

তখন ভাবিয়া ভাবিয়া লাইকা স্থির করিল চিন্তা অত্যাজ্য কিন্তু এ নির্জ্জন বনে থাকিয়া কেন সে চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেছে? তাহার পক্ষে এখন কর্ম্মই বাঞ্ছনীয় লোকালয়ই বাসযোগ্য। কর্ম্ম ও জনতার অন্বেষণে তখন সে নগরাভিমুখে চলিল।—

দেশের কোন স্থানই লাইকার অপরিচিত ছিল না,—সেই পথে আসিতে নিকটে একটি চতুষ্পাঠী ছিল, তাহার ছাত্রগণ অধিকাংশই লাইকার বান্ধব,—প্রথমত সে সেই থানেই গেল। প্রথম দুই দিন বেশ ছিল কিন্তু তৃতীয় দিবসে বিপদ ঘটিল, বিদ্যালয়ে একজন ছাত্রের দারুণ বিসূচিকা রোগ দেখা দিল। ছাত্রগণ আতঙ্কগ্রস্তভাবে প্রাণপণে সকলে তাহার সেবা চিকিৎসা করিল,লাইকাও তাহাতে যোগ দিল,—কিন্তু বালক বাঁচিল না।—সে মরিল কিন্তু আবার আর এক জনের সেই রোগ হইল,—সে বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই আর একজনের হইল,—সন্ধ্যা-বেলায় দুই জনেরই মৃত্যু হইল এবং একজন শিক্ষক রোগগ্রস্ত হইলেন!

তখন সকলেই বিপদ গণিল—কিন্তু উপায় কি? বৃদ্ধ অধ্যাপক শিশু ও বালক ছাত্রদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বয়স্কদিগকেও যাইতে আদেশ করিলেন—তাহারা সে কথা হাসিয়া উড়াইল, তাহাদের শিক্ষক মৃত্যুশয্যায় আর তাহারা ভয়ে পলাইবে?

শিক্ষকেরও মৃত্যু হইল। তখন দেখিতে দেখিতে রোগ দাবানলের ন্যায় গ্রামে প্রবেশ করিল। এবং নির্ব্বোধ পল্লীবাসীর অচেষ্টায় তাহা ভীষণ সংহার মূর্ত্তি ধরিয়া গ্রাম ধ্বংস করিতে লাগিল।

তখন লাইকা প্রথমে চতুষ্পাঠী পরে গ্রামে গিয়া সকলের সেবায় রত হইল। সদা মৃত্যুবিভীষিকাযুক্ত রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাদের সেবায় নিমগ্ন হইয়া লাইকা ভাবিল যে এইবার বুঝি বিষম রাজপুরী ও ততোধিক বিষম রাজকন্যার চিন্তা হইতে কিছু মুক্ত হইলাম।—কিন্তু সে চিন্তাজাল হইতে নিস্তার পাইল কিনা বুঝিতে না বুঝিতে সেই কঠিন রোগ আসিয়া তাহাকে ধরিল।

(৯)

তখন ঘরে ঘরে রোগ কে কার সেবা করে—কিন্তু তবুও লাইকার সেবার অভাব হইল না। তাহার প্রিয়বন্ধু মোহনলাল তাহাকে আপনার গৃহে লইয়া গিয়া রাখিল। তাহার পত্নী লাইকার যথেষ্ট সেবা করিলেন। গ্রামের লোকও সর্ব্বদা তাহার সন্ধান লইল, তাহাদের সেবা করিতে গিয়াই না তাহার এই

কষ্ট! তাহার আরোগ্য লাভের জন্য সকলেই প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

সেই প্রাণান্তিক কষ্টের সময় লাইকা ভাবিত—মরিলে ক্ষতি কি? সকল চিন্তার সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাই!—কিন্তু তখনই মনে হইত—মরিব তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই বটে,—কিন্তু একথা ত গোপন থাকিবে না প্রকাশ হইবেই,—তখন সেই পুষ্প সুকোমল বালিকার কি হইবে? ওহো!—সে কথা যে লাইকা ভাবিতেও পারে না! সেও একান্ত চিত্তে আপনার আরোগ্য চাহিল।

সকলেরই ঐকান্তিক চেষ্টায় লাইকা বাঁচিল। তখন মোহনলাল ও তাহার পত্নী, লাইকাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে গিয়া কিছুদিন বাস করিতে চলিলেন। সেখানে সে ক্রমেই সুস্থ হইতেছিল এই সময় আবার সে জ্বরগ্রস্ত হইল; প্রায় একমাস আবার শয্যাগত থাকিল। রোগশয্যায় শুইয়া কষ্টে একদিন লাইকার মনে হইয়াছিল মহারাজকে সংবাদ দিলে হয় না?—কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক বিষম আত্মগ্লানিতে তাহার সমস্ত প্রাণ ধিক্কৃত হইয়া গেল,—ছিঃ কষ্টে পড়িয়া দারিদ্র্যের সময়-অভাবের সময়,—ধনী বন্ধু বা আত্মীয়ের সাহায্য গ্রহণ! ইহার তুল্য নীচতা আর কি সম্ভব! হায় কষ্ট—তুমি মানুষের অন্তরকে এমনও হীন করিয়া তুলিতে পার? লাইকা একথা ভাবিল কি করিয়া? ভাবিতে ভাবিতে লাইকার হৃদয় আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইয়া উঠিল, সে ঐ চিন্তাকে অন্তর হইতে দূর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরিল।—

ধীরে ধীরে সে সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল, সে দুর্ব্বলতা কিছুতেই সারে না, লাইকা এখনও শয্যায়, কবিরাজ বলিল, স্থান পরিবর্ত্তন ভিন্ন ইহার স্বাস্থ্যলাভ কিছুতেই সম্ভব নয়—শরীরে রক্ত মাত্র নাই সমস্ত পেশীই দুর্ব্বল—ইত্যাদি। লাইকা হাসিয়া বলিল, পায়ে বল না হইলে কি করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন হয় মহাশয়?

কবিরাজ বলিলেন, "এখন কিছুদিন নৌকাবাস আপনার পক্ষে উপকারী!"

উচ্চ হাসিয়া লাইকা বলিল, "ক্ষমা করুন কবিরাজ মহাশয়! এখন আমার বাহুতে দাঁড় টানিবার বল নাই—আর এ জন্মে যে হইবে এ ভরসাও হয় না!" বলিতে বলিতে তাহার হাসি থামিয়া গেল, মোহনলালও সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলেন—একটি মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

এইভাবে কয়দিন গেল,—সেদিন বৈকালে মোহনলাল আসিয়া লাইকার শয্যার পার্শ্বে বসিলেন, তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া লাইকা বলিল, "ভাল মোহন, আমাকে দেখিয়া তোমার কি বোধ হয়?

মোহনলাল বলিলেন "কি বোধ হইবে লাইকা?"

"কিছু বোধ হয় না? একটি প্রস্তরস্তূপ বা বল্মীকপিণ্ড—অথবা—"

মোহনলাল বলিলেন,—বাধা দিয়া একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "আঃ চুপ লাইকা! তোমার এ কথাগুলি আমার ভাল লাগে না—সত্য! তবে একটা কথা শোন এবং ইহাতে তোমার কি অভিপ্রায় তাহাও বল,—"

লাইকা বলিল—"কি?" মোহনলাল বলিলেন,—"নানকু আর বিন্দা—ছোকরা দুটিকে মনে আছে ত? যাহাদের অসুখে সেবা করিয়া তুমি—"

লাইকা একটু ব্যস্তভাবে বলিল,—"হাঁ, তা কি হইয়াছে?—তাহারা ভাল আছেত?"—

"ভাল আছে এই তোমারই মত, দুর্ব্বলতা কিছুতেই সারিতেছে না!—তাই কবিরাজ তাহাদেরও নৌকায় বেড়াইতে বলিয়াছেন, পরশু দিন তাহারা সপরিবারে যাত্রা করিবে—তাই বলিতেছি লাইকা, তুমি ইহাদের সহিত যাও না। আমার মুখে তোমার কথা শুনিয়া তাহাদের পিতা বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন,—যাইবে লাইকা?"

লাইকা স্তব্ধভাবে শুনিতেছিল, ধীরে ধীরে বলিল, "যাইব না কেন মোহন? যতদিন রোগ থাকিবে ততদিন তোমাদের স্নেহ ভিন্ন আমার আর উপায় কি আছে ভাই। তোমাদের ভালবাসাই আমাকে প্রাণ দিয়াছে—তাহা—"

ব্যস্ত ভাবে মোহন বলিল—"ছি ছি লাইকা কি বলিতেছ? লাইকা, একবার রোগে সেবা করিলাম বলিয়া এত কথা বলিতেছ—আর তুমি যখন—"

আবার লাইকা হাসিয়া কথাটা চাপা দিল। তাহার পর যথা সময়ে লাইকা নৌকায় উঠিল। মোহনলাল সঙ্গে আসিয়াছিল যাইবার সময় প্রশ্ন করিলেন, "ফিরিবে ত তুমি?" লাইকা মৃদু হাসিয়া কপালে হাত দিয়া বলিল,—"অদৃষ্ট!—" কিন্তু তখনই তাহার মুখ সহসা কালিমাময় হইল বলিল, "ফিরিব—ফিরিব—মোহন নিশ্চয় ফিরিব!"—

নৌকা চলিতে লাগিল। সম্মুখে বসিয়া লাইকা ভাবিতেছিল একটু চলৎশক্তি পাইলেই নামিয়া যাইব,—কিন্তু সেই শক্তি সে কতদিনে পাইবে?—তাহার মুখখানি বিষাদমলিন,—এমন সময় নানকু আসিয়া বলিল, "লাইকা জি!—আপনি ওরূপ ভাবে বসিয়া আছেন কেন?—"আমার মা বলিয়া পাঠাইলেন যে আপনি একবার আপনার বাঁশী বাজান তিনি শুনিবেন!"—

লাইকা হাসিয়া বলিল এখন বাঁশী বাজাইব নয়ুয়া? আমার এখনকার বাঁশী শুনিয়া মায়ি কি সুখী হইবেন? ভাল বাজাইতেছি!

লাইকার বাঁশী বাজিতে লাগিল—প্রথমতঃ অতি মৃদু করুণ—তাহার পর ঈষদুচ্চ তীক্ষ্ণ স্বর—যেন কোন বিয়োগবিধুরার ক্রন্দনধ্বনি! শুনিয়া নানকুর মাতার সদ্যমৃতা কন্যার কথা স্মরণ হইল,—তিনি দ্বারান্তরালে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন,—নৌকার অপরাপর আরোহীরা প্রথমত বিস্মিত পরে স্তম্ভিত ক্ষণকালেই সকলেরই নয়ন এক হৃদয়বিদীর্ণ ব্যথাময় বাষ্পরাশিতে পূর্ণ হইয়া গেল!—

১০

শরৎ শেষে চারিদিক পরিষ্কার, শীতাগমে গঙ্গার জল স্রোতহীন;—সুজনরামের নৌকা নিরাপদে চলিল। প্রথমতঃ লাইকা কিছু অসুস্থ হইয়াছিল,—কয়েকদিন জ্বরে পড়িয়াছিল—ইতিমধ্যে নৌকা উজান বহিয়া কাশী

লাভ করিতেছিল—যাত্রীদল বারাণসী ত্যাগ করিল।

প্রয়াগ।—অনেকদিন পরে লাইকা সঙ্গম জলে আরোগ্য স্নান করিল। নৌকা ভাগীরথী ছাড়াইয়া যমুনায় চলিল। কালপীতে সুজন-রামের ভগ্নীপতির বাটী,—সেখানে দুইদিন বিলম্ব করিয়া তারা একেবারে মথুরায় আসিল। মথুরা ও বৃন্দাবনে সপ্তাহ অতীত,—লাইকার ইচ্ছা হইতেছিল যে এইখানেই থাকিয়া যায়,—কিন্তু এই কথা শুনিয়া সুজন-রামের পত্নী দুঃখ করিতে লাগিলেন—তিনি দ্বারকা যাইবেন, তাঁহার ইচ্ছা যে লাইকাও তাহাদের সঙ্গে যায়—বিশেষ লাইকার শরীর এখনও যেমন দুর্ব্বল কিছুদিন এইরূপ বিশ্রামে না থাকিলে সে আবার পীড়িত হইতে পারে! লাইকা তাহার অশ্রুপূর্ণ অভিপ্রায় বিফল করিতে পারিল না।

নৌকা ক্রমে রাজধানী দিল্লী পৌঁছিল। ঔজ্জ্বল্য, উৎসবসমাকুল নগর পথে কয়দিন সকলে নানা আনন্দ উপভোগ করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিলেন,—নৌকা যমুনা ছাড়িয়া ভাটিতে সারি নদীর মুখে প্রবেশ করিল। ক্ষুদ্রকায়া নদী, ধীরে ধীরে নৌকা চলিতে লাগিল।—

অবশেষে আর জলযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠিল, রাজপুতানা মরুপ্রদেশ অনেক স্থলেই নদী অন্তঃসলিলা কোথাও বা শুষ্ক—এ অবস্থায় আর নৌকা চলে না।

সুজনরাম পত্নীর মত জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিন্তু দ্বারকাযাত্রার মত পরিবর্ত্তন করিলেন না,—এসব দেশে কি সহজে আসা হয়? যদি আসিয়াছেন শেষ না দেখিয়া কিছুতেই ফেরা হইবে না। তখন গোগাড়ী এবং দোলার ব্যবস্থা হইল। লাইকা ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু নানকুর মাতা তাহাতেও বাধা দিলেন,—এই অপরিচিত প্রদেশে সঙ্কটপূর্ণ স্থলে আসিয়া লাইকা তাঁহাদের কি পরিত্যাগ করিবেন?—

এ কথার উপর আর কথা নাই,—লাইকা মাথা হেঁট করিয়া সম্মত হইল। তখন সে পদব্রজে চলিল,—বিন্ধ্যগিরির পাশ দিয়া পথ, পথে নাকি দস্যুভয়ও আছে—অনেকগুলি ওস্‌ওয়ালি দর্শকের সহিত তাহারা চলিলেন।

মাচেরীর পথ ধরিয়া তাঁহারা অম্বর নগরে আসিলেন। বিশাল পার্ব্বত্য দুর্গ। সেই উন্নত দুর্গে ভগবান্ রামচন্দ্রের বংশধর এখনও রাজত্ব করিতেছেন!—দুর্গশিরে স্বর্ণ সূর্য্যাঙ্কিত পঞ্চরঙ্গ পতাকা উড়িতেছে।

অন্ধকার গিরিগুহা ভেদ করিয়া তাঁহারা অজয় মেরুর পথে চলিলেন। তাহার পর বনাসের তীরবাহী যে বক্রপথ—গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া চলিয়াছে—তাহাই ধরিয়া—তাঁহারা আজমীরে আসিলেন। পার্ব্বত্য পথের কষ্টে সকলেই শ্রান্তি বোধ করিতে-ছিলেন, সুজনরামের স্ত্রী বলিলেন যদি কোন উপায়ে—নদীপথ পাওয়া যায় তাহারই চেষ্টা করা হউক!—

তখন লাইকা বলিল; যদি এই বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘন করিয়া পরপারে যাওয়া হয় তবে লুনী নদীর পথে নির্ব্বিঘ্নে—কচ্ছের উপকূলে যাওয়া যাইবে।—তাহাই হইল,—অতি অপরিসর পথে কষ্টে তাঁহারা জোহানির পথ ধরিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

প্রাচীন রাঠোর রাজধানী,—অল্পদিন পূর্ব্বেই মহাত্মা বোধরাও বোধপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন—এস্থল এখন শ্রীভ্রষ্ট, তথাপি প্রাচীন বীরকীর্ত্তি স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধরিয়া মন্দর চিরদিনই মানব হৃদয়ে ভক্তিভাব উদ্রেক করিতেছে!—লাইকা দুই দিন ধরিয়া নানকু বিন্দাকে লইয়া সকল দ্রষ্টব্যগুলি দেখাইয়া বেড়াইল।—তাহার পর কয়দিনে পালীর নিকট আসিয়া তাঁহারা লুনী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন।

জল পথে সুচিকন সরল যাত্রা!—যাত্রীদল কয়দিনের মধ্যেই সাচোরে উপস্থিত হইল। তাহার পর এইখানে সমুদ্র মুখের বিশাল দৃশ্য!—নদীমুখ ও সমুদ্র কুলের উচ্ছ্বসিত বিরাট শোভা দেখিয়া বালকেরা আনন্দে উন্মত্ত—এবং স্ত্রীলোকেরা কিছু চিন্তাকুল হইলেন। অতি সাবধানে নৌকা রাধনপুরার অভিমুখে চলিল।

হ্রদভাগ শেষ হইল, মালিয়ার ক্ষুদ্র প্রণালী পার হইয়া নৌকা মুন্দ্রার নিকট সমুদ্রে উপস্থিত হইল। কি বিরাট নীল দৃশ্য! সুজনরামের বালকেরা লাফাইয়া তীরে আসিল,—সাগরতীর ফেনহারে সাজিয়া খেলিতেছে, সদ্য রোগমুক্ত বালকেরা মহানন্দে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া স্নান করিল।

এইখানে নৌকাপথে যাত্রা অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল, সকলে নবনগরের পথ ধরিয়া পদব্রজে চলিলেন। পথে কোন কষ্ট নাই কোন ভয় নাই—নিরাপদে তাঁহারা তাঁহাদের গম্যস্থলে উপস্থিত হইলেন—সম্মুখেই সাগর-গর্ভে—দ্বারকানাথের বিশাল মন্দির—সাগর তরঙ্গে প্রতিহত হইতেছে!

তখন যাত্রীদলে মহানন্দকল্লোল উঠিল!—আহ্লাদে কেহ হাসিল কেহ কাঁদিল—দর্শনকামী ভক্তদলের হৃদয়োচ্ছাসে সাগর তীর উদ্বেল হইয়া উঠিল!

এই সময় লাইকা আসিয়া সুজনরামের পত্নীকে বলিল, "মা, এইবার ত তোমরা পথ চিনিলে—এখন সন্তান বিদায় হইতে পারে কি?"

তিনি আর বাধা দিতে পারিলেন না,—তখন সকলকে কাঁদাইয়া ও কাঁদিয়া লাইকা চলিয়া গেল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

মানভূমবাসীর দিকবিদিক্ জ্ঞান

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও এপ্রকার অসংখ্য লোক আছে, যাহারা দিক্, দূরত্ব ও সময় সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিচয় দিতে পারে না। বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষায় বাঙ্গালিগণ অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই বঙ্গদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯২ জন লোক নিরক্ষর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে পরিমাণ লোক লিখিতে পড়িতে জানে তাহার হিসাব এই প্রকার:—

বঙ্গদেশে প্রতি হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৭৭জন
মান্দ্রাজ বিভাগে „ „ „ ৭১ জন
বোম্বাই „ „ „ „ ৬৯ জন
বিহার ও উড়িষ্যা „ „ „ ৩৮ জন

ছোটনাগপুর ডিভিসনের মধ্যে মানভূম জেলায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে প্রতি হাজারে মাত্র ৪৩ জন লোক লিখিতে পড়িতে জানে। কিন্তু ছোটনাগপুরের অন্যান্য বিভাগের লিখিতে পড়িতে জানা লোকের সংখ্যা আরও কম, হাজারকরা মোটে ২৮ জন মাত্র।

এই জেলার অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ লোক দিক্, দূরত্ব বা সময়ের সঠিক পরিচয় দিতে পারে না। সাধারণতঃ বহুসংখ্যক লোক উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি দিকের নাম পর্য্যন্ত জানে না। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ বুঝাইতে হইলে, তাহারা যথাক্রমে "বেলা উঠা" ও "বেলা ডুবা" দিক্ বলে। "বেলা উঠা" শব্দে সূর্য্যোদয়ের দিক্ এবং "বেলা ডুবা" শব্দে সূর্য্যাস্তের দিক্ বুঝায়। উত্তর ও দক্ষিণ দিক বুঝাইতে হইলে লোকে ঐ ঐ দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। তদ্ব্যতীত উত্তর দক্ষিণদিক বুঝাইবার উপযুক্ত কোন ভাষার সহিত তাহারা পরিচিত নহে।

মানভূমে দিক্ বুঝাইবার জন্য অপর একটি উপায় বর্ত্তমান আছে। এখানকার ভূমি নিতান্ত অসমতল। যে কোন একটি স্থান তাহার নিকটবর্ত্তী অপর স্থান অপেক্ষা উচ্চ বা নিম্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সেই হিসাবে লোকে "অমুক স্থানের উপরে বা নিম্নে" বলিয়া দিক নির্দ্দেশ করে। গ্রামের যেভাগ নিম্ন, "নামো পাড়া" উচ্চভাগ "উপর পাড়া" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া সহরের উত্তর পূর্ব্বাংশ সহরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা নিম্ন এই হিসাবে, এই পল্লী, "নামো পুরুলিয়া" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। রাস্তার যে অংশ উন্নত স্থানে থাকে, তাহার নাম "উপর কুলি" (কুলি=গ্রাম্য-রাস্তা) ও অপরাংশের নাম "নামো কুলি"। "উপর কুলি"র ধারে যাহাদের বাস, তাহারা "উপর কুলির লোক," ও "নামোকুলির ধারে যাহাদের বাস, তাহারা "নামোকুলির লোক" বলিয়া পরিচিত। এই প্রকারে দিক্ নির্ণীত হইলে, তদ্দ্বারা উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিকের কোন আভাস পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে যে প্রকার বিঘা কাঠার হিসাবে জমীর পরিমাণ অবধারিত হয়, মানভূমের কৃষকগণ সে প্রকার বিঘা কাঠার হিসাব জানে না। এখানে জমীতে বৎসরে যে পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয়, অথবা জমীর বপন জন্য বৎসরে যে পরিমাণ বীজধান্যের প্রয়োজন হয়, সেই হিসাবে জমীর পরিমাণ কথিত হইয়া থাকে। এখানে সাধারণতঃ "পাঁচ পুড়া (১ পুড়া=১০ মণ) বা তিন পুড়া ধান্যের" জমী বলিয়া জমীর পরিমাণ প্রকাশিত হয়। দেশীয় ভাষায় "দু'শ ধান্যের" জমী বলিলে, যে জমীতে বৎসরে দুইশত মণ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে, সেই পরিমাণ জমী বুঝায়। তদ্ব্যতীত এখানে "একমণ বা পাঁচমণ ধান্য

পড়নের" জমী বলিয়াও জমীর পরিমাণ করিবার রীতি আছে। "একমণ ধান্য পড়নের" জমী বলিলে, সেই জমীতে বপন জন্য একমণ বীজধান্যের প্রয়োজন হয়, ইহাই বুঝায়। এক সময়ে একমণ ধান্য পড়নের জমীর প্রকৃত পরিমাণ ৮ বিঘা বলিয়া সরকারী কর্ম্মচারীগণ স্থির করিয়াছিলেন। এদেশে জমীর পরিমাণ বুঝাইবার জন্য আর এক প্রকার হিসাব আছে। তাহাকে লোকে রেখকুলির হিসাব বলে। এই রেখকুলির হিসাব মানভূম জেলা ও বাঁকুড়া জেলার স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। রেখকুলির হিসাব বুঝিবার জন্য, এই স্থানের একটি আদিম প্রথা বুঝিবার প্রয়োজন। এই সকল জঙ্গলময় স্থানে পূর্ব্বে এক একটি পরিবার একস্থানে বাস করিয়া আপনাদের পরিশ্রমে জঙ্গল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিত। বহুপুরুষ ধরিয়া সেই আদিম-পরিবারের বংশাবলী এইপ্রকারে গ্রামের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া শেষে তাহা আপনাদের ভিতর বিভাগ করিয়া লইয়াছে। এইপ্রকার বিভাগ কালে গ্রামের যাবতীয় পুরাতন আবাদী জমী আট, দশ, বার, চৌদ্দ কি ষোল অংশে বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রকার এক একটি অংশের নাম এক একটি রেখ। ভাগের সুবিধার জন্য অধিকাংশ স্থলে এই রকম জমী ষোল অংশে বিভক্ত হইয়াছে। জেলার স্থানে স্থানে অদ্যাপি আট বা দশ রেখের গ্রামও দেখিতে পাওয়া যায়। এক রেখের এক চতুর্থাংশের নাম কুলি। এক রেখ বা এক কুলিতে যে কত পরিমাণ জমী হইবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কোনও গ্রামের রেখে হয় ত বিশ বিঘা জমী থাকিতে পারে। আবার তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের রেখে দশ বিঘারও কম জমী থাকা অসম্ভব নহে। গ্রামের কৃষকেরা কিন্তু এই রেখ বা কুলি ব্যতীত জমীর পরিমাণসূচক অপর বিশেষ কোন পরিচয় দিতে পারে না। এই রেখ ও কুলি গ্রামের পুরাতন আবাদী জমীর নির্দ্দিষ্ট ভগ্নাংশ মাত্র।

কেবল আবাদী জমি সম্বন্ধেই এই প্রকার রেখ কুলি নির্দ্দিষ্ট উৎপন্ন ও পড়নের হিসাবে জমীর পরিমাণ স্থির করা হইয়া থাকে। এদেশের সর্ব্বত্র যে সকল অনুর্ব্বর পতিত ডাঙ্গা ও জঙ্গল আছে, তাহার পরিমাণ প্রকাশ করিবার ভাষা সাধারণ লোকের পরিজ্ঞাত নাই।

দূরত্ব বুঝাইবার জন্য এখানকার সাধারণ ভাষায় "কাঁড়," "ডাক," ও "হাঁক" শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'কাঁড়' শব্দের অর্থ 'তীর', "এককাঁড়" দূর বলিলে, একটী কাঁড় সজোরে নিক্ষিপ্ত হইলে যতদূর যায়, ততদূর বুঝায়। সেই প্রকারে 'একডাক' বলিলে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে যতদূর হইতে শুনিতে পারা যায়, ততদূর বুঝিতে হইবে। 'হাঁক' বলিলে, 'ডাক' অপেক্ষা অধিকদূর বুঝায়। পল্লীগ্রামের কোনও কোনও লোক ডাকাতের "হাঁক" বা চীৎকার শুনিয়া থাকিবেন। "হাঁক" শব্দে ঐ প্রকার শব্দ বুঝায়। ফলতঃ "কাঁড়", "ডাক" বা "হাঁক" শব্দে কোনও প্রকার নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব সূচিত হয় না। অনেক সময়ে "হাঁক" শব্দে এক মাইল দূরের জায়গা পর্য্যন্ত বুঝায়।

আজকাল জেলার স্থানে স্থানে পাকা রাস্তা হইয়াছে। ঐ সকল রাস্তার ধারে দূরত্বসূচক প্রস্তর (mile-stone) প্রোথিত আছে। তদ্দৃষ্টে পাকা রাস্তার নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকে মাইল পরিমাণ বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থানের লোক মাইলের পরিমাণ এখনও শিখে নাই।

দূরত্বসূচক ক্রোশের নাম অনেকে শুনিয়াছে। কিন্তু ক্রোশের পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই আছে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র "ডালভাঙ্গা" ক্রোশের কথা শুনা যাইত। প্রাতঃকালে কোনও বৃক্ষের ডাল বা শাখা হাতে লইয়া লোকে পথ চলিতে আরম্ভ করিত। পথ অতিক্রম করিতে করিতে যেখানে রৌদ্রে ঐ শাখার পত্র সকল শীর্ণ হইত, সেইখানে এক ক্রোশ পথ পরিসমাপ্ত হইত। ক্রোশ বলিলে এক্ষণে আর ততদূর বুঝায় না। কিন্তু তথাপি স্থানীয় লোকের হিসাবে এক ক্রোশ অনেক সময়ে দুই, তিন বা ততোধিক ক্রোশের কম হয় না।

দিক্ ও দূরত্ব বুঝিবার বা বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান এখানে যে প্রকার অল্প, সময় সম্বন্ধে ধারণাও তদ্রূপ। দিবা ভাগের সময় নির্দ্দেশের জন্য, সাধারণতঃ দুই প্রহর (বা দু' প'র), আড়াই প্রহর (বা আড়াই' প'র) কথার চলন আছে। তদ্ব্যতীত "বেশাম্ বেলা" একটী সময় বুঝাইবার বাক্য, "বেশাম্" শব্দ 'বিশ্রাম' শব্দের রূপান্তর। "বেশাম্ বেলা" বলিলে সাধারণতঃ প্রাতে ৯ ঘটিকা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বুঝায়। প্রাতঃকালে

বিশ্রাম করে বা জলখাবার খায়, সেই সময়ের নাম "বেশাম্ বেলা।" "বেশামের" পূর্ব্ব সময়ের নাম "আধ্ বেশাম্।" "আধ্ বেশাম্" বলিলে সাধারণতঃ প্রাতে ৮টা বা তাহার নিকটবর্ত্তী সময় বুঝায়। "বেশাম্" উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর, অর্থাৎ প্রায় ১১টার সময়কে এদেশে "খরবেশাম্ বেলা বলে।

এতদ্ব্যতীত এই স্থানে বেলা বুঝাইবার জন্য আর একটী সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়। এই সঙ্কেতটী বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে পরিচিত নহে। দিবাভাগের কোনও বিশেষ সময় বুঝাইবার জন্য লোকে আকাশের দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিয়া, তৎকালে যেস্থানে সূর্য্য থাকিবার কথা, সেই দিক্ দেখাইয়া বলে, "এমন বেলায়" বক্তব্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বক্তার অঙ্গুলি আকাশের যে দিকে সঞ্চালিত হইবে, দিবসের যে সময়ে ঐ স্থানে সূর্য্য থাকে, সঙ্কেতে তত বেলা বুঝিতে হইবে। দিবাভাগের ন্যায় রাত্রিকালের বিভাগ বুঝাইবার উপযুক্ত কোনও সঙ্কেত নাই।

রাত্রিকালের শেষাংশ বুঝাইবার জন্য "কুক্ড়িডাক" বলিলে যে সময়ে শেষ রাত্রিতে কুক্কুট শব্দ করে সেই সময় বুঝায়। এই "কুঁক্ড়িডাক" ইংরাজী "Cock-crow"র বঙ্গানুবাদ নহে। এই জেলার অধিবাসিগণের মধ্যে কুর্ম্মি, ভূমিজ, সাঁওতাল ও বাউরীগণ সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৪৮ জন এই চারি শ্রেণীর লোক। তাহারা যদিও সকলে বৈষ্ণব তথাপি কুক্কুট মাংস ভোজন দোষাবহ মনে করে না। প্রাতঃকালে অনেকে কুক্কুট ডাকি-

রত হয়। সেই জন্য "কুঁক্‌ড়ি ডাকের" সময়ের সহিত তাহারা বিশেষভাবে পরিচিত।

এখানকার অধিকাংশ লোক নিজের বয়স বলিতে পারে না। এখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব নাই। সেই জন্য ৬০ বৎসর ও তদপেক্ষা অধিক বয়সের লোক অনেক গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার পলিত কেশ, গলিতদন্ত বহুসংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তি তাহাদের বয়স 'এক কুড়ি' বা 'দেড় কুড়ি' বলিয়া শ্রোতার কৌতুক উৎপাদন করিয়া থাকে। আবার অনেকে বয়স কত জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, "আমার ত কোষ্ঠী নাই, বয়স ত সঙ্গেই আছে দেখিয়া লও।" গল্প আছে, বঙ্গদেশের কোন স্থানে জনৈক পক্ক-শ্মশ্রু বৃদ্ধ তাহার বয়স সতের বৎসর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। কৌতূহলাক্রান্ত শ্রোতা তাহার দীর্ঘ শ্মশ্রুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অত অল্প বয়সে এত বড় দাড়ী কিরূপে হইল জিজ্ঞাসা করিলে, সে ধীরভাবে উত্তর দিয়াছিল, "এ দাড়ী বাবা তারকেশ্বরের!" বয়স সম্বন্ধে এ প্রকার সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর এখানে অনেকেই দিয়া থাকে।

সম্প্রতি মেথডিষ্ট টাইম্‌স্ (Methodist Times) পত্রিকায় একজন ইংরাজ লেখক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক বলেন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার সময় হইতে ব্যক্তি বিশেষের জীবনের কাহিনী বিবৃতি করিবার রীতি আছে। লেখক কিছুদিন মানভূম জেলায় ছিলেন। তিনি এখানকার অনেক লোককে "গঙ্গা নারায়ণী হাঙ্গামার" সময় হইতে বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিতে শুনিয়াছেন।

মানভূম জেলায় বরাহভূম নামে একটি পরগণা আছে। এই পরগণার ভূস্বামী এক প্রাচীন রাজবংশের বংশধর। এই বংশে বিবেক নারায়ণ নামে এক রাজা ছিলেন। বিবেকনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বাধীন ছিলেন। বিবেকনারায়ণও দীর্ঘকাল ধরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বিবেকনারায়ণ পরাস্ত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করেন। বিবেকনারায়ণের রঘুনাথ ও লক্ষ্মণ নামে দুই পুত্র ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ রঘুনাথ বিবেকনারায়ণের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত; ও কনিষ্ঠ প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত ছিলেন। ইংরাজ সরকার যুদ্ধান্তে রঘুনাথের সহিত বরাহভূম পরগণা বন্দোবস্ত করেন। কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ প্রধানা রাণীর সন্তান বলিয়া রাজ্যে দাবী করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ রঘুনাথের সহিত বহুদিন যুদ্ধ করিয়া পরে পরাজিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজের কারাগারে লক্ষ্মণের দেহান্ত ঘটে। গঙ্গানারায়ণ লক্ষ্মণের পুত্র।

বিবেকনারায়ণের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যে কারণে বিবাদ হইয়াছিল, রঘুনাথের দুই পুত্রের মধ্যেও সেই কারণে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মাধবসিংহ রাজ্যের জন্য প্রথমতঃ যুদ্ধ ও পরে দেওয়ানী মোকদ্দমা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। শেষে সর্ব্বত্র পরাজিত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দের দেওয়ান মনোনীত

হইয়াছিলেন। মাধবসিংহ অত্যন্ত স্বার্থপর, প্রজাপীড়ক দেওয়ান ছিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র গঙ্গানারায়ণের ভরণপোষণ জন্য রাজা কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। মাধব সিংহ ঐ সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া গঙ্গানারায়ণকে পথের ভিখারী করিয়াছিলেন। গল্প এই প্রকার যে গঙ্গানারায়ণকে যাহাতে রাজ্যের ভিতর কেহ মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্ত না দেয়, তজ্জন্য মাধব সিংহ প্রজাগণের উপর কঠোর আদেশ দিয়াছিলেন! শেষে উৎপীড়িত প্রজামণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গানারায়ণ বরাহভূম পরগণার অন্তর্গত বান্দড়ি নামক গ্রামে মাধব সিংহকে হত্যা করেন। তৎপরে গঙ্গানারায়ণ প্রজাপুঞ্জের নেতা হইয়া তাহাদের সাহায্যে বরাহভূম পরগণা ও নিকটবর্ত্তী বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন। শেষে পুরুলিয়া নগরের ৮ মাইল দক্ষিণে চাকলতোড় নামক স্থানে গঙ্গানারায়ণের সহিত ইংরাজ সৈন্যের এক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গঙ্গানারায়ণ পরাজিত হইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৮৩২ সালে (বাঙ্গালা ১২৩৯ সালে) গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে লোকে "গঙ্গানারায়ণীর সময় আমি এত বড় ছিলাম" কি "গঙ্গানারায়ণীর দশ বছর পরে আমার বড়ছেলে হয়" ইত্যাদি বলিয়া বহু ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিত। বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা হইতে কাল গণনা আর শুনা যায় না। তবে এদেশে এখনও "সিপাহী হাঙ্গামা বা বড় হাঙ্গামা" এবং "বড় আকাল" হইতে কালগণনার বিস্তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে মানভূম অশান্তির নিলয় হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহীগণ পুরুলিয়ার খাজনাখানা, জেল প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের বিস্তর কাগজপত্র ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই জেলার সর্ব্বপ্রধান জমীদারী পঞ্চকোটে তখন রাজা নীলমণি সিংহ জমীদার ছিলেন। প্রবাদ আছে যে রাজা নীলমণি সিংহ বিদ্রোহীগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সিপাহী বিদ্রোহ মানভূমের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

ইংরাজী ১৮৬৬ সালে (বাঙ্গালা ১২৭৩ সালে) এখানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কথা অনেকের জানা আছে। মানভূম অঞ্চলেও দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপ প্রকাশ পাইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে দেশের বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষ এদেশে সাধারণতঃ "বড় আকাল" বা "ছিয়াত্তুরে আকাল" বলিয়া পরিচিত। ১২৭৩ সালে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তথাপি ইহাকে "ছিয়াত্তুরে আকাল" বলা হয় কেন? সন ১১৭৬ সালে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল,—ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। তৎকালীন লোকে ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের কথা শুনিত। সুতরাং সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষের পুনরভিনয় দৃষ্টে তাহারা "তিয়াত্তুরে অকাল"কে "ছিয়াত্তুরে অকাল" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষও এখানকার একটী স্মরণীয় ঘটনা।

এই "বড় হাঙ্গামা" ও "বড় আকাল" হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপি অনেকে বিস্তর ঘটনার কালনির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অবশ্য প্রাগুক্ত ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়াও অনেকে

সঠিক সময় নির্দ্দেশ করিতে পারে না। কেহ কেহ "বড় আকালের সময়ে আমি এত বড় ছিলি (ছিলি=ছিলাম।)" এই বলিয়া হাত তুলিয়া তৎকালে সে মাথায় কত উচ্চ ছিল, তাহা দেখাইয়া দেয়। কেহ বলে "বড় আকালের সময়ে আমি গরু বাগালি করতি (করতি=করিতাম)। গরু বাগালি করা মানে গরু চরান। এ জেলায় 'রাখাল' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বাগাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই প্রকারে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার সহিত যোগ রাখিয়া অন্যান্য ঘটনার পরিচয় দেওয়া এখানকার কৃষকদিগের রীতি।

স্মরণীয় বিশেষ ঘটনা প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে "বড় আকালে"র পর, আর সেরূপ স্মরণযোগ্য ঘটনা বড় একটা ঘটে নাই। সুতরাং এখন অনেকে অন্যরূপে সময় বুঝাইবার চেষ্টা করে। কেহ কেহ তাহার বয়স কত জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আমার বড় বেটা নিম্‌জোয়ান্।" এখানে "নিমজোয়ান্" শব্দে ১৫।১৬ বৎসরের লোককে, অর্থাৎ পুরা যোয়ান্ হইতে কিছু বাকী আছে—ইহাই বুঝায়। এই প্রকার পুত্র পৌত্রের আনুমানিক বয়স হইতে লোকের বয়স স্থির করা কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই প্রকারে দিক্, দূরত্ব ও কালনির্ণয় যে কতদূর অজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন। যদি কখনও এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তবেই এই প্রকার অজ্ঞতা ক্রমশঃ লোপ পাইবার আশা করা যাইতে পারে। নতুবা এই জেলার সম্বন্ধে কবিকে চিরকাল গাইতে হইবে—

"তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

শ্রীহরিনাথ ঘোষ।

অতিথি

১

শারদ প্রভাতে আজি গো আমার কুটীরে কে তুমি অতিথি?
জাগিয়া স্নিগ্ধ কিরণ, উষায়
ঝলকে তোমার শ্যামল ভূষায়;
জাগিছে অঙ্গে অরুণের রাগ, চোখে প্রভাতের জ্যোতিটি;
স্বাগত। প্রভাত-অতিথি!

২

ব্যথাসমুথ চেতনায় মোর উদ্ভূত একি প্রতীতি!
ভস্ম 'পরে নত চিতার ধুঁয়ায়,
মৃত্যুর গূঢ় নিভৃত গুহায়,
স্ফুরিত দীপ্ত আলোক আবার, নির্ব্বাণ নাশি ঝটিতি!
এস প্রিয়তম অতিথি!

৩

সিক্ত বক্ষে ভাতে রামধনু; মধুর আলোক-সমিতি!
আঁখির পাতায়, শিশির ফলকে,
পূর্ণ সপ্তবর্ণ ঝলকে!
প্রভাতে তোমার অমৃত মুক্ত আলোকে দীপ্ত প্রকৃতি!
এস সুন্দর অতিথি!

৪

কুটীর দুয়ারে লহ গো অর্ঘ্য, ওগো স্বর্গের অতিথি!
ছার জীবনের সাধনার ধন—
যৌবন পারে জরা ও মরণ,
দলিয়া চরণে লহ গো প্রাণের হীরক-মুক্তা-মোতিটি!
স্বাগত! প্রভাত-অতিথি!

মোগল-আমলে শিল্পকলা

"নবজীবনের" যুগই ভারতীয় শিল্পকলার প্রকৃষ্ট যুগ।

বাস্তুশিল্প।—প্রথমে প্রাচীন দিল্লির রূঢ় ধরণের কীর্ত্তিমন্দিরাদি ;—বাবর ও হুমায়ুনের কীর্ত্তিকলাপ—কতকগুলি প্রস্তরময় শিবির বলিলেও হয়। একটা অলিন্দ, এই অলিন্দের উপর একটা স্থূল তলভূমি,—তাহার ধারে ধারে কতকগুলি চতুষ্ক ; মধ্যস্থলে সূচাগ্র গোলাকার গম্বুজ। মুসলমান গঠনরীতি, পারসীকদিগের শিল্পকলা, তাহার সহিত মোগলদিগের রূঢ়তা ;—এই রূঢ়তা মোগলদিগের নিজস্ব। যে দেশের উপর জয়লাভ করিয়াছে, এই বিজেতারা সেই দেশের লোকের কিছুই জানে না।

আকবরের আমল।—আকবরের আমলে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। তখনও বাস্তুগঠনরীতি পারসীক ও মোগল ধরণের ছিল ; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই উহার উপর ভারতের প্রভাব প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল ; নবসাম্রাজ্যের কল্পনায় উহা অনুরঞ্জিত হয় ; এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আপনাকে সূর্য্যসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত আগ্রার প্রাকার ও দন্তুর বুরুজবিশিষ্ট চূড়াগুলি একজন সৈনিকের কীর্ত্তি, এবং ফতেপুরের মসজিদ ও ফতেপুরের বিজয়-তোরণ বিজয়ী মুসলমানের প্রকৃত বিজয়চিহ্ন বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, ফতেপুরের প্রাসাদ, ফতেপুরের মণ্ডপগৃহাদি, ফতেপুরের দ্বারপ্রকোষ্ঠ, জাহাজের গলুয়ের মত থামের মাথাল,—এই সমস্ত একজন রাজার পরিচয় দেয়—হিন্দুরাজার পরিচয় দেয়। সিকন্দ্রার সমাধিমন্দিরও ঐরূপ :—কতকগুলি অলিন্দ—যাহার উপর লোহিত প্রস্তর ও ধবল মর্ম্মর-প্রস্তর স্থাপিত ; উহার বারাণ্ডা, উহার চতুষ্ক দেখিলে সমাধিমন্দির অপেক্ষা ভজনমন্দির বলিয়াই মনে হয়। শেষ অলিন্দটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা ও বালুকার দ্বারা আচ্ছাদিত। মধ্যস্থলে একটি অনাড়ম্বর সমাধি-প্রস্তর ; সূর্য্যসম্ভব সম্রাট ইহা ভক্তের উদ্দেশে নির্ম্মাণ করাইলেও এই সমাধিমন্দিরের উপর মোগল-সম্রাটের হীরক বসাইয়াছিলেন।

আকবর ও জহাঙ্গিরের সংযত ও সুদৃঢ় গঠনরীতির পরে, শাজাহানের জমকাল অথচ সুন্দর গঠনরীতির আবির্ভাব হইল। হিন্দুর কলারুচি ও মুসলমানের কলারুচি একত্র মিশ্রিত হইল। বহুমূল্য রত্নখচিত ধবল মর্ম্মর-প্রস্তর, লোহিত প্রস্তরের স্থান অধিকার করিল। সেই সময়েই পরমাশ্চর্য্য দ্বার প্রকোষ্ঠ-সকল ও দিল্লির মোতি মসজিদ্ আবির্ভূত হইল। আগ্রার প্রাসাদে,—দর্পণ-সমাচ্ছাদিত স্নানাগার, অলিন্দ, চতুষ্ক প্রভৃতি, আকবর-নির্ম্মিত প্রাকারের মুকুটরূপে ভূষিত হইয়া যমুনা-প্রবাহের উপর দৃষ্টি প্রসারিত করিল।

এই সকল চতুষ্ক হইতে,—নগরের গৃহাদি ছাড়াইয়া, উপবন-বিভক্ত মাঠময়দান ছাড়াইয়া—শাজাহানের প্রিয়তমার সমাধিমন্দির ও ভারতীয় শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা—সেই তাজমহল পরিদৃশ্যমান্। একটা সমতল ভূমি, ধবল মর্ম্মর প্রস্তরে সমাচ্ছাদিত ; একটা

উদ্যানের শেষপ্রান্তে নদী বহিয়া যাইতেছে, অথবা উন্নতশীর্ষ ঝাউগাছ-শোভিত দীর্ঘাকার চৌবাচ্চাসকল উপবনভূমিকে বিভক্ত করিয়াছে। লাল-পাথরের মসজিদের অলিন্দের পার্শ্বদেশে ধবল মর্ম্মর-প্রস্তরের চতুর্দ্দিকস্থ "মিনারেটর" মাঝখানে সেই সমাধিমন্দির। অষ্টকোণাকৃতি তলভূমি :—ভগ্নধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত চারিটি দ্বার; আরও ২৪টা দুই-থাক্, ছোটছোট দ্বার-পথ; একটা অলিন্দ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজভূষিত চারিটি মণ্ডপের মধ্যে, বহুমূল্য রত্নখচিত এক বৃহৎ গম্বুজ।

ঔরংজেবের আমলের যে গঠনরীতি সে সৈনিকের গঠনরীতি, ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্তের গঠনরীতি এইরূপ বলা যাইতে পারে। ইহা পূর্ব্বতন গঠনরীতির হিসাবে একটা প্রতিক্রিয়া। গঙ্গানদীর তটস্থ অগণিত হিন্দু মন্দিরের মাথা ছাড়াইয়া বারাণসীতে যে মসজিদ উঠিয়াছে, সেই মসজিদ বিজেতার বিজয়-নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়।

ঔরংজেবের মৃত্যুর পরেই তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের কীর্ত্তিকলাপ সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পরিচয় দেয়, দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত নরপতিদিগের পরিচয় দেয়, অবনতিগ্রস্ত বিকৃত শিল্পকলার পরিচয় দেয়।

মোগল সম্রাটদিগের ন্যায় সকল মুসলমান নৃপতিই স্বকীয় স্মৃতিরক্ষার জন্য ইমারৎ নির্ম্মাণ করাইতেন :—নীল চীনে-মাটির কাজে আচ্ছাদিত গোলকন্দের সমাধি মন্দিরসমূহ; পৃথিবীর মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সেই বিজাপুরের গম্বুজ। গুজরাট প্রদেশস্থ আহমদাবাদে হিন্দুশিল্পকলা ও

গিয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই, আর একটি নূতন প্রভাব অনুভূত হইতে আরম্ভ হইল—সেটি য়ুরোপীয় শিল্পকলার প্রভাব। এই প্রভাবের পরিণাম—লক্ষ্ণৌ নগরের বড় বড় প্রাসাদ, ও মসজিদাদি। মুসলমান শিল্পকলা কলুষিত হইল, অন্তর্হিত হইল। যে সকল তথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তদৃষ্টে আমরা ষোড়শ শতাব্দী, সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি এবং ঐ প্রত্যেক যুগের রচনাকার্য্যের সহিত ঐ একই যুগের য়ুরোপীয় বাস্তুশিল্পের তুলনা করিতে পারি। য়ুরোপের ন্যায়, ভারতেও "নবজীবনের" তরুণ ও নির্ভীক শিল্পকলার আবির্ভাব হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও জ্ঞানগর্ভ ও আরও বিরাট শিল্পকলার আবির্ভাব হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতীব কৃত্রিম ও দার্শনিক ভাব-রঞ্জিত শিল্পকলার আবির্ভাব হয়।

***

চিত্রবিদ্যা।—ইসলামধর্ম্মে, মূর্ত্তিরচনা শিল্পের অনুশীলন নিষিদ্ধ; কিন্তু আকবরের আমলে এই নিষেধ কেহ বড় একটা মানিত না।

আবুল ফজল লিখিয়াছেন :—

"অনেকে মনে করে, পদার্থ সকল নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের একটা সাদৃশ্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা অলসভাবে সময় কাটাইবার একটা উপায় মাত্র। কিন্তু আমার মনে হয়, সুনিয়ন্ত্রিত মনের পক্ষে, এই সথটি জ্ঞানার্জ্জনের একটা দ্বার, অজ্ঞান-গরলের একটা বিষহারী মহৌষধ। যে সকল গোঁড়ারা বিধিব্যবস্থায় শুধু অক্ষর মাত্র দেখে, তাহারাই চিত্রবিদ্যাকে গর্হিত বলিয়া মনে করে; কিন্তু এক্ষণে তাহাদের চক্ষু

কতকগুলি বন্ধুকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তিনি একজনকে তাঁহার সমক্ষে ছবি আঁকিতে অনুমতি দিলেন, তাহার পর বলিলেন:—যাহারা চিত্র-বিদ্যার বিদ্বেষী, আমি তাহাদের বিদ্বেষী। চিত্র কলা কি?—না ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটা প্রমাণ আত্মসমক্ষে প্রদর্শন করা। জীবন্ত লোকদিগের মুর্ত্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই ঠিক করিয়া চিত্রিত কর না কেন, সেই চিত্রে কখনই প্রাণসঞ্চার করিতে পারিবে না। তবেই বলিতে হয়—ঈশ্বরই কেবল প্রাণদান করিতে পারেন।"

রং ও বার্ণিস প্রস্তুত করিবার কাজে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল আবুল-ফজল তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন:—পারস্য দেশীয় বড় চিত্রকর বিজ্বাদের রচনার সহিত, (ষোড়শ শতাব্দীর) এবং "যাহাদের যশে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ" সেই য়ুরোপীয় চিত্রকরদিগের রচনার সহিত, ভারতীয় ওস্তাদদিগের রচনাবলী টক্কর দিতে পারে।

এই ভারতীয় ওস্তাদদিগের মধ্যে আইন-ই-আকবরীতে ৪ জনের নাম আছে:—কবি বলিয়াই যাহার বেশী খ্যাতি সেই জুদাই; উদারচিত্ত খাজা-আবদুস্‌সমদ; সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দসবন্ত—যে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যা করে; বসাবন—যাহার তুলিকা সর্ব্বপ্রকার চিত্রকর্ম্মেই সুনিপুণ ছিল। কিন্তু পারস্য-চিত্রকলার দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতীয় চিত্রকলা কেবল ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রেরই অনুশীলন করিত। এই ভারতীয় ওস্তাদেরা কতকগুলি ভাল ভাল প্রতিকৃতি এবং সুন্দর চিত্রকর্ম্মে বিভূষিত কতকগুলি কেতাব রাখিয়া গিয়াছে।

সঙ্গীত।—ষোড়শ শতাব্দীর দুইজন গায়ক ভাল ভাল সুর রচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের রচিত সুরগুলি এখনও খুব লোকপ্রিয়:—গোয়ালিয়রের নায়ক-বক্‌সু (শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে) এবং আকবরের প্রিয় গায়ক তানসেন।

আবুল ফজল লিখিয়াছেন:—

"আমি সেই সঙ্গীতের আশ্চর্য্য শক্তি বর্ণনা করিতে অসমর্থ—যে সঙ্গীত বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্রস্বরূপ। কখন বা গীত ও স্বরগুলি হৃদয়-অন্দরমহলের রূপসীদিগের মত হঠাৎ কণ্ঠে আসিয়া আবির্ভূত হয়; কখন বা কর-স্পৃষ্ট তন্ত্রীধ্বনি ও গম্ভীর ঐক্যধ্বনি শ্রবণবিবরে সুধা ঢালিয়া দেয়। সুরগুলি শ্রুতি-গবাক্ষ দিয়া প্রথমে প্রবেশ করে, পরে শতসহস্র উপহার লইয়া আবার স্বকীয় আবাস সেই হৃদয় মন্দিরে ফিরিয়া যায়। নিজনিজ মানসিক প্রকৃতি ও অবস্থানুসারে শ্রোতৃবর্গ দুঃখ বা আনন্দ অনুভব করে। সঙ্গীত সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীকেও গড়িয়া তুলে আবার সংসারে আসক্ত বারাঙ্গনাকেও গড়িয়া তুলে। সম্রাট্‌বাহাদুর সঙ্গীত ভালবাসেন, এবং যাহারা এই মোহিনী বিদ্যার সাধনা করে তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। রাজদরবারের অসংখ্য গায়ক বাদক—পুরুষ, স্ত্রী, হিন্দু, পারসীক, তুরাণী, কাশ্মীরী; দরবারী গায়ক-বাদকের দল, সাত শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রত্যেক শ্রেণীর গায়ক-বাদক সপ্তাহে একদিন সম্রাটকে সঙ্গীত শুনায়। সম্রাট বাহাদুর হুকুম দিবামাত্রই গায়ক-বাদকেরা সঙ্গীত-মদিরা অজস্রধারে ঢালিয়া দেয়; এই মদিরায় কাহারও বা নেশা ছুটিয়া যায়, কাহারও বা নেশা জমিয়া যায়।"

আলঙ্কারিক শিল্পকলা।—দীর্ঘকাল বিকাশ লাভ করিয়া এই শিল্পকলা সপ্তদশ শতাব্দীতে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

আধুনিক যুগের বহু পূর্ব্বে, ভারতীয় শিল্প সামগ্রী আরব ও পারসীকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার সমূহের পূর্ব্বে, দিল্লির প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভের ন্যায় স্থূল লৌহখণ্ড আর কখন ঢালাই হয় নাই। হিন্দুরা বহুমূল্য-ধাতুর কাজেও খুব

উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিল; হিন্দুরা অলঙ্কার সকল মুক্তা ও বিবিধ রত্নে খচিত করিত, কার্পাসবস্ত্র বয়ন করিত, এবং কাপড়ে চিকনের কাজ করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে পুরাকালের অল্প কারুকার্য্যই আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে; কেবল গ্রীক্ বা বৈজন্তীন্ ধরণের কয়েক খণ্ড স্বর্ণালঙ্কার আমরা দেখিতে পাই। ইমারতী অলঙ্কারের জন্য, ভারতবাসী-গণ স্বীয় শিল্পকলার নক্সাদি ব্যাবিলনিয়া ও পারস্যদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতবাসীরা খুব সম্ভব তাহার অল্পস্বল্প বদলও করিয়াছিল। মনে হয়, রোমক শিল্পী ও মধ্যযুগের য়ুরোপীয় শিল্পী, হিন্দু শিল্পীদিগের নিকট হইতে চিকণ-কাজের নক্সার ভাব কতকটা গ্রহণ করে।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মহাসংকট কালের পর, দৈন্যগ্রস্ত ভারতীয় শিল্পকলা, পারসীক শিল্পকলার শাখা মাত্রে পরিণত হয়। অবশ্য ভারতবাসীরা এই ধার-করা জিনিসগুলিকে রূপান্তরিত করিয়াছিল। আরবী ধরণের লতা পাতার নক্সার সহিত, পুষ্প পল্লবের নক্সার সহিত, উহারা জ্যামিতিক নক্সা, জীব জন্তু, দেব, মানব প্রভৃতি-মূর্ত্তির নক্সা মিশ্রিত করিয়াছিল; উহাদের বহুবর্ণবিন্যাস-পদ্ধতি রূঢ় ধরণের ছিল। উহারা উদ্ভিদ-জগৎ হইতে যে সকল মূল-নক্সা বাহির করিত, তাহার মধ্যে ভারতীয় বৃক্ষাদিই দৃষ্ট হয়। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের জন্য, ঘটাদির জন্য, গৃহসজ্জার জন্য, উহারা পারসীক নক্সার আকারই রক্ষা করিয়াছিল এবং উহাদের নিজস্ব মূল-নক্সা প্রায়ই পারসীক নক্সার কাঠামের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। পারস্যের মধ্যবর্ত্তিতাসূত্রে ভারত, আরব ও বৈজেনসিয়া-কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হয়; আবার, বাণিজ্য-সূত্রে, চীনদেশীয় আদর্শ লাভ করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় প্রভাব গুজরাট্ ও দাক্ষিণাত্যের শিল্পকলাকে রূপান্তরিত করিল। এই প্রভাব দৃষ্ট হইত —কাপড়ের উপর, রত্নখচিত সামগ্রীর উপর, খোদাই করা কাঠের আস্‌বাবপত্রের উপর, সিন্দুকের উপর, আলমারীর উপর।—ইটালী দেশের নবজীবন যুগের শিল্পাদি যে সকল কারুকার্য্যে ভূষিত হইত সেই সকল কারু-কার্য্যও ঐ সকল দ্রব্যে পরিলক্ষিত হইত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে, উনবিংশ শতাব্দীতে, ভারতের সকল প্রদেশেই, ও সকল ব্যবসাতেই এই প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল; কিন্তু ভারতের শিল্পরীতি ও য়ুরোপীয় শিল্পরীতি তখনও পরস্পরের সহিত বেশ বেমালুম মিশিয়া যাইতে পারে নাই।

এক হিসাবে বলিতে গেলে, আলঙ্কারিক শিল্পকলার ইতিহাস, স্বয়ং ভারতেরই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:—প্রথমে জগৎ হইতে পৃথক্ থাকিয়া ভারত ধীরে ধীরে আত্মবিকাশ লাভ করিল; তাহার পর, পারস্য ও গ্রীসের প্রভাবাধীনে আসিয়া পড়িল, পরে মুসলমানদিগের আক্রমণে রূপান্তরিত হইল, এবং সর্ব্বশেষে য়ুরোপীয়-দিগের দিগ্‌বিজয়ের পর সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।



ও-বাড়ির পূজো !

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ভারত ষড়ঙ্গ

১। রূপভেদাঃ

রূপভেদাঃ —রূপে রূপে বিভিন্নতা, রূপের মর্ম্মভেদ বা রহস্য উদ্ঘাটন,—জীবিত রূপ, নির্জ্জিত রূপ, চাক্ষুষ রূপ, মানস রূপ, সু রূপ, কু রূপ ইত্যাদি।

মায়ের কোলে সবপ্রথম চোখ খুলিয়া অবধি আমরা রূপকেই দেখিতেছি। "জ্যোতিঃ পশ্যতি রূপাণি!" গ্রহনক্ষত্রের জ্যোতি, রূপকে প্রকাশিত করিতেছে, আত্মার জ্যোতি, রূপকে প্রকাশিত দেখিতেছে—আলোকের ছন্দে, ভাবের ছন্দে—'বহুধা' 'বহুপ্রকারে', যথা—

জ্যোতিঃ পশ্যতি রূপাণি রূপঞ্চ বহুধাস্মৃতম্
হ্রস্বোদীর্ঘস্তথা স্থূলশ্চতুরস্রোঽণুবৃত্তবান্ ॥৩৩
শুক্লঃ কৃষ্ণস্তথা রক্তঃ পীতো নীলারুণস্তথা
কঠিনশ্চিকণঃ শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলো মৃদু দারুণঃ ॥৩৪ ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৮৪ অধ্যায়)

হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল চতুষ্কোণ ও নানা কোণ—যেমন ত্রিকোণ ষট্‌কোণ অষ্টকোণাদি এবং গোলাকৃতি অণ্ডাকৃতি; অথবা শ্বেত, কৃষ্ণ, নীলারুণ (বেগুনি) ও নানাবর্ণের মিশ্রিত রূপ; রক্ত পীতাদি এক এক স্বতন্ত্র বর্ণরূপ; কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ম (সূক্ষ্ম, কৃশ, স্নিগ্ধ, স্বল্প), পিচ্ছিল অর্থাৎ পিছল,—যেমন কাদা, যেমন জল; পিচ্ছিল যেমন ছত্রাকার ময়ূরপিচ্ছ; মৃদু যেমন শিরীষ ফুল, দারুণ যেন লোহার ভীম! ছোট বড়, রোগা মোটা, কাটাছাঁটা, গোলগাল, কালোধলো, একরঙ্গা, পাঁচরঙ্গা ইত্যাদি;—উপরের শ্লোকে যে ষোলো প্রকার রূপ কথিত হইয়াছে তাহার বিস্তার অশেষ। এই রূপের অসীমতা এক এক পদার্থে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন দেখা এবং এই অখণ্ড বিভিন্নতাকে একে সমাহিত—অসীমে প্রতিষ্ঠিত—দেখাই হচ্ছে চক্ষুর এবং আত্মার কাজ। প্রথমে রূপের সহিত চোখের পরিচয়, ক্রমে তাহার সহিত আত্মার পরিচয়—ইহাই হচ্ছে রূপভেদের গোড়ার কথা এবং শেষের কথা।

চক্ষু দিয়া যখন রূপভেদ বুঝিতে চলি তখন এক রূপের সহিত আর-এক রূপের তুলনা দিয়া দুয়ের পার্থক্য দেখিতে চলি;—হ্রস্বকে দীর্ঘ দিয়া, চতুষ্কোণকে নানা কোণ কিম্বা নিষ্কোণ, কঠিনকে কোমল দিয়া, এবং এক বর্ণকে আর এক বর্ণের পাশে দাঁড় করাইয়া। এরূপে কেবল চোখের দেখার দৃশ্য বস্তুটি তোমারও কাছে যেরূপ আমারও কাছে সেইরূপ। রমণীকে তুমিও দেখিতেছ রমণী, আমিও দেখিতেছি রমণী; তুমিও তাহাকে চিত্রিত করিতেছ যেরূপে, আমিও চিত্রিত করিতেছি সেইরূপে, এবং এই ফটো-যন্ত্রটিও চিত্রিত করিতেছে সেই রূপে। সুতরাং কেবল চোখের সাহায্যে রূপটি চিত্রিত হইলে তোমার চিত্রিত, আমার চিত্রিত এবং ফটো-যন্ত্রের চিত্রিত রূপেতে, বিভিন্নতা রহে না; বড় জোর রূপটির তুমি দেখাইলে এক পাশ, আমি দেখাইলাম এক পাশ, সে দেখাইল একপাশ। হয়তো তুমি দেখাইলে এক রমণী জল তুলিতে চলিয়াছে, হয়তো আমি দেখাইলাম সেই রমণীটিই চুল বাঁধিতেছে এবং সে দেখাইল শিশুকে

স্তন্যপান করাইতেছে। অথবা আমাদের তিন জনের মধ্যেই একজন চিত্র করিয়া দেখাইলাম যে, তিন ভিন্ন ভিন্ন রমণী ঐ তিন কার্য্যে ব্যাপৃতা। কিন্তু এতটা করিয়াও কি বুঝাইতে পারিতেছি যে, এই রমণী মাতা, ইনি ঘরের বধূ ও এই ঘরের দাসী? বলিতে পার না যে, স্তন্যপ্রদান-রতাই হচ্ছেন মাতা, কেশরচনা-রতাই হচ্ছেন বধূ, এবং জল-আনয়নউদ্যতাই হচ্ছেন দাসী; কেননা ধাত্রী যে সেও স্তন্য পান করায়, মাতা যে সেও কেশ রচনা করে এবং বধূ যে সেও জল তুলিতে চলে! হয়তো, তুমি জল যে আনিতে চলিয়াছে তাহাকে একটু মলিন বেশ দিয়া, চুল যে বাঁধিতেছে তাহাকে সিন্দুরাদি দিয়া, কোনো প্রকারে বুঝাইলে যে, এই দাসী, এই বধূ! কিন্তু মাতৃরূপের বেলায় কি করিবে? সন্তানরূপের বেলায় কি করিবে? ছেলেটিকে কোলে দিয়াই তো বুঝাইতে পারিতেছ না ইনি মা, ইনি পুত্র;—ইনি ধাত্রী নহেন, পালিত পুত্রও নহেন। দুই কিশোরীকে পাশাপাশি বসাইয়া, ছবির নীচে না লিখিয়া দিয়া, বুঝাইতে পার না তো—ইহারা ভগিনী;—দুই প্রতিবেশী নয়। মলিন বেশ দিয়াই তো জোর করিয়া বলিতে পার না, ইনিই দাসী;—ইনি দুঃখীর ঘরের লক্ষ্মীটি নন। সুতরাং দেখিতেছ কার্য্যের ভিন্নতা, বেশের ভিন্নতা—এমন কি আকৃতির ভিন্নতা দিয়াও তুমি চিত্রিত রমণী-রূপটির সত্ত্বা—যেমন তাঁহার মাতৃত্ব, ভগ্নীত্ব, দাসীত্ব ইত্যাদি—সপ্রমাণ করিতে পারিতেছ না। বলিতে পার না যে, রূপে তাহার সত্ত্বা দান অসম্ভব, যখন তোমার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে—র্যাফেলের মাতৃরূপ, আমাদের কৃষ্ণরাধার যুগল রূপ এবং পাষাণের রেখায় প্রকাশিত তেত্রিশ কোটী দিব্য রূপ।

কাজেই কেবল দুই চোখের উপর, চিত্রে রূপভেদটি দেখাইবার সম্পূর্ণ ভার দিয়া, আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না; কেননা চক্ষু কাজে ফাঁকি দিতে চাহিতেছে,—রূপের সত্ত্বাটি সে দেখিতে ও দেখাইতে সক্ষম নয়। কাজেই রমণী-রূপটিকে সে নটীর মত কখন মলিন, কখন উজ্জ্বল বেশে, কখন তাহার কোলে ছেলে দিয়া, কখন তাহার হাতে ঝাঁটা দিয়া বুঝাইতে চায় যে, ইনি দাসী, ইনি মাতা, ইনি রাণী, ইনি মেথরাণী! কিন্তু বিভিন্ন বেশের ভিতর দিয়া দেখা দিতেছেন সেই নটীরূপ যিনি মাতাও নহেন, রাণীও নহেন। সুতরাং দেখিতেছি চিত্রকরের পক্ষে একমাত্র চক্ষুর পথই উত্তম পথ নয়; কেননা রূপের বহিরঙ্গীণ ভিন্নতা ধরিতে ও ধরিয়া দিতে পারিলেও চক্ষু বিভিন্ন রূপের সত্ত্বাকে অর্থাৎ রূপের আসল ভেদা-ভেদটাকে ধরিতে পারে না; ধরিয়া দিতেও পারে না। রূপের এই আসল ভেদ বা রূপের মর্ম্ম, কেবল জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারাই আমরা ধরিতে পারি। "নহু জ্ঞানানি ভিদ্যন্তামাকারস্তু ন ভিদ্যতে।" (পঞ্চদশী, দ্বৈতবিবেক) এই জ্ঞানই রূপকে যথার্থ ভেদ দিতেছে—ভিন্ন ভিন্ন রূপের সত্ত্বাকে প্রকাশিত করিয়া। মাতার স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে, ভূমিষ্ঠ হইয়া বাড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিদিনের হাসিকান্না ইত্যাদির ভিতর দিয়া যে সকল সত্ত্বার জ্ঞান আমরা পাইয়াছি তাহাকেই রূপের ভিতরে প্রেরণ করাই হচ্ছে রূপের

মর্ম্ম দেওয়া—জীবন দেওয়া, অথবা রূপের সুরূপ বা স্বরূপ দেখানো। ইহার বিপরীতটাই হচ্ছে রূপকে নির্জিত করা না রূপকে অরূপ করা।

আমাদের রুচি অনুসারে আমরা রূপে সু কু দুই ভিন্নতা দিই। রুচি হচ্ছে আমাদের মনের দীপ্তি বা চিরযৌবন শোভা। ইহারি দ্বারা রূপবান বস্তুমাত্রেরই রুচিরতা আমরা অনুভব করি। যাহারই মন আছে তাহারই রুচি আছে, তেমনি আকৃতিমাত্রেরই নিজের নিজের একটা রুচি বা দীপ্তি অথবা শোভা আছে; এই দুই রুচির মিলন যখনি হইতেছে তখনি দেখিতেছি সুরূপ; আর তদ্বিপরীতেই যেন দেখিতেছি রূপহীন। কথায় বলে, "যে যারে দেখতে নারে তার চলন বাঁকা।" বস্তুরূপটি আমাদের সম্মুখে পড়িবামাত্র আমাদের মনের দীপ্তি বা রুচি, লণ্ঠনের আলোর মত, বস্তুটির উপর গিয়া পড়ে এবং বস্তুর দীপ্তি বা শোভা আমাদের মনে আসিয়া পড়ে। যদি বস্তুরূপের রুচি আমাদের রুচি-সঙ্গত না হয় তবে আমরা বস্তু হইতে নিজের দীপ্তি ঘুরাইয়া লই—যেন মুখই ফিরাইলাম; এবং বলি এ রূপটি কুরূপ; এবং তদ্বিপরীতে আমরা দেখি বস্তুটি সুরূপ! সুতরাং রূপ দেখিতে এবং রূপকে রেখাদির দ্বারা চিত্রিত করিয়া দেখাইতে হইলে এই রুচি—মনের দীপ্তি বা চিরযৌবনশোভাই হচ্ছে চিত্রকরের একমাত্র সহায় এবং চিরসঙ্গী। সকল প্রদীপের দীপ্তি সমান হয় না; তেমনি সকল মানুষের অন্তঃকরণে এই রুচি সমভাবে উজ্জ্বল নহে। এই জন্য তোমার দেখায় এবং আমার দেখায়, আমার চিত্রিতে ও তোমার চিত্রিতে রূপের প্রভেদ ঘটে ও উত্তমাধম ভেদাভেদ থাকে। এই মনের রুচি বা দীপ্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলাই হচ্ছে রূপসাধনা। এই দীপ্তির প্রেরণা দিয়া চিত্রের রেখা দীপ্তিমতী, লিখিত আকৃতির রূপ দীপ্তিমতী করিয়া তোলাই হচ্ছে ষড়ঙ্গের প্রথম ভেদাভেদ—রূপভেদ—দখল করা। "ব্যঞ্জকো বা যথালোকো ব্যঙ্গ্যস্যাকারতামিয়াৎ। সর্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাদ্ধীরর্থাকারা প্রদৃশ্যতে।" (পঞ্চদশী দ্বৈতবিবেকঃ) যখন দেখি সকল বস্তুর প্রকাশক আলোক যখন যে বস্তুকে প্রকাশ করিতেছে তখন সেই বস্তুর আকার প্রাপ্ত হইতেছে,—নতুবা স্বরূপ প্রকাশ হইতেছে না; তেমনি সকল বস্তুর যাথার্থ্য প্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুর উপরে পড়ে তখন সেই বস্তুরই আকার প্রাপ্ত হয়;—নচেৎ তদ্বস্তুর জ্ঞান হয় কিরূপে? শুধু চোখের দীপ্তি দিয়া রূপকে দেখা নয়, দেখানো নয়, মনের দীপ্তি দিয়া তাহাকে প্রকাশিত দেখিতে হইবে এবং প্রকাশও করিতে হইবে। এই জন্যই শুক্রাচার্য্য প্রতিমার লক্ষণ লিখিবার গোড়াতেই বলিয়াছেন—"নান্যেন মার্গেন প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু।" চোখ দিয়া রূপ দেখা নয়, লেখাও নয়।

২। প্রমাণাণি

প্রমাণাণি—বস্তুরূপটির সম্বন্ধে প্রমা বা ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানলাভ করা, বস্তুর নৈকট্য, দূরত্ব ও তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদির মান পরিমাণ;—এককথায় বস্তুর হাড়হদ্দ।

চোখ দেখিতেছে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার অথচ কয়েক-অঙ্গুলী-পরিমিত পটখানিতে

আমায় সমুদ্র দেখাইতে হইবে। সমস্ত কাগজখানিকে নীল বর্ণে ডুবাইয়া বলিতে পারিতেছি না যে, এই সমুদ্র। কেননা সেখানি দেখাইতেছে একখানি চতুষ্কোণ নীল কাচ;—একেবারে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র পদার্থ! অনন্তের কিছুমাত্র আভাস তাহাতে নাই। এই সময়েই আমরা সমুদ্রের অনন্ত বিস্তারকে আকাশ এবং তট এই দুই সীমা দিয়া পরিমিতি বা প্রমিতি দিতে চলি। আমরা তটকে পটের এতখানি, আকাশকে এতখানি স্থান অধিকার করিতে দিব ও বাকি স্থানটি সমুদ্রের জন্য ছাড়িয়া দিব;—এই হইল আমাদের প্রমাতৃ চৈতন্য বা প্রমার প্রথম কার্য্য। তাহার পরে প্রমা দ্বারা আমরা নিরূপণ করিতে বসি—বালুতটের সহিত সোনার-আলোয়-রঞ্জিত আকাশের পীতবর্ণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ, দুয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা ও কর্কশতার ভেদ এবং তট ও আকাশ দুয়ের সহিত জলের তরঙ্গিত-রূপ ও বর্ণের ভেদ, সমুদ্রের তরঙ্গমালার সহিত আকাশের মেঘমালার রূপভেদ ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকৃতিভেদ, বর্ণভেদ, দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বিস্তারাদি ভেদ;—শুধু ইহাই নয় ভাবের ভেদ পর্য্যন্ত! আকাশের নির্নিমেষ নীরবতা, সমুদ্রের সনির্ঘোষ চঞ্চলতা, এমন কি তটভূমির সসহিষ্ণু নিশ্চলতাটি পর্য্যন্ত! পরিষ্কার আকাশের দীপ্তির গভীরতা, সুনীল জলের দীপ্তির গভীরতা এবং তটভূমিতে যে সন্ধ্যার আলোটি দীপ্তি পাইতেছে বা সমস্ত ছবিটির উপরে রাত্রির যে গভীরতাটুকু ঘনাইয়া আসিতেছে সেটুকু পর্য্যন্ত প্রমার দ্বারা পরিমিতি দিয়া আমরা নিরূপণ করিয়া লই। ও নৈকট্য ইহাও আমরা প্রমার সাহায্যে অনুমান করিয়া লই। এই প্রমা হচ্ছেন, সান্ত এবং অনন্ত উভয়কে মাপিয়া লইবার, বুঝিয়া দেখিবার জন্য, আমাদের অন্তঃকরণের আশ্চর্য্য মাপকাঠিটি। ইহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেরও মাপ দিতেছে, বৃহৎ হইতে বৃহতেরও মাপ দিতেছে, গভীর অগভীর দুয়েরই মাপ দিতেছে;—রূপেরও মাপ দিতেছে, ভাবেরও মাপ দিতেছে, লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ সকলেরই মাপ এবং জ্ঞান দিতেছে।

সঙ্গীতাচার্য্য ছেলেটিকে গান শিক্ষা দিতেছেন। ছেলেটির প্রমাতৃ চৈতন্য তখনও অপরিস্ফুট অবস্থায় আছে। সুতরাং সুরটি সে যতবারই আবৃত্তি করিতে চাহিতেছে ততবারই সে ভুল করিতেছে;—হয় কতকটা সুর চড়া হইতেছে, নয় তো কতকটা নরম হইতেছে; আর এদিকে বাঁধা সুরও বলিয়া চলিয়াছে ক্রমাগত—"না, না, হইল না।" ইহার পর দেখি দিনের পর দিন এই সুরকে মাপিতে মাপিতে সুরটি সম্বন্ধে ছেলের প্রমাতৃ চৈতন্য যেমনি সম্পূর্ণ জাগিয়াছে, সেই দিনই গলার সুর আর তানপুরার সুর ঠিক মিলিয়া গেছে।

শুধু যে মানুষের মধ্যে এই প্রমা জন্মাবধি কাজ করিতেছে তাহা নয়; নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যেও ইহার পরিচয় পাইতেছি। কোথায় একটি পাতা খুস্ করিয়া নড়িয়াছে অমনি হরিণের মধ্যে যে প্রমা তাহা দুই কান পাতিয়া শব্দটির ওজন লইতেছে,—সেটি পাতা নড়ার শব্দ, কি কোনো অজ্ঞাত শত্রুর সতর্ক পদক্ষেপ! অথবা সেটি বাঘ, সেটি মানুষ

ইত্যাদি! সমস্ত শিকারী জন্তুর মধ্যে এই প্রমার প্রখরতা আমরা দেখিতে পাই। পাখিটি যেমনি গাছ হইতে ভূমিতে নামিয়াছে অমনি বিড়ালটি তাহার দিকে চলিয়াছে—পায়ে পায়ে পাখি ও নিজের মধ্যে দূরত্বটুকু প্রমার দ্বারা মাপিতে মাপিতে। শেষে বিড়াল এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়ায় যেখান হইতে ঠিক এক লম্ফে সে পাখিটির উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে,—এক চুল মাপের এদিক ওদিক হইবার জো নাই। ঠিক কতখানি জোরে লম্ফটি দিতে হইবে তাহাও বিড়াল প্রমার সাহায্যে এই সময় ওজন করিয়া তবে কার্য্যে অগ্রসর হয়। এদিকে পাখিটিরও প্রমাতৃ চৈতন্য ঘুমাইয়া নাই। সে বিড়ালের প্রমার দৌড়টা মাটিতে নামিয়া অবধি গ্রহণ করিতেছে এবং শত্রুর ও নিজের মধ্যের ব্যবধানটুকু অভ্রান্তরূপে নিরূপণ করিয়া নিজে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে—নানা পতঙ্গ শিকার করিয়া। পতঙ্গও যে পাখির প্রমার ও বিড়ালের প্রমার পদধ্বনি শুনিতেছে না এবং গর্ত্তে লুকাইতেছে না তাহাই বা কে বলিল!

প্রমা যে কেবল দূর ও নৈকট্য বোঝায় তাহা নয়। সে কোন্ জিনিসটিকে কতখানি দেখাইলে সেটি মনোহর হইবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট করে। তাজমহলের-নির্ম্মাতা-যে-স্থপতি তাহার প্রমা পাথরের গুম্বজটিকে কি এক পরিমিতি দিয়াছে যে, ইহার মত গুম্বজ জগতে আর একটি দুর্ল্লভ। এই গুম্বজের পরিমাণ এক চুল এদিক ওদিক যদি করা যায় তবে দেখিবে সাহাজাহানের মর্ম্মরস্বপ্ন বাণবিদ্ধ রাজহংসের মত ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাজের মণিমাণিক্যের জন্য তাজ সুন্দর নয়; তাহার আশ্চর্য্য পরিমিতিই তাহাকে সুন্দর করিয়াছে। ইউরোপের বিখ্যাত মিলো'র "ভিনস" মূর্ত্তির হারানো দুটি হাত এ পর্য্যন্ত কেহ মিলাইয়া দিতে পারিল না—সহস্র চেষ্টাতেও। কি আশ্চর্য্য পরিমিতিই, অজ্ঞাত শিল্পীর প্রমা, ভিনস্ মূর্ত্তিটিকে দিয়া গিয়াছে।

সুতরাং দেখিতেছি "প্রমাণানি" কেবল অঙ্কশাস্ত্রের ইঞ্চি গজ ও ফুট নয়। সে আমাদের প্রমাতৃচৈতন্য;—যাহা অন্তর বাহির দুইকেই পরিমিতি দিতেছে।

'মাতৃর্ম্মানাভিনিষ্পত্তির্নিষ্পন্নং মেয়মেতি তৎ
মেয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মেয়াভত্বং প্রপদ্যতে।'

(পঞ্চদশী ৪ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৩০)

বস্তুরূপটি গোচরে আসিবামাত্র প্রমাতৃ-চৈতন্য হইতে অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া প্রমেয় বা বস্তুরূপটিকে গিয়া অধিকার করে; তখন ঐ অন্তঃকরণ,প্রমেয় যে বস্তুরূপ তাহাতে সঙ্গত হইয়া তদাকারে পরিণত হয় অর্থাৎ মন বস্তুরূপ ধারণ করে এবং বস্তুরূপ মনোময় হইয়া উঠে। সুতরাং দেখিতেছি, একদিকে আমাদের অন্তরেন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয়সকল, আর একদিকে অন্তর্বাহ্য দুই দুই বস্তুরূপ;—এতদুভয়ের মধ্যে প্রমাতৃ-চৈতন্য হচ্ছেন যেন মানদণ্ড বা মেরুদণ্ড। "পূর্ব্বাপরৌতোয়নিধীব-গাহ্য।' এই মানদণ্ডটি আমরা শিশুকাল হইতেই নানা বস্তুর উপরে প্রয়োগ করিতে করিতে তবে উচ্চ নীচ, দূর নিকট, সাদা কালো, জল স্থল ইত্যাদির ভেদাভেদজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই; এবং নিত্য ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে আমরা প্রখরতর করিয়া তুলি। কৃপাণকে অধিকদিন অব্যবহার্য্য অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে যেমন মরিচা পড়িয়া সেটি অকর্ম্মণ্য

হইয়া যায়, তেমনি প্রমাতৃচৈতন্যের দ্বারা কাজ না লইলে তাহা তীক্ষ্ণতা হারাইয়া নিষ্প্রভ হইয়া রহে। বিড়ালশিশুটি ইঁদুর ধরিতে চলিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রমা নানা বস্তুর উপরে প্রয়োগের দ্বারা তখনো সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই, কাজেই সে পদে পদে ভুল করিতেছে—শিকারের দূরত্ব সম্বন্ধে এবং নিজের উল্লম্ফন শক্তির ঝোঁকটুকুতে।

মানব-শিশুর চিত্রিত বস্তুগুলির মধ্যেও আমরা এই প্রমা-প্রয়োগের তারতম্য লক্ষ্য করি। যেমন—দুই বালক একটি হস্তী অঙ্কিত করিয়াছে; হস্তীর মোটামুটি আকৃতি সম্বন্ধে দুজনেরই প্রমা ঠিক আন্দাজটি লইয়াছে,—দুজনেই দেখিয়াছে শুঁড়টি, লেজটি, ঢাকের মত পেটটি। কিন্তু পায়ের বেলা কেহ দেখিয়াছে দুই, কেহ চার; দন্তদুইটির বেলাও এইরূপ;—একে দেখিয়াছে এক দাঁত, অন্যে দেখিয়াছে দুই; কেহ মোটেই দাঁত দেখে নাই! পায়ের গঠনের বেলাতেও দেখিতেছি এক শিশু বেশ একটু প্রমা প্রয়োগ করিয়া যদিও দুটি পা লিখিয়াছে কিন্তু দুটি পায়েরই স্তম্ভাকৃতি দিয়াছে; অন্যে চারি পা লিখিয়াছে—পায়ের সংখ্যার বেলায় প্রমা প্রয়োগ করিয়া—কিন্তু পায়ের গঠনের বেলায় সে একেবারে অন্ধ রহিয়া গেছে এবং চারিখানি কাঠি লিখিয়া হাতীর পা বুঝাইতে চাহিতেছে! ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকরের চিত্রেও এই প্রমাপ্রয়োগের তারতম্য লক্ষিত হয়। প্রমাকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখাই হচ্ছে ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় সাধনা।—মাকড়সার মত চারিদিকে প্রমাজাল বিস্তার করিয়া নিজে মাঝখানটিতে

জালে পড়িবামাত্র তাহার হাড়হদ্দের সঠিক খবর আমার কাছে নিমেষের মধ্যে পৌঁছিতেছে।

৩। ভাবঃ

ভাবঃ—আকৃতির ভাবভঙ্গী, স্বভাব ও মনোভাব ইত্যাদি এবং ব্যঙ্গ্য।

শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ
ভাবা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ইরিতাঃ।

শরীর এবং ইন্দ্রিয়সকলের বিকার-বিধায়ক হচ্ছেন ভাব; বিভাবজনিত চিত্তবৃত্তি হচ্ছেন ভাব। "নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া।" নির্ব্বিকার চিত্তে ভাবই প্রথম বিক্রিয়া দান করেন।

চিত্ত স্বভাবত স্থির থাকিতে চাহিতেছে—মাটির পাত্রে এই জলটুকুর মত। সে স্বভাবত নির্ব্বিকার; বিশাল হ্রদের মত সে স্বচ্ছ; তাহার নিজের কোনো বর্ণ নাই কিম্বা চঞ্চলতা নাই;—ভাবই তাহাকে বর্ণ দিতেছে, চঞ্চলতা দিতেছে।

কোন্ সকালে বসন্তের বাতাস বহিয়াছে, আকাশের কোন্ প্রান্তে বর্ষার গুরুগুরু মৃদঙ্গ বাজিয়াছে, কোন্‌দিন শরতের অমল ধবল মেঘ দেখা দিয়াছে, শীতের শিহরণটি উত্তরের নিশ্বাসের সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আর অমনি এই চিত্ত-হ্রদের জল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! এই ভাব উত্তমাধম নির্ব্বিচারে কেবল যে মানুষেরই চিত্তবিকার ঘটাইতেছে তাহা নয়; ভাবাবেশে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা তাবতই রোমাঞ্চিত হইতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে

এই ভাবের কার্য্যটি আমরা চোখ দিয়া ধরিতে পারি;—যেমন আকৃতির নানা ভঙ্গীতে;—বসন্তে নূতন ফুল, কচি পাতার বর্ণের উৎকর্ষে ও তাহাদের সতেজ ভঙ্গীতে, ঝড়ের দিনে গাছের ঝুঁকিয়া-পড়া শুইয়া-পড়ার ভঙ্গীতে এবং সমুদ্রের তাণ্ডব আস্ফালনে; তোমার গালে হাত দিয়া বসায়, চোখে আঁচল দিয়া কাঁদায়, তোমার আলুথালু বেশের ভঙ্গীতে, তোমার ছুটিয়া চলায়, বসিয়া থাকায়, তোমার চোখের পাতাটি মুইয়া পড়ায়, তোমার অধরের একটু কম্পনে, ভ্রূর সামান্য কুঞ্চনে, হাতখানি হাতে দিবার গালে দিবার ভঙ্গীতে।

চোখে আমরা ভাবকে দেখি ও দেখাই ভঙ্গী দিয়া—ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ, অতিভঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত এবং অগণিত শাস্ত্রছাড়া, সৃষ্টিছাড়া ভঙ্গী দিয়া। কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনা বা নিগূঢ় ভাবটি আমরা কেবল মন দিয়া অনুভব করিতে পারি। কোকিলের কণ্ঠ কি যে জানাইতেছে, শীতের কুহেলিকা কাহাকে ঢাকিয়া রহিয়াছে, শরতের মেঘের রথ কাহাকে যে বহন করিয়া চলিয়াছে, আমার মধ্যে কাহার বেদনা বাহিরের বসন্তের সমস্ত আনন্দের বর্ণে বর্ণে দুঃখের কালিমা লেপন করিতেছে, কাহার আনন্দ, অন্ধকারে আলো দিতেছে—তাহাকে দেখা চোখের সাধ্য নয়;—মনের আয়ত্তাধীন। সুতরাং কেবল চোখে ভাবের কার্য্য যে ভঙ্গীটুকু পড়িতেছে কেবল সেইটুকুমাত্রই চিত্র করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিনা; কেননা এরূপে ভাবের ব্যঞ্জনার দিকটি সম্পূর্ণ বাদ পড়িতেছে। চিত্রিতের কেবল স্ফুট দিকটি অর্থাৎ ভঙ্গীর দিকটি দেখাইলে চলেনা; চিত্র অসম্পূর্ণ থাকে,—ইঙ্গিতের অভাবে, ব্যঙ্গ্যের অভাবে। "শব্দ চিত্রম্ বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যন্ত্ববরং স্মৃতম্"। ব্যঙ্গ্য অভাবে শব্দচিত্র, বাচ্য চিত্র, এমন কি লিখিত চিত্রও অনুত্তম হইয়া পড়ে। "ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গে"। চিত্রমাত্রেই উত্তম হয় ব্যঙ্গ থাকিলে।

সুতরাং ভাবটি দেখিতেছি দুইমুখো সাপ! একমুখ তাহার চোখে দেখিতেছি ও দেখাইতে পারিতেছি ভঙ্গী দিয়া,—রেখার ভঙ্গী, বর্ণের ভঙ্গী, আকৃতির নানা ভঙ্গী দিয়া। কিন্তু সাপের আর একমুখ দেখিতেছি ব্যঙ্গ্য ও গূঢ়তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায়, ছায়ার মায়ার মত সে দেখা দিতেছেও বটে, দেখা দিতেছেনাও বটে! কাজেই চিত্র করিবার সময় দেখাইব কতখানি এটাও যেমন ভাবিতে হইবে, দেখাইব না কতখানি তাহাও বিচার করিতে হইবে।

কি দিয়া ভাবের প্রচ্ছন্নতাকে বুঝাইব? প্রচ্ছন্ন যাহা তাহাকে খুলিয়া দেখাইলে তো সে আর প্রচ্ছন্ন রহে না। ছায়ার উপরে আতপের প্রয়োগ করিয়া ছায়াকে তো দেখাইতে পারিনা;—সে যে আতপ পাইলেই দূরে পালায়। কাজেই দেখিতেছি, ছায়া দেখাইতে হইলে আমরা যেমন আতপের সম্মুখে কোনো এক পদার্থ আড়াল করিয়া ধরিয়া—যেমন গাছটি কিম্বা আমার হাতখানি ধরিয়া—দেখাই, এই ছায়া! তেমনি চিত্রেও ব্যঞ্জনা দিই আমরা যেটা প্রচ্ছন্ন তাহার, আর যেটা স্ফুট তাহার মাঝে কিছু-একটা আড়াল দিয়া।

কুটীরটি আধখানি লিখিলাম, আর আধ-

খানি গাছের আড়ালে ঢাকিয়া দিলাম; কুটীরের লেখা অংশটি কুটীরের ভঙ্গী বা কুটীরের ভাবের প্রকাশের দিকটা আমাদের দেখাইল, আর গাছের আড়ালে ঢাকা কুটীরের প্রচ্ছন্ন অংশটুকু ইঙ্গিতে জানাইতে লাগিল—কুটীরের ভিতরের ভাব, কুটীরবাসীর নানা লীলা। সে দিকটায় আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি—নানা অলিখিত বস্তু।

মন কেমন কেমন করিতেছে, সুতরাং চোখে সকলি কেমন কেমন ঠেকিতেছে! এই ভাবটি কবিতায় খুলিয়া বলিতে গেলে দেখি কাব্য হয় না; সেখানে কবিকে না খুলিয়াই বলিতে হইতেছে—

"স এব সুরভিঃ কালঃ স এব মলয়ানিলঃ
সৈবেয়মবলা কিন্তু মনোঽন্যদিব দৃশ্যতে।"

সেই তো বসন্তকাল, সেই মলয় বাতাস, সেই তো এই প্রেয়সী! কিন্তু মন কেমন কেমন করিতেছে—সকলি কেমন কেমন দেখিতেছি! কেমন যে দেখিতেছি তাহা খুলিয়া বলিতে পারিতেছি না।

ভাবের, ভঙ্গীর বা বাহিরের দিক, চিত্রের রেখা, বর্ণ ইত্যাদি দিয়া খুলিয়া বলা চলে কিন্তু ভাবের ব্যঙ্গ্যের দিক বা অন্তরের দিক আবছায়া দিয়া ঢাকিয়া দেখানো ছাড়া উপায় নাই।

টানে যেটা প্রকাশ হয় না, টোনে তাহা প্রকাশ করে। "বেলা গেল পারে যাবি না!" এ কথার লেখার টানে কিবা প্রকাশ হইল? কিছুই না। কিন্তু এই কথার টোনটুকুতেই লালাবাবুকে সংসারের পারে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এই টোনকেই বলি ব্যঙ্গ্য।

চিত্রে ভঙ্গী দিয়া ভাব প্রকাশ করা সহজ; কিন্তু চিত্রিতের মধ্যে ব্যঙ্গ্যটি দেওয়া সহজ কার্য্য নহে। এই জলপাত্রটি যদি কাঙালের ইহা বুঝাইতে চাহি, তবে জলপাত্রটির আকৃতিমাত্র লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না;—কেন না সেরূপ জলপাত্র দেখি বহু ধনী-গৃহেও আছে! না হয় চিত্রিত করিয়া দেখাইলাম, জলপাত্রটি মলিন ও বহু স্থানে বিদীর্ণ; কিন্তু এত করিয়াও সেটি যে কাঙালের যত্নের ধন তাহা কেমন করিয়া বুঝাই? মনে হইতেছে যে, কাঙালটিকে জলপাত্রটির পাশে বসাইয়া দিলেই তো সব গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু এরূপ করিয়া দেখ, দেখিবে চিত্রটি "কাঙাল" হইয়া গেছে;—"কাঙালের জলপাত্র"—এ চিত্রটি নাই! এই সময়ে কাঙালের জীবনের একটুখানি ইঙ্গিত বা ব্যঙ্গ্য—যেমন তাহার ছিন্ন কন্থার একটুখানি কিম্বা ভিক্ষার ঝুলিটি দিয়া—অথবা আরও কোন সূক্ষ্মতর ইঙ্গিতের সাহায্যে জলপাত্রের শূন্যতা এবং কাঙাল-জীবনের রিক্ততা প্রকাশ করিয়া আমায় চিত্রে কাঙালের জলপাত্রের ব্যঙ্গ্যটি বুঝাইয়া দিতে হয়। এই ব্যঙ্গ্য যে-চিত্রকর যত সুচারুভাবে নিজের চিত্রে প্রকাশ করেন, ততই তাঁহার অধিক গুণপনা।

একবার এক জাপানসম্রাট চিত্রকরগণের এই ব্যঙ্গ্য-প্রয়োগ-শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সকল চিত্রকরকেই একটি কবিতার এক ছত্র চিত্রিত করিতে দেওয়া হইল; যথা—"বিজয়ী বীরকে অশ্ব বহিয়া আনিয়াছে,—বসন্তের পুষ্পিত ক্ষেত্রসকলের উপর দিয়া।" কত চিত্রকর কত ভাবেই এই কবিতা চিত্রিত করিয়া দেখাইল কিন্তু সম্রাট



লঙ্কাদ্বীপের এক প্রাচীন মন্দিরে অঙ্কিত চিত্র।

(বৌদ্ধযুগের চিত্রের নমুনা)

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

কাহাকেও পুরস্কার দিলেন না, পুরস্কার পাইল সেই চিত্রকর যে ধূলায়ধূসর অশ্বটির পদচিহ্নের কাছে একটি প্রজাপতি লিখিয়া ইঙ্গিতে জানাইল—অশ্বক্ষুরলগ্ন নানা পুষ্প রসের শেষ সৌরভটুকু!

ফুলের মধ্যে সৌরভটুকু যেমন, চিত্রের মধ্যে ব্যঞ্জনাটুকু তেমনি। রূপ আছে, ভাব-ভঙ্গী আছে, প্রমাণাদি সবই আছে কিন্তু ব্যঞ্জনা নাই, সৌরভ নাই;—সে যেন গন্ধহীন পুষ্পমালা। এরূপ ব্যঞ্জনাবিহীন চিত্র যে কিছু নয় তাহা বলা যায় না; কিন্তু একথাও বলা চলেনা যে, তাহা উত্তম চিত্র; কেন না তাহা "অব্যঙ্গ্য" সুতরাং "অবর"। শুধু ভাবের ভঙ্গীটুকু দিয়া তুলি রাখিয়া দিলে দর্শকের মন যাইয়া চিত্রে মজে না। চিত্রের ভাবভঙ্গীটি হয় তো আমাদের মনকে তখনকার মত কাঁদাইয়া কিম্বা আনন্দ দিয়া ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু মনটি গিয়া চিত্রে বসিয়া নব নব ভাবরস পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যায় না। এমন কি, এরূপ চিত্র বারম্বার দেখিতে দেখিতে মনে একটা অরুচিও আসিয়া পড়া সম্ভব। ব্যঙ্গ্য এই অরুচির হাত হইতে চিত্রকে ও ভাবকে রক্ষা করে; তাহাকে পুরাতন হইতে দেয় না—সেটিকে নব নব দিক দিয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত করিয়া। ভাবের কার্য্য হচ্ছে রূপকে ভঙ্গী দেওয়া। এবং রূপের আড়ালে মনোভাবের ইঙ্গিতটিকে যেন অবগুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে ব্যঙ্গ্যের কার্য্য।

৪। লাবণ্যযোজনম্

রূপকে যেমন পরিমিতি দেয় প্রমাণ,—যথোপযুক্ত এবং যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে তাহাকে আনিয়া, তেমনি লাবণ্য পরিমিতি দেন, ভাবের কার্য্যকে বা ভঙ্গীকে—অদ্ভুত ও উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গী হইতে নিরস্ত করিয়া। ভাবের তাড়নায় ভঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছে—উন্মত্ত অশ্বের মত অসংযত উদ্দাম অসহিষ্ণু, এমন কি অশোভনরূপে আপনাকে প্রমাণের সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া; লাবণ্য আসিয়া তাহাকে শান্ত করিতেছে—নিজের মধুরকোমল স্পর্শটি ধীরে ধীরে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া। ভাবের তাড়নায় রূপ যখন শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানকালে দুর্ব্বাসা ঋষির মত অপরিমিতরূপে হাত-পা নাড়িয়া, দাঁতমুখ খিঁচাইয়া, উদ্দণ্ড ভঙ্গীতে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তখনি আমাদের লাবণ্য তাহার কাছে আসিয়া বলিতেছে—"স্থিরোভব! পাগল হইলে যে!"

প্রমাণের বন্ধনে যে কঠোরতাটুকু আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই; অথচ সেও বন্ধন;—সুনিশ্চিত একটি সুন্দর, সুকুমার বন্ধন। সে প্রমাণের মত জোরে রাশ টানিয়া অশ্বের ঘাড় বাঁকাইয়া দেয় না কিন্তু তাহার স্পর্শে অশ্ব আপনি ঘাড় বাঁকাইয়া লয় ও তালে তালে পা ফেলিয়া চলে। প্রমাণ যেন মাষ্টার, বেত মারিয়া সবলে ছেলেকে সোজা করিতেছে; আর লাবণ্য—যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে ভুলাইয়া যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন।

রুচি যেমন রূপে দীপ্তি দেয়, লাবণ্য তেমনি ভাবে দীপ্তি দিয়া থাকে।

"মুক্তাফলেষু চ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥
(উজ্জ্বলনীলমণি)

মুক্তা র রূপের ভঙ্গী নিষ্প্রভ,—যদি না তাহাতে লাবণ্যের দীপ্তি থাকে। তেমনি চিত্রের রূপ এবং প্রমাণ এবং ভাব সকলি নিষ্প্রভ—যদি না এই তিনে লাবণ্য আসিয়া দীপ্তি দেয়।

চিত্রের সমস্ত ভাবভঙ্গীতে লাবণ্য একটি শীতলতা, শোভানতা দিয়া চিত্রটিকে নয়ন-স্নিগ্ধকর ও মনোহর করিয়া তোলে। লবণ না থাকিলে যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদে ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি লাবণ্য না থাকিলে চিত্রের রসাস্বাদে ব্যাঘাত জন্মায়। সুতরাং লাবণ্যের পরিমাণ, পাকা গৃহিণীর মত, চিত্রকরকে বুঝিয়াসুঝিয়া—এক কথায় প্রমা দ্বারা পরিমিতি দিয়া—প্রয়োগ করিতে হয়। অতিরিক্ত লাবণ্যে চিত্রের ভাবভঙ্গী তিক্ত হইয়া পড়ে, অত্যল্প লাবণ্যে তাহা আস্বাদ-হীন হয়।

লাবণ্যরেখাটি হচ্ছেন সকল সময়ে শুচি এবং সংযতা। তিনি ভাবাদির সহিত যুক্তা হইতেছেন বটে কিন্তু সর্ব্বদা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া। লাবণ্য যেন কষ্টিপাথরের কোলে সোনার রেখাটি, কিম্বা পরনের সাড়িখানির কোলে সোনালি পাড়খানি!

লাবণ্য, পাথরকে নিজের সুনির্দ্দিষ্ট রেখাটি দিয়া অঙ্কিত করিতেছেন, পটখানি ঘেরিয়া আপনার দীপ্তি সুনিশ্চিত সূক্ষ্মরেখায় টানিয়া দিতেছেন;—কিন্তু বলিতেছেন যে, পাথর তুমিও থাক, আমিও থাকি—তোমার এই একটুখানি জুড়িয়া; কাপড় তুমিও থাক আমিও থাকি—তোমায় একটি ধারে একটুখানি স্থান অধিকার করিয়া। লাবণ্য, চিত্রের ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে অথচ আড়ম্বরটি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা কম। লাবণ্য নিজে শুদ্ধা এবং সংযতা সুতরাং যাহাকেই স্পর্শ করেন তাহাকেই বিশুদ্ধি দেন, সংযম দেন।

৫। সাদৃশ্যং

ঘরের কোণে বসিয়া বুড়ি চরকা ঘুরাই-তেছে আর ছড়া কাটিতেছে:—

"চরকা আমার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দুয়োরে বাঁধা হাতী।"

বুড়ির চরকাটি যে তাহার নাতি কিম্বা হাতী অথবা পুতের অনুরূপ তাহা নয়; বুড়ির এরূপ দেখিবার কারণ হচ্ছে চরকাটির সঙ্গে বুড়ির সংসার ও বুড়ির নিজের মনোভাবের—হাতি কেনা ইত্যাদির—অচ্ছেদ্য সম্বন্ধটুকু। সুতরাং দেখিতেছি, রূপে রূপে মিল অপেক্ষা সাদৃশ্যের পক্ষে ভাবে ভাবে সম্বন্ধ অধিক প্রয়োজনীয়। "সদৃশস্য ভাব ইতি সাদৃশ্য।" একের ভাব যখন অন্যে উদ্রেক করিতেছে তখনি হইতেছে সাদৃশ্য। চরকাটি যদি কোনো উপায়ে নাতির রূপটিমাত্র লইয়া বুড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইত—যেমন ইতালীয় চিত্রকরের দ্রাক্ষাগুচ্ছ পাখিকে দেখা দিয়াছিল—তবে বুড়ি হয়তো ঠকিত--কিন্তু যেদিন সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিত, সেদিন চরকার একখানি কাঠিও সে আর আস্ত রাখিত না।

সাদৃশ্যের অর্থ চাতুরীর সাহায্যে রূপের প্রতিরূপটি করিয়া—সোনার সাপ গড়িয়া—লোককে ভয় দেখানো নয়, ঠকানো নয়; কিন্তু কোনো-এক রূপের ভাব অন্য-কোন রূপের সাহায্যে আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া। "তদ্ভিন্নত্বেসতি তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্বম্"। এক বস্তু অন্য বস্তুর যথার্থ ভাব উদ্রেক করে—দুয়ের

আকৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও। যদি একটি জয়গায় দুয়ের মিল থাকে, সেই জায়গাটি হচ্ছে দুয়ের স্ব স্ব ধর্ম্ম। আকৃতির মধ্যে মিল আছে সেই জন্য বেণীর সহিত সর্পের সাদৃশ্য দেওয়া চলিতেছে বটে, কিন্তু বেণীর স্থানে সাপটিকে কিম্বা সাপের স্থানে বেণীটিকে যেমনি রাখিয়াছি অমনি দুয়েরই স্বধর্ম্মে আঘাত করিয়াছি এবং সাদৃশ্যও ক্ষুণ্ণ করিয়াছি। সর্পের ধর্ম্ম নয় যে, মস্তক হইতে লম্বমান থাকা,—মস্তকে দংশন করাই তাহার ধর্ম্ম। কিম্বা বেণীর ধর্ম্ম নয় যে, গাছের তলায় পড়িয়া ভয় দেখানো—নির্জীব সর্পের মত। আবার দেখি, চামরের ধর্ম্ম, গাত্রে লম্বিত রহা, কেশেরও ধর্ম্ম তাহাই; ইহাদের মধ্যে স্ব স্ব ধর্ম্মের মিলও আছে। কাজেই একে অন্যের স্থান অধিকার করিলেও সাদৃশ্যকে অধিক ক্ষুণ্ণ করে না। চামর ও কেশের মত, আকৃতির সাদৃশ্য এবং দুয়ের স্ব স্ব ধর্ম্মেরও সাদৃশ্য তেমন সুলভ নহে; সেই জন্য সাদৃশ্য দেখাইবার বেলায় বস্তুর আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতি বা স্বধর্ম্মের দিক দিয়া সাদৃশ্য দেওয়াই ভাল।

কবিতা কবির মনোভাবের সাদৃশ্যকে পায় ও পাঠকের বা শ্রোতার মনোভাবকে তৎসদৃশ করিয়া তোলে। সুতরাং কবি নির্ভয়ে বলিতে পারেন 'মুখচন্দ্র'। চন্দ্রে এবং মুখে সেখানে আকৃতির সাদৃশ্য কবি দিতেছেন না; দিতেছেন সেখানে চন্দ্রোদয়ে নিজের মনোভাবের সহিত প্রিয়মুখদর্শনে মনোভাবের সাদৃশ্য। কাজেই বলিতে হইতেছে, সেই সাদৃশ্যই উত্তম যাহা কোনো-এক রূপের ব্যঞ্জনাটুকু অন্য-এক রূপ দিয়া ব্যক্ত করে। মনোভাবের সদৃশ হওয়াই হচ্ছে সাদৃশ্য।

"মুষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা।
রূপাদিন্ ব্যাপ্নুবচ্চিত্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্।"
(পঞ্চদশী দ্বৈতবিবেকঃ)

মনোভাব রূপের এবং রূপ মনোভাবের ছাঁদ ছন্দ বা ছাঁচে পড়িয়া উভয়ে উভয়ের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছে। কবি যখন কমলের সহিত চরণের সাদৃশ্য দিতেছেন তখন তিনি চরণে এবং কমলে আকৃতির সাদৃশ্যটা চূর্ণ করিয়া নিজের মনোভাবটিকেই কমলের মত লেখার ছন্দটিতে বাঁধিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন; কেননা কেবল রূপের সাদৃশ্য দিয়া লিখিতে গেলে লেখা মনোভাবের সদৃশ কিছুতেই হয় না দেখিতেছেন। চিত্রকরও দেখিতেছেন চরণকে কমলাকৃতি দিয়া তিনি, না চরণ, না কমল, দুয়ের একটিকেও বুঝাইতে পারিতেছেন; এই জন্য তিনি কমলকে চরণের কাছাকাছি পাদপীঠরূপে দেখাইয়া নিজের মনোভাবের সদৃশ করিয়া মূর্ত্তির চরণকমল গড়িতেছেন।

মনে যে সুরটি বাজিতেছে তাহারই অনুরণন্ যখন বীণায় ঝঙ্কার ও মূর্চ্ছনাদি দিয়া প্রকাশ করিতেছি, তখনই বাহিরের বাদনকে অন্তরের বেদনের সদৃশ করিয়া দেখাইতেছি। চিত্রেও তেমনি শতসহস্র রেখা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণভেদাদি যখন মানসমূর্ত্তির সদৃশ করিয়া অঙ্কন করিতেছি তখনই যথার্থ সাদৃশ্য দিতেছি। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, ভাবের অনুরণন্ যাহা দেয় তাহা উত্তম সাদৃশ্য; আর কেবল আকৃতি বা রূপের অনুকরণ যাহা দেয় তাহা অধম সাদৃশ্য। অনুকৃতি বা অধম সাদৃশ্য কীট পতঙ্গাদি নানা ইতর শ্রেণীর জীবকে অবলম্বন করিতে দেখা যায়—আকৃতি গোপন করিবার

চেষ্টায়। সুতরাং এরূপ সাদৃশ্য চিত্রিতকে ফুটাইয়া তোলে না, বরং অনেক সময়ে তাহাকে লুপ্ত করিয়া দেয়।

৬। বর্ণিকাভঙ্গ

বর্ণিকাভঙ্গ—নানা বর্ণের সংমিশ্রণ ভঙ্গী ও ভাব; বর্ণবর্ত্তিকার টানটোনের ভঙ্গী, ইত্যাদি।

বর্ণজ্ঞান ও বর্ণিকাভঙ্গ ষড়ঙ্গ-সাধনার চরম সাধনা এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সাধনা। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন "বর্ণজ্ঞান যদা নাস্তি কিং তস্য জপপূজনৈ।" যদি বর্ণজ্ঞান না জন্মিল, যদি বর্ণিকাভঙ্গীটি—ঐ সরুকাঠির টানটোন—দখল না হইল তবে ষড়ঙ্গে পাঁচটি সাধনাই বৃথা। সাদা কাগজ সাদাই থাকিয়া যাইবে যদি তোমার বর্ণজ্ঞান না জন্মায়; তোমার হাতের তুলিটি সাদা কাগজে নানা বর্ণের আঁচড় টানিবে অথবা ঘুণাক্ষরের মত একটা-কিছু লিখিবে—যদি বর্ণিকাভঙ্গে তোমার দখল না হয়। ষড়ঙ্গের আর পাঁচটিতে তোমার মোটামুটি দখল জন্মাইতে পারে—সাদা কাগজে একটি মাত্র আঁচড় না টানিয়া! রূপের ভেদাভেদ তুমি চোখ দিয়া, মন দিয়া বুঝিতে পার; প্রমাণকেও তুমি তুলি ব্যতিরেকে দখল করিতে পার; ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্যকেও চোখে দেখিয়া, মনে বুঝিয়া জানিতে পার; কিন্তু বর্ণিকাভঙ্গের বেলায় তুলি তোমাকে ধরিতেই হইবে। এই যে সাদা কাগজখানি—যাহাকে ইচ্ছা করিলেই শতখণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি—তুলির ডগায় একটুখানি কালি লইয়া তাহাকে করিবার মানসে সাদা কাগজখানিকে যখনি নিজের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়াছি, তখনই আর সেখানি সাদা কাগজ নাই, তখন সে আমার আত্মার দর্পণ। বীজের মধ্যে যেমন সম্পূর্ণ গাছটি নিহিত থাকে, তেমনি ঐ সাদা কাগজখানিতে, সমস্ত রূপ, সমস্ত প্রমাণ, সমস্ত ভাব লাবণ্য ও বর্ণভঙ্গী লইয়া আমার আত্মাটি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে দেখি। সেইজন্য সহসা তাহাকে তুলি দিয়া স্পর্শ করিতে ভয় হয়, হাত কাঁপিতে থাকে। পটখানির উপর এই শ্রদ্ধা এই সমিহটুকু, চিত্রকরকে চিরকাল অনুভব করা চাই; কিন্তু তুলি ধরিলেই ঐ যে হাতটি কাঁপিতেছে—ঐ ভয়টুকুকে মন হইতে দূর করা চাই। হাত একটু কাঁপিবে না, তুলি আমার অনিচ্ছায় একতিল অগ্রসর হইবে না, বা পিছাইবে না, বামে বা দক্ষিণে একটুমাত্র হেলিবে না;—বর্ণিকাভঙ্গের এই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সাধনা। কাগজের কাছে তুলিটি লইবামাত্র চুম্বকের মত কাগজ যেন তুলিকে টানিয়া লইতেছে কিছুতেই রুখিতে পারিতেছি না, হাত যেন প্রবল জ্বরে কাঁপিতেছে—বাগ মানিতেছে না। এই হাতকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলিকেও বশে আনা হচ্ছে প্রধান কাজ। এটি হইয়া গেলে আর বাকি কাজ সহজ। "সিতো নীলশ্চ পীতশ্চ চতুর্থো রক্ত এব চ। এতে স্বভাবজাবর্ণা...সংযোগজা পুনস্তন্যো উপবর্ণা ভবন্তিহি"—শ্বেত রক্ত নীল পীত এই চার স্বভাবজ বর্ণ, এই চারের সংযোগে নানা উপবর্ণ সৃষ্টি হয়;—এইটুকু শিখিতে, ~~কিম্বা যেমন—~~

'সিতপীতসমাযোগাৎ পাণ্ডুবর্ণ ইতিস্মৃতং।

'সিতনীলসমাযোগঃ কাপোতো নাম জায়তে।
'পীতনীলসমাযোগাৎ হরিতো নাম জায়তে।
'নীলরক্তসমাযোগাৎ কাবায়ো নাম জায়তে।
'রক্তপীতসমাযোগাৎ গৌর ইত্যভিধীয়তে।
'এতে সংযোগজাবর্ণাহ্যুপবর্ণাস্তথা পরে।
'ত্রিচতুর্বর্ণসংযুক্তা বহবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
'...দুর্ব্বলস্য চ ভাগৌ দ্বৌ নীলবর্ণাদৃতে ভবেৎ।
'নীলস্যৈকো ভবেদ্ভাগশ্চত্বারো অন্যস্য তু স্মৃতাঃ
'বর্ণস্তু বলীয়স্ত্বং নীলস্যৈব হি কীর্ত্ত্যতে।
(নাট্যশাস্ত্রম্ ২১ অধ্যায়ঃ শ্লোকা ৬০—৬৫)

সাদায় পীলায় পাণ্ডুবর্ণ, লালে সাদায় পদ্মবর্ণ, নীলায় সাদায় কাপোতবর্ণ, পীলায় নীলে হরিৎ; লালে নীলে কাবি (কাষায়), পীলায় লালে গৌর—এইটুকু শিখিতে, কিম্বা বর্ণের তিন চার সংযোগে বহুতর উপবর্ণ সৃষ্টি হয়; সবল বর্ণ, অপেক্ষাকৃত-দুর্ব্বল বর্ণ অপেক্ষা দ্বিগুন বল ধরে—কেবল নীলবর্ণ অন্যবর্ণের চারিগুণ বলবান ও সকল বর্ণ অপেক্ষা বলীয়ান—এই সহজ কথাগুলো মুখস্থ করিয়া এবং কার্যত প্রয়োগ করিয়া শিখিয়া লইতে অধিক সময় যায় না। কিন্তু নিজের হাতকে নিজের বশে আনাই বিষম ব্যাপার।

যাহারা তলোয়ার খেলিতে শেখে তাহারাই জানে একটা লোহার শিক্ বা একটা হাতীর মুণ্ড কাটা সহজ কিন্তু বাতাসে একখানি রুমাল উড়াইয়া দিয়া সেটিকে দুই-টুক্‌রা করায় হস্তের ও অসিঘাতের কি আশ্চর্য্য লঘুতা ও ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন!

চোখের তারাটি—যাহা তিলমাত্র বিচলিত হইলে, নিটোল গালের রেখাটি—যাহা একচুল এদিক-ওদিক হইলে, লতাতন্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম হাসিরেখা—যাহা একটু কাঁপিলে সব নষ্ট হইয়া যায়;—তুলির আগায় সেগুলি কাটিয়া দেখানোয়, হস্তে কি ক্ষিপ্রকারিতার, স্পর্শের কত লঘুতারই অপেক্ষা রাখে। বর্ণিকা-ভঙ্গের যে বর্ণপরিচয় তাহার প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ নাই, তাহার একটিমাত্র পাঠ—সেটি হচ্ছে লঘুপাঠ বা হস্তলাঘবতা।

হাত তুলিকে গড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, হাত তুলিকে ক্ষুরধারে কাগজ কাটিয়াই যেন চালাইয়া দিতেছে,—হাত ছোঁয়-কি-না-ছোঁয় ভাবে তুলিকে কাগজের উপর দিয়া উড়াইয়া লইতেছে—ইহাই হচ্ছে আমাদের লঘুপাঠের পাঠ্য, ও বর্ণিকাভঙ্গের সারাংশ।

দপ্তরী রেখাটি টানিতেছে ঠিক সোজা ভাবে—একেবারে চুলপ্রমাণ। কিন্তু তাহা বলিয়া বলিতে পারি না যে, বর্ণিকাভঙ্গে দপ্তরী পরিপক্ক হইয়াছে কিম্বা সে যে-রেখাটি টানিয়াছে সেটি চিত্রকরের রেখার মত জীবন্ত রেখা। কেন না, দপ্তরী রেখাটি টানিতেছে প্রাণ দিয়া নয়;—হাতটি দিয়া। কলের রুলও যে কাজ করিতেছে দপ্তরীর হাতও সেই কাজ করিতেছে। দপ্তরীকে কোনো চিত্রকরের-টানা রেখাটি লিখিতে দাও দেখিবে তাহার হাত একেবারে অশক্ত। চিত্রকরের রেখায় আর দপ্তরীর রেখার প্রভেদ এই যে—একটি জীবন্ত আর একটি নির্জীব! চিত্রকরের প্রাণের ছন্দ একই রেখাকে কখনো গড়াইয়া, কোথাও কাটিয়া বসাইয়া, কোথাও বা ছুঁইয়া-কি-না-ছুঁইয়া যেন উড়াইয়াই লইতেছে। কপাল হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক পর্য্যন্ত মুখের একপাশের রেখাটি টানিতে চেষ্টা কর, দেখিবে, তুলির তিন প্রকার ভঙ্গ, ভঙ্গী

বা স্পর্শ তোমায় প্রয়োগ করিতে হইবে। কপালের অস্থি সুদৃঢ়, সেখানে তোমায় তুলিতে দৃঢ়তা দিয়া, গাল সুকোমল, সেখানে তুলিকে গড়াইয়া দিয়া—কোমলতা দিয়া, নাতিদৃঢ় চিবুকের কাছে কোমলে কঠোরে মিলাইয়া রেখাটি টানিতে হইবে। একই রেখাকে কঠোর কোমল এবং নাতি কোমল, একটি টানকেই স্থির ও বিগলিত এবং স্থিরবিগলিত করিয়া দেখানো, আর বর্ণসম্বন্ধে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা এবং বর্ণবর্ত্তিকাপ্রয়োগসম্বন্ধে হস্ত লাঘবতাই হচ্ছে বর্ণিকাভঙ্গের সমস্ত শিক্ষাটুকু।

তুলিটি ঠিক কতটুকু ভিজাইব, তাহার আগায় ঠিক কতটা রং তুলিয়া লইব ও ঝাড়িয়া ফেলিব এবং সেই রং-সমেত ভিজা তুলিটি ঠিক কতটুকু চাপিয়া অথবা কতখানি না চাপিয়া কাগজের উপর বুলাইয়া দিব;—ইহারি সম্বন্ধে প্রমালাভ করা হচ্ছে ষড়ঙ্গের বর্ণিকাভঙ্গনামে শেষ শিক্ষা বা চরম শিক্ষা। চিত্রে মনের রংকে ফলাইয়া তোলা, মনের অন্ধকারকে ঘনাইয়া আনা, মনের আলো'কে জ্বালাইয়া দেওয়া এবং মনের ষড়ঋতুর বিচিত্রচ্ছটাকে প্রকাশিত করাই হচ্ছে বর্ণিকা ভঙ্গে বর্ণ-জ্ঞান।

বর্ণজ্ঞান শুধু অক্ষরের অথবা রেখার বা বর্ণের রূপ জানা নয়, শুধু একবর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সংমিশ্রণে নানা উপবর্ণাদি সৃষ্টি করাও নহে; কিন্তু বর্ণের তত্ত্ব এবং রূপ—দুয়েরই জ্ঞান।

তন্ত্রশাস্ত্রে অক্ষর এবং রেখাসকলের একএকটি আত্মা এবং একএকটি বিশেষ বর্ণ দেওয়া হইয়াছে যেমন "আকারং পরমাশ্চর্য্যং শঙ্খজ্যোতির্ম্ময়ং ...ব্রহ্মাবিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্র স্বয়ং।" ব্রহ্মবিষ্ণুরাত্মক এবং শঙ্খজ্যোতির্ম্ময় পরমাশ্চর্য্য যে 'আ' অক্ষর তিনি স্বয়ং রুদ্র। গায়ত্রীতন্ত্রেও গায়ত্রীর এক একটি অক্ষরকে এইরূপ আত্মাবান বলা হইয়াছে যেমন—

"গায়ত্র্যা প্রথমং বর্ণং পীতচম্পকসন্নিভং।
অগ্নিনা পূজিতং বর্ণং আগ্নেয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।"

গায়ত্রীর প্রথম বর্ণ চম্পকের ন্যায় পীত, তিনি অগ্নির দ্বারায় অর্চ্চিত সুতরাং আগ্নেয়।

কালি দিয়া রেখাটি টানিতেছি কিন্তু মনে চিন্তা করিতেছি এই তুলির অক্ষর কেহ শ্যাম, কেহ কপিল, কেহ ইন্দ্রনীলাভ। শুধু ইহাই নয়;—কোন অক্ষর অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ কেহ নীল আকাশের ন্যায় স্নিগ্ধ ইত্যাদি।

নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"বর্ণানাং তু বিধিং জ্ঞাত্বা তথা প্রকৃতিমেবচ কুর্য্যাদঙ্গস্য রচনাং।"—বর্ণের বিধি এবং প্রকৃতি অর্থাৎ কোন্ বর্ণ আকৃতিকে গোপন করে, কে তাহা ফুটাইয়া তোলে ইহার বিধি; কোন্ বর্ণ আনন্দিত করে, কে বিষাদিত করে, কে বা বৈরাগ্য বুঝায়, কে বা অনুরাগ জানায় ইত্যাদি বর্ণের প্রকৃতি বুঝিয়া তবে অঙ্গ রচনা করিও।

কথায় বলে—"কালি কলম মন, লেখে তিন জন।" মন কোথায় গোপনে বসিয়া কালোর উপরে আলো, আলোর উপরে কালো টানিতেছে আর অমনি হাতসমেত তুলি সেই আলোর কম্পনে দুলিয়া উঠিতেছে, কালোর বর্ণে রাঙিয়া উঠিতেছে! চোখের বর্ণজ্ঞান হইতেছে না;—হইতেছে মনের। হাতের বর্ণিকাভঙ্গ দখল হইতেছে না;—হইতেছে মনের। বর্ণজ্ঞানসম্বন্ধে চোখকে বিশ্বাস

করিতে পারি না; কেননা অনেক চোখ নীলকে দেখে হরিৎ, লালকে দেখে পীত। এবং একটি সামান্য পাতার উপরে ষড়ঋতুতে নিমেষে নিমেষে আমাদের সুখদুঃখের আলোক-কম্পনের ভিতর দিয়া যে ভাবের রংটি ফুটিয়া উঠিতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে, নূতন হইতে নূতনে তাহাকে ধরাও চোখের সাধ্য নয়। চোখ বসন্ত কালের সমস্ত পাতার মোটামুটি একটা বাসন্তী রং দেখিতে পাইতেছে—"নীলপীত সমাযোগাৎ।" কিন্তু বাস্তবিক বসন্তের রংটিতে রাঙিয়া উঠিতেছে আমাদের মন। তাছাড়া ষড়ঋতু তো শুধু বর্ণটুকু লইয়াই আমাদের কাছে আসিতেছেনা, —বর্ণ, গন্ধ, গান, স্পর্শ ইত্যাদি সমস্ত দিয়া সে আপনাকে আমাদের মনের নিকটে প্রকাশ করিতেছে! ইহারই বর্ণন হচ্ছে বর্ণের কাজ। বর্ণ শুধু রঞ্জিত করে না; বর্ণ চিত্রকে রণিত করে। শুধু ফুলের রংটুকু নয়, তাহার সৌরভটিও; শুধু সূর্য্যকিরণের রংটুকুও নয় তাহার উত্তাপের স্পর্শটি পর্য্যন্ত সকালে কিরূপ, সন্ধ্যায় কিরূপ, দ্বিপ্রহরে কতটা;—বর্ণ দিয়া এ সমস্তই বর্ণন করিতে শেখা চাই।

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর-সভার চিত্র লিখিতেছি—পঞ্চ নলকে, দময়ন্তিকে, সকল সখী ও সকল রাজাদের লিখিয়া সমস্তটির উপরে পুষ্পচন্দন, ধূপদীপের গন্ধটি, বর্ণ দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে! চিত্রে বর্ষা বর্ণন করিতেছি—ময়ূর দিলাম, গাছ দিলাম, মেঘের আকার দিলাম, অভিসারিকা রাধাকেও দিলাম;—কেবল বর্ণ দিতে পারিলাম না;—সব ব্যর্থ হইয়া গেল! মেঘের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম না, গাছের তলায় সুরভিত অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল না, ভিজা-মাটির গন্ধে চিত্রটি ভরিয়া উঠিল না;—মনের অভিসার ব্যর্থ হইা গেল!

বর্ণ মেশায় না চোখ;—বর্ণ মেশায় মন। মন শরতের আকাশকে কতটা নীল দেখিতেছে বা কতটা উজ্বল অথবা ম্লান দেখিতেছে তাহারি ওজনটুকু নীলে মেশানোই হচ্ছে বর্ণকে ভঙ্গী দেওয়া। আমি কালি দিয়াও শরতের আকাশ দেখাইতে পারি যদি মনের রংটুকু সেই কালিতে আনিয়া মেশাই। কালি তখন আর কালি থাকে না; যদি মন তাহাকে রাঙায়—আপনার বর্ণে।

"কালী কি কালো দূরে তাই কালো।
চিনতে পারলে আর কালো নয়।"
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ)

মন যতক্ষণ কালি হইতে পৃথক আছে, কালি ততক্ষণ কালো কালি মাত্র। আর মন আসিয়া যেমনি মিলিয়াছে অমনি কালি আর কালো নাই;—সে ষড়ঙ্গের বরনডালায় আলোর শিখার মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ

রাত হয়ে এল বলেই অষ্টার লিটজের যুদ্ধের বিরাম হল। প্রথমে ২রা ডিসেম্বরের কুয়াশা-অন্ধকার সকাল বেলায়, তার পর যখন সূর্য্যোদয় হল,—যে সূর্য্যকে নেপোলিয়ান চিরকাল বল্‌তেন, অষ্টার লিটজের মহিমাময় সূর্য্য—ক্রমে আবার যখন ছায়া দীর্ঘতর হয়ে এল—সন্ধিবদ্ধ রুষ এবং অষ্ট্রীয়ান সৈন্য-শ্রেণীর পিছনে, হ্রদ দুটির উপর দিয়ে তীব্র হিমবাতাস হুহু করে বয়ে এল, তখন পর্য্যন্তও সমর হুহুঙ্কার আর রক্ত-প্লাবনের বিরাম ছিল না। ফরাসী-সাম্রাজ্যের শ্যেনাঙ্কিত পতাকা বহনকারীকে অনুসরণ করে, জয়শ্রী ধীর নিশ্চিত পদেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। অষ্ট্রীয়ানরা প্রথমেই পালাতে আরম্ভ করেছিল, রুষ-সৈনিকেরা একাগ্র পৌরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেও যখন কিছুই কর্ত্তে পারলেন না—তখন তারা ক্রমে হ্রদ সীমানার নিম্ন জলাভূমির দিকে তাড়িত হল। তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হয়ে আসতে লাগল, তাদের মনের বল ক্ষীণ হল, চারিদিক হতে আক্রান্ত হয়ে তারাও শোচনীয় পরিণামের হাতে আত্মসমর্পণ করলে।

যুদ্ধ-বিরত রুষ-সৈন্যের এক অংশ কেবল একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়নি, মনের ধৈর্য্য আর কাজের নিয়ম রক্ষা করে তারা জমাট বরফের উপর দিয়ে, হ্রদ দুটির মধ্যে যেটি বড়, সেইটি পার হবার চেষ্টা করছিল।

পরাভূত শত্রুর জাতীয় গৌরব পতাকায় পা রেখে, বিজয়ী সেনাপতিপরিবৃত সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা, জয়গর্ব্বিত খর্ব্বাকৃতি কর্সিকান যখন এই দৃঢ় নিষ্ঠ বীর সকলের অসাধ্য সাধন চেষ্টা দেখলেন তখন তাঁর মন সহসা দ্বিধায় কাতর হয়ে উঠ্‌ল—কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্ত কালের জন্যে। যুদ্ধে দয়ার বিধান কোথা?—ধীরে দূরবীণটি নামিয়ে স্থির কণ্ঠে বল্লেন—"আমার দেহরক্ষক কামানের সৈন্যদের, হ্রদের দিকে মুখ ফিরিয়ে গোলা চালাতে বল"। আদেশ পালনের ক্ষণমাত্র বিলম্ব হল না।

কামানের নলের মুখে হাল্কা সাদা ধোঁয়া দেখা দেবার পর, কালো-পোষাক-পরা দৃঢ় শ্রেণীবদ্ধ রুষ-সৈন্য-দলের মধ্যে ফাঁক দেখা দিল, যেখানে তিল ধরবার ঠাঁই ছিল না, যেন সেখানে একটি প্রসর পথ রচনা করে দিলে। একটি, আবার একটি—পথের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলল;—তার পর মনে হল উগ্র সাদা বরফের প্রান্তরের উপর হ্রদের তীর হতে কে যেন কালো কালো ঝোপ বসিয়ে দিয়ে গেছে—সে আর কিছুই নয়, ভূমিশায়ী রুষ-সৈন্য!

নেপোলিয়ান এই হত্যাদৃশ্য হতে মুখ ফিরিয়ে তাঁর পার্শ্বচর সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কর্ণেল আবনে প্রেভষ্ট কোথায়?

লানেস কিম্বা রেসিএর বোধ হয়, বল্লেন, গোলা চালাবার হুকুম দেবার জন্যে কর্ণেল গিয়েছিলেন, এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল কিন্তু—কথা সমাপ্ত না করেই তিনি নীরব হলেন। ভাবটা কর্ণেল জীবিত আছেন কি, না কে জানে?

নেপোলিয়ান বল্লেন, হায় আমার মনে কষ্ট হচ্ছে;—কর্ণেল স্বদেশভক্ত বীরপুরুষ ছিলেন।

সম্রাট আবার হ্রদের দিকে চেয়ে দেখলেন, আর এক দল কামানের সৈন্যকে সম্মুখে নিয়ে আসবার হুকুম দিয়ে, আপন ঘোড়ার উপর পাষাণ-মূর্ত্তির মত অটল হয়ে বসে রইলেন।

নিমেষে নিমেষে মৃত্যু যে শত শত রুষ-সৈন্য গ্রাস করছিল, তা দেখে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হননি, কিন্তু আপন সেনাপতিদের মধ্যে কেবলমাত্র একজনের অভাবে মনে কষ্ট বোধ করলেন! অপরের জন্যে কোনো ব্যথা কিম্বা সমব্যথায় কাতর হবার মানুষ তিনি ছিলেন না—আজ যে বেদনা মনে অনুভব করছিলেন—মৃত কর্ণেলের জন্যে নয়—জীবিত আপনার জন্যে! কর্ণেলের অভাবে তাঁর যে কত ক্ষতি হল তাই কেবলি মনে করছিলেন!

হেক্টর, মারি পিয়ের, আবৃনে প্রেভষ্ট সেণ্ট ক্রোয়ার মার্কুইসের বয়স সবে মাত্র চল্লিশ। সম্রাটের কোনো সেনাধ্যক্ষই এ বয়সে এতটা উচ্চ পদবী পায়নি—তাঁর বংশ-গৌরবও অনন্য-সাধারণ, ফ্রান্সের প্রাচীন কোনও শ্রেষ্ঠতম অভিজাত কুলে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা যখন শুনলেন, তিনি নেপোলিয়ানের অধীনে সৈন্যপদ স্বীকার করেছেন তখন তাঁকে ত্যাজ্য-পুত্র করলেন। বৃদ্ধ ডিউক তখনও অষ্টাদশ লুই এর একান্ত অনুগত ভৃত্যরূপে তাঁরি নিকটে- রুষ সম্রাজ্যাধীন মিটাও নগরে বাস করছিলেন। হেক্টরও রুষ-সেনাবিভাগে কাজ নিয়েছিলেন, তখন তিনি মস্কাওএর প্রসিদ্ধ "নোবল সন্তানের মনে নেপোলিয়ানের প্রতি যেরূপ দারুণ বিদ্বেষ থাকা সম্ভব তা তিনি সম্পূর্ণ ভাবেই পোষণ করতেন। তবুও অকস্মাৎ রুষ-কাপ্তেনের পদ ত্যাগ করে গোপনে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ ছেড়ে চলে এসেছিলেন। জনশ্রুতি তাঁর বিদায়ের কারণ, কোনও দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রুষ-সম্রাটের অনভিমত।

হেক্টর পারিস নগরীতে উপস্থিত হয়ে ফরাসী সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। ঋজু, উন্নতবপু, সুশ্রী সেই যুবা পুরুষ সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অতি সপ্রতিভ ভাবে বল্লেন, রাজেন্দ্র আমার এই তরবারি ফ্রান্সের সেবায় উৎসর্গ করলাম। আজ হতে আমি, আপনার সৈন্যদলভুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক। আমি জানি আজ হতে আমার জীবনের সম্মুখে প্রতিদিনই মৃত্যুভয় জেগে থাকবে। আমার নাম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের তালিকাভুক্ত। যারা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, দেশে ফিরলে যারা মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবে, আমি সেই নির্ব্বাসিত দিগেরই একজন। তবুও আমি ভীত নই। আমার ভাগ্য-বিধান আমি আপনার হাতেই সমর্পণ করলাম।

কর্সিকান, আবেদনকারীর কথা শুনলেন, মুহূর্ত্তকাল স্থির ভাবে চিন্তা করলেন। সম্রাটের সম্মান, পদবী সবে অল্পদিনমাত্র তাঁর হস্তগত হয়েছে; তাঁরি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে রাজা রাজ্যচ্যুত, দরিদ্র ঐশ্বর্য্যবান, সামান্য সৈনিক সেনাপতি পদে, গৃহস্থবধূ সাম্রাজ্ঞীর সখীত্বের গৌরবে উন্নীত হচ্ছিল, তবুও তাঁর মনে সন্তোষ ছিল না। পদগৌরবের সঙ্গে সঙ্গে যদি বংশগৌরব

জন্মায়;—তার বিশেষত্বটুকু মার্জ্জিত-শীলতা, কেউ কা'কে দিতে পারে না। নেপোলিয়ানের রাজসভায় অনেক নূতন ডিউক, ব্যারণ, কাউণ্ট, মার্কুইসের সৃষ্টি হয়েছিল সত্য, কিন্তু, এই হঠাৎ-নবাবের দলে অভিজাত-সুলভ শোভন সংযত ভব্যতার বড়ই অভাব ছিল। ভদ্রাচার যেন গিলোটিনে সম্রাজ্ঞী মেরি এণ্টোনিয়েটের শিরশ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিল। এতদিনে নেপোলিয়ান বুঝতে পারছিলেন, তাঁর কাছে বনিয়াদী বংশের বশ্যতাই তাঁর একান্ত বাঞ্ছার সামগ্রী! সে মনোবাঞ্ছা বুঝি আজ পূর্ণ হবারও সুযোগ হল,—ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠতম অভিজাত-সন্তান আজ তাঁর কাছে সৈনিকের পদপ্রার্থী।

নেপোলিয়ান যে হাসিতে অধীন সকলকে বশ করে রেখেছিলেন, যে হাসির এতটুকু আলোক দেখবার জন্যে কত অগণ্য লোক স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন করতে উদ্যত হত—সেই সুমধুর মনোমোহন হাসিটুকু হেসে বল্লেন, "কর্ণেল প্রেভষ্ট আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ফ্রান্সের মঙ্গল আপনি আপন স্বার্থ চেষ্টার চেয়েও শ্রেষ্ঠ করেছেন। আমি বীরের সম্মান রক্ষা করে থাকি, এবং সাহসী পুরুষকে চিনে নিতে আমার বিলম্ব হয় না,—এ বোধ আপনার আছে দেখে সুখী হলাম। দেশ ভক্তি আর এই অকুতোভয়তার জন্যে, আপনাকে ভবিষ্যতে কখনো অনুতাপ করতে হবে না!"

হেক্টর এসেছিলেন কাপ্তেন পদবী নিয়ে, যখন ফ্রান্সের রাজ-প্রাসাদ হতে ফিরে গেলেন তখন তিনি কর্ণেল। আশৈশব নেপোলিয়ানকে বলে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌তেই তিনি অভ্যস্ত, অথচ আজ তাঁরি অধীনে কর্ম্মভার স্বীকার করলেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই অষ্ট্রিয়া প্রুষিয়া একত্রে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, রুষিয়াও সন্ধিবদ্ধ রাজন্যবর্গের হয়ে শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিলে। নেপোলিয়ান সৈন্যদলের নায়কতা স্বয়ং গ্রহণ করে, অষ্টারলিটজের যুদ্ধক্ষেত্রে সকল বিপক্ষকে একেবারে পেষণ করে ফেললেন। এই যুদ্ধ-দিনে হেক্টর আব্‌নে প্রেভষ্ট তাঁরি পার্শ্বচর সেনাধ্যক্ষের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

ফরাসী-সম্রাট-যুদ্ধক্ষেত্র ক্ষেত্র হতে ফিরে চল্লেন। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে তিনি শ্রান্ত, কিছু আহার না করলে আর চলে না। সকলেই জানেন, নেপোলিয়ান বড় অভিনয় পটু ছিলেন। সন্ধি-ক্ষণের দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলি কেমন করে সকলের সম্মুখে উজ্জ্বল করে তুলতে হয়, তা তিনি বিশেষরূপে জান্‌তেন। কেবলমাত্র কয়েক-প্রহর পূর্ব্বেই, গত রাত্রিতে, যুগ যুগান্তের দুই রাজ বংশধর প্রবল প্রতাপশালী রুষ এবং অষ্ট্রিয়ান সম্রাটদ্বয়, মহাসমারোহে যেখানে একত্রে ভোজন সমাধা করেছেন, সেইখানেই নিতান্ত প্রাকৃত বংশজাত, বিজয়ী যোদ্ধা যদি আজ রাত্রিকার আহার সমাপন করেন, তাহলে উভয় পক্ষের মনে কিরূপ ভাবস্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভব, তা তিনি বেশ কল্পনা করতে পার্‌ছিলেন। কিন্তু যখন এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন তখনই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনিনাদে সমগ্র আকাশ আর পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল। ফরাসী আর্টিলারি সৈন্যের

প্রান্তর ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছে, অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য তুহিনশীতল জলরাশির মধ্যে আর্ত্ত-চীৎকার করে জলমগ্ন হচ্ছে—আসন্ন মৃত্যু বিভীষিকায় সকলেই বিহ্বল। ফরাসী-সম্রাট ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন, একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, একবার একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, তারপর আবার আপন গন্তব্য পথে চল্লেন। আজ যথার্থই তিনি বিজয়ী, সমগ্র ইউরোপখণ্ড আজ তাঁর পদানত।

অস্তগামী সূর্য্যের পাণ্ডুর পীত একটি রশ্মিরেখা, তুষারভারাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল;—সম্রাট নেপোলিয়ান দক্ষিণ হস্তে আপন তরবারি খানিকে তুলে ধরে দিবসের সেই অন্তিম মহিমা-দীপ্তিকে অভিবাদন করলেন—বল্লেন "দেখ দেখ অষ্টারলিটজের সূর্য্য বিদায় কালে আমাদের অভিবাদন করে যাচ্ছেন।"

নেপোলিয়ান অগ্রসর হতে যাচ্ছেন এমন সময় সৈন্যব্যূহ ভেদ করে, একজন সৈনিক কাতর কণ্ঠে বিলাপ করতে করতে তাঁর অশ্বের সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে শুয়ে পড়ল। তার পরণে সাধারণ অশ্বারোহী সৈনিকের পরিচ্ছদ, এক হাতে গুলির আঘাতে গভীর ক্ষত, সমস্ত শরীর রক্তাক্ত, তরবারিখানি অর্দ্ধভগ্ন। নেপোলিয়ান ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখলেন, তিনি কখনো কোন সৈনিকের আবেদন অগ্রাহ্য করতেন না। তাঁর কাছে আপন সুখদুঃখের কথা জানাতে এসে, অতি নিম্নতম সিপাহীকেও কি অমূল্য ধন, কত দুর্লভ, তার মর্য্যাদা কত অধিক, তা তিনি ভালই জানতেন। এই জ্ঞানই তার উন্নতির নিগূঢ় কারণ। অতি আকাঙ্ক্ষার বশে, পদগৌরবের গর্ব্বে অন্ধ হয়ে যখনি সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন তখনি তাঁর পতন হয়েছিল।

"ভাইয়া তুমি কি চাও ?"

অশ্রুগদগদ কণ্ঠে সৈনিক বল্লে, আমার নাম জ্যাক ক্লেমঁ। আমি কর্ণেল সাহেবের অরদালি।

"কোন কর্ণেল! আমার কর্ণেল তো একটি নয়।"

"কর্ণেল মাকুইস আব্‌নে প্রেভষ্ট। আমি তাঁর পালিত ভ্রাতা। রুষ-সৈনিকের সঙ্গে তিনিও ঐ জমাট বরফের উপর ছিলেন, বরফ তো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে—তিনি তাহলে ডুবে মারা যাবেন। হে রাজ্যেশ্বর প্রভু! তাঁকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।"

যে ব্যক্তি আপন ভৃত্যের মনে এমন প্রবল অনুরাগ, এমন একাগ্র প্রভুপরায়ণতা জাগরিত করতে পারে, সে নিশ্চয়ই জননায়ক হবার বিশেষ উপযুক্ত! কর্ণেল হেক্টর প্রেভষ্টের মৃত্যু, মস্ত বড় ক্ষতি বলেই, নেপোলিয়ানের মনকে পীড়িত করতে লাগ্‌ল।

"তোমার প্রভু কেন বরফের উপর যাবেন? তোমার নিশ্চয়ই ভুল হয়ে থাক্‌বে। ওখানে ত কেবল রুষ-সৈন্য আছে।"

"নোবল গার্ডস" রা ঐপথে যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছিল,—যেখানেই "নোবল গার্ডস" রা যায় সেইখানেই আমার প্রভু

দিন তিনি তাদের পিছে পিছে ছিলেন, আমিও আমার প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলুম। রক্ষা করুন! হে অসীম প্রতাপশালী! আমার প্রভুকে রক্ষা করুন!

নেপোলিয়ান আরো নুয়ে পড়ে, সেই সৈনিকের রক্তসিক্ত স্কন্ধে হাত রেখে বল্লেন,—তাঁকে রক্ষা করা যদি আমার সাধ্যে থাকত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই করতাম, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁকে রক্ষা করতে পারলে লাভ আমারই—কিন্তু ভাই, তিনি যে আমার সাধ্যের বাহিরে চলে গিয়েছেন।"

সৈনিক বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল—"ফরাসী-সম্রাটের সাধ্যেরও বাহিরে!"

নেপোলিয়ান ব্যথিত স্বরে উত্তর করলেন,—"হ্যাঁ ভাই, ফরাসী-সম্রাটও সেখানে শক্তি-হীন।"

অরদালি যে কথা বলেছিল, সে কথা সত্য—আব্‌নে প্রেভষ্ট সেই তুষারস্তূপের উপরেই ছিলেন।

চন্দ্রনক্ষত্রহীন সুদীর্ঘ হিমার্ত্ত রাত্রি ক্রমে অবসান হল। চারিদিকের নিবিড় নীরবতা, ক্ষণে ক্ষণে আহত কাতর স্বরে, দ্বিধাভিন্ন হয়েছিল; কিন্তু স্তম্ভিত পাষাণ-অচল অন্ধকার কোনও আহতের কোনও তৃষিতের ব্যাকুলতায় মুহূর্ত্তমাত্রও বিচলিত হয়নি। শীতের নিরুদ্যম দিন আবার ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রত্যূষে রাত্রির অন্ধকার-কালিমা ক্রমে অপগত হয়ে, যখন ধূসর কুয়াশায় প্রসর লাভ করছে—ফরাসীসৈনিকবেশধারী একজন যোদ্ধা, অন্তরে একান্ত বেদনার আঘাতে সচেতন হয়ে জান্‌লেন তিনি তখনও জীবিত আছেন। ধীরে ধীরে চক্ষু দুটি উন্মীলন করলেন। প্রথমে একখানি তারপর অন্য হাতখানি তুলে দেখলেন, দুখানিই কর্ম্মাক্ষম। কপালের জমাট কেশরাশি সরিয়ে দিয়ে একবার ভাববার চেষ্টা করলেন-তিনি কোথায় আছেন।

"কি ভয়ানক! আমি এ কোথায় আছি!" আমার শীত বোধ হচ্ছে না কেন!" তাঁর চারিদিক ঘিরে ঘন কুয়াশার যবনিকা—কোথাও কিছু দৃষ্টি-গোচর হয় না। সেখানে শুয়েছিলেন সেখানে হাত দিয়ে দেখলেন ভয়ানক ঠাণ্ডা! ভাবলেন এ আবার কি! তিনি যে বরফের উপর পড়ে আছেন সে কথা তখনো বুঝতে পারেন নি। কত আজগুবি কথাই তাঁর মনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগ্‌ল। মনে হল, কুয়াশার বাধা ভেদ করে, একটি বহুপরিচিত গানের ছত্র যেন তাঁর কানে এসে প্রবেশ কর্‌ছে! সেই গান সেই সুর তাঁকে বিচলিত করলে, বার বার চক্ষু মার্জ্জনা করলেন, একি স্বপ্ন! একি মায়া!—সে গান এখানে কে গাইবে? কিন্তু আবার যখন স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেন তখন আর সংশয় রইল না, সেই সঙ্গে বহুকাল অশ্রুত, প্রিয় একটি নাম শুন্‌লেন। সেই তার নাম, যাকে তিনি বড় ভালবেসেছিলেন; কোনো রমণীর সুকুমার একটি নাম! সেই চিরপরিচিত, প্রিয় নামটির মৃদু স্পর্শে তাঁর সমস্ত চেতনা জীবন্ত জাগরিত হয়ে উঠল। হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে শুন্‌তে লাগলেন;—জ্বরাতুর উচ্চ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে ডাকছে "নিকলেট",—"নিকলেট"। তারপর আবার সেই গান আরম্ভ হ'ল, যে গান সে কতবার

গেয়েছে! হেক্টর নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে রইলেন;—চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তখন ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন,—"ভগবান হায় ভগবান, কুয়াশা উঠিয়ে নাও, দৃষ্টির এ বাধা দূর করে দাও। কে এখানে "নিকলেটকে" ডাকছে, কে এখানে তার গান গাইছে!"

তিনিও চাপাস্বরে সেই গান গাইতে আরম্ভ করলেন। সুন্দরী প্রেয়সী, সুন্দর কুলটি নিকলেট। কোথায় তিনি আছেন, এ কোন্ দেশ, আবার সেই নাম কে বলে? সে গান এখানে কে গায়?"

গত দিনের ঘটনা একে একে সব তার মনে হল। যতক্ষণ তাঁর শরীরে শক্তি ছিল, বীরের বাহু তার কর্তব্য ভুলে যায়নি, যতক্ষণ চরণ চলৎশক্তিরহিত হয়নি, ততক্ষণ তো ফরাসী-সেনা, অষ্ট্রিয়া রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ মত্ত ছিল। এককালে বোরিসের সঙ্গে একত্রে রুষ "নোবল গার্ডস" এ কাজ করতেন। বোরিসের মত বন্ধু তাঁর ছিল না, আজ আবার তার মত শত্রুও তাঁর আর কেউ নেই। দুজনেই সেই একটি নারীকে ভালবাসতেন —তারি পরিণাম আজকের এই শত্রুতা!

প্রভাত হতে মধ্যাহ্ন, মধ্যদিন হতে ক্রমশঃ সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন ধুসর আগমন কাল পর্য্যন্ত, বোরিস তাঁর অনুসরণ এড়িয়ে গিয়েছে। বোরিস সেনানায়ক হয়ে যখন বরফের আশ্রয়ের উপর দিয়ে রুষসৈন্যকে ক্রমশঃ যুদ্ধ-ক্ষেত্র হতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ফরাসী-সম্রাট তাঁদের উপর গুলি চালাবার আদেশ দেন। হেক্টর সেই আদেশ

সৈন্যদের অনুসরণ করে চলেন। অধিকদূর যেতে না যেতেই তাঁর ঘোড়াটি ভূমিশায়ী হয়। কোনরূপে আপনাকে রক্ষা করে আবার পদব্রজেই তাঁদের পিছন পিছন চল্লেন, অন্ততঃ এই তাঁর বিশ্বাস—গভীরভাবে চিন্তা করেও আর কিছু মনে করতে পারলেন না। তবে তাঁর এই ধারণা কি সত্য—তিনি যে মনে করেছিলেন, তাঁর শত্রুকে দেখতে পেয়েছিলেন, চীৎকার করে, নাম ধরে তাকে ডেকেছিলেন, দাঁড়াতে বলেছিলেন, পিস্তল পর্য্যন্ত তুলে তার দিকে লক্ষ্য করছিলেন—এমন সময় নিজে বন্দুকের আঘাতে খেলার পুতুলের মত ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন—তারপর কিছুই আর জানেন না চারিদিক দুর্ভেদ্য অন্ধকার নিস্পন্দ শব্দহীনতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবে সে কি ভ্রান্তি, কল্পনা, স্বপ্ন? তা তো নয়! তিনি যে স্পষ্ট তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। সবই সত্য, তিনি যে বরফের উপর কাষ্ঠখণ্ডের মত নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন, তারি মত নিশ্চিত সত্য। কেন তিনি এমন হয়ে পড়ে আছেন? চেষ্টা-করলে উঠতে পারেন না কি? জীবের জীবন-রক্ষার চেষ্টা, প্রকৃতির আদিম সংস্কার তাঁকে আত্মরক্ষার উদ্যমে প্রণোদিত করলে, প্রথম ব্যাকুল চেষ্টার পরই বেদনাব্যঞ্জক অস্ফুটধ্বনি উচ্চারণ করে আবার শুয়ে পড়লেন! হাঁটুর কাছে যে তীব্র বেদনা বোধ করলেন তাতেই বুঝতে পারলেন, ব্যাপার সহজ নয়! কি হ'ল? অতি সাবধানে ধীরে ধীরে উঠবার চেষ্টা করলেন, আবার

আশে পাশে বরফের উপর দৃষ্টি চালনা করে কিছুই বুঝতে পারলেন না। নিজের সম্মুখে বার বার হাত বাড়িয়ে দিতে লাগলেন ;—কুহেলিকার ঘন যবনিকা যেন সেই উপায়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন। তারপর বল্লেন—"আমাকে একবার ভাল করে দেখতে হবে, হা অদৃষ্ট, না দেখলেই নয়!" উঠতে চেষ্টা করে তাঁর শরীরের প্রত্যেক স্নায়ু যে অসহ্য বেদনায় স্পন্দিত হতে লাগল, তাতে ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন, নিশ্চিত কোন অঘটন ঘটেছে। শরীরের উপর হস্ত চালনা করে দেখলেন হাত দুখানি হাঁটুর নীচে আর গেল না। তারপর তাঁর শরীরাংশ আর কিছুই ছিল না। বিহ্বল কাতর বিলাপ শব্দ উচ্চারণ করতে করতে আবার শুয়ে পড়তে হ'ল—সে করুণ ধ্বনি ব্যথার চেয়ে নিরাশার আকুলতায় পূর্ণ।

আবার চারিদিকে নিবিড় অন্ধকারে ঘিরে এল, সুদূর আকাশের অপরিসীম শূন্যতা, কেবল মাত্র একটি সুকুমার নামের বন্দনায়—নিরতিশয় সুমধুর একটি গানের মন্ত্রমোহে ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে তরঙ্গায়িত হতে লাগল—"নিকলেট"—"নিকলেট, শোভন ফুলটি, সুন্দরী প্রেয়সী।" (আগামী বারে সমাপ্ত)

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভারতীয় আর্য্যদিগের প্রথম উদ্ভিদ্‌পরিচয়ের ইতিহাস

(উত্তরকুরুবাসের ভৌগোলিক প্রমাণ)

আর্য্যদিগের ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে ইতিহাসের বহু উপাদান নিহিত রহিয়াছে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমরা জানিতে পারি। আমাদের শাস্ত্রেই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের বিধি সন্নিবদ্ধ হইয়াছে সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক উপকরণ সকল শাস্ত্রেরই যে অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এই প্রকারে ধর্ম্মগ্রন্থরূপে আমাদের নিকট শাস্ত্রের যেরূপ মান্য হইয়াছে ইতিহাসগ্রন্থরূপেও ইহার তদ্রূপ মান্যই হওয়া উচিত। সমস্ত শাস্ত্রেরই বেদ মূলাধার, শাস্ত্রমূলক ঐতিহাসিক তত্ত্বেরও তবে বেদই মূলাধার হয়। আমরা যে পুরাতত্ত্বের উদ্‌ঘাটন আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবে উপস্থিত করিতেছি তাহার প্রথম সূত্র আমরা বেদেই দেখিতে পাইব।

বেদে আমরা উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে খুব কম উল্লেখই প্রাপ্ত হই। বেদবর্ণিত আর্য্যদেশ যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষ নহে ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। প্রকৃতির প্রিয় লীলাক্ষেত্র গ্রীষ্মমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষই যদি প্রথম আর্য্যদেশ হইত তাহা হইলে বেদে উদ্ভিদ্ রাজ্যের বর্ণনায় এরূপ দারিদ্র্য কখনও লক্ষিত হইত না। প্রত্যুত আদি আর্য্যদেশ হিমমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ছিল বলিয়াই

যে বেদে উদ্ভিদ্ রাজ্যের বর্ণনা স্ফূর্তি পাইতে পারে নাই তাহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

বেদে সোমরস যজ্ঞের প্রধান উপকরণ। এই সোমরস সোমলতা হইতে নিষ্কাশিত হইত। সোমলতা ওষধি বিশেষ। বেদে আমরা ওষধির বহুল উল্লেখই দেখিতে পাই। ওষধি হইতে যেমন রস নিঃসারিত হইত তেমনই শস্যও উৎপাদিত হইত। এই প্রকারে ওষধি জাতীয় উদ্ভিদের অধিক উপযোগিতাই ইহার বহুল উল্লেখের কারণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আমরা নিম্নে একটী সুপ্রচলিত বৈদিক মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধী র্মধু নক্তমুতোষসোঃ মধুবৎ
পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তনঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতি
র্মধুমানস্তু সূর্য্যো মাধ্বী র্গবো ভবন্তনঃ॥
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥"

"বায়ু নিয়ত মধুর ভাবে বহিতে থাকুক, নদী সকল মধু ক্ষরণ করুক; ঔষধি সকল মধুময় হউক; রাত্রি ও ঊষা মধুর হউক; পৃথিবীর ধূলি মধুর হউক, আমাদের পিতৃরূপী আকাশ মধুর হউক; আমাদের বনস্পতি মধুযুক্ত হউক; সূর্য্য মধুবিশিষ্ট হউক; আমাদের গাভী সকল মধুমতী হউক।"

এখানে আমরা যেমন ওষধির উল্লেখ পাইতেছি তেমনই বনস্পতিরও উল্লেখ পাইতেছি।

বর্ত্তমান ভৌগোলিক গ্রন্থে সুমেরু সন্নিহিত প্রদেশের (Arctic Zone) উদ্ভিদাদি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় :—

"Dwarf shrubs lichens etc" (১) অর্থাৎ ক্ষুদ্র গুল্ম ও অপুষ্পক উদ্ভিদ ইত্যাদি॥

ওষধি গুল্মেরই অন্তর্গত এবং অপুষ্প বৃক্ষেরই নাম 'বনস্পতি।' সুতরাং বেদের বর্ণিত উদ্ভিদাদি যে সুমেরুর সন্নিহিত শীত-প্রধান উত্তরকুরুরই উদ্ভিদ্, তাহার প্রমাণ আমরা বর্ত্তমান ভৌগোলিক বিবরণ হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি।

বেদে একদিকে আর্য্যদিগকে যেমন সোমরস দেবতাদিগের নিকট আহুতি প্রদান করিতে দেখা যায় তেমনই অপরদিকে যবচূর্ণ নির্ম্মিত পুরোডাস, অপূপ প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য-দ্রব্য উপহার দিতেও দেখা যায়। যব ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ্ই বটে। এই যবের যে রীতিমত চাষ আর্য্যগণ করিতেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখই বেদে রহিয়াছে যথা :—

"যবংবৃকেন কর্ষথঃ"
ঋগ্বেদ ৮৷২২৷৬

"তোমরা লাঙ্গিল দ্বারা যব কর্ষণ করিয়াছ।"

ভাজাযব 'ধান' নামে অভিহিত হয় যথা "ভৃষ্টযবা পুনর্ধানা ধানাচূর্ণন্তু সক্তব" ইতি হেমচন্দ্র। ভাজা যব ধান এবং ধান বা ভাজা যবচূর্ণ ছাতু।"

এই ধানের বহুলরূপে উল্লেখই বেদে পাওয়া যায়। এই ধানই আমাদের প্রচলিত ধান্য নামের মূল। অভিধানে 'যবের' এক নাম 'দিব্য' পাওয়া যায়। দিব্য শব্দের অর্থ দিবি বা স্বর্গে জাত। আর্য্যগণ উত্তর কুরু ছাড়িয়া আসিলে উহা যখন আদিস্থান বলিয়া স্বর্গস্থানরূপে বিবেচিত হইত তখনই উহার সহিত সম্পর্কের স্মৃতি রক্ষার্থ যব 'দিব্য' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। যব ধান্য শস্যের আদি বলিয়াই 'ধান্যরাজ' নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। ইহার 'শীতশূক' নাম হইতেও

ইহাকে শীতপ্রধান দেশে প্রথম উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

ধান্‌জাতীয় শস্যের কোনটী যে প্রথম, যবের ধান নাম হইতে 'ধান্য' নামে অভিহিত হয় তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিলে 'দেব ধান্য' নামক ধান্যই 'ধান্য' নামে অভিহিত হয় বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত 'দেব' শব্দের যোগ হইতেই দেবকার্য্যে ইহার প্রথম ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা সাধারণ কথায় 'দেধান' বা 'দেধানা' বলিয়া পরিচিত। ভাজা যবের বাচক ধান বা বহু বচনান্ত 'ধানাঃ' শব্দ হইতেই যে 'ধান্য' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে তৎপক্ষে এই ধান বা ধানাঃ শব্দ স্পষ্ট সাক্ষ্যই দিয়া থাকে। 'দেবধান্যের' যে 'যবনাল' একটী নাম পাওয়া যায় তাহাতেও আমরা মূলে যবের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরই পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইহার অর্থ যবের ন্যায় যাহার নাল অর্থাৎ কাণ্ডভাগ।

ধান্যসকল আদিতে শীতপ্রধান স্থানের শস্য ছিল বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের দেশে হেমন্তকালে এই সমস্ত জন্মিয়া থাকে। 'হৈমন্তিক ধান্য' কথায় তাহার স্পষ্ট পরিচয়ই বিদ্যমান।

সম্ভবতঃ যবের গাছ তৃণভোজী পশুর খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই ঘাসের একনাম 'যবস' হইয়াছে।

দৈবকার্য্যে যেমন আমরা যব শস্যের ব্যবহার দেখিতে পাই তেমনই একজাতীয় তৃণেরও বিশেষ ব্যবহার দেখিতে পাই। এই তৃণের নাম 'কুশ'। 'দর্ভ,' 'বর্হিঃ' ইহার প্রাচীন নাম যথা "কুশোদর্ভস্তথাবর্হিঃ সূচাগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।" ইহা বিশেষরূপে যজ্ঞ-কার্য্যের সৌষ্ঠব সম্পাদক বলিয়াই 'যজ্ঞভূষণ' নামে আখ্যাত হইয়াছে। অভিধানে ইহার এতদনুরূপ নাম 'যাজ্ঞিক'ও পাওয়া যায়। সর্ব্বদা যজ্ঞ কার্য্যে ব্যবহার হেতু ইহা 'পবিত্র' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। যজ্ঞে কুশের ব্যবহার হইতে বৈদিক পৌরাণিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি সমস্ত দৈবকার্য্যেই ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য রূপে পরিগণিত হইয়াছে যথা :—

"পূজাকালে সর্ব্বদৈব কুশহস্তো ভবেচ্ছুচিঃ।
কুশেন রহিতা পূজা বিফলাকথিতাময়া॥

ইতি বরদাতন্ত্রে ১ম পটলঃ।

"পূজার সময় সর্ব্বদাই কুশহস্ত হইয়া শুচি থাকিবে। কুশশূন্য পূজা নিষ্ফল বলিয়া মৎ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।"

ধর্ম্মকার্য্যে কুশ কেবল হস্তে লইবারই নিয়ম নহে, পবিত্র বলিয়া ইহার আসনে বসিবারও নিয়ম। তাহাতেই 'কুশাসন' পবিত্র আসন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

যজ্ঞসম্পাদনে কুশের যেমন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়, ধান্য ও যবেরও তেমনই আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় যথা :—

"ব্রীহিভির্যজেত যবৈর্যজেত।" ইতি শ্রূয়তে।

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত একাদশীতত্ত্বম্।

প্রাগুক্ত প্রকারে যজ্ঞীয় দ্রব্যরূপে যব, ধান্য, কুশ প্রভৃতির ব্যবহার হইতে সাধারণ পূজাদ্রব্যরূপেও ইহাদের ব্যবহারের বিধান হইয়াছে যথা :—

"আপঃক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পি সতণ্ডুলম্।
যবঃ সিদ্ধার্থ কশ্চৈব অষ্টাঙ্গোহর্ঘ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

"জল, দুগ্ধ, কুশাগ্রভাগ, দধি, ঘৃত, আতপতণ্ডুল যব, শ্বেত সর্ষপ, এই অষ্টদ্রব্যসমন্বিত হইয়াই অর্ঘ অষ্টাঙ্গ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।"

এতৎ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে দেবপূজা

আদিতে কেবল অর্ঘ্যদ্বারাই সম্পাদিত হইত। অর্ঘ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। অর্ঘ শব্দ হইতেই অর্ঘ্য শব্দ নিষ্পাদিত হয়। অর্ঘ শব্দের অর্থ পূজাবিধান যথা "মূল্যে পূজাবিধার্ঘঃ।" অর্ঘ বা পূজা বিধানের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই অর্ঘ্য বা পূজাদ্রব্য। অর্ঘ্যযোগে সূর্য্যেরই পূজা সর্ব্বপ্রথমে করা হয় বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেই সমস্ত দেবপূজার আদিতেই 'সূর্য্যার্ঘ' প্রদানের বিধি প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রকারে সূর্য্যের সহিত অর্ঘ্যের বিশেষ যোগের দ্বারা সূর্য্যপূজারই যে প্রথম উৎপত্তি হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সূর্য্যার্ঘ্যে আকন্দপাতা ও তৎপূজায় আমরা আকন্দপুষ্পের বিধান দেখিতে পাই। অভিধানে আকন্দের 'শীতপুষ্পক' ও 'সদাপুষ্প' নামও পাওয়া যায়। 'শীতপুষ্পক' নামের দ্বারা শীতকালে ইহার পুষ্প হয় এবং 'সদাপুষ্প' নামের দ্বারা ইহার পুষ্প কঠিনদল বলিয়া শীঘ্র শুষ্ক হয় না ইহাই বুঝিতে পারা যায়। আকন্দ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌ই বটে। এই সমস্ত দ্বারা ইহা যে আদিতে শীত-প্রধান দেশের উদ্ভিদ্‌ ছিল তাহাই অনুমান হয়। বিশেষতঃ আকন্দের একনাম অভিধানে 'মন্দারও' দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ দেবতরুর মধ্যে আমরা এক মন্দারের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। যদিও কেহ কেহ মাঁদার গাছকেই সেই মন্দার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন আকন্দ গাছ সেই মন্দার হওয়াও অসম্ভাবিত বোধ হয় না। যাহা হউক মন্দার দেবতরু নামে আখ্যাত হওয়ায় এবং আকন্দের সহিত নামসাদৃশ্য দ্বারা যোগ থাকায় ইহাও যে আর্য্যদিগের আদি নিবাস বা স্বর্গেরই তরু তাহা আমরা মনে করিতে পারি।

পূর্ব্বে যে আমরা সুমেরু সন্নিহিত স্থানে গুল্মজাতীয় তৃণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভৌগোলিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি তদনুসারে কুশকেও আমরা উত্তর কুরুজাত বলিয়াই মনে করিতে পারি। কারণ কুশ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌ তো বটেই পরন্তু ইহার যে ফুল হয় তাহাও সাধারণ ফুলের ন্যায় নহে, উহা একপ্রকার তুলার ন্যায় এবং কখনও শুষ্ক হয় না। সুতরাং ইহাকে অপুষ্পক মধ্যেই ধরা যাইতে পারে। কুশেরই তুল্য জাতীয় 'কাশতৃণ'। ইহার ফুলও বিশেষরূপেই শীতসহ ও দীর্ঘস্থায়ী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই ইহার একনাম 'অমর পুষ্প' হইয়াছে।

আমরা শাস্ত্রাদির প্রমাণ দ্বারা যবকে উত্তর কুরুজাত বলিয়া প্রতিপাদিত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছি পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌-দিগের অনুসন্ধানের দ্বারা তাহা কতদূর সমর্থিত হয় তাহা আমরা নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হইতেই বুঝিতে পারিব :—

"The Zone which comprised barly and rye, but not wheat, must be sought somewhere to the north of the Alps." "The Origin of the Aryans by Isaac Taylor p 28.

"যে ভৌগোলিক মণ্ডল যব ও ব্রীহি ধারণ করে, কিন্তু গোধূম ধারণ করে না, আল্পস্‌ পর্ব্বতের উত্তরে কোথাও তাহার সন্ধান লইতে হইবে।"

রাই (Rye) যে ব্রীহিরই নামান্তর তৎসম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যই প্রমাণ—

"The word 'rye' is common to the Teutonic Lettic and Slavonic languages and has been identified by Grimm with the Sanskrit Vrihi, rice." Ibid p 28

"রাই শব্দ টিউটানিক. লেটিক্ ও স্লেভনিক্ ভাষায় একই এবং গ্রিম্ ইহাকে সংস্কৃত ব্রীহির সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

উপরে 'গোধূম'কে যবের সহিত এক মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী বলিয়া যে স্বীকার করা হয় নাই আমাদের শাস্ত্রেও তাহারই সমর্থন পাওয়া যায় যথা—

"ব্রীহিভির্যত্ত যবৈর্যজেত" ইতি শ্রূয়তে—যথোক্ত বস্তুসম্পত্তৌ গ্রাহ্য তদনুকারিযৎ। যবানামিব গোধূমা ব্রীহীণামিশালয়॥"

শ্রুতি আছে ব্রীহি দ্বারা যাগ করিবে। বিধানোক্ত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে তাহারই অনুরূপ যাহা তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন যবের অনুকল্প গোধূম, ব্রীহির অনুকল্প শালি।"

এস্থলে অনুকল্প বিধানের দ্বারা যব ও ব্রীহিই যে মুখ্য কল্প এবং গোধূমও শালি (আশুধান্য প্রভৃতি) গৌণকল্প তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যব ও ব্রীহির উৎপত্তি যে গোধূম ও শালির পূর্ব্বে তাহারই প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়।

যবাদির যেমন আমরা অনুকল্প দেখিতে পাই—কুশতৃণেরও তেমনই অনুকল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনুকল্প ইহারই তুল্য জাতীয় কাশতৃণ। নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্র বাক্যটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কাশ ব্যতীত আরও কয়েক জাতীয় তৃণই অনুকল্প ছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ ইহাতে সকলগুলিকেই একদর্ভ সংজ্ঞারই অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে যথা :—

"হরিতা সপিঞ্জলাশ্চৈব পুষ্টাঃ স্নিগ্ধাঃ সমাহিতাঃ।
পিতৃতীর্থেন দেয়াঃ স্যুদূর্ব্বা শ্যামাক মেবচ।
কাশাঃ কুশাবল্বজাশ্চতথান্যে তীক্ষ্ণরোমশাঃ।
মৌঞ্জাশ্চ শাদ্বলাশ্চৈব ষড্‌দর্ভাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

সপিঞ্জলাঃ সাগ্রাঃ তীক্ষ্ণরোমশা ইতি বল্বজানাং বিশেষণম্। শাদ্বলা ইতি সর্ব্বেষাং বিশেষণম্। ইতি শব্দ কল্পদ্রুম।

এস্থলে দূর্ব্বা,শ্যামাক নামক তৃণ ধান্য গাছ, কাশ, শ, বল্বজ, মুঞ্জ এই ছয়টী তৃণজাতিকেই আমরা দর্ভ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত পাইতেছি। ইহাদের মধ্যে 'দূর্ব্বাকে' আমরা সামান্যার্ঘ্যের মধ্যে কুশাগ্রের পরিবর্ত্তে নিত্যই ব্যবহৃত হইতে দেখি।

যখন আর্য্যগণ উত্তরকুরু হইতে মধ্য আসিয়ার তৃণপ্রায় ভূভাগে উপস্থিত হন তখনই সম্ভবতঃ দূর্ব্বা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন তৃণজাতীর উদ্ভিদ্ কুশতৃণেরই ন্যায় পূজাদ্রব্য রূপে পরিগৃহীত হয়।

মনুসংহিতায় উপবীতের বিভিন্ন উপাদানের আমরা যে উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা প্রায় সমস্তই তৃণজাতীয় উদ্ভিদেরই বিকার। এবং বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ সমস্ত তৃণজাতির অধিকাংশই আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত দর্ভ পর্য্যায়ভুক্ত যথা—

"মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমাশ্লক্ষ্ণা কার্য্যাবিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥ ৪২
মুঞ্জালাভেতু কর্ত্তব্যাঃ কুশাশ্মান্তক বল্বজৈঃ।
ত্রিবৃতা গ্রন্থনৈকেন ত্রিভিঃপঞ্চভিরেববা॥ ৪৩
কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিক সৌত্রিকম্॥" ৪৪

মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়ঃ

"ব্রাহ্মণদিগের সমান গুণত্রয়ে নির্ম্মিত; সুখস্পৃশ্য মুঞ্জময়ী মেখলা করিতে হয়। ক্ষত্রিয়দিগের মূর্ব্বময়ী ধনুকের ছিলার ন্যায় ত্রিগুণিত এবং বৈশ্যের

মুঞ্জাদির অপ্রাপ্তি পক্ষে ব্রাহ্মণেরা কুশের মেখলা করিবেন, ক্ষত্রিয়েরা অশ্মান্তক নামক তৃণ বিশেষের এবং বৈশ্যেরা বল্বজ তৃণের মেখলা করিবেন। ত্রিগুণা মেখলা স্ব স্ব বংশের রীত্যনুসারে এক তিন অথবা পঞ্চগ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ করিবে।

ব্রাহ্মণের ঊর্দ্ধত্রিবৃৎ কার্পাস সূত্রের উপবীত হইবে ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রের ও বৈশ্যের মেষলোমের উপবীত হইবে।"

উপরে আমরা যে মূর্ব্বা নামক তৃণের উল্লেখ পাইয়াছি তাহা হইতে যেমন যজ্ঞোপবীত নির্ম্মিত হইত তেমনই ধনুর গুণও নির্ম্মিত হইত তাহাতেই ধনুর গুণের এক নাম মৌর্ব্বী হইয়াছে। ইহাতে ধনুর ব্যবহার ঐ সময় হইতে হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। মূর্ব্বার একনাম "দিব্যলতা"ও পাওয়া যায়। ইহাতে স্বর্গ বলিয়া ভারতের উত্তরবর্ত্তী আসিয়ার উত্তরভাগই যে ইহার উৎপত্তি-স্থান তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

এতৎপ্রসঙ্গে তৃণজাতীয় অপর একটী উদ্ভিদের কথা উল্লেখ করাও কর্ত্তব্য বোধ হয়, ইহা ইক্ষু। বৃহৎ তৃণবিশেষের বৈদিক কুশর নাম পাওয়া যায়। চলিত ভাষায় ইহারই অনুরূপ ইক্ষুর 'কুশারী' নাম প্রচলিত আছে। সুতরাং বৈদিক 'কুশর' ইক্ষুরই প্রাচীন নাম বলিয়া বোধ হয়। (২) কুশেরই নামানুসারে ইহার নাম হওয়ায় ইহা যে বিশেষ প্রাচীন তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। একদিকে ইক্ষুর যেরূপ কুশের সহিত যোগ দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ আবার অন্যদিকে ইহার সহিত কাশেরও যোগ দেখা যায় কারণ ইক্ষুর নামানুসারেই কাশের 'ইক্ষুর' ও ইক্ষুরক নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইক্ষুর রস হইতে শর্করা প্রস্তুত হইয়া দৈব ও পৈত্র কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইক্ষুর উৎপত্তি পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যথা—

"অমৃতং পিবতোবক্ত্রাৎ সূর্য্যস্যামৃতবিন্দবঃ।
নিপেতুর্যে তদুত্থাস্তী শালিমুদ্গেক্ষবঃ স্মৃতাঃ ॥
শর্করা পরমস্তস্মাদিক্ষুসারোঽমৃতাত্মকঃ।
ইষ্টারবে রতপুণ্যা শর্করা হব্যকব্যয়োঃ ॥" ইতি শব্দ কল্পদ্রুমধৃত মাৎস্যে ৭২ অধ্যায়।

"সূর্য্য অমৃত পান করিবার সময় তাঁহার মুখ হইতে যে অমৃতবিন্দু সকল নিপতিত হয় তৎসমস্ত হইতে শালি ধান্য, মুগ ও ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্যই ইক্ষুর সারভুত অমৃত রস শর্করা উৎকৃষ্ট বস্তু হইয়াছে ও রবির প্রিয় হইয়াছে। এই জন্যই পিতৃঅন্ন ও দৈব্যঅন্নেও পবিত্র রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।"

এ স্থলে শর্করার সূর্য্য হইতে উৎপত্তি ও ইহা সূর্য্যের প্রিয়রূপে বর্ণিত হওয়ায় মধ্য আসিয়ায় সূর্য্যপূজার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যভাষা সকলে যে শর্করা শব্দের স্পষ্ট অপভ্রংশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেও শর্করার প্রাচীনত্বের প্রমাণ হয়। সুপণ্ডিত রেগোজিন তদীয় 'বৈদিক ভারত' (Vedic India) নামক গ্রন্থে পাশ্চাত্য ভাষা সকলে ও প্রাচ্য আরব্য ও পারস্যভাষায় শর্করা-শব্দের অপভ্রংশ প্রদর্শন করিতে যাইয়া এইরূপ লিখিয়াছেন— .

Slightly corrupted in our European languages ; Latin Saccharum, Slavic sakhar, German zucker, Italian zucchero, Spainsh azucor, French sucre, English sugar not to mention Arbic sukkar and Persian shakar p 33 footnote.

ইংরেজী sugar যে শর্করা শব্দের অপভ্রংশ তাহা

সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রেগোজিন মিশ্রিবাচক sugarcandy শব্দও সংস্কৃত 'শর্করাখণ্ডে'রই অপভ্রংশ বলিয়া মনে করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভূগোলগ্রন্থে সিন্ধু হইতে জাপান পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আসিয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণাংশের (৩) যে উদ্ভিদ্‌বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতেও আমরা কার্পাস ও ইক্ষুর উল্লেখ প্রাপ্ত হই যথা—

"The Mountains are covered with the most valuable timber trees, and on the plains rice, cotton, sugarcane, and other products are cultivated while the bambo, palms, and ornamental woods flourish." fuller treatLangmans The World with ment of India. p 61.

মধ্য আসিয়ার পরেই এই ভৌগোলিক বিভাগ। সুতরাং এই সমস্ত উদ্ভিদ্ মধ্য আসিয়ার দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী আর্য্যদিগের পরিচিত হওয়া সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়।

আর্য্যগণ পূর্ব্বোল্লিখিত তৃণময় দেশের আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইলেই প্রথম বৃক্ষাদির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। এই সময়েই তাঁহারা পলাশ খদিরাদি বৃক্ষের পরিচয় প্রাপ্ত হন। তাহাতেই মনুসংহিতায় ব্রহ্মচারীর পলাশাদি দণ্ডের বিধান দৃষ্ট হয় যথা—

"ব্রাহ্মণো বৈল্বপলাশৌ ক্ষত্রিয়োবাটখদিরৌ।
পৈলবোদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হতি ধর্ম্মতঃ॥" ৪৫

• মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বিল্ব অথবা পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বট অথবা খদিরের দণ্ড এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী পীলু, অথবা উড়ুম্বরের দণ্ড ধারণ করিবে।"

উল্লিখিত বৃক্ষ সকলের প্রায় সকলগুলিরই যজ্ঞের উপযোগিতা দেখা যায়। তাহাতেই পলাশের একনাম 'যাজ্ঞিক' খদিরের একনাম 'যজ্ঞাঙ্গ', উড়ুম্বরের একনাম 'ব্রহ্ম বৃক্ষ' পাওয়া যায়। উড়ুম্বর যে যজ্ঞোড়ুম্বর বা যজ্ঞডুম্বর নামে কথিত হয় তাহাতে ইহার যজ্ঞোপযোগিতা বিশেষরূপেই প্রমাণিত হয়। পীলুর একনাম আমরা 'শীতসহ' প্রাপ্ত হই। তাহাতে ইহা শীতপ্রধান দেশের বৃক্ষ বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান ভূগোলগ্রন্থের মধ্যআসিয়ার উদ্ভিদ্‌বিবরণ আমাদের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যেরই পোষকতা করিয়া থাকে যথা—

The Central Plateaux are clothed with grasses, and except on the higher mountain slopes are singularly deficient in trees. (৪)

(আসিয়ার) মধ্য সমতল ভূভাগ সকল বিবিধ জাতীয় তৃণ সমাচ্ছন্ন এবং উচ্চ পার্ব্বতীয় ঢালু প্রদেশ ব্যতীত তৎসমস্ত বিশেষরূপেই বৃক্ষহীন।"

ইহা হইতে মধ্য আশিয়ার সমতল প্রদেশে বিবিধ জাতীয় তৃণ ও পর্ব্বত প্রদেশে বৃক্ষ থাকার স্পষ্ট উল্লেখই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

এতৎপ্রসঙ্গে বৃক্ষের প্রথম নাম সম্বন্ধে একটু মন্তব্য করা আমরা কর্ত্তব্য বোধ করি। আমাদের নিকট বোধ হয় 'পলাশই' বৃক্ষের প্রথম নাম ছিল। তাহাতেই যেমন বৃক্ষ বিশেষের নাম 'পলাশ' প্রাপ্ত হওয়া যায় তেমনই বৃক্ষের জাতীয় নামও 'পলাশী' পাওয়া যায়। বৃক্ষের 'পলাশী' নাম হওয়ার কারণও 'পলাশ' শব্দেই পাওয়া যাইতে পারে। একদিকে 'পলাশ' শব্দ যেমন বৃক্ষের

(৩) Longmans' the World with fuller treatment of India p 60.
(৪) Largman's the World with fuller treatment of India p 62.

সবুজ বা হরিদ্বর্ণের বাচক যথা—অমর কোষে :—

"পলাশো হরিতো হরিৎ ;"

তেমনই ইহা বৃক্ষের পত্রেরও বাচক যথা—অমর কোষে—

"পত্রং পলাশং ছদনং দলং পর্ণং ছদঃ পুমান্ ॥"

উপরে যে আমরা বটের উল্লেখ পাইয়াছি ইহার একনাম 'বনস্পতি' পাওয়া যায়। বট বিশেষ বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষ। বর্ত্তমান ভূগোল গ্রন্থে আমরা উত্তরমেরুর পরবর্ত্তী যে দুইটী ভৌগোলিক মণ্ডলের নাম প্রাপ্ত হই উহাদের উদ্ভিদাদির সম্বন্ধে এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা যায়—

Thə Sub-Arctic Zone—Coniferous trees (pines, fir &c)

The Cold Temperate Znee—Deciduons trees (oak &c) (৫) "

"উত্তরমেরু সন্নিহিত মণ্ডল—দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ,

নাতিশীতোষ্ণ হিমমণ্ডল—ওক্ প্রভৃতি বৃক্ষ।

আমরা যে বটবৃক্ষের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি তাহা ওকের ন্যায়ই বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষ। বটের একনাম 'বিটপী, ও পাওয়া যায়। এই 'বিটপী' বৃক্ষেরও সাধারণ নাম। বটের বিশেষ 'বনস্পতি' ও 'বিটপী' নাম এবং তদনুসারে বৃক্ষের বিশেষ ও সাধারণ নাম কল্পিত দেখিয়া ইহা যে বৃক্ষের প্রথম আদর্শ হইয়াছিল তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

উত্তরমেরু সন্নিহিত মণ্ডলে যে দেবদারু জাতীয় বৃক্ষের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদের 'দেবদারু' নামের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে এ সমস্ত যে আমাদের 'দেবদারু'র সহিতই অভিন্ন তাহা পরিষ্কারই বোধগম্য হয়। 'দেবদারু' শব্দের অর্থ দেবতার বৃক্ষ। এই দেবদারুর অপর নাম 'শক্রপাদপও পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে ইন্দ্রের পূজা প্রবর্ত্তিত হইলেই এই বৃক্ষের সহিত আর্য্যদিগের পরিচয় হয়। তাহাতেই ইন্দ্রের সহিত ইহার যোগ হইয়াছে।

আইজাক্ টেলার তদীয় আর্য্যদিগের আদি নিবাস The Origin of the Aryans নামক গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক সেইশের (Sayce) যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহাতেও দেবদারুকেই আর্য্যদিগের আদি নিবাসের নিদর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

* * * "but he thinks ft agrees with the conclusion of Comparative Philology, which teach us that the early Aryan home was a cold region, "Since the only two trees whose names agree in Eastern and Western Aryan are the bich and the pine, while winter was familiar with its snow and ice." The Origin of the Aryans by Isaac Taylor.

p p 14—15

"কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে ইহা ভাষাবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সকলের সহিত মিলে। ঐ সিদ্ধান্ত সকল আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে আর্য্যদিগের আদি নিবাস শীতপ্রধান দেশ ছিল। কারণ যে দুইটী মাত্র বৃক্ষের নাম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আর্য্যের মধ্যে মিলযুক্ত হয় ঐ দুইটী 'দেবদারু' ও 'ভূর্জ্জ'। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে তুষার ও হিমানী সহ শীতকালও তাঁহাদের সুপরিচিত ছিল।"

ভূর্জ্জের একনাম আমরা 'শৈলেপ্রস্থ'

---

(৫) Longmans' The World With fuller treatment of India p. ...

প্রাপ্ত হই। ইহাতে ইহাকে হিমালয় পর্ব্বত-জাত বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়। ভূর্জ্জপত্র বা ভূর্জ্জত্বকে মন্ত্রাদি লিখিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। ইহা হইতেই হউক বা শিবের সহিত যোগ হইতেই হউক ভূর্জ্জের একনাম, শিবও পাওয়া যায়।

পঞ্চদেবতরু বা স্বর্গতরুর নাম যে আমরা শুনিতে পাই তৎসমস্তও এই সময়েই আর্য্যগণ পরিজ্ঞাত হন বলিয়া বোধ হয়।

পঞ্চদেবতরুর নাম এই—

"পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসিবা হরিচন্দনম্॥"

"মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন এই পাঁচটী দেবতরু। 'হরিচন্দন' শব্দটীর ইন্দ্রের সহিতই যোগ দেখা যায়। কারণ 'হরি' ইন্দ্রের একনাম। (৬) সুতরাং ইন্দ্রের চন্দন বলিয়াই হরিচন্দন নাম হইয়াছে। ইহার ইন্দ্রচন্দন যে এক নাম আছে তাহাতেও ইন্দ্রের সহিত ইহার যোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার অপর নাম 'দিব্য' 'দিবিজ' ও আছে। তাহাতেও ইহা যে স্বর্গস্থানের বা ভারত উত্তরবর্ত্তি আসিয়ার বৃক্ষ তাহা প্রমাণিত হয়। দেবতরু সম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুমেও 'দেবভূমাবেব সম্ভবাৎ দেবতরুঃ।' এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত যে ভারতের স্বর্গস্থান বা উত্তর আসিয়া বা মধ্য আসিয়ারই বৃক্ষ তাহাই প্রমাণিত হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে স্বর্গসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে পূর্ব্বে স্বর্গ আকাশস্থ স্থান বিশেষকে বুঝাইত না পরন্তু মর্ত্ত্যস্থ সুমেরু বা উত্তরমেরু স্থিত পর্ব্বতই স্বর্গ নামে আখ্যাত হইত। অমরকোষ অভিধানে 'সুমেরুর' বাচক শব্দ সকলের মধ্যে 'সুরালয়' শব্দ পাওয়া যায় যথা "মেরুঃ সুমেরুর্হেমাদ্রীরত্নসানুঃ সুরালয়ঃ॥" শব্দকল্পদ্রুমধৃত জটাধর অভিধানে সুমেরুর বাচক 'অমরাদ্রি' ও ভূস্বর্গ' শব্দ ও, পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে উত্তরমেরু স্বর্গ বলিয়া সংস্কার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্রোতের ফুল

(৪)

কলিকাতার দর্জিপাড়ায় হরিবিহারী বাবুর একখানি বাড়ী আছে। সেই বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপিনবিহারী ও তাঁহাদের কুলপুরোহিত নন্দকিশোর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের একমাত্র সন্তান নবকিশোর কলেজে পড়িত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবকিশোরকে যখন নিজের টোলে সংস্কৃত না পড়াইয়া ইংরেজি পড়িতে দিলেন, তখন তাঁহার যজমান-মহলে

বিষম আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু বলিষ্ঠ প্রকৃতির ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা উচিত মনে করিতেন তাহাই করিতেন, কাহারও ভয়ে বা খাতিরে আপনার মতের বিপরীত কার্য্য করিতেন না।

হরিবিহারী যখন তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় জমিদার-বাড়ীর ভাবী পুরোহিতকে ইংরেজী পড়াইতেছেন কেন, তখন ভট্টাচার্য্য হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন—আজকালকার যজমানেরা ইংরেজী শিখিতেছে, আজকালকার শাস্ত্রও অনেকটা ইংরেজী হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং শিষ্য যজমানের নিকট সম্মান পাইবার যোগ্য হইতে হইলে গুরু পুরোহিতের সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষারই সকল শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা দরকার।

হরিবিহারী কুণো প্রকৃতির লোক। তিনি ভট্টাচার্য্যের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া ঐখানেই নিবৃত্ত হইয়া গেলেন।

কিন্তু সেই গ্রামের মোড়ল নিবারণ মুখুয্যে ভট্টাচার্য্যের মতিচ্ছন্ন হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধ জুড়িয়া দিল—নন্দকিশোর স্মৃতিরত্নের ছেলে—মুদি মালার ছেলেরা যা শিখছে তাই শিখবে?

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—শিখবে নাই বা কেন? জ্ঞানেরও কি জাতিভেদ আছে নাকি?

নিবারণ সোজা হইয়া জোর দিয়া বলিল—তা আবার নেই? তুমি মোছলমানকে বেদ পড়াতে পার?

ভট্টাচার্য্য তেমনি হাসিমুখে বলিলেন—কেন পারব না? খুব পারি। তেমন নিষ্ঠাবান্ ছাত্র যদি পাই আমার যত বিদ্যা আছে সব আমি পরম আনন্দে তাকে শেখাতে পারি।

নিবারণ একেবারে বজ্রাহত। সে আর কোনো যুক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া ভট্টাচার্য্যকে ভয় দেখাইবার ভাবে বলিল—না না না, ও-সব অনাচার ছেলেকে করিয়ো না বলছি। মেলেচ্ছ পুরুত নিয়ে আমাদের চলবে না! শেষে কি কুলপুরোহিত ত্যাগ করতে হবে নাকি?

ভট্টাচার্য্য তেমনি হাসিমুখেই বলিলেন—কিচ্ছু করতে হবে না দাদা। সব ঠিক মানিয়ে যাবে। ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট-ভোজী যজমান নিয়ে পুরোহিতরা যখন চলছে, তখন কেবল মাত্র ম্লেচ্ছের ভাষা মুখে উচ্চারণ করার জন্যে পুরোহিতকে ত্যাগ করতে হবে না। সেটা তেমন অনাচার নয়।

ভট্টাচার্য্যের এই কথার মধ্যে একটু শ্লেষ-ইঙ্গিত ছিল। নিবারণ মুখুয্যে আবাল্য নানাবিধ অনাচার করিয়া যৌবনে কমি-সেরিয়েট বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করে। লোকে বলে গোরাসৈনিকদিগের উচ্ছিষ্ট খানা নিবারণের রসনা পরিতৃপ্ত করিত। সেই অপবাদটা ঢাকিবার জন্য নিবারণ এখন গ্রামের হিন্দুয়ানি রক্ষার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য তাহার প্রকাণ্ড হিন্দুয়ানির আড়ম্বরের আবরণ সত্ত্বেও নষ্ট লোকের রচা কথাটাকেই যখন ইঙ্গিতের খোঁচা দিয়া খুঁড়িয়া তুলিলেন, তখন নিবারণের মনের মধ্যে দ্বিতীয় রিপুটা খোঁচা-খাওয়া ভিমরুলের মতো ভন ভন করিয়া উঠিল। কিন্তু নিবারণ হুলটা যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া হতাশানম্র করুণস্বরে বলিল

—যা খুসী কর ভায়া! তোমরা হলে একে পণ্ডিত তায় রাজপুরোহিত! তোমরা আমাদের মতন গরিব মুখ্‌খু সুখ্‌খুর কথা শুনবে কেন? কিন্তু দেখো ভায়া, গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগবে, তখন পস্তাতে হবে!......হরিহে মধুসূদন, তোমারই ইচ্ছা!

নিবারণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—কী! এত বড় আস্পর্দ্ধা! নিবারণ মুখুয্যের কথা অগ্রাহ্যি! এর শোধ আমি তুলব, তুলব, তুলব! না তুলি ত......

ইহার পর নবকিশোর নির্ব্বিবাদে গ্রামের স্কুল হইতে মাইনর পাশ করিয়া বৃত্তি পাইল। এখন সে কলিকাতায় পড়িতে যাইবে ঠিক হইয়াছে। গ্রামে আবার একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। মনুর পর এ পর্য্যন্ত কেহ কখনো কেবলমাত্র লেখাপড়া করিবার জন্য এ গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে পা দিয়াছে বলিয়া কিম্বদন্তী নাই, ইতিহাস ত এ বিষয়ে একেবারে নীরব। নবকিশোর এই সনাতন নিয়ম ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়া সকলকেই বিষম চিন্তিত করিয়া তুলিল। সকলেই ভাবিল কিশোর ছোঁড়াটা এইবার একেবারে ম্লেচ্ছ হইয়া ঘরে ফিরিবে! নবকিশোরের এমন যে নিষ্ঠা, বাছবিচার, ছোঁয়াছুঁয়ির এত পিটপিটি এ সব বুঝি আর টিকিবে না! কেবল কিশোরের কিশোরবয়স্ক বন্ধুরা তাহাকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়া ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিল। সব চেয়ে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বিপিন। সে জমিদারের ছেলে বলিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে বাহিরের সংশ্রব হইতে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল; নবকিশোরই এই খাঁচার পাখীটিকে বাহিরের উদার বিপুল বিস্তারের মোহন সংবাদ আনিয়া দিত। সেই একমাত্র বন্ধুটির বিচ্ছেদ বিপিনের মনে বড় বাজিয়াছিল।

নবকিশোরও কলিকাতায় আসিয়া প্রথমটা একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিল। সে দেখিল গ্রামে থাকিতে যে-সমস্ত আচার সে পালন করিত, কলিকাতায় তাহা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। মনুর আমলের নিয়মগুলি এই কলির শহরে পালন করা এক রকম অসম্ভব; কলিকাতাটা যেন মনুর ব্যবস্থা পণ্ড করিবার জন্যই কোমর কষিয়া বসিয়া আছে। প্রতি পদে পদে বাধা পাইয়া পাইয়া নবকিশোরের মন নিজের আচার অনুষ্ঠানের দিকে সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল; সে ঠেকিয়া ঠেকিয়া বুঝিতে লাগিল যে, এমন না করিয়া অমন করিলেও জীবনযাত্রা বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, এবং জগতের লক্ষ কোটি নরনারীর মধ্যে দুজনের আচার ব্যবহার ঠিক এক রকম হইতে দেখা যায় না। তাহার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা সকলেই অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপকের আচারের সহিত হিন্দুস্থানী অধ্যাপকের আচারের মিল নাই, আবার বাঙালী অধ্যাপকের আচার উহাঁদের দুইজনের আচার অনুষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশেষ করিয়া তাহার একজন অধ্যাপক একেবারে দেবচরিত্রের লোক; কিন্তু তিনি একেবারে বিষম অনাচারী। এই সাধু চরিত্রের অধ্যাপকটির সস্নেহ মিষ্ট ব্যবহারে নবকিশোর তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দেখিয়া শুনিয়া আচার পালন সম্বন্ধে তাহার একান্ত আগ্রহ ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া



মায়ানদী-তীরে শ্রীবৎস ও চিন্তা।

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

পড়িতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে করিতে ভিতরে ভিতরে তাহার যতই পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল ততই সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে লাগিল যে আচারটা নিতান্তই বাহিরের জিনিস, প্রয়োজন অনুসারে তাহা কখনও পালন করিতে হয়, কখনও পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কখনও বা একেবারে বর্জ্জন করা দরকার হয়; যে লোক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারও পরিবর্ত্তন করিতে না পারে সেই ব্যক্তি আচারের ও সংস্কারের নাগপাশে জড়াইয়া গিয়া জড় বা পঙ্গু হইয়া পড়ে; গোঁড়ামি ও মূর্খতা প্রায় সমার্থক!

নবকিশোরের চরিত্রের মধ্যে একটা সতেজ বলিষ্ঠতা ছিল; তাহা তাহার প্রকাণ্ড সুগৌর শরীর, দীর্ঘোন্নত নাসিকা ও বড় বড় চোখ দুটি দেখিলেই বুঝা যাইত। তাহার মধ্যে জ্ঞানের স্বচ্ছতা, মনের তেজ, চরিত্রের দৃঢ়তা, নিষ্ঠার একাগ্রতা ও হৃদয়ের সরলতা সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল। তাহা তাহার বাক্যে ব্যবহারে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত। তাহার ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত উচ্চ খোলা হাসিতে তাহার নির্ম্মল মুক্ত প্রাণখানি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়িত। সে যাহা বলিত ও করিত তাহা সাবধানে বিচার করিয়া, কিন্তু মধ্যপথে থামিতে সে জানিত না, সে মনের প্রবল বেগে ব্যাপারটার শেষে গিয়া তবে থামিতে পারিত। এজন্য তাহাকে হঠাৎ দেখিলে নিতান্ত একগুঁয়ে মনে হইত; সে মনের মধ্যে যুক্তিতর্ক এমন জোরে বহাইয়া শীঘ্র উপসংহারের দিকে উপনীত হইতে পারিত যে লোকে মনে করিত সে কেবলমাত্র খামখেয়ালির উত্তেজনার বশেই কাজ করিয়া চলে। সুতরাং তাহার মত বলিষ্ঠ চরিত্রের লোক যখন যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে তখন তাহার সম্বন্ধে কোনোই দ্বিধা রাখে না।

এ রকম প্রকৃতির লোককে সকলে সম্ভ্রম দেখায়, খাতির করে, এমন কি মনে মনে একটু ভয়ও করে, কিন্তু তাহার সঙ্গ লোভনীয় মনে করে না। সুতরাং কলিকাতায় তাহার কেহ বন্ধু বা সঙ্গী ছিল না। সে মোটা থান পরে, মোটা থানের চাদর গায়ে দেয়, চটি পরে; সুতরাং সে কলিকাতার বাবুর দলে মিশ খাইত না। আবার বাহিরের সাদৃশ্যে যাহাদের সহিত মিলিতে পারিত সেই-সব সংস্কৃত কলেজের ভট্টাচার্য্য ধরণের ছাত্ররা তাহার মতের সৃষ্টিনাশা উগ্রতা দেখিয়া তাহার কাছে ভিড়িত না।

নবকিশোর যখন ত্রিশঙ্কুর মতো মধ্যপথে স্থগিত নিরবলম্ব, তখন তাহাকে বাবু ও ভট্টাচার্য্য দলের মধ্যবর্ত্তী একজন আসিয়া গেরেপ্তার করিল। সে তারক, নবকিশোরেরই সহপাঠী। তাহার চেহারাটি ভয়ানক শীর্ণ, কঙ্কালের উপর শুধু যেন একখানি পাতলা নরম চামড়া জড়ানো আছে; তাহার কোটর-প্রবিষ্ট বড় বড় গোল গোল চোখ দুটি অর্থ-হীন হাসিতে উজ্জ্বল; বড় বড় দাঁতগুলি সদাবিকশিত; তাহার গাল দুটি তোবড়ানো বলিয়া হনু ও চোয়ালের হাড় অত্যন্ত উঁচু ও চওড়া দেখায়; তাহার পরণে থান, গায়ে চায়না কোট—গ্রীষ্মে লংক্লথের, শীতে আল-পাকার—তাহার উপর কোঁচানো চাদর দড়ির মতন পাকাইয়া গলায় মালার মতন করিয়া বাঁধা থাকে, পায়ে পেনেলার জুতো, মাথার সামনে টেড়ি, পিছনে টিকি, গলায় তুলসী

কাঠের মালা জামার তলে প্রায় ঢাকা, তাহার প্রন্থিল তর্জ্জনীতে অষ্টধাতুর তারের পুঁঠে-দেওয়া একটি আংটি চল্‌চল্‌ করিতেছে। তারক বাহ্য আকারে যেমন তুই প্রাচীন ও নব্য দলের সমন্বয় করিয়াছিল, ভিতরেও সে তেমনি—বচনে ভয়ানক সনাতন-ভক্ত, শাস্ত্র ও ঋষি ছাড়া মুখে অন্য কথা নাই, কিন্তু সুবিধা-মত প্রাচীন ও নবীন বিধি নির্ব্বিচারে পালন করিত। সে নবকিশোরকে বেশে একেবারে প্রাচীন ও মতে অতীব নবীন পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখিয়া ভাবিল নবকিশোরও হয়ত তাহারই ন্যায় দুই দিক বজায় রাখিয়া চলিবার মতন বুদ্ধিমান্। কিন্তু সে নবকিশোরকে নিজের দলে টানিতে আসিয়া দেখিল যে নবকিশোর একটি আস্ত গোঁয়ার, তাহার মধ্যে মানাইয়া রফা করিয়া চলিবার ভাব এতটুকু নাই। তারকের কাছে নবকিশোর যতই দুর্ব্বোধ হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, সে ততই নবকিশোরের সঙ্গ চাপিয়া ধরিতে লাগিল, নবকিশোরকে তাহার বুঝিতেই হইবে। সে এলোমেলো তর্ক করিয়া নবকিশোরকে রাগাইয়া তুলিত এবং নবকিশোর তাহার মুখের উপর তাহাকে মূর্খ বলিয়া গালি দিলে মুখে সে খুব ঘটা করিয়া আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু নবকিশোরের স্বচ্ছ তর্কযুক্তির নিকটে পদে পদে পরাস্ত হইয়া মনে মনে তাহাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

তারককে অপদার্থ জানিয়াও সঙ্গীহীন নবকিশোর তাহার এই অনুরক্ত অধ্যবসায়শীল লোকটিকে প্রশ্রয় দিত এবং সময়

করিত। তাহার বুদ্ধিবিচারহীন তুমুল তর্কে বিরক্ত হইয়া নবকিশোর তাহার নাম রাখিল তাড়কা রাক্ষসী। এবং তারকের এই নাম তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার পরিচিত মহলে এমন রটিয়া গেল যে তাহার পিতৃদত্ত নামের বদলে নবকিশোরের দেওয়া নামটিই বাহাল হইয়া গেল।

নবকিশোর যখন সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ ও বেদান্তের উপাধি লইয়া বাহির হইল তখন সে শুদ্ধিতত্ত্ব ও সংহিতার অনুশাসন নির্ব্বিচারে স্বীকার করিবার অবস্থা একেবারে কাটাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তখনো তারক তাহাকে হিন্দুশাস্ত্রে ও ঋষিবাক্যে আস্থাবান্ করিবার আশা একেবারে ত্যাগ করে নাই। সে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের সন্তানকে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইত; কিন্তু মনে করিত যে-ফলটা পচে তাহার খোসাতেই আগে পচন ধরে, নবকিশোর পোষাকে পরিচ্ছদে যখন এমন সনাতনী ধারা ধরিয়া রাখিয়াছে, তখন তাহার অন্তরটা এখনও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই জন্য ব্যথিত ও আশান্বিত হইয়া তারক এক-একদিন তর্কের মধ্যে তাহার কপালের শিরা ও কোটরগত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবকিশোরকে খৃষ্টান, ব্রাহ্ম বলিয়া গালি দিত। নবকিশোর তাহাতে একটুও রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিত—ও ত ঠিক গাল হল না! দেশে দেশে কালে কালে যে-সব মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়ে সমাজে তাঁদের মত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাঁরা ত শুধু সেই সেই দেশের বা কালের মধ্যেই আবদ্ধ নন; তাঁদের বাণীর যতটুকু সেই দেশের ও সেই কালের সঙ্গে জড়িত ততটুকু ছাড়া

তাঁদের সত্য বাণী শাশ্বত, তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি, তাঁরা সব জগৎগুরু। এই হিসেবে ঈশা মহম্মদ যেমন আমাদের পূজনীয়, বুদ্ধ নানক কবীর চৈতন্য তেমনি আবার খৃষ্টান মুসলমানেরও পূজার্হ। এঁরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে-সমস্ত মহাসত্য প্রচার করেছেন, তার মূল প্রস্রবণ এক; উপনিষদ ও বাইবেল, কোরান ও ভাগবত একই উৎসের বিভিন্ন ধারা। বিশেষ বিশেষ দেশে আবির্ভূত বলে' সেগুলি বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ম্বর ও সংস্কারগত সঙ্কীর্ণ আচারের বাহিক আবরণে আচ্ছন্ন; এই জন্য বুদ্ধিমান্ সচেতন মনের যে ধর্ম্ম তা সকল সামাজিক ধর্ম্ম হতে স্বতন্ত্র, সে সকল ধর্ম্মের অন্তরের জিনিস, তাকে কোনো নামের গণ্ডি টেনে সঙ্কীর্ণ করা চলে না। আমার ধর্ম্মমতকে যদি কোনো নাম দিতে চাও ত হিন্দু নামই দিও, যেহেতু আমি হিন্দুস্থানের বিশেষ অবস্থার মধ্যে জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছি।

নবকিশোরের এই কথায় তারক একেবারে খেপিয়া গিয়া বিষম তর্ক জুড়িয়া দিত। বেগতিক দেখিলে বিপিন মধ্যস্থ হইয়া উভয়কে নিরস্ত করিত।

বিপিন বড় শান্তপ্রকৃতির চুপচাপ ধরণের লোক। সে অপরিচিত লোকের সহিত কথা বলিতে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়, একলা কোথাও যাইতে পারে না, নিজের চেষ্টায় সে একটা কাজ করিতে পারে না। এই জন্য নবকিশোর নহিলে তাহার একদণ্ড চলে না। নবকিশোর তাহার বন্ধু ও অভিভাবক দুইই।

হইয়াছিল অবস্থার ফেরে। সে জমিদারের ছেলে; ছেলেবেলা হইতেই সে নিষেধের জালে জড়িত হইয়া কেবল শুনিয়াছিল সকলের সহিত তাহার মিশিতে নাই, কথা কহিতে নাই, যথায় তথায় যাওয়া তাহার উচিত নয়; কেমন করিয়া পদে পদে জমিদারী কায়দা বজায় রাখিয়া মর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে হইবে তাহার জন্য তাহাকে তাহার অপেক্ষা সতর্ক ও বুদ্ধিমান্ লোকদের মতের ও ইঙ্গিতের উপর সর্ব্বদাই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। রাজপুরোহিত-বংশের অকার্য্য হইলেও নবকিশোর স্কুলে পড়িতে পাইয়াছিল, কিন্তু বিপিনের সে সৌভাগ্যও হয় নাই। চৌধুরী-গোষ্ঠীর আবহমান ইতিহাসের বিশ্বাস যে কালির আঁচড় কাটিলে ধার কর্জ্জ হয়। লেখাপড়া শেখার শ্রম স্বীকার করুক তাহারা যাহাদের খাটিয়া খাইতে হইবে। পায়ের উপর পা দিয়া মা-লক্ষ্মীর পেঁচার ডানার তলে যাহারা আরামে থাকিবার দিব্য সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে তাহাদের লেখাপড়া শেখা শুধু পণ্ডশ্রম। প্রচুর আহার নিদ্রার পরও যদি সময় না কাটে তবে বড়মানুষের ছেলের আমোদ আহ্লাদের উপকরণের অভাব ত হইবার কথা নয়।

কিন্তু বিপিনের একমাত্র বন্ধু নবকিশোর যখন স্কুলে ভর্ত্তি হইল তখন বিপিনও মায়ের কাছে স্কুলে যাইবার বাহানা ধরিল। বিপিনের এ অন্যায় আবদার কিন্তু রক্ষিত হইল না; সে তাহারই প্রজাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসিয়া সকলের সমানি হইয়া পড়িবে? এ হইতেই পারে না; প্রজারা পরে তাহাকে মানিবে

তাহাকে গৃহেই পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে। চৌধুরী-বংশের মর্য্যাদা বড়, না, ছেলের আব্দার বড়!

বিপিনের চতুর্দ্দিকে নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া তাহার দৃষ্টি একেবারে রোধ করিবার আয়োজনে তাহার অভিভাবকদের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। বাহিরের খবর দিয়া মধ্যে মধ্যে যা গোল ঘটাইত নবকিশোর। এইজন্য এই খাঁচার পাখী ও বনের পাখীর মধ্যে একটি বড় ঘনিষ্ঠ যোগ জন্মিয়াছিল। নিরেট নিষেধের প্রাচীরের ছোট ছোট ঘুলঘুলি দিয়া বিপিনের মনের উপর যেটুকু বাহিরের আলো আসিয়া পড়িতেছিল তাহারই সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে আপনার সমস্ত বুদ্ধিটিকে মেলিয়া ধরিতেছিল; ইহাতে তাহার মন সচেতন হইয়া তাহার আশেপাশের তুচ্ছতম ঘটনাও ত্যাগ করিত না। তাহাতে তামসিক পরিবারের মধ্যে থাকিয়া সে এমন সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে লাগিল যাহা তাহার বয়সে তাহার জানা উচিত ছিল না। অথচ তাহার শান্ত প্রকৃতি ও নবকিশোরের স্বচ্ছ দৃপ্ত চরিত্র তাহাকে এজন্য সঙ্কুচিত করিয়াই তুলিত।

এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে বড়মানুষের আদুরে ছেলে বিপিন বর্দ্ধিত হইয়া বড়ই ভাবপ্রবণ ও আবেগময় হইয়াছিল। প্রতি পদে পরের খেয়াল-মত চলিতে চলিতে এবং কথায় কথায় রফা মানিতে মানিতে তাহার মন পরের উপর এমন নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছিল যে সে নিজের চেষ্টায় কোনো কাজই করিতে পারিত না; কিন্তু একবার উত্তেজিত হইয়া উঠিলে তাহাকে রোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। নবকিশোর ছিল তাহার ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া দিবার পাণ্ডা।

বিপিন প্রাইভেটে এণ্ট্রান্স পাশ করিতেই নবকিশোর বিপিনকে কলিকাতায় যাইয়া পড়িবার পরামর্শ দিতে লাগিল। বিপিনের পিতার অনেক আপত্তি ও তাহার মাতার অজস্র অশ্রু অগ্রাহ্য করিয়া বিপিন গোঁ ধরিয়া রহিল সে কলিকাতায় পড়িতে যাইবেই।

বিপিনের পিতা হরিবিহারী হাল্কা ছিপছিপে ছোটখাটো গৌরবর্ণ লোকটি; আপনার খেয়াল-মত নেশা ভাঙ করিয়া চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেই ভাল বাসিতেন, কোনো ঝঞ্ঝাটে থাকিতে চাহিতেন না। জমিদারী দেখিত দেওয়ানজী, সংসার দেখিতেন গিন্নি, আর তাঁহাকে দেখিত তাঁহার খানসামা গোলোক, সুতরাং তিনি ছিলেন নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট। সুতরাং বিপিনকে দু চার বার বারণ করিয়া শেষে "তোমাদের যা খুসী কর" বলিয়া তিনি একেবারে সরিয়া গেলেন।

কিন্তু গিন্নির অশ্রু কিছুতেই বারণ মানিতেছিল না। বিপিনের মা যেদিন মারা যান সেদিন যে তিনি বিপিনকে তাঁহারই হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। বিপিনকে কোলে পাইয়াই প্রথম তিনি মা হইয়াছিলেন; আজ এই আঠার বৎসর যাহাকে কোল-ছাড়া করেন নাই আজ তাহাকে একাকী বিদেশে পাঠাইতে তাঁহার মন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। বিপিনেরও মন অত্যন্ত

মুক্তি পাইবার আনন্দ সে বেদনাকে প্রবল হইয়া উঠিতে দিতেছিল না।

বিপিন কলিকাতায় আসিয়া বাহিরের সহিত প্রথম পরিচয়ে বাহিরকে লজ্জিতা নববধূর মতো ভালো বাসিল; কিন্তু সঙ্কোচে সে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বাহিরকে দান করিতে পারিল না। ইহা তাহার পক্ষে কল্যাণের কারণই হইল।

বিপিনকে কলিকাতায় পাইয়া নবকিশোরও বাঁচিয়া গেল। সে তারকের সঙ্গে অবিশ্রাম তর্ক করিতে করিতে যখন হাঁপাইয়া উঠিত, তখন সে বিপিনের শান্ত স্নিগ্ধ আলাপে তৃপ্তি খুঁজিত। বিপিন নবকিশোরের ন্যায় তার্কিক নয়। সে চিরকাল পরের মতেই মত দিয়া অভ্যস্ত; তাহার একমাত্র বন্ধু নবকিশোরের মত মানিয়া লওয়া সুতরাং তাহার পক্ষে বিশেষ কঠিন বোধ হইত না। তবু যে সে মধ্যে মধ্যে এক আধবার প্রতিবাদ করিত তাহা তাহার আবাল্যের সংস্কার হইতে নবকিশোরের মত এখন একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার মত ও সংস্কার তাহার আবাল্যের পরিবেশ ছাড়াইয়া একেবারে নূতন পথে ছুটিয়াই চলিতেছিল। দুই বন্ধুতে নূতন মতের তর্কের চকমকি ঠুকিয়া মাঝে মাঝে আপনাদের চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়া খেলা করিত; তাহাতে যে নিজেরই ঘরে আগুন লাগিতে পারে এমন আশঙ্কা কখনো কখনো তাহাদের মনে হইলেও ঘরের আগুনে পথ আলো করিবার মোহ তাহাদিগকে খেপাইয়া তুলিত; তাহাদের ভাবপ্রবণ তরুণ হৃদয় উজ্জ্বলতায় ক্ষণে ক্ষণে আপনাদিগকে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে থাকিত।

(৫)

মথুরাপুরের চৌধুরী-পরিবারে যখন বিপিনের খুড়িমার বোন্‌ঝি মালতীকে আশ্রয় দিবার ব্যাপার লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়াছিল তখন নবকিশোর ও বিপিন দুই বন্ধু কলিকাতার বাসায় পরম নিশ্চিন্ত মনে রাস্তার ধুলা ও বাতাসের ধোঁয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্জন্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লইয়া পরম উৎসাহে আলোচনা করিতেছিল। এবং তাহাদের পরম অবজ্ঞাভাজন চিরসহিষ্ণু নিত্যসহচর তারক তাহার মত কেহ গ্রাহ্য করুক আর না করুক সে বিষয়ে একেবারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উভয় বন্ধুর তর্কের মাঝখানে পড়িয়া বাধা দিতে কিছুমাত্র অবহেলা করিতেছিল না।

প্রাতঃকাল। শরতের সোনালি রৌদ্র খোলা জানলা দিয়া ঘরের ফরাশে আসিয়া পড়িয়াছে; ঘরের যেখানে যেখানে দেয়াল ফরাশের উপর সেখানে সেখানে ছায়া, আর জানলার ফাঁকে ফাঁকে সোনালি রৌদ্র, তাহার বুকে আবার গরাদের ছায়ার ডোরা-কাটা; যেন একখানি রৌদ্রছায়ার ডোরা-কাটা শতরঞ্জ বিছানো রহিয়াছে। জানলার নীচেই একটি শিউলি গাছের তলায় ঝরাফুলে শারদলক্ষ্মীর শয্যা পাতা হইয়াছে; শিউলি ফুলের মধু পরিমল স্নিগ্ধ বাতাসে স্পর্শ বুলাইতেছে। ভিখারী করতাল বাজাইয়া মোটা ভাঙা গলায় গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে আগমনী গান শুনাইয়া বেড়াইতেছে, এবং

যেখানে সেখানে হঠাৎ গান থামাইয়া অন্যত্র ভিক্ষার অন্বেষণে চলিয়া যাইতেছে। রাস্তায় ফেরিওয়ালারা বিচিত্র স্বরভঙ্গী করিয়া নিজ নিজ পণ্য হাঁকিয়া ফিরিতেছে।

বিপিন একখানি ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া প্রসারিত পা চটিজুতার উপর রাখিয়া শেক্সপীয়রের মার্চাণ্ট অফ ভিনিস পড়িতেছিল; অগ্রহায়ণ মাসে তাহার এম-এ পরীক্ষা। নবকিশোর পাশের ফরাশের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। অনেকক্ষণ পাঠ্য পুস্তকের টীকা ভাষ্যের খুঁটিনাটি পড়িতে পড়িতে বিপিনের বিরক্তি বোধ হইতেছিল। সে বলিল—ওহে কিশোর, কাগজখানা দাও ত একবার, দুনিয়ার খবরটায় চোখ বুলিয়ে নি।

নবকিশোর তাহার দিকে বক্রদৃষ্টি হানিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—না না, এখন পোর্শিয়ার খবরদারী কর; খেয়ে দেয়ে দুনিয়ার খবরদারী কোরো 'খন।

বিপিন বন্ধুকে চিনিত। তাহার বন্ধু ত শুধু নর্ম্মসহচর নয়, সে যে আবার অভিভাবকের মতন গম্ভীর হইয়া চোখও রাঙায়। নবকিশোরকে গম্ভীর হইয়া কথা কহিতে দেখিয়া বিপিন আর কাগজ চাহিতে পারিল না; অথচ পাঠ্য পুস্তক পড়িতে আর কিছুতেই ভালো লাগিতেছিল না; তাই সে হাসিয়া নবকিশোরের কথার উত্তরে বলিল—পোর্শিয়ার খবরদারী কাউকে করতে হয় না, সে-ই কত লোকের খবরদারী করে' বেড়াচ্ছে! এইজন্যে ত পোর্শিয়া-চরিত্র আমার তত ভালো লাগে না।

পাইয়া নবকিশোর সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—কেন?

—ওকে আমার কেমন মদ্দা মদ্দা ঠেকে। নারীত্ব যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

—কি হলে ভালো হত? নোলক-পরা, প্যানপেনে ঘ্যানঘেনে বাঙালীর ঘরের খুকী বৌটির মতন? স্বামীর বন্ধুর বিপদে উদাসীন, বড় জোর কেঁদে কেটে হাট বাধানোতে তার ক্ষমতা আর সহৃদয়তার চূড়ান্ত পরিচয়! কেমন?

বিপিন হাসিয়া বলিল—তা বলে' কি গৃহলক্ষ্মী কোমর বেঁধে মকদ্দমা করতে যাবে?

নবকিশোর জোর দিয়া বলিল—দরকার হলে যেতে হবে বৈ কি। ঝান্সীর রাণী, রাণী দুর্গাবতী, জোয়ান অফ আর্ক প্রভৃতি রমণীরা যুদ্ধ করেছিলেন বলে কি আমরা তাঁদের বেশী রকম শ্রদ্ধা করি না? কেন? না, এঁরা নিজের হাতে নিজেদের দুঃখের প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন! আর তার উল্টো দিকে আমাদের খুড়িমার ব্যাপারটা দেখ,—ফাঁকি দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত যারা করলে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু প্রতিকার করতে পারা দূরে থাকুক একটু আশ্রয় আর এক মুঠো অন্নের জন্যে উল্টে তাদেরই কাছে ভিক্ষার অপমান স্বীকার করতে হল! এর চেয়ে অক্ষমতার লজ্জা আর কি হতে পারে? সমস্ত দেশটা ক্লীব হয়ে উঠেছে, তাই অপমান সহ্য করাকে মনে করে ক্ষমা; নারীদের দুর্গতিকে মনে করে গৃহলক্ষ্মীর আদর্শ! ধিক্ থাক এমন নির্জীব মনের পুঁথিপড়া বড় বড় অর্থহীন

নবকিশোরের বজ্রকণ্ঠের নির্ঘোষে ঘর গমগম করিতে লাগিল। বিপিন পিতার অন্যায় আচরণের প্রসঙ্গে লজ্জিত হইয়া নিরুত্তর হইয়া গিয়াছিল। নবকিশোর উত্তেজনার ঝোঁকে একাকীই অনর্গল বক্তৃতা চালাইতে পারিত, কিন্তু দরোয়ান দুইখানি চিঠি আনিয়া বাধা জন্মাইল। বিপিন মুক্তির আনন্দ অনুভব করিল।

একখানি চিঠি বিপিনের, অপরখানি নবকিশোরের; উভয়ের পিতা লিখিয়াছেন।

পত্র পড়া শেষ করিয়া নবকিশোর বিপিনের গায়ে পত্রখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল—এই দেখ আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের দুর্দ্দশা!

বিপিন সেই পত্র পড়িয়া দেখিল স্মৃতিরত্ন মহাশয় নবকিশোরকে মালতীর অবস্থা ও আশ্রয়প্রার্থনার ব্যাপার আগাগোড়া খুলিয়া লিখিয়াছেন। বিপিন এক দিকে মাতার আচরণে যেমন অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হইল, অন্য দিকে তেমনি নির্য্যাতিতা খুড়িমা ও তাঁহার নিরাশ্রয়া বোনঝি মালতীর প্রতি সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। বিপিন পিতা ও মাতার সমস্ত অন্যায় আচরণের কৈফিয়ৎ স্বরূপ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—খুড়িমার বোনঝিকে তোমার সঙ্গে মথুরাপুরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে বাবা আমায় এই চিঠি লিখেছেন।

নবকিশোর এ কথায় কান না দিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল—দেখেছ, দেখেছ, আমাদের কাণ্ডখানা দেখেছ! আমরা আর্য্য বলে বড়াই করি, কিন্তু কার্য্য করি বাড়ী দাসী হতে চলেছে, এর চেয়ে কি তার বিয়ে হওয়া ভাল নয়? তুমি আবার বল কিনা বিধবা-বিবাহ গর্হিত!

নবকিশোরের চক্ষুদুটি আবেগে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিপিন তাহার উত্তেজনার সম্মুখে সঙ্কুচিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল—গর্হিত ঠিক বলিনে; আমি বলি, বিধবার স্বামীস্মৃতিকে সামনে রেখে ব্রহ্মচর্য্য পালনই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

—মানি বিধবার সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, বিপত্নীকেরও আদর্শ সেই রকমই! কিন্তু যে কাজে অন্তর থেকে কোনো প্রেরণা আসে না, শুধু বাইরের চাপে করতে হয়, তেমন ধর্ম্মসাধনও যে ব্যর্থ! আমরা সচেতন ভাবে কি কিছু করতে জানি? ধর্ম্মবিধি, সমাজবিধি, সবই অন্ধের মতো অভ্যাসের বশে শুধু পালন করে চলেছি—কারণ এমন না করে' অমন কেউ কোনো দিন করে না, বাপ-পিতামহের আমল থেকে এমনি ধারা চলে আসছে। আরে, একবার ছাই ভেবেই দেখ, কেন তাঁরা অমন না করে' এমন করতেন? ভগবান আমাদের মাথার মধ্যে মগজ বলে' এতখানি পদার্থ যে পূরে দিয়েছেন, তা কি শুধু গাধার মতো ভার বহনের জন্যে, কাজে খাটাবার জন্যে একটুও নয়? পাছে বুদ্ধি খরচ করে' দেউলিয়া হয়ে যাই, সেই ভয়ে বাপ-পিতামহ সঞ্চিত ধনের সুদের ওপরই আমাদের ভরসা; তা তাতে আধপেটাই খাই আর অনাহারে মরি, নতুন ব্যাপারে খাটাতে আমাদের সাহসই হয় না!

বিপিন বলিল—তুমি কি মনে কর

করতে পারে ? যার বুদ্ধি শিক্ষা-দ্বারা মার্জ্জিত হয়নি, তার যে নিজের বুদ্ধিতে চলতে গেলে পদে পদে ভুল হবে।

—আরে ভুলই করুক! ভুল না করলে সত্যের পরিচয় পাবে কেমন করে'। অতি বিজ্ঞ সাবধানী জাত আমরা ভুলও করিনে, সত্যেরও সন্ধান পাইনে। আর শিক্ষার কথা বলছ, সে ব্যবস্থাও ত করতে হবে তোমাদেরই, তোমরা যারা শিক্ষার স্বাদ পেয়েছ; আরো বিশেষ করে' তোমাদের মতো শিক্ষিত ধনীদের; কিন্তু যতদিন তা না ঘটছে, ততদিন জড় হয়ে না বসে থেকে, নিজের অশিক্ষিত বুদ্ধিতে চলে' সচেতন ভাবে যদি ভুলও করি তাও ভালো, তাতে ভুল সংশোধন করবার মতন বুদ্ধিশক্তি আমাদের মধ্যে ক্রমশ সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। যেমন ধর, আমাদের দেশের অশিক্ষিত মেয়েরা পর্য্যন্ত জানে যে ভগবান এক দিকে অন্তর্য্যামী, আর অন্য দিকে সর্ব্ব-ব্যাপী; কিন্তু এই বোধ সচেতন নয় বলে' বিশ্বমন্দিরের বিচিত্রতা আর মনোমন্দিরের নিগূঢ়তার মধ্যে তাঁর সন্ধান না করে' আমরা মানুষের গড়া মন্দিরে মন্দিরেই শুধু তাঁকে সন্ধান করে ফিরি; বিশ্বরূপে তাঁর প্রকাশ না দেখে বিশেষ শিলায় বা বিশেষ মুর্ত্তিতেই তাঁকে দেখতে চাই। এমনি অন্ধভাব গৃহস্থালীর আচার অনুষ্ঠান শুচিতা সকল সম্বন্ধেই দেখা যায়।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—এ সব সংশোধন করবে এমন শক্তিশালী কে ?

—তুমি, আমি, আর যাদের মধ্যে এই অভাব বোধ জেগেছে। এই জন্যেই ত জ্ঞানের আলোক বিস্তার করা প্রয়োজন, সকলকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা কি এক হওয়া উচিত।

—খানিকটা এক হওয়া উচিত বৈ কি! নইলে হয় কি জানো ? বৃদ্ধ বিপত্নীক হলেই তাড়াতাড়ি আর একটি বিয়ে করেন, কারণ তিনি রেঁধে খেতে বা ঘরকন্নার কাজ করতে জানেন না; আবার বালিকা বিধবা হলে তাকে পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়, সে যে স্বতন্ত্র হয়ে নিজেকে সামলাতে কখনো শেখে নি। ধর যেমন মালতী। তার বহিঃসংসার দেখবার মতন কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই, সে শুধু অন্তঃপুরের শিক্ষা নিয়ে করবে কি ? তার বর্ত্তমান অবস্থায় তাকে হয় বাইরের সংঘাতের সঙ্গে লড়াই করবার উপযুক্ত শিক্ষা পেতে হবে, নয় অপরের অন্তঃপুরে আশ্রয় নিতে হবে। অন্তঃপুরে আশ্রয় মিলতে পারে দু রকমে—এক বাড়ীর বৌ হয়ে, নয় অপর বাড়ীর দাসী হয়ে। দাসী হওয়ার চেয়ে বৌ হওয়া ঢের সম্মানের, নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে। এককালে ছিল যখন বিধবা পিসি বোন ভাই ভাইপোর বাড়ীতে থাকতেন সকলকার ওপর কর্ত্রী হয়ে, কিন্তু এখন আর সেদিন নেই, সমাজের অবস্থা বদলে গেছে; তাই এখন বিধবাদের হয় স্বতন্ত্র হয়ে আপন মর্য্যাদা বজায় রাখতে হবে, নয় পরের গলগ্রহ হয়ে দাসীপনা করতে হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, হয় বিধবার বিয়ে হওয়া উচিত, নয় মেয়েদেরও শিক্ষায় সাহসে পুরুষের সমকক্ষ হওয়া উচিত। বিশেষ ত যারা মালতীর মতো পরাধীনের অধীন হতে যাচ্ছে।

বিপিন জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি

ত জানো কিশোর, খুড়িমার মন থেকে সমস্ত গ্লানি মুছে দেবার জন্যে আমি তাঁকে কত ভক্তি করি, যত্ন করি। মালতীও যাতে পরের গলগ্রহ বলে না মনে করে তা আমি করব। মালতীর কাছে তুমি কখন যাবে?

নবকিশোর বলিল—বিকেল বেলা যাওয়া যাবে এখন।

—খুড়িমা মালতীকে কিছু লেখেন নি, হঠাৎ তুমি তাকে আনতে গেলে সে অবিশ্বাস করতে পারে। চিঠি দুখানাই সঙ্গে নিয়ে যেয়ো, যদি দরকার বোঝো পড়তে দিয়ো; দুখানা চিঠি পড়লে আর কিছু সন্দেহ থাকবে না।

—তাই হবে। এখন নেয়ে খেয়ে নেবে চল। সকাল বেলাটা ত তর্কে কাটল। দুপুর বেলাটা পড়তে হবে তোমায়। মালতীর বাড়ী থেকে ফিরতে ত আমাদের রাত হবে।

বিপিন ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, আমি সেখানে যেতে পারব না, তুমিই একলা যেয়ো। অচেনা মেয়ে-লোকের সামনে......

নবকিশোর হা হা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—চিরকালই কি তুমি এমনি মুখচোরা থাকবে? যে অচেনা মেয়েটি তোমার বৌ হয়ে আসবে তার কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা করবে নাকি?

বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—না না, আমি যেতে পারব না, তুমি একলাই যেয়ো।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(৩)

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছেলেদের জন্য একটি ধর্ম্মপাঠশালা খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইতেন। উপনিষদের শ্লোকগুলি হ্রস্বদীর্ঘ রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে সমস্বরে পাঠ করান হইত। যেখানে এক সময় গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসিত, দুর্গাপূজা হইত, সেই পূজার দালানই পরে বেদমন্ত্র পাঠে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই পাঠশালায় কতকগুলি বাহিরের ছেলেও পড়িতে আসিত। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একজন। তখন হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা গাঢ়তর হইয়া উঠে, এবং তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এ বন্ধুত্ব অক্ষয় ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

ছেলে বেলায় অক্ষয়চন্দ্রকে জ্যোতিবাবুদের বাড়ীর সকলেই "Poet" "Poet" বলিয়া ডাকিত। তখন তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন এবং জ্যোতিবাবুকে শুনাইতেন। একটু ফাঁক পাইলেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে জ্যোতিবাবুও খুব খুশী হইতেন। শীতকালে এক একদিন রাত্রি ৩।৪ টার সময় আসিয়া জ্যোতিবাবুকে শয্যা হইতে

উঠাইয়া লইয়া তিনি প্রত্যুষভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তখনকার কালে শীতকালেই সকলে morning walk করিত। বেশ করিয়া শীতবস্ত্র চাপাইয়া ও গলায় comforter জড়াইয়া ৩।৪টা রাত্রে বেড়াইতে বাহির হইতেন; এবং Race course প্রভৃতি ঘুরিয়া বেলা প্রায় দশটার সময়ে বাড়ী ফিরিতেন। একদিন ইহারা ফিরিতেছেন, কেশব বাবু গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন "তোমাদের এখনও morning walk হচ্ছে নাকি?" এক একদিন Eden's Park-এ যখন পৌঁছিতেন, তখনও রাত্রি থাকিত। চৌকিদার challenge করিয়া বলিত—"হুকুম্—সদর" (who comes there?)। পথে বাহির হইয়া কি করিতেন,—তাহার বর্ণনায় জ্যোতিবাবু বলিলেন, "বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই পথে নানারূপ ছেলেমানুষী বাক্যালাপ ও হাস্যকৌতুক সুরু করিয়া দিতাম। তা'তে পথের শ্রান্তি আদৌ অনুভব করিতাম না। একদিন যাইতে যাইতে আমাদের এই খেলা হইল—কে আগে কয়টা গ্যাস-লাইটের খুঁটি দেখিতে পায়। খুব দ্রুত চলিতে চলিতে আমি বলিলাম, "ঐ একটা" অক্ষয় বলিল, "ঐ একটা"। এই রকম যার নজরে যত বেশী পড়িত, তারই জিত হইত!



৺কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী

"তখন শীতকালেই morning walk হইত এবং শীতকালেই আমাদের চা'য়ের বরাদ্দ ছিল। এ চা' চীনদেশের চা—তখনও আসামের চা' আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নি। সে চা'য়ের কি সুগন্ধ! আমাদের অন্তঃপুরের রক্ষক একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধ লাঠিয়াল্ সর্দ্দার ছিল। সকলের চা'য়ের পেয়ালায় যে চা'টুকু পড়িয়া থাকিত, তাহাই জমা করিয়া সে চক্ষু মুদিয়া অতি আরামে খাইত। তখন বাহির মহলে হিন্দুস্থানী দরোয়ান্ ও অন্দর মহলে বাঙ্গালী সর্দ্দার পাহারা দিত। সর্দ্দার রাত্রে ডাকাতি হাঁকের মত যখন হাঁক দিত, তখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, ভয়ে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিত।"

"তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দুইজন করিয়া ডাক্তার বাৎসরিক

বেতনে নিযুক্ত থাকিত—একজন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী ডাক্তার। গুরুতর রোগ না



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

হইলে সাহেব ডাক্তারকে কখনও ডাকা হইত না। সাহেব ডাক্তারের উপর তখন সকলের অসীম বিশ্বাস ছিল। সৌভাগ্যক্রমে এখন সে বিশ্বাস অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী বড় ডাক্তারের অধীনে একজন অল্প বেতনের হাতুড়ে ডাক্তারও থাকিতেন। তিনি বাড়ীতে অষ্টপ্রহর হাজির থাকিতেন এবং বড় ডাক্তারেরা যে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, এই হাতুড়ে ডাক্তারটি সেই অনুসারে নিজের হাতে ঔষধপত্র দিতেন এবং ঠিক ঠিক সময়ে সেবন করাইতেন। জ্যোতিবাবুদের আমলে পীতাম্বর নামে একজন বৃদ্ধ এই ছোট ডাক্তার ছিলেন। ছেলেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত, তাঁহার নিকট সকলে গল্প শুনিতেন। তাঁহার বগলে, কাপড়ে মোড়া খোপকাটা একটা টিনের বাক্স থাকিত। সেই সব খোপে নানা রকম রঙের মলম থাকিত। ছেলেদের ফোঁড়া পাঁচড়া হইলে এই সব মলম লাগান হইত। ছেলেদের ভুলাইবার জন্যই বোধ হয় এইরূপ নানা রঙের মলম তিনি রাখিতেন।

জ্যোতিবাবুদের সময়ে এ বাড়ীতে বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ গুপ্ত এবং সাহেব ডাক্তার ছিলেন শ্রীযুক্ত বেলি। ডাক্তারদের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর স্মৃতি এইরূপ:—"আমাদের জ্বর হইলে দ্বারিবাবু প্রথম দিন আসিয়াই দীর্ঘচ্ছন্দে বলিতেন "তে—ল্"। অর্থাৎ Castor Oil—এই তেলের নাম শুনিলেই আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইত। তাঁর চিকিৎসায় একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল; ফলে এইরূপ চিকিৎসার নিয়মেই তিন দিন বড় জোর সাত দিনের মধ্যেই আমরা খাড়া হইয়া উঠিতাম। চিকিৎসার ঔষধ যেমন তিক্ত, পথ্যও তেমনি অরুচিকর ছিল। "জল সাবু" "চিনির মুড়্কী" "এলাচ দানা" ইত্যাদি। তখন ব্রাহ্মণের দোকানের খট্খটে একরকম বিস্কুট হইত, কখন কখন সেই বিস্কুট। আর তৃষ্ণা পাইলে গরম জল। ৺দ্বারিকানাথ গুপ্তের জ্বরের ঔষধই এখন "ডি, গুপ্তর মিক্শ্চার"—চলিত কথায় ডি, গুপ্ত ঔষধ নামে বিখ্যাত। শুনিতে পাই বেলি সাহেবের ব্যবস্থাপত্র অনুসারেই দ্বারি বাবু নাকি জ্বরের এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

"ডাক্তার বেলি অতি সদাশয় লোক ছিলেন। রাত্রে কেহ তাঁহাকে ডাকিতে গেলে,

তাঁর স্ত্রী তাঁহার উপর খড়্গ-হস্ত হইতেন কিন্তু আমাদের বাড়ী হইতে কেহ গেলে, তিনি স্ত্রীর কথা শুনিতেন না; বলিতেন 'Governor তাঁর হস্তে বাড়ীর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার দিয়া শিমলা-পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কিছুতেই কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারিবেন না।' বেলি সাহেব শিশু রবীন্দ্রকে বড় ভাল বাসিতেন, দেখা হইলেই তিনি রবিকে "Robin, Robin" করিয়া আদর করিতেন।"

তৎকালীন কলিকাতা সহরের এবং পানীয় জলের দুরবস্থা সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর স্মরণ আছে যে "তখন কলিকাতায় খোলা নর্দ্দমা ছিল। চারিদিকেই দুর্গন্ধ। তখন গঙ্গায় সহরের ময়লা ফেলা হইত—গঙ্গার জলে সর্ব্বদাই ময়লা ভাসিত। কিন্তু গঙ্গা স্নানের সময় সেই সব ময়লা ও তজ্জনিত দুর্গন্ধসত্ত্বেও আমাদের চির সংস্কারবশত কিছুই মনে হইত না। অভ্যাস ও সংস্কারের এমনি মাহাত্ম্য! সন্ধ্যার আরম্ভেই মশকের ঝাঁক চক্রাকারে মাথার উপর ঘুরিতে ঘুরিতে বোঁ বোঁ শব্দে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিত। সে মধুর সঙ্গীত এখন আর শোনা যায় না। তখন বেচারারা নিশ্চিন্ত ছিল—তাহাদের উপর লক্ষ্য করিয়া তখনও কামান্ পাতা হয় নাই।

"তখন কলের জল ছিল না। লালদীঘি হইতে পানীয় জল আসিত। মাঘ মাসে গঙ্গা হইতে জল আনাইয়া বড় বড় জালা ভরিয়া রাখা হইত। তাহাতেই সম্বৎসর কায চলিয়া যাইত। তখন আমাদের বাড়ীর পুকুরের সঙ্গে গঙ্গার যোগ ছিল। আমার গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে এক থোকে কিছু টাকা দিয়া গঙ্গা হইতে আমাদের পুকুর পর্য্যন্ত একটী পাকা লহর কাটাইয়া লইয়াছিলেন। পুকুরের জল শুকাইলেই সেই লহর দিয়া গঙ্গার জল আনা হইত। ঝরণার মত ঝর্‌ঝর্ করিয়া সেই ফেনিল শুভ্র জল যখন পুকুরে আসিয়া পড়িত তখন আমাদের বড়ই আনন্দ হইত। এখনকার ম্যুনিসিপ্যালিটি কিছু ক্ষতিপূরণের টাকা ধরিয়া দিয়া এই লহর এখন উঠাইয়া দিয়াছেন।"

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একজন মালিনী ছিল সে প্রতিদিন ফুল যোগাইত। অন্তঃপুরের জন্য ফুলের মালা এবং বাবুদের গুড়্‌গুড়ির মুখনলের জন্য ফুলের ভূষণ সে নিত্যই প্রস্তুত করিয়া দিয়া যাইত। "হুঁকা বর্‌দার্" বলিয়া তামাক সাজিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ভৃত্য নিযুক্ত থাকিত, জ্যোতিবাবু বলেন "বাস্তবিক তাহার-সাজা তামাকের ধূমোত্থিত সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিত।" একজন "ভবিষ্যুক্ত" তিলক-কাটা বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী আসিতেন, তিনি অন্দরে মেয়েদের লেখা পড়া শিখাইতেন। গিব্রেল্ নামে একজন ইহুদী ছিল, সে আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য সরবরাহ করিত। সে এ বাড়ীর বড়ই অনুগত ছিল, সকল ক্রিয়াকর্ম্ম আমোদ উৎসবেই সে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে যোগ দিত। তাহাকে দেখিলেই জ্যোতিবাবু আতর চাহিতেন, সে অমনি একটু তুলায় আতর লাগাইয়া ইঁহাকে দিত। 'বাচ্চা' বলিয়া এক জন কাবুলীওয়ালা জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে বেদানা পেস্তা প্রভৃতি ফল সরবরাহ করিত.

যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইত—এজন্য ছেলেরা তাহাকে খুব ভয় করিত। সদর দেউরীতে দরোয়ান্ ছিল, কিন্তু প্রত্যেক বাবুর বসিবার ঘরের (Drawing Room) দরজায় এক একজন হর্‌করা থাকিত। কোনও অভ্যাগত অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি আসিলে সেই হরকরা গিয়া সংবাদ দিত। কোনও ভৃত্যকে ডাকিতে হইলেও সেই ডাকিয়া দিত। বাবুদের প্রত্যেক বৈঠকখানাতেই ফরাশ বিছানা, মাঝখানে মছলন্দ পাতা, তাকিয়া দেওয়া, গদিওয়ালা একটা উঁচু বসিবার আসন থাকিত—তাহাতেই একেলা বাবু বসিতেন। নীচের ফরাশে অভ্যাগত ও মোসাহেবগণ বসিত। এরূপ বিছানা এখন বিবাহ সভায় বরের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাই হউক, এই সবই ছিল সেকেলে' নবাবী আমলের চা'ল ও কায়দা।

উক্তরূপ মুসল্‌মানী সভ্যতা এবং এখনকার ইংরাজী সভ্যতায় তখন যে এক সংঘাত চলিতেছিল, তাহার বিষয়ে জ্যোতিবাবু বলেন যে "তখন মোগলাই সভ্যতার সঙ্গে ইংরাজী সভ্যতার একটা যুঝাযুঝি চলিতেছিল—দেখা যাইতেছে জয়ী হইয়াছে ইংরাজী সভ্যতা। বৈঠকখানার সে গদীপাতা বিছানা উঠিয়া গিয়া তাহার স্থানে আসিয়াছে Drawing Room-এ কৌচ্ কেদারা। তখনকার aristocracyর ভাবটা গিয়া এখন (সাম্যের যুগে) democracyর spiritটাই প্রবল হয়েছে। এরূপ aristocracy যে শুধু আমাদের বাড়ীতেই নিবদ্ধ

দের ঘরেই এই একই প্রথা ছিল। কিন্তু মহর্ষির কক্ষটি অত্যন্ত সাদাসিদে রকমে সজ্জিত ছিল—সেখানে আসনের উচ্চ নীচ কোন পার্থক্যই ছিল না। ব্রাহ্মসমাজই আমাদের পরিবারের মধ্যে democracy-র ভাবটা আনিয়াছে। পূর্ব্বে' এ ভাবটা ছিল না।

"দুইটি বিভিন্ন সভ্যতা বঙ্গদেশকে দুই দিক হইতে যখন আঘাত করিতেছিল আমরা সেই সময়ে জন্মিয়া দুই রকমই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পূর্ব্বে পোষাক ছিল চোগা, চাপকান্, কাবা, পাগড়ী; এখন হ্যাটকোট, ওয়েষ্টকোট এবং পেণ্টুলন। ভাষায় পূর্ব্বে ফারশী আরবী শব্দেরই আধিক্য ছিল, এখন হইয়াছে ইংরাজী। বড়মানুষী আহার তখন ছিল কালিয়া পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব প্রভৃতি মোগলাই রকমের, এখন ইংরাজী মতে চপ কাট্‌লেট্ পুডিং রোষ্ট্ হইয়াছে। গৃহসজ্জাও তদ্রূপ, আগে বলিয়াছি। কিন্তু বেশ দেখা যাইতেছে কোন'টিই একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রত্যেক সভ্যতাই আমাদের হিন্দু সভ্যতার উপর এক একটা পলি বা স্তর রাখিয়া গিয়াছে। কাযেই হিন্দু মুসলমানী এবং ইংরাজী এই তিন সভ্যতার উপাদান একত্র হইয়াছে, আঘাত না করিয়া ভাব করিয়াছে, আর যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিয়াছে। এ সন্ধির ভাবটা এখন আমাদের সব কাযেই প্রকাশিত হইতেছে। যেমন হিন্দুমতে পূর্ব্বে নামের আগে "শ্রীযুক্ত" লেখা হইত; মুসলমান আমলে আসিলেন "বাবু"। যখন কোন ব্যক্তিকে যথেষ্টরূপ

সম্মান দেখাইতে হইত, তখন লেখা হইত "শ্রীযুক্ত বাবু" তারপর ইংরাজী মতে আসিল "Mr." এবং "Squire"। শেষোক্ত কারণে এখন Mr. বা Esqrই প্রযুক্ত হয়। হিন্দু "শ্রীযুক্ত" এবং মুসলমান "বাবু" বেশ একত্র মিলিয়া মিশিয়া ছিল; মিষ্টারও এমনি ভাবে মিশিয়া "শ্রীযুক্ত বাবু মিষ্টার অমুক চন্দ্র অমুক এস্কোয়ার হইতে পারিত কিন্তু ইংরাজেরা আসিয়াই "বাবু"কে অত্যন্ত অনাদর অবহেলা ও ঘৃণা করিতে লাগিলেন, তাই "বাবু" অভিমানে এখন গা ঢাকা দিয়াছেন; বাবু অন্তর্হিত হইলেও অন্যান্য বিষয়ে বেশ ত্র্যহস্পর্শ হইয়াছে। এখন খুব ভাল ভোজ দিতে গেলে, হিন্দুমতে শাক্ শুক্তানী, মোগলাই মতে কালিয়া পোলাও, এবং ইংরাজী মতে চপ্ কাট্‌লেট্-এর আয়োজন করিতে হয়। পোষাকেও তাই—ধুতি চাদর, চাপকান এবং মোজা ক'লার (Collar)।"

এই সময়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। জ্যোতিবাবু মাইকেলের কথায় বলিলেন, "মাইকেল মধুসূদন দত্তমহাশয় তখন আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর খুবই আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুসূদনকে আমার বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রঙ ময়লা, চুলগুলি



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ইংরাজী ফ্যাশানে ছাঁটা বেশ কোঁকড়া কোঁকড়া, মাঝখানে সীঁথি। চোখ দু'টি বড় বড়, চেহারাটী দোহারা। তাঁর গলার আওয়াজ ছিল ভাঙা' ভাঙা'। আমার মনে পড়ে একদিন তিনি তাঁর "মেঘনাদ বধ" কাব্যের পাণ্ডুলিপি তাঁর সেই ভাঙ্গা-গলায় পড়িয়া সারদা বাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও "মেঘনাদ বধ" কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। তাঁর কবিতা পাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটী স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া একটানে বলিয়া যাইতেন, যথা "সম্মুখ—সমরে—পড়ি—বীর—চূড়া—মণি —বীর—বাহু—চলি—যবে—গেলা—যম—পুরে—অকালে—কহহে—দেবী—" ইত্যাদি। যেমন কবি বা যেমন কাব্য তাঁহার কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না। সে আবৃত্তিতে কোনপ্রকার ভাব প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। কিন্তু তিনি অতি সহৃদয়, আমুদে, এবং মজলিশি ব্যক্তি ছিলেন। গল্পগুজবও বেশ করিতে পারিতেন।

"মাইকেল মধুসূদন দত্তমহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁর টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মৎলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন নাই। যে কাযেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, কাব্যখানির উপর তিনি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন; "ব্রজাঙ্গনা" পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাই জানিতে পারিয়া —"ব্রজাঙ্গনা"র সমস্ত স্বত্ব (copy right) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নবাব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রীতি-ভোজ।

দ্বার-রক্ষক কার্ডখানি টেবিলে রাখিয়া কহিল, "মসুঁ বার্ণার্ড জাঁসুলে।"

সজ্জিত কক্ষে আলাপ-রত নর-নারীর দল নামটা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিল। ডাক্তার জেঙ্কিন্স শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। পরে জাঁসুলের হাত ধরিয়া সস্মিত মুখে কক্ষে যখন তিনি পুনঃপ্রবেশ করিলেন, তখন চারিধারে একটা কৌতূহলের ঢেউ ছুটিয়া গেল। জাঁসুলে! এই সেই নবাব—টাকার যাহার অন্ত নাই! পারি সহরটাকে স্বর্ণমুদ্রায় মুড়িয়া ফেলিতে পারে এত যাহার অর্থ। এমন লোকের

পানে কে না চাহিয়া দেখে! মাদাম জেঙ্কিন্স কহিলেন, "আজ যে আমাদের কি অনুগৃহীত করলেন—আমাদের আপনি চিরকালের জন্য কিনে রাখলেন!" গর্ব্বে জেঙ্কিন্সের বুকখানা ফুলিয়া উঠিল—দীপ্ত নেত্রে চারিধারে তিনি একবার চাহিয়া দেখিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ, —সারা পারি বিস্ময়মুগ্ধ চিত্তে যাহার পানে চাহিয়া আছ, এই দেখ, সেই জাঁমুলে—সেই নবাব! সেই নবাব আজ আমার গৃহে অতিথি! আমি তাহার কতখানি প্রীতি-বন্ধুত্বের অধিকারী! নবাবের পিছনে পল স্তে গেরি আসিয়াছিল—তাহার পানে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। গেরি আশ্বস্ত হইল। বিলাস-দর্পের সভায় আপনাকে লইয়া সে কেমন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল—সকলের লোলুপ দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সারা পথ ধরিয়া একটা আদর-অভ্যর্থনার সমারোহ-আশঙ্কা করিয়া সে কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন নবাবের পানেই সকলের বিহ্বল দৃষ্টি সুদৃঢ় দেখিয়া সে যেন একটা অন্তরালের আশ্রয় পাইল। সেই অন্তরাল হইতে পারির সমাজটাকে একবার দেখিয়া লইবার সুযোগ মিলিয়াছে ভাবিয়া সে জুড়াইয়া বাঁচিল।

কৌতূহলের মাত্রা কমিতে না কমিতে আবার একটা তরঙ্গ উঠিল। আর্টিষ্ট ফেলিসিয়া আসিয়াছে। ফেলিসিয়া! ডাক্তার জেঙ্কিন্স আগাইয়া গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। নবাবের সহিত ফেলিসিয়ার পরিচয় করাইয়া দিতেও তিনি কালবিলম্ব করিলেন না। গেরি চাহিয়া দেখে, নবাবের সম্মুখে বসিয়া এক তরুণী। তরুণী অপূর্ব্ব সুন্দরী! শুধু লাবণ্যই অপরূপ নহে,—সে মুখে কেমন-একটা ঔজ্জ্বল্য, সে চোখে স্নিগ্ধ কি-এক দীপ্তি! তরুণীকে দেখিলেই মনে হয়, ইহার মধ্যে অসাধারণ একটা কিছু আছে। গেরি মুগ্ধ নেত্র সরাইতে পারিল না, ফেলিসিয়ার পানেই চাহিয়া রহিল। আশপাশের লোকগুলা জনান্তিকে যে আলোচনার স্রোত বহাইল, তাহা হইতে গেরি জানিল, তরুণী ফেলিসিয়া এখনও কুমারী। গঠন-শিল্পে অদ্ভুত তাহার প্রতিভা! রূপের খ্যাতিও তাহার সমধিক! ফেলিসিয়া নবাবের সহিত কথা কহিতেছিল—কি কথা, তাহা গেরির কানে গেল না। আশপাশের কথাবার্ত্তাগুলাই তাহার কানে ঢুকিতেছিল।

"নবাবের সঙ্গে খুব যে ভাব জমে উঠল! ডিউক যদি এসে দেখতে পায়—"

"ডিউক আসবে না কি?"

"নিশ্চয়। তার জন্যেই ত ভোজের আয়োজন। নবাবের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হল আসল উদ্দেশ্য।"

"হ্যাঁহে, কথাটা ঠিক কি—?"

"কি কথা?"

"এই ডিউক আর ফেলিসিয়ার মধ্যে—"

"তুমি যে আকাশ থেকে নেমে এলে! হুঁঃ—সারা সহর এ খপর জানে—আর গেল একজিবিসনে ফেলিসিয়ার হাতে-গড়া ডিউকের মূর্ত্তিটাও কি চক্ষে দেখনি? সেই থেকেই ত আলাপের সূত্রপাত—!"

"ডচেস্ জানে—!"

"যাক্,—থাম। মাদাম জেঙ্কিন্স গান ধরেছে—শুনতে দাও।" আলোচনা

থামিল। ওদিকে কক্ষ প্লাবিত করিয়া মাদাম জেঙ্কিন্সের সুর-তরঙ্গও উছলিয়া উঠিল। গেরি আরাম পাইয়া বাঁচিল। এইমাত্র যে সকল অপ্রিয় কথাগুলা তাহার কানে গিয়াছিল, সেগুলা আগুনের মতই তাহার প্রাণটাকে তাতাইয়া তুলিয়াছিল। মনে হইতেছিল; তাহার নির্ম্মল চিত্তে এই সকল বর্ব্বর লোকগুলা কুৎসার কাদা ছিটাইয়া দিয়াছে! এই সুন্দরী নারী,—তাহার বিরুদ্ধেও মানুষ এমন কুৎসিত অভিযোগের সৃষ্টি করিতে পারে! হারে পুরুষ!

গেরি একটু সরিয়া গিয়া অন্য চেয়ারে বসিল। তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, কে জানে, আর কাহার বিরুদ্ধে এখনই আবার কি কুৎসার সৃষ্টি হইবে!

মাদাম জেঙ্কিন্স গাহিতে লাগিলেন। মধুর কণ্ঠে উত্থিত কোমল রাগিণী বসন্তের হাওয়ার মতই শ্রোতার মনটাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। নদীর স্রোতের মতই সুরের মূর্চ্ছনা ভাসিয়া চলিল। চারিধারে প্রশংসার মর্ম্মর-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। যখন গান থামিল, গেরির প্রাণটা তখন বেদনায় ভরিয়া উঠিল,—হায় সুন্দর, তুমি এত ক্ষণিকের! জেঙ্কিন্স-দম্পতির প্রতি গেরির একটা শ্রদ্ধার উদয় হইল! কি সুন্দর ইহারা দুইজনে! আহা, সার্থক ইহাদের মিলন! সহসা একটা কথা গেরির কানে গেল—পাশে চাপা গলায় কাহারা কথা কহিতেছিল—

"জানো ত—লোকে কি বলে—মাদাম জেঙ্কিন্স ডাক্তারের স্ত্রী নয়?"

"না হে—পাগল নই। জেঙ্কিন্সের স্ত্রী একজন আছে—সম্পূর্ণ আলাদা জীব! তার সঙ্গে ডাক্তারের দেখা সাক্ষাৎ নেই। সে বেচারী কোথায় কোন্ দেশে পড়ে আছে—তা কেউ জানেও না। তবে ইনি আসল মাদাম নন্—।"

"প্রমাণ—?"

"প্রমাণ আবার কি! চাও? তবে শোন সব—"

কণ্ঠ মৃদুতর হইল। বাকী কথাগুলা গেরির কানে পৌছিল না। না পৌছাক—যেটুকু গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট! গেরির মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মাদাম জেঙ্কিন্স—? এ কি কথা সে শুনিল! এই সুরের উৎস, রূপের রাণী—সে—! মাদাম জেঙ্কিন্স চেয়ার ছাড়িয়া ডাক্তারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার তাঁহার হাতে সুরা-পাত্র তুলিয়া দিলেন। গেরি চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, মাদামের প্রতি জেঙ্কিন্সের ব্যবহারে একটু যেন কৃত্রিমতা আছে! এতক্ষণ তাহা চোখে পড়ে নাই? আশ্চর্য্য! আর মাদামের ভাবেও আশ্রিতার কৃতজ্ঞতা যেন বেশ ফুটিয়া উঠিতেছিল। তবে—তবে কি মাদাম—! গেরি আপনার মনকে চাবুক মারিয়া ফিরাইল,—শাসাইয়া কহিল, "তোমার এ সব আলোচনায় কাজ কি? ওধারে তুমি চাহিয়ো না—" কিন্তু তখনই আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গের আরও দুই চারিটা টুক্‌রা তাহার কানে গেল।

"আমি ত আর চোখে কিছু দেখতে যাইনি। অপরের মুখে যা যেমন শুনেছি, তাই বললুম আর কি! বাঃ—এই যে ব্যারণেস

পারিটাকেই আজ টেনে এনে বাড়ীতে পুরেছে।"

জেঙ্কিন্স ব্যারণেসকে আনিয়া নবাবের পার্শ্বে চেয়ার টানিয়া বসিতে দিলেন। বন্ধু হেমারলিঙের সহিত নবাবের বিরোধ মিটাইয়া দিয়া আবার যদি তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির বাঁধন টানিয়া দেওয়া যায়, ইহাই ছিল জেঙ্কিন্সের উদ্দেশ্য—। নবাব ও হেমারলিঙ্ উভয়েই তাঁহার ধনশালী রোগী—প্রীতির সূত্রে দুইজনকে বাঁধিতে পারিলে তাঁহার পক্ষে লাভের আশাই সমধিক। এ প্রীতির বাঁধনে ধরা দিতে নবাবের অবশ্য এতটুকু অসাধ ছিল না। হেমারলিঙের প্রতি তাঁহার এতটুকু ক্রোধ বা বিদ্বেষ ছিল না। দুইজনের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এই ব্যারণেসের সহিত হেমারলিঙের বিবাহ উপলক্ষ করিয়াই। শুধু এই নারীর জন্যই যা-কিছু বিরোধ। ব্যারণেস ছিল, ভূতপূর্ব্ব বে'র একজন প্রিয়-বাঁদী! হেমারলিঙ কিন্তু নবাবের সহিত পুনর্ম্মিলনের জন্য এতটুকু ব্যগ্র ছিল না।

আজ ব্যারণেসের সঙ্গে আসিয়াছিল, হেমারলিঙের ম্যানেজার লি মার্কার। হেমারলিঙের শরীর সুস্থ নহে, তাই তিনি আসিতে পারেন নাই।

সস্মিত মুখে নবাব উঠিয়া ব্যারণেসকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু প্রত্যভিবাদনের পরিবর্ত্তে ব্যারণেস যে দৃষ্টিতে নবাবের পানে চাহিলেন, তাহাতে যেন আগুন ঠিকরিয়া পড়িল। সে দৃষ্টি যেমন কঠিন, তেমনি অবজ্ঞার। জাঁসুলে মর্ম্মাহত হইয়া সরিয়া [illegible]। জেঙ্কিন্সেরও বুকখানা ছাঁৎ

লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া গেল। নবাবকে, ব্যারণেস এরূপভাবে অবজ্ঞা দেখাইল কেন!

ডাক্তারের একটা সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। হেমারলিঙ নিজে আসিল না। ব্যারণেস নবাবের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিল। যাক! এখন ডিউক আসিলেই হয়। আসিবেন কি না, কে জানে!

এমন সময় রক্ষক আসিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল, "ডিউক"– সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডিউককে অভিবাদন করিল। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ডাক্তার শশব্যস্তে কহিলেন, "এখন অনুমতি দিন—ডিউক বাহাদুর,—নবাব–।" মঁপাভঁ কথাটা শুনিয়া ডিউকের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, "ফেলিসিয়া এসেছে—"

ফেলিসিয়া! ডিউক সতৃষ্ণ নেত্রে সম্মুখে চাহিলেন। ডাক্তারের কথা তাঁহার কানেও পৌঁছিল না। ডাক্তার অপ্রতিভ হইলেন। মঁপাভঁ ডাক্তারের পানে একটা তীব্র কটাক্ষ পাত করিয়া ডিউকের হাত ধরিয়া ফেলিসিয়ার পার্শ্বস্থ আসনে তাঁহাকে বসাইয়া দিল। গেরি উভয়ের পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! এই মাত্র যে কথা সে কানে শুনিয়াছে,—তাহা, তবে—!

ডিউক সস্মিত মুখে কহিলেন, "সেদিন তোমার ওখানে গেছলুম, ফেলিসিয়া—কিন্তু দেখা হল না—"

ফেলিসিয়া কহিল, "আমি সে শুনেছি। আপনি নাকি আমায় ষ্টুডিয়ো ঘরে অবধি গেছলেন?"

"হ্যাঁ—তোমার নতুন পুতুল দেখে এলুম।"

"হাঁ! চমৎকার হচ্ছে। কুকুরটা পাগলের মত ছুটে চলেছে, শেয়ালটাও তেমনি চলেছে—শুধু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তুমি বলেছিলে, আমাদের দুজনের বিষয় নিয়ে গড়ছ—তা—"

ফেলিসিয়া অপ্রতিভভাবে কহিল, "আপনি অর্থ করুন না—"

ডিউক হাসিয়া কহিলেন, "আমার ত মাথায় কোন অর্থ আসেনা কিছু।"

ফেলিসিয়া কহিল, "না, না—ও এক গল্প থেকে ভাবটা নিয়েছি। সেই যে পুরাণো গল্পটা—ব্যাকাসের শেয়ালটা ভারী ছোটে। এমন ছোটে যে কেউ তাকে ধরতে পারে না। ওদিকে ভলকানও তার কুকুরকে এমন শক্তি দিয়েছে যে সে যার পিছনে ছুটবে, তাকে ধরবেই। সে আর না ধরে যায় না। তারপর একদিন ত দুজনের দেখা হয়ে গেল। দুজনেই ছুটতে লাগল—এ দৌড়ের আর শেষ নেই—অনন্তকাল ধরেই দুজনে ছুটচে, অথচ কুকুর শেয়ালকে ধরতে পারচে না। গল্পটা বুঝলেন, ডিউক বাহাদুর? আজ ভাগ্য আমাদেরও দুজনকে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছে—দুজনেই কিন্তু তেজী। ভগবান আপনাকে শক্তি দিয়েছেন, আপনি সমস্ত নারীর হৃদয় জয় করবেন, আর আমারও হৃদয়টাকে এমন গড়ছেন যে সে একেবারে দুর্জ্জয়—কারো হাতে ধরা পড়বে না—কারো কাছে হার মানবে না।"

হাসিতে হাসিতেই ফেলিসিয়া কথাটা বলিয়া গেল। শুনিয়া ডিউকের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্য। তিনিও হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কিন্তু দুজনে এমন অন্ধভাবে ছুটতে থাকলে দেবতাদেরও যে তা দেখে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।"

ফেলিসিয়া কহিল, "তা হলে কি হয়। তাঁরা যেমন গড়েছেন।"

ডিউক কহিলেন "তাঁরা না হয় ভুল করে ফেলেছেন! এ ভুল কি ভাঙ্গবে না—আচ্ছা, এ দৌড়ও কি শেষ হল না?"

"কেন হবে না?"

"কি করে?"

"দেবতারা কুকুর আর শেয়াল, দুটোকেই পাষাণ করে ফেললেন।"

"এইখানে দেবতারা আর এক ভুল করলেন, ফেলিসিয়া। আমার প্রাণটিকে তাঁরা পাষাণ করতে পারচেন না—কখনও না—কিছুতেই না।" ডিউকের চক্ষু হইতে একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। ডিউক চাহিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিককার দৃষ্টি তাঁহাদেরই উপর বিন্যস্ত। তিনি কহিলেন, "না—এ ঠিক হচ্ছে না। লোকে বলতে পারে, তোমায় আমি একচেটে করে ফেলেছি।" ডিউক উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মঁপাভঁ নবাবের হাত ধরিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। ডিউককে উঠিতে দেখিয়া সে কহিল, "আপনার সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি বার্ণার্ড জাঁস্থলে—নবাব বাহাদুর—আর ইনিই ডিউক বাহাদুর।"

ডিউক সানন্দে নবাবের করমর্দ্দন করিলেন।

গেরি অন্তরালে বসিয়া সকলই দেখিতেছিল। নবাবের প্রতি সকলের কি লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহা সে বুঝিল। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য সকলের এ কি

আগ্রহ! আর সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের লোকগুলার জনান্তিকে মৃদুস্বরে টীকা-টিপ্পনী কাটিবার ঘটাই বা কি! মধুকরের গুঞ্জন-ধ্বনির মতই আলোচনা চলিয়াছে—মুহূর্ত্ত বিরাম নাই!

"মঁপাভঁর কাণ্ড দেখলে? নবাবকে চারি পাশ থেকে ছেঁকে ধরেছে। সেদিন পাগানেতির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে,—আজ ডিউকের পালা।"

"বেচারা নবাব! তার টাকার উপর যত জোঁক এসে চেপে বসছে। নবাবকে না খেয়ে আর ছাড়বে না, দেখছি।"

"দোষ কি! নবাবও ত তুর্কিদের শাস খেয়ে এমন ফুলে উঠেছে।"

"কি রকম?"

"কি রকম আবার! ব্যারণ হেমারলিঙের মুখে শোন নি? নবাবের কথা সে সমস্তই জানে। হেমারলিঙ ছিল ওর দোসর।"

কুৎসার বৃষ্টি সুরু হইল। পনেরো বৎসর ধরিয়া এই নবাব বে'র সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। লুণ্ঠনের বিবিধ কৌশল-কাহিনীরও ধারা বহিল। দুই হাজার টাকার এক নর্ত্তকীর ছবি কিনিয়া নবাব তাহা এক লক্ষ টাকায় বে'র হস্তে গছাইয়া দিয়াছে। একখানা সিংহাসন একশত টাকায় কিনিয়া পাঁচ হাজার টাকায় বে'কে বেচিয়াছে। ছোট-খাটো খেলানাগুলা অবধি বে'র হাতে তুলিয়া দিয়া নবাব সেগুলার জন্য রীতিমত চড়া দাম আদায় করিয়া তবে ছাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া য়ুরোপের বাছা বাছা সুন্দরী নারীতে বের হারেম ভরিয়া দিয়া আপনার তহবিল মোটা করিতে নবাব এতটুকু অবহেলা করে নাই! মৃদুস্বরে উচ্চরিত এই সকল কুৎসার বাণীগুলা গেরির প্রাণে বৃশ্চিকের মত দংশন করিতে লাগিল। নিরাশায় ক্ষোভে প্রাণ তাহার জ্বলিয়া উঠিল। রোষে সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু নিস্ফল এ রোষ! এ রোষে কাহারও দেহে এতটুকু আঁচ লাগিবে না! তীব্র দৃষ্টিতে সকলের পানে সে একবার ফিরিয়া চাহিল! মনে হইল, লোকগুলার কাণ ধরিয়া চীৎকার করিয়া সে বলে, "তোরা মিথ্যাবাদী—যে রসনায় অলস কুৎসা ছড়াইতেছিস, সে রসনা তোদের খসিয়া যাক,—দগ্ধ হইয়া যাক্!" কিন্তু সে কথা বলিবার সাহস গেরির নাই! ভোজের আহ্বান পড়িল। সকলে সাগ্রহে উঠিয়া টেবিলের চারিধার ঘেরিয়া বসিয়া গেল।

* * *

"আকাশ পরিষ্কার আছে। চল, হেঁটেই বাড়ী যাই।" গাড়ীকে বিদায় দিয়া গেরির হাত ধরিয়া নবাব হাঁটিয়া চলিলেন।

গেরি ভাবিল, ভালই হইল! রুদ্ধ গৃহে কুৎসার মধ্যে পড়িয়া দেহ তাহার তাতিয়া উঠিয়াছিল। মুক্ত বাতাসে সে শ্রান্তি তাহার ঘুচিয়া যাইবে। রাত্রির স্নিগ্ধ শীতল মৃদু বায়ু-স্পর্শে তাহার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবারও চমৎকার সুযোগ মিলল। এখানে সে সমাজ-নাটকের যে কয়টা দৃশ্যের অভিনয় দেখিল, তাহা যেমন কুৎসিৎ, তেমনই বীভৎস! ইহারই নাম পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ! আর্টিষ্ট ফেলিসিয়া,—এতখানি যাহার প্রতিভার খ্যাতি, ডিউকের হাতে সে একটা খেলার পুতুলমাত্র! আর মাদাম জেঙ্কিন্স? জেঙ্কিন্সের বিবাহিতা স্ত্রী নহে সে!

এত-বড় ডাক্তার,—এতখানি মানসম্ভ্রম যাহার, সে একটা গণিকার সংস্পর্শে সদর্পে মাথা তুলিয়া সমাজে দাঁড়াইয়া আছে! এতটুকু লজ্জা নাই! আর এই নবাব জঁাস্তুগে—ঐশ্বর্য্যের যাহার সীমা নাই, সে একজন নিষ্ঠুর দস্যুমাত্র! গেরির প্রাণে যেন কতকগুলা তপ্ত লোহার শিক্ বিঁধিতেছিল। প্রাণ তাহার জ্বলিয়া খাক্ হইতেছিল। এখান হইতে ছুটিয়া দূরে—কোন্ সুদূরে পলাইতে পারিলে তবে যেন সে বাঁচিতে পারে।

ডিউকের সহিত আলাপ হইয়াছে—সেই আনন্দে আকুল-চিত্ত নবাব পথে চলিয়াছিলেন। গেরির প্রাণে যে ক্ষোভের ঝড় বহিয়াছে, তাহার এতটুকু পরিচয়ও তিনি পাইলেন না। এত সুখ নবাবের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই! এমন সম্মান—এ যে তাঁহার আশার অতীত ছিল! ফেলিসিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়িতে চাহিয়াছে—ডিউক তাঁহাকে আপনার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। নবাবের চিরদিনকার সাধ এতদিনে আজ চরম সার্থকতা লাভ করিতে চলিয়াছে।

নবাবের প্রাণে আনন্দ যেন ধরিতেছে না! দুইজনে পাশাপাশি পথে চলিয়াছে! একজনের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া চলিয়াছে, আর একজন ক্ষোভে জ্বালায় একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ নবাব কহিলেন, "এ কি—এরই মধ্যে বাড়ী এসে গেলুম! এস গেরি, আরও একটু বেড়ানো যাক্!"

গেরি কহিল, "বেশ ত!"

নবাব কহিলেন, "আজকের ভোজটা ভারী জমেছিল। জেঙ্কিন্স খাসা লোক। ফেলিসিয়ার কি রূপ—কি শান্ত স্বভাবটুকু! ডিউককে বেশ দেখলুম। এতটুকু দেমাক নেই! পারি—সুন্দর পারি—কি বল, গেরি?"

গেরি রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমি ত বড় ঘোরাল দেখচি। আমার কেমন আতঙ্ক হয়।"

"আতঙ্ক!" নবাব হাসিলেন; হাসিয়া কহিলেন, "তা মনে হতে পারে। তুমি সবে পাড়াগাঁ থেকে আসছ কি না! থাকো—একমাস যাক্—তখন তুমিও দেখবে, পারি কেমন সুন্দর! আমারও প্রথম প্রথম তোমার মত মনে হত!"

"কিন্তু আপনি না পারিতে আগেও একবার ছিলেন?"

"আমি! না,—কখনও না। কে বললে তোমায়?"

"আমার কেমন মনে হল—"গেরি সহসা থমকিয়া থামিয়া পড়িল, পরে আবার কহিল, "ব্যারণ হেমারলিঙের সঙ্গে আপনার কোন গোল আছে কি? আপনার উপর লোকটার ভারী আক্রোশ!"

হেমারলিঙের নামে নবাবের প্রাণে যেন একটা বাধা লাগিল। আনন্দের স্রোতে কে যেন বিষাদের আবর্জ্জনা ঢালিয়া দিল। নবাব কহিলেন, "হাঁ—আক্রোশ আছে বটে! কিন্তু আমি তার কখনও কোন অনিষ্ট করিনি, বরং ভালই করেছি। যেদিন ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে বেরুই, সেদিন দুজনে আমরা পরস্পরের সঙ্গী ছিলুম—পরস্পরের বন্ধু ছিলুম। আমি তাকে অনেক সাহায্য করেছি। আমিই তাকে টিউনিসে কণ্ট্রাক্টের কাজ পাইয়ে দি—সে কাজ দশ বৎসর চলে।

সেই থেকেই ওর বরাত ফেরে—ও অগাধ টাকার মালিক হয়। তার পর একদিন হেমারলিঙ্‌ বে'র এক বাঁদীর প্রেমে গড়ে—জানাজানি হতে বের মা সে বাঁদীকে হারেম থেকে তাড়িয়ে দেন। বাঁদীটা সুন্দরী ছিল—তার পর ত তাকে বিয়ে করেলে। আর এই বিয়ের জন্যই হেমারলিঙকে টিউনিস ছাড়তে হয়।

"ওদের কে বলে, আমিই নাকি বে'কে বলে ওদের তাড়াবার মন্ত্রণা দিয়েছি। কথাটা কিন্তু ঠিক নয় মোটে। আমিই বরং বেকে বলে কয়ে হেমারলিঙের ছেলেকে—ওর প্রথম স্ত্রী'র গর্ভের ছেলে—টিউনিসে তার বাপের কাজ-কর্ম্ম দেখবার জন্য রাখিয়ে দি। হেমারলিঙ পারিতে চলে আসে—এসে এখানে ব্যাঙ্ক খোলে! আমার সেই উপকার করার দরুণ হেমারলিঙ কিন্তু চূড়ান্ত শোধ নিয়েছে।

"তারপর আহম্মদ বে মারা গেলে তার ভাই মস্তুর বে হল। হেমারলিঙের সঙ্গে তার একটু ভাব ছিল—তিনি লোক মন্দ নন—আমার সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার প্রথমটা খারাপ ছিল না। শেষে হেমারলিঙের কানা-কানি-ভাঙাভাঙিতে আমার উপর তাঁর মন চটে গেল—আমি চলে এলুম। হেমারলিঙ কি এই করেই সন্তুষ্ট রইল—তার স্ত্রীকে দিয়ে যেখানে সেখানে আমার অপমান করে বেড়াত। আজই ত দেখলে,—তার স্ত্রীর ব্যবহার। আমায় কি রকম তাচ্ছল্যটা করলে! যাক্—করুকগে—আমার আর তাতে কি ক্ষতি করবে সে? তবে এ সব দেখে আমার শুধু হাসি পায়!

"এখন শোনো, গেরি—আমার কথা—আমি অনেক কাজ করতে চাই—কারবার ঢের করা গেছে—বিশ বৎসর টাকার জন্য অশ্রান্ত খাটা খেটেছি। এখন আমি যশ চাই, মান চাই, নাম চাই। দেশের ইতিহাসে নিজের নামটা যাতে চিরকালের জন্য লিখিয়ে রেখে যেতে পারি, এমন কাজ আমি করে যেতে চাই। পিছনে এত টাকা—বাধা বিশেষ দেখচি না—শুধু মাথা খাটানো—গেরি—বন্ধু আমার—" নবাবের স্বর জড়িত হইয়া আসিল। গেরির হাত দুইটা সবেগে চাপিয়া ধরিয়া নবাব কহিলেন, "গেরি, তুমি আমার পাশে থাকো—আমার সহায় হও—কখনো আমায় ছেড়ে যেয়ো না। তাহলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

এ আবেগ-ভরা মধুর স্পর্শে গেরির শিরায় শিরায় একটা পুলকের বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। আহা, অসহায় বিপন্ন নবাব—সে আজ আশ্রয় চাহে—নির্ভর চাহে। চক্রান্তময় পারিতে নবাবের হৃদয় বুঝে, এমন লোক কেহ নাই। অর্থটাই সকলের চোখে ঠেকিতেছে—মানুষ নয়! নবাব বন্ধু চাহে—গেরি সে বন্ধুত্ব দান করিবে! সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সে তাহার সহচর থাকিবে! নবাবকে এই লুব্ধ ব্যাধগণের কঠিন পাশ হইতে রক্ষা সে করিবেই! করুণায় গেরির চক্ষে জল আসিল। সে কহিল, "নবাব বাহাদুর, আমি চিরদিন আপনার পাশে থাকব—যতখানি সাধ্য, আমি আপনার সাহায্য করব।" (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ক্যামেরার সাহায্যে বন্যজন্তুর ছবি

মিঃ এ র‍্যাডক্লিফ ডাগমুর ক্যামেরা লইয়া আফ্রিকা মহাপ্রদেশে বৃহৎ বন্যজন্তুর ছবি তুলিতে গিয়াছিলেন। আত্মরক্ষার্থে তাঁহার সহিত বন্দুকও লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জীবিত বন্যজন্তুর ছবি তোলা। সেখানে তিনি অনেকগুলি সুন্দর চিত্র তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফটো তুলিবার প্রণালী হইতে পাঠক পাঠিকাগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, এইরূপ কার্য্য কতদূর বিপজ্জনক, ইহাতে পদে পদে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। এই নূতন রকমের শিকারে একজন সাধারণ শিকারীর অপেক্ষাও বেশী সাহস, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং দক্ষতা থাকা চাই। ডাগমুর সাহেবের কথাই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রায় যাঁহারাই বন্যজন্তুর বিষয় আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সকল দেশের অপেক্ষা ব্রিটীস ইষ্ট আফ্রিকায় অধিকসংখ্যক বিভিন্নপ্রকার বন্যজন্তু পাওয়া যায়। আমিও অনেকদিন হইতে এ বিষয়ের রঞ্জিত বিবরণ শুনিয়া সেই খানে যাইতে মানস করিলাম। ক্যামেরা সঙ্গে লইয়া ১৯০৯ খৃঃ ৩০শে জানুয়ারী বন্ধুর সহিত মোমবাসা হইতে যাত্রা করিলাম। এবং যতই ট্রেনপথে আমরা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম ততই গাড়ীর জানালা হইতেই নানারকমের জন্তু দেখিতে

প্রথম দেশভ্রমণে বাহির হইবার সময়ই এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। আমাদের পথ-চালক হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। যথার্থই অদূরে বিশগজের মধ্যেই সমীরণে আন্দোলিত তৃণরাশির উপর একটি প্রকাণ্ড গণ্ডারের ধূসরবর্ণ পৃষ্ঠদেশ দেখা যাইতেছিল। হঠাৎ ইহা দেখিতে পাইয়াই আমি তাড়াতাড়ি সব প্রস্তুত করিলাম। বন্দুকটি বারুদে ভর্ত্তি করিতে ও ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরা ঠিকঠাক করিতে আমার কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র সময় লাগিল। কিন্তু সেই গণ্ডারটি অতি দ্রুত আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এরূপ একটি প্রকাণ্ড ভারী জন্তু এত দ্রুতগতিতে নড়িতে পারে ইহা চক্ষে না দেখিলে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। সে আমাদের আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। (১নং ছবি) তাহার ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় সে আমাদের নিকট হইতে ১০ গজ দূরে ছিল এবং পর-মুহূর্ত্তেই সে আমাদের দুই গজের মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর দুই তিনবার বন্দুক ছুঁড়িবার পর সে পলাইয়া গেল। সেইদিন এই পর্য্যন্ত।

তারপর আমরা স্বকার্য্যে ব্রতী হইলাম। নানা বিষয় হইতে আমি বিচার করিয়া দেখিলাম যে এ দেশে দিনের বেলা ছবি তোলা আদৌ সুবিধাজনক নহে। অতএব রাত্রেই কার্য্য করিতে সিদ্ধান্ত করিলাম।



১নং চিত্র—গণ্ডার

সাহায্যে ইহাদের ছবি তোলা বড় আমোদ-জনক। এক রকম উপায়ে জন্তুরা নিজেদের ছবি নিজেরাই তোলে, অন্য উপায়ে একজনকে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হয় এবং জন্তুরা নিকটবর্ত্তী হইলেই আলোকরশ্মি ফেলিয়া স্থানটকে আলোকিত করিতে হয়।

আমরা একটি ছোট খালের ধারে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিলাম। সেখানে তাঁবু খাটাইয়া সিংহ ও চিতাবাঘের আকস্মিক আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিলাম। সেইখান হইতেই ছোট খালটি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে রাত্রিকালে বন্যজন্তুরা জল পান করিতে আসে। ইহার একটু দূরে আমরা দুইটি ক্যামেরা লুকাইয়া রাখিয়া দিলাম এবং আলোকরশ্মিরও সবিশেষ বন্দোবস্ত করিলাম।



২নং চিত্র—হরিণের দল

সমস্তই বৈদ্যুতিক বন্দোবস্তের দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন। আমরা সন্ধ্যাকালে আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলাম এবং রাত্রি প্রায় নটার সময় দেখিতে পাইলাম যে কতকগুলি হরিণ আসিতেছে; তাহারা অতীব সাবধানের সহিত অগ্রসর হইল। হয়ত কোন সিংহ তাহাদের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবার জন্য পাহাড়ের ছায়ার মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে পারে সেইজন্য গোল হইয়া দাঁড়াইয়া তাহারা ক্রমশঃ একটু একটু নিকটে আসিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টার বেশী তাহারা সব বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিল। সেই সময় আমাদের উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। তারপর তাহারা ডোবার নিকট অগ্রসর হইয়া জলপান করিতে লাগিল। তখন আর আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। কম্পিতহস্তে আমি কলটি টিপিয়া দিলাম। সমস্ত স্থানটি আলোকিত হইয়া গেল। তাহারা ভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহাদের ফোটোও প্লেটে অঙ্কিত হইয়া গেল। ইহাই আমাদের আলোকের সাহায্যে প্রথম চিত্র (flash-light photo)।

পরবর্ত্তী রাত্রে আমরা হায়েনার (গোবাঘা) ছবি তুলিয়াছিলাম। সেবার কতকগুলি জেব্রা আমাদের সম্মুখীন হইলেও আমরা তাহাদের ছবি তুলিতে পারি নাই। তারপর আমরা তাঁবু উঠাইয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানে এক স্থানে সিংহের অনেক পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া একটি শুষ্ক নদীগর্ভের নিকটেই তাঁবু ফেলিতে মনস্থ করিলাম। প্রথম রজনী, সিংহের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন শুনিয়া আমাদের খুব আমোদ হইয়াছিল। পরদিন একটি সদ্যঃনিহত জেব্রা হইতে প্রায় বারগজ দূরে দুইটি ক্যামেরা স্থাপন করিলাম। রাত্রিতে বিশেষ কিছুই ঘটিল না। পরবর্ত্তী রাত্রে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল।

রাত্রি নয়টার কিছুপরে একটা কৃষ্ণবর্ণ আকৃতি হঠাৎ আমার চক্ষুর সম্মুখে উদিত হইল। কোথা হইতে ইহা আসিল তাহা আমি আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা যথার্থই একটা প্রকাণ্ড সিংহ! সে জেব্রার পার্শ্বে পাথরের প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। (৩নং ছবি)



৩ নং চিত্র—জেব্রার পার্শ্বে সিংহ

আফ্রিকার সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর জন্তু এবং এই পশুরাজকে বার গজ দূর হইতে আমাদের দিকে তাকাইতে দেখিয়া ভয়ে আমাদের প্রাণ শুকাইয়া গেল। সিংহ আমাদের উপর লাফাইলে আমাদের পলায়নের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভয়ে ও উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে আমি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কলটি টিপিয়া দিলাম। ম্যাজিকের ন্যায়, সমস্ত স্থানটি আলোকিত হইয়া গেল। এবং তৎক্ষণাৎ ক্যামেরার মধ্যস্থিত প্লেটে সিংহের ছবি অঙ্কিত হইয়া গেল। সিংহও পলায়ন করিল। পরে পুনর্ব্বার আলোর বন্দোবস্ত করিয়া ও প্লেট বদলাইয়া অপর সিংহের আগমনের জন্য বসিয়া রহিলাম। অন্ততঃ পাঁচটী সিংহ আমাদের আশে পাশে বিচরণ করিলেও কেহই আর নিকটে আসিল না। রাত্রিতে আর কোন বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটিল না। ভোরের বেলা তাঁবুতে ফিরিয়া গিয়া প্লেটগুলি হইতে ছবি তুলিয়া দেখিলাম যে ছবি বেশ স্পষ্ট উঠিয়াছে।

একদিন দিনের বেলা একটি সিংহের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল। আমি তখন হরিণদের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম। অদৃষ্টজোরে আমি সেই সিংহের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। আমার গুলিতে আহত হইয়া সে ঝোপের মধ্যে চলিয়া গেল।

টানা নদীর তীরে সিন্ধুঘোটকের ছবি তুলিবার জন্য আমরা অগ্রসর হইলাম। রাত্রিতে আলোকের সাহায্যে তাহাদের ছবি তুলিতে অসমর্থ হইয়া একদিন অপরাহ্নে দেখিতে পাইলাম যে, নদীর মধ্যে একটি পাহাড়ের উপর অনেকগুলি সিন্ধুঘোটক নিদ্রিত রহিয়াছে। এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক, জলে শান্তভাবে বিশ্রাম করিতেছে। এইরূপ একটি দৃশ্য দেখিবার জন্য আমরা আটদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিলাম। পরদিন বেলা দুইটার কিছু পরে আমরা পুনর্ব্বার সেই পর্ব্বতের নিকট জন্তুদের দেখিতে পাইলাম; তখন তাহারা সংখ্যাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তখন ভাবনা হইল কি রকমে তাহাদের নিকট যাওয়া যাইতে পারে। তাহারা বড়ই লাজুক জন্তু এবং তাহাদের ঘ্রাণশক্তিও খুব তীব্র। ধীরে ধীরে পা টিপিয়া যাইয়া, যেখানে জন্তুরা ছিল, আমরা তাহার বিপরীত তীরে উপস্থিত হইলাম। এবং যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত আমি ক্যামেরাটিকে যথাস্থানে স্থাপন করিলাম তাহাতে তাহারা আদৌ ভীত হইল না। তাহারা প্রায় ৮০ কিম্বা ১০০ গজ দূরে ছিল। একটি বৃদ্ধ সিন্ধুঘোটক ক্যামারাটি



৪নং চিত্র—বৃদ্ধ সিন্ধুঘোটক

দেখিতে আসিল। (৪নং ছবি) ! আমি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের নানাপ্রকার ছবি তুলিলাম। এমন সুবিধা আমাদের ভাগ্যে খুব কমই ঘটিয়াছিল। (৫নং ছবি)। ঐ জন্তুদের পিঠের উপর যে পাখীরা বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা তাহাদের পিঠের জোঁক ধরিয়া খায় এইরূপ অনেকের ধারণা।

একদিন একটি মৃত ভুক্তাবশিষ্ট মৃগ দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া মনে হইল যে গতরাত্রে সে নিহত হইয়াছে। আমরা সন্ধ্যার সময় সব ঠিকঠাক করিয়া সিংহের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। আমরা মৃত জন্তুটি হইতে দশগজ দূরে ছিলাম। ইহাপেক্ষা দূরে থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম



৫নং চিত্র—সিন্ধুঘোটক

না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে না আসিতে আমরা অদূরে তৃণগুল্মের মধ্যে অস্ফুট খস্‌খস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবং শীঘ্রই কত্র সিংহের লঘু ছায়াকৃতি দেখিতে পাইলাম। তারপর অপর দিকে আর একটি সিংহ উপস্থিত হইল। এবং তারপর আর একটি। তিনটী সিংহই আমাদের নিকট হইতে ১৫গজ দূরে ছিল। আমি বৈদ্যুতিক



৬নং চিত্র—মৃতজন্তুর পার্শ্বে সিংহী

যন্ত্রের কলটি টিপিয়া দিলাম। আলোকরশ্মি দেখিয়া সিংহেরা গর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আমরা তাহাদের মধ্যে একটি সিংহের ফটো তুলিয়া লইলাম। কিছুক্ষণ পরে বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে দেখিতে পাইলাম যে একটি সিংহী মৃতজন্তুর পাশে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। আমি বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তাহার ফটো তুলিয়া লইলাম। (৬নং ছবি)।

আমাদের আফ্রিকা ত্যাগের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। পরে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য চিত্র তুলি নাই। কিন্তু সেই কয়মাসের স্মৃতিচিত্র চিরদিনের জন্য আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া আছে।”

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভিজিগাপত্তম

আমরা ভিজিগাপত্তমের যাত্রী। রেলের গাড়ীতে ব'সে প্রকৃতির শোভা দেখে দিনটা বেশ আরামে কেটে গেল। এই পাহাড় গাছ পালা—এই নদনদী তড়াগ; মুহুর্মুহু নবনব দৃশ্যের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান! প্রকৃতি দেবীর এই রকম লুকোচুরী খেলা দেখতে দেখতে অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় আমরা গম্যস্থানে এসে পড়লেম।

আমাদের বাড়ীটি ছোট খাট দোতলা; বারান্দার নীচেই বড় রাস্তা—রাস্তার পরেই সমুদ্র। বারাণ্ডায় বসে আমরা সমুদ্রের মাতামাতি এবং রাস্তার লোকচলাচল—এই দুই-ই দেখতে পাই।

শুনা যায় ডাচরা সর্ব্ব প্রথম এ দেশ জয় ক'রে নিয়ে, এখানে বসবাস আরম্ভ করে। এখন অবশ্য এ অঞ্চলও ইংরাজের অধিকার ভুক্ত। এই বাড়ীর চারি ধারেই বহু ডাচ পরিবার খোলার বাড়ীতে বাস করছে। আমরা ঘরে বসে তাদের সমুদ্র-স্নান দেখতে পাই। জ্যোৎস্নারাতে ১০টার সময়ও কোন কোন দিন তারা সমুদ্রে নামে; মেমদের মিহি গলার দিনের বেলা অনেক সাহেবমেম জলকেলী করেন,—কিন্তু গলার স্বর এমন শোনা যায় না।

এখানে হিন্দুতীর্থ বেশী নেই, একটি উঁচু পাহাড়ের উপর রাজা নরসিংহ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। অনেক সিঁড়ি পার হয়ে তবে এই পাহাড়-তীর্থে উঠতে হয়। আমাদের একটি আত্মীয় একবার সেখানে উঠতে গিয়ে ভারী বিপদে পড়েছিলেন, তাই আমি আর আমার সদ্যঃ রোগমুক্ত দুর্ব্বল আত্মীয়াটিকে নিয়ে সেখানে যেতে সাহস পেলেম না। কিন্তু তীর্থদর্শনপুণ্য যে একেবারেই অদৃষ্টে ঘটেনি তা নয়। একটি ছোট পাহাড়ের উপর মুসলমানদের একটি মসজিদ্ আছে আমরা সেখানে একদিন গিয়েছিলেম। এটি একটি পীরের আস্তানা—রেলিং ঘেরা তিন চার হাত স্থান ধূপধুনা ও ফুলগন্ধে ভরপুর। বলা বাহুল্য এখানে কোন মূর্ত্তি নেই। মুসলমানগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই শূন্য মন্দিরে এসে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করে। জানি না, একজন হিন্দুর মনে এই দৃশ্যে কি ভাবের উদয় হয়—আমার মন ত এই দৃশ্যে সেই

ভরে উঠেছিল। আসল কথা, ভগবান সকলের মধ্যেই বিরাজমান্. গঠিত মূর্ত্তিতে যে ভক্তির উচ্ছ্বাস তাহা কেবল আশৈশব-শিক্ষা সংস্কার মাত্র।

আমরা একদিন রোমান-কাথলিকের গির্জ্জা দেখতে গিয়েছিলেম। সেদিন তাঁদের একটা উৎসব দিন।—শোভাযাত্রা ক'রে সকলে গির্জ্জায় প্রবেশ করছিলেন। আমরাও তাদের সঙ্গ গ্রহণ করলেম।

প্রথম শ্রেণীতে পোপ, তাঁর সঙ্গে বড় মাদাররা, তারপর পদমর্য্যাদা অনুসারে অন্যান্য সকলে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেচে; সব শেষে দেশী খৃশ্চান মেয়ে পুরুষ সেজেগুজে ছোট ছেলেদের নিয়ে তাদের অনুবর্ত্তী। পাহাড়ের উপর গির্জ্জাটি নির্ম্মিত—উপরে মুক্ত স্বচ্ছ নীলাকাশ—নীচে তরঙ্গায়িত সমুদ্র—বড়ই মনোরম স্থান! গির্জ্জার মধ্যে সাড়ীওড়নায় সুসজ্জিতা মেরীর প্রতিমূর্ত্তি। তাঁর সম্মুখে বড় বড় মোমবাতী আর পায়ের কাছে কাপড়ের ও মোমের ফুলের স্তূপ। এত ভিড় হয়ে গেল যে আমরা ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলেম না কি পড়া হচ্চিল। বাহির থেকে অল্প অল্প শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু বোঝা গেল না। আমরা প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেম; নীচের তিন দিকে সমুদ্র একদিকে পাহাড়ের শ্রেণীর মধ্যে ছোট সহরটিকে যেন প্রকৃতি দেবী নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছেন। কত লোক বাতি হাতে করে মেরী-মাতার নিকট মানৎ করতে যাচ্ছে দেখলেম। কারও মানৎ আমার ছেলে কি স্বামী ভাল হোক্ তোমাকে জোড়া বাতী দেব, যার দুট বাতি দিতে সাধ্য নেই সে বলছে একটা বাতি দেব। রোমান কাথলিকরা ঠিক আমাদের মতই মূর্ত্তি পূজা করে এবং মেরীদেবীর নিকট মানৎ করে থাকে। তবুও আমরাই শুধু পৌত্তলিক! তফাতের মধ্যে দেখলেম—ওরা বাতি মানৎ করে; মেরীর ঘর আলোতে উজ্জ্বল করে তুলে তাঁকে আনন্দ দেয়, এবং আমাদের করালবদনা রক্তপিপাসু কালীকে বড় বড় মহিষ ছাগল বলি দিয়ে পিপাসা নিবৃত্তি করাতে হয়। নানেরা (Nun) দেখলুম দু চারজনে মিলে হাঁটু গেড়ে বসে কেউ ক্রাইষ্টের ছবির কাছে, কেউ মেরীর মূর্ত্তির কাছে বসে একমনে প্রার্থনা করছেন। ভক্তি জিনিষটায় এমনই মাহাত্ম্য—যে করুক বা যার কাছেই করুক—দেখলেই মনে ভক্তি ভাবের উদয় হয়! উৎসব শেষ হবার আগেই আমরা চলে এলেম।

এখানে বিকাল বেলাটা আমরা সমুদ্র-তীরে বেড়াতে যাই। আর দুপুর বেলাটা যত খেলানাওয়ালা বিক্রিওয়ালারা এসে আমাদের ব্যাপৃত রাখে।

চন্দন কাঠের বাক্স, কলমদানী, কচ্ছপের বড় বড় খোলা, নানান্ রকম শিং এই সব জিনিষে তারা ঘর ভরিয়ে ফেলে। মনের মতন জিনিস হলে কোন দিন আমরা কিনি; কোন দিন কিনবনা বল্লেও তারা সব সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকে। সাতারজি নামে ওদের মধ্যে একজন লোক আছে সে বাবুদের বেশ বশ করে নিয়েছে। লোকটা বেশ চালাক বুদ্ধিমান, তার কাছে কিছু কিনতেই হয়!

যে ডাচদের কথা বলেছি তাদের একটি পরিবার আমাদের পাশের বাড়ীতে বাস করে। সাহেবটি একদিন আপনি এসে বাবুদের সঙ্গে ভাব করলে, আমাদের

বাঙ্গালা খাবার তার খেতে ভারি ইচ্ছে, তাই এসে আপনার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল; তাকে একদিন মাংস লুচি মালপোয়া পাঁপর ইত্যাদি অনেক রকম খাবার করে খাওয়ালেম। বেশ ত তারিফ করে খেলে; কিন্তু আসলে ভাল লাগল কি না কে জানে! তার মেমটি বড় ভালমানুষ; অনেক গুলি ছোট ছেলে মেয়ে তার;—আমাকে তারা গ্র্যানী গ্রানী করে ডাকে। কিছু খাবার দিলে ভারি খুসি হয়ে খায়।

এখানকার সূর্য্যচন্দ্রোদয় দৃশ্য কি চমৎকার! মনে হয় সমুদ্রদেবতা যেন সূর্য্যচন্দ্রকে বক্ষের মধ্য হতে বার করে হাত দিয়ে ধরে আকাশে উঠিয়ে দিচ্ছেন। সৃষ্টির যত কিছু মহীয়সী মহিমায় বিশ্ব যেন তখন মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠে। আমাদের বাড়ী যাবার সময় প্রায় হয়ে এল, আনন্দই হচ্ছে, কেবল এই দৃশ্য থেকে আপনাকে ছিন্ন করতে একটা বেদনা অনুভব করছি।

শ্রীসৌদামিনী দেবী।

পিয়ানোর গান

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্‌টুক্ তুলতুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্ ফুল?
টুক্‌টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য।
টুক্‌টুক্ পদ্ম
লক্ষ্মীর সদ্ম
নয় তার দুই পা'র
আলতার মূল্য।
টুক্ টুক্ টুক্ ঠোঁট
নয় শিউলীর বোঁট
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
নয় বস্‌রাই গুল।
ঝিল্‌মিল্ ঝিক্‌মিক্
ঝিক্‌মিক্ ঝিল্‌মিল্
পুষ্পের মঞ্জীল্
তার তন্ তার দিল্।

তার তন্ তার মন-
ফাল্গুন্-ফুল্-বন
কৈশোর-যৌবন
সন্ধির পত্তন।
চোখ্ তার চঞ্চল;—
এই চোখ উৎসুক
এই চোখ বিহ্বল
ঘুমু-ঘুম সুখ্-সুখ্!
এই চোখ জ্বল্-জ্বল্
টল্ টল্ ঢল্ ঢল্
নাই তীর নাই তল,
এই চোখ ছল্ ছল্!
জ্যো'স্নায় নাই বাঁধ
এই চাঁদ উন্মাদ
এই মন উন্মন
তন্ময় এই চাঁদ।
এই গায় কোন্ সুর
এই ধায় কোন্ দূর
কোন্ বায় ফুর ফুর
কোন্ স্বপ্নের পুর!

গান—তার গুন্ গুন্,
মঞ্জীর রুণ্ রুণ্,
বোল্—তার ফিস্ ফিস্,
চুল তার মিশ্ মিশ্।
সেই মোর বুল্ বুল্,—
নাই তার পিঞ্জর,—
চঞ্চল চুল্‌বুল্
পাখনায় নির্ভর।
পাখ্‌নায় নাই ফাঁস্
মন তার নয় দাস,
নীড় তার মোর বুক,—
এই মোর—এই সুখ।

প্রেম তার বিশ্বাস
প্রেম তার বিত্ত
প্রেম তার নিশ্বাস
প্রেম তার নিত্য।
তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
তার তুল্ কার মুখ?
তার তুল্ কোন্ ফুল?
বিল্‌কুল্ তুল্ তুল্
টুক্ টুক্ বিল্‌কুল্
এল্-বস্‌রাই গুল্!
দেল্-রোশ্‌নাই ফুল!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শোক সংবাদ

রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

গত ৫ই জুন, রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৭৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন;—এ সংবাদ আমরা মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি। শৌরীন্দ্রমোহন ধনীর সন্তান হইয়া, জীবন কেবল ভোগবিলাসে কাটাইয়া যান নাই;—দেশ এবং দেশবাসীর গৌরব ও কল্যাণসূচক কর্ম্ম তিনি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

লুপ্তপ্রায় হিন্দুসঙ্গীতকলা দেশের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলাই ছিল শৌরীন্দ্রমোহনের জীবনের একান্ত সাধনা। যাঁহারা তাঁহার সংশ্রবে একবার আসিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে হিন্দুসঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কি অসাধারণ ছিল,—সারা

সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন—প্রাচীন শাস্ত্র সাগর যেন একা একহাতে মন্থন করিয়াছেন।

সঙ্গীতবিদ্যা দেশময় যাহাতে বিস্তার লাভ করে তাহার জন্য তাঁহার কি না উৎসাহ ছিল। নিজের তত্ত্বাবধানে সঙ্গীতবিদ্যালয় খুলিয়া তিনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; যে সমস্ত প্রাচীন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এখনকার লোকের জানা নাই এমন অনেক যন্ত্র তিনি পুনঃনির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেন—এবং অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন; সঙ্গীতবিদ্যা যাহাতে সহজে, বিনা ওস্তাদের সাহায্যে আয়ত্তাধীন হয় তজ্জন্য তিনি বিবিধ গ্রন্থ রচনাও করিয়াছিলেন;—এক্ষেত্রে আমাদের দেশে তিনিই একরূপ অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব" "যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা"

সঙ্গীত-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। "সঙ্গীত সার সংগ্রহ" নামে তাঁহার সংগ্রহ-পুস্তকখানি একটি অমূল্য জিনিস।

শৌরীন্দ্রমোহন দেশ-বিদেশ হইতে নানা সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি, খেতাব, খেলাত প্রভৃতির তালিকা করিতে গেলে প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া পড়ে। সভ্যজগতে এমন দেশ বোধ হয় অল্পই আছে যেখান হইতে কোনো না কোনোরূপ সম্মান তিনি লাভ না করিয়াছেন। ইউরোপ আমেরিকার তো কথাই নাই; প্রাচ্য দেশের নানা স্থানের নানা উপাধি তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। পারস্য, চীন, তুর্কী প্রভৃতি স্থান হইতে উপাধিসম্ভার আসিয়াছিল। দেশদেশান্তরের সঙ্গীত-সমাজ তাঁহাকে বরমাল্যে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের গৌরবস্বরূপ।

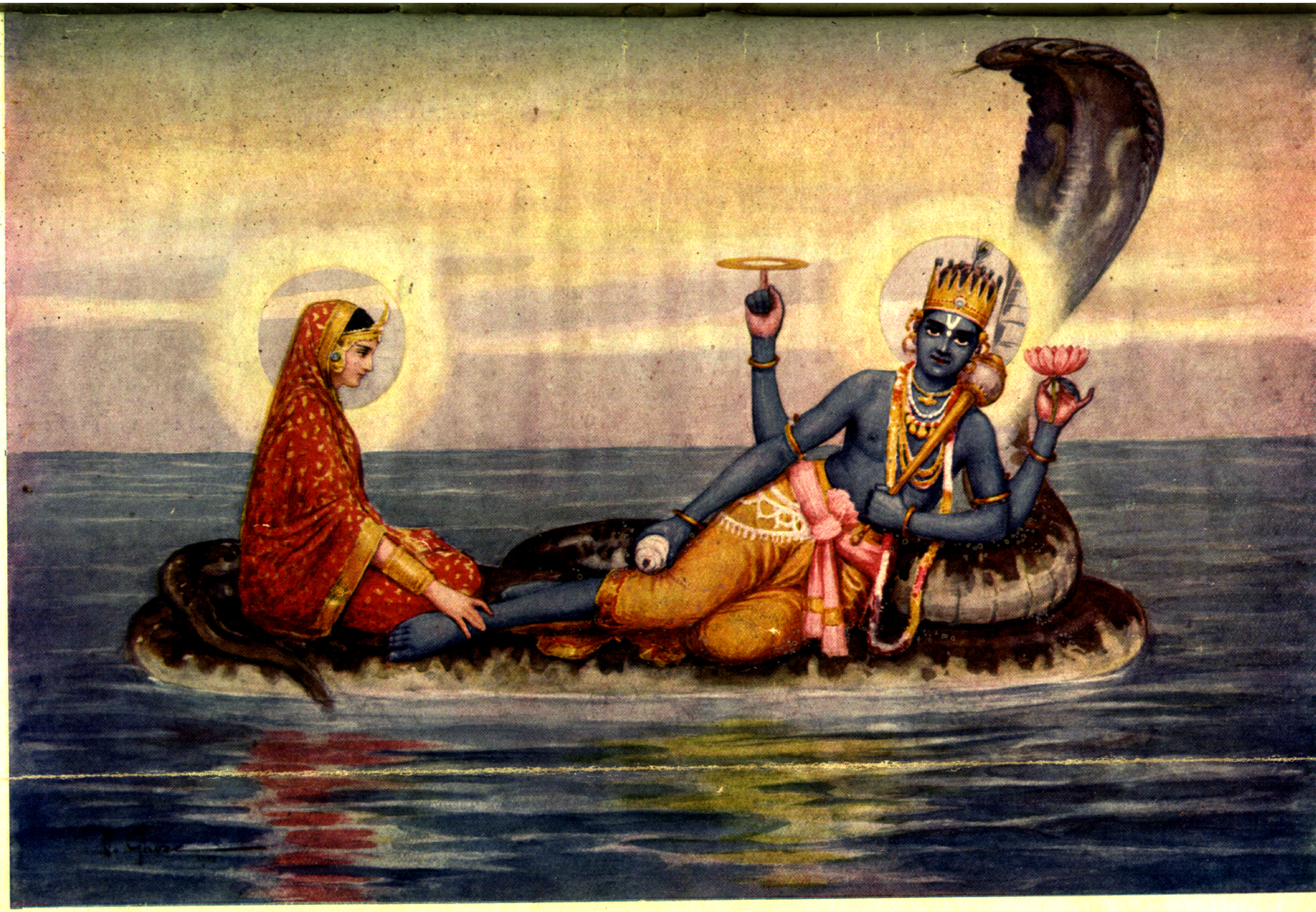
শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গদর্শন-সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা সাতিশয় দুঃখিত। শৈলেশচন্দ্র বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রচার করিয়া মাসিকসাহিত্যের পুষ্টিবিধান করিয়াছিলেন ইহা বলাই বাহুল্য। নানা বিপদ ও অসুবিধার বাধা তুচ্ছ করিয়া তিনি এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গদর্শন চালাইয়া আসিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকপদ পরিত্যাগ করিলে শৈলেশচন্দ্র স্বয়ং সেই ভার গ্রহণ করেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি সে ভার ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল। শৈলেশচন্দ্র ছোটো গল্প লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের পাঠকদের অবিদিত নাই। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।



রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ

শেষশায়ী নারায়ণ

ভারতী

৩৮-শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২১ [৪র্থ সংখ্যা

ষড়ঙ্গ দর্শন

রস, ছন্দ, রূপ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ—চিত্রের আপাদমস্তক এই অষ্টাঙ্গকে আমরা এতক্ষণ আমাদের দিক দিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম; এখন এই চিত্রসম্বন্ধে আমাদের চিন্তার প্রতিধ্বনি আর কোনো প্রাচ্যশিল্পে পাই কি না দেখা কর্ত্তব্য। প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে জাপান-শিল্প এখন জগতের নিকট সুবিদিত এবং তাহার সমস্ত চিন্তাটুকু প্রাচীনতর চীন-শিল্পের দ্বারাই অনুপ্রাণিত সুতরাং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রথমেই দেখা যাক্ রস বলিতে আমরা কি বুঝি এবং জাপানই বা কি বোঝেন। আমাদের আলঙ্কারিকগণ রসকে বলিতেছেন—'ব্রহ্মস্বাদমিব অনুভাবয়ন্'—যেন বৃহতের আস্বাদ দিয়া তাবৎকে বড় করিয়া তুলিয়া রহিয়াছে যে মহৎ আস্বাদ তাহাই রস।

জাপান এই রসকে বলিতেছেন—Ki In... that indefinable somthing which in every great work suggests elevation of sentiment, nobility of soul.

[On the Laws of Japanese Painting by Henry P Bowie. Page 83.]

কাব্য-প্রকাশ-প্রণেতা মম্মট, রসকে বলিয়াছেন "স চ ন কার্য্য নাপি জ্ঞাপ্য।" তাঁহার মতে রস আপনাকে অনুভব করায়;—"পুরইব পরিস্ফুরন্, হৃদয়মিব প্রবিশন্, সর্ব্বাঙ্গীনমিব আলিঙ্গন্ অন্তৎ সর্ব্বমিব তিরোদধৎ।" জাপানেরও Ki In অথবা রস সম্বন্ধে Bowie সাহেব বলিতেছেন যথা—

"From the earliest times the great art-writers of China and Japan have declared that this quality...can neither be imparted nor acquired (স চ ন কার্য্য নাপি জ্ঞাপ্য) It is...akin to what the Romans meant by Divinus—Afflatus that Divine and Vital breath...which vivifies...the work and renders it immortal. (হৃদয়মিব প্রবিশন্ ইত্যাদি) (Vide Page 43. On the Laws of Japanese Painting)

ছন্দকে আমাদের অভিধানে বলা হইয়াছে

"আহ্লাদয়তি ইতি";—ইনি হ্লাদিত করেন, ইনি হ্লাদিনীশক্তি।

"সত্ত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
বর্ণা ভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রম্ নানাবিধং যথা॥"

(পঞ্চদশী, ভূতবিবেকঃ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শ্লোক ৫৯)

স্বভাবত বর্ণহীন-ভিত্তিতে সঙ্গত হইয়া, বর্ণসকল ভিত্তিটিকে যেমন নানারূপে চিত্রিত করিতেছে, তেমনি স্বভাবত নিষ্ক্রিয় যে সৎ তাঁহাতে সঙ্গত হইয়া শক্তি তাঁহাকে বিক্রিয়া দিতেছেন। কাজেই দেখিতেছি, হ্লাদিনী যে শক্তি তিনি,—একদিকে গতি বা মুক্তি, আর-একদিকে স্থিতি বা বন্ধন,—দুই পারের এই দুই আলিঙ্গনে সৎ যে তাঁহাকে দোলা দিয়া বিক্রিয়া দিতেছেন। "হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর।" সৎ-যে-বস্তুটি স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়, তিনি হ্লাদিনী-শক্তির সচেতন আলিঙ্গন পাইয়া চিৎ এবং আনন্দরূপে নন্দিত হইয়া উঠিতেছেন বা ছন্দিত হইতেছেন।

জাপানের শিল্পাচার্য্য স্বর্গগত ওকাকুরা চীনষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গটির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা এই ছন্দ বা হ্লাদিনী শক্তিকেই বুঝাইতেছে; যথা—

Ch'i-Yun Sheng-Tung. "The life movement of the spirit through the Rhythm of things...the great mood of the universe (সৎ) moving hither and thither amidst the harmonic laws of matter (হ্লাদিন্যা সম্বিৎ) which are Rhythm.

Spirit বা প্রাণে সঙ্গত হইয়া যে শক্তি বিক্রিয়া (movement) রচনা করে তাহাই হইতেছে ছন্দ বা হ্লাদিনীশক্তি। এক কথায় বলিতে গেলে ছন্দ বা হ্লাদিনীশক্তি প্রাণের (Spirit) স্পন্দন—Life movement of the spirit। এই ছন্দকে জাপানিরা কহেন Sei do (ছন্দ, ছাঁদ)—

"...This is one of the marvellous secrets of Japanese painting handed down from the great Chinese painters (?) and based on psychological principles—matter responsive to mind,......

এই ছন্দ বা হ্লাদিনী শক্তির প্রয়োগ চিত্রে কি ভাবে করিতে হইবে যথা—

...Should he depict the sea-coast with its cliffs and moving waters, at the moment of putting the wave-bound rocks into the picture he must feel that they ary placed there to resist the fiercest movement of the Ocean, while to the waves in turn he must give an irresistible power to carry all before them; thus by this sentiment called living movement (Sei do) reality is imparted to the inanimate object.

[On the Laws of Japanese Painting by Henry. P. Bowie Page 78.]

চিত্রকরের নিকট Sei do বা ছন্দশক্তির কার্য্য এই ভাবে ধরা দিতেছে, যথাঃ—অন্তরের দ্বারা বাহির,—বা মনোগত যাহা তাহার দ্বারা বস্তু-রূপটি অনুরণিত হইতেছে। পর্ব্বতটি যখন লিখিতেছি তখন পর্ব্বতের দৃঢ়তা, স্থিরতা মনে আনিয়া—এককথায় ছন্দের স্থিতির দিকটিকেই মনে ধরিয়া লিখিতেছি। আবার যখন তরঙ্গভঙ্গ লিখিতেছি তখন লিখিতেছি স্থিতির বিপরীত ছন্দের যে গতির দিক তাহাকেই মনে ধরিয়া লিখিতেছি।

'ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্ভপর্য্যন্তাঃ প্রাণীনোঽত্র জড়া অপি।
উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ'॥

(পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, শ্লোক ৫)

আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত কি জীব, কি জড় উত্তমাধমভাবে যে যাহার যথাস্থান অধিকার করিয়া আছে—চিত্রপটে নানাবিধ সামগ্রী যে ভাবে সজ্জিত থাকে।"

চীন-ষড়ঙ্গের পঞ্চম অঙ্গটির যে অনুবাদ ফরাসী পণ্ডিত পেৎরুচি (Petrucci) এবং বিলাতের বিনিয়ান্ (Binyon) সাহেব দিয়াছেন তাহা পঞ্চদশীর চিত্রদীপের এই পঞ্চম শ্লোকটির অবিকল প্রতিধ্বনি যথা :—

"Dispoeser les lignes!et leur attribuer leur place hi'erarchique.

(La philosophic de la Nature daus l'art de l' extreme orient—Petrucei. page 89)

'Composition and subordination or grouping according to the hierarchy of things (L. Binyon. The flight of the Dragon. Page 12)

বেদান্তদর্শনের এই চিন্তাটি চীন-ষড়ঙ্গের মধ্যে কোন্-কালে কি-ভাবে প্রবেশ লাভ করিল তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

আমাদের ঋষিগণ বলিয়াছেন যে রূপের ধর্ম্মই হচ্ছে, প্রতিবিম্বিত হওয়া, কল্পিত হওয়া, ছন্দিত হওয়া এবং ছায়াতপে প্রকাশিত হওয়া, যেমন :—

'যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে,
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।"
(কঠোপনিষদ্)

আত্মাতে দর্পনস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায়, পিতৃলোকে স্বপ্ন-দৃষ্টের ন্যায়, গন্ধর্ব্বলোকে যেন জলের কম্পনের উপরে এবং আমাদের এই ব্রহ্মলোকে ছায়া এবং আতপ এতদুভয়ের বৈষম্য দিয়া।

অনুরূপ ভাবটি ব্যক্ত করিতেছে জাপানের Sha I যথা :—

They paint what they feel rather than what they see, but they first see very distinctly (আত্মাতে প্রতিবিম্বিতবৎ). It ;is the artistic impression (Sha I) which they strive to perpetuate in their work.

(Page 8 on the Laws of Japanese painting by Henry P Bowie)

আত্মাতে প্রতিবিম্বিত না দেখা পর্য্যন্ত রূপকে সম্পূর্ণ বোধ করা অথবা প্রকাশ করা অসম্ভব;—ইহা জাপানও বলিতেছেন, আমাদের ঋষিগণও বলিয়া গিয়াছেন।

'ছায়া তপয়োরিব ব্রহ্মলোকে'—রূপ প্রকাশ পাইতেছে ছায়াতপের বৈষম্য দিয়া, যেমন—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে,
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যোঽভি-
চাকশীতি।'

দুই সুন্দর পক্ষী—শ্বেত, কৃষ্ণ,—জাগ্রত, ঘুমন্ত—যেন ছায়াতপের মত একত্র বাস করিতেছে। একটি পক্ষী ফল আস্বাদ করিতেছে, গান গাহিতেছে, অন্যটি চুপ্‌চাপ্ বসিয়া তাহা দেখিতেছে। জীবাত্মা পরমাত্মা, (spirit and matter) আকার নিরাকার, রূপ ও অরূপ—এই দুয়ের সমতা ও বৈষম্যতা ব্যক্ত করিতেছে ভারতের উল্লিখিত যে সনাতন চিন্তাগুলি তাহার ঠিক প্রতিধ্বনি দিতেছে জাপান-চিত্রশিল্পের In yo মন্ত্রটি, যথা :—

In yo......requires that there should be in every painting the sentiment of active and passive, light and shade (ছায়াতপ)... The term In yo originated in the earliest

always existed in the art language of the Orient. (?) It signifies darkness (In. ছায়া) and light (yo, আতপ) negative and positive, female and male (প্রকৃতি পুরুষ) passive and active (যেমন 'স্বাহ্‌র্পণা') lower and upper (উত্তমাধম) even and odd......Two flying crows one with its beak closed, the other with its beak open (?)......or two dragons one ascending to the sky, the other descending to the ocean—illustrate the phases of In yo, (vide Page 48 on the Laws of Japanese painting by Henry P. Bowie)

আমাদের ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ 'প্রমাণানি' (correct, perception, proportion measure and structure of forms) ও চীনষড়ঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ (anatomical structure) যে সাধারণভাবে মিলিতেছে তাহা নয়। চীন ও জাপান চিত্রশিল্পে এই প্রমাপ্রয়োগের পুংখানুপুংখ উপদেশগুলিও যেন প্রমাসম্বন্ধে আমাদের চিন্তাগুলির প্রতিধ্বনি দিতেছে। প্রমা অর্থে আমরা বুঝিতেছি কোনো বস্তুর ভ্রমভিন্ন-জ্ঞান—তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদির পরিমাণ। জাপান শিল্পের Ichi Isho এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি দিতেছে যথা :—

Ichi and Isho......they aim to supply and express with sobriety what is essential to the composition, proportion (Ichi) determining the just arrangement and distribution of the component parts, and design (Isho) the manner in which the same shall he handled. (Vide page 46. on the laws of Japanese painting by H. P. Bowie)

প্রমাণ বা প্রমা যে কেবল বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বোঝায় তাহা নয়, প্রমা দ্বারা আমরা বস্তুর দূরত্ব এবং নৈকট্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হই। চীন-শিল্পশাস্ত্রে এই দূরত্ব ও নৈকট্য বুঝাইবার নীতিটিকে বলা হইয়াছে :—

En kin......So for as the perspective is concerned, in the great treatise of Chu Kaishu entitled the "Poppy Garden Art Conversation" a work laying down the fundamental laws of landscape painting, artists are specially warned against disregarding the principle of perspective called En Kin, meaning what is far and what is near (Vide Page 8. on the Laws of Japanese painting by Henry P Bowie)

আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হইতেছে যথা—

"শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যন্ত্ববরম্‌ স্মৃতম্‌"।

(কাব্যপ্রকাশ, প্রথম উল্লাস)

চিত্রমাত্রেই অবর,—কি শব্দচিত্র, কি বাচ্যচিত্র—যদি তাহাতে ব্যঙ্গ্য না থাকে ঈঙ্গিৎ না থাকে। জাপানী শিল্পশাস্ত্রে ব্যঙ্গকে বলা হইয়াছে :—Yu Kashi......such suggestion or stimulation of the imagination is called Yu Kashi. The Japanese painter is early taught the value of suppression in design. (Vide Page 47 on the Laws of Japanese painting by Henry P. Bowie)

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে আমাদের বেদান্ত উপনিষদ্‌ প্রভৃতির গভীরতম সূক্ষ্মতম চিন্তাগুলির প্রতিধ্বনি দিতেছে চীনের ও জাপানের চিত্রসম্বন্ধে ষড়দর্শন। নানা দিক দিয়া ভারতে ও চীনে যেরূপ যোগাযোগ দেখা যায় তাহাতে আমার বোধ হয় যে বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মের সঙ্গে ভারতের চতুঃষষ্টিকলা ও আলেখ্যের এই ষড়ঙ্গটি চীনে নীত হইয়াছিল।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও ভারতের দশাবিপর্য্যয়

(Dela Mazeliereএর ফরাসী হইতে)

মোগল-আমলের ভারতীয় সভ্যতার স্থূল রেখাগুলি ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিরূপে এই সভ্যতার দ্রুত অধঃপতন হইল এক্ষণে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

দুইটি মূল তত্ত্বের উপর মোগল-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল।

প্রথম, কেন্দ্রগত শাসন-প্রণালী :—ঔরংজেব দাক্ষিণাপথের সমস্ত রাজ্যগুলিকে বশীভূত করিয়া উহাদিগকে রাজধানীরূপ কেন্দ্রের শাসনাধীনে আনিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিংশতি বর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ, এই রাজ্যগুলিকে, মোগল-সাম্রাজ্যকে, এবং সেই সঙ্গে মুসলমান আধিপত্যকেও বিধ্বস্ত করিল।

দ্বিতীয়, হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে মিলন :—ঔরংজেবের উৎপীড়নে পূর্ব্ব-বিদ্বেষ পুনরুত্তেজিত হইল। যথেচ্ছাচারী ঔরংজেব, আক্‌বারের কার্য্য বিধ্বস্ত করিলেন; তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, এই রাষ্ট্রনীতির পরিণাম স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইল।

কেন্দ্রগত শক্তির দুর্ব্বলতা।—উত্তরাধিকারের নিয়ম অনিশ্চিত। ইহা হইতেই ষড়যন্ত্র, বেগম মহলের বিবাদ বিসম্বাদ, হত্যাকাণ্ড, বিদ্রোহ। অনেকগুলি মোগল সম্রাট গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। তন্মধ্যে একজনের (১৭১২) প্রাণদণ্ড হয়, আর একজনের চক্ষু-উৎপাটন করা হয়, আর তাহাকে বেত্রের দ্বারা প্রহার করা হয়। প্রকৃত প্রভুত্ব সেই নির্লজ্জ ভ্যাগ্যান্বেষী ওয়াকীলদিগের হস্তে ছিল; তাহারা স্বীয় শত্রুদিগের প্রাণবধ করিত, একই জায়গীরগুলি পুনঃ পুনঃ বিক্রয় করিত, রাজকোষ ও প্রজাদিগের ধন লুণ্ঠন করিত; প্রায়ই উহারা শিশু-সম্রাটদিগকে রাজ-সিংহাসনে বসাইত। এক বৎসরের মধ্যে (১৭২০) এইরূপ তিনজনকে বসাইয়াছিল।

সামন্ত শ্রেণীর শাসনকর্ত্তাদিগের ক্রমশঃ স্বাধীনতা লাভ।—দুইজন বড় বড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন—তন্মধ্যে একজন হাইদ্রাবাদের নিজাম (১৭২০—৪৮), আর একজন—অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা (১৭৩২—৪৩)। বাঙ্গালার ও কার্ণাটিকের নবাবেরাও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে। মহীশূরের রাজাও স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু অচিরাৎ হাইদর আলি নামক এক ভাগ্যান্বেষী মুসলমানের হস্তে নিপতিত হন। এই হাইদর-আলির পুত্র টিপু-সুলতান (১৮৮২—৯৯) দাক্ষিণাত্যের একজন প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতি হইয়া উঠেন।

মধ্য-এসিয়া হইতে বিজয়াভিযান।—মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনে, মধ্য-এসিয়ার দস্যুরা আবার ভারত আক্রমণ করিল।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারসীকেরা ক্রোড় ক্রোড় টাকা লুটিয়া লইয়া যায়। পরে ১৭৩৯ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ—ইহার মধ্যে আফগানেরা সমস্ত পশ্চিম প্রদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করে—একটি বৃক্ষ, একটি জীবজন্তু, একটি অধিবাসী মনুষ্যও রাখিয়া যায় নাই!

***

হিন্দুদিগের বিদ্রোহ।—অপরিসীম শৌর্য্য-বীর্য্য সত্ত্বেও রাজদূতগণ ঔরংজেবের কামান ও নিয়ন্ত্রিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আরও দুইবার পরাজিত হয়। শেষে সামন্তযুগের প্রায় অন্তিমদশা উপস্থিত হইল।

অশ্বারোহী যোদ্ধৃ-সঙ্ঘের পর, গণ-সঙ্ঘের আবির্ভাব হইল। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে,—পরে, মধ্য-ভারতে মারাঠারা প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক, কৃষিকার্য্য শেষ করিয়াই উহারা লাঙ্গল ছাড়িয়া ঘোটক-পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিত এবং মুসলমান-দিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িত, সেকেলে পলিতা-বন্দুক হইতে গুলি ছুঁড়িত। শিবাজি নামক এক রাজপুত সেই সকল মারাঠার দলকে একত্র করিয়া তাহাদের রাজা হইয়া বসিল। কিন্তু বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করা দূরে থাকুক, শিবাজী কখন ঔরংজেবকে কখনবা দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদিগকে সাহায্য করিতে লাগিল এবং সেই সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ, বিস্তৃত ভূমিখণ্ড প্রাপ্ত হইল।

শিবাজীর অক্ষম উত্তরাধিকারিগণ, স্বকীয় প্রভুত্ব ব্রাহ্মণ মন্ত্রিদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিল। এই ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ পেশোয়া নাম ধারণ করিয়া পুণা-নগরে এক কুলানুক্রমিক রাজবংশ স্থাপন করিল। রাজা, কোন এক অপ্রধান রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন, পেশোয়া মারাঠা দলসঙ্ঘের দলপতি হইয়া দাঁড়াইল। এই মারাঠা-দলসঙ্ঘ সমস্ত মধ্য-ভারত জয় করিয়া সেখানে চারিটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিল। এই রাজবংশ নীচশ্রেণীর ভাগ্যান্বেষী জনপ্রসূত।

কেননা, এই মারাঠারা কৃষক ছিল—ইতরসাধারণ লোক ছিল, এবং তাহারা বরাবর এই ইতর সাধারণের ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। এই গণতন্ত্রী লোকদিগের সৈন্যমণ্ডলীও গণমণ্ডলীর অনুরূপ ছিল।

প্রথম আরম্ভকালে এই কৃষকের দল, যে সকল ঘোড়া তাহাদের ক্ষেতের কাজে লাগিত সেই সব ঘোড়ায় চড়িত ও বাঁশের বল্লম ব্যবহার করিত। কিছুকাল পরে তাহাদের রীতিমত অশ্বারোহী সৈন্য হইল, নিজ নিজ দলের লোকেরা তাহার খর্চ্চা যোগাইত। ক্রমে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হইল, মাথার পাগড়ী হইল,—পাগড়ীর ছুঁচাল অংশ পশ্চাৎ দিকে হেলানো; খাটো কোর্ত্তা, আঁটসাট পায়জামা—তাহার দ্বারা জঙ্ঘা আচ্ছাদিত; আর পাদুকা;—ইহাই তাহাদের সৈনিক পরিচ্ছদ হইল। তাহারা দাড়ী রাখিত। প্রথমে তাহাদের শুধু ঢাল তলোয়ার ছিল, পরে বন্দুক। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, য়ুরোপীয় শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক গঠিত, এই মারাঠা সৈন্য, প্রবল তোপ কামানে সুসজ্জিত হইয়াছিল। এবং যদিও পাণিপথের প্রথম সম্মুখ-যুদ্ধে (১৭৬১) নব-গঠিত মারাঠা-পদাতিক সৈন্য, লৌহ বর্ম্মাবৃত দীর্ঘকায় আফগানদিগের কর্ত্তৃক

নিষ্পেষিত হয়,—তথাপি এই মারাঠা সৈন্য অচিরাৎ শত্রুদিগকে আবার আক্রমণ করিয়া সমস্ত উত্তর-ভারতকে বশীভূত করে। তাহাদের সেনাপতি সিন্ধিয়া এই সময়কার একজন বিষম দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি। একজন চাষার জারজ পুত্র এই দলপতি মারাঠা, সিন্ধিয়া নামক এক শাখা-জাতির প্রভু হইয়া পড়িল। ইনিই শেষে গোয়ালিয়ারের রাজা হইলেন। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি নির্ব্বাসিত মোগল সম্রাটকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন; আবার ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট ইঁহারই হস্তে সমস্ত প্রভুত্ব ছাড়িয়া দেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। তাহার পর দিল্লি ইংরাজের অধিকারে আইসে।

দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রগণ।—পঞ্জাবে, প্রাচীন জেঠজাতির বংশধর শিখেরা, নানক ও শিখ-গুরুদিগের ভক্ত হইয়া উঠিল। দশম ও শেষ-গুরু গোবিন্দ শা (১৭০৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়) মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং খাল্‌সা বা ঈশ্বরের সৈন্যমণ্ডলী নামে এক সামরিক মিলন-সঙ্ঘ সংঘটন করেন। লাহোরের প্রথম রাজা রণজিৎ সিংহের অধীনে শিখদিগের বিভিন্ন শাখাজাতি, অবশেষে পঞ্জাব, কাশ্মীর ও সমস্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রভু হইয়া দাঁড়াইল (১৭৪০—১৮০১)।

সেখানেও, দশ শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের পর, হিন্দুরাই মুসলমানদিগের উপর জয় লাভ

***

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের চিত্রটি সম্পূর্ণ করিতে হইলে, য়ুরোপীয়দিগের দিগ্‌বিজয় ও ষড়যন্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক; পোর্ত্তুগী, দেনেমার, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী। দুপ্লে কর্ত্তৃক দক্ষিণাত্যে, ও ক্লাইভ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে কতকগুলি রাজ্য স্থাপিত হইল। জমি আবাদ করিবার জন্য, বানিজ্য করিবার জন্য, রাজাদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য, এবং তাহাদের সৈন্যপরিচালনা করিবার জন্য—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে কতকগুলি ভাগ্যান্বেষী আসিয়াছিল; তুর্ক-ফৌজ, আফগান-ফৌজ, আরব-ফৌজ, এমন কি কাফ্রি-ফৌজও ছিল। দস্যুদল ছিল, ঠগের দল ছিল;—এই ঠগেরা বণিক-দল বা যাত্রী-দলের-সহিত মিশিয়া রাত্রিকালে উহাদিগের গলায় ফাঁস লাগাইয়া হত্যা করিত। হসমের বর্ণনা অনুসারে—মুসলমান-নগর-গুলিতে, লোকের রীতি-নীতি সৌখীন ও মনোরম ছিল; তাহাদের সাহিত্যচর্চ্চা আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বারাণসীর ন্যায় খাস হিন্দুনগর-গুলিতে, যাত্রীর দল বিকটাকার বিগ্রহাদির পদতলে আসিয়া সমবেত হইত, চিতাগ্নিতে সতীদাহ হইত। দুঃখ কষ্টের পরিসীমা ছিল না; রাজাদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ চলিত; অসৎ রাজকর্ম্মচারিদিগের অত্যাচারে প্রজারা নিপীড়িত, করভারে ভারাক্রান্ত। জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী। যে সময়ে বাবর মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, সে সময় অপেক্ষা ভারতের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া

পঞ্চদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দী।—ইহার মধ্যবর্ত্তী কালের ভারতীয় ইতিহাসের স্থূল রেখাগুলি নির্দ্দেশ করিতেছি। মোগলেরা সমস্ত ভারতকে বশীভূত করিয়াছিল; এই দ্বিতীয়বার ভারত স্বকীয় ঐক্যসাধন প্রত্যক্ষ করিল। কিন্তু এই ঐক্যসাধনের কার্য্যটি অতীব ক্ষণস্থায়ী; যে রাজবংশের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মভাবের বিরুদ্ধ সেই রাজবংশের শাসনাধীনে, বিজিত বিজেতার মধ্যে মিলন না হইলে, সাম্রাজ্য স্থাপন করা অসম্ভব। তাই মিলনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু এই মিলন স্থায়ী হইল না; সাম্রাজ্য অন্তর্হিত হইল; ভারতে আবার অরাজকতা উপস্থিত হইল।

ভারতের ঐক্যসাধনের এই দ্বিতীয় চেষ্টার পরিণাম প্রথম-চেষ্টার পরিণাম হইতে ভিন্নপ্রকারের। অশোকের দিগ্‌বিজয়, অশোকের রাজ্যশাসন,—সমস্ত ভারতের উপর ভারতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ভারতকে নৈতিক ঐক্য প্রদান করিয়াছিল। মধ্যযুগে, মুসলমানদিগের অধিষ্ঠান, বৈরী জাতিসমূহের ও সম্প্রদায়সমূহের সংগঠন—প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মনৈতিক একতা চূর্ণ করিয়া দিল। তখন হইতে হিন্দুরা সেই য়ুরোপীয়দিগের সভ্যতা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল—যে য়ুরোপীয়েরা, অশোক ও আকবর যাহা পারে নাই সেই কার্য্যসাধনে সফলতা লাভ করে। এইরূপে, মধ্যযুগের শেষভাগে য়ুরোপের ন্যায় ভারতেও কেন্দ্রগত রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু ইহা একটা আগন্তুক ঘটনা মাত্র। ষোড়শ শতাব্দীসুলভ জ্বলন্ত উৎসাহের ভাব, সপ্তদশ শতাব্দীসুলভ প্রাচীন আদর্শগত "ক্ল্যাসিক" ভাব, অষ্টাদশ শতাব্দী সুলভ কৌতূহলের ভাব ভারতেও পরিলক্ষিত হয়;—কিন্তু সমস্ত রূপান্তরিত আকারে। শেষে রহিয়া গেল সামন্ততন্ত্রসুলভ আচার-ব্যবহার, জাতিভেদ প্রণালী, হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের আধিপত্য।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তোমাময়

তোমার মধুর কণ্ঠের গীতি
বাজিছে আমার কর্ণে,
বিশ্ব-প্রকৃতি তোমারি মূরতি
এঁকেছে সপ্ত-বর্ণে।
তোমার হৃদয়-ছায়াটী আমার
পড়েছে মানস-কক্ষে;

তোমারি উজল নয়ন-জ্যোতিটি
লেগেছে আমার চক্ষে।
তোমারি সৃজিত কুসুম আমারে
আকুল করেছে গন্ধে,
তোমাময় হ'য়ে, তাই বীণা মোর
গাহিছে তোমারি ছন্দে।

শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কর্ণেল আবে্ প্রেভস্ট যখন সম্পূর্ণ চেতনা লাভ করলেন, দিন তখন কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে ;—দিন-সারথি সূর্য্যদেব ধূসর-নীল আকাশের অনেকখানি পথ অতিক্রম করে গিয়েছেন। প্রেভস্ট বহুক্ষণ আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন, মন তখন তাঁর পশ্চাৎ-গতি অবলম্বন ক'রে, অতীতের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। নিকলেট নামটি, বহুবার তারি মুখে শোনা গানটি, তিনি আবার শুন্‌তে পেয়েছিলেন সে কথা তাঁর মনে পড়ছিল, কিন্তু সে গান এখানে আর কে জান্‌তে পারে ? সেখানে তিনি একা না আরও কেউ আছে ? যা শুনেছেন মনে করছিলেন, সেটা তাঁর কল্পনা না সত্য ? —সে কথা জানবার জন্যে তাঁর মন উৎসুক হয়ে উঠেছিল। বাঁদিকে মাথা সরালেন, দেখলেন—চারিদিকেই বিবর্ণ বরফে ঘেরা, ঘাড় সরাতে গিয়ে দেখলেন—তাঁর শরীরের অন্তদিক হ'তে একটী সঙ্কীর্ণ রক্তধারা প্রায় ছয় ফুট দূরে হ্রদের জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

এবারে তিনি বুঝতে পারলেন, ফরাসী আর্টিলারী, কামানের গোলাতে জমাট বরফ ভেঙ্গে দিয়েছিল, তারি একখণ্ডের উপর তিনি পড়ে আছেন ; তিনি আহত, চলৎ-শক্তি-রহিত, ডিসেম্বর দিনের দারুণ শীতে, জলের মধ্যে ভেসে চলেছেন। আপন অবস্থা বুঝতে পেরে, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ বারম্বার কেঁপে উঠতে লাগল ; পাগলের মত চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন—ক্লেমঁা আমার কাছে এস, ক্লেমঁা কোথায় তুমি ? তাঁর স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হলো, কাছে হতেই আর-একজন কে নিকলেটের নাম উচ্চারণ করে সেই প্রতিধ্বনির উত্তর কর্‌লে।

এই নামটির বারম্বার উচ্চারণ, ক্ষতস্থানে শলাকা প্রবেশের মত তাঁর পক্ষে নিতান্তই পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল—তাঁর মনে হতে লাগল—এ তাঁর আসন্ন মৃত্যুকালের মানসিক ভ্রান্তি। আবার একবার মনে হ'ল—নিকলেট সত্যই বুঝি পুরাতন দিনের নিকলেটের মত চটুল গমনে, মন-পাগল-করা হাসি হেসে, এখনি তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হবে, অথচ সেই তখনকার মতই কি সে এমন কাছে কখনই আসবেন না, যে তিনি তাঁকে ধরতে ছুঁতে পারেন ? দুর্লভ স্বপ্নের মত, সে কি কেবলি তাঁর আয়ত্তের অতীত হয়ে থাকবে ? বুকের পকেটের কাছে একবার হাত দিয়ে বল্লেন হায় ! তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, নিকলেটের ছবি খানি তাঁর হৃৎপিণ্ডের নিতান্ত সন্নিকট স্থানটুকু অধিকার করে আর নেই,—রুষ-রাজধানীর প্রধান নর্ত্তকী, সুন্দরী নিকলেট, যেদিন সহসা অন্তর্ধান হলেন, ছবিখানিও সেই দিন হতে স্থানচ্যুত হয়েছিল, সে শূন্যতা আর পূর্ণ হয়নি—তবু স্থিরনিশ্চয় হবার জন্য আর একবার তিনি বেশ মনোযোগের সঙ্গে খুঁজে দেখলেন।

ছবির পরিবর্ত্তে ব্রাণ্ডির ছোট শিশিটি তাঁর হাতে ঠেক্‌ল। সেটি আঁকড়ে ধরে, তারপর আপন অজ্ঞাতেই সেটিকে বা'র করে, মুখে সেই তীব্র মাদক-পানীয় বিন্দু কতক ঢেলে দিলেন। দেহে নূতন-বল-সঞ্চার অনুভব কর্‌লেন, কোনরূপে উঠে বস্‌লেন— এমন করে একলা, সকলের অজ্ঞাতে, মর্‌লে ত চলবে না—সম্রাটের অন্ততঃ জানা আবশ্যক তাঁর এমন সেনা-নায়ক কোথা গেল—তার কি হল। আর কেউ আসুক নাই আসুক, ক্রেমা নিশ্চয়ই তাঁকে একবার খুঁজতে আস্‌বেই, এ কথা ভেবে তাঁর মনে আবার আশা ফিরে এল, সাহস প্রবল হ'ল, এতক্ষণ যা কর্‌তে তাঁর একেবারেই ভরসা হয়নি, এবারে তাই কর্‌লেন—সম্মুখে চেয়ে দেখলেন, দৃষ্টি স্থির করতে কিছুক্ষণ সময় গেল—যখন সে সামর্থ্য হ'ল তখন দেখ্‌লেন, সম্মুখের সাদা জমাট বরফ রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে গিয়েছে, ক্রমে সব কথা তাঁর বোধগম্য হ'ল—কেন যে তিনি চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে একভাবে মাটীতে প'ড়ে আছেন সে কথা বুঝতে বাকী রইল না, তাঁর পায়ের হাঁটুর নীচের অংশ কামানের গোলায় উড়ে গেছে, বরফের ঐকান্তিক হিমে, ক্ষতস্থানের রক্তপাত বন্ধ হ'য়ে যাওয়াতেই তিনি এখনও জীবিত আছেন—"চিরকালের মত অক্ষম খোঁড়া—হেক্টর আব্লে প্রেভষ্ট, পরমুখাপেক্ষী দুর্ব্বল অসহায় খোঁড়া।"

ধীরে ধীরে অন্যদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, সে দিককার ভাসমান তুষারখণ্ড অধিকতর প্রশস্ত, তারি উপরে প্রায় বিশ ফুট দূরে যেন একটী কালো পোষাকের বোচকা পড়ে আছে মনে হ'ল। হেক্টর ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই নিস্পন্দ বস্তুটিকে বারবার দেখতে লাগলেন, তারপর আপন মনে বল্লেন—"আর একজন আমারি মত আহত হতভাগ্য! হায় বিধাতা, কে ও?" সেই জনশূন্য যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরি মত আর একজনকে দেখে তাঁর ভরসা হল, হয়ত জীবনরক্ষার কোন উপায় হতে পারে। সমদুঃখীর আরো কাছে যাবার জন্যে স্বভাবতই তাঁর মনে আগ্রহ জন্মাল। যুদ্ধের সময় প্রায়ই দেখা যায় সৈনিকেরা আপন পার্শ্বচরের কাছ ঘেঁষে এম্নিভাবে দাঁড়ায়। হেক্টর সরবার চেষ্টা করলেন, আহত স্থানে অসহ্য বেদনা বোধ হইতে লাগল। একটু স'রে, আবার কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন; কেননা এই চেষ্টাতেই যে কষ্ট হল তা'তে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্বিগুণ বেড়ে গেল, সমস্ত শরীর স্বেদধারায় আর্দ্র হ'য়ে উঠ্‌লো। সূর্য্যের তীব্র-কিরণ তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করছিল, শ্বেতজমাট তুষারের উপর তীব্র আলোকের অভিঘাতে, চারিদিক যেরূপ অসহ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাতে চোক চেয়ে থাকা আর সম্ভবপর ছিল না। তাঁকে এম্নি নিশ্চল ভাবে পড়ে থাক্‌তে দেখে, হঠাৎ একটা শিকারী পাখী মাথার উপর ঘুরে ঘুরে উড়্‌তে লাগ্‌ল, একবার প্রায় মুখের উপর এসে পড়্‌ল। তারপর তীক্ষ্ণ সুরে চীৎকার করতে করতে, আবার উপরে উড়ে চলে গেল। হেক্টর তার উড়ে যাওয়া একদৃষ্টে দেখ্‌তে লাগলেন, মনে ভাবলেন পাখীটা বুঝি কোন সক্ষম সবল পুরুষকে তাঁর সঙ্কটের খবর দিতে গেল। তারপর

আপন উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার কথা মনে করে হাস্‌লেন, বল্লেন—"পাগল হ'য়ে গেলাম নাকি ?" আবার দূরে সেই কাপড়ের বোচকার দিকে চেয়ে দেখলেন—আশা হচ্ছিল, তার কাছে যেতে পারলে—তার সঙ্গ পেলে নিজের বুদ্ধি স্থির রাখ্‌তে পারবেন। হঠাৎ আবার আশঙ্কা হল, বোচকাটি বোধ হয় শুধু কারো ছাড়া কাপড়ের রাশ, বস্ত্রমাত্র—জীবিত মানুষ নয়। কিন্তু কাপড়ের পুঁটলিটির আকারের ক্রমে পরিবর্ত্তন হ'ল, তখন আর সন্দেহ রইল না ; যে সেটি জড়পদার্থ নয়, সজীব প্রাণী।

হেক্টর তখন চীৎকার করে ডাক্‌তে লাগলেন, বন্ধু ওগো বন্ধু! এ আহ্বানের কোনো উত্তর পেলেন না। পাঁচ মিনিট, তারপর দশ মিনিট অতীত হ'য়ে গেল, হেক্টর সেই নিশ্চল কাপড়ের রাশির উপর আপন দৃষ্টি সমাহিত করে বসে রইলেন—ক্রমে সেটি নড়্‌তে আরম্ভ করলে, একখানি হাত উপরে উঠ্‌ল, উপরকার লম্বা কোটটি সরে গিয়ে পরণের মেষ-লোমের পরিচ্ছদ দৃষ্টিগোচর হল—হেক্টর দেখ্‌লেন এ তাঁর বহুদিনের পরিচিত রুষ নোবল গার্ডসদের পরিচ্ছদ ; তবে ত তাঁরি পুরাতন কোন সঙ্গীর সঙ্গে একত্রে তুষার ক্ষেত্রের উপর রাত্রি যাপন করেছেন! এই সঙ্গীই কি সারারাত ভ'রে নিকলেটকে নাম ধরে ডেকেছে, থেকে থেকে ব্যাকুল কণ্ঠে তারি গান গেয়েছে ? হেক্টর দাঁতে দাঁতে চেপে, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লেন—বোঝা গেছে, এ তবে সেই! তার পর আবার ভাবলেন বোরিস ভিন্ন, তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে আরো অনেকে নিকলেটকে জানত, আডাম-ভক্তি তার গান গাইত ; ক্ষুদ্র শিবরেফ তার গান জানত—সাধারণ সৈনিকেরা পর্য্যন্ত সে গান কতবার গেয়েছে। রুষ-সম্রাটের প্রকাণ্ড রাজধানী, সেই গানের মধুরধ্বনিতে কতবার প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, তার কি আর ঠিক আছে ? কিন্তু এ ব্যক্তি তাদের মধ্যে কোন্ জন ; গলা বাড়িয়ে দিয়ে হেক্টর বারম্বার সেটা নিরূপণ করিবার চেষ্টা করলেন, কেবলি ভাব্‌তে লাগলেন এ কে ? কে বলে দেবে—এ কে ? আরও কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল—এক নিমেষ যেন তাঁর কাছে এক একটি যুগ বলে মনে হতে লাগল, রূঢ় কণ্ঠে বল্লেন—নিকলেট, নিকলেট। আপন পায়ের দিকে চেয়ে দেখলেন—উঠে যাবার শক্তি তাঁর নেই অথচ এ সংশয় আর সহ্য হয় না, যেমন করেই হউক জানা আবশ্যক, এ নির্জ্জন দেশে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গীটি কে ? অসহ্য ব্যথা সহ্য করে, নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে, তিনি গড়াতে গড়াতে মরতে মরতে, একবার শেষবার জানবার চেষ্টা করবেন যে, এ ব্যক্তি বোরিস্ কি না ? এ চেষ্টার ফল যা হবে তা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন, নড়্‌তে গেলেই তাঁর ক্ষত স্থানের মুখ খুলে যাবে—রক্ত বন্ধ করবার কোন উপায় করা সম্ভব হবে না—অবিলম্বে তিনি মারা যাবেন। এ কাজ করবেন কি ? মৃত্যুভয় তাঁর ছিল না। তবে যে তাঁর শত্রু তার জন্যে, মৃত্যুকে বরণ করবেন কি ? আবার কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে রইলেন—ব্রাণ্ডি যেটুকু খেয়েছিলেন তারি তেজে আর কোন শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভব করছিলেন না। এইবার—

সে কতক্ষণের পর, রুষসৈনিক হাত দুখানি মাথার উপর তুলে, আকাশের দিকে মুখ করে শুলেন। হেক্টর দেখতে না পেলেও, বুঝতে পারলেন, তার চোক দুটী খোলা রয়েছে এতক্ষণের পর তার সংজ্ঞা হয়েছে।

হেক্টর চীৎকার করে প্রথমে ফরাসী তার পর রুষ ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন—ওখানে ও কে? কে গো তুমি কে? এবারেও কোন উত্তর এল না, রুষ-সৈনিক আবার একটু নড়ে চড়ে স্থির হলেন, হেক্টর আবিষ্টভাবে তাকে দেখতে লাগলেন; তাঁর নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর হয়ে উঠল। যাকে দেখেছিলেন সে ক্রমে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে উঠে বস্‌ল—সেই ভাবেই স্থির হয়ে রইল;—হেক্টর তার মুখ দেখতে পেলেন না, কেন না সে তাঁর দিকে পিঠ ফিরে বসে ছিল। হেক্টর চীৎকার করে বল্লেন, আরে জন্তু, তুই যদি রাজকুমার বোরিস হ'স, তা হ'লে আমার দিকে মুখ করে ফিরে বো'স্‌।

যে ব্যক্তির উদ্দেশে কথাগুলি বলা হ'ল, তাঁর নীলবর্ণ বনাতে সোনালি কাজকরা পোষাক; বৃষ্টি বরফ পড়ে জরিতে কালী ধরেছে, হেক্টরের দিকে পিঠ ফিরে বসে ছিলেন; মাথা নীচু, পিঠ নুয়ে পড়েছিল, তবুও সেই আহত পৃষ্ঠখানির ব্যবধান যেন হেক্টরের চোখের সম্মুখে আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত আলোক ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করে, চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঞ্চয় করে, মুখের মধ্যে গোঁফ টেনে নিয়ে, চিবতে চিবতে, হেক্টর আপন পিস্তল খুঁজতে লাগলেন—কোথায় পিস্তল,—নেই! শত্রুর দেখা পাবা না, এই বড় আপশোষ হ'ল; তবুও এ কাজ যে করবেন এমন কথা পূর্ব্বে কখনো ভাবেন নি। পিস্তল গেছে, তলওয়ারখানা তখনও ছিল, ভাঙ্গা কোমরবন্ধ হতে সেখানি আস্তে আস্তে বা'র করলেন, ধার পরীক্ষা করে দেখলেন—তলওয়ারের মুখ পড়ে গেছে, চারি দিকে মরচে ধরেচে—দেখে শুনে খুলে সেখানি পাশে রাখলেন। হঠাৎ আবার বাতাস আরম্ভ হল—চারিদিক্‌ হ'তে গুঁড়ো বরফ ঝেঁটিয়ে নিয়ে ছড়াতে লাগল, হেক্টরের চোখে মুখে সেই তুষার ধূলি প্রবেশ করে; তাকে অন্ধপ্রায় করে দিলে, সর্ব্বাঙ্গে এম্নি জোরে আঘাত করলে, যে, তিনি সহসা একেবারে সোজা হয়ে উঠে বসলেন, আপন পায়ের দিকে চেয়ে রইলেন—সম্মুখের জলস্রোত, ঊর্দ্ধে নীল-আকাশের দিকে দেখলেন—তার পরে আপনার বাঁদিকে চাইলেন—সেই খানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়ে রইল—কতদিন কোন যুগ যুগান্তর পরে, হেক্টর আবেনে প্রেভষ্ট আর প্রিন্স বোরিস একে অপরকে দেখলেন। সে জমাট বরফক্ষেত্রে তাঁরা দুজন ভিন্ন আর কেহই হয়ত বেঁচে ছিল না। হেক্টরই প্রথম কথা কইলেন—"আমি কেবলি তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি"।

বোরিস উত্তর করলেন—"আমিত কখনো পালিয়ে বেড়াইনি। জমাট বরফ তো ভেঙ্গে গেছে, আমরা হ্রদের জলের উপর ভাসছি"।

"তাইত দেখছি একই আশ্রয়ে তোমার আর আমার একটুখানি বিশ্রাম স্থানের এখনো অভাব হয়নি।" "হ্যাঁ এখনও কিছুক্ষণের জন্য আছে বটে।" হেক্টর চুপ

জমির ব্যবধান, তাই মনে মনে বুঝবার চেষ্টা করছিলেন—তারপর কি করবেন, কি বলবেন সে বিষয় তিনি মন স্থির করবার পূর্ব্বেই বোরিস জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কেমন করে আহত হলে।"

হেক্টর বল্লেন—"হাঁটুর নীচে হতে আমার পা কামানের গোলায় উড়ে গেছে, তোমার কি হয়েছে?" "আমার পা দুটোও ভেঙ্গে গেছে দেখছি।"

"ভেঙ্গে গেছে—একেবারে যায় নি ত?" "সত্যি বটে, একেবারে যায়নি—ঘাগরার মত এখনও ঝুলে, লুটিয়ে আছে।"

এই কথাবার্ত্তার পর দুজনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলেন, হেক্টর ব্রাণ্ডির শিশিটি আপন মুখের কাছে তুলে ধরলেন, পান করবার আগে কিছুক্ষণ থেমে রইলেন—অনিচ্ছাসত্ত্বেও বোরিসের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন; বিড় বিড় করে বললেন "কেবলি মেয়ে মানুষের কথাই ভাব্‌ছে।" আবার শিশিটী মুখের কাছে তুলে ধরলেন—সেই একই চিন্তা দ্বিতীয়বার তার পানের বাধা জন্মাল, জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার কাছে ব্রাণ্ডি আছে কি?" বোরিস উত্তর করলেন—"না ভাই আমি যে চিরকাল লক্ষ্মীছাড়া তাত জানই, ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করা আমার কোষ্টিতে লেখেনি।"

হেক্টর শিশিটী তুলে ধরলেন—দারুণ শ্রান্তি দূর করবার ব্যাকুলতায় বোরিসের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আগ্রহ যতই হোক, তবুও প্রসন্ন মুখের ভাবটির কোন ব্যতিক্রম হ'ল না।

হেক্টর শিশিটি বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌তে লাগলেন, তাঁর কিছুতেই ইচ্ছা নয় যে সেটি হাতছাড়া করেন, কিছুক্ষণ স্থির ভাবে ভেবে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন বল্লেন—"বোরিস তুমি জান, রুষসম্রাট যখন তাঁর বড় পিয়ারের পোল,-রাজকুমারের সহিত যুদ্ধ করতে আমায় নিষেধ করলেন, তখন সেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করবার জন্যেই আমি নেপোলিয়ানের অধীনে কাজ নিয়েছিলাম, সেইজন্যেই আমার রুষরাজধানী ছেড়ে আসা,—আজ সারাটা দিন আমি তোমায় খুঁজেছি, আর তুমি পালিয়ে বেড়িয়েছ।

"আমি পালাব—কখনই না—অদৃষ্ট আমাদের ভিন্ন করে রেখেছিল"। "আমি ছাড়বার পাত্র নই তা তুমি বেশ ভালই জান, তোমাকে খুঁজতেই আমি তুষারক্ষেত্রে এসেছিলাম—কামানের গোলার আঘাত পেয়ে অক্ষম অবস্থায় এখানে পড়ে আছি, যে কামানের গোলায় আমার পা দুখানি গেছে আশা করি তারি আঘাতে তুমিও খোঁড়া হয়েছো, এখনও সময় একেবারে যায়নি, তোমার আমার দুজনেরি তলওয়ার আছে, আমাদের স্ফূর্ত্তি করে দেখ্‌তে হবে,—যে হারবে, সে যেমন করে পারে অন্যের কাছে এগিয়ে আস্‌বে, যাই হোক্—যুদ্ধের কারণ যেমনি অসহ্য হোক, তবুও আমাদের বংশের কেহ কখনও ছোটলোকোমি করেনি, আমিও কর্‌বনা, সমানে সমানে লড়াই হবে। এ ব্রাণ্ডির অর্দ্ধেক আমি খেয়ে শরীরে বল পেয়েছি, শিশিটা তোমার কাছে দিচ্ছি বাকী অর্দ্ধেক তুমি খাও। হাত উঁচু করে প্রেভষ্ট ফ্লাস্কটি ছুঁড়ে দিলেন—বোরিস সেটি লুফে নিলেন। তৃষ্ণাতুর দৃষ্টিতে সেটির

দিকে একবার চেয়ে দেখে, পরমুহূর্ত্তেই আবার সেটি হেক্টরের দিকে ফেলে দিলেন, বল্লেন—'আব্রে প্রেভষ্ট, তুমি যখন লড়তে চাও, তখন যতক্ষণ এ লড়াই না হয়ে যায়, ততক্ষণ তোমার দেওয়া কিছু আমি নেব না।

তখন প্রায় মধ্যদিন, সূর্য্য তীব্র উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার ক'রে, আকাশের সর্ব্বোচ্চ স্থানে সিংহাসন স্থাপন করেছিলেন, খর রৌদ্রের প্রেরণায় তুষারখণ্ডে গতিসঞ্চার হ'য়ে সে আবার ভেসে চলেছিল, হ্রদের স্রোতোবেগে তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়ে, আর এক তুষারখণ্ডের সন্নিকটস্থ করে দিলে, উভয়ের সংঘর্ষ সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠল। আহত উভয় ব্যক্তিই এই সংঘাতের বেদনা অনুভব করলেন; কিন্তু কেবলমাত্র হেক্টরই দেখতে পেলেন, তুষারক্ষেত্রের বৃহৎ একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। এই ঘটনায় ভীত না হ'য়ে যা করবার জন্যে তিনি উৎসুক ছিলেন, সে বিষয়ে তাকে আরও ত্বরান্বিত করে দিলে। যে ব্যক্তিকে তিনি ঘৃণা করতেন তার দিকে চেয়ে—জিজ্ঞাসা করলেন "বোরিস আমার কাছে টাকা আছে তোমার কাছে আছে কি?"

পোলাণ্ডবাসী বোরিস্ উত্তর করলেন আছে বই কি—তারপর হেসে বল্লেন—এখানে এ অবস্থায় অর্থে কোন্ অর্থ সাধন করবে? হেক্টর বোরিসের এলঘু চেষ্টা উপেক্ষা করে বল্লেন, তা হলে আমি একটা ফরাসী আধ্‌লা তোমার কাছে ছুড়ে দিচ্ছি—তুমি আমায় একটা চার আনি ফেলে দাও, দুটিই আয়তনে, ভারে সমান। যদি আমার চৌআনি তোমার কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে না পৌছায়, তবে আমি তোমার কাছে এগিয়ে যাব, আর যদি তোমার আধলা আমার নাগাল না পায় তা হলে তোমাকে আমার কাছে আস্‌তে হবে। বোরিস্ এ প্রস্তাবে রাজী হলেন।

যুদ্ধে আমি যখন তোমায় আহ্বান করছি তখন তুমিই আগে আধলা ফেলো।—হেক্টরের কথায় সম্মতি জানিয়ে বোরিস বল্লেন—তাই হবে, অধিকার তোমারই বটে।

বোরিস কোন যত্ন চেষ্টা মাত্র না করে অবহেলার সঙ্গে আধলাটি ছুঁড়ে দিলেন, মুহূর্ত্তকাল সেটি সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করে উঠল, তারপর সেটি ফরাসী হেক্টরের যুদ্ধ বেশের বুকের বোতামের উপর পড়ে টং করে বেজে উঠ্‌ল। তারপর হেক্টর আব্রে প্রেভষ্ট আপন হাত ওঠালেন, মুদ্রাখণ্ডটি মুহূর্ত্তকালের জন্য সজোরে ধরলেন; যদি এ বাজীতে হারেন, তা হলে, তাঁকে কি কষ্টই বরণ করতে হবে তা তিনি বুঝেছিলেন—তাই তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর হাতটা একটু খানি কেঁপে উঠল। যাই হোক তাঁর চৌআনি বোরিসের কাছ অবধি পৌছিল না—আধ পথে বরফের উপরে রৌপ্যনিক্কণে বেজে উঠ্‌ল। তিনি বল্লেন—তাইত আমারই তোমার কাছে যেতে হ'ল দেখ্‌ছি। তাঁর কণ্ঠস্বরে কোনও কাতরতা ছিল না। এই চলবার চেষ্টাতেই হয় ত তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটবে, সে কথা মনে করে কিছুমাত্র ভীত হন নাই। উর্দ্ধে আকাশের দিকে একবার

চেয়ে দেখলেন, সে নির্ব্বিকারনীলিমা কোথাও কোন খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘের দ্বারা লেশমাত্র দ্বিধা-ভিন্ন নয়, বরং দণ্ডকয়েক পূর্ব্বে যাহা ছিল তদপেক্ষা সুনীলতর। তীর ভূমি ক্রমে তাঁর দৃষ্টিশক্তির সীমার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। চলন্ত তুষার ক্ষেত্র ক্রমেই হ্রদসীমানার নিকটবর্ত্তী হয়ে এল; পর্ণহীন নিঃসঙ্গ গাছটী তখনো অসম সাহসিক প্রহরীর মত নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সর্ব্বাঙ্গ কামানের গোলায় ক্ষত বিক্ষত, তবু সে নিরুপায় ভাবে আত্ম সমর্পণ করেনি! তুষারখণ্ডটি যেমন ভাবে ভেসে চলেছিল যদি সেই ভাবেই চলে, তবে তীরের এমন নিকট গিয়ে পৌছবে, সেখান হতে সাহায্য প্রার্থনা করে কাউকে আহ্বান করা সম্ভব হ'বে—কিন্তু তার পূর্ব্বে?

"তার পুর্ব্বে যা হবে তা আমরা জানি"! —শত্রুর দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে তিনি ছোট ছেলের মত হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌বার চেষ্টা করলেন—একখানি পা তো কামানের গোলায় চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, অতি সামান্য নড়বার চেষ্টাতেও তাঁর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা হচ্ছিল—সে যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ হ্রাস করবার জন্যে উপুড় হয়ে, কনুইএর উপর ভর দিয়ে, অতি ধীরে শরীরখানি প্রাণপণ চেষ্টায় টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌লেন—চেষ্টা সফল হল—কিন্তু সে চেষ্টায় কি মৃত্যুসমধিক বেদনা বোধ হল, তা তিনি ছাড়া আর কারো বোঝা অসাধ্য,—প্রথম রক্তবিন্দু, পরে লোহিত রেখা দেখা দিল, অবশেষে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হ'ল। হেক্টর বোরিসের যতই কাছে হতে লাগলেন শ্রান্তিতে, কষ্টে তাঁর গর্ব্বিত মস্তকটি বার বার ততই নুয়ে পড়তে লাগল—বার বার অশ্রান্ত-অধ্যবসায়ে সে মস্তক উন্নত করলেন সত্য, কিন্তু এই অসাধ্য সাধনে তাঁর মুখ মৃত্যু-পাংশুল হয়ে উঠল, নিমীলিত নেত্র দুটি অসহ্য যাতনায় নিমেষে নিমেষে স্পন্দিত হ'তে লাগল। যুবরাজ বোরিস হেক্টরের পাণ্ডুনীল মুখের দিকে চেয়ে কতকালের কত কথা মনে করতে লাগলেন —সেই দুজনের আজন্ম বন্ধুত্ব, কৈশোর যৌবনের কত সুমধুর স্মৃতি,—আর আজ কিনা সেই বন্ধু তাকে আপন হাতে মৃত্যুদণ্ড দিবার জন্যই, মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণাকে স্বেচ্ছায় বরণ করেছে। করুণার্দ্র স্বরে বোরিস্ হেক্টরকে বল্লেন—"থাক্ আর এগিয়ে আস্‌বার চেষ্টা কোরনা তুমি যে আর পারছ না।"

একথার উত্তরে হেক্টর তাঁর তরবারি উত্তোলন করবার চেষ্টা করলেন, কৃতকার্য্য হলেন না, অক্ষম হস্ত ছিন্ন-লতিকার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল, সমস্ত শরীরের রক্ত যেন জল হয়ে এল, মাথা ঘুরে উঠল, পৃথিবী চোখের সম্মুখ হতে অদৃশ্য হয়ে গেল। শেষ অবধি এই দুর্ব্বলতার সহিত যুঝতে যুঝতে হেক্টর বল্লেন "তবে কি যুদ্ধের আগেই মৃত্যু এসে আমায় হার মানাবে! অবসন্ন শরীর মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয়ে মৃৎপিণ্ডের মত নিশ্চল পড়ে রইল।

বোরিস্ শ্বাসরুদ্ধ করে বারম্বার বল্‌তে লাগলেন, "হায় হায়, একি দুর্দ্দৈব, একি বিড়ম্বনা।" যদিও পাশ ফিরতে বোরিসেরও বড় কষ্ট হচ্ছিল তবুও ফিরলেন, ব্রাণ্ডির

শিশিটিতে কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা দেখলেন, অকস্মাৎ তাঁর হাতে কি উষ্ণস্পর্শ অনুভব করে চেয়ে দেখলেন, হেক্টরের ভগ্ন পিষ্ট জানু হ'তে অজস্র ধারে রক্ত ঝরে পড়ছে। ব্যাপার কি বুঝতে বাকী রইল না। একদিন যাকে ভাইয়ের অধিক ভালবাস্‌তেন, সেই বন্ধু তাঁরি সম্মুখে, রক্তস্রাবে মারা যাচ্ছে, অথচ তিনি এমন নিরুপায় যে, একবিন্দু জল দিয়েও তাকে সাহায্য করতে পারছেন না। হেক্টর ঠিক তাঁর সম্মুখে এবং তাঁর মাথার একটু উপরের দিকেই শুয়েছিলেন—বোরিস হাত বাড়িয়ে সহজেই তাঁর ক্ষতস্থানের সন্ধান পেলেন, ছিন্ন ধমনীটি চেপে ধরবামাত্র রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল। তার বুঝতে বিলম্ব হল না যে, যতক্ষণ যন্ত্রণা সহ্য করে, হেক্টরের ক্ষত জানুর ছিন্ন শিরা চেপে রাখ্‌তে পারবেন, ততক্ষণই তার প্রতিপক্ষের আয়ুষ্কাল। অপর কেহ হলে এ ব্যর্থ চেষ্টায় আপনাকে পীড়িত করত না, যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং সন্নিকট তাকে বারণ করা তাঁর সাধ্যাতীত জেনে স্থির হয়ে থাকৃত। জন্মমৃত্যুর সেই সন্ধিস্থলে অর্দ্ধপূর্ণ সেই ব্রাণ্ডি শিশিটির লোভ সম্বরণ করা অনেকেরি পক্ষে অসম্ভব হত, কিন্তু সেই অভিজাতবংশসম্ভূত, যথার্থ বীর, মহদন্তঃকরণ বোরিস যে আদর্শে জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র কাজ নিয়মিত করতেন, তাঁর পক্ষে যা সহজ স্বেচ্ছায় মুহূর্ত্ত চিন্তা না করে করেছিলেন, সে কাজের ব্যতিক্রম করা স্বভাব-বিরুদ্ধ বলেই করতে পারেন নি। শত্রু মিত্র কারো বিপন্ন অবস্থায় সুবিধা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

সূর্য্য তখনও সমুজ্জ্বলদীপ্তিতে আকাশে বিরাজিত, তুষার ক্ষেত্র তখনও গতিশীল, একাধিক বার অন্য তুষার ক্ষেত্রের সংঘর্ষে ভগ্নপ্রায়। প্রায়শই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে—একবার সংঘর্ষ কিঞ্চিৎ সাংঘাতিক হওয়ায় একটি প্রকাণ্ড খণ্ড স্বতন্ত্র হয়ে ভেসে গেলে বারম্বার আঘাতে জমাট তুষারে যে ফাটল দেখা দিয়াছিল ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে ভিন্ন হয়ে গেল; বোরিস বল্লেন এর পরিণতি যে কি বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি। একটু হাসলেন, যন্ত্রণায় সরল হাসিটুকু বাঁকা হয়ে গেল। তারপর আপন মনে বল্‌তে লাগলেন, দেখ্‌ ভাই বোরিস্ ষ্টানিলুস্কিণ্টা অনর্থক সরফরাজি কচ্ছে—কি করবে তার স্বভাবই ঐ—সবাই জানে সবাই বলে ডুবে মরার চেয়ে রক্তস্রাবে মরার বোধহয় যন্ত্রণা কমই হতে পারে। তবুও বোরিস হেক্টরের বিচ্ছিন্ন ধমনী হতে হাত সরিয়ে নিলেন, জমাট তুষার সেই একভাবে গলে গলে আকারে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেল!

সূর্য্য দেবের রশ্মি সংযমন শিথিল হ'য়ে এল, তীব্র হিম বাতাসে চারিদিক হায় হায় করে উঠল, বোরিস শুন্‌লেন কে তাঁর নাম ধরে ডাকছে, ফিরে চেয়ে দেখলেন, হেক্টর আবার প্রেভষ্টের সংজ্ঞা আবার ফিরে এসেছে —এ আহ্বান তাঁরই। বোরিস অবিলম্বে অথচ ভদ্রভাবে বল্লেন; আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই আছি কিন্তু তখনও হেক্টরের রুধির নিবারণের জন্য ক্ষত স্থান যে চেপে ধরে রেখেছিলেন সে হাত সরিয়ে নিলেন না। হেক্টর সম্পূর্ণ শয়ান অবস্থা হতে কতকটা উঠে বসলেন, পূর্ব্বে কি হয়েছিল সে কথা

স্মরণ হতে তাঁর কিছুক্ষণ গেল; মনে পড়ল, যখন তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তখন তাঁর ক্ষত স্থান হতে জীবন রুধিরের ধারাপাত হচ্ছিল, কিন্তু কৈ এখন তো আর একটুও রক্ত পড়ছে না? চকিতে আড় চোখে একবার আপনার আহত জানুর দিকে চেয়ে দেখলেন, দেখে বুঝলেন—ঐ বিপদ দূরীকরণ দৈব-উপায়ে হয় নি, মানুষের হাতেই ঘটেছে। হেক্টর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ওকি করছ? বোরিস বল্লেন—তোমার কখন যুদ্ধ করবার সুবিধা হবে তারি অপেক্ষা করে আছি। "যুদ্ধের উপায়টি ভালই আবিষ্কার করেছ, ডানহাত খানি আবদ্ধ, যুদ্ধ হয় কি করে? বোরিস বল্লেন—যেমন করে হয় হবে, তোমার তরওয়াল বার করতো!"

"তলওয়ার বার করলেম যেন, কিন্তু তোমার ডান হাত যে জোড়া।" "তা হোক ডান হাত জোড়া আমাদের দুজনেরি বাঁহাত স্বচ্ছন্দ, কোনও আঘাত পায় নি, এ ঠিক হবে, নাও, এখন তলওয়ার খোল।" হেক্টর বল্লে "ঠিক কি করে হ'ল, তুমিই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছ—তুমি যদি আমার ক্ষত স্থানের রক্তপাত বন্ধ না করে রাখতে তবে ত কখন্ মরে যেতাম। এ তুমি অন্যায় করেছ;—আবার তুমি আর একবার আমায় বঞ্চনা করলে! যারে আমি বড় ভাল বেসেছিলাম, প্রথম তুমি তাহতে আমায় বঞ্চিত করেছিলে; আবার এখন আমার প্রতিহিংসা হতে আমায় প্রতারিত কল্লে। যে আমার জীবন রক্ষা করেছে তার সঙ্গে

আমি তোমার কাছে এতটুকুও কৃতজ্ঞ লেশমাত্র কৃতজ্ঞতা আমার মনে নাই"। যুবরাজ বোরিস হেক্টরের সব কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু একটি মাত্র কথার উত্তর দিলেন—আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি যাকে ভালবেসেছিলে তাহতে আমি তোমায় বঞ্চিত করেছি।" হেক্টর রূঢ় কণ্ঠে বল্লেন—"করেছই ত, করনি? তুমিই ত নিকলেটকে চুরি করে নিয়েছিলে?" বোরিস্ বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কাকে, নিকলেটকে? হেক্টর বিকার গ্রস্তের মত বল্তে লাগলেন "একথা অস্বীকার করবার উপায় তোমার নেই—কাল সারা-রাত ভোর তুমিই নিকলেটের নাম ধরে ডেকেছ, তুমি বার বার তারি গাওয়া গান গেয়েছ।"

বোরিস স্থির হয়ে সব শুনলেন, ক্রোধ-বিহ্বল পুরাতন বন্ধুর আরক্ত মুখের উপর হতে দৃষ্টি অন্যত্র রেখে একটু শ্রান্ত হাসি হাসিলেন। সে হাসি ত হাসি না;—আনন্দের লেশমাত্রও তার কোথায়ও ছিল না, সে হাসিতে দুরাশাগ্রস্ত অতীতের, হতাশ বর্ত্তমানের সমস্ত দুঃখ, যেন তুষারের মত পুঞ্জীভূত হয়ে উগ্র ধবলরূপ ধারণ করেছিল। তারপর শান্তভাবে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মনে করেছিলে নিকলেটকে তোমার কাছ হতে আমি চুরি করে নিয়েছিলাম। হায় বন্ধু, আমরা দুজনেই তাকে বড় ভাল বেসেছিলাম, সে কথা কারো কাছে অবিদিত ছিল না। অধীরভাবে হেক্টর আবাব প্রশ্ন ক'রলেন, তুমি কি বল্তে চাও,

কি তাই বিশ্বাস কর ? আচ্ছা আমাদের মধ্যে কি ঠিক হয়নি, যে-কেউ আমাদের মধ্যে সদুপায়ে তাকে জয় করে নিতে পারবে?" "ঠিক বলেছ—সদুপায়ে জয় করবার কথা ছিল।"

"আর তুমি মনে করেছিলে আমার উপায়টা ?"

"তোমার উপায় ?—তোমার উপায়টা অতি নীচ, অধম ও দুষ্প্রবৃত্তির পরিচায়ক ; তুমি প্রলোভন দেখিয়ে তাকে সেণ্টপিটার্সবর্গ হতে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলে, আমি যতদূর জানি, এখনো পর্য্যন্ত তুমি তাকে লুকিয়েই রেখেছ। সে তোমাকে ভালবাসত না, সে শুধু আমাকেই ভালবেসেছিল, কিন্তু তবু জোরজবরদস্তি তুমি তাকে অধিকার করেছিলে, রুষিয়া রাজ্যে এমন ব্যাপার তো প্রতিনিয়তই ঘট্‌ছে।" দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব হ'য়ে রইলেন—তারপর বোরিস হেক্টরের আক্রমণের কোনই প্রতিবাদ না করে স্নিগ্ধস্বরে বল্লেন, "বুঝতে পারছ কি ? তুষারক্ষেত্র যে ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে।" হেক্টর বল্লেন—"হ্যাঁ বুঝতে পারছি।"

"ভেবে দেখেছ কি, এর চেয়ে ছোট যদি হয়ে যায়, তা হলে এর উপরে আমাদের আশ্রয় আর হবে না, দুজনেই ডুবে মরব ?" হেক্টর বল্লেন "হ্যাঁ তাও বাকী নেই।

এর পর বোরিস কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন—পরে শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "আমি নিকলেটকে ভাঙ্গিয়ে নিয়েছি এই ধারণায় তোমার বন্ধু-স্নেহ বৈরীভাবে পরিণত

যে হাত খানি অক্লান্তভাবে তার ক্ষত জানুর রক্তস্রাব রোধ ক'রেছিল তারি দিকে চেয়ে রইলেন, কিছুপরে উত্তেজিত তীব্রস্বরে উত্তর করলেন—"হ্যাঁ নিকলেটকে আমি প্রাণাধিক ভাল বাসতাম, তাই আজ তোমার প্রতি আমার স্নেহ লেশমাত্র আর নাই।

দারুণ বেদনাহত সেই দুই মুমূর্ষু মানব একে অপরকে স্পর্শ করে পড়ে রইল ; —সূর্য্য পশ্চিমে গড়িয়ে পড়ল, স্বল্পাবশিষ্ট তুষার-আশ্রয় ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর এবং মৃত্যুও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সন্নিকট হচ্ছিল।

যুবরাজ বোরিস ষ্ট্যানহুসি আবার আপনা হইতেই জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি যে তোমাকে প্রতারণা করেছি এ কথা এমন করে কে তোমার বিশ্বাস জন্মালে ?"

"নিকলেট যে চিঠি রাখিয়া যায় তাহাতেই একথা লেখা ছিল, নতুবা অপরের কথা কি আমি বিশ্বাস করি ?

"আরে ভাই—সে যে আমাকেও ঐ একই কথা লিখে দিয়েছিল।"

"তোমাকেও ঐ একই কথা লিখেছিল। তোমার জন্যও পত্র রেখে গিয়েছিল ? কি যে বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

"তুই ভাই আমার কথা বিশ্বাস কর্ আমি তো কখন মিথ্যা বলি না আর এই উভয়ের আসন্ন মৃত্যুকালে মিথ্যা বলবার আবশ্যকতাই বা কোথায় ? আমরা দুজনেই নিকলেটকে ভালবেসেছিলাম দুইজনেই রুষ সম্রাটের অসন্তোষ অবহেলা করে, তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিলাম। সে সুন্দরী মেয়েটি তোমাকে কি আমাকে কাউকেই

করেই জানি ; তবুও আজ পর্য্যন্ত আমি তাকে ভুলতে পারিনি। সে কর্সিকানের প্রেরিত গুপ্তচর। চলে যাবার সময় আপনার কোন চিহ্নই রেখে যেতে ইচ্ছা করেনি। তোমার কাছ হতে রাজেন্দ্র লুই এর সংবাদ এবং আমার কাছ হতে পোলরাজ্যের নিগূঢ় অবস্থা জেনে নেবার জন্তই তার আসা। যখন তার সে উদ্দেশ্য সাধন হল, তখন আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটালে তার স্বার্থ সাধন হয় না, তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায়, সে ধরা পড়তে পারে, তাই আমাদের উভয়কে অনুরূপ পত্র লিখেই পরস্পরের মধ্যে বিরূপ ভাবের সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছিল। এর চেয়ে সুনিশ্চিত মর্ম্মঘাতী উপায় আর সে খুঁজে বার করতে পারত না। নির্ঘাত কিসে বাজবে, সে তা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। আমি তো ঠাঁই ছাড়া হলাম না, দেশ আঁকড়েই পড়ে রইলাম, তুমি বিদেশে চলে গেলে, কোনও একটি আশ্চর্য্য ঘটনায় সত্য যা' তা' আমার কাছে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ল। যা কথা বলছি প্রত্যয় যাচ্ছ ত ?"

হেক্টর স্থির নির্ব্বাক হয়ে রইলেন, অবিশ্বাস তাঁর মনে হতে চলে গিয়েছিল, নেপোলিয়ানের গুপ্তচর চারণা সকলেরই কাছে বিদিত ছিল। বোরিসের বিবরণে অসম্ভব কিছুই ছিল না, তা ছাড়া বোরিস যা বলেছিল সে কথাও খুব ঠিক্ ; মৃত্যুকালে মিথ্যার প্রয়োজন আর থাকে না।

হেক্টর সাবধানে পাশ ফিরে স্নিগ্ধস্বরে বল্লেন ভাই—"কেন মিছে আর কষ্ট পাস্, মরতেই যখন হল আয় দুজনে আরামেই মরি—তোর হাতটা উঠিয়ে নে, আর মিছে কষ্ট করে কি কাজ ?" এ কথার উত্তরে বোরিস অন্য হাত দিয়ে হেক্টরকে জড়িয়ে ধরে' বল্লে "দেখ সম্মুখে একবার দেখ।"

প্রবলপ্রতাপান্বিত ফরাসী সম্রাটের পক্ষে যে কাজ সাধ্যায়ত্ত হয়নি দরিদ্র হীনপদবী অখ্যাতনামা জ্যাক ক্রেমাঁ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল। দূরে হতে ভাসমান তুষার ক্ষেত্রের উপর একটি কালো পদার্থ দেখে মৃত্যু অবজ্ঞা করে, একখানি দীর্ঘ দণ্ড ধারণ করে একখণ্ড বরফের উপর হতে অপর খণ্ডে লাফিয়ে পড়ে, একগাছি দীর্ঘ রশির সাহায্যে সে তার প্রভুর কাছে এসে পৌঁছে ছিল—ক্রেমাঁকে দেখে হেক্টর হাত বাড়িয়ে দিলেন, বোরিস পুরাতন আবেগপূর্ণ বন্ধু স্নেহে সে হাতখানি জড়িয়ে ধরে হেসে বল্লেন—"ভাইয়া দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেবার মধ্যে বাকী দেখছি মোটে ত এক খানি পা, বড় চমৎকার দৃশ্য কি বল ?" তাঁর কণ্ঠস্বরে সেই চিরন্তন স্নেহের ললিত রাগিণী ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্ল, স্নিগ্ধ নেত্রযুগলে নবোদিত আনন্দ রশ্মি অপূর্ব্ব উষার সূচনা করে দিলে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্রোতের ফুল

(৬)

মালতীর বাপের বাড়ী ছিল কলিকাতার সন্নিকট বেহালা গ্রামে। বিবাহের একমাস পরেই মালতী যখন বিধবা হইল, তখন তাহার শ্বশুর শাশুড়ী এই বিষকন্যা সর্ব্বনাশী চক্ষুশূল বৌকে বাড়ী হইতে দূর না করিয়া জলগ্রহণ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। মাস না ফিরিতে যে রাক্ষসী তাহাদের অসুরের মতন বলবান সুস্থ ছেলেকে খাইয়া ফেলিল, সেই অপয়া মেয়েকে বাড়ীতে ঠাঁই দিয়া কি শেষে নূতন আর কিছু বিপদ ঘটিবে! মালতীর বয়স তখন সবে পনর বৎসর। সে শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—"মা, আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব, আমায় পায়ে ঠেলো না!" কিন্তু শাশুড়ীর মন কিছুতেই নরম হইল না, তাঁহার শোকার্ত্ত চিত্ত হত-ভাগিনী বধূর মিনতি ডাইনীর মায়াকান্না বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিল। তখন অগত্যা বাপের বাড়ীতেই আশ্রয় লওয়া ছাড়া মালতীর আর কোনো উপায় রহিল না। নবীন যৌবন যখন তাহার ভাব-শতদলের পাপড়িগুলি একটির পর একটি খুলিয়া খুলিয়া আপনার চারিদিকে অশেষ উন্মাদনা সঞ্চারিত করিতেছিল, যখন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অভিনব আনন্দ তাহার চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়টিতে মালতী তাহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার দেনাপাওনা চুকাইয়া ম্লান মুখে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল।

মালতী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং তাহাকে তাঁহারা গভীর দুঃখে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। মালতীর পিতা ছিলেন নব্যতন্ত্রের লোক; তিনি কন্যার পুনরায় বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ চেষ্টার প্রধান প্রতি-বন্ধক হইল মালতী নিজে। মালতী তখন ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল,—তাহার কাছে বিধবার বিবাহ অন্যায় ও লজ্জার কারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে মায়ের কাছে কাঁদিয়া গিয়া পড়িল—"মা, বাবাকে বারণ কর, আমি আর বিয়ে করতে পারব না!" সে কাঁদিয়া কাঁদাইয়া তাহার পিতাকে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার জন্য মাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার পিতা তাহাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে তাঁহারা মারা গেলে মালতী যখন একা পড়িবে, তখন তাহার উপায় কি হইবে? মালতী বুঝিল যে পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাহার অভিভাবক কেহ নাই, কিন্তু তবু বিবাহ সে কিছুতেই করিতে পারিবে না।

মালতীর পিতা দেখিলেন মালতীর যে আপত্তি তাহা হিন্দু সমাজের সংস্কারগত অপ্রবৃত্তি মাত্র; তাহা তাহার স্বামীর প্রতি প্রেম-সঞ্জাত নহে; কারণ স্বামীর সহিত তাহার ত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইবার অবসরই ঘটে নাই। তখন তিনি কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন—তাহাতে মালতী একটা অবলম্বন পাইবে এবং জ্ঞানবৃদ্ধি

পরিপক্ক হইলে তাহার মন হইতে বিধবার বিবাহে সংস্কারজনিত আপত্তি দূর হইতে পারিবে।

কিন্তু বছর না ফিরিতে মালতীর পিতার মৃত্যু হইল; এবং তাহার বিবাহের কথাও চাপা পড়িয়া গেল।

এখন সংসারে শুধু সে ও তাহার মা। দুটি বিধবার সামান্য গৃহকর্ম্মের পর উদ্বৃত্ত সময় যখন তাহাদের শোকার্ত্ত মনকে অত্যন্ত নিপীড়িত করিত, তখন মালতী পুস্তকের মধ্যে আপনার সমস্ত ভয় ভাবনা ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে লেখাপড়া করা তাহার নেশা হইয়া উঠিল।

বছর দুই পরে যখন মাতারও মৃত্যু হইল, তখন সে বুঝিল যে শুধু বই লইয়া থাকা যায় না, মানুষের জীবনে মানুষের সঙ্গ ও স্নেহ মমতারও আবশ্যক আছে। তাহার পরে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা পুরুষেরা যখন অনাথা বিধবার দুঃখে অতিমাত্রায় কাতর হইয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল তখন মালতী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুড়ী দাসী হরির মায়ের পরামর্শে তাহার মাসিমার কাছে আশ্রয় লওয়াই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিল। মালতী তাহার মাসিকে কখনো দেখে নাই। এই অচেনা অদেখা মাসির কাছে আশ্রয় লইতেও মালতীর মনে নানা প্রকার ভয় ভাবনা দেখা দিতেছিল। কিন্তু হরির মা তাহাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতেছিল—"মায়ের বোন মাসি, তার কাছে যেতে আর ভয় কি?"

মালতী সাতদিন হইল মাসিমাকে চিঠি জবাব আসিল না। মালতী উদ্বিগ্ন হইয়া যেন দিশা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

বিকাল বেলা। মালতী মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছে; হরির মা তাহার চুলের রাশির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে নীরবে তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল। ঘরের দেয়ালে কুলুঙ্গিতে একটা টাইমপিস ঘড়ী ঘরের নিস্তব্ধতাকে টিটকারী দিতেছে।

মালতী শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল তাহার মাসিমারই কথা। মায়ের আকৃতি-প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া মাসিমাকে সে গড়িতেছিল। দুঃখিনী মালতী প্রাণপণে মাসিমার সেবা যত্ন করিয়া নিঃসন্তান তাঁহার সমস্ত বাৎসল্য পাইয়া মায়ের শোক ভুলিতে পারিবে—এ আশা তাহার হইতেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল—মাসিমা জমিদারের ঘরণী, তবু তিনি কখনো নিজের বোন বোনঝির খোঁজ খবর ত করেন নাই। সে শুনিয়াছিল বটে যে তাহার মাসিমা বিধবা হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া এখন তাঁহার ভাসুরের আশ্রয়ে আছেন, কিন্তু পরাধীন বলিয়া কি এতটাই পরাধীন যে আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর পর্য্যন্ত লইতে পারেন না! আর যদি তিনি তেমনি পরাধীনই হন, তবে তাঁহার কাছে গিয়া তাহাকে না জানি কেমন ভাবে থাকিতে হইবে! আর যদি তেমন পরাধীন না হন তবে সে মাসির স্নেহের ভরসা না রাখাই ভালো!

মালতীর মন যখন এমনি চিন্তামগ্ন তখন সদর রাস্তায় কে একজন গুরুগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ হে, অক্ষয়বাবুর বাড়ী কোনটা?

উঠিয়া জানালা ভেজাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল একজন সুগৌর দীর্ঘ বলিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য ধরণের যুবাপুরুষ তাহাদের পাড়ার নবদ্বীপ কামারকে তাহারই পিতার বাড়ীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছে। মালতীর বুকের মধ্যে আনন্দ দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, নিশ্চয় মাসিমা ইহাঁকে পাঠাইয়াছেন।

নবদ্বীপ কামার অবাক হইয়া নবকিশোরের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল —এই বাড়ী চৌধুরী মশায়ের। মশায়ের কোথেকে আসা হচ্ছে?

নবকিশোর বলিল—আমি অক্ষয়বাবুর মেয়ের মাসির দেশের লোক।

মালতী ইহা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চাপা গলায় হরির মাকে ডাকিয়া বলিল— হরির মা, যা যা ঝপ করে গিয়ে ওঁকে ডেকে নিয়ে আয়। ওঠ্ ওঠ্।

মালতীর বাড়াটি সদর রাস্তার ধারে হইলেও, তাহার প্রবেশদ্বার একটি গলির ভিতর। খেজুর কাঠের শাঁকো দিয়া নয়ান-জুলি পার হইয়া নবকিশোর বহিঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণের প্রাচীরের ধারে একটা সজিনার ও জবাফুলের গাছ, এবং এখানে সেখানে গোটাকতক ক্রোটন, অতীত উদ্যানের স্মৃতির মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; এক পাশে একটা চুনের জালা ভাঙিয়া পড়িয়া আছে। বাহির-বাড়ীতে কোনো ঘর নাই; ভিতর বাড়ীর একটি ঘরের বাহির দিকে একটি রক ও দরজা আছে; সেই ঘরটিই দরকার মতো সদর অন্দর দু দিককারই কাজ চালাইয়া দ্যায়। হরির মা সেই ঘরের দরজা খুলিয়া নবকিশোরকে বলিল—আপনি এই ঘরে এসে বস বাবা, আমি মালতী দিদিমণিকে ডেকে দিচ্ছি।

সেই ঘরে একটা বিড়াল কুণ্ডলী পাকাইয়া দিব্য আরামে ঘুমাইতেছিল। তাহার সুষুপ্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়া আলোক ও লোকের সমাগম হওয়াতে সে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল; প্রথমে সে আকৃষ্টজ্যা ধনুকের ন্যায় উষ্ট্রভঙ্গীতে পিঠ ফুলাইয়া আলস্য ত্যাগ করিল; তারপর পালোয়ানের ডন ফেলার মতো হাত পা ছড়াইয়া নিজেকে যথাসম্ভব দীর্ঘ করিয়া কোমর টানিয়া হাই তুলিয়া সে ঘর হইতে প্রস্থান করিল। একটু আগেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, উঠানের মাঝখানে ঘাসের বনে জল থিতাইয়া ছিল; বিড়ালটি প্রতিপদক্ষেপের পর ভিজা পা তুলিয়া ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া নূতন-জুতা-পরা সৌখীন বাবুর মতো অতি সন্তর্পণে জল পার হইয়া বাড়ীর বাহিরে প্রস্থান করিল।

নবকিশোর একখানি চেয়ারে বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ঘরটিতে আসবাবের বাহুল্য নাই; যাহা আছে তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিপুণা গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণ হস্তের সেবার সাক্ষী; ঘরের জানালাগুলিতে ও দরজায় নানান রঙের ছিটের, ছেঁড়া ঢাকাই কাপড়ের ঝালর-দেওয়া পর্দা টানা রহিয়াছে, ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল ঘিরিয়া চারখানি চেয়ার; একপাশে একখানি তক্তপোষ, সবগুলি সূচের কাজকরা সুন্দর সুজনি দিয়া ঢাকা। দেয়ালের ধারে একটি কাঠের আনলা; দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও খানকয়েক ফটোগ্রাফ সুসজ্জিত।

হরির মা দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল —মালতী দিদিমণি এসেছে।

নবকিশোর দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী মালতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—আমি তোমাকে মথুরাপুরে নিয়ে যেতে এসেছি।……আমি অসঙ্কোচে প্রথমেই তোমায় তুমি বলছি, তাতে কিছু মনে কোরো না। তোমার যিনি মাসিমা, তিনি আমার খুড়িমা। দাদা ছোট বোনকে আপনি বললে কেমন শোনায়?

মালতী এই নবাগত আগন্তুকের অসঙ্কোচ সরল অমায়িকতা দেখিয়া প্রীত হইল। সে স্পষ্ট অথচ মৃদুস্বরে বলিল—এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন। আমাকে আপনি বললেই অন্যায় হত।...আপনি মথুরাপুর থেকে কবে এলেন? মাসিমার কোনো চিঠি না পেয়ে বড় ভাবছিলুম।

মালতী আজন্ম বাপের বাড়ীতেই পল্লী-গ্রামে প্রতিপালিত বলিয়া ঘোমটাটানা সঙ্কুচিত লজ্জার সহিত তাহার কখনো পরিচয় হয় নাই; বিবাহের পরও তাহার মাথার উপর শ্বশুরবাড়ীর কোনো রকম চাপ না পড়াতে সে অসঙ্কোচ স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছিল—শাশুড়ীর শাসন, ননদের খোঁটা, তাহাকে কৃত্রিম ভব্যতায় আড়ষ্ট করিয়া তুলিতে পারে নাই। অধিকন্তু তাহার পিতা আপিসে বা বিদেশে গেলে আগন্তুক অতিথি অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা সমাদর করিতে হইত তাহাকেই। ইহাতে তাহার প্রকৃতিগত নারীত্বের মাধুর্য্য অভ্যাসগত স্বাধীন অপূর্ব্ব রকমে কোমল অথচ শক্তিমতী করিয়া তুলিয়াছিল।

নবকিশোর এই তরুণী রমণীর অসঙ্কোচ ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমি কলকাতাতেই থাকি, মথুরাপুর থেকে চিঠি পেয়ে তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

এমন অসম্পূর্ণ কথায় সন্তুষ্ট হইবার পাত্রী মালতী নহে। সেইজন্য সে পুনরায় প্রশ্ন করিল—আপনাকে মাসিমা নিয়ে যেতে লিখেছেন, কিন্তু আমায় ত কোনো খবরই লেখেন নি?

নবকিশোর এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হইয়া বলিল—খুড়িমাই ঠিক চিঠি লেখেন নি। তিনি পরাধীনা, সব সময় ইচ্ছামত কাজ করে উঠতে পারেন না। খুড়িমার ভাসুর হরিবিহারী বাবু, তাঁর ছেলে বিপিনকে চিঠি লিখেছেন; বিপিন আমায় তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—আপনি বিপিন বাবু নন? আমরা তাঁর নাম শুনেছি। মাসিমা বিধবা হলে তিনিই তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন। আমি মনে করেছিলাম আপনিই বিপিন বাবু। আপনি তবে বিপিনবাবুদের কে হন?

—তাঁদের সঙ্গে আমার কোনো রক্ত-সম্বন্ধ নেই। আমার বাবা তাঁদের পুরোহিত। তোমার মাসিমা সেই সূত্রে আমাদের সকলেরই খুড়িমা—চাকর দাসী গোমস্তা পাইক সকলেই তাঁকে খুড়িমা বলেই চেনে।

মালতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—আপনি কি চিঠি পেয়েছেন একবার দেখতে পারি কি?

দেখিয়া ও সপ্রতিভ জেরা শুনিয়া মনে মনে প্রীত হইতেছিল। সে হাসিয়া বলিল—অপরিচিতকে সনাক্ত করা দরকার হবে বুঝে চিঠি সঙ্গেই এনেছি।...এই নাও—বলিয়া নবকিশোর পকেট হইতে দুখানি চিঠি বাহির করিল এবং পাছে ভুল হয় এজন্য সতর্ক হইয়া নিজের নামের চিঠিখানি আগে পকেটে রাখিয়া দিয়া বিপিনের নামের চিঠি-খানি হরির মায়ের হাতে দিল।

কিন্তু যে-ভুল করিবে না বলিয়া সতর্ক হইতে চাহিয়াছিল, সেই ভুলই ঘটিয়া গেল। সকালে তর্কের ঝোঁকে বিপিনের নাম-লেখা খামে ভট্টাচার্য্য মহশেয়ের চিঠি এবং নব-কিশোরের নাম-লেখা খামে হরিবিহারী বাবুর চিঠি স্থান পাইয়াছিল। মালতী স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের চিঠিতে তাহার চিঠি পাওয়া হইতে তাহাকে আশ্রয় দেওয়ার সমস্ত বিবরণ অবাক্ হইয়া পড়িতে লাগিল।

মালতীকে স্বামীবিয়োগের দুঃখের পর কয়েকদিন মাত্র শ্বশুরবাড়ীর অনাদর উপেক্ষা সহ্য করিতে হইয়াছিল; তখন সে বালিকা মাত্র, তাহার পিতামাতার স্নেহপ্রলেপ তাহার সকল বেদনা শীঘ্রই উপশম করিয়া দিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পিতামাতার মৃত্যুর পর তাহার যে দারুণ বেদনা মাসির কাছে সান্ত্বনা পাইবার আশা করিতেছিল, সেই মাসির উদাসীন উপেক্ষা মালতীর বুকে ব্যথার উপর বড় বেশী করিয়া বাজিল। সে মনে মনে মাসির যে স্নেহকল্যাণী মূর্ত্তি গড়িয়া-ছিল তাহা এই আঘাতে একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তাহার মাসির কাছে তাঁহার আহত গর্ব্বই যে তাহার বিপদের চেয়ে বড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, এই অপমানের আঘাতে তাহার মনের কানায় কানায় পূর্ণ দুঃখ অভিমানের অশ্রুতে উপ্‌চিয়া পড়িতে লাগিল।

নবকিশোর মালতীকে কাঁদিতে শুনিয়া মনে করিল তাহা পিতামাতার মৃত্যুশোক। তাই সান্ত্বনা দিয়া বলিল—দুঃখ করো না। আমাদের খুড়িমা বড় স্নেহময়ী, তাঁর কাছে গেলে তুমি মাসির যত্নে মায়ের অভাব বুঝ্‌তে পারবে না······

মালতী ক্রন্দনবিজড়িত দৃঢ়স্বরে বলিল—হ্যাঁ চিঠিতে যে রকম স্নেহের পরিচয় পাচ্ছি তাতে তাঁর স্নেহ বেশী পেতে আর প্রবৃত্তি নেই! তাঁর কাছে আমি আর যাব না।

মালতীর কথা শুনিয়া নবকিশোর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, একি বলিতেছে? তারপর হঠাৎ তাহার মনে হইল চিঠি দিতে সে বোধ হয় গোলমাল করিয়া বসিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে অপর চিঠিখানি বাহির করিয়াই বুঝিল যে-কথা সে ঢাকিতে চাহিয়াছিল অসাবধানে তাহা ফাঁস হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সে লজ্জিত হইল। মালতীর তেজদৃপ্ত বাক্য শুনিয়া তাহার আনন্দও হইল। একটি নিরাশ্রয়া যুবতীর মুখে অমন তেজের কথা শুনিয়া নবকিশোর সলজ্জ স্মিতমুখে বলিল—তুমি যদি যাবে না, তবে এখানে তোমার চলবে কি করে?

—কোনো মেয়ে-স্কুলে চাকরী নেব। আমি একলা মানুষ বৈ ত নয়, কোনো রকমে চলে যাবেই।

বাঙালী হিন্দু ঘরের মেয়ের এমন স্বাব-লম্বনের মাত্রা আছে নবকিশোরের সে জ্ঞান

ছিল না। তাহার মন মালতীর প্রতি শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিতেছিল। মালতীকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্য নবকিশোর বলিল—এখানে তোমাকে দেখবে শুনবে কে?

—ভগবান, আর আমি নিজে।

নবকিশোর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে তুমি অমন ভয়ে ব্যস্ত হয়ে খুড়িমাকে চিঠি লিখেছিলে কেন?

মালতী লজ্জিত হইয়া গলার স্বর নামাইয়া থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—সংসারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অল্প বলে ভয় হয়।

—এখনো ত সে ভয়ের কারণ দূর হয়নি?

—ভগবান যখন আমাকে সংসারে একলা না ছেড়ে দিয়ে ছাড়বেন না, তখন বাধ্য হয়েই সংসারকে চিনে নিতে হবে। যতক্ষণ অপরিচয় ততক্ষণই ত ভয়...

নবকিশোর আর মালতীর কথা ভালো করিয়া শুনিতেছিল না। সে মনে মনে মালতীর সহিত তাহার চেনাশোনা মেয়েদের তুলনা করিতেছিল। মালতীর পাশে তাহাদের ছবি হাস্যোদ্দীপক মনে হইতেছিল। নবকিশোর সঙ্কল্প করিল যেমন করিয়া হোক মালতীকে মথুরাপুরের জমিদারের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া ফেলিতে হইবে; মালতীর আদর্শ, সংসর্গ ও চেষ্টার দ্বারা সেখানকার মূর্খ পরকুৎসাপ্রিয় স্ত্রীসমাজকে ভাঙিয়া গড়িতে হইবে।

নবকিশোর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমার মাসির ব্যবহারে তোমার মনে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার একবার তাঁর মানসিক অবস্থাটাও বিচার করে দেখা উচিত। এককালে তিনি যাদের সমকক্ষ শরিক ছিলেন, তাদের দুষ্ট চক্রান্তে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখন তিনি তাদেরই দ্বারস্থ। তাদের কাছে ভিক্ষা চাইবার সময় তাঁর অভিমান একটু যদি তীক্ষ্ণ হয়েই থাকে তবে সে কি একেবারে অমার্জ্জনীয়?......তুমি তোমার মাসিকে চেন না, আমরা কিন্তু আমাদের খুড়িমাকে খুব ভালো করেই চিনি।

মালতী একটু ভাবিয়া বলিল—তা হতে পারে। কিন্তু যেখানে এক দিকে ভিক্ষা আর অন্য দিকে উপেক্ষা, সেখানে ভিক্ষার মাত্রা বৃদ্ধি করে মাসিমাকে কুণ্ঠিত অপমানিত করাও ত আমার উচিত হবে না। তাঁকে যে এমনতর ভিক্ষার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় জানলে কখনো তাঁকে চিঠি লিখতাম না।

—এখানেও তোমার চেয়ে আমাদের জানবার সুবিধা বেশী। বিপিনের মা জমিদারের অশিক্ষিতা গৃহিণী, তাই তিনি খামখেয়ালি, গর্ব্বিতা, অসহিষ্ণু; কিন্তু আসল মানুষটি বড় সাদা, বড় স্নেহশীলা, অল্পেই তাঁহাকে তুষ্ট করা যায়, রাগ তাঁর বেশীক্ষণ থাকে না। যদি তাঁর খেয়াল বুঝে চলা যায় তবে তাঁকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। খুড়িমা সেইটি পারেন না বলেই যত গণ্ডগোল বাধে। বিপিন মধ্যস্থ হয়ে দু দিক সামলায়। বিপিন বাড়ী থাকলে এত গণ্ডগোল হত না। বিপিন শিগ্‌গিরই বাড়ী যাবে, তখন আর কোনো গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা থাকবে না। ......তোমার আর কোনো ওজর-টোজর শুনব না। এই দেখ হরিবিহারী বাবু তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি বিপিনের হয়ে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি;

তোমাকে যেতেই হবে। সে বাড়ীতে তোমার যাওয়ার দরকার আছে; তোমাকে দিয়ে আমরা ঢের কাজ করিয়ে নেব। আমরা দুই বন্ধুতে অনেক কাজ করবার মতলব ঠাওরে রেখেছি, তোমায় গিয়ে তাতে সাহায্য করতে হবে।……স্পষ্ট কথা বলতে কি তোমাকে প্রথমটা একটু বিরাগ তাচ্ছিল্য হয়ত সহ্য করতে হবে। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠলে আর কোনো গণ্ডগোল থাকবে না।

মালতী নবকিশোরের সরল সবল চরিত্রের আভাস পাইয়া মুগ্ধ হইতেছিল; সে চুপ করিয়া রহিল। নবকিশোর ইহাতে প্রীত হইয়া বলিল—কালকেই আমরা রওনা হব তবে, কেমন? যাত্রার দিনের জন্যে পাঁজি খুঁজতে হবে না ত?

মালতী হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—না। পাঁজির ধার ধারি নে।

নবকিশোর দরাজ গলায় জোরে হাসিয়া বলিল—তবে ত তোমাকে মথুরাপুরে আমরা না নিয়ে গিয়ে ছাড়বই না। আমাদের দুই বন্ধুর অখ্যাতি আছে যে আমরা পাঁজি পুঁথি মানি নে; তুমি গেলে আমাদের দলে আর একজন বাড়বে।……তুমি তা হলে সমস্ত গুছিয়ে ঠিক হয়ে থেকো, আমি কাল এসে নিয়ে যাব। এখন তবে আমি যাই।

নবকিশোর ছাতা চাদর লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

মালতী মৃদুস্বরে বলিল—একটু মিষ্টিমুখ না করে' যাওয়া হবে না।

নবকিশোর সমস্ত ঘর ভরিয়া হাসিয়া বলিল—সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতন আমারও যে মিষ্টান্নের প্রতি বিষম পক্ষপাত এ কথা আমার এই প্রকাণ্ড শরীরটা কিছুতেই গোপন রাখতে দেয় না। তা দাও, আমার আপত্তি নেই।

হরির মা আসন পাতিয়া জলখাবারের ঠাঁই করিয়া দিলে নবকিশোর আসনে গিয়া বসিল। ক্ষণকাল পরেই সলজ্জ স্মিত মুখে মালতী জলখাবারের রেকাবি হাতে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। নবকিশোর এতক্ষণ মালতীকে দেখিতে পায় নাই, মালতী অন্তরালে বসিয়াই কথা বলিতেছিল। এখন তাহাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া নবকিশোর মুখ তুলিয়াই দেখিল তাহার কি অপরূপ রূপ! একখানি ধোয়া নরুন পেড়ে শাড়ীতেই এই নিরাভরণা তরুণীকে রাণীর মতো মহিমাময়ী দেখাইতেছিল। নবকিশোর সসম্ভ্রমে আসনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। মালতী তাহার সামনে জলখাবারের রেকাবি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

(৭)

জেদের বশে খুড়িমা মালতীকে নিজের কাছে আনাইবার চেষ্টায় বিরত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু মন তাঁহার নিশ্চিন্ত ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন—কোন্ সেই দূর দেশে তাঁহার বোনঝি রহিয়াছে; সে এই নিষ্ঠুর সংসারে একেবারে একা। শুধু আছে তাহার পরিপূর্ণ যৌবন আর অপরূপ রূপ! কে তাহাকে এইসব শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবে? তিলমাত্র অশুচিতা যদি তাহাকে কলঙ্কিত করে তবে তাহার লজ্জা ও প্রত্যবায়ের ভাগী তিনিও। ধিক্ ধিক্ তাঁহার ক্রোধকে, কেন তিনি এমন দারুণ

শপথ করিয়া বসিলেন, এ প্রবৃত্তি তাঁহার কেন হইল? হতভাগা মেয়েটার জন্য শত্রুর কাছে মাথা হেঁট ত সেই করিতেই হইল, অথচ কোনো কাজ হইল না! মেয়েটা কি এমনি অপয়া—যেখানে পা দিয়াছে সেখানেই আগুন জ্বালিয়াছে! কি কুক্ষণেই তাহার জন্ম! পরের গলগ্রহ হওয়ার যে দৈন্য এতদিনের অভ্যাসের তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল মালতীর জন্যই ত তাহা আজ তাঁহার নিজের ও পরের কাছে নূতন হইয়া উঠিয়াছে! কি লজ্জা! কি লজ্জা! মালতীর এখানে আসিয়া কাজ নাই, তাহার না আসাই ভালো! কিন্তু সে যে অনাথা! আহা সে যে ছেলেমানুষ! তাহার মুখের দিকে তাকাইতে দ্বিতীয় লোক যে আর কেহ নাই!

খুড়িমার মন এমনি ভাবে একবার মালতীর দুঃখে কাতর হইতেছিল, আবার নিজের আহত অভিমান তাঁহাকে কঠিন করিয়া তুলিতেছিল। বিরাগ ও মমতার মধ্যে তাঁহার চিত্ত দোল খাইয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না যে মালতীর সম্বন্ধে তিনি উদাসীনই থাকিবেন অথবা তাহার জন্য কিছু চেষ্টাই করিবেন।

এমনি অমীমাংসার মধ্যে কয়দিন অবিশ্রাম কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মালতীকে আনিবার জন্য হরিবিহারী বিপিনকে ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবকিশোরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা খুড়িমা জানিতেন না। হরিবিহারী একান্তবাসী মিতবাক্ মানুষ, তিনি এ কথা কাহাকেও বলা আবশ্যক মনে করেন নাই; পাছে মালতী আসিয়া পড়ার আগে তাহার আসার সংবাদ প্রকাশ পাইলে কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটে এই ভয়ে ভট্টাচার্য্যও সে কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। তিনি কেবল খুড়িমাকে সান্ত্বনা দিতেন—মা, ভেবো না, যেমনটি হলে ভালো হবে নারায়ণ ঠিক তেমনি করে দেবেন। আমরা কতটুকু ভাবতে পারি মা, আমাদের ভাবনা তিনিই ভাবছেন।

বাস্তবিক খুড়িমা ভাবিয়া চিন্তিয়া কূল-কিনারা পাইতেছিলেন না। তিনি বেদনা-কাতর দেহমন ঠাকুরের পায়ের কাছে লুটাইয়া দিয়া চোখের জলে নিবেদন করিতেন—হে ঠাকুর, আর পারিনে, আর পারিনে। রক্ষা কর ঠাকুর, রক্ষা কর!

একদিন প্রভাতে খুড়িমা ঠাকুরঘরে বসিয়া অশ্রুজলে ঠাকুরের পূজা করিতেছেন, এমন সময় অন্দরের দেউড়িতে পাল্কীবেহারার ক্লান্ত কলরব শোনা গেল।

অন্দরে একটা কৌতূহলের সাড়া পড়িয়া গেল। এমন অসময়ে বিনা সংবাদে আসিল কে? গিন্নি পর্য্যন্ত যখন জানেন না, তখন ইহার মধ্যে কিছু রহস্য আছে। ছেলে মেয়ে আর দাসীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। বৌঝিরা উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ঘন ঘন দরজায় উঁকি মারিতে মারিতে সম্ভব অসম্ভব নানান রকম আন্দাজ করিতে লাগিল।

খুড়িমার কাহারও সহিত সম্পর্ক নাই। তিনি ঠাকুরঘরেই চুপ করিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। যে আসিল সে যদি মালতী হয়!—এই সম্ভাবনায় আনন্দ ও ভয়, আশা ও দুঃখ তাঁহার মন বিমথিত করিতে লাগিল, তাঁহার

বুকের ভিতর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

সকলকে ঠেলিয়া রোহিণীই আগে দেউড়িতে দৌড়িয়াছিল। সে গিয়া দেখিল নবকিশোরের পশ্চাতে একটি জীবন্ত প্রতিমা অন্দরের দিকে আসিতেছে। রোহিণী সম্ভ্রমে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এত রূপ যাহার সে কি মানুষ!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—অবাক হয়ে কি দেখছ রোহিণী? এ আমাদের খুড়িমার বোনঝি।

রোহিণী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ও যে ঠাকরুণ নয়, পরী নয়, এমন কি মেমও নয়, ও খুড়িমার বোনঝি মালতী মাত্র, একজন অতি সাধারণ মেয়ে—যাহাকে লইয়া এই সেদিন এতবড় তুমুল কাণ্ড হইয়া গেল এ সেই,—ইহা মনে করিয়া রোহিণী আশ্বস্ত হইল! সে একমুখ হাসিয়া বলিল—ওমা! এই খুড়িমার বোনঝি বুঝি! আমি বলি দাদাঠাকুর বুঝি শেষকালে ঘাগরাপরা মেম বিয়ে করে আনলে!

মালতীর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে চকিতে একবার রোহিণীকে দেখিয়া মাথা নত করিল। রোহিণীর ভাবভঙ্গী তাহার মোটেই ভালো লাগিল না।

নবকিশোর রোহিণীর দিকে এমন তীব্র ভাবে চোখ রাঙাইয়া তাকাইল যে রোহিণী দ্বিতীয় রসিকতার জন্ম উদ্যত রসনা সংযত করিয়া অন্দরের দিকে ছুটিয়া পলাইল। সে নবকিশোরকে ভালো রকমই চিনিত।

রোহিণীকে ফিরিতে দেখিয়া সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন বর্ষণ করিতে লাগিল—কে রোহিণী? কে রে? কে এসেছে?

রোহিণী তখন খুড়িমাকে খবর দিয়া জ্বালাইবার জন্য ব্যস্ত। সে ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল—ওগো, আমাদের খুড়িমার ঘাগরাপরা মেম বোনঝি এসেছে গো!

নবকিশোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মালতী উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ছেলে মেয়েরা চারিদিক হইতে নবকিশোরকে জড়াইয়া ধরিয়া কলরব করিতেছিল। বিনোদ বলিল—দাদাঠাকুর, তুমি এলে, বড়দা এল না?··· এইবার তোমায় রোজ একটা করে গপ্প বলতে হবে কিন্তু!

পাঁচু বলিল—হ্যাঁ, সেই সাত ভাই চম্পার গপ্প!

বিনোদ বাধা দিয়া বলিল—না না, ও ত পুরোণো গপ্প। সেই সোনার কাঠি রূপোর কাঠির গপ্প, সেই রাজপুত্তুরের তালপত্র খাঁড়া আর কাঠের পক্ষীরাজ ঘোড়ার গপ্প বলতে হবে দাদাঠাকুর······

নবকিশোর হাসিতে হাসিতে দুই হাতে দুইটা মাথা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল—হাঁ রে হাঁ, বলব রে বলব, সব বলব। এখন বাঁদররা একটু থাম দেখি, দেখছিস নে তোদের একজন নতুন দিদি এসেছে? ও ঢের গপ্প জানে। যা, ওর সঙ্গে সব ভাব করগে যা।

ছেলেরা সবিস্ময় কৌতূহলে অপরিচিতা আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৌয়েরা নবকিশোরকে দেখিয়া একগলা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া দুই

আঙুল ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া মালতীকে দেখিতেছিল। ঝিউড়িরাও নির্ব্বাক নিষ্পন্দ হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। কেহই অগ্রসর হইয়া মালতীকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিল না।

রোহিণীর বিদ্রূপে মালতীর মনের মধ্যে কান্না জমিয়া উঠিয়াছিল; এখন সকলের বিরাগভরা ব্যবহারে তাহার অশ্রু রোধ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—এ কি এ কোথায় আসিলাম? সকলের এত তাচ্ছিল্য সহিয়া এখানে টিকিয়া থাকিব কেমন করিয়া? এমন ভাবে সকলের দৃষ্টির লক্ষ্য হইয়া আর কতক্ষণ লজ্জা পাইতে হইবে? কেহ কি তাহাকে একবার ডাকিয়া তাহাদের নিজেদের মধ্যেকার একজন করিয়া লইবে না? মাসিমা, তিনিই বা কোথায়?

নবকিশোর মালতীর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া করুণ সান্ত্বনার দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই তাহার চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহা লুকাইবার জন্য মালতী মাথা নত করিল। এই অপরিচিত বিরূপ নারী-মণ্ডলীর মধ্যে একা নবকিশোরকে বন্ধু দেখিয়া যতই সে তাহার প্রত্যাশা করিতেছিল ততই তাহার ভয় বাড়িতেছিল যে পরের ঘরে নবকিশোর কতক্ষণ তাহাকে আগলাইয়া থাকিবে? এই-সমস্ত বিরূপ লোকেদের বিরাগ সহ্য করিয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে। মালতী এই সম্ভাবনার চিন্তাতেই ব্যাকুল হইয়া নিরাশ্রয়ের হতাশ দুর্ব্বলতায় একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার মতন হইতেছিল। আর সে নিজেকে যেন সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

এমন সময় বিনি তাহাকে বাঁচাইল। সে এতক্ষণ মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সাহস করিয়া অগ্রসর হইল, এবং মালতীর হাত ধরিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—তুমি আমাল্ দিদি? তুমি গপ্প বলবে?

মালতী সমুদ্রে যেন কূল পাইল। সে তাড়াতাড়ি বিনিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে চুম্বন করিতেই তাহার সকল চেষ্টা ভাসিয়া গেল—প্রভাতবায়ুর স্নিগ্ধ স্পর্শে শুভ্র সুন্দর শিউলি ফুলের মতো অশ্রু-বিন্দুগুলি ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ বাড়ীর কেহ একজন তাহাকে আদর করিয়া আত্মীয় বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছে! তাহার সমস্ত লজ্জার গ্লানি এই ছোট্ট মেয়েটুকু আদর দিয়া মুছিয়া দিয়াছে!

মালতী তাড়াতাড়ি চোখের জল আঁচলে মুছিয়া নবকিশোরের দিকে সকরুণ প্রসন্ন দৃষ্টি ফিরাইল। নবকিশোরও এতক্ষণে কিছু বলিবার অবকাশ পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; সে বলিল—এ আমাদের বিনি, আর ইনি আমাদের মা......

বিনি পাছে মালতীকে ছুঁইয়া ফেলে এই ভয়ে গিন্নি তাড়াতাড়ি বিনিকে ধরিতে আসিয়াছিলেন; তিনি ধরিবার আগেই মালতী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল; গিন্নি তাহা দেখিয়া কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। মালতী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই, পায়ের কাছে সাপ দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া চমকাইয়া পিছু হটে তেমনি করিয়া তিনি সরিয়া গিয়া বলিলেন—

থাক থাক, আমায় ছুঁয়ো না।……বিনি, কোল থেকে নেমে আয় বলছি! নাচতে নাচতে গিয়ে কোলে ওঠা হল! যা রোহিণীর কাছে, ঘাগরা খুলে কাচতে দিগে যা!…… গেলি?

নবকিশোর মালতীর আগমনটা কিছুতেই সহজ করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না বলিয়া সে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। সে এখন মালতীকে খুড়িমার জিম্মায় সঁপিয়া দিতে পারিলে নিষ্কৃতি পায়। সে গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিল—মা খুড়িমাকে দেখছিনে, খুড়িমা কোথায়?

তাঁহাকে না জানাইয়া মালতীকে একেবারে আনাইয়া লওয়াটা যে ছোট বৌয়েরই কারসাজি সে বিষয়ে গিন্নির কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি রুদ্ধ রোষে দগ্ধ হইতেছিলেন। নবকিশোরের প্রশ্ন শুনিয়াই তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন—কে জানে তোমাদের খুড়িমা কোথায় আছেন না আছেন! তাঁরা হলেন রাণী লোক! আমাদের মতো দাসী বাঁদীদের তাঁরা কিছু বলেন, না পোঁছেন।

নবকিশোর নিরাশ্রয় ভাবে একবার চারিদিকে চাহিল। ক্ষমা বলিল—খুড়িমা ঠাকুরঘরে।

নবকিশোর মিনতির স্বরে বলিল—নিয়ে যা-না ভাই ক্ষমা, মালতীকে খুড়িমার কাছে। আমি ততক্ষণ মার সঙ্গে একটু গল্প করি…… বিপিন মাকে অনেক কথা বলতে বলেছে……

নবকিশোর পুত্রের নামে মাতার হৃদয় জয় করিবার আশা করিতেছিল।

ক্ষমা মালতীর দিকে অবাক হইয়া একবার চাহিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না মেমকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবে, এবং মেমই বা তাহার কথা কেমন করিয়া বুঝিবে? ইতস্ততঃ করিয়া ক্ষমা মাথার ইঙ্গিতে মালতীকে আহ্বান করিল।

গিন্নি চোখ রাঙাইয়া ক্ষমাকে বলিলেন—আ মর আজুলি ছুঁড়ি! ও ঠাকুরঘরে যাবে কি লা?

ক্ষমা ফ্যালফ্যাল করিয়া একবার গিন্নির দিকে, একবার মালতীর দিকে, একবার নবকিশোরের দিকে চাহিতে লাগিল।

নবকিশোর চেষ্টা করিয়া হাসিয়া গিন্নিকে বলিল—কেন মা, ও ঠাকুরঘরে গেলই বা?

গিন্নি বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—গেলই বা! অজাত কুজাত সকলে অমনি ঠাকুরঘরে গেলেই হল!

—অজাত কুজাত কিসে হল? ও ত তোমারই জায়ের বোনঝি।

—হলই বা জায়ের বোনঝি! ঘাগরা পরেছে যখন তখন ত ও খৃষ্টান হল!

নবকিশোর মালতীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। মালতীর মুখ তখন লজ্জায় অপমানে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

নবকিশোর গিন্নিকে বলিল—ও ত ঘাগরা নয়, ওকে বলে শেমিজ! আবরুর জন্যে আজকাল সহরে ও-রকম জামা সবাই পরছে। তোমরা যে কাপড় পর সেই কাপড় কেটে একটা জামা তৈরি করে পরলেই অমনি জাত গেল? জাত এমনি ঠুনকো! আর, ঘাগরা পরলেই যদি জাত যায় তবে তোমার বিনিরও ত জাত গেছে!

গিন্নি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—ছেলেমানুষে আর বড়ো মাগীতে সমান হল!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—তোমরা জাত মান জানি, তোমাদের ঠাকুররাও জাতের বিচার করেন দেখছি! তোমাদের মতন গুটিকয়েক শুচিবেয়ে লোকেরই শুধু দেবতা! তাঁরা আর কারো কেউ নন! অথচ কথায় কথায় তোমরাই বল যে দেবতা পতিত-পাবন!

গিন্নি নবকিশোরের যুক্তির কাছে পরাজিত হওয়াতে উষ্ণ হইয়া হাত ও নথ নাড়িয়া বলিলেন—পতিতপাবন বলে' কি মেলেচ্ছ এসে ঠাকুর যজাবে! চাঁদপানা মুখ দেখে তোরা মাথায় করে নাচবি বলে' কি আমরাও জাত খোয়াব, না, ঠাকুরকে অপবিত্তর করব? তুই লেখা পড়া শিখে কি হলি বল দেখি কিশোর? শাস্তরে আছে, সেলাই করা কাপড় পরে দেবকার্য্য হয় না, তা জানিস? নইলে দরজিরা মোছলমান হলো কেন তা বল!

—না মা, ওসব শাস্তর আমার জানা নেই। কিন্তু পশ্চিমের পাণ্ডাদের দেখেছ ত? তারা দিব্যি তুলো ভরা জামা পরে পূজো করায়। তার বেলা?

—দেবতার পাণ্ডা আর আমরা এক হলাম! তোর জ্ঞান বুদ্ধি কবে হবে কিশোর? তো হতেই এত বড় ভটচায্যি গুষ্টিটার নাম ডুববে দেখছি!

নবকিশোর দেখিল এ তর্ক মীমাংসা হইবার নয়। ওদিকে মালতী শিথিলবৃন্ত ফুলটির মতো নিরাশ্রয় দাঁড়াইয়া আছে। তাই নবকিশোর হাসিয়া বলিল—এর চেয়ে বেশী জ্ঞান বুদ্ধি তোমার কিশোরের হবে না মা। আমার আছে, ওকে গোবর টোবর খাইয়ে যদি শুদ্ধ করে নিতে পার ত তাতে তোমার নাম-যশ আর পুণ্য দুইই হবে। ওর সমস্ত ভার ত তোমাকেই নিতে হবে। খুড়িমা ত ওকে আনাতে চানিনি, ও তোমার যশ শুনেই ত তোমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে......

এই কথায় গিন্নির মন খুসী হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—তা এসেছে যখন তখন কি আর আমি তাড়িয়ে দেবো? কিন্তু তোমায় বলে রাখছি বাছা, ওসব মেলেচ্ছপনা তোমায় ছাড়তে হবে। এ নয়, সে নয়, বিধবা মানুষের এই ধারা, ছি!......ছোট বৌয়ের আক্কেলকে বলিহারি যাই! মেয়েটা এক পহর এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা একবার উঁকি মেরে দেখার নামটি নেই। ছোট বৌ, ও ছোট বৌ!.. ...

খুড়িমা ঠাকুরঘরে থাকিয়াই টের পাইয়াছিলেন মালতী আসিয়াছে। তিনি বিগলিত অশ্রুধারা রোধ করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে রোহিণী গিয়া কর্কশ ব্যঙ্গস্বরে বলিল—ওগো খুড়িমা, তোমার ঘাগরা-পরা মেম বোনঝি এসেছে যে, দেখসে!

খুড়িমা নিশ্চল মুদ্রিত নেত্রে বসিয়াই রহিলেন, রোহিণীর কথার কোনো সাড়াই দিলেন না।

রোহিণী বিরক্ত হইয়া ফিরিতেছিল, পথে গিন্নির সহিত দেখা হইল। গিন্নি জিজ্ঞাসা করিলেন—ছোট বৌ কোথায় রে রোহিণী।

রোহিণী খুড়িমাকে ভেঙচাইয়া বলিল—ঠাকুরঘরে চোখ বুজে ধ্যান হচ্ছে। বললাম

গিন্নি ঠাকুরঘরে গিয়া ডাকিলেন—ছোট বৌ!

খুড়িমা গলায় কাপড় দিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুপ্লাবিত করুণ দৃষ্টিতে গিন্নির মুখের দিকে চাহিলেন।

তাহা দেখিয়া গিন্নির মন ভিজিল। তিনি নরম সুরে বলিলেন—শুধু শুধু কাঁদছিস কেন ছোট বৌ? মা-মরা মেয়েটা এসেছে, তাকে দেখ শোন। আয় আয় বেরিয়ে আয়......

অনেক কষ্টে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করিয়া খুড়িমা বলিলেন—দিদি, আমি এই ঠাকুরঘরে বলছি আমি ওকে আনাই নি, ঘুণাক্ষরে জানিও না যে ও আসবে। ও তোমারই আশ্রয়ে এসেছে; তুমিই ওর মা মাসি; তুমিই ওকে দেখবে।

গিন্নি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—হাঁ তা ত দেখবই। তবু তুই একবার এসে দেখ।...... কিন্তু বলে রাখছি ছোট বৌ, এ বাড়ীতে ওসব মেলেচ্ছ চাল চলবে না।

খুড়িম' এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি গিন্নির পশ্চাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই দেখিলেন নবকিশোরের পশ্চাতে একটি পরমা সুন্দরী তরুণী দাঁড়াইয়া আছে! এই অপূর্ব্ব রূপসী তাঁহার বোনঝি! এ কী রূপ! ডাগর চোখ দুটি লজ্জায় নত হইয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে; নিটোল গাল দুটিতে লজ্জার অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরণে একটি শেমিজ বেড়িয়া একখানি চুল-পেড়ে ধুতি। ঘোমটায় মাথার অর্দ্ধেক ঢাকা; কালো রেশমের মতো চুলগুলি শুভ্র সুন্দর কপালখানির উপর ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে। একগাছি করিয়া সরু সোনার চুড়ি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সুগোল মণিবন্ধটি আলিঙ্গন করিয়া আছে।

এ সব দেখিয়া শুনিয়া খুড়িমার মন মালতীর প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। গরিবের মেয়ের এত রূপই বা কেন, আর এত সাজসজ্জাই বা কিসের জন্য? কিন্তু তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে ইহার জন্য মালতী একটুও দায়ী নহে—গরিব বাঙালী বিধবা বলিয়া বিধাতা তাহাকে রূপ যৌবন স্বাস্থ্য দিবার বেলা একটুও কৃপণতা করেন নাই, এবং মালতীর পিতামাতা তাঁহাদের একমাত্র সন্তানকে একেবারে বিধবার সর্ব্বশূন্য রিক্ত বেশ পরাইতে পারেন নাই। ম.লতী অভ্যাসের বশেই রূপ ও বেশ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যে কাহারও বিরাগ ও কৌতূহলের কারণ হইতে পারে তাহা সে মনেও করে নাই।

নবকিশোর প্রণাম করিয়া সরিয়া গেলে মালতী অগ্রসর হইয়া তাহার মাসিমাকে প্রণাম করিল, কিন্তু এবার সে পায়ের ধূলা লইবার চেষ্টা করিল না। মেয়েটার এই ভব্যতার অভাব ও অহঙ্কার দেখিয়া খুড়িমার মন অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি শুষ্ক কঠোর স্বরে শুধু বলিলেন—এস।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(৪)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবসঙ্গী আর একজন ছিলেন ৺ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।* গুণেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু বলিলেন যে "গুণুদাদা ও আমি প্রায় একবয়সী। আমরা ছেলেবেলায় বরাবর একত্রে থাকিতাম, একসঙ্গে খেলাধূলা এবং একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করিতাম। তিনি অত্যন্ত পরদুঃখকাতর, স্নেহশীল এবং উদারহৃদয় ছিলেন। আমরা দুইজনে যেন হরিহর-আত্মা ছিলাম। এক হাতার মধ্যে আমাদের দুই বাড়ী। "এ বাড়ী" আর "ও বাড়ী"। তিনি রোজ সকালে আমাদের বাড়ী আসিতেন। আরও দুই চারি জন সঙ্গী লইয়া আমাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় আমরা আড্ডা বসাইতাম। গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় বড় আমোদ পাইতেন। কত রকম কল্পনা যে আমাদের মাথায় আসিত, তাহার কিছুই ইয়ত্তা নাই; কিন্তু সে সব গল্পেই উবিয়া যাইত, কাজে কিছুই পরিণত হইত না। তবুও ওরই মধ্যে আমি একটু কেজো' ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া তখনি তাহাকে কাযে পরিণত করিবার জন্য তৎপর হইতাম। তা' সে ছেলেমানুষীই হউক্ আর যাই হউক।



গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"একদিন কথা উঠিল আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন সংবাদ "প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা "অদ্ভুত নাট্য" খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর বৈঠকখানায় তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। একটা গান ছিল,—

ও কথা আর ব'লোনা, আর ব'লোনা,
বল্‌ছো বঁধু কিসের ঝোঁকে

* ইঁহার তিন পুত্র :—গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ।

ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা

হাসবে লোকে, হাস্‌বে লোকে—

হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে!—

হাঃ হাঃ হাঃ—এ জায়গাটাতে সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। বৈঠকখানায় ঐরূপ "হা হা হা" সুরে অট্টহাস্য হইত আর ধূপধাপ্ শব্দে তাণ্ডব নৃত্য চলিত। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় এই "অদ্ভুত নাট্য" বড় দাদার নামে আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু বড়দাদা (শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

"একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—সেকালে কেমন "বসন্ত-উৎসব" হইত। আমি বলিলাম—এসোনা আমরাও একদিন সেকেলে ধরণে বসন্ত-উৎসব করি, গুণুদাদার কল্পনা খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কোনও এক বসন্ত-সন্ধ্যায় সমস্ত উদ্যান বিবিধ রঙীন্ আলোকে আলোকিত হইয়া নন্দন কাননে পরিণত হইল। পিচ্‌কারী আবীর কুঙ্কুম সমস্ত সরঞ্জাম উপস্থিত হইয়া গেল। খুব আবীর খেলা হইতে লাগিল। তারপর গান বাজনা আমোদ প্রমোদও বাদ গেল না। ইহাতে অনেকগুলি টাকাও খরচ হইয়া গেল।

"আর একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—আমাদের মধ্যে Free mason এর মত একটা কিছু করিলে হয় না? এই কল্পনাটা গুণুদাদার খুব লাগিল ভাল। এ প্রস্তাবে তিনি খুব অনুমোদন করিলেন। আমি বলিলাম—এখনি এর উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাউক্। দেশী masonic দলের কিরূপ পরিচ্ছদ হইবে প্রথমে তাহাই স্থির করা যা'ক্। দরজী আসিল, কাপড়ের পরামর্শ বসিয়া গেল। "ও বাড়ীর" সংলগ্ন একটা ছোট বাড়ী নূতন কেনা হইয়াছিল, সেই বাড়ীতে আমাদের Free mason-এর আড্ডা বসিল। Free-mason সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা কিছুই ছিল না। এ সভায় আমাদের কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহারও কিছু স্থির নাই। এই মাত্র ধারণা ছিল যে, আমাদের যাহা কিছু করিতে হইবে সমস্তই গোপনে করিতে হইবে। একটা "প্রতিজ্ঞা পত্র" লিপিবদ্ধ হইল। তাহার মর্ম্মটা এইরূপ:—এখানে আমরা যাহা শুনিব, যাহা দেখিব বা যাহা করিব, তাহার ইঙ্গিত মাত্র কাহারও নিকটে প্রকাশ করিব না। সে যেন হইল, কিন্তু ঘরের পরিচারক ভৃত্য বুদ্ধু বেহারার সম্বন্ধে কি করা যাইবে? স্থির হইল, আমাদের অন্যতম mason ভ্রাতা অক্ষয় বাবু (প্রসিদ্ধ "কমিক" অভিনেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মজুমদার)—হিন্দি ভাষায় বুদ্ধুকে এই প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। তিনি অমনি বুদ্ধুকে বুঝাইতে লাগিলেন—"দেখো বুদ্ধু, হিঁয়া তোম্ যো কুছ্ দেখো গে, কভি কিসিকো নেই বোল্‌না ইত্যাদি।" বুদ্ধু একথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বলিয়া উঠিল—"হম্ কেন বল্‌বে মশাই?" সংক্ষেপে এই কয়টি কথা বলিয়াই সে ঘরের ঝাড়পোঁচ কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইল। ফ্রিমেশানি পালার এই-খানেই ইতি হইল। সৌভাগ্য ক্রমে

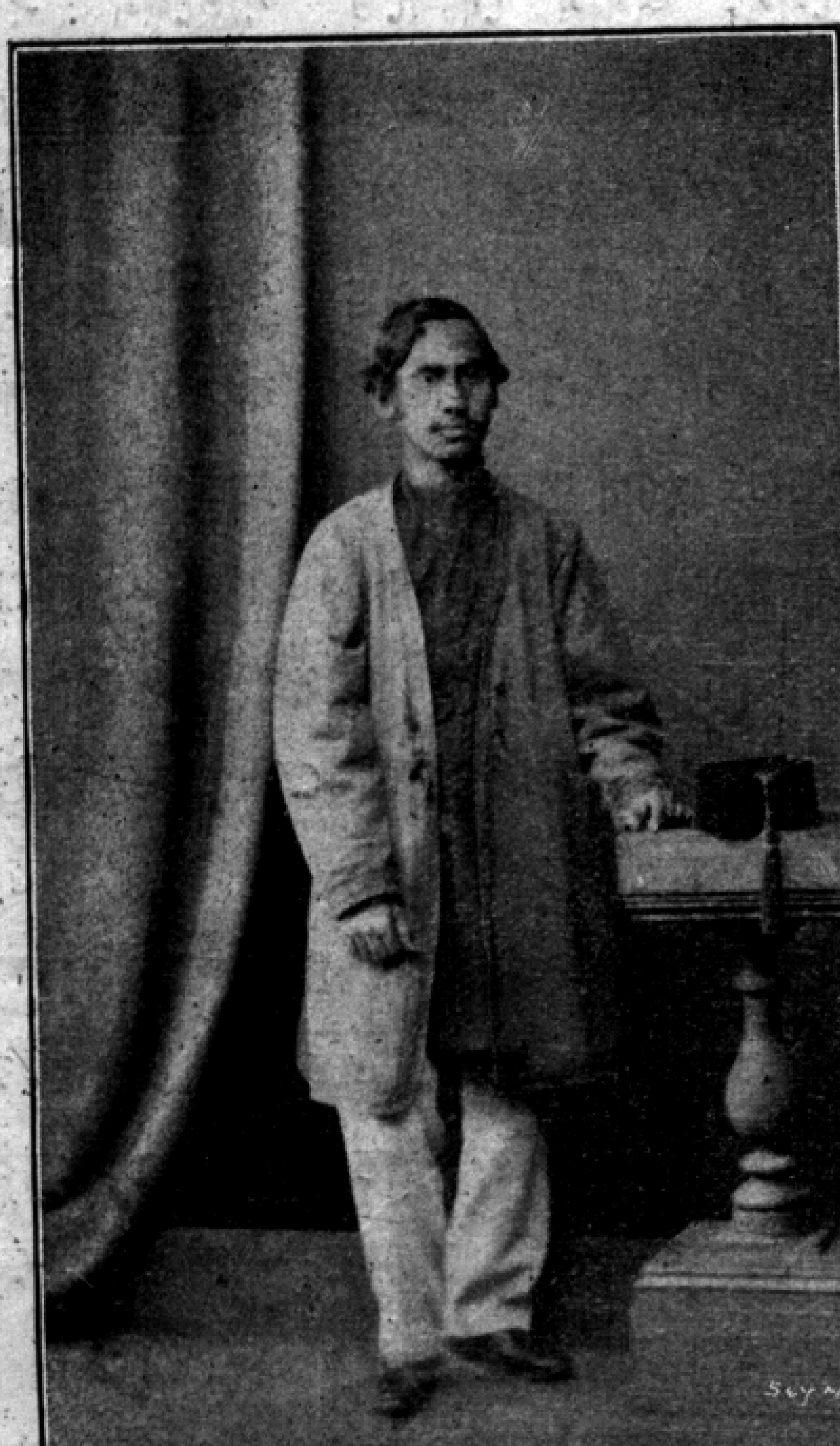
আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।" এইখানে জ্যোতিবাবু, গুণেন্দ্রনাথের দয়া ও আশ্রিত বাৎসল্যের একটা গল্প বলিলেন। "আমাদের একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ঋণগ্রস্ত হইয়া গুনুদাদার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সেইখানেই অবস্থিতি করিতেন। পাওনাদার তাঁহার উপর ওয়ারেণ্ট জারী করিবার সুযোগ পাইত না। কোন ঘরের শত্রু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। গুনুদাদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের এ বাড়ীতে আসিয়া আমাকে জাগাইলেন এবং এই বিপদের কথা জানাইলেন। বেঙ্ক বন্ধ—এত রাত্রে—অত টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে। আমার তখন হাটখোলায় পাটের আড়ৎ ছিল—লোক পাঠাইয়া সেখান হইতে তখনি টাকা আনাইলাম—তিনি সেই টাকায় ঋণ পরিশোধ করিয়া ঐ বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিলেন।"

মধ্যে একবার জোড়াসাঁকো-বাড়ীর আগাগোড়া মেরামৎ ও জীর্ণ সংস্কার করিবার প্রয়োজন হয়। সেই উপলক্ষ্যে নৈনানে শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল মহাশয়ের বাগান বাড়ী ভাড়া লইয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলে সেখানে কিছুদিন বাস করিতেছিলেন। বাড়ীটি খুব বড়, দোতালা, বাড়ীর হাতাও খুব বিস্তৃত। হাতার মধ্যেই খানিক দূরে রান্না বাড়ী। রান্না বাড়ীটি বড় বড় গাছে ঘেরা, তার সামনে ঘাট বাঁধান একটা পুষ্করিণী। চাকরেরা রাত্রি ১১টা ১২টার সময় রান্নাঘরের সাম্‌নে দিয়া যদি যায় অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শেষে এমন হইল যে একদিন একটা চাকর অত্যধিক ভয়ে মরিয়াই গেল। কিন্ত

নামে একজন বৃদ্ধ হর্‌করা ছিল। জ্যোতিবাবু কিনুকে ডাকিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করেন; সে উত্তর করিল—"দাওয়ানজীর (মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়) মত চেহারা, মাথায় তাঁরই মত পাগ্‌ড়ী কে একজন রোজ রাত্রে রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া জ্যোতিবাবু ভূতের অস্তিত্ব নির্ণয়ে খুব কৌতূহলী হইলেন। বাল্যকালেও তিনি ভূত বিশ্বাস করিতেন না, এজন্য তিনি মনে মনে একটা গর্ব্বও অনুভব করিতেন। যাহাই হউক, এক্ষেত্রে তিনি ভূত আবিষ্কার ব্যাপারে নিজেই ব্রতী হইলেন। একদিন রাত্রি ১২টার পর একাকী রান্নাঘরের দিকে গেলেন। যেমন রান্নাঘরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, অম্‌নি দেখিতে পাইলেন সত্য সত্যই কে একজন পাগ্‌ড়ী মাথায় দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভয় তাঁহার যথেষ্টই হইয়াছিল, কিন্তু গর্ব্ব তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। নিকটতর হইয়া যাহা দেখিলেন তাহা নিতান্তই হাস্যকর। দেওয়ালের একটা জায়গায় খানিক চুন বালি খসিয়া গিয়া স্থানে স্থানে কালো এবং সাদা সাদা রেখাপাত হইয়া সমস্তটা দূর হইতে একটা পাগড়ী-পরা মূর্ত্তির মত দেখাইতেছিল। চাকর বাকরেরা ইহাকেই ভূত কল্পনা করিয়া এত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোতিবাবু তখন সকলকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন;—সেই হইতে ভূতের ভয়ে আর কেহ মূর্চ্ছা যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি মজার গল্প বলিলেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এঁদের বন্ধু বান্ধবগণ অথবা বন্ধুপুত্রেরা অনেকে থাকিয়া লেখা পড়া করিতেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও ইঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় পড়িয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রসিক লাল পাইন্ নামে তখন একজন ছাত্র থাকিতেন। জ্যোতিবাবু স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি যেন রসিক বাবুদের বাড়ী গিয়াছিলেন, এবং দেখিয়া আসিয়াছেন যে তাঁহাদের বাড়ী ঘেঁসিয়া একটা আতা গাছ উঠিয়াছে; কখনকখনও আতা শুকাইয়া শুকাইয়া তাঁহাদের ছাদের উপর পড়ে। রসিক বাবুকে এ স্বপ্নের কথা বলায় তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করে জান্‌লে?" জ্যোতিবাবু একথা তাঁহার বড়দাদাকে



মনোমোহন ঘোষ

(দ্বিজেন্দ্রনাথ) বলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু আবার এই কথা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়কে বলেন। প্যারীবাবু তখন খুব spiritualism এর অনুশীলন করিতেছিলেন। তাঁহার মতে আত্মা শরীর ছাড়িয়া বাহির হইয়া কখনকখনও অন্যত্র যায়। এ স্বপ্ন বৃত্তান্তটি তিনি তাঁহার মতের পোষক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু আরও যে দুই একটা কথা বলিয়াছিলেন তাহা এইখানে বলি।—"আমাদের যোড়াসাঁকো বাড়ীতে তিনি যে ঘরটিতে থাকিতেন, সেই ঘর (তিনি চলিয়া গেলেও) অনেক দিন পর্য্যন্ত "মনমোহনের ঘর" বলিয়া অভিহিত হইত। সকালে দেখিতাম, একটা ধুতি পরিয়া ও গায়ে একটা গুল্‌বাহার চাদর জড়াইয়া তিনি পাঠাভ্যাস করিতেছেন। কখন কখন দেখিতাম, বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে একজায়গায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া মস্তক উন্নত করিয়া, পকেটে দুই হাত দিয়া, ভাবে ভোর হইয়া অস্ফুট স্বরে সেক্‌স্‌পিয়ার আবৃত্তি করিতেছেন। একটা আবৃত্তির দুই একটা কথা আমার এখনও মনে পড়ে—যথা—"Nor poppy nor Mandagora" ইত্যাদি। এই কথাগুলা তিনি কতকটা সংস্কৃতছন্দের টানে পড়িতেন;—"নর্" এই শব্দটির র্-কে অকারান্ত করিয়া "নর" এইরূপ পড়িতেন, এবং সমস্তই একটু টান্ দিয়া পড়িতেন যথা,—"নরপপী নরম্যান্ ডাগোরা" —আমার বেশ লাগিত। তখন হইতেই আমাদের রাষ্ট্রিক উন্নতিসাধনের দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক্ ছিল, এবং এই উদ্দেশ্যে

তিনি পিতৃদেবের অর্থসাহায্যে "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক ইংরাজি সংবাদপত্র বাহির করেন। এবং তিনিই তাঁর প্রথম সম্পাদক হন। তিনি তখনই বেশ ইংরাজি লিখিতে পারিতেন! এই সময়ে Captain Palmer বলিয়া একজন সুলেখক জুটিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে পারিশ্রমিক দিয়া কাগজে লেখান হইত। তিনিই সমস্ত লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। দোষের মধ্যে লোকটি মাতাল ছিলেন। তিনি যাহা কিছু পাইতেন সমস্ত মদেতেই উড়াইয়া দিতেন। আমার মনে পড়ে, পামার সাহেব মদের পয়সা সংগ্রহ করিবার জন্য খুব অল্প দামে, মাথায় দুর্ব্বিন-বসানো একটা ভাল ছড়ি সেঝদাদাকে বিক্রয় করিয়া যান।



মনোমোহন ঘোষ

নানা স্কুল পরিবর্ত্তন করিয়া শেষে হিন্দু স্কুল হইতে জ্যোতিবাবু কেশব বাবুর স্থাপিত "কলিকাতা কলেজে" ভর্ত্তি হয়েন। কেশব বাবুর ইচ্ছা ছিল এই বিদ্যালয়টিকে তিনি কলেজে পরিণত করিবেন, তাই Calcutta College নাম রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। যাহাই হউক্ এ স্কুলে তখনকার সব কৃতবিদ্য মনীষীরা অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করিতেন, যেমন আচার্য্য কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার, উকীল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর তারকনাথ পালিত প্রভৃতি। কেশব বাবু নীতি উপদেশ দিতেন। বোর্ডে নানারূপ চিত্র বৃত্ত ও শাখা প্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষ আঁকিয়া কর্ত্তব্যবিভাগ—ঈশ্বরের প্রতি, মানুষের প্রতি, আপনার প্রতি—বুঝাইয়া দিতেন, আরও নৈতিক উৎকর্ষসাধনের জন্য নানাবিধ বক্তৃতা দিতেন। তাঁহার সচিত্র উপদেশ ছাত্রদিগের খুব হৃদয়গ্রাহী হইত।

ক্লাস বসিবার আগে সমস্ত ছাত্রেরা একটি ঘরে সমবেত হইত। যে শিক্ষক আগে আসিতেন তিনি ছাত্রদিগকে বাইবেল-উক্ত Lord's Prayerটি বলাইতেন ঃ—

Our father, which art in Heaven Hallowed be Thy name.

Thy kingdom come. Thy will be done on earth, as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts, as we forgave our debtors.

And lead us not unto temptation, but deliver us from evils; for Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever.

Amen.

বঙ্গানুবাদ—হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হউক্। তোমার রাজ্য আসুক্। তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি সিদ্ধ হউক্। আমাদিগকে আজ আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য দাও। আর আমরা যেমন আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি, তেমনি তুমিও আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আর আমাদিগকে প্রলোভনের দিকে লইয়া যাইও না, আমাদিগকে মন্দ হইতে রক্ষা কর। যেহেতু রাজ্য, পরাক্রম এবং মহিমা নিত্যকাল তোমারই। আমেন্।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় বেদোক্ত "ওঁ পিতা নোঽসি" মন্ত্রটির* সহিত এই Lord's Prayerএর একটু মিল আছে;

* "ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ শম্ভবায় চ ময়ো ভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিব তরায় চ।"

বঙ্গানুবাদ ঃ—তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার; আমাকে মোহপাশে হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না। হে দেব, হে পিতা, পাপ সকল মার্জ্জনা কর। যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। তুমি যে সুখকর

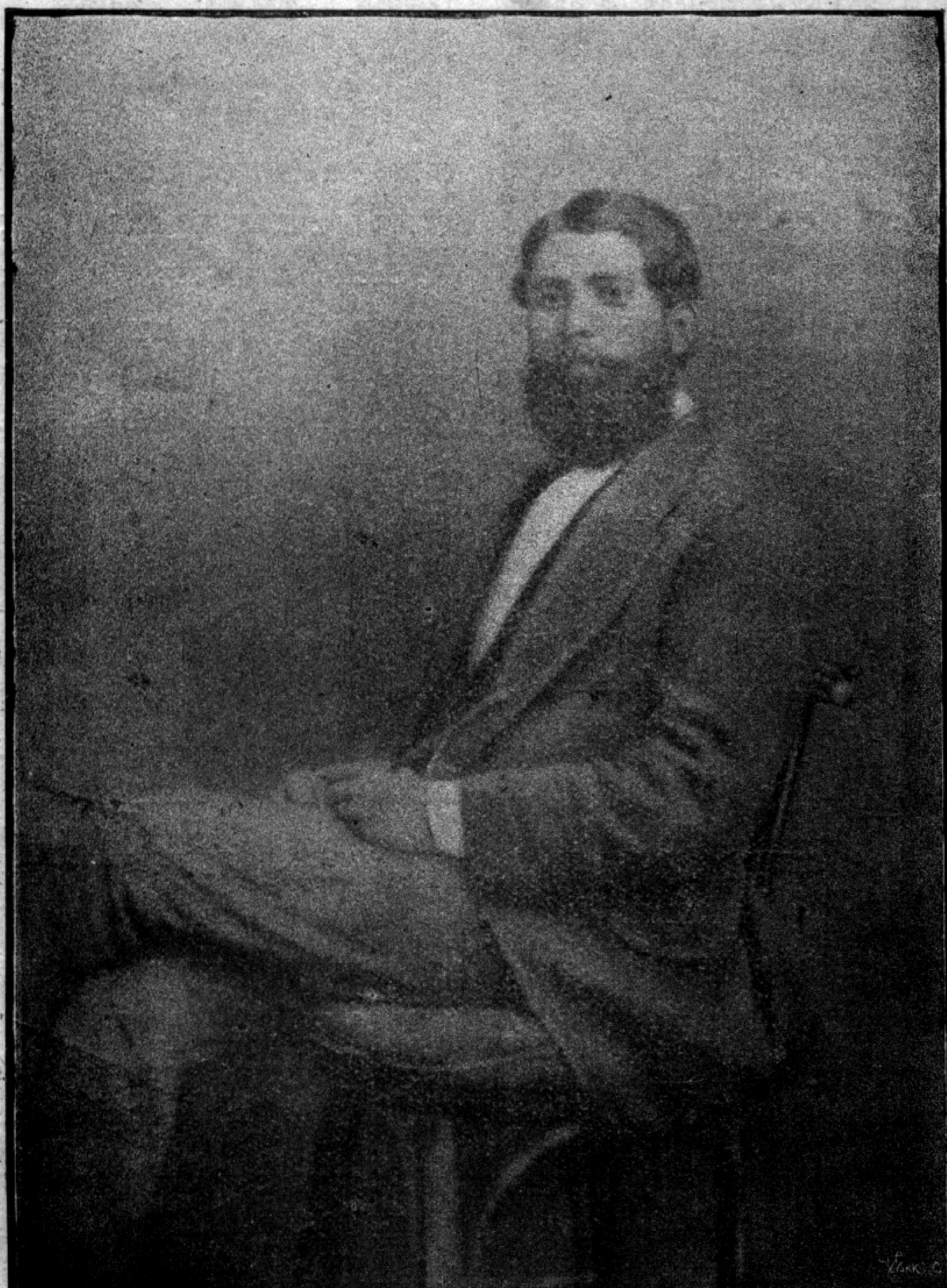
কিন্তু আমাদের এই বেদমন্ত্র উক্ত Prayerটি হইতে কত উন্নততর এবং গভীর! উক্ত প্রার্থনায় আছে 'Daily bread দাও' আর বৈদিক ঋষিরা প্রার্থনা করিয়াছেন, "জ্ঞান-শিক্ষা দাও।" বোধহয় হিন্দুউপনিষদ্ ও বেদের উপর তাঁহাদের তত আস্থা ছিল না। অথবা অনুশীলনের অভাবের ফলেই এই সুন্দর প্রার্থনা তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াছিল।"

এই Calcutta College হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার শেষ দিনে যেদিন ইতিহাস ও ভূগোলের পরীক্ষা হইতেছিল সেদিন একটা ভারি মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। যখন ঘণ্টা বাজিল তখনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উত্তর লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল Sutcilff সাহেব পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া কাগজগুলি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াই টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তখনও আরও কয়েকটি ছেলে লিখিতেছিল, ঘণ্টা বাজিয়া তখন এক মিনিটও হয় নাই, তবু তাঁহার নিকট হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া কেন যে সাহেব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, বুঝিতে না পারিয়া তিনি একবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন যে, "হিন্দুস্কুলের ছেলেদিগকে তিনি অনেক রকমে অনুগ্রহ করিতেন, আর অন্তস্কুলের ছেলেদের উপরই যত অত্যাচার। অথবা পাহারা দিয়া দিয়া তাঁহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—আমাকে সম্মুখে পাইয়া আমার উপরেই ঝালটা ঝাড়িলেন।" জ্যোতিবাবু

হউক পাশ হওয়ার বিষয়ে তিনি একেবারে নিরাশ হইলেন। একদিন তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, পথিমধ্যে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জানাইল যে তিনি পাশ হইয়াছেন। তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। শেষে জানিলেন যে সত্য সত্যই জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলেন। জ্যোতিবাবু প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর A. Sectionএ পড়িতেন, B. Sectionএ পড়িতেন বিহারীলাল গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা। Rees সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চাটুগাঁয়ের ফিরিঙ্গি। তাই তাঁর ইংরাজিতেও পূর্ব্ববঙ্গের টান্ ছিল। বাস্তবিক তিনি গণিতে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁর গর্ব্বটা আরও অধিক ছিল। কোন একটা দুরূহ গণিত-সমস্যার সমাধান করিয়া বলিতেন, এরূপ ভাবে সমাধান আর কেহ করিতে পারিবে না—এমন কি "The man of upstairs" অর্থাৎ উপরি ওয়ালা Sutcliff সাহেবও পারিবেন না। তিনি কাহাকেও বড় প্রশংসা করিতেন না—কেবল একবার জ্যোতিবাবুর বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগ্য বলিতে হইবে। তাঁর বড়দাদা সেই সময়ে নূতন প্রণালীর এক জ্যামিতি ছাপাইয়াছিলেন। ছাত্রেরা মজা দেখিবার জন্য তাঁর হস্তে একখণ্ড দিল—তিনি খানিকটা পড়িয়া বলিলেন "This man

পড়াইতে আসিতেন। তাঁর মুখের কাছে মাছি ভন্‌ভন্‌ করিত, আর হাত দিয়া ক্রমাগত তাড়াইতেন। তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের ছাত্র দেখিলেই তাহাকে নাকাল করিয়া ছাড়িতেন কিন্তু সহুরে ছাত্রকে কিছু বলিতেন না। ৺ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু যখন পড়াইতে আসিতেন তখন ক্লাসে হট্টগোল হইত কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবু যখন আসিতেন তখন টুঁ-শব্দ হইত না,—এমনি তাঁর একটা গাম্ভীর্য্য ও চারিত্র-প্রভাব ছিল। ছাত্রেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা



স্যর টি পালিত

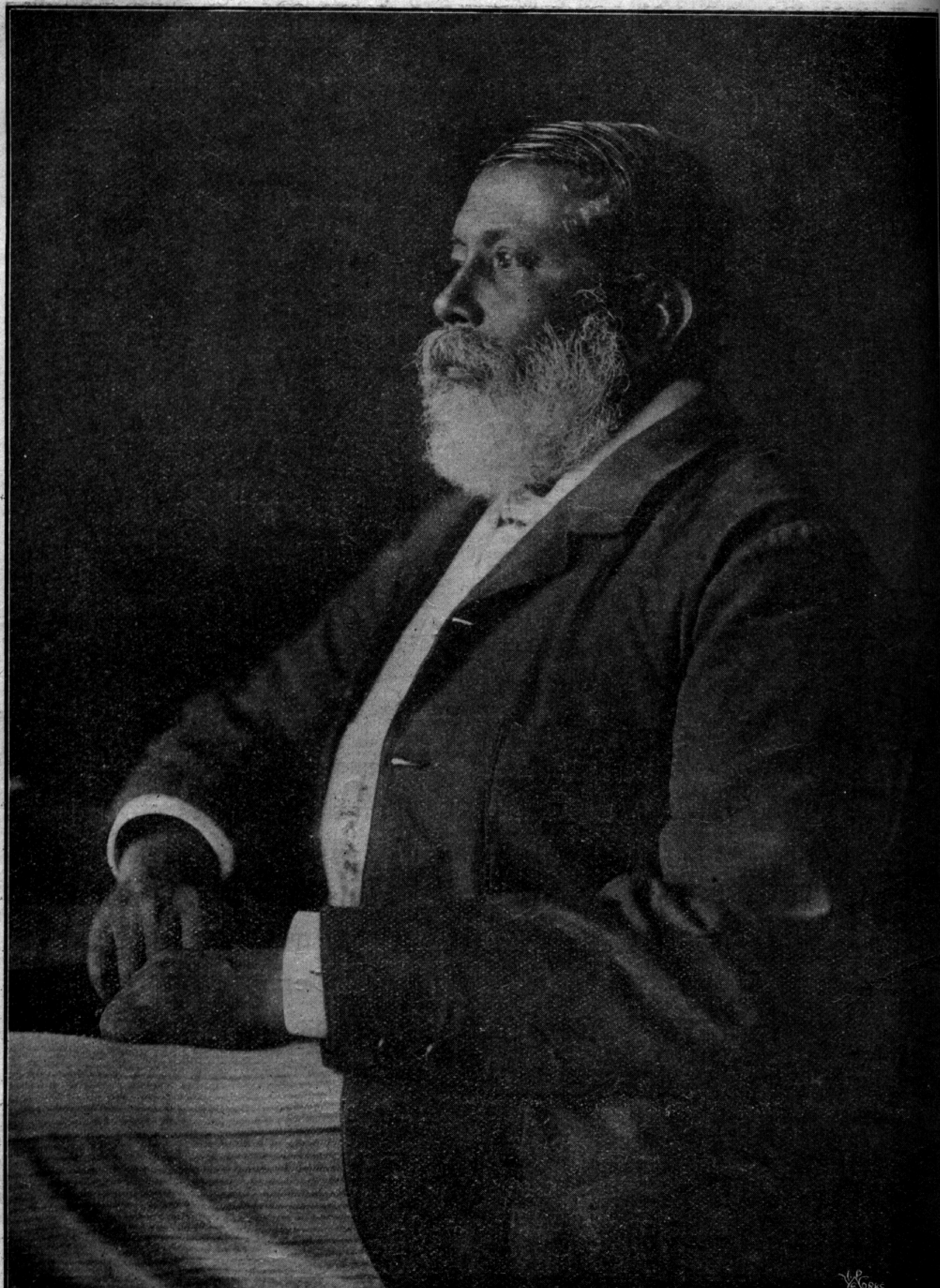
না করিয়া থাকিতে পারিত না। Lt. Ives ইংরেজী পরাইতেন। Ives সাহেবের গলা খুব উচ্চ ছিল, যখন তিনি পড়াইতেন তখন সমস্ত হল্‌খানি তাঁহার কণ্ঠস্বরে কাঁপিতে থাকিত। একদিন কি একখানি বইয়ে Mont Blanc কথা পাওয়া গেল। Ives সাহেব একে একে সমস্ত ছাত্রকে উক্ত বাক্যের শুদ্ধ উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু সকলেই বলিল, "মণ্ট্‌ব্ল্যাঙ্ক", শেষে জ্যোতিবাবুকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, "মঁ ব্লঁা",—শুনিয়াই Ives সাহেব খুব প্রীত হইলেন—এবং জ্যোতিবাবু যে ফরাসী ভাষা জানেন, সাহেবের এ ধারণা জন্মিয়া গেল। কিন্তু জ্যোতিবাবু তখন পর্য্যন্ত ফরাশীর এক বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তবে তিনি কি করিয়া এ উচ্চারণ জানিলেন? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "মেজ্‌দাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) তখন নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট বিলাতের গল্প শুনিতে শুনিতে ঐ কথাটির প্রকৃত উচ্চারণ শুনিয়াছিলাম—তাহাই আমার মনে ছিল।" যাহাই হউক, জ্যোতিবাবুর ক্লাসে একটা খুব প্রতিপত্তি হইয়া গেল। Ives সাহেবেরও জ্যোতিবাবুর উপর খুব একটা ভাল ধারণা জন্মিয়া গেল। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য কত দিন তাঁহার বাড়ী যাইতে বলিয়া ছিলেন, কিন্তু যাওয়া তাঁহার হইয়া উঠে নাই।

Ives সাহেবের বাড়ী গিয়া পড়া ত দূরের কথা ক্লাসেই তিনি নিয়মিতরূপে যাইতেন না, যদিবা যাইতেন ত' পলাইয়া আসিতেন। তখন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নীচের একটা ঘরে ইহাদের আড্ডা বসিত, সেখানে গান বাজনা গল্পগুজব খুব পুরাপুরিই চলিত। First Year এমনি করিয়া গান বাজনা প্রভৃতিতেই কাটিয়া গেল। Second Year ও যায় যায়। পরীক্ষার সময় যখন খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন খুব মনোযোগ দিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিলিয়ান হইয়া এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসিয়া এই খানে ইহাদের সহিত মিলিত হইলেন। পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ক্রমশ তাঁহার শিথিল হইয়া আসিল। তিনি মিষ্টার ঘোষের নিকট ফরাসী শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাঁর অক্লান্ত লেখনী বার্দ্ধক্য জরার ভীষণ ভাব অবহেলা করিয়া আজিও ফরাসী ভাষা হইতে অমূল্যরত্নরাজি আনিয়া বঙ্গভারতীর সাহিত্য-মঞ্জুষা পরিপূর্ণ করিতেছে, সেই ফরাশী ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হইল এই কাশীপুর-উদ্যানবাটিকায়। মনোমোহন ঘোষমহাশয় প্রথমেই ভল্টেয়ার কৃত নাটক "সীজার" (Cæsar) তাঁহাকে পড়ান:— তিনি বলিলেন, তাহার প্রথম চরণের একটু অংশ এখনও তাঁহার কর্ণে যেন ধ্বনিত হইতেছে:—

"Ceasar tu vas regnier"—সেজার তু ভা রেঞিয়ে; অর্থাৎ—সিজার তুমি রাজত্ব করিতে যাইতেছ—ইত্যাদি।

যাহাই হউক এইখানে জ্যোতিবাবু তাঁহার মেজ বৌ-ঠাকুরাণীর নিকট বোম্বায়ের অনেক



স্যর টি পালিত

গল্প শুনিতেন। বোম্বায়ের গল্প, সমুদ্র ও দৃশ্যাবলীর কথা শুনিতে শুনিতে বোম্বায়ের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন। পরীক্ষা না দেওয়াই স্থির করিলেন এবং বোম্বাই যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। পরীক্ষা দিবেন না কাযেই ফীও দাখিল করা হইল না। বোম্বাই যাত্রার সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। ইতিমধ্যে পালিতমহাশয় (স্যর টি পালিত) তথায় গিয়া উপস্থিত। তিনি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধরণে থান্ ধূতি ও আপাদ-লম্বিত মোটা চাদর পরিতেন। সে পরিচ্ছদের বেশ একটা শোভন গাম্ভীর্য্য ছিল। সেই পরিচ্ছদে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত রোমক সেনেটার বলিয়া মনে হইত। এইবার হয়ত পড়াশুনার সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে মনে করিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র জ্যোতিবাবু ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি জ্যোতিবাবুকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন,—তিনি জ্যোতিবাবুকে পরীক্ষা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফী দেওয়া হয় নাই শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সেজন্য কোনও চিন্তা নাই, আমি Sutcliff কে বলিয়া তোমার ফী জমা করাইয়া দিব।" জ্যোতিবাবু মহা মুস্কিলে পড়িলেন কিন্তু শেষে তাঁহারই জিত হইল। পরীক্ষা না দিয়াই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

লাইকা

(১১)

তখন বন্ধনমুক্ত কুরঙ্গের ন্যায় লাইকা যথেচ্ছভাবে চলিল; বন পর্ব্বতে ভ্রুক্ষেপ নাই;—এই কয়দিন জনসমাজে বাস করিয়া সে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—এইবার স্বেচ্ছাবিহারে সে যেন মুক্তবায়ুর স্পর্শ সুখানুভব করিল! গুর্জ্জরের শ্যামল বনভাগ দিয়া, নারিকেল কুঞ্জের বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে লাইকা সুরাটে আসিল।

এইখানে আসিয়া তাহার স্মরণ হইল প্রায় বৎসরাতীত হইল সে আপনার জন্মভূমি ত্যাগ করিয়াছে।—কত স্মৃতিময় দেশ সে আর কতসুখময়?—কত কত কি আছে সে দেশে? লাইকা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। এত মনোরম দৃশ্যপূর্ণ কত নগর জনপদ কত পল্লী—কত বিচিত্র উপত্যকারম্য পার্ব্বত্য ভূমি দেখিল—কিন্তু কোথায় সে দেশের তুল্য সুখ?—দুটি একটি স্মৃতি বা বিস্মৃত কল্পনায়—এক একটি স্থান মানুষের নিকট এত প্রিয় হয় কেন?—লাইকা মনে মনে হাসিল।—কিন্তু হায়! সে দেশে কি ফিরিবার সুখ তাহার আছে?—এই চিন্তা বিষাক্ত শল্যের ন্যায় তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল,—চিন্তার হাত এড়াইবার জন্য সে সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিল।

তাহারা ক্রমে সাতপুর পর্ব্বতমালার নিম্নে উপস্থিত হইল। তাপ্তী নদীর তটভূমে নির্জ্জন বনভূমি,—দুই চারিজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী

তথায় তপস্যা করিতেন,—সন্ন্যাসীদল তাহাদের চরণ দর্শন করিয়া চলিয়া গেল কিন্তু লাইকা গেল না,—সে একজন সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া তাহার শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিল —হাসিয়া তিনি সম্মত হইলেন।

তখন সে সেইখানেই থাকিল। সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন "তুমি কি চাও বৎস ?—" লাইকা বলিল "দয়া করিয়া আপনি যাহা শিক্ষা দিবেন তাহাই !

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বিদ্যা ত তুমি অনেক আয়ত্ত করিয়াছ দেখিতেছি—আমার নিকট তুমি কি চাও তাহাই বল !"

লাইকা অধোমুখে বলিল—"বিদ্যা ? বিদ্যাও ভার প্রভু, আমি এমন কিছু চাই যাহাতে এই জগতের সমস্তই ভুলিতে পারি ?"

সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন "জগতে কি কোন ব্যথা পাইয়াছ বৎস ?—ভাল আমি তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে চাই না,—কিন্তু আসক্তির জ্বালায় যদি সংসার ত্যাগ করিয়া থাক—তবে সে মোহবন্ধন মুক্ত হওয়া কঠিন,—তবু চেষ্টা কর অবশ্যই সফল মনোরথ হইবে।"

লাইকা থাকিল।—দুই বৎসরকাল সে সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিল। কিন্তু কোথায় শান্তি ?—কোথায় সে অনাসক্ত অথচ সকলেরই দুঃখে সমান ব্যথাশীল নির্ভীক প্রাণ ?—এ আত্মসুখেচ্ছায় জর্জ্জর—কাতর অশ্রুবিবর্ণ প্রাণ লইয়া সে কোথায় লুকাইবে ? এ পর্ব্বত গুহাও যে তাহার পক্ষে সেই রাজপুরীর ন্যায়ই ভীষণ। এ মায়াবাদী সংসারত্যাগী অশ্রুহীন সন্ন্যাসীর সঙ্গও যে লাইকার উপযোগী নয়। যাহাদের নিকট প্রেম মায়া,—স্নেহ মায়া,—ভক্তি মায়া—কোমলতা দৌর্ব্বল্য,—মাধুরী অর্থহীনতা, আর তাহার চিরপ্রিয় সঙ্গীতের নাম, স্নায়ু দুর্ব্বলকারী—অকারণ ভক্তিজনক প্রলাপ কাকুলি—; তাঁহারা কি করিয়া লাইকার হৃদয়প্রভু গুরুপদে অভিষিক্ত হইবেন ?

লাইকা ভীত চিত্তে ভাবিল এ দুই বৎসর কাল সে কি করিয়া এ পাষাণের বিরাট ভার বক্ষে লইয়া বাঁচিল ?—কেমন করিয়া এতদিন এ "প্রেম বিমুখের সঙ্গ" সহ্য করিল ? —কি আরামের এ গিরিগুহা—কত শুষ্ক এ জীবন যাত্রা !

তখন সে বিনীত ভাবে গুরুর নিকট আপনার কর্ত্তব্যচ্যুতির কথা জানাইল। বলিল, সে বালিকা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, এতদিনে সে বুঝিয়াছে এই নারীর দীর্ঘনিশ্বাসই তাহার সকল বেদনার মূল,—তাহার অশ্রু মুছাইতে না পারিলে বোধ হয় সেই পরম দয়ালের নিকট সে ক্ষমা পাইবে না। সুতরাং সে ফিরিতে চায়।"

সন্ন্যাসী আবার হাসিয়া নিঃশব্দে সম্মতি জানাইলেন। লাইকাও দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। গিরিসঙ্কটের দৃশ্য তাহার অসহ্য হইয়াছিল—সে বক্রমুখে গোন্দোয়ানার পথ ধরিল।

চারিদিকে জনকোলাহল,—কান্নাহাসি —কলহউৎসাহ—শোক ও সুখ !—কি উত্তেজনা—কি সমপ্রাণতা ! এই হৃৎতন্ত্রী-সংস্পর্শী বিশ্ববীণা মুখরিত সংসার ছাড়িয়া লাইকা কোন মূর্চ্ছিত জগতে বাস করিতে

গিয়াছিল ?—সৌন্দর্য্যের মহিমায় সেখানেও দুঃখ ছিল না,—সেই নীরব গিরিগুহার পার্শ্ব-ভূমিও বিহঙ্গ কলতানে ঝঙ্কৃত হইত, বেতস লতার বংশবনে বায়ুবেণু বাজিত, তরুমর্ম্মরে মধ্যাহ্ন রৌদ্র মিশিয়া রাগ ও শব্দের উজ্জ্বল মিলনে এক জীবন্ত রাগিণীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইত!—সুন্দর সেই অশ্বত্থ পত্রের স্বচ্ছ অবসর পথে দৃশ্যমান্ পীত রৌদ্রোজ্জ্বল মেঘখণ্ডে আসীনা সেই রাগিণী সারঙ্গিকার রূপ অতুল্য সুন্দর!—লাইকা একা সেই মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াই জীবন শেষ করিয়া দিতে পারিত, কিন্তু হায়—সেই পাষাণপ্রাণ সন্ন্যাসী যে ইহারই বিরোধী!—প্রভাতে তাপ্তীর জলে যখন প্রথম উষালোক জ্বলিত, তীরের প্রস্তর গুটিকামালার সহিত তাহার লহরী খেলা আরম্ভ হইত,—তীরের লতা সেই জলে নিজের পুষ্পসজ্জা ভাসাইয়া দিত,—আর তাপ্তী সলিল সেই ফুল আপনার বুকে চাপিয়া লইয়া হাসিয়া নাচিয়া ভাসিতে থাকিত,—তখন লাইকা ভাবিত, এত সং প্রতিদানময় সংসারে সে কোথাও স্থান পাইল না কেন? এ আপনাতে আপনি বিসর্জ্জন কি শ্বাসরোধকর!—নদীস্রোত বহিয়া চলিয়াছে—বায়ুস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, লতায় ফুল ফুটে কিন্তু ঝরিয়া পড়ে,—আকাশে চন্দ্র সূর্য্য জ্বলে তাহাতে ধরণী হরষিতা;—সকলেরই উদ্দেশ্য আছে সকলেই একের আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে—লাইকারই কি উদ্দেশ্য নাই?—সে ভগবানের চরণে আপনাকে বিকাইতে চাহিয়াছিল, বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আপনার মানসী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই চরণে আপনার জীবন মরণ অর্পণ করিতে চাহিয়াছিল—কিন্তু সন্ন্যাসী তাহা হাসিতে উড়াইলেন—বলিলেন "এতখানি বিহ্বলতার মধ্যে বন্ধনচ্ছেদ অসম্ভব?"—ইহাও বন্ধন? হোক তবে বন্ধন, ইহাই লাইকার উপজীবি-সেব্য এবং সর্ব্ব!

(১২)

লাইকা অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। অসম্ভব—আর সেই মানসী প্রেয়সীর দর্শন ভিন্ন জীবন ধারণ অসম্ভব!—রাজভবনের কষ্টকে আর কষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছিল না—এই প্রসারিত বিশাল সংসারে এমন বিপুল ধরণীতে লাইকার জন্য স্থান নাই! সমস্তই গিরিগুহার ন্যায় অন্ধকার—পাষাণ বেষ্টনীর ন্যায় দুর্ভেদ্য অলঙ্ঘ্য! দুই বৎসর কাল পর্ব্বতে বাস করিয়া দারুণ নির্জ্জনতায় লাইকার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল,—সে এতদিন আত্মার স্বরূপ খুঁজিতে গিয়া আপনার জীবনরাগিণীকে খুঁজিয়াছে—আজ তাহারই মূর্ত্তিতে আত্মার রাগ ভাসিয়া উঠিয়াছে—আজ সেই তাহার সব—সেই তাহার আত্মা সেই তাহার জগৎ—সেই তাহার ওঙ্কারস্বরূপা ব্রহ্মমূর্ত্তি!—সে কাহাকে খুঁজিতে এ কাহাকে পাইল!

আহা এত সুন্দর সে?—অন্ধকারে সূর্য্যালোকের ন্যায়—সাগর নিমগ্নের সম্মুখের তটরেখার ন্যায় সে কি প্রার্থনীয়া!—কোথায় সে?—এই দুই বৎসরের তপঃক্লিষ্ট পাষাণপীড়িত লাইকা কতক্ষণে তাহাকে দেখিয়া এ কষ্টের অবসান করিবে?—

লাইকা চলিল। সে ভাবিতেছিল এ ভালই

হইয়াছে ; বিবাহের পরই যদি তাহাকে পত্নী ভাবে পাইতাম তবে বুঝি সে এমন অপরূপ মূর্ত্তিতে মনোনয়নে প্রতিভাত হইত না ; সাধারণ মানবের ন্যায় মানবীর আকারে সে তাহার স্ত্রীরূপে সহধর্ম্মিণী ভাবে জীবন যাপন করিত। কিন্তু একি অপরূপ মূর্ত্তি ?—এ কি অভিনব অনুভব ?—লাইকা তখন মানস নয়নে দেখিতেছিল—যেন, পূর্ব্বাকাশ প্রান্তে এক অপূর্ব্ব শীতল জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যোদয় হইয়াছে—! সাগরবেষ্টিতা নদীমালিনী, শ্যাম কাননাঞ্চলা তুষারগিরিকিরীটিনী ধরণী তাহার চরণতলে আবেশনতা।—চারিধারে নীল আকাশ যেন তাহাকে স্পর্শআশায় অন্তরে অন্তরে শিহরিতেছে।—ঘন পুঞ্জিত মেঘরাশি ললাটে রামধনুর সপ্তবর্ণ রেখা আঁকিয়া তাহার চরণ তলে লুণ্ঠিত।—কিন্তু সেই ধরণী সেই আকাশের, সেই মেঘের, সেই প্রার্থনার অনুভবের এবং স্পর্শের, সকল হইতে বিচ্ছিন্ন—বহুদুরে অতি উর্দ্ধে সেই আলোক কেন্দ্র ! কেহ তাহার নিকটে নাই —একা ভক্ত হৃদয় মাত্রে প্রতিভাষিত সে নবারুণ—অতি উর্দ্ধে জ্বলিতেছে ! তাহারই মধ্যে ও কে ?—কে ও ?—উদ্যৎ প্রদ্যোতন শতরুচি” ও কে পুরুষ না নারী ?—“সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী” ও কে দেবী ?—

সে তখন বিন্ধ্যতনয়া নর্ম্মদার বিরাট প্রপাতের নিকট দাঁড়াইয়াছিল ! যেন সদ্যঃ প্রভাত দৃশ্য, তাহার উর্দ্ধে নিম্নে পার্শ্বে—, সর্ব্বত্র তখন মর্ম্মর পাষাণ দেহে নবোদিত সূর্য্যালোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে—আর প্রবল ভৈরব জলোচ্ছ্বাস রব জগতের সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া দিয়াছে—; লাইকা সেই প্রপাত প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। বিগলিত হৃদয়ের অশ্রু নয়ন বহিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণে সে চেতনা পাইল, তখন শত শত নর নারী বালকবালিকা সেই নদী স্রোতে স্নানে আসিয়াছে। চারিদিকে হাস্য কলরব। সে উঠিয়া বসিল ; জলে উজ্জ্বল রৌদ্র জ্যোতিঃ খেলিতেছে। সহসা লাইকা যেন দেখিল হাস্য জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা আপনার বাল্য ক্রীড়ায় চঞ্চলা !—সে কে ?—ও হো কি আনন্দ ! সে যে তাহারই পত্নী,—তাহার এই রক্তমাংসময় হস্তেই ত সেই পুষ্পকমনীয় হস্তখানি অর্পিত হইয়াছিল।

আবার মহোৎসাহে সে চলিতে লাগিল। পথে অজস্র বাধা—সে সকলে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সে আপনার বাঞ্ছনীয় পথে চলিল। কিন্তু একটি গুরুতর বাধায় সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, পথিমধ্যে দেখিল তাহার কয়জন সন্ন্যাসী মিত্র চলিয়াছে—তাঁহারা তাহাকে ধরিলেন ; হরিদ্বারে মেলা আরম্ভের মাত্র দুইমাস বিলম্ব, তাঁহারা যাইতেছেন লাইকাকেও যাইতে হইবে ! তখন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাঁহাদের উপরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিল না,—তাঁহাদের সহিত শিবালিকের অভিমুখে চলিল !—গোমুখী ক্ষেত্রে বিরাট জ্ঞানধর্ম্মসঙ্ঘ, —দেখিয়া লাইকা মুগ্ধ হইল। সেস্থানে আসিয়াছিল বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল।—কিছুদিন সেই উৎসাহেই কাটিল।

শীতের অবসান, বসন্ত পঞ্চমী চলিয়া গেল।—আনন্দোৎফুল্ল লাইকা ভাবিল যদিই বা দোল পূর্ণিমায় তথায় উপস্থিত হইতে না পারি তবু মধু পূর্ণিমায় নিশ্চয়—! আর বিলম্ব করিব না। মধুঋতু সমাগমে প্রফুল্ল

কোকিলের ন্যায় উন্মাদ গীত গাহিতে গাহিতে লাইকা চলিল।—সে গীতের কি সুর—কি মূর্চ্ছনা— কি আবেগ!—পথের পথিক শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। নগরে নগরে উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়া পল্লীতে পল্লীতে নবীননবীনার হৃদয়ে উল্লাস তরঙ্গ তুলিয়া গাহিতে গাহিতে সে চলিল।

(১৩)

পথে বহুদিন কাটিয়া গেল, সাতপুরা হইতে বাহির হইয়া এতদূর আসিতে প্রায় বর্ষ শেষ হইয়া আসিল। পথিমধ্যে হরিদ্বারেও প্রায় তিনমাস গিয়াছে!--যখন লাইকা আপনার জন্মভূমিতে আসিল তখন পরিপূর্ণ বসন্ত।—বর্ষ শেষ প্রায়।—এইখানে আসিয়া তাহার শরীর অবসন্ন হইল,—চরণ যেন আর উঠিতে চাহে না! হায় কি করিয়া সে রাজ-ভবনে প্রবেশ করিবে?—দীন হীন ভিক্ষুক, কি বলিয়া সে মহারাজাধিরাজের—আর সে প্রশ্ন ত এখন নয়—, একবার যেথানে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে সেখানে কি বলিয়া প্রবেশ করিবে?—

ভাবিতে ভাবিতে লাইকা হাসিল।—নিজেকে হীন বলিয়া সে লজ্জা পায় কেন?—সে ত জগতে কাহারও পূজা চায় না ভক্তি চায় না,—কাহারো চক্ষে নিজেকে উচ্চ দেখাইতে চায় না,—তবে নিজের দীনতাকে কেন লজ্জার চক্ষে দেখিতেছে?—জীবনধারণ একান্তই কর্তব্য এই জন্য ভিক্ষা করে—লোকে তাহাকে ভিক্ষুক নাম দেয়,—দিক্!—তাহাতে লজ্জা কি?—যদি সে নামও লোপ পায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি?—লোকে তাহাকে অকর্ম্মা অপদার্থ ভাবে—! হায় কর্ম্ম! তোমার নামেও অন্তরে আত্মগরিমা পোষণ করিতে হইবে?—লোকে কি বলে—কেন বলে—সব কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে তোমার উদ্দেশ্যে প্রাণ দিতে হইবে? আগে তোমার মূল্য নির্দ্ধারণ না করিয়া আপনার আত্মত্বের মূল্য দিতে হইবে?—

সে তুচ্ছ লাইকা?—আর কত তুচ্ছানুতুচ্ছ তাহার জীবন মরণব্যাপী সর্ব্বস্ব?—তাহার মাণ পরিমাণ—দীর্ঘ প্রস্থ—উচ্চ নীচের কেন এত বাদ বিবাদ?—কেন এত প্রশ্ন মীমাংসা?—পায়ের ধুলা পথে পড়িয়া থাকে, শত শত ধূলিকঙ্করনাশির সহিত দীর্ঘ পথরেখার অতি সূক্ষ্মতন অংশে সে পড়িয়া থাকে—পরে তাহার উপর দিয়া যদি এক দিনের জন্যও আরাধ্যতম তাঁহার রক্তচরণ স্পর্শ দিয়া যান—মুহূর্ত্তের জন্যও যদি সে ধূলার বুকে বাঞ্ছিতের পদরেখা অঙ্কিত হয়—সেই কি তাহার জীবন ব্যাপী তপস্যার চরম সার্থকতা নয়?—তিনি যদি তাহার পূজার ফুলের গন্ধ নাই পান—সে যে তাঁহারই আশায় জন্মগ্রহণ করিয়া—তাঁহারই চরণে দলিত মৃত্যু লাভ করিল এ সংবাদ যদি তাঁহার অজ্ঞাতেই থাকিয়া যায়—তবে ক্ষতি কি?—ধূলি তাহার সার্থকতা হইতে ত একটু ভ্রষ্ট হইল না—সে ত পরশমণির স্পর্শে স্বর্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে তবে এই লজ্জা এই ধিক্কার কেন?—

মাতঃ বসুন্ধরে!—অগণিত সন্তান প্রসবিনী জননি!—অতি অক্ষম অতি দীন সন্তান এই লাইকা,—যদি তোমার কোন উপকারে ইহার জীবন শেষ না হয় মা!—সন্তানকে কি ক্ষমা করিবে না?—বিধাতৃ সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড কল্পনায় অপূর্ব্ব উত্তম রাগিণী তুমি,—শত

সুগন্ধ পুষ্পে তোমার বক্ষ সুগন্ধিময়—সহস্র উজ্জ্বল পুষ্পে তুমি বিচিত্র মাধুর্য্যময়ী—, মা গো যদি এই সামান্য বৃক্ষে সামান্য সূর্য্যমুখী ফুল তাহার চিরবল্লভের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র কার্য্যে জীবন শেষ করিয়া সন্ধ্যার মৌন অন্ধকারে তোমার বুকে ঝরিয়া পড়ে—তবে কি তুমি তাহাকে তোমার শীতল ক্রোড়ে স্থান দিবে না?

লাইকা কাঁদিতে লাগিল।—সম্মুখে প্রসারিত শস্য ক্ষেত্র—গোধূম ক্ষেত্রের দীর্ঘ শীর্ষ ক্রমে নুইয়া পড়িতেছে,—পাশ দিয়া ক্ষুদ্র পথরেখা বহিয়া পল্লীবধূ গাগরী মাথায় জল লইয়া ফিরিতেছে; সূর্য্য কখন অস্ত গিয়াছে সে তাহা জানিতেও পারে নাই—সহসা চক্ষু তুলিয়া দেখিল অন্ধকার; সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে!

অশ্রু মুছিয়া লাইকা উঠিল; হায় বাঞ্ছিতে! হায় প্রেয়সী—ভক্তজনের নিকট তুমি এত দুর্লভ কেন?—যে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা সমীপস্থ তাহারই নিকট হইতে তুমি দূরে উচ্চে বাস কর কেন?—দয়াময় ভগবান!—তোমার সেবকের নয়নেই সাগর জল আসিয়া বাস করে কেন?—কাতরের অশ্রুজল কি তোমার প্রিয়—প্রিয়তম?—যে তোমায় ভাল বাসে তাহাকে কাঁদাইতে কি তোমার ভাল লাগে?—তবে তাই হোক—তবে আয় রে অশ্রু! তুই আমার সর্ব্বস্বের প্রিয়—সুতরাং আমারও প্রাণাধিক প্রিয়!—

লাইকা এবার বসিয়া পড়িল—; গদগদ কণ্ঠে কি গাহিতে লাগিল—চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্র ধীরে ধীরে পশ্চিমাঞ্চলে ঢলিয়া পড়িতেছে, পার্শ্বে মোহিনী জ্যোতির্ম্ময়ী রোহিণী!—

মৃদু হাসিয়া লাইকা বলিল—"তুমি রাজাধিরাজতনয়া আর আমি দরিদ্র, তুমি উচ্চে স্বর্ণচূড় প্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর আমি এই নগণ্য পল্লীর অজ্ঞাতনামা সামান্য দীন—তবু তুমি আমার, একান্তই আমার! তুমি আমার পত্নী এ গর্ব্ব রাখি না দেবি,—শুধু তোমায় ভালবাসি—তোমারে আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছি তোমার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আমার সমস্ত বিকাইতে পারিয়াছি—এই আনন্দে তুমি আমার!—জীবনে মরণে আমি একান্তই তোমার এই অখণ্ডবিশ্বাসে তুমি আমার! আমার আমিত্ব কেবল তোমার তত্ত্বে লীন হইয়া গিয়াছে আমি বলিতে কেবল তোমাকেই বুঝায়—আর তুমি বলিতে বুঝি আমি; আপনার জীবনরাগিণী তোমাকেই অনুভব করি, তাই —তাই—আমার ধ্যান জ্ঞান অনুভব--, আমার জীবন মরণ স্মরণ, আমার তারক তৃপ্তি তর্পণ!—আমার সর্ব্বস্বরূপে তুমি আমার!—আত্মার দুইদিনের ক্রীড়াভূমি দেহকে যদি আমার দেহ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি—দুইদিনের বাসভূমি পৃথিবীকে আমার আবাস বলিয়া স্বীকার করি—তবে হে আমার আত্মার চিরনিলয়রূপিনী দেবি! তুমিও আমার—এ কথা বলিব না কেন?

সর্ব্বত্রব্যাপী কি এক প্রসন্নতার অনুভবে লাইকা শিহরিয়া উঠিল! এ সত্য যথার্থই, এ সম্পূর্ণ সত্য?—এ জগতে কিসের অভাবে কিসের বেদনা? সংসারে এত হায় হায় কেন? নিজের আত্মার স্বানুভবে এত প্রীতি এত শান্তি এত শক্তি সত্বেও মানুষ এত অভাব দুঃখ সৃষ্টি করে কেন?

কিন্তু, লাইকা এইখানে অন্তরের মুক্ত-দ্বারের সম্মুখে সহসা নীরব হইল; এ প্রসন্নতা কি শুধু তাহার হৃদয়ের প্রবণতায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে অথবা—এ কি?—তাহার অন্ধ চক্ষুতে যে সহসা এই বিপুল জ্যোৎস্না উদিত হইয়াছে এ আলোকের কারণ নির্ণয়ে অশক্ত হইয়া সে নীরব হইল।

সম্মুখে বিরাট অসীম আকাশ—কত বৃহৎ তারা কত তারকাপুঞ্জ—কত নীহারিকা মণ্ডলী! কত দূরে—কোন অসীমে ইহারা জ্বলিতেছে?—আবার তাহার উপর?—কোথায় এ অসীমের সীমা?—লাইকা চক্ষু মুদিল,—সম্মুখে সীমাহীন হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব আবেগে ফেনিল তরঙ্গায়িত সাগরের ন্যায় দিগন্তরেখায়—বা চিন্তার অতীত ক্ষেত্রে লীন!—এ সর্ব্বত্রময়ী অসীমার মধ্যে কোথায় এ আলোক কেন্দ্র!

ভাবিতে ভাবিতে বোধ হয় সে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছিল—যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল। ক্ষীরোদ সাগরের চূর্ণমুক্তামালায় সজ্জিত ধবল বক্ষে উচ্চ পর্ব্বত স্থাপিত, কৃষ্ণ পাষাণ গাত্রে দুগ্ধউর্ম্মি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—পর্ব্বতের কটিদেশে শ্বেতমাল্যের ন্যায় বৃহৎ সর্প—পুরাণকথিত ভূধারণশক্তিশালী বাসুকী। তাহাকে ধরিয়া দুই পাশে দেবাসুরের শক্তির ও শান্তির অদম্য চেষ্টা যে সেই অসীম পারাপার মন্থন করিয়া জগতের শ্রী ও আলোকের মূর্ত্ত প্রতিমাদ্বয়কে উদ্ধৃত করিবে! আরও লইবে মৃতসঞ্জীবনী—চির মরণশীল জগতে মৃত সঞ্জীবনী সুধা? অদম্য চেষ্টা, মিলনমন্ত্রে আজ বল ও সমতা একত্র, উভয়ে প্রাণপণ বলে সেই বিশাল ভূধরকে আন্দোলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে বিপুল শক্তি নাগরাজও মরণ বলে সেই সাধনা মন্ত্রকে জড়াইয়া আছে—কিন্তু সাধ্য অচল, পর্ব্বত অটল!

হায় শক্তি—হায় সাধনা! কার বলে এ মহোদধি সঞ্চালন করিবে? পুরুষকার একা পুরুষকার এ অসাধ্য সাধন করিবে? অসম্ভব! ইহা যে অসম্ভব তাহা দেবাসুরও বুঝিল, এই নৈরাশ্যের বেগে আকুলতার দৈন্যে তাহারা অদৃষ্ট দৈবনিয়ন্তাকে স্মরণ করিল—"হে নীলভূধরকান্তি, শতসূর্য্য সমুজ্জ্বল!—এস, তুমি হৃদয়ে শক্তি ও বাহিরে মূর্ত্তিরূপে উদয় হও প্রভু!—"

তখন সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেও লাইকা দেখিল,—অপূর্ব্ব শোভা। আকাশ ব্যাপিয়া এক স্নিগ্ধচ্ছায়া নামিয়া আসিতেছে, ধবল দুগ্ধ সাগর সেই বর্ণে অনুরঞ্জিত, মন্দারের উচ্চশিরে সেই নীলছায়া যেন ঘনীভূত,—দেখিতে দেখিতে গিরিচূড়ায় যেন নবপ্রভাতের পূর্ব্বরাগ দেখা দিল,—তাহার পর সেই ঊষারাগরঞ্জিত বর্ণচ্ছটা মধ্যে তরুণ অরুণ উদয় হইল—ছায়া নিম্নে আলোক,—তাহার মধ্যে ও কে? কে ও সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী—সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট?" কে ও অভয় বরদহস্ত—প্রীতিহাস্য কুশলী?—

দেখিতে দেখিতে তখন সেই বিপুল দেবাসুর মিলনসমষ্টি ভক্তিনত হইল। সকলেই চিনিল ইনি সেই জীবমঙ্গল নিদান কল্যাণমূর্ত্তি, সকল গর্ব্বের অবসানে একমাত্র শিব-চৈতন্য? আপনার শক্তিতে হতাশ হইয়া জীব যখন জগৎ ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয় জগতে দৃষ্টিপাত করে তখন হৃদয় মাত্রে যাহার অনুভব পায়—ইনিই

তিনি।—তখন কোন অদ্ভুত শক্তিতে সেই পর্ব্বত তুলিয়া উঠিল। প্রবল উৎসাহে দেব দানব সকলে নাগরজ্জু আকর্ষণ করিবামাত্র সাগরবক্ষ ফেনিল করিয়া তরঙ্গ উঠিল।

তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, মানব হৃদয়ে ভাবের পর ভাবলহরীর বিচিত্র উদ্ভব!—মন্থন চলিতে লাগিল, দৈবভক্তিতে অনুপ্রাণিত জীবশক্তি অসীমার মধ্যে ধ্যান যোগে কর্ম্ম যোগে শত শত রত্নরাজির সৃষ্টি করিল, ধন শ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ উঠিল,—দেবাসন, উচ্চৈঃশ্রবা—ঐরাবত উঠিল, বিলাসের অপূর্ব্ব উপচারণ পারিজাত উঠিল,—অবশেষে মানব হিতের চরম উপাদান সুধাভাণ্ডকর ধন্বন্তরী চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল মন্ত্র লইয়া উত্থান করিলেন,—জগতে বিপুল হর্ষোচ্ছাস উঠিল,—আনন্দ হল্‌হলায় সাগরগর্জ্জন লোপ হইল!

সবই ত পাইল তবু প্রাণ কি চায়?—ধন জন সুখ আরোগ্য—ইহার পরও মানব কি চায়?—

লাইকা আপন অন্তরে চাহিল,—আছে, অভাব আছে, হৃদয়গুহা অন্ধকারাচ্ছন্ন—আলোক চাই—ঔজ্জ্বল্য চাই!

আবার মন্থন চলিল; ঊর্দ্ধে গিরিশিরে যে আলোক কেন্দ্র জ্বলিতেছে তেমনি মধুর তেমনি সুন্দর আলোক চাই!—হাঁ অমনি সুন্দর! ঐ সাদৃশ্য ছাড়া বুঝি জগতে আর আলোকের আদর্শ নাই।

আছে কি জীব হৃদয়ে ঐ জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ কণা? উঠিবে কি তাহা এই মন্থন আলোড়নে? দয়া কর দেব, দয়া কর! তোমার দয়ামাত্রেই সে আলোকের উদ্ভব

আঘাতে আঘাতে সাগরহৃদয় মথিত চূর্ণীকৃত হইতেছিল—আর বুঝি সেই বিন্দু ফেনাশ্রু ঊর্দ্ধে সেই অরুণ চরণদ্বয়ের স্পর্শও পাইয়াছিল! দেবাসুর শ্রান্ত কাতর,—আবার সকলে গিরিচূড়াসীন বিপদহারী মধুসূদনকে স্মরণ করিল।

এস এস হে সকল শ্রমহারী সুশীতল জ্যোতির্ম্ময়! তোমার চিত্ত-নয়ন-নন্দন কোমল রাগ সকলকে দেখাও!—তোমার শক্তি ধন্য তোমার স্নেহ ধন্য—সকলই পাইলাম—, এইবার এসহে কমনীয় কোমল কান্তিধর—হৃদয় মাঝারে সুশীতল প্রেম! প্রাণের প্রীতিতে জীবন মরণ উজ্জ্বল করিয়া দাও!—

মেঘাচ্ছন্ন লাইকা যেন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল!—আহা কি অপূর্ব্ব আলোক!—শুভ্র সাগর মধ্যে—দ্বিধাহীন হৃদয় মধ্যে কি বিপুল জ্যোৎস্না ভাসিয়া উঠিল! -

সে আলোক দর্শন মাত্র সিন্ধু যেন উছলিয়া উঠিল। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ চূর্ণসলিলে সেই শুভ্র আলোক জ্বলিতে লাগিল। জল উজ্জ্বল, স্থল উজ্জ্বল—চরাচর যেন ঐ এক আলোকে হাসিয়া উঠিল! নিদ্রাতুর লাইকা স্বপ্নেই দুই বাহু তুলিয়া প্রণাম করিল। হাঁ ইহাই জীবহৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি প্রীতি!—সর্ব্ব স্থানে অবাধ প্রসারিত শিব জ্যোতিঃ!

আলোক কেন্দ্র ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। সাগর মহাতরঙ্গে বাহু তুলিতেছিল,—যেন ছাড়িতে যায় না! দেব অসুরবৃন্দ মুগ্ধ চক্রে সেই শোভা দেখিতেছিল, মন্দার অচল। সকলে তখন ঊর্দ্ধে চাহিল।—

কোথায় দেবতা? সেই গিরিচূড়াসীন

উঠিল,—একি ভ্রান্তি একি অভাব সকলকে আচ্ছন্ন করিতেছে আবার ?—লাইকা বুঝিল যে আলোকে তাহার হৃদয় মন উজ্জল হইয়া ছিল তাহা এই আলোকেরই কণা—কিন্তু—আবার কিন্তু ?—অনন্ত বীর্য্যশালীর দয়ায় যাহা হৃদয়সাগর ভেদ করিয়া প্রাণ আলোকিত করিয়াছে—তাহার মধ্যেও একি শূন্যতা ?—প্রাণ আরও কি চাহে ?—তখন মনেরও অজ্ঞাতসারে প্রাণ ডাকিল,—দয়াময়—দয়াময় !—

বিচিত্র চন্দ্রোদয় !—প্রকাণ্ড মণ্ডল ধীরে ধীরে আকাশ গাত্রে উত্থিত হইতেছে। ক্রমে নগরাজের চূড়ার সম্মুখে আসিয়া তাহা যেন স্থির হইল।—প্রকাণ্ড পর্ব্বতের প্রত্যেক গুহাও আলোকিত—আলোকিত সমুদ্র যেন গলিত রজতে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে !—

ঐ যে ভগবান—হাঁ ঐ আবার সেই ভক্ত নয়নানন্দ মূর্ত্তি !—ছুটি বাহু প্রসারিত—যেন একান্ত আগ্রহ ভরে ভাবুক হৃদয়ের সেই চরম বিকাশ প্রীতিবৃত্তিকে আলিঙ্গন প্রয়াসী !—

আর ও কে ?—চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে সহসা প্রকাশিত চিন্তাতীত রাগিণী, সৌন্দর্য্যপ্রতিমা,—শরীরিণী শ্রী ?—কেগো ঐ হাস্যপুলকিতা দেবী ?—কে কে—কে ও ?—যাহাকে পাইবার জন্য স্বয়ং ভগবানও লালায়িত তৃষাতুর !—লাইকা নিজের হৃদয়ে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিল।

কে এ ?—জীবনপ্রতিমা চিরবাঞ্ছিতা কে ও জ্যোতির্ম্ময়ী ? ও মূর্ত্তি লাইকার পরিচিতা—কিন্তু কে ?—

সুধাংশুহৃদয়বাসিনী দেবী ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছিল, ধীরে ধীরে সেই চন্দ্র বিশ্বমন্দার চূড়ার নিকটে আসিল। জগতের একমাত্র অধীশ্বর—মানব দেহের জীবরূপী পরমাত্মা যেখানে বাহু প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন সেইখানে সেই পূর্ণ শশধর আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্য আনিয়া ধরিয়া দিল।

তাহার পর ? সেই অমৃতরূপিণী দেবী সেই মহামহিমাময়ের হৃদয়ে লীনা হইলেন ? আকাশে উজ্জল জ্যোৎস্না, জলে তাহার বিশাল লীলা,—জগৎ যেন এক বিরাট আলো রাশিতে ডুবিয়া গেল ;—আকাশে সাগরে যেন আর কোন পার্থক্য নাই কেবল জলকল্লোলের ছলছল কলকল ধ্বনি সমস্ত পৃথিবীর মহানন্দ কল্লোলের ন্যায় উছলিয়া উঠিতেছিল !

কি আনন্দ ! কি উল্লাস ! অনুভবাতীত অনুভব !

লাইকা আত্মহারা হইয়া দেখিতেছিল। মানবহৃদয়সাগরে কি এই জ্যোতির্ম্ময়ী বাস করেন ? এও কি সম্ভব ?—হাঁ সম্ভব ! লাইকা তৎক্ষণাৎ চিনিল,—তাহার চির আরাধ্যা জীবনদেবতার মূর্ত্তিতে বিলীনপ্রায় ওই দেবী তাহারই প্রেমপ্রতিমা রাজকুমারী বারি !—

সেই মুহূর্ত্তেই তাহার তন্দ্রা মূর্চ্ছায় পরিণত হইল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

স্বেচ্ছাবিবাহ

আমাদের দেশে স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে ইহা য়ুরোপীয় প্রথা। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ডুবিয়া যাওয়ার ন্যায় ভারতবর্ষের সভ্যতা পশ্চিমে গিয়া অস্তমিত হইয়াছে। এই মহাবিধান জড়জগৎ ও মনোজগৎ উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রভাবান্বিত। একদিন ভারতবর্ষ যে গরিমায় মহিমান্বিত ছিল, আজ পশ্চিমদেশ সেই গৌরবে গৌরবময় অবনত মস্তকে একথা কে না স্বীকার করিবে ? কিন্তু মনীষীগণ ভবিষ্যৎবাণী করিতেছেন, পূর্ব্বের উদয়াচল আবার রক্তিমাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্বদেশের অন্ধকার শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবে। ভগবান্ করুন্ তাহাই হউক।

এই স্বেচ্ছা-বিবাহ য়ুরোপীয় সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ, সমস্ত সভ্য য়ুরোপ এই প্রথাটিকে নির্ব্বিচারে স্বীকার করিয়া চলে। বিবাহের ক্ষেত্রে কোনও অভিভাবক সন্তানের মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। অনেক বিপ্লবাগ্নি সমাজকে ছারখার করিয়া এই প্রথা য়ুরোপে স্থায়ী ভাবে পাট্টা লইয়া বসিয়াছে। যদিও প্রায় সকল বিবাহেই পিতামাতার অনুমতি লওয়া হয় কিন্তু তাহা একটা রীতি, অথবা বিবাহ করিবার একটা কায়দা মাত্র। আমাদেরও বিবাহ সভায় উপস্থিত হইবার অনতিপূর্ব্বে কনকাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া বরের মাতা বিবাহে অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন। ভারতীয় অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করার রীতিও ঠিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। য়ুরোপে পিতামাতাগণ সন্তানের বিবাহ দেন না, তাঁহারা সন্তানদের বিবাহ দর্শন করেন।

ভারতীয় সভ্যতার মধ্যাহ্ন-সূর্য্য যখন সমগ্র পৃথিবীতে কিরণ বিস্তার করিতেছিল, তখন ভারতবর্ষীয় সমাজেও স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা অতি উচ্চ অঙ্গের বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত। আমাদের পুরাকালীয় প্রায় সকল গ্রন্থ গুলিতেই এই শ্রেণীর বিবাহের উল্লেখ আছে। হিন্দুস্থানের স্বয়ম্বর প্রথা যদিও আজ হিন্দুস্থান ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু ইহা হিন্দুস্থানেরই সভ্যতার নিদর্শন ছিল।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যেরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষ যখন উন্নতির শীর্ষদেশে অবস্থিত ছিল, তখন এই প্রকার বিবাহই ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া গৃহীত হইত। মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থপাঠে, এমন কি মনুসংহিতাতেও এই বিবাহের হীনত্ব সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি। পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবাহের নাম প্রজাপতি বিবাহ। ক্ষত্রিয় জীবনে ইহা একটি অতীব অগৌরব বলিয়া পরিত্যজ্য ছিল। গান্ধর্ব্ব, আসুর, এমন কি রাক্ষস বিবাহও ইহাপেক্ষা প্রশস্ত ছিল। এবং সেই সময়ই ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির বাসভূমি ছিল। আজ সকলে বিচার করিয়া দেখুন, তখন যাহা শ্লাঘ্য ছিল আজ তাহার এত লাঞ্ছনা কেন, এবং আজ যাহা পরম শ্লাঘ্য তখন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ছিল কিসের জন্য ?

আর্য্যসভ্যতার এই একটি পূর্ব্বগৌরবকে অবহেলা করিয়া আমরা সত্যই লাভবান্ হইয়াছি না ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি ? ইহা বিচার করিতে হইলে অতীতের মহাপুরুষ ও রমণীকুলরত্নদিগকে আদর্শস্বরূপ চক্ষের সম্মুখে ধরিতে হয়।

রামায়ণে স্বয়ম্বর বিবাহের বিশেষ উল্লেখ নাই। বীরত্বের পরিবর্ত্তে কন্যাদান রীতিই রামায়ণের ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচলিত। রাক্ষসগণ ও অসভ্য জাতিগণ প্রায় জোর করিয়াই বিবাহ করিত। মহাভারতে স্বেচ্ছাবিবাহের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের ললনাকুল-মহিমা সাবিত্রীকে তাঁহার পিতা ইচ্ছানুরূপ পতি মনোনীত করিবার জন্য দেশ পর্য্যটনে পাঠাইয়াছিলেন। দময়ন্তী আপনার ইচ্ছানুসারে পতিলাভ করিয়াছিলেন ; রুক্মিণী, সুভদ্রা, আরও কত শত কন্যা স্বয়ম্বরা হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বিবাহমাত্রেই প্রায় স্বেচ্ছা-বিবাহ বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি যাহাতে ভারতীয় নারীকুলের মহিমা, স্বেচ্ছা-মিলন তাহার অন্যতম বিকাশ মাত্র। সে দিনও রাজপুতানায় এইরূপ মিলনের জন্য এক একটা রাজ্য ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, এক একটি রমণীরত্ন পৃথিবীর ইতিহাসে চির অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এ সকল ইতিহাস ত আর্য্য সভ্যতার গৌরবময় ইতিহাস, ভারতবর্ষ তখন হীন দাসত্বের বোঝা বহিয়া কলঙ্কিত হয় নাই। আজ স্বেচ্ছা-বিবাহকে য়ুরোপীয় প্রথা বলিয়া, যদি আমরা অবহেলা করি সেটা আমাদের পক্ষে একটি বিষম ভ্রম বলিয়া প্রতিপাদিত হইবে না কি ?

কতদিন ভারতবর্ষ হইতে স্বেচ্ছাবিবাহ প্রথা লুপ্ত হইয়াছে জানি না। তবে একভাবে অবরোধপ্রথাকে ইহার মৌলিক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হিন্দুগণ অবরোধ প্রথাকে যদি বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে স্বেচ্ছা-বিবাহের মূলোৎপাটন তাহারই আনুসঙ্গিক। এবং তাহা হইলে এই ঘটনা অধিক পুরাতন নহে। আর যদি অবরোধপ্রথা স্ত্রী-জাতির প্রতি পুরুষের ক্ষমতার অপব্যবহার জনিত হয়, তাহা হইলেও স্বেচ্ছা বিবাহের লোপ বেশী দিন পূর্ব্বে ঘটে নাই। হিন্দুজাতির অধঃপতনের পূর্ব্বে যে এই সকল সামাজিক দুর্লক্ষণ দেখা দিয়া ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। সে দিনকার রাজপুত ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায় রমণীগণ পুরুষের সহযোগে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন, স্বামীপুত্রকে সহস্তে রণসজ্জা পরাইয়া দিয়াছেন। এ সকল কোনও ক্রমে অবরোধ প্রথার লক্ষণ নহে। যে দিন হইতে সমাজ দূষিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের জাতীয় অধঃপতনেরও সেই দিন হইতেই সূত্রপাত হইয়াছে।

আমি বিবাহ সমস্যা নামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা জাতীয়তার পক্ষে সহায়কর। পৃথিবীর মহাবীর, গুণী জ্ঞানীগণ এই মিলনের ফলস্বরূপ। ইহার সমর্থন কল্পে দু'একটি উদাহরণও উপস্থিত করিয়াছিলাম। অনেকে ইহা স্বীকার করিয়াও অন্যান্য কয়েকটি তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁদের প্রথম তর্কের বিষয় এই যে, স্বেচ্ছা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে

অনেক মেয়েকে অবিবাহিতা থাকিতে হইবে, এবং তন্নিমিত্ত সমাজ কুৎসিতাকার ধারণ করিবে।

আমার ধারণাটা অনেকাংশে ইহাঁদের ধারণার বিপরীত। আপনারা কি লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই, সংসারে যে ছেলেটার উপর শাসনদণ্ড দিবারাত্রি উত্তোলিত থাকে, কালক্রমে সেই ছেলেটাই সর্ব্বাপেক্ষা বিকৃত হইয়া যায়? এই প্রকার শাসনের ফলে একটা অচিন্ত্য-পূর্ব্ব উচ্ছৃঙ্খলতা দিনে দিনে জন্ম পরিগ্রহ করিতে থাকে। ইহা একটি চিরন্তন সত্য। বিবাহ সম্বন্ধেও আমরা যে স্বাধীন মতামতকে চাপিয়া রাখিতে উৎসাহিত, তাহার ফলও তদ্রূপ। শত প্রকারের গাঢ় অধীনতার পেষণনিম্নে মৃতপ্রায় না থাকিলে এই উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন্ত অভিব্যক্তি আমাদের সামাজিক জীবনেও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত!

আর স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা বিদ্যমান থাকিলে কুৎসিৎ মেয়েদের যদি অবিবাহিতা থাকিতেই হয়,তবে অনেক কুৎসিৎ ছেলেকেও অবিবাহিত থাকিতে হইবে। ইচ্ছাটা ত এক পক্ষীয় নহে। স্বেচ্ছা বিবাহের মানে বর ও কন্যা উভয়ের সম্মতি ক্রমে বিবাহ! সুন্দরী মেয়ে কুৎসিৎ ছেলেকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবে কেন? আমি বলি, এ সকল তর্ক, অথবা আশঙ্কার বিশেষ কোনও মূল্য নাই। সৌন্দর্য্যের উপরে আর একটা জিনিষ সর্ব্বদাই জয়যুক্ত হইয়া থাকে। চরিত্রের মধুরতা, বুদ্ধির প্রখরতা, সচ্চরিত্রতা, সাধুতা, সৌন্দর্য্যকে চিরকাল পরাভূত করিয়া ভর করিয়া চিরদিন জয়যুক্ত হইয়াছে। গুণহীন সৌন্দর্য্য শিমুল ফুলের ন্যায় স্পর্শমাত্রে শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া ফেলে। য়ুরোপে এবং আমাদের দেশে যে অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকার ভ্রমপ্রমাদ ঘটে না তাহা নহে। কিন্তু ইহাদ্বারা যতখানি উপকার সংগঠিত হয়, তাহার তুলনায় ঐ প্রকার দু'চারিটা কুফল উল্লেখযোগ্য নহে। য়ুরোপে প্রতিকার স্বরূপ অন্যান্য কতকগুলি পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া য়ুরোপে অনেকেই বিবাহ করে না, কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের চাকচিক্য এই অগ্নি পরীক্ষায় টিঁকিতে পারে না। বরং আমাদের দেশে স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা বিদ্যমান না থাকার দরুণ মোহাকৃষ্ট হইবার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশী, এবং অনেক ক্ষেত্রে ইহার জন্য মানুষ অনুতাপ করিয়া জীবন যাপন করে।

তারপর, যদি অনেক মেয়ের বিবাহ না হয়, তাহা হইলে তাহারা সমাজকে অত্যন্ত কদর্য্য করিয়া তুলিবে, স্বেচ্ছাবিবাহের বিরুদ্ধে এই যে একটা যুক্তি ইহা কতদূর সঙ্গত দেখা যাউক।

প্রথমতঃ এ যুক্তির গোড়াতেই গলদ। কারণ ইহা সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইলে বিধবার চিরবৈধব্য প্রথা টিঁকিতে পারে না। কিন্তু যদি বলি বিধবাদের বেলা সে যুক্তি গ্রাহ্যকর নহে, তবে এস্থলেই বা তাহা অগ্রাহ্য না হইবে কেন?

আমার মতে কিন্তু এই প্রকার কোনও শঙ্কার কারণ নাই। য়ুরোপ ও

থাকিতে হয় সত্য, তাহার কারণ এই সকল দেশে মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশী, এবং বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে! স্বেচ্ছাবিবাহপ্রথা বিদ্যমান থাকার দরুণ মেয়েদের অবিবাহিতা থাকিতে হয় না। আমাদের দেশেও যদি বহুবিবাহ প্রথা না থাকিত, বিধবার বিবাহ হইত, তাহা হইলে এখানেও অনেক যুবতীকে অবিবাহিতা থাকিতে হইত। ইহা ছাড়া আরও কতক গুলি জঘন্য প্রথা বর্ত্তমান থাকাতে আমাদের সমাজে মেয়েদের অবিবাহিতা থাকিবার কোনই আশঙ্কা এত দিন বর্ত্তমান ছিল না। ধরুন্ আমাদের বিবাহের বয়সের হিসাবটি। ছেলের বয়স দশ কি আট হইতে সত্তর, আর মেয়ের বিবাহের বয়স সাধারণতঃ আট হইতে চৌদ্দ। ছেলের অভাব আমাদের দেশে এত দিন এরই জন্য হয় নাই। এবং আমরা ইহাকে লইয়াই গৌরব করি। আমাদের বরের বহুরূপ, কনের একরূপ। বর কোনও ক্ষেত্রে বালক, কোনও ক্ষেত্রে বৃদ্ধ; কোনও ক্ষেত্রে কুমার, কোনও ক্ষেত্রে স্ত্রী-বেষ্টিত অথবা বিগত-পত্নী। আর কনে আমাদের দেশে চিরদিনই কুমারী।

কিন্তু কি ঘোর পাশবিক পন্থা অবলম্বন করিয়া আমরা এই গৌরবকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, তাহা কি বিচার করিয়া দেখার বস্তু নহে? দেশে কতক গুলি মেয়ে অবিবাহিতা থাকা তাহার চেয়ে কি বহু পরিমাণে প্রার্থনীয় নহে?

আরও একটি কথা আছে। কেহ কেহ বলেন, য়ুরোপে বিবাহের এই প্রকার স্বাধীনতা থাকার দরুণ, স্বামীস্ত্রী-ত্যাগ (divorce) প্রভৃতি কতক গুলি দুর্নীতি য়ুরোপীয় সভ্যতার কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছা বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকার দরুণ য়ুরোপে স্বামী স্ত্রী-ত্যাগের সৃষ্টি হয় নাই। খৃষ্টানদের শাস্ত্র সম্মত বলিয়াই ইহা প্রচলিত হইয়াছে। মুসলমানগণের মধ্যে স্বেচ্ছাবিবাহ প্রচলিত নাই,তবে তাহাদের ভিতরে ডাইভোর্স প্রচলিত কেন? ইহারা যে কথায় কথায় স্ত্রী-ত্যাগ করিয়া থাকে! তারপর আমাদের ভিতরে স্বামীত্যাগ নাই বটে কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেও কি স্ত্রী-ত্যাগের বিধি নাই? আমার ত মনে হয়, আমরা যে ভাবে স্ত্রী-ত্যাগ করি, সেই ভাবে ত্যাগ করা আরও জঘন্য ব্যাপার। আমরা যে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকি, সেটা কি একটা পাশবিক হৃদয়-শূন্যতার পরিচায়ক নহে! হিন্দুর শাস্ত্রে ত স্ত্রী-মহিমার জলন্ত ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিণী, জীবন সঙ্গিনী ইত্যাদি। আমরা কিন্তু এই মহাবাণী বিস্মৃত হইয়া স্ত্রী জাতির প্রতি লাঞ্ছনার কি এক শেষ করিনা? আমরা আমাদের স্ত্রী-দিগকে এমন জঘন্য ভাবে ত্যাগ করি, যাহাতে সমগ্র মানবসমাজের চক্ষে সে চিরলাঞ্ছিতা ও ঘৃণিতা হইয়া থাকে। আমরা স্ত্রী-ত্যাগ করি, অর্থাৎ নিরুপায় সম্বল-হীনাদিগকে বিশ্বের অবহেলার ভিতরে ছাড়িয়া দিই। এর চেয়ে সমাজের পক্ষে একটা লজ্জাস্কর ব্যবহার আর কি থাকিতে পারে? আপনাকে স্বরূপ ভাবে চিনিয়া লইতে আমাদের যত বিলম্ব হইবে আমাদের এ জাতির মুক্তির পথও তত দূরে অবস্থিত থাকিবে।

আমরা কপট উপায় অবলম্বন করিয়া ক্রূরভাবে ব্যভিচারের বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য সাধন করি য়ুরোপীয় সমাজ ধর্ম্মাধিকরণে না গিয়া সে কার্য্য সাধন করে না, এই জন্যই কি য়ুরোপের নামে আজ এমন কলঙ্ক ডঙ্কা আমরা বাজাইয়া থাকি ?

স্বেচ্ছা বিবাহের ফলাফল অন্যান্য সকল প্রকার বিবাহ অপেক্ষা যে উৎকৃষ্টতর তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ? যে স্থানে মনে মনে মিলন ঘটাইতে হইবে, সে স্থানে মনের প্রবৃত্তিকে স্বাধীনতা দান করার চেয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যাপার আর কি হইতে পারে ?

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি কোনকোনও সম্প্রদায় ইহাকে অবলম্বন করিতেছেন। এবং ইহা একটি সুদৃঢ় সত্য যে, যে সকল স্থানে ইহার একটিমাত্র বীজও উপ্ত হইয়াছে ভারতবর্ষের গৌরব পদ্মটি ঠিক সেই সেই স্থানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের ব্রাহ্ম সমাজ এবং এবং "নামকাটা সেপাইয়ের" দল ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাংলাদেশ আজ যাঁহাকে লইয়াই গৌরব করিতে যাউক না কেন ইহাদের মধ্যেই তাহার লীলাভূমি। নামোল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা ইহাঁদিগকে যে স্থানেই স্থাপন করিনা কেন, ইহাঁরাই দেশের গৌরব স্বরূপ।

কিন্তু হিন্দুসমাজের বুদ্ধিটা যেন বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিলাত হইতে গুণীজ্ঞানী হইয়া আসিবেন, তাঁহারা হিন্দু নহেন, যাঁহারা কুসংস্কারে লোকাচারকে মানিয়া চলিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের বাহিরের। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজ হইতে একে একে সকলেই বহিষ্কৃত হইতেছেন। এমন করিলে আর হিন্দুসমাজে থাকিবে কে ? অমুক তর্ক পঞ্চানন আর অমুক বিদ্যাবাগীশই কি হিন্দুসমাজ ? ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের চরণ ধুলা লইতে সকলেই প্রস্তুত, তাঁহাদের অনুশাসনের নিম্নে বাস করিতে সকলেই বাধ্য, কিন্তু যদি ঠাকুরগণ অবহেলা করিয়া সকল উন্নতিতেই বাধা দেন তাহা হইলে শেষে তাঁহাদের পদধূলি লইবার লোকই পাইবেন কোথা ? নিজের মান নিজের হাতে একথা একটি সহজ সরল সত্য! যদি তাঁহারা ক্রমাগতই উন্নতির পথে বাঁধ দেন তবে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক সে বাঁধ যে ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। ইহা যে প্রাকৃতিক নিয়ম। এরূপ বাধায় ইংরেজীশিক্ষিত যুবকবৃন্দমাত্রেই অহিন্দুর তালিকা ভুক্ত হইবেন নাকি !

আজ যে সকল "অহিন্দু" এত উন্নত অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছেন স্বেচ্ছাবিবাহপ্রথা প্রচলিত সমাজের নিকটে তজ্জন্য তাঁহারা অনেক পরিমাণে ঋণী। সমাজ যে ব্যক্তির স্রষ্টা এ কথায় যদি কাহারও সংশয় না থাকে, তবে এ কথা নির্ব্বিচারে সকলেই গ্রহণ করিবেন যে দাম্পত্যসুখ এবং স্বেচ্ছা-মিলনোদ্ভূত সন্তানগণের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ এই উন্নতির মৌলিক উপদান। ইহাঁদের সমাজে নারীজাতির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদান করা হয়; নারীজাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকে। ইহারই দরুণ স্ত্রী-শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তি পাইয়া আপন গরিমায় পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। কাজেই তাঁহাদের ভিতরে সর্ব্বতোমুখীন্ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতীয়তার পুষ্টিসাধনের সঙ্গেসঙ্গে

আমাদের মধ্যেও স্ত্রী-শক্তির উন্মেষণ আমরা কিছু কিছু লক্ষ্য করিতেছি সত্য; কিন্তু যত দিন ইহা সর্ব্বতোভাবে বিকশিত হইয়া না উঠিবে ততদিনে জাতীয় উন্নতির আশা স্বপ্নের অপেক্ষাও অমূলক।

কত দিনে কিভাবে স্বেচ্ছাবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইবে জানি না। হিন্দুগণ এই প্রথাকে আশ্রয় দান করিতে নিতান্ত বিমুখ, ইহাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব লয় পাইবে এমন আশঙ্কা অনেকেই করিবেন। কিন্তু এইপ্রকার আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হিন্দুর হিন্দুত্বের সঙ্গে সামাজিক দু'চারিটা সংস্কারের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। হিন্দু-জাতি এবং হিন্দুস্থান জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণ-স্থায়ী নহে। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে এই আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যবর্ত্তই। হিমালয় পর্ব্বতের উপর দিয়া একটা পথ করিয়া চলিলে যেমন হিমালয় টুটিয়া ফাটিয়া যায় না, দুই একটা সংস্কারের পথ সমাজের উপর দিয়া বহাইয়া দিলেও হিন্দু-সমাজের বিন্দুমাত্রও অঙ্গহানি হইবে না। উন্নত আচার সংস্কারে হিন্দু-সমাজের উন্নতিই হইবে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। স্বেচ্ছা-বিবাহের উপকারিতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্র-সম্মত মতামত গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না। শাস্ত্রও মানুষের বুদ্ধির বাহিরের বিষয় নহে, চিরন্তনও নহে, সময়োপযোগী। নত মস্তকে নির্ব্বিকারে তাহাকে মান্য করিলে নিজেকে খর্ব্ব করা হয়। ভুল ভ্রমের ভিতর দিয়া চলিয়া শিক্ষা লাভ করা—শাস্ত্র মানিয়া প্রতিপদক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া চলার চেয়ে শতগুণে শ্রেয়ঃ। কেননা তাহাতে উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আজ আভিজাত্য ত্যাগ করিয়া আমাদের অভিভাবকবৃন্দ যদি অশ্বপতির ন্যায় বলেন, "বৎসে ও বৎস আপনার মনোমত পতি পত্নী বাছিয়া লও" তাহাতে ভারতের কল্যাণই হইবে।

অবরোধ ইত্যাদি প্রথা যে ভাবে শিথিল হইয়া আসিতেছে, দেশ ব্যাপিয়া দিন দিন যে ভাবে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, কন্যা-গণেরও অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, কাজেই এই প্রকার বিবাহ পদ্ধতিও আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে; আজ যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন, তাঁহারা সমাজের কল্যাণপথ রুদ্ধ করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অবশেষে বক্তব্য এই, কেহ যেন না মনে করেন পিতামাতার নির্ব্বাচনপদ্ধতি আমি একবারেই উঠাইয়া দিতে বলিতেছি। আমাদের সমাজে যখন স্ত্রীপুরুষের মিলনক্ষেত্র অবারিত নহে তখন পিতামাতার পাত্রনির্ব্বাচন কতক পরিমাণে অবশ্যম্ভাবী এবং অনভিজ্ঞ বরকন্যার পক্ষে বহু সময় অভিজ্ঞ পিতামাতা কর্ত্তৃক পাত্রনির্ব্বাচন সুফলপ্রদ তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতামাতা নির্ব্বাচন করিলেও বরকন্যার ইচ্ছার উপরই প্রধান ভাবে বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রার্থনীয়, এবং তাহাই সমাজের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

নবাব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জুজ্-পরিবার।

তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। নিত্যকার মত সেদিন প্রভাতেও প্যারির নিভৃত প্রান্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র একখানি গৃহ হাস্য আনন্দ-কলরবে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

"বাবা, আমার বাজনা আনতে ভুলো না।"

"আর আমার পশম!"

"আজ কিন্তু আমার বোনবার কাঁটা আনা চাইই, বাবা—"সেই সঙ্গে পিতার কণ্ঠও শুনা গেল। পিতা বলিল, "হ্যাঁ, আমার ব্যাগটা দিয়ে যাও ত, মা—"

"বাবা, বাবা, রোজ তুমি ব্যাগ ভুলে যাবে! মাগো,—আর পারিও না আমি!"

ইয়া ব্যাগ লইয়া আসিলে বৃদ্ধ জুজ্ কন্যাগুলিকে যথেষ্ট ভরসা দিয়া বিদায় লইল। মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। জানালা দিয়া পথ দেখা যায়। সেই পথে জুজ যাইবে। তখনও মেয়েদের চোখের পাতে নিদ্রার জড়তা মাখানো ছিল, আলু-থালু কেশ—বেশ একটি সহজ সরলতায় মুখগুলি সুন্দর দেখাইতেছিল। চারিটি মেয়ে আসিয়া খড়খড়ির উপর বুক দিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল, বৃদ্ধ পিতাকে সস্নেহভাবে বিদায়-সম্ভাষণ করিল! বৃদ্ধ পথে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া ফিরিয়া চাহিল।

জুজ অফিসে চলিয়াছে। মেয়েরা ছুটিয়া চারতলার ছাদে উঠিয়া আলিশায় ভর দিয়া বাপের পানে চাহিয়া রহিল—যতক্ষণ বাপকে দেখা যায়! দূর হইতে বৃদ্ধ ছাদের পানে চাহিয়া দেখিলেন, দূর হইতেই উভয় পক্ষে চুম্বন-বিনিময় হইল। জুজ মোড় বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাসা হইতে হাঁটিয়া চলিয়া হেমারলিঙ এণ্ড সন্সের অফিসে পৌঁছিতে জুজের ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগিত। পথটুকুও দীর্ঘ নহে, তবে জুজের গতি মৃদু ছিল। বেগে চলিলে বাতাস লাগিয়া গলায় সুন্দর বাঁধা বো-টি পাছে ঈষৎ স্থানচ্যুত হয়, এই আশঙ্কায় জুজ কখনও বেগে চলিত না। এ বো মেয়েরা কত যত্ন করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে!

কয়েক বৎসর হইল, জুজের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। শোকের উপর পাষাণ চাপা দিয়া এ কয় বৎসর মেয়েদের জন্যই শুধু জুজ প্রাণ ধরিয়া আছে। মেয়ে ধ্যান, মেয়ে জ্ঞান, মেয়েগুলিকেই নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহাদের সহিত সহস্র আদর-আব্দার করিয়াই বৃদ্ধ আপনাকে কোনমতে খাড়া রাখিয়াছিল। কল্পনা কিন্তু জুজের প্রতি অত্যাচার করিতে ছাড়িতনা। অফিসের পথটুকু চলাফেরা করিবার সময় কল্পনা তাহার সম্মুখে আপনার মায়াজাল বিস্তার করিয়া ধরিত! বৈদ্যুতিক পাখা যেমন ক্ষিপ্র গতিতে ঘুরিতে থাকে, জুজের মাথার মধ্যে কল্পনাও তেমনি বেগে ঘুরিতে থাকিত। অফিসের একাউণ্টাণ্ট জুজ যখন অফিসের হিসাব-নিকাশ করিতে বসিত কল্পনা তখন সভয়ে দূরে

সরিয়া থাকিত। তখন জুজকে দেখিলে এ কথা কেহ বলিতে পারিত না, ঘাড় গুঁজিয়া এই যে লোকটি অঙ্কের পর অঙ্ক কষিয়া চলিয়াছে, ইহার সহিত ঐ মায়াময়ী চটুল কল্পনার কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল বা আছে! কিন্তু একবার অফিসের বাহিরে পা দুইটি বাড়াইলে হয়! দুরন্ত শোকের মত কল্পনা যেন প্রচুর আক্রোশে জুজকে আক্রমণ করিত! মাথায় তাহার ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া যাইত—কত চিন্তা, কত কথা তরঙ্গের মত নাচিয়া ছুটিত! সে সকলের সন্ধান রাখিলে দশজন লেখক তরিয়া যাইতে পারিত।"

সেদিন সকালেও মেয়েদের চোখের আড়ালে আসিতেই জুজের মাথার মধ্যে কল্পনা এক বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া ধরিল। বৎসর শেষ হইতে চলিল—বড়দিন আসন্ন। কন্যাদের জন্য বিবিধ সওগাত কিনিতে হইবে। ডিসেম্বর মাসে হেমারলিঙ এণ্ড সন্‌সের কর্ম্মচারী মাত্রেই অতিরিক্ত এক মাসের মাহিনা ভাতা পাইয়া থাকে। সওগাতের সঙ্গে সঙ্গে ভাতার কথাও জুজের মনে পড়িল। ছোট-খাট পরিবারে এই ভাতা অনেকখানি আনন্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহারই উপর পুত্রকন্যার হাসিমুখ নির্ভর করে। দুঃখ-দৈন্যের দিনের জন্য সামান্য সঞ্চয়ের আয়োজনও এই ভাতার সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। কর্ম্মচারীর দল ইহার জন্য মনিবের জয়-গান গাহিতে কখনও কার্পণ্য করে না।

আসল কথা জুজের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল—পয়সার সাচ্ছল্য না থাকিলেও বনিয়াদি ঘরের মেয়ের পক্ষে চাল কমানো সহজ ব্যাপার নহে। জুজও এ বিষয়ে স্ত্রীকে কোনদিন একটা কথা বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দেয় নাই। সেই স্ত্রী আজ তিন বৎসর হইল সংসার হইতে বিদায় লইয়াছে। স্ত্রীর প্রতি পাছে অসম্মান প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় জুজ স্ত্রীর জীবিত-কালীন ব্যবস্থাদিতে এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেয় নাই। স্ত্রীর স্থানে জ্যেষ্ঠা কন্যা বন্ মামান্ এখন গৃহিণী—তাহারই হাতে জুজ টাকা-কড়ি তুলিয়া দেয়—গুছাইয়া ব্যয় করিবার ভার বন্ মামানের উপর! এ কাজ বন্ মামান্ এমন নিপুণতার সহিত চালাইয়া আসিতেছে যে সংসারের কোন কোণ হইতে কোন দিন এতটুকু অনুযোগের সুর উত্থিত হয় নাই।

এ বৎসর ভাতাটা কিছু মোটা রকমের হইবে বলিয়া জুজ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। স্থির করিবার কারণও ছিল। টিউনিস্ লোনে কোম্পানি এবার সমধিক লাভবান্ হইয়াছে। জুজ তাহার সহকারিবৃন্দকে এ কয়দিন ধরিয়া আশ্বাস দিয়া এই কথাই বলিয়া আসিতেছে, "হেমারলিঙ এণ্ড সন্ এবার লক্ষ্মীকে একবারে মুঠার মধ্যে পুরিয়া ফেলিয়াছে!"

চলিতে চলিতে জুজ ভাবিল, ভাতা অন্য বৎসরের অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে, নিশ্চয়! এত লাভ! কল্পনা-নেত্রে সে যেন স্পষ্ট দেখিল, হেমারলিঙের ঘরে তাহার ডাক পড়িয়াছে! হেমারলিঙ প্রসন্ন মুখে জুজকে ডাকিয়া অনেক টাকার চেক্ কাটিয়া দিতেছে!

হেমারলিঙ তাহাকে ডাকিল, কহিল, "জুজ, তোমার কটি মেয়ে ?"

জুজ উত্তর দিল, "তিনটি—না, না, চারটি—আমার ঐ ভারী ভুল হয়ে যায়। বড়টি একেবারে পাকা গিন্নি কি না!"

মনিব কহিল, "বয়স তাদের কত ?"

"আলিনের বয়স কত—কুড়ি হবে—হ্যাঁ, কুড়ি। সে-ই বড়। তারপর এলিস্, এবার সে পাশ দেবে, বয়স হল আঠারো। হেনরিটা চোদ্দয় পড়েছে আর জাজা তাকে ইয়া বলে ডাকি, সে এই সবে বারোয় পা দিয়াছে।

তার পর ব্যারণ হেমারলিঙ সংসারের সচ্ছলতার কথা তুলিলেন, একান্ত সঙ্কোচে জুজ বলিল, "এই আমার মাইনেই যা ভরসা, ব্যারণ সাহেব। কিছু টাকা জমিয়েছিলুম, তা স্ত্রীর ব্যামোতে আর মেয়েদের লেখাপড়ার—"

মনিব বলিলেন, "বুজেছি জুজু, এ মাইনেতে তোমার কুলোয় না। মাসে হাজার ফ্রাঙ্ক বাড়িয়ে দিলুম—তাতে হবে ত ?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! ওঃ, এ যে ঢের।"

আনন্দের বিহ্বলতায় শেষ কথা কয়টা জুজ এমন সজোরে উচ্চারণ করিল যে দুই চারিজন পথিকও তাহা শুনিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু জুজের সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে তখন মাহিনা বৃদ্ধির সংবাদ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল! মেয়েদের লইয়া থিয়েটারে যাইবে—একটা বক্স লইবে—হ্যাঁ বক্স! বক্স আলো করিয়া বসিয়া মেয়েরা থিয়েটার দেখিবে—সমস্ত দর্শকের প্রশং-সমান দৃষ্টির বিদ্যুৎ তাহাদের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইবে এবং পরদিনই দুই মেয়ের জন্ত দুই পাত্র আসিয়া—জুজের কল্পনা এইখানে বাধা পাইল। সে আসিয়া অফিসে পৌঁছিল। মোটা খাতা খুলিয়া নিত্যকার মত কলম লইয়া বসিয়া মৃদু হাসিয়া জুজ ভাবিল, কি যে সব বাজে কথা মনে আসে!

কিয়ৎক্ষণ পরেই সংবাদ আসিল, বড় সাহেবের কাছে জুজের ডাক পড়িয়াছে। হেমারলিঙ! জুজের বুকের মধ্য দিয়া একটা পুলকতাড়িৎ ছুটিয়া গেল! এ কি, এখনও সে স্বপ্ন-দেখা চলিয়াছে!—না! তবে ? তবে কি তাহা সত্য হইয়া ফলিবে ? আশায় উৎফুল্ল হইয়া সে মনিবের ঘরে উপস্থিত হইল। মনিব জুজকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন; জুজ নিকটে আসিলে, "জুজ্ তোমার কটি মেয়ে ?" এ কথার পরিবর্ত্তে মনিব কহিলেন, "জুজ টিউনিস্ লোনের কথা নিয়ে সমস্ত আফিস একেবারে তোলাপাড়া করে তুলেছ—তুমি যা বলেছ, তার সমস্তই আমার কানে গেছে। এ সব আমি মোটে পছন্দ করি না। তা ছাড়া তোমার এই রকম বলে বেড়ানোর দরুণ আমাদের ক্ষতিও কিছু হয়েছে—এ-সব কারণে আমি তোমায় নোটিস দিচ্ছি—আসছে মাস থেকে তোমার আমার অফিসে কাজ করা পোষাবে না!"

ইস্তফা! এ কি কথা! জুজের কাণের কাছে সোঁ সোঁ করিয়া বায়ু বহিতেছিল, মাথার মধ্যে রক্ত-স্রোত ঝড়ের ঢেউয়ের মত আতালি-পাতালি করিতেছিল। তাহার মেয়েরা! সোনালী মেয়েরা! তাহাদের মুখ

কি হইবে? এ সময়ে সস্তায় বাড়ীও সংগ্রহ করাও যে বিষম কঠিন ব্যাপার!

জুজের চোখের সম্মুখে দারিদ্র্যের একটা বীভৎস কঙ্কাল-মূর্ত্তি খট্ খট্ করিয়া যেন নাচিয়া উঠিল। একবার তাহার মনে হইল, মনিবের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া সে আপনার দুর্দ্দশার কাহিনী খুলিয়া বলে! কিন্তু না, তাহাতে কোন ফল হইবে না। পাথরের মত কঠিন হেমারলিঙের প্রাণ! বেদনার আক্ষেপ তাহাতে এতটুকু ক্ষীণ রেখাও পাত করিতে পারিবে না! সে ধীরে ধীরে চোখের জল মুছিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেদিন গৃহে ফিরিয়া মেয়েদের কাছে জুজ কোন কথা বলিল না। বলিবার সাহসও ছিল না। আসন্ন উৎসবের আয়োজন কল্পনায় মেয়েরা বিভোর হইয়া রহিয়াছে! এ সময় তাহাদের সে আনন্দে আঘাত দিবার সাহস জুজের ছিল না। এ কথা শুনিলে চোখ তাহাদের জলে ভরিয়া উঠিবে! তাহা ছাড়া এত তাড়াই বা কেন! কাল বলিলেও চলিতে পারে! এমন করিয়াই নভেম্বর মাস শেষ হইয়া গেল। প্রতি দিনই তাহার মনে আশা জাগিত, আজ হয় ত হেমারলিঙ ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু সে আশা নিত্যই নিষ্ফল হইত। তাহার পর ডিসেম্বর মাসে মাহিনা আনিতে গিয়া জুজ যখন এক মাসের মাহিনা অতিরিক্ত পাইল, তখন ভাবিল, এবার বুঝি চাকুরিটিতেও পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়—কিন্তু তাহা ঘটিল না। জুজ দেখিল, তাহারই আসনে বসিয়া আর একজন লোক নিবিষ্ট চিত্তে হিসাব লিখিতেছে।

বাড়ীর সহিত জুজ বরাবর চাতুরী খেলিয়া আসিতেছিল। পূর্ব্বকার মত অফিসে বাহির হইবার সময় নিত্যই সে বাড়ীর বাহির হইয়া যায়—মেয়েরা পশম পুতুল প্রভৃতির জন্য আব্দার করে। ইচ্ছা করিয়াই মেয়েদের সে ফরমাস্ মিটাইতে সে ভুলিয়া যায়। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করিলে ঢোঁক গিলিয়া মৃদু হাসিয়া জুজ উত্তর দেয়, "আজ বড় খাটুনি গেছে মা,—ভুলে গেছি।"

সারাদিন জুজের পথে পথে ঘুরিয়াই কাটিয়া যায় কখনও বা লোকের মুখে আশা পাইয়া কোন্ অফিসে চাকুরির চেষ্টায় প্রবেশ করে—কিন্তু সর্ব্বত্রই উত্তর প্রায় একই রূপ—সকলেই অল্প বয়সের লোক চায়—টাকা দিয়া পুরা দমে যাহাকে খাটাইয়া লওয়া যাইবে, এমন লোক,—বৃদ্ধের দেহে আর কতই বা বল! কেহ বা সহানুভূতি জানাইয়া বলে, "এঁ্যা—হেমারলিঙ এণ্ড সনের ওখানে তুমি আর নেই? সে কি!" কেহ বা আশ্বাস দেয়, "জানুয়ারি মাস পড়লে, বছরের গোড়ার দিকে এস। দেখা যাবে।" জুজ বেচারা একেই নিরীহ, তাহার উপর নিজের দুর্ভাগ্যে সে যেন মরিয়া আছে। লোকের কাছে সে দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে মাথা তাহার কাটা যায়। তাই সে কোথায়ও আর দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ না করিয়া আশ্বস্তভাবেই ফিরিয়া আসে।

বৃষ্টি ও তুষার-পাতের মধ্যে এমনই ভাবে নিষ্ফল ভ্রমণ করিয়া জুজের দিন কাটিয়া যায়। চাকুরি নাই চাকুরি খুঁজিতেছে! এ যে বড় লজ্জার কথা! তাই শেষে এমন

ঘটিল যে, চাকুরির কথা লইয়া কাহারও সম্মুখে দাঁড়াইতে তাহার কেমন সঙ্কোচ ঘটিতে লাগিল। বলিয়াও যখন এত দিনে পাওয়া গেল না, তখন আর সে কথা বলিয়া ফল কি! কিন্তু বাড়ীর অবস্থা আরও শোচনীয় দাঁড়াইল মেয়েরা হেমারলিঙের কথা জিজ্ঞাসা করে! কবে সে মাহিনা বাড়াইয়া দিবে! কত বাড়াইবে! জুজ কি বলিবে! হেমারলিঙের নির্ম্মমতায় তাহার পাঁজরার হাড় কয়খানা যেন ফাটিয়া গিয়াছিল। সে আজ দশ বৎসর ধরিয়া হেমারলিঙের অফিসে কাজ করিয়া আসিয়াছে। আজ বার্দ্ধক্য যখন তাহার শিরাগুলাকে লোল করিয়া দিয়াছে, ঘুরিয়া বেড়াইবার সামর্থ্যটুকুও হরিয়া লইয়াছে, এমন দুর্দ্দিনে বিনাদোষে মনিব হেমারলিঙ তুচ্ছ একটা খেয়ালে শুধু তাহাকে সাফ জবাব দিয়া দিল! হেমারলিঙের প্রশংসায় মেয়েদের কাছে কে সে বড় গলা বাহির করিত! আজ সেই হেমারলিঙের নিষ্ঠুরতার কথা বলিতে গিয়া তাহার যেন কেমন বিসদৃশ ঠেকিল—নিজের কানেই তাহা কেমন মিথ্যা শুনাইতেছিল। অপরকে সে তাহা বলিতে পারিল না। তাই সে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া এমনই ভাবে অভিনয় সারিয়া চলিল। মেয়েরা একটা বিষয় বড় স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছিল। সে বিষযে ইঙ্গিত করিতেও তাহারা ভুলে নাই। মেয়েরা বলিয়াছিল, "বাবার শরীর একটু ভাল যাচ্ছে বোধ হয়। আগে বাবার এমন খিদে হত না ত। এখন কিন্তু অফিস থেকে ফিরে বাবা খেতে পারে ভাল!" এ ইঙ্গিত তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত জুজের মর্ম্মের মধ্যে বিঁধিত।

দিন কাটিতে লাগিল। জুজের চাকুরী মিলিল না। হাতের পুঁজিও কমিয়া আসিতেছিল। জুজ যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল। আর বুঝি মিথ্যা বলিয়া ব্যাপারটাকে চাপিয়া রাখা যায় না। সওগাতের জন্য জাজা উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে বন মামান কাল সওগাতের কথা তুলিয়াছিল—কাহার জন্য কি চাই, কাহাকে কি জিনিস উপহার দিলে শোভন হয়, বন মামান তাহাও বলিয়া ছিল—সে মুহূর্ত্তে জুজের যেন দারুণ অগ্নিপরীক্ষা চলিল। মেয়ের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া সে চাহিতে পারে নাই। তাহার অকপট সরল দৃষ্টির সম্মুখে জুজের ভিতরকার সমস্ত গোপন রহস্য যদি ঈষৎ আভাষেও প্রকাশিত হইয়া পড়ে! যে সকল কয়েদীর দল কয়েদ খালাস হইয়াও হাকিমের অনুজ্ঞামতে পুলিশের তদারক-বন্দী হইয়া থাকে, তাহারা যেমন চলিতে ফিরিতে একটা বিশ্রী রকমের অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, জুজের অবস্থাও ইদানীং ঠিক তাহাদেরই সমতল হইয়া পড়িয়াছিল। কে জানে, এ ভাবে এখনও কতদিন কাটাইতে হইবে! বুঝি বা জীবনের বাকী কয়টা দিনই এমন ভাবে কাটাইয়া দিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে পুরাতন বন্ধু পাসাজোঁ একদিন বলিয়াছিল "নবাবের কারবারে কাজ করবে। বেশী মাহিনা মিলবে।" তখন জুজ হেমারলিঙের চাকরী ত্যাগ করে নাই। সে বলিয়াছিল, "বিনাদোষে মনিব ছাড়ব! শুধু পয়সার লোভে? ছিঃ।"

আজ মনিব তাহার নির্লোভ অন্তর না বুঝিয়া অকারণে তাহাকে বিদায় করিয়া

দিল! শুধু বিদায়—এ যে একরূপ পথে বসানো! আজ সেই পাসাজোঁর কাছে গিয়া মুখ তুলিয়া নবাবের কাছে চাকরীর কথা তুলিতেও সে লজ্জা বোধ করিল।

হায়, কেন সে টিউনিস্ লোন্ লইয়া এতখানি মাথা ঘামাইতে গিয়াছিল! এ দুর্ব্বুদ্ধি তাহার কেন হইয়াছিল! জীবন-গ্রন্থের পৃষ্ঠা হইতে সেই দুর্দ্দিনের কথাটা রবার ঘষিয়া পেন্সিলের দাগের মতই যদি তুলিয়া ফেলা যাইত! কিন্তু না, তাহা হয় না—হয় না! কবিরা মিথ্যা উপমার ভাবে মানুষকে মজাইয়া গিয়াছেন। কে বলিল, জীবন গ্রন্থ-স্বরূপ! গ্রন্থের একটা পাতা ছিঁড়িয়া সে-স্থলে আর একটা পাতা জুড়িয়া কোনমতে তাহার সংস্থান-যোগটুকুকে খাড়া রাখা যায়, কিন্তু জীবন বড় কঠিন ব্যাপার! সেখানে কোথাও এতটুকু গোঁজামিল চলে না—জোড়া-তাড়া খাটে না। এ এক নির্ম্মম প্রহেলিকার মত চলিয়াছে—চলিয়াছে! একটি ভুল করিলে যতই ছোট সে ভুল হোক — তাহা আর ফিরাইবার উপায় নাই! পথ নাই। অকরুণ কঠিন এ বিধান সন্দেহ নাই!

কাল বড়দিনের অধিবাস-সন্ধ্যা। কাল সকালে সওগত আনা চাইই—নহিলে মেয়েদের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো যাইবে না। এই যে জাজা আজ হইতে বায়না লইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে। সেজ মেয়েটিও ম্লান নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া ছিল—এলিসও কি বলিতে আসিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া কি জানি কি ভাবিয়া আর কিছুই বলিতে পারিল না—আর বন মামান—সে বুঝি পিতার হৃদয়ের গূঢ় রহস্যের একটু আভাস পাইয়াছিল! বুঝি কিছু সন্দেহ করিয়া-ছিল—তাই আর তাগাদা করে নাই! জুজের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কাল সে কি করিবে—কি করিয়া সওগাত আনিয়া মেয়েদের মুখে হাসির দীপ্তি ফুটাইবে। সারা পারি উৎসবের আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছে। ছেলেমেয়ে নরনারী সকলেই উল্লাসে বিভোর—আর—সে এত দীন, এমন লক্ষ্মীছাড়া যে—

জুজের চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল। বাহিরে দ্বারে কে করাঘাত করিল। কে আসিল? হেমারলিঙের ওখান হইতে কেহ আসিল না কি! এলিস যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এক অপরিচিত তরুণ যুবা কক্ষে প্রবেশ করিল। মেয়েরা চকিতে ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল। জুজ জিজ্ঞাসুভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল। যুবা অভি-বাদন করিয়াই কন্যাদের সহিত বৃদ্ধের এ মধুর অবসর-উপভোগে বাধা দেওয়ার জন্য প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করিল, পরে বলিল, জুজের পুরাতন বন্ধু পাশাজোঁর কাছেই তাঁহার কর্ম্মপটুতার পরিচয় পাইয়া সে আজ তাঁহার দ্বারে বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়া হাজির হইয়াছে। যদি জুজ কয়েক মাস—সপ্তাহে তিন চারি ঘণ্টার মত অবসর করিয়া লইয়া ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ রাখা তাহাকে কিছু শিখাইয়া দেন!

যুবার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জুজ কম্পিত স্বরে কহিল,"বলেন কি! তা আর সুবিধে হবে না? খুব হবে—বিশেষ এখন ত আর আমার অন্য কোন কাজ-কর্ম্ম নেই!

তা আপনার কখন্ সুবিধে হবে, বলুন, কোথায় আমার যেতে হবে—?"

যুবা বলিল, "হাঁ—ভাল কথা। আমি লুকিয়ে এ কাজ শিখতে চাই। আপনার যদি কোন রকম অসুবিধে না, হয় আর যদি অনুমতি করেন ত এইখানে এসেই শিখি। তবে একটা কথা, আজ আমি বিপ্লবের মত আসার দরুণ কাঁরা যেমন ছুটে পালিয়ে গেলেন, যদি বারে বারে তেমনি ঘটে, তাহলে কিন্তু আমার পক্ষে আসা দায় হতে পারে।"

জুজ হাসিয়া কহিলেন, "ও আমার মেয়েরা। ওরা আমার কাছে রাত্রে বসে একটু-আধটু গল্প-স্বল্প করে কি না! তা ছাড়া ওরা বেশী রাতও জাগে না ত!"

স্থির হইল, সারাদিন ও সন্ধ্যায় বসিয়া শিক্ষা দেওয়ায় কোন অসুবিধা ঘটিবে না।

যুবা কহিল, "কিছু মনে করবেন না—আপনি যে এতখানি পরিশ্রম করবেন, তার কিছু পারিশ্রমিক—"

জুজের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বাধা দিয়া কহিল, "না, না, আপনি শিখবেন,—এতে আর আমার মেহনতই বা কি! বসে আছি বৈ ত না। আপনাকে না হয় একটু শেখালুম—"

যুবা কহিল, "না, না। সে কি হয়? তবে আপনার যোগ্য দিতে পারি—এমন কি সামর্থ্য আছে! তবে—"

জুজের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে পারিল না। ইহাই ভগবানের করুণা। কালিকার ভাবনায় সে যখন পাইতেছিল না, তখন কোন্ স্বর্গ হইতে এ কি করুণা ঝরিয়া পড়িল! যুবা কহিল, "এই এক মাসের জন্য আগাম নিন্—"

জুজের হাতের মধ্যে যুবা নোট্ গুঁজিয়া দিল। জুজ চমকিয়া উঠিল, "এ কি—এত!"

"এত আর কি! সামান্যই!"

জুজ কিছু বলিল না; করুণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে যুবার পানে চাহিয়া রহিল! যুবা কহিল, "তাহলে বুধবার থেকে আসব—কি বলেন, মস্যুঁ জুজ?"

"বুধবারেই তাহলে—আচ্ছা—? বেশ মস্যুঁ—

"ওহো—আমার নামটাই বলা হয় নি এখনও। আমার নাম স্তে গেরি—পল্ স্তে গেরি—"

গেরি বিদায় লইল—দুই জনেই বিস্মিত পুলকিত হইয়া গিয়াছে। জুজ ভাবিল, এ আমার ভগবান—এ আসিয়া আমার আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিল। কৃতজ্ঞতায় অন্তর তাহার লুটাইয়া পড়িতে চাহিল। গেরি বিস্মিত হইল—এই নির্লোভ-চিত্ত নিরীহ বৃদ্ধকে দেখিয়া। এও প্যারির লোক! এমন লোক প্যারিতে থাকিতে পারে, ইহা সে ভাবেও নাই। কেতাবে এমন লোকের কথা কেহ ত লিখে না—প্যারির সম্ভ্রান্তসমাজে এমন লোকের দেখাও মিলে না। জুজকে দেখিয়া গেরির আজ আবার নূতন করিয়া তাহার পল্লীর কথা মনে পড়িল—প্যারির বিপুল হৃদয়-হীনতার মধ্যে শান্তিময় একটি হৃদয়ের সন্ধান পাইয়া সে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ক্রমশঃ

পিপীলিকা

বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন প্রাণী জগতে পিপীলিকা বুদ্ধি এবং অধ্যবসায় গুণে আদর্শ স্থানীয়। বাস্তবিক পিপীলিকার কার্য্য কলাপের বিষয় ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। বিশেষতঃ যখন আমরা ইহাদের আয়তনের কথা মনে করি তখন ত বুঝিতেই পারি না যে এত ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ভিতর কি করিয়া এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সঞ্চিত হইল। এতটুকু জীব কিরূপ ভাবে এত পরিশ্রম সংসাধন করে। প্রাণী জগতে একমাত্র মনুষ্যেরই সহিত ইহাদের বুদ্ধি ও কার্য্য কলাপের তুলনা হইতে পারে। ইহাদের সামাজিক শৃঙ্খলা, জাতিবিভাগ, ইহাদের সুনির্ম্মিত বাসগৃহ এবং রাস্তা ঘাট, গৃহ-পালিত দাস দাসী ইত্যাদির কথা ভাবিলে মনুষ্যের ন্যায় ইহাদেরও যে হৃদয় বলিয়া একটী বৃত্তি আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকার আচরণ ও কার্য্যকলাপ বিশেষ ভাবে বিভিন্ন। এক জাতীয় পিপীলিকার ভিতরেও সকলের আচরণ একরূপ দেখা যায় না। এমন কি একই পিপীলিকাকে স্থান ও সময় ভেদে বিভিন্ন রূপ আচরণ করিতে দেখা গিয়াছে।

পিপীলিকাজীবন প্রধানতঃ দুই স্তরে বিভক্ত। ডিম্ব জীবন ও সম্পূর্ণ দেহ-প্রাপ্ত পিপীলিকা। ইহার মধ্যবর্ত্তী দুইটী অবস্থা আছে (larva ও pupa)। ডিম্ব

লম্বাকৃতি। ডিম্ব প্রসবের প্রায় পনেরো দিবস পর সাধারণতঃ সেগুলি ফুটিয়া থাকে; অনেক সময় একমাস বা ততোধিক সময়ও অতিবাহিত হইয়া থাকে। তখন এ গুলিকে বোল্‌তার টোপের মত দেখায় তবে তদপেক্ষা অনেক ছোট। এই অবস্থায় ইহাকে larva বলে। বোলতার টোপ অনেকে দেখিয়াছেন; স্থানবিশেষে এগুলি বড়শিতে গাঁথিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই (larva) গুলি অতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত লালিত পালিত হয়। ইহাদিগকে শ্রামিক পিপীলিকারা পিঠে করিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া যায়। বয়স ও আয়তন অনুসারে ইহাদিগকে পিপালিকা বিবরে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায়। ঠিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগের মত পিপালিকা শিশুগুলি এই অবস্থায় কোনকোনও ক্ষেত্রে একমাস হইতে ৬।৭ সপ্তাহের ভিতর পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া জীবনের তৃতীয় স্তরে উপনীত হয়। কখনও বা অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ও অতিবাহিত হয় ইহাকেই পিউপা (pupa) অবস্থা বলে।

এই সময়ে অর্থাৎ পিউপা অবস্থাতে ইহাদের পিপীলিকার ন্যায় আকৃতি লাভ হয়। পা হুল ইত্যাদি বাহির হওয়ার পরই ইহারা জীবনের তৃতীয় স্তরে পদার্পণ করিয়া থাকে। এ অবস্থায় অল্প কয়েকদিন অতি-বাহিত হইবার পরই ইহাদের কোমলদেহ

কঠিন হইতে থাকে এবং কয়েক দিনের ভিতরই ইহারা পূর্ণাবয়ব পিপীলিকা দেহ লাভ করে।

এইরূপে তিন শ্রেণীর পিপীলিকা জন্ম গ্রহণ করে—(১) স্ত্রী বা রাণী পিপীলিকা (২) পুরুষ পিপীলিকা ও (৩) শ্রামিক পিপীলিকা—ইহারা সম্পূর্ণ স্ত্রীও না সম্পূর্ণ পুরুষও না। ইহাদের ভিতর স্ত্রী হৃদয়ের কোমলতা এবং পুরুষের ন্যায় শ্রমসহিষ্ণুতা দেখা যায়, স্ত্রী-পুরুষোচিত অনেকগুলি গুণের সামঞ্জস্যীভূত বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পিপীলিকা-গৃহের যাবতীয় কার্য্য ইহারাই সম্পন্ন করিয়া থাকে। রাণী নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া ডিম্ব প্রসব করেন আর শ্রামিক পিপীলিকারা সেগুলি প্রতিপালন ও পরিবর্দ্ধনের জন্য সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত রাণীর সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করা, এবং গৃহ নির্ম্মাণ খাদ্য সংগ্রহ ইত্যাদি যাহা কিছু কাজ সমস্তই এই দাস পিপীলিকারা সম্পন্ন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের সন্তানাদি হয় না কেন না ইন্দ্রিয় হিসাবে ইহাদের দেহ অসম্পূর্ণ তবে কখনকখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেও দেখা গিয়াছে। ইহাদের কালেভদ্রে দুএকটি সন্তানসন্ততি হইলেও সেগুলি প্রায়ই বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন হইয়া থাকে।

রাণী পিপীলিকার ডিম্ব হইতে যে সকল পিপীলিকার জন্ম হয়, তাহাদের ভিতর শ্রামিক পিপীলিকারই সংখ্যা অধিক; পুরুষ ও স্ত্রী পিপীলিকা অতি অল্পই জন্মায়। পুরুষগুলি বিবাহ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। বিবাহের দিবসে উহাদের পাখা উঠে এবং সেই শুভদিনেই তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে—বাসর শয্যা তাহাদের মৃত্যুশয্যায় পরিণত হয়। বিবাহ দিবসে রাণী-পিপীলিকাদেরও পাখা ওঠে, তবে তাহারা প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। মাতা হইয়া ইহারা অসংখ্য পিপীলিকাকে জন্ম দান করে। ইহাদের জীবনকাল সাধারণতঃ এক বৎসর। লবকের (Lubbock) রক্ষিত ২।৩টি রাণী-পিপালিকা ৮।১০ বৎসরও বাঁচিয়া ছিল।

শ্রামিক পিপীলিকারা দেশ ও জাতি ভেদে নানা আয়তনবিশিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ (Æcodoma cephaloters) এক জাতীয় পিপীলিকার উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের ভিতর তিন শ্রেণীর শ্রামিক পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। (১) সাধারণ ছোট আকারের শ্রামিক, (২) বৃহদায়তন শ্রামিক, ইহাদের মস্তক বড় বড় লোমে আচ্ছাদিত, (৩) ভিন্নপ্রকার বৃহদায়তন শ্রামিক, ইহাদের মস্তক লোমশূন্য।

পিপীলিকার দেহ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) মস্তক (২) বক্ষ (thorax) (৩) নিম্নোদর (abdomen)। মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের সন্নিবেশ স্থল মস্তক। পাগুলি (thorax) বক্ষ সংলগ্ন এবং এ স্থানেই ইহাদের পক্ষোদ্গম হইয়া থাকে। তলপেটে পাকস্থলি আছে। হুলও ইহারই ভিতর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

উহাদের বক্ষে (thorax) ছোট ছোট তিনটি ছিদ্র থাকে ইহাদেরই ভিতর দিয়া পিপীলিকাদের শ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া থাকে।

বিবাহের পর নবীনা পিপীলিকারাণী কখনও পূর্ব্বগৃহে ফিরিয়া আসে—কখনও

বা কতকগুলি শ্রামিক পিপীলিকার সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সাহায্যে এক নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নূতন সংসার পাতে, আবার সময় সময় নিজে একাকীই একটি গৃহের সংস্থান করিয়া লয়। কিন্তু একাকী সংসার পাতিয়া কোনও পিপীলিকাকেই সফল মনোরথ হইতে দেখা যায় না। এমনও অবশ্য দেখা গিয়াছে যে পিপীলিকারাণী বিবাহের পর নিজের পাখা নিজে ছেদন করিয়া নিজের পরিশ্রমে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ডিম্ব প্রসব করিয়া সেগুলি তা' দিয়া ফুটাইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী (larva) অবস্থায় সেগুলির উপযুক্তরূপ যত্ন নিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া তোলা কখনই একটি পিপীলিকার কর্ম্ম নহে। এরূপ স্থলে শ্রামিক পিপীলিকাদের সাহায্য না লইলেই নয়।

এক একটা পিপীলিকাপরিবার দীর্ঘ কাল ধরিয়া নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া থাকে। তাই তাহাদের মধ্যে মধ্যে নূতন রাণীর আবশ্যক হয়। কিন্তু অন্য পরিবারের কোনও নূতন রাণী আসিয়া যে সহজে তাহাদের গৃহে আমল পাইবে তাহার জো নাই। লবক কখনও রাণীশূন্য পরিবারে নূতন 'রাণী' ভর্ত্তি করিতে গিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। মেককুক একবার একটি রাণীকে অন্য নূতন পরিবারে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। তিনি 'রাণী'টিকে এরূপ ভাবে ঐ পরিবারে কিছুদিন আবদ্ধ রাখিয়া ছিলেন যে তাহাদের ভিতর দৃষ্টি বিনিময় হইতে পারিত। তারপর ক্রমে তাহাদের হৃদয়ে ভালবাসা জন্মে। বিশেষ ভাবে পরিচয় হইয়া যায়। ঠিক আমরা নূতন পায়রাতে পায়রাতে জোড়া বাঁধিতে হইলে যাহা করিয়া থাকি। কিংবা একদল হাঁসের ভিতর নূতন একটিকে আনিয়া ভর্ত্তি করিতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করি।

নানা প্রকার কীট পোকা পিপীলিকার খাদ্য। এ সকল কীট পোকাকে অধিকাংশ স্থলে ইহারা নিজেরাই সংহার করিয়া থাকে। মৃত অবস্থায় পাইলে ত তাহাদের বিশেষ সুবিধাই হয়। কীট পোকা ছাড়া মধু এবং ফল খাইতেও উহারা বেশ ভালবাসে। আর এমন কোন মিষ্টদ্রব্য কিংবা প্রাণীদেহ নাই যাহার খোঁজ পাইলেই পিপীলিকার সারি আসিয়া উপস্থিত না হয়। এতদ্ব্যতীত পিপীলিকার দুগ্ধপানের লোভও বেশ প্রবল।

পিপীলিকার দৈনিক জীবন বড় চমৎকার। সে সম্বন্ধে আমরা একজন বৈজ্ঞানিকের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সেদিন সূর্য্য উঠিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কয়েকটী শ্রামিক পিপীলিকা বিবরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটী পিপীলিকার কার্য্য কলাপই আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি এবং উহাকে আমরা উহার জাতীয় নাম অনুসারে ফরমিকা (formica) বলিয়াই অভিহিত করিব। আজ ফরমিকা বড় ব্যস্ত। রোজই অবশ্য তাকে এইরূপ ব্যস্ত দেখা যায়। বাস-গৃহের প্রয়োজনীয় সংবর্দ্ধনের জন্য রাস্তাঘাট সুরঙ্গ ইত্যাদি তৈয়ার করিতে হইবে—খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে—শিশুদের তত্ত্ব লইতে হইবে, গাভী দোহাইতে হইবে।—এ ছাড়াও কত অসংখ্য কাজ যে তাহার ও তাহার শত সহস্র

সঙ্গীকে সম্পাদন করিতে হইবে তাহার সংখ্যা নাই। ব্যস্ত থাকিবার কথা নহে কি ?

ফরমিকাদের গৃহেরও একটু বর্ণনা করি। উহাদের গৃহকে যদি চিড়িয়া দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—তবে আমরা দেখিতে পাইব— ভূগর্ভে উহা প্রায় একফুট গভীর এবং এদিকে ওদিকে আঁকা বাঁকা ভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া এক গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তুগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া খিলান করা ছাদবিশিষ্ট কতকগুলি প্রকোষ্ঠের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। বিস্তৃত একটী প্রকোষ্ঠে রাণীমা থাকেন। দেহরক্ষী এবং সেবাকারী শতশত পিপীলিকা রাণীর সুখসাধনে ব্যস্ত। রাণীর প্রতি তাহাদের সম্মান ও ভক্তি অতুলনীয়। রাণীর দিকে 'পাছ ফিরিয়াও' কখনও তারা দাঁড়ায় না। অন্যান্য প্রকোষ্ঠের ভিতর কোনটা ভাণ্ডার ঘর কোনটা বা শিশুদের ঘর (nursery)। এখানে শিশুদের খাওয়াইয়া শোয়াইয়া যত্নের সহিত প্রতিপালন করা হয়। কোন প্রকোষ্ঠে ডিম্ব কোথাও larva কোথাও বা pupa সযত্নে রক্ষিত আছে।

এদিকে সেদিকে ঘাসের পাতার উপর পিপীলিকা-গাভীগুলি চড়িতেছে। ইহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পিপীলিকা রাখালদের খুবই সতর্ক থাকিতে হয়। পিপীলিকাগৃহে নানাস্থানে—গোবরে পোকার মত কতকগুলি পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমাদের কুকুর বিড়াল যেমন এ পোকা গুলিও তেমনি পিপীলিকা-প্রতিপালিত। পিপীলিকাদের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য এই কুকুর বিড়াল গুলির ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

পিপীলিকার কোনও শাসনকর্ত্তা নাই কোনও পুলিশ কর্ম্মচারীও নাই; প্রজাতন্ত্র রাজতন্ত্র বা এরূপ কোনও তন্ত্রের শাসন প্রণালীও নাই সকলেই স্বাধীন তবুও এ রাজ্যে একটু বিশৃঙ্খলা একটু বিপদ বিসম্বাদ বা শান্তিভঙ্গ নাই। অতি পরিপাটী ভাবে লক্ষাধিক পিপীলিকা আপন মনে কাজ করিয়া যাইতেছে, অবস্থা বুঝিয়া নিজেরাই নিজেদের কাজ বাছিয়া লইতেছে।

ফরমিকা প্রাতে ছয়টায় শয্যাত্যাগ করিয়াছে কেহ তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া দেয় নাই। উঠিয়া পায়ের সাহায্যে সে প্রাতঃকালীন প্রসাধন কার্য্য সারিয়া লইয়া অতি যত্ন সহকারে পাগুলি টানিয়া পরিষ্কার করিয়া লইল। বিবরের প্রবেশ দ্বার উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর শত শত পিপীলিকার সহিত ফরমিকাও বাহিরে আসিল। তাহাদের প্রথম কাজ বাহিরে খাদ্য সংগ্রহ।

পথে যাইতে যাইতে ফরমিকা দেখিল তাহার সহযাত্রী একটী পিপীলিকার গায়ে কতকটা কাদা লাগিয়া আছে সে অতি যত্নের সহিত সে কাদা পরিষ্কার করিয়া দিল। তারপর দুজনে দৌড়াইয়া গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইল। তাহারা সকলেই এখন বিবরের অনেকটা দূরে উন্মুক্ত আকাশ তলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ফরমিকা ঘাসের উপরে নীচে এদিক সেদিক খাদ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। নিজে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া যতটুকু সময় ও সুবিধা পাওয়া যায় অন্যের খাওয়ারও ত সংস্থান করিতে হইবে।

যাহা হউক ফরমিকার কপালটা ভাল বলিতে হইবে। বেশীদূর ঘোরাফিরা করিবার পূর্ব্বেই সে দেখিতে পাইল—একটী মৃত মৌমাছি পড়িয়া রহিয়াছে। বেশ লোভনীয় খাদ্যটী! তখনও মৌমাছিটীর উদরে মধু ভরা রহিয়াছে—মৃত্যুর পূর্ব্বে সংগৃহীত শেষ পুষ্প সুষমাটুকু তখনও ব্যয়িত হয় নাই; মিষ্ট মধু আমাদের ছেলে মেয়েদের নিকট যেমন লোভনীয় পিপীলিকাদের নিকটও সেইরূপ। ফরমিকা বেশ পেট ভরিয়া মধু পান করিল আর দেহটা তাহাদের পরিবারের অন্যান্য পিপীলিকার জন্য বহন করিয়া লইয়া চলিল। নিজের দেহের তুলনায় মৌমাছিটীর দেহ কিন্তু অনেকগুণ ভারী ছিল তথাপি ফরমিকা তাহা অনায়াসেই পিঠে করিয়া লইয়া চলিল। নিজের দেহের যতগুণ ভারী জিনিস সে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে আমরা কিন্তু আমাদের দেহের ততগুণ ভারী জিনিস তুলিতেই পারি না। অন্য কোন প্রাণীও পারে কিনা সন্দেহ। একটা কুকুরের পিঠে যদি একটা মৃত ঘোড়া চাপাইয়া দেওয়া যায় তবে কেমন হয় তার অবস্থাটা! কিন্তু পিপীলিকার আশ্চর্য্য ভারবহনশক্তি! তাহারা নিজ দেহের তিন শতগুণ ভারী জিনিস একপায় তুলিয়া ধরিতে পারে।

এতক্ষণ একটু বেলা হইয়াছে; বিবর হইতে বাহির হইবার জন্য সমস্ত গর্ত্তের মুখই খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অসংখ্য পিপীলিকা ব্যস্তভাবে বাহিরে কাজে লাগিয়া গিয়াছে! কেহ গৃহ নির্ম্মাণ জন্য তৃণখণ্ড ও ছিন্ন পত্রাদি একত্র করিয়া রাখিতেছে। কেহ ঘাসের গোড়া কাটিয়া কাটিয়া—গৃহের বড়গা ইত্যাদির সংস্থান করিতেছে, আবার কেহ বা নানাপ্রকার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

ফরমিকা সংগৃহীত খাদ্য ভাণ্ডারে রাখিয়াই রাণীর প্রকোষ্ঠে গমন করিল। সেখানে অসংখ্য শ্রামিক পিপীলিকা রাণীর সদ্যপ্রসূত সহস্র সহস্র ডিম্বের তত্ত্বাবধান করিতেছিল। প্রসূতির ডিম্বগুলির কোনও সংবাদ নিতে হয় না। সে গুলি পর মুহূর্ত্ত হইতে শ্রামিক পিপীলিকাদের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শ্রামিক পিপীলিকারা রাণীর প্রকোষ্ঠ হইতে এক একটি করিয়া ডিম্ব বহন করিয়া অন্য প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। এই কাজে প্রায় দুইঘণ্টা ব্যাপৃত থাকিয়া সকলেই শিশুগৃহে (nursery) চলিয়া গেল। সেখান হইতে (larva) টোপগুলিকে পিপীলিকা বিবরের উচ্চাংশে বিমল সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত করিবার জন্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ সেস্থানে রাখিয়াই তাহাদিগকে পুনবার শয়ন প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া যত্নের সহিত তাহাদের গা চাটিয়া চাটিয়া প্রসাধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। তাহাদিগকে "ঘুমপাড়াইবার" পূর্ব্বে প্রত্যেককে যত্নের সহিত 'খাওয়ান' হইল।

ইহার পর 'পিউপা'দের প্রতি মনোযোগ। ইহাদিগকেও সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত করা হইল। সেখানে 'খোলস' ভাঙ্গিয়া কত pupaই না নূতন পিপীলিকা জীবন প্রাপ্ত হইল। এইগুলিকে শ্রামিক পিপীলিকারা যত্নের সহিত চাটিয়া থাকে এবং উহাদের মধ্যে কোনটী নিজ 'খোলস' ভাঙ্গিয়া বাহির

হইবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিতে পারিলেই অতি সতর্কতার সহিত সেই 'খোলসের' কোমল পর্দ্দা ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া দেয়। এবং পিউপাদের গুটান' হাত পাগুলি টানিয়া সোজা করিয়া দেয়। নবজাত পিপীলিকাদের মধ্যে যেগুলি 'রাজ কুমারী' হইয়া জন্মগ্রহণ করে সে গুলি তখনই বিশেষ বিশেষ প্রকোষ্ঠে নীত হয়। বিবাহ বয়সের পূর্ব্বে কোনও 'যুবরাজ' পিপীলিকার সহিতই ইহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে না। প্রতিদিন যে অসংখ্য পিপীলিকা জন্মগ্রহণ করে তাহাদের প্রায় সমস্তই শ্রমিক। 'রাজকুমার' বা 'রাজকুমারী' পিপীলিকা অতি অল্পই জন্মায়।

এখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। ফরমিকা এতক্ষণ পরে একটু অবসর পাইয়া শ্রান্তি অপনোদনার্থ বিবরের প্রান্তদেশে ছুটিয়া চলিল। সেখানে শত শত পিপীলিকাগাভী বৃক্ষের উপর 'চলিয়া বেড়াইতেছিল।' বৃক্ষের পাতা হইতে ইহারা রস চুষিয়া খাইতেছিল। ইহাই পিপীলিকা-গাভীর খাদ্য। ফরমিকা বৃক্ষারোহণ করিয়া একটী গাভীর পশ্চাৎ দেশে হুল দ্বারা ধীরে ধীরে আঘাত করায় উহাদের দেহ হইতে এক প্রকার মিষ্ট রস নির্গত হইতে লাগিল। ইহাই পিপীলিকা গাভীর দুগ্ধ। তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ত্তি করিয়া ফরমিকা তাহা চুষিয়া খাইল। শত শত পিপীলিকা তাহাদের পালিত শত শত গাভী এইরূপ ভাবে দোহন করিয়া লইতেছিল।

অনেক পিপীলিকা আবার প্রচুর অপেক্ষা অধিক দুগ্ধ নিজ নিজ উদরে ভরিয়া লইতে-ছিল। অনবসর প্রাপ্ত অথচ দুগ্ধপানাকাঙ্ক্ষী অন্য পিপীলিকার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এই সঞ্চিত অতিরিক্ত দুগ্ধ ইহারা তাহাদিগকে খাইতে দিবে; আশ্চর্য্য ইহাদের সময়ের মূল্য জ্ঞান।

দুগ্ধ পান করিয়া কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এমন সময় ফরমিকা দেখিতে পাইল বৃক্ষোপরি একটী পিপীলিকা-গাভী এমন স্থানে অবস্থান করিতেছে যেখানে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার খুব সম্ভাবনা। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে নীচ হইতে মুখ ভরিয়া কতক-গুলি মাটী লইয়া বৃক্ষারোহণ করিল। কিছুক্ষণ পরিশ্রম করিয়া নানা উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া গাভীটীর উপর একটী ক্ষুদ্র 'চালঘর' তুলিয়া দিল।

শ্রমিক পিপীলিকারা তখন দুগ্ধপান সমাপনান্তে গৃহে ফিরিতেছিল। পথে তাহাদের সহিত একদল বিবাহ যাত্রীর দেখা হইল অসংখ্য রাজকুমার ও রাজকুমারী উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল। এইরূপ অবস্থায় উহাদের বিবাহ হইবে এবং রাজকুমারীগণ রাণী হইয়া নূতন সংসার পাতিবে। আর তাদের স্বামীরা পাখা হারাইয়া চলৎশক্তি হীন অবস্থায় পথে পড়িয়া মরিবে।

ফরমিকা এ বিবাহ উৎসব দেখিবার জন্য সময় নষ্ট করিল না—উৎসব দেখিবার জন্য সে একটু দাঁড়াইল না। রাণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই বলিয়া তাহার একটুও আপশোষ হইল না কিম্বা রাণীর স্বামীদের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিবারও একটু অবসর পাইল না।

এতক্ষণ সে তাহার সহস্র ভগিনীর সহিত

বিবরে একটি নূতন ভাণ্ডার-গৃহ নির্ম্মাণে লাগিয়া গিয়াছে। তাহারা এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত ইতিমধ্যে এক ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল।

একটা দুরন্ত ভেড়া রাখালের তাড়া খাইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে ঠিক ফরমিকাদের বিবরের উপর দিয়াই চলিয়া গেল। কয়েকটি শিশুগৃহ উহার পায়ের চাপে একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। শত শত শিশু, ডিম্ব ইত্যাদি আহত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। বিপদ একা আসে না। সেই সময় আবার কোথা হইতে একটা পাখী আসিয়া পিপীলিকা-শিশু ও ডিম্বগুলির উপর বেশ 'ফলার' জমাইয়া তুলিল।

মাত্র দুই এক শত পিপীলিকা সে গৃহে তখন পিপীলিকাশিশুদের তত্ত্বাবধান করিতেছিল। তাহারা এই আকস্মিক বিপদে ধৈর্য্য হারাইল না বা চীৎকার করিয়া সমস্ত বিবরের শান্তিভঙ্গ করিল না—তাহারা একএকটি শিশুকে পৃষ্ঠে লইয়া অতি সত্বর আশ্রয় সন্ধানে ছুটিয়া চলিল। অনেকে তখনই পাখীর উদরে স্থান লাভ করিল—কিন্তু ইহা দেখিয়া অন্যান্য পিপীলিকারা কার্য্যবিরত হইল না। যে কয়েকটি পিপীলিকা নিরাপদ স্থানে পৌছিল তাহারা তৎক্ষণাৎ বিপদের বার্ত্তা সকলকে জানাইয়া পুনরায় দুর্ঘটনার স্থলে ফিরিয়া আসিল।

এতক্ষণ সারাগৃহে মস্ত একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা উত্তেজিত ভাবে সেস্থানে দৌড়িয়া আসিল। এবং শিশুদের রক্ষার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। ততক্ষণ একটী পাখীর স্থানে অনেকগুলি পাখী আসিয়া জুটিয়াছিল। তাই লক্ষ লক্ষ শিশু ও ডিম্বের ভিতর মাত্র কয়েক শত রক্ষা পাইল, সহস্র সহস্র পিপীলিকা এই কয়টী শিশুর রক্ষা কল্পে জীবন বলিদান করিল।

কিন্তু দুঃখ করিবার, শোক করিবার কাহারও অবসর নাই। তাহারা কার্য্য করিতে আসিয়াছে—কার্য্য করিয়াই মরিবে অন্য কোনও চিন্তা তাহাদের নাই—একমাত্র চিন্তা—কার্য্য ও শ্রম। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। লার্ভা এবং পিউপা-গুলিকে উপরের শীতল প্রকোষ্ঠ হইতে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। সকলে সেই কার্য্যেই মনোনিবেশ করিল।

এতক্ষণ সন্ধ্যার অন্ধকার—চারিদিকে কালোপর্দ্দা টানিয়া দিয়াছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর এইবার পিপীলিকাদের বিশ্রামের সময় হইয়াছে। কাষ্ঠখণ্ড ও বৃক্ষপত্রের সাহায্যে বিবরের সমস্ত দরজা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া ফরমিকা ও তাহার সহচরীরা বিশ্রামের জোগাড় করিতে চলিল।"

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

দুর্দ্দৈব

আরো আলো, আরো প্রেম, এই অনিবার
একান্ত কামনা শুধু প্রাণের আমার,
তবু দেখা দেয় মেঘ ঘেরিয়া আকাশ,
লুপ্ত করি চন্দ্রতারা, তপন-প্রকাশ!
তবু নামে বৃষ্টিধারা দুরন্ত দুর্ব্বার
রুদ্ধ শ্বাসে মগ্ন করি পুষ্প সুকুমার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা দেশের কোনো অখ্যাত গ্রাম থেকে কোনো নিরক্ষর লোক কল্‌কাতায় পৌঁছলে তার কাছে এখানকার ট্রাম্ বৈদ্যুতিক আলো, রাস্তাঘাট, গাড়ীঘোড়া, সুবৃহৎ অট্টালিকা সমস্তই অতীব আশ্চর্য্য বলে মনে হয়। তার কাছে এ সমস্তই এক কল্পনাতীত রাজ্য,—সে স্বপ্নেও এত বড় বিরাট ব্যাপারের সম্ভাবনা মনে করতে পারে নাই। নিউইয়র্ক বন্দরে পৌঁছে Custom house কর্ত্তাদের হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়ে রাজপথে এসে বিদেশীকে উক্ত গ্রামবাসীর মতনই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে উচ্ছ্বসিত জনতার স্রোত লক্ষ্য করতে হয়।

সহরের যে দিকেই চলি, রাজপথের দু ধার দিয়ে সারি সারি দোকান—তার সাজসরঞ্জাম বা চাকচিক্য দেখে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। রেল ষ্টেশনে যাই, শুনি এত বড় বৃহৎ ষ্টেশন পৃথিবীতে আর একটি নাই; সিকাগো থেকে গাড়ী এল, শুনি বিংশশতাব্দীর লিমিটেট এই ট্রেন হচ্ছে সব চেয়ে দ্রুত রেল গাড়ী; বৈদ্যুতিক কারখানা দেখি—সেখানে খবর পাই, এত বড় বিপুল কারখানা পৃথিবীতে আর নাই! এমনি করেই লক্ষ্মী তাঁর ভক্ত সেবকগণের প্রাঙ্গণে আশীর্ব্বাদ ছড়িয়ে রেখেছেন।

সহরের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যের বিস্তার এক বিরাট সাধনের ফল। সমস্ত উন্নতির পশ্চাতে এক মহান সাধন ক্ষেত্র বিদ্যমান এবং এ ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্ত্তেই মহাশক্তি কাজ করচে। এখানে দেশের সহস্র সহস্র যুবক বুকভরা আশা ও স্বদেশপ্রেম নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত হচ্চে; এবং এখান থেকেই সমস্ত দেশে নবজীবনের সঞ্চার হতে থাকে।

স্বদেশের অন্তপ্রকৃতি পরিপূর্ণতা লাভের জন্য যখন যা দাবী করেছে, যখন যার অভাব ঘটেছে, সে সমস্ত সমস্যা য়ুনিভার্সিটি থেকে মীমাংসা করবার চেষ্টা হয়েছে। য়ুনিভার্সিটি হচ্চে দেশের হৃদ্‌পিণ্ড—এখান থেকেই রক্ত দেশের সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হয়।

যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়—University town নামে তাকে অভিহিত করা হয়। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ও বাগানের মাঝে মাঝে এক একটি সুরম্য বিশ্ববিদ্যালয় অট্টালিকা স্থাপিত। বাগানের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা চলেছে; নানাপ্রকার লতাগুল্ম বৃক্ষে বাগানটি শোভিত—অসংখ্যক কাঠবিড়ালী নিঃসঙ্কোচে বাগানে বিচরণ করচে। চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি স্তব্ধ সৌন্দর্য্যের নিবিড় আনন্দ প্রকাশ পাচ্চে যে এই রমণীয় স্থানটি সরস্বতী বন্দনারই উপযুক্ত। এই রমণীয় স্থানে শিল্পমন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত।

য়ুনিভার্সিটি-প্রাঙ্গণের চারিধারে ক্লাব, হোটেল, ছাত্রাবাস; খাবার দোকান, ও গির্জ্জা। দূরে কৃষিবিদ্যালয় ও ইহার অন্তর্গত সুবৃহৎ কৃষিক্ষেত্র; কোথাও দুগ্ধবতী গাভীগুলি বিচরণ করছে, কোথাও ছাত্রগণ অধ্যাপকগণের

সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করচে, কোথাও শিক্ষকপরিবৃত হয়ে যুবকগণ ব্যাধিগ্রস্ত পশুর চিকিৎসায় নিযুক্ত রয়েছে। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীগণ সকলেই যেন কি একটা মন্ত্র শুনতে পেয়েছে—নিশ্চল হয়ে বসে থাকা কারও পক্ষে অসাধ্য।

আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তুম তার মন্ত্রটি হচ্চে "Learning and Labor ;" এ মন্ত্রটি কেবল মাত্র একটি সখের জিনিষ নয়; শিক্ষার্থীদের চিত্তে এটি ছাপিয়ে দেয়, কেবলমাত্র ডিপ্লোমা-পত্রেই এটি মুদ্রিত থাকে না।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চেয়ে বড় বাড়ী হচ্চে সাহিত্য ও কলাবিদ্যার মন্দিরটি; এর আশে পাশে ইঞ্জিনিয়ার, কৃষি, বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, আইন, রসায়নাগার, পাঠাগার প্রভৃতি বহুসংখ্যক বিভাগীয় বিদ্যালয় স্থাপিত। প্রত্যেক বিভাগের এক একজন সর্ব্বাধ্যক্ষ আছে; ইহার অধীনে শিক্ষকগণ ও সহকারী শিক্ষকগণ। প্রত্যেক অধ্যাপক ও শিক্ষকের এক একটি স্বতন্ত্র ঘর আছে; এবং যারা বিজ্ঞান কিংবা ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের অন্তর্গত তাদের সকলেরই এক এক বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্ত পরীক্ষাগার আছে। কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য ছেলে ক'টি পড়িয়েই এদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না, এরা নিজেরাও ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করচে—এবং যখন অবসর পাচ্চে, কোনো একটি তথ্য অনুসন্ধানের জন্য নিশিদিন এক আশ্চর্য্য সাধনায় নিযুক্ত থাকচে। রসায়নাগার কিংবা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানাগারে গভীর রাত্রিতেও গুটি কয়েক ছাত্র সঙ্গে করে অধ্যাপক কাজ করেন; পাশের একটি ছোট ঘরে তাঁর জন্যে একটি বিছানা রয়েছে—নিতান্ত ক্লান্ত বোধ করলে সেখানে তিনি শয়ন করতে পারেন। যেখানে ছাত্রগণ এমনি সাধনা ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত দেখ্‌চে, সেখানে ছাত্রগণের চিত্তও যে জ্ঞানলাভের জন্য পিপাসিত হবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? একবার তুলনা করুন্ আমাদের শিক্ষকদের সঙ্গে। আমাদের দেশে যে দু একটি অধ্যাপক বিজ্ঞানের মন্দিরে শ্রেষ্ঠ পূজারীর আসন অধিকার করতে পেরেছেন, তাঁদের সহিত তরুণ শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধ কতটুক? আশা করি আমাদের দেশে শিক্ষোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ আবার সহজ ও সরল হয়ে উঠবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন দেখেছি আমাদের কাছে তা কল্পনাতীত। মনে আছে যখন ছেলেবেলায় এদেশে রসায়ন শাস্ত্র পড়তুম, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রকৃতি গ্যাসের স্বরূপ ও গুণ মুখস্থ করতে প্রাণান্ত হ'ত। সল্‌ফার ও হাইড্রোজেন মিল্‌লে Sulphurated Hydrogen হয় এবং তার গন্ধ পচা ডিমের ন্যায় এ কল্পনা করে আয়ত্ত করা ভিন্ন উপায় ছিল না। অবশ্য, এখন আমাদের কালেজের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল। আমাদের দেশের ধনীগণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুব্যবস্থার অভাব অনুভব করে অভাব মোচনের জন্য সচেষ্ট হচ্চেন। স্যর তারকনাথ ও ডাক্তার ঘোষের দান দেশে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তারের পথ খুলে দিয়েছে তা শিক্ষিত মাত্রেই স্বীকার করবেন। যাহোক আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্র কিংবা পদার্থ

বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয় হাতে কলমে না শিখিয়ে কেবল মুখস্থ করিয়ে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ককে ভারগ্রস্ত করে তোলা হয় না। প্রত্যক ছাত্র ছাত্রীকে ছোটখাট এক একটি বৈজ্ঞানিক সাজ সরঞ্জাম দিয়ে তাকে খাটিয়ে নেওয়া হয়; সে নিজ হাতে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে আরম্ভ করে।

বিজ্ঞানের এক একটি বিভাগের জন্য যেমন স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে, তেমনি এক একটি লাইব্রেরী রয়েছে। লাইব্রেরীর ঘর সর্ব্বদা ছেলেদের জন্য উন্মুক্ত; কাজ করতে করতে কোথায় একটা খট্‌কা বাধল, ছুটে এসে card index দেখে তার জ্ঞাতব্য বিষয়টী জেনে গেল। লাইব্রেরীর বিধিব্যবস্থা সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! সমস্ত লাইব্রেরীকে এমন করে সাজান হয়েছে যে কোনো বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অতি অল্প সময় মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

এতক্ষণ বিজ্ঞানশিক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা গেল। এবারে শুনুন কৃষি বিভাগে কি বিরাট আয়োজন। সাধে কি যুক্তরাজ্য ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে! কৃষিজীবির পুত্রকন্যাকে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী করবার জন্য সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাজ-সরঞ্জামে অর্থব্যয় করতে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো ত্রুটি করেন নি। প্রায় হাজার বিঘা জমী নিয়ে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত, গোপালন অশ্ব, শূকর, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগণের উন্নতি বিধানের জন্য বৈজ্ঞানিক আয়োজন, দুধ হইতে মাখন, পনির প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, ইত্যাদি কৃষিঅন্তর্গত যাবতীয় বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে; এখানে ছাত্রগণ অধ্যাপকের সহযোগে কৃষিবিষয়ক নব নব তথ্যাবিষ্কারের জন্য এক মহা সাধনায় নিযুক্ত। যে সকল কৃষিসমস্যার মীমাংসা প্রয়োজন, এখানে সে সকল বিষয়েই চর্চ্চা হয়,—এবং গবেষণার ফল দেশের প্রত্যেক কৃষিজীবির ঘরে ঘরে পৌঁছাইবার জন্য পুস্তিকা প্রণয়ন, বক্তৃতা, ও আলোকচিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা হয়।

আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে উভয়েরই পড়বার ব্যবস্থা আছে। যাতে মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করতে পারেন, যাতে মেয়েরা স্বামীকে তার কাজেও অল্পবিস্তর পরিমাণে সহায়তা করতে পারেন, যাতে মেয়েরা আবশ্যক হ'লে নিজেরা আপনার জীবিকা অর্জ্জন করতে পারেন, বিদ্যালয়ে সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা পাওয়াটা তাঁরা একটা 'ফ্যাসান' বলে মনে করেন না। যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে মেয়েরা গৃহের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সুচারুরূপে পালন করতে পারেন, সে দিকেই এদের দৃষ্টি। একটু ইংরেজি শিখে দুটো ইংরেজি নভেল পড়ে, একটু পিয়ানো টুং টাং করে, সৌখিন রকমের সেলাই শিখে যাঁরা মনে করেন 'স্ত্রীশিক্ষার' উচ্চাদর্শ লাভ হচ্ছে, তাঁদের এ সংস্কার ভাঙ্গবার জন্যে এক একবার ইচ্ছা করে আমেরিকা ও য়ুরোপের কোনো কোনো নারী-বিদ্যালয়ের অন্তর্প্রকৃতির সহিত তাঁদের পরিচয় করিয়ে দি। ব্রাহ্মসমাজ একদিন দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করেছিলেন; আজ যদি স্ত্রীশিক্ষাবিধানে সংস্কার প্রয়োজন হ'য়ে থাকে,

তাহলে আবার নূতন উদ্যমে তাঁদের কাজ করতে হবে।

মানসিক শক্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মোটামুটি যে বিধিব্যবস্থা করেছেন সংক্ষেপে তা বিবৃত করলুম। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমবেত চেষ্টায় মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছেন, এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

সাহিত্য, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান কৃষি প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য এক একটি সমিতি (club) গঠিত হয়েছে। আবার সাহিত্যানুরাগী ছাত্রদের মধ্যে—যাঁরা ধরুন Emerson কিংবা whitman পড়বার জন্য উৎসুক, তারা একত্রিত হ'য়ে এক একটি শাখা সমিতি গঠন করে। এ সকল সমিতিতে কেবলই যে গম্ভীর ভাবে এক একটী বিষয়ের আলোচনা হয় তা নয়; নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ, হাসিতামাসা ও কখনকখনও চড়ুইভাতেরও (Picnic) আয়োজন করা হয়। এর ফলে ছাত্র মহলে বেশ একটা সদ্ভাব স্থাপিত হ'তে থাকে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতি গুলিকে কখনকখনও আহ্বান করে ভাববিনিময়, আলোচনা, তর্কবিতর্ক, ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও করা হয়। এমনি করে সমগ্র যুক্তরাজ্যের শিক্ষার্থীগণের মধ্যে একটা জমাট ভাব ফুটে উঠ্‌তে থাকে। তাঁরা অনুভব করেন "এক দেশ, এক প্রাণ, এক ভগবান্।" হায় ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীগণ যদি এম্‌নি করে মিল্‌তে পারত!

যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের তরুণ যুবকগণকে মানুষ করে তুল্‌বার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সে যে তাদের শারীরিক উৎকর্ষ বিধানের নিমিত্ত কোনো একটা আয়োজন না করে ক্ষান্ত থাকবে তা হ'তেই পারে না। এজন্যে প্রত্যেক যুবককে দুই বৎসর কাল রীতিমত সপ্তাহে দুইবার করে শারীরিক ব্যায়ামের ক্লাশে উপস্থিত হ'তে হয়। ব্যায়ামের জন্য বিশেষ এক বস্ত্র প'রে একজন অধ্যাপকের অধীনে ও ইঙ্গিতে ব্যায়াম শিক্ষা করতে হয়। এ ছাড়া সপ্তাহে দু'বার করে ড্রিল করবার নিয়ম আছে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে যুবকগণকে যে ধরণের ড্রিল শেখাবার আদেশ আছে তা থেকে এ ড্রিলের আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হলে শিক্ষক থেকে হাজার হাজার যুবক যদি বন্দুক হাতে নিয়ে সমরক্ষেত্রে ছুটে যেতে না পারে, তা হলে এ ড্রিলের কোন সার্থকতা হয় না। যে সকল বিদ্যালয় গর্ভমেণ্টের সাহায্য পায়, তাহাদের প্রত্যেককে একটি সৈন্যবিভাগ রাখতে হয় ও প্রত্যেক ছাত্রকে সৈনিকের পরিচ্ছদে ভূষিত হ'য়ে বন্দুক হাতে করে ড্রিল করতে হয়।

ফুটবল, ব্যাটবল ইত্যাদি নানাপ্রকার খেলার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়কেই করতে হয়। সুধু ব্যবস্থা নয়, যার কর্ত্তৃত্বে এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, যিনি খেলার কৌশল শিক্ষা দেন তাঁর বেতন বিদ্যালয়ের প্রায় প্রধান অধ্যক্ষের সমান। খেলার সম্বন্ধে যুবকদের কি উন্মত্ততা! যখন আমাদের দেশের নির্জ্জীব, হীনবীর্য্য ও নিষ্পেষিত যুবকদের দেখি, তখন আমেরিকার যুবকদের কথা মনে হয়। সেখানেই যথার্থভাবে

যৌবন তার হাস্যপুলকিতমুখে বিরাজ করচে, সেখানে যৌবনের সংস্পর্শে সমস্ত জাতীয় জীর্ণতা লোপ প্রাপ্ত হচ্ছে। আর আমাদের দেশে জীবন ফুটতে না ফুটতেই শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে। এখানকার বসন্ত আর ফুলকে জাগিয়ে তোলে না—ভরা যৌবনের সঙ্গীত নীলাকাশে প্রতিধ্বনিত হয়ে দেশে নব-জীবনের বার্ত্তা প্রচার করেনা! কতবার পাখী ডেকে গেল, আমাদের সচেতন করবার জন্য কতবার উষা প্রদীপ জেলে সমগ্র বিশ্বকে জাগিয়ে তুল্‌লে—কিন্তু কই আমরা ত জাগলুম না। যদি জাগতুম তবে দেশের যুবকগণের মধ্যে যৌবনের প্রকাশ দেখতে পেতুম; যে সকল অকল্যাণকর সংস্কার এখনও আমাদের সমাজকে বদ্ধ করে রেখেছে, তা মুহূর্ত্তে লোপ পেত।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক বল্‌বার আছে। এত বড় বিপুল আয়োজনের বর্ণনা অল্পকাল মধ্যে সম্ভব নয়; এর অন্তর্গত বহু বিভাগ রয়েছে—তার প্রত্যেকটি নিয়ে এক একটি অবলম্বন করে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়। আমি এতক্ষণ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সাধারণ ভাব মাত্র সামান্যভাবে আলোচনা করেছি।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের ঋষিগণ আশ্রম রচনা করে শিক্ষার্থীর শরীর মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনের যেমন আয়োজন করেছিলেন আধুনিক যুগে আমেরিকা ও য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের আকৃতি দেখে তারই যেন একটা নতুন ছবি মনে পড়ে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সাধনার জন্যে কি অপূর্ব্ব ক্ষেত্রই না এঁরা রচনা করেচেন! এখানে কর্ম্ম সৃষ্টির আনন্দে যুবা বৃদ্ধ একেবারে নিমগ্ন। জ্ঞানের শিখরে উঠে এঁরা জীবনের ক্ষেত্রকে বড় করে দেখতে পাচ্চেন! তাই কোনো সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে এঁরা মান্‌তেই চান্ না। এঁদের শিক্ষা এঁদের ভিক্ষুক করে না; এঁদের সবল, সক্ষম আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। এরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার হয় জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে। জ্ঞানার্জ্জনের পিপাসা জাগিয়ে দেওয়া কর্ম্মের নেশা ধরিয়ে দেওয়াই ইউনিভার-সিটির লক্ষ্য। তারপর পিপাসা মেটাবার জন্যে, কর্ম্মের নেশার তাগিদে তাকে ছুটতেই হয়! যতই সে খাটে শক্তি তার ততই বৃদ্ধি পায়। এম্‌নি করেই সে সার্থকতার পথে যাত্রা করতে থাকে!

এই যে প্রভেদ আমেরিকার য়ুনুভারসিটির সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর—এর কারণ কি? যেন সেখানকার বিদ্যালয়ে মানুষ তৈরী হচ্চে, আর আমাদের শিক্ষাযন্ত্রে আরো যেন আমাদের চিত্ত বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়চে, এমন কি বুদ্ধিটাও নিষ্প্রভ হয়ে উঠছে এ দৃষ্টান্তও দেখা যায়। এ দুর্দ্দশার কারণ যে আমাদের সমাজ—কে আছেন একথা অস্বীকার করবেন? আমাদের দেশের কোন্ বিদ্যার্ণব তর্কচূড়ামণি সভায় দাঁড়িয়ে একথা বলতে সাহসী হবেন যে, আমাদের সমাজ মানুষকে অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাবার পথকে নানা জালজঞ্জালে রুদ্ধ করে দেয়নি? একবার বিচার করুন্ আমাদের সমাজ আমাদের

কাছে কি দাবী করচে! সে কি একথা বল্‌চে, ওগো তরুণ যুবকসম্প্রদায় দেখ, যুগের জঞ্জালের বোঝা ক্রমশই আমার দেহকে শীর্ণ করে তুল্‌চে; যাদের হাতে আমার জীবন সমর্পণ করা হয়েছিল, তারা আমাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে; যেখানকার যতকিছু আবর্জ্জনা তা কুড়িয়ে এনে এ কারাগারের দরজায় স্থাপন করে রেখেছে; আমাকে এ কারাগার থেকে মুক্ত করে এই নবযুগের প্রভাতে একবার মুক্তাকাশতলে দাঁড়াতে দেও।

কই আমাদের প্রাণ থেকে ত এমন বাণী এখনও শোনা যাচ্ছে না। যখনই কারাগারের প্রাচীর ভেদ করে সমাজের ক্রন্দন ধ্বনি বাইরে পৌঁছতে আরম্ভ করেছে, তখনই দ্বাররক্ষকগণ কাল ঘণ্টার কলরবে সব ঢেকে দিতে চেষ্টা করেচে! থামিয়ে দিন্ কাল ঘণ্টার অবিশ্রাম কলরব। যে সমাজে মানুষ নেই যে সমাজে প্রাণ নেই, তার আবার কিসের পূজা! যে সমাজ মানুষ দেখলেই বলে, "ওগো তুমি কোন্ বংশে জন্মেছ? তোমার গোত্র কি? তুমি এটা পূজা কর কিনা ওটা মান কিনা, অমুকের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খাও কিনা? যে সমাজ তুমি কার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিলে, কত বয়সে মেয়ে বিয়ে দিলে, সমুদ্রের উপরে ছেলে পাঠিয়ে আবার প্রায়শ্চিত্ত করালে কিনা, এই কৈফিয়তই চাচ্ছে, সে সঙ্কীর্ণ সমাজপ্রাচীরের সীমায় বদ্ধ থেকে মানুষ জন্মাবে এত বড় দুরাশা কে করবে? যে গাছের গোড়ায় কীটেরা দুর্গ নির্ম্মাণ করেছে—সে গাছে জল দিলে কি হবে? এই জন্যই ত শিক্ষা আমাদের জীবনকে বড় করে তুলছে না, আমাদের আশার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে আস্‌ছে শক্তির মূল আশারসে সিক্ত না হয়ে ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্চে। ভূ-শিকড় নষ্ট হয়েছে বলে না পারছি দেশের মাটি থেকে রস কর্ষণ করতে না পারছি বাহির থেকে কিছু সংগ্রহ করতে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই বলে আমরা দুঃখ করে থাকি,—আমার বিশ্বাস যোগ্যতার অভাব বশতঃই আমরা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। সুতরাং সেজন্য অনুশোচনা না করে আমাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের মত কাজ,—এবং সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। বিচার করে দেখতে গেলে শারীরিক দাসত্ব অপেক্ষা মানসিক দাসত্ব আরো ভয়ঙ্কর। যতদিন আমাদের মনুষ্যত্ব না জন্মে ততদিন সর্ব্বপ্রকার অধীনতা তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মাত্র। কোনো জাতিই শক্তির ক্ষেত্র একেবারে নিষ্কণ্টক পায়নি। ক'রে কর্ম্মে ভেঙ্গে গড়ে নানা ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে সবাইকেই পথ চল্‌তে হয়েছে। সার্কাসের ঘোড়া যেমন যত ধাক্কা পায় ততই তার উৎসাহ ও বেগ বৃদ্ধি পায়, তেমনি যে জাতি শক্তিকে সীমাবদ্ধ দেখে পেছিয়ে যায়নি বরং দ্বিগুণ উৎসাহে সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে নির্ভয়ে ছুটেছে "সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা", সে জাতিই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমাদের যদি এ জড়ত্ব থেকে একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হয় তবে যেটুকু সুযোগ সুবিধা সহায় আছে তারই সামনে পথ কেটে চল্‌তে হবে।

পথ চল্‌তেই শক্তি আপনি আসবে—প্রাণ সঞ্চারিত হবে। যখন একটু শক্তি জাগ্‌বে, তখন সমাজ আর এমনি করে মানুষকে নির্জীব হয়ে থাকতে দেবে না। প্রভাতের আলো যেমন আপনিই সমস্ত বিশ্বচরাচরকে সুপ্তি থেকে জাগায় তেমনি আমাদের এ বিপুল সমাজপ্রাঙ্গণে একবার বিশ্বালোকের আলো এসে পড়্‌লেই সমস্ত কৃত্রিম বন্ধন আপনা আপনি শিথিল হয়ে পড়বে। যতদিন না সমাজের স্বাস্থ্য ভাল হয় যতদিন না আমাদের জীবনের সম্মুখে একটি লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, ততদিন শিক্ষার সার্থকতা হবে না, শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার সময় এ কথাটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

জনগণমনঅধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমের আগমন

(Ella Wheeler Wilcox হইতে অনুদিত)

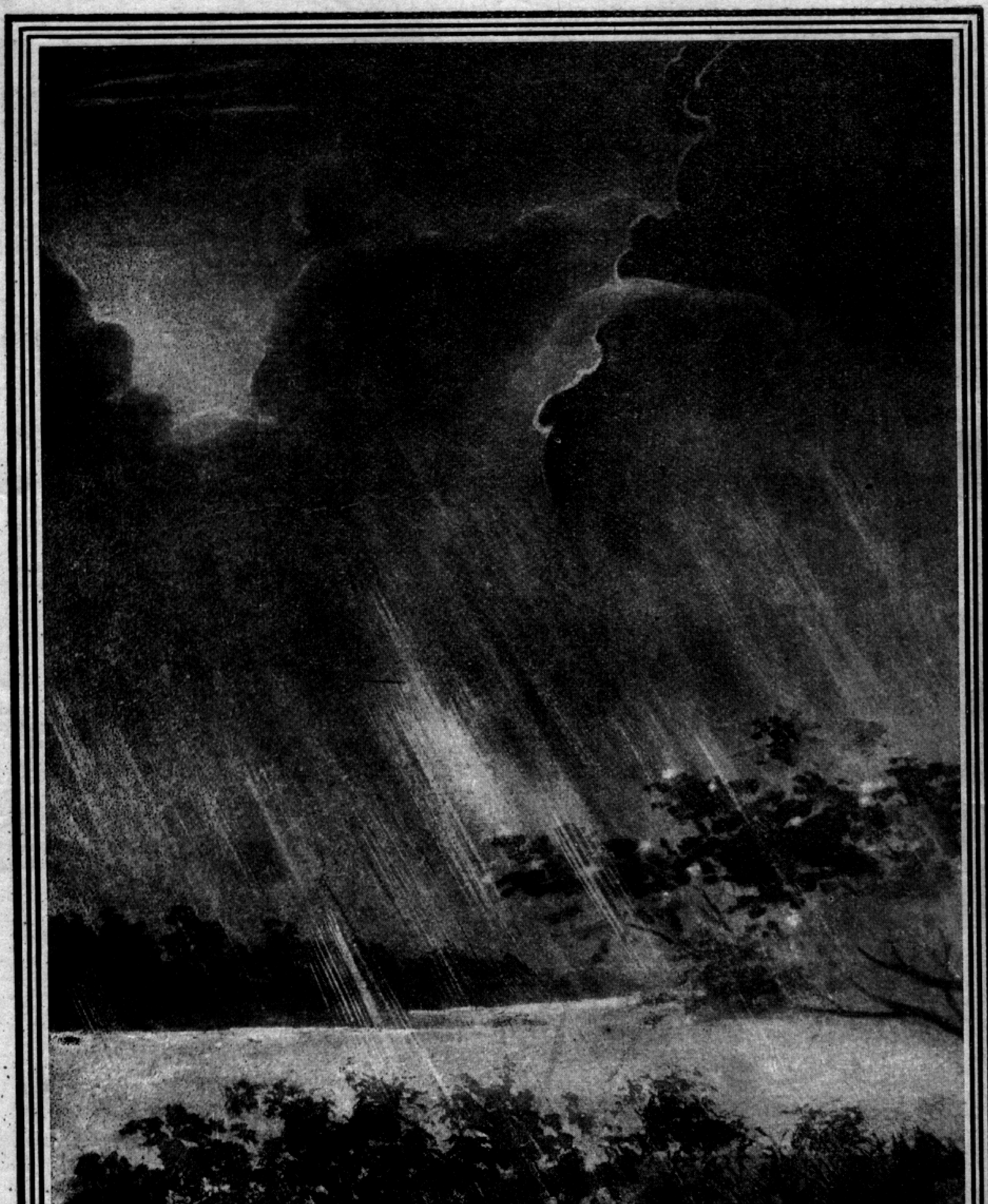
ভেবেছিল নারী প্রেম সে আসিবে
বিজয়ী বীরের ন্যায়,
তুরী ও ভেরীর গভীর মন্দ্রে
অস্ত্র ঝঞ্ঝনায়;
তা না হ'য়ে কোথা অন্তরে আসি
পশিল চোরের মত,
আগমন তার রমণী কিছুতে
হইল না অবগত!

ভেবেছিল রাজ-কুমারের মত
বধূ বরিবার তরে,
আসিবে গো প্রেম—বর্ম্ম তাহার
ঝকিবে সূর্য্য করে;
তা না হ'য়ে তারে দিবা অবসানে
দেখিল পার্শ্বে তার,
যবে ধীরে রাজে ম্লান ও মধুর
মৃদু আলো সন্ধ্যার!

সোনার স্বপন বিরচি রমণী
ভেবেছিল প্রাণে তার,
প্রেমের নয়ন করিবে সহসা
নব জ্যোতি সঞ্চার;
তা না হ'য়ে মুখে দেখিল তাহার
মোহন মধুর ভাতি,
জীবনে সে যারে ভেবেছে বন্ধু
চির পরিচিত সাথী!

ভেবেছিল সেগো বাত্যা-আকুল
সিন্ধু-নীরের মত,
আগমন তার, হৃদয় তাহার
আলোড়িবে অবিরত;
তা না হ'য়ে কোন সুখ স্বর্গের
শান্তি পিযুষ আনি
সার্থক তার করিল জীবন
ধন্য করিল প্রাণী!

শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।



শ্রাবণ-ধারা

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

মহালয়া

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসের প্রমাণ)

"মহালয়া" হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ পর্ব্ব। আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষ "মহালয়" বলিয়া খ্যাত (১)। তিথিতত্ত্বে ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে—"মহালয়ে কন্যায়াঃ পরপক্ষে।" এই পরপক্ষে হিন্দুসাধারণেরই পক্ষে পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধতর্পণ বিহিত হইয়াছে বলিয়া এই পক্ষকে বিশেষভাবে 'প্রেতপক্ষ' বা 'পিতৃপক্ষ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই পক্ষের অমাবস্যা বিশেষরূপে (মহালয়া) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; এবং এই অমাবস্যায় কৃত শ্রাদ্ধ বিশেষভাবে "মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ"নামে সর্ব্বত্র সুবিদিত। "মহালয়া" এইরূপে হিন্দুমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত হইলেও ইহার অর্থ তেমন সুগম নহে। সুতরাং ইহার অর্থের বিচারেই আমরা প্রথম প্রবৃত্ত হইব। 'মহালয়া' একটি সমাস বদ্ধ শব্দ। ইহা দুই প্রকারে গঠিত হইতে পারে। 'মহৎ' শব্দের সহিত 'আলয়' শব্দের যোগে একপ্রকারে এবং 'মহৎ' শব্দের সহিত 'লয়' শব্দের যোগে অন্য প্রকারে। এক্ষণে কোন্ প্রকারের যোগ গ্রহণ করিলে অর্থের সুসঙ্গতি হইবে তাহাই বিশেষরূপে আমাদের বিবেচ্য। প্রথম প্রকারের যোগের সমর্থনে আমরা কোন বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হই না, কিন্তু শেষোক্ত যোগের সমর্থনে আমরা সবিশেষ প্রমাণই প্রাপ্ত হই। সুতরাং আমরা শেষোক্ত যোগই গ্রহণ করিব। শেষোক্ত যোগ গ্রহণ করিলে অর্থ এই হয় যে "মহান্ লয় অর্থাৎ বিলয় হয় যাহাতে (২)।" কৃষ্ণপক্ষ যখন "মহালয়" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং অমাবস্যাতে যখন মহালয় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কৃত হইয়া থাকে, তখন "চন্দ্রের সম্পূর্ণ লয় হয় যাহাতে" পূর্ব্বোক্ত সমাসবাক্যের এইরূপ এক তাৎপর্য্য সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা তাহাই একমাত্র তাৎপর্য্য বা প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ "চন্দ্রের লয় হয়" বলিয়াই যদি মহালয় নাম হইবে—তবে প্রত্যেক 'কৃষ্ণপক্ষ' ও প্রত্যেক 'অমাবস্যা'ই 'মহালয়া' নাম পাইতে পারে। কেবল আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষ ও অমাবস্যাই বিশেষ করিয়া এই নাম পাইতে যায় কেন? এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি "সূর্য্যের মহান্ অর্থাৎ সম্পূর্ণ 'লয়' অর্থাৎ অস্ত হয় যাহাতে" ইহাই "মহালয়া" শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য। সূর্য্যের সম্পূর্ণ অস্ত কিরূপে হয় এক্ষণে আমরা তাহাই পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এখানে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে আষাঢ় মাস হইতেই সূর্য্যের দক্ষিণায়ন গতি আরম্ভ হইয়া সূর্য্য উত্তর হইতে আশ্বিনমাসে আসিয়া বিষুবরেখার উপর অবস্থিত

(১) "সৌরাশ্বিনীয় কৃষ্ণপক্ষঃ।" শব্দকল্পদ্রুম।

(২) বাচস্পত্য অভিধানেও এইরূপ ব্যুৎপত্তিই প্রদত্ত হইয়াছে ...

হয়। তাহাতেই দিন রাত্রি সমান হইয়া থাকে।

সূর্য্য যেকাল পর্য্যন্ত বিষুবরেখার নিম্নে দক্ষিণদিকে ক্রমাগত গমন করিতে থাকে—সেকাল পর্য্যন্ত উত্তরকুরু হইতে তাহা দৃষ্ট হইবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। দক্ষিণায়নের পর উত্তরায়ণে যখন সূর্য্যের উত্তর দিক হইতে গতি আরম্ভ হয় তখনই আবার তাহার দেখা পাইবার সম্ভাবনা হয়। সুতরাং এই অন্তর্ব্বর্ত্তীকাল উত্তরমেরুর নিকট সূর্য্য অস্তমিতই থাকে। ইহাই সূর্য্যের "মহালয়" অর্থাৎ মহাস্ত।

এক্ষণে সূর্য্যের মহাস্ত বা মহালয়ের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত "মহালয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধের" কি সম্পর্ক তাহাই আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিব। আমরা জানি যে রাত্রিভাগে সাধারণ দৈব বা পৈত্র্যকার্য্য করিবার নিয়ম নাই। উত্তরকুরু হইতে সূর্য্য পূর্ব্বোক্ত-রূপে কয়েক মাসের জন্য অস্তমিত হইলে তথায় সেই কয়েক মাস কেবল রাত্রিই বিরাজ করিতে থাকে। সুতরাং তৎকালে শ্রাদ্ধাদি পৈত্র্যকার্য্যের অনুষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই আর্য্যগণ সূর্য্যাস্ত-কালের জন্য পিতৃগণের পিণ্ডোদকের সঞ্চয় করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যেন সমস্ত কৃষ্ণপক্ষ ব্যাপিয়া তর্পণশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় আশ্বিন কার্ত্তিক মাস শ্রাদ্ধের কাল বলিয়া তখন যমালয় শূন্য হইয়া পড়ে যথা—

"যাবচ্চকন্যাতুলয়োঃ ক্রমাদাস্তে দিবাকরঃ।
তাবৎ শ্রাদ্ধস্যকালঃ স্যাৎ শূন্যং প্রেত পুরং তথা॥"
ইতিশুদ্ধিতত্ত্বম্।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষই মহালয়া, প্রেতপক্ষ বা পিতৃপক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সাধারণ গণনায় এরূপ হইলেও মলমাস স্থলে কার্ত্তিকেও মহালয়া বা পিতৃপক্ষ হইতে পারে যথা—

"নভাবাথ নভস্যোবা মলমাসোযদা ভবেৎ।
সপ্তমঃ পিতৃপক্ষঃস্যাদন্যত্রৈবচপঞ্চমঃ॥"

এখানে সপ্তম দ্বারা আষাঢ় হইতে সপ্তম পক্ষ ও পঞ্চম দ্বারা আষাঢ় হইতে পঞ্চম পক্ষ বুঝিতে হইবে।(৩) প্রাগ্বর্ণিত কালের পর উত্তর কুরুতে যে কয়েকমাস নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি বিদ্যমান থাকিবে তাহাতে পিণ্ডোদক প্রদত্ত হইবে না বলিয়া ব্যগ্র হইয়াই পিতৃগণ যমালয় পরিত্যাগ করিয়া পিণ্ডোদক সংগ্রহার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, ইহাই আমরা "প্রেতপুর শূন্য" হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বিষুবরেখার উত্তরদিক্ ক্রমশঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ করে বলিয়া রাত্রিকালে শ্রাদ্ধান্নপানীয় প্রদত্ত হইবে না মনে করিয়াই যে পিতৃগণ আশঙ্কা-ন্বিত হইয়া এই সময়ে বিশেষভাবে শ্রাদ্ধান্ন ভোজনের জন্য লালায়িত হন তাহার আরও বিশিষ্ট প্রমাণ আমরা দীপান্বিতার উল্কাদানের বিসর্জ্জন মন্ত্রে প্রাপ্ত হই যথা—

"যমলোকং পরিত্যজ্য আগতো যে মহালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তুতে॥"

---

* আষাঢ্যাঃ পঞ্চমেপক্ষে কন্যা সংস্থে দিবাকরে।

"যাঁহারা যমলোক পরিত্যাগ করিয়া মহালয়ের সময় আসিয়া সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা এই উল্কার উজ্জ্বল জ্যোতি দ্বারা পথ দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাউন্।"

নিমন্ত্রিত পিতৃগণ শ্রাদ্ধভোজন সমাপন করিয়া ফিরিবার পূর্ব্বে সূর্য্য বিষুবরেখার উত্তর হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ায় অন্ধকারের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে যাইতে হইবে বলিয়াই উল্কা ধরিয়া তাঁহাদের গমনমার্গ প্রদর্শন করিবার কথা লিখিত হইয়াছে। সংক্রান্তি হইতে আকাশপ্রদীপদান ও কার্ত্তিকে যমদীপ-দান এবং দীপান্বিতায় দীপাবলী প্রদানেরও মর্ম্ম উল্কাদানের অনুরূপ বলিয়াই মনে হয়।

উপনয়ন চূড়াকরণ প্রভৃতি বৈদিক সংস্কার যে দক্ষিণায়নের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং বিবাহ যে দক্ষিণায়ন অপেক্ষা উত্তরায়ণেই প্রশস্ত বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাও ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুতে আদিবাসের অন্যতর প্রবল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ দক্ষিণায়নে উত্তরকুরুতে রাত্রিকাল থাকিত বলিয়া এবং এই সমস্তের সহিত পিতৃকার্য্যের যোগ থাকায় তখন পৈত্র্যকার্য্য হইতে পারিত না বলিয়াই উত্তরকুরুতে দক্ষিণায়নে এই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত না থাকায় এখনও সেই পূর্ব্ব নিয়মই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

ভারতীয় আর্য্যগণ দক্ষিণায়নে মৃত্যুকামনা না করিয়া যে উত্তরায়ণে মৃত্যুকামনা করেন —তাহারও গূঢ় রহস্য আমরা পূর্ব্বোক্ত আলোচনাতেই প্রাপ্ত হইতে পারি।

ভারতীয় আর্য্যগণ যখন উত্তরকুরুতে বাস করিতেছিলেন; তখন দক্ষিণায়নের সময়

সময়ে কেহ মরিলে রাত্রিকাল বলিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য হইতে পারিত না। সুতরাং ইহাতে তাঁহার আত্মার সদ্গতি হইতে না পারায় আত্মাকে কষ্ট পাইতে হইত। কিন্তু উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধকার্য্যের কোন বাধা না থাকায় আত্মাকে পূর্ব্বোক্তরূপে কোন কষ্ট পাইতে হইত না। ইহাতেই দক্ষিণায়নে মৃত্যু দুরদৃষ্ট এবং উত্তরায়ণে মৃত্যু শুভাদৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

উত্তরায়ণের সহিত অন্ধকারের সম্বন্ধের মূল আমরা উপনিষদেই দেখিতে পাই। উপনিষদে মৃতের জন্য অর্চ্চিরাদিমার্গ ও ধূমাদি-মার্গ এই দুইটী পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহাদের বিশেষ পুণ্যসঞ্চয় থাকে তাঁহাদেরই উত্তরায়ণে মৃত্যু হয় এবং তাঁহারা অর্চ্চিরাদি মার্গে দেবলোকে গমন করেন, আর যাহাদের তেমন পুণ্যসঞ্চয় না থাকে তাহাদেরই দক্ষিণায়নে মৃত্যু হয় এবং তাহারা ধূমাদিমার্গে পিতৃলোকে গমন করে। এখানে আমরা বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ হইতে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"তে য এবমেতদ্বিদুর্যেচামী অরণ্যে শ্রদ্ধাসত্যমুপাসতে হর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি॥" ৬।২।১৫

"যাঁহারা উক্ত প্রকার পঞ্চাগ্নিদর্শন বিদিত হয়েন (অর্থাৎ জ্ঞানী) সেই সকল গৃহস্থ অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত হয়েন।"

"অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি॥" ৬।২।১৬

"আর যাঁহারা কেবল কর্ম্মী তাঁহারা ধূমাদিমার্গ প্রাপিত হয়েন।"

"অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রিরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয় নাণপক্ষাদ্ যান্ যণ্মাসান্ দক্ষিণমাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ

"আর যাঁহারা কেবল কর্ম্মী তাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞদ্বারা, যজ্ঞস্থানে দান দ্বারা, ও কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা লোকসকলকে জয় করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ ধূমাভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা ও দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা দ্বারা পিতৃলোক ও পরিশেষে চন্দ্রলোক প্রাপিত হয়েন।"

"তেষ এবমেতদ্বিদুর্যেচামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণ পক্ষ অপূর্য্যমাণ পক্ষাদ্মাম্ যণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যোদেবলোকং দেবলোকদাদিত্য ইত্যাদি।" ৬।২।১৫

"আর যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সত্যের উপাসনা করেন তাঁহারাও ঐ আর্চ্চরাদি মার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্চ্চিরাদি মার্গের প্রথম অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা, দ্বিতীয় অহরভিমানিনী দেবতা, তৃতীয় শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, চতুর্থ উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা, পঞ্চম দেবলোকাভিমানিনী দেবতা, ষষ্ঠ আদিত্যাভিমানিনী দেবতা ইত্যাদি।"

গীতাতেও উপর্যুক্ত উপনিষদ্ মর্ম্মই এইরূপে অবিকল সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লষন্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্রপ্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ॥ ৮।২৪
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্রচান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥" ৮।২৫
শুক্লকৃষ্ণেগতী হেহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়াযাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥" ৮।২৬

উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা আর্য্যমিশন ইন্‌ষ্টিটিউশন্ সম্পাদিত গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী যে অনুবাদ প্রদান করা হইয়াছে তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—ইহার সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত উপনিষদ্ বাক্য সকলের তুলনা করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদিত হইবে;—

মানিনী দেবতা) ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণং (উত্তরায়ণরূপাঃ ইতি উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা) [এতাসাং দেবতানাং যোমার্গঃ] তত্রপ্রযাতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্মগচ্ছন্তি] ২৪

ধূমঃ (ধূমাভিমানিনী দেবতা) রাত্রিঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা), কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) তথা ষন্মাসাঃ দক্ষিণায়নং (দক্ষিণায়নরূপাঃ ষন্মাসাঃ ইতি দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা।) [এতাভিঃ উপলক্ষিতো। [যোমার্গঃ] তত্র (প্রযাতঃ) যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য) [তত্র কর্ম্মফলং ভুক্ত্বা] নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্ততে)। ২৫।

"জগতঃ শুক্লকৃষ্ণে [শুক্লা অর্চ্চিরাদি গতির প্রকাশময়ত্বাৎ কৃষ্ণা ধূমাদি গতিঃ তমোময়ত্বাৎ] এতে সতী (মার্গৌ) শাশ্বতে অনাদীমতে (সংজ্ঞিতে) [সংসারস্য অনাদিত্বাৎ] [তয়োঃ] একয়া (শুক্লয়া) অনাবৃত্তিং (মোক্ষং) যাতি, তনয়া কৃষ্ণয়া পুনরাবর্ত্ততে॥ ২৬

অগ্নি এবং জ্যোতিঃ (তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল), অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) উত্তরায়ণরূপ ষণ্মাস (উত্তরায়ণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ঐ ঐ দেবতাগণের যে মার্গ (পথ) তাহাতে (মৃত্যুর পর) গমনশীল ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মকে পান।" ২৪

কর্ম্মযোগিগণ, (মরণান্তে) ধূম, রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন ষণ্মাস ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা সমীপে উত্তরোত্তর উপগত হইয়া ক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং ভোগাবসানে তথা হইতে সংসারে পুনরায় আগমন করেন। ২৫

প্রকাশময় অর্চ্চিরাদি শুক্লাগতি এবং তমোময়া ধূমাদি কৃষ্ণাগতি জগতের এই দুই মার্গই অনাদিরূপে প্রসিদ্ধ আছে, এই দুয়ের মধ্যে একটী দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অপরটী দ্বারা পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ২৬

উপনিষদে আমরা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ভেদে মৃত্যুর পর যে দুই প্রকারের গতির উল্লেখ পাই বেদেও তাহার আভাস পাওয়া যায়।

আখ্যাত হইয়াছে এবং "ধূমাদিমার্গ" 'পিতৃযান' আখ্যাত প্রাপ্ত হইয়াছে। উপনিষদে যেমন আদিত্য অর্চ্চিরাদি মার্গের অধিষ্ঠাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ঋগ্বেদেও আমরা আদিত্যাত্মক যমকে স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাতারূপে স্তুত হইতে দেখি যথা—

আদিত্যাভিমানিনী দেবতা ইত্যাদি।"

"পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরণু বহুভ্যঃ পথামনুপস্পশানম্।
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্ত ॥"
১০।১৪।১

"হে অন্তঃকরণ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর। তিনি সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাঁহার নিকটই সকল লোকে গমন করে।" রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ।

যমসম্বন্ধে রমেশবাবু টীকা করিয়াছেন—"আমরা আরও বলিয়াছি যে যমের আদি অর্থ সূর্য্য বা দিবস।"

ঋগ্বেদের অন্যত্র মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়াদেব-কার্য্যের পথ ছাড়িয়া দিতে বলা হইয়াছে যথা—

"পরং মৃত্যো অনুপরেহি পংথাং যস্তে স্ব ইতরো
দেবযানাৎ ॥" ১০।১৮।১

"হে মৃত্যু! তুমি আর একপথে ফিরিয়া যাও, দেবলোকে যাইবার যে পথ তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যপথে যাও।" রমেশ বাবুর অনুবাদ।

উপনিষদে যেমন কর্ম্মবিশেষের দ্বারা ধূমাদিমার্গ প্রাপ্তির কথা পাওয়া যায় বেদেও তেমন অনুষ্ঠান বিশেষের দ্বারা হীনগতি প্রাপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

"সংগচ্ছস্ব পিতৃভি সংযমেনেষ্টা পূর্ত্তেন পরমেব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বাসুবর্চ্চাঃ ॥"
ঋগ্বেদ ১০।১৪,৮

"ইষ্টাপূর্ত্তের সাধ্য অনুষ্ঠান দ্বারা আকাশে পিতৃলোক

পুনর্ব্বার অস্ত (নামক গৃহে) প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর।" রমেশবাবুর অনুবাদ (শেষাংশ)।

এখানে অস্ত যদি আমরা দক্ষিণায়নে সূর্য্যের মহাস্ত বা মহালয় অর্থে গ্রহণ করি—তবে ইহার দক্ষিণায়নে পিতৃলোক প্রাপ্তিরূপ গতি বুঝাইতে বাধা থাকে না।

এখানে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠকের দুইটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—বেদের পূর্ব্বোক্ত আভাস তাহাতে কিরূপ বৈশদ্য ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে আমরা দেখিতে পাইব।

"যেচেমে অরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষ-মভিসম্ভবন্তি। অর্চ্চিষোহহঃ। অহ্ন আপূর্য্যমাণ পক্ষম্। আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড় উদঙাদিত্য মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্। সংবৎসরাদাদিত্যং আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং। চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্। তৎপুরুষো অমানবঃ সএতান্ ব্রহ্মগময়তি। এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ॥"

যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাবান্ ও তপস্বী হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করে, তাহারা মরণান্তে প্রথমতঃ অর্চ্চির-ধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থান হইতে কোন এক অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে উপাগত হইয়া মৃত জীবকে ব্রহ্মলোক প্রাপন করে।

"অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি। ধূমাদ্রাত্রিম্। রাত্রেরপর পক্ষম্। অপর পক্ষাৎযান্ ষড় দক্ষিণাদিত্য এতি মাসাংস্তান্। নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্। পিতৃলোকাদাকাশম্। আকাশাচ্চন্দ্রমসম্। ইতি ॥"

"যাহারা গ্রামে গৃহস্থভাবে থাকিয়া ইষ্ট অর্থাৎ যাগাদিপূর্ত্ত অর্থাৎ জলাশয় মার্গাদি ও দানাদি কর্ম্ম করে, তাহারা মরণান্তে প্রথমতঃ ধূমাভিমানিনী দেবতা প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে উত্তরোত্তর রাত্রি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, দক্ষিণায়ন দেবতা, পিতৃলোক, আকাশ দেবতা, এবং পরিশেষে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।" আর্য্যমিশন্ ইনষ্টিটিউশন্ সম্পাদিত গীতায় উদ্ধৃত ও অনূদিত।

চন্দ্ররশ্মি*

বর্ত্তমানে অষ্ট্রীয়ায় এক মহা আবিষ্কার প্রক্রিয়ার ধুম পড়িয়াছে; কিয়ৎকাল অবধি তত্রত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে চন্দ্রকিরণ সম্বন্ধে সুগভীর গবেষণা চলিতেছে। মিঃ ব্রায়ার এ সম্বন্ধে অগ্রণী। তাঁহার এক বন্ধু মেরু প্রদেশের অনেক স্থান পরিভ্রমণের পর তাঁহাকে বলেন যে চন্দ্রের কিরণ সম্বন্ধে তাঁহার একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ তিনি যখন উত্তর মেরুর কেন্দ্রে গিয়া পড়িলেন তখন এক রজনীতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। প্রায় মাসাধিক কাল সেই শীতপ্রবল দেশে থাকিয়াও নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটে নাই! একদিন সন্ধ্যার ঈষৎ ম্লান ছায়ায় যখন শিকারের পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে তিনি কোন পর্ব্বতের বাহুদেশে দাঁড়াইলেন, তখন সুনিবিড় মেঘপুঞ্জ ভেদ করিয়া সহসা নির্ম্মুক্ত কৌমুদীধারা সমগ্র আকাশ পরিপ্লাবিত করিতেছিল! নিম্নে ভূখণ্ড নীহারাচ্ছন্ন থাকায় সেই শুভ্র রজত কিরণধারা উহাতে প্রতিহত হইল। তুষারখণ্ডের উপর অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তিনি কেমন মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাহার দেহ যেন অসাড় হইয়া গেল আর সর্ব্বাঙ্গ এরূপ বেদনা পরিপ্লুত হইল যে মাথা তুলিবার পর্য্যন্ত শক্তি রহিল না। পাঁচদিনে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিয়াছিলেন। তখন তাঁহার আশ্চর্য্য ঠেকিল এই, কত প্রমোদ রজনীতে—কত যৌবনপ্রবাহের উদ্দাম স্রোতে এইরূপ চন্দ্ররশ্মি ত স্বদেশে উপভোগ করিয়াছেন কিন্তু এমন শক্তিহীনতা ত কখনই অনুভব করেন নাই! চন্দ্রের প্রতি বন্ধুর এই সুদীর্ঘ অভিযোগ মিঃ ব্রায়ারের নিকট বড়ই কৌতুহলপ্রদ বলিয়া অনুমিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ এই রহস্যের সন্তোষজনক উত্তরদান করিতে পারিলেন না। পরে সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা যাহা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মিঃ ব্রায়ার এই অভিনব রহস্য উদ্ঘাটনে চারি পাঁচজন বন্ধুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ বিকিরণের (radiation) মধ্যে তারতম্য নির্নীত হয়। সূর্য্যের কিরণ অনলপ্রভ ও সঞ্চরণশীল কিন্তু চন্দ্রের কিরণ শৈত্যময় ও সঙ্কোচশীল। সূর্য্যের কিরণ ঊর্দ্ধে গমনপথ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর আপ্রান্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলে, প্রবেশপথ না পাইলেও উত্তাপ সঙ্কোচশীল স্থানেও বিকীর্ণ হয় এবং সমস্ত পদার্থে তাপ সঞ্চারিত হয়। কিন্তু চন্দ্রকিরণ শুভ্রতায় নীলিমার আস্তরণ ঢাকিয়া পৃথিবীর বক্ষে শীতলতা বর্ষণ করিতে থাকে, বারিবর্ষণের ন্যায় চন্দ্ররশ্মিপাতও শতসহস্র যোজন হইতে নামিয়া যেখানে আর্দ্র স্থান পায় তাহাতে প্রহত হইতে থাকে, আর তাহার অভাবে

* প্রবন্ধান্তর্গত উপাদানের অধিকাংশই 'The literary digest' এবং The lancet' ও 'The

বরাবর আকাশপথ হইতে সঞ্চারিত হইয়া নিমস্থ ভূখণ্ডেই সেই আর্দ্রতার ধারা পুঞ্জীকৃত ও গাঢ় হইতে থাকে অথচ সূর্য্যকিরণবৎ চতুষ্পার্শ্বে সঞ্চারিত হইবার জন্য ইহার কিছুমাত্র প্রয়াস দৃষ্ট হয় না। সূর্য্যরশ্মিতে যে বস্তু-নিচয়ের সমবায় আছে উহাতে সজীবতার অংশই অধিক কিন্তু চন্দ্রকিরণে যে তরল বস্তু-ভাগ আছে উহা স্বতঃই চন্দ্ররশ্মিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে এবং সেই জলীয় অংশহেতুই চন্দ্রের রশ্মি বিকিরিত হইয়া নিম্নভূভাগে আশ্রয় লইয়া পুঞ্জীকৃত হইতে আরম্ভ হয়। এখন বৈজ্ঞানিকের চক্ষে এই চন্দ্ররশ্মিতে যে পরিমাণ তরল পদার্থ আছে তাহা দ্বারা এইরূপ প্রতীত হইয়াছে যে, চন্দ্রের কিরণে সজীবতার লেশমাত্রও নাই কিন্তু উদ্ভিদাদির বর্দ্ধনশীল উপকরণ রহিয়াছে।

এমন অনেক গাছ দেখা যায় কৃষ্ণপক্ষে বিশুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া যায় কিন্তু শুক্লপক্ষের আগমেই উহাদের নষ্ট কান্তি ফিরিয়া আসে। ইহা হইতে চন্দ্রের কিরণে উদ্ভিদাদির হিতকর জিনিস আছে বলিয়া সাধারণতঃ বুঝা যায়। সেইরূপ সূর্য্যের কিরণেও কোন গাছ বা দৃশ্যতঃ বিশুষ্ক গাছ যেমন কদলী প্রভৃতি সজীব দেখায়।

এখন কথা হইতেছে যে, সূর্য্যকিরণ যেমন আমরা নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতে পারি চাঁদের আলোকেও সেরূপ আপন করিয়া লইতে পারি কিনা! এই সমস্যায় পড়িয়া বৈজ্ঞানিক ব্রায়ার কিছুকাল হাবুডুবু খাইয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে একটি উত্তম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। ব্রায়ার বলেন চন্দ্ররশ্মি জীবন-নাশক সাংঘাতিক উপায় স্বরূপ। তাঁহার এই মন্তব্যে দুই দল হইয়া পড়িয়াছে। আর একদল দল মুক্তকণ্ঠে প্রাচীন বিশ্বাস অনুসরণ করিয়া কহিতেছেন, আশঙ্কার কোন কারণ নাই, বরঞ্চ চন্দ্রালোকে জীবনী শক্তির স্ফূর্ত্তিলাভ ব্যতীত আর কিছুই হয় না। কিন্তু এই মতের প্রামাণ্য ভিত্তি নাই তাই তাহাদের প্রতিবাদ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। অষ্ট্রীয়ার বৈজ্ঞানিক আপনার সিদ্ধান্ত অনুসারে কহিতেছেন চন্দ্রের প্রাথমিক উত্তেজনাই জীব প্রকৃতির বিকৃতিসাধন করে; সেই জন্য চন্দ্রলোকদীপ্ত প্রান্তরে মাথা পাতিয়া থাকিলে উহার আকর্ষণ প্রভাব প্রথমেই সম্মোহন জন্মাইয়া দেয় তারপর মস্তিষ্ক বিকার ঘটাইতে আরম্ভ করে। ইংরাজীতে 'লুনেসি' (Lunacy) শব্দটীরও ব্যুৎপত্তি এইরূপ বিশ্বাসমূলক। ব্রায়ার বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন চন্দ্ররশ্মি যে ধ্বংসকারী তাহা উহার আলোকতরঙ্গের ভঙ্গীভেদ হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কিন্তু ভঙ্গীভেদ কি তাহাই জনসাধারণের দুর্ব্বোধ্য। যাহা হউক অবশেষে ইহারও সরলার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন কোনও তাড়িতযন্ত্রে উত্তাপ দৃঢ়ীভূত হইয়া ইষ্টক দেওয়াল ভেদ করিয়াও অদূরবর্ত্তী সজ্জিত কামানে অগ্নি সংযুক্ত হয় এবং তন্মুহূর্ত্তেই কৃত্রিম প্রণালী অনুসৃত কামানে বহ্নিশলাকা প্রদানের ন্যায় ধূমোৎগীরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া অগ্নি গোলা ধাবমান হয়, যেমন ভিন্ন দুই স্থানের তাড়িত যন্ত্রে সঞ্চিত সম সরঞ্জামের ফলে তারহীন টেলিগ্রাফের কার্য্য আরম্ভ

হয়, সেইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা চন্দ্রের দীপ্তি-মণ্ডলে জীবননাশক পদার্থ নিচয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অতি উত্তম প্রমাণ লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছে।

ফুল্লজ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে ছাদের উপর শয্যা আস্তৃত করিয়া চন্দ্রদেবকে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে, উন্মত্ততার সঞ্চার হয়। যাহার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অধিক তাহার মস্তিষ্ক বিকার হওয়া খুব সাধারণ ও সম্ভবপর আর যাহার মাংসপেশী সবল, শরীর স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, তাহারও স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা ক্ষতিজনক, ইহাতে কিন্তু সে পাগল হইয়া পড়ে না। চন্দ্র-রশ্মির প্রধান দোষ হইতেছে এই যে, ইহাতে দৃষ্টিহীনতা জন্মে। কেহ কেহ বা একেবারে অন্ধও হইয়া যায় তবে তাহা ক্বচিৎ। একজন জর্ম্মান্ জ্যোৎস্নানিশীথে এয়ারোপ্লেনে বার্লিন প্রাসাদ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকেন সঙ্গে তাপমানের পারদ নিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল গ্রহনক্ষত্রের পর্য্যালোচনা; কিন্তু দেড়শো গজ ঊর্দ্ধে উঠিতেই তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার রক্তের নির্গমন কতকটা অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। তিনি বাহিরের ডেকে দাঁড়াইয়াছিলেন, চন্দ্ররশ্মি তাঁহার উপরে সম্পূর্ণরূপে বিকীর্ণ হইয়া চুম্বকের ন্যায় তাঁহাকে যেন আকৃষ্ট করিতেছিল। তিনি অনুভব করিলেন যেন তাঁহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া শোণিতস্রোত হিমানী-শীতল হইয়া পড়িতেছে। তৎক্ষণাৎ কেবিনে ফিরিয়া গেলেন। সে যাত্রা আর নক্ষত্র-পর্য্যালোচনা হইল না, অসুস্থ শরীরে গতি ফিরাইয়া নামিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তখন শরীরের উত্তাপ নিয়া দেখিয়াছিলেন যে দেড়ছটাক রক্ত আন্দাজ শুষিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে চন্দ্রের কিরণে পূর্ব্বে যে প্রকার জিনিস ছিল, উহার কিছু বিলোপ হইয়াছে, তাই তাহার ভাবেরও (odor) কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আর একটা শোচনীয় ঘটনার কথা শুনা যায়।

কোনও এক ভাবুক গায়ক আপন গানে বিভোর হইয়া ছাদের উপর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে গান করিতেছিল, নিজের গানে সে এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িল যে তাহার আর বাহ্যিক জ্ঞান ছিল না, রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহাকে আর গান করিতে শুনা গেল না! যখন লোক গিয়া সেখানে পৌছিল তখন তাহার কোন সাড়া শব্দ নাই! তাহারা দেখিল গায়ক তেমনিভাবে বসিয়া রহিয়াছে হাতে তেমনই রবাব, আর মুখেও তেমনি তৃপ্তির হাসিটুকু লাগিয়াই রহিয়াছে, কিন্তু বক্ষে হাত দিয়া দেখিল উহা যেন তুষার শীতল, শরীরে রক্তের চলাচল বন্ধ মুখে যেন রক্তহীন প্রতিকৃতির চাপ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। লোকটা গানে এরূপ মজগুল হইয়া পড়িয়াছিল যে রশ্মিধারা রাক্ষসী যে তাহার প্রতি শোণিতবিন্দু শোষিয়া লইতেছে তাহা কিছুমাত্র সে টের পায় নাই; তন্ময় ভাবে সে গাহিয়াই চলিয়াছিল। যখন দেহে হঠাৎ রক্তাভাব হইল, তখনই সারা দেহে সাড়া পড়িয়া গেল, হৃদয়যন্ত্র শেষ ঝঙ্কার দিয়া চির-দিনের তরেই থামিয়া গেল।

বৈজ্ঞানিক ব্রায়ার এই সমুদয় খণ্ডদৃষ্টান্ত দ্বারা চন্দ্রের নৃশংশতা সম্বন্ধে অনেক অগ্রসর

হইতে পারিয়াছেন সত্য কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রমাণ সর্ব্ববাদীসম্মত হইতে পারে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মিঃ ব্রায়েণ্ট নামক জনৈক সুশিক্ষিত ইংরাজ লেখক 'Chemical News' নামক ম্যাগাজিনে ইহার সহিত একমত হইয়া একটি সুলিখিত সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছেন।

তিনি বলেন, চন্দ্ররশ্মি যে স্বাস্থ্যহানিকর মৎস্যের দ্বারা পরীক্ষায় তাহা সহজেই প্রমাণীকৃত হয়। আমরা জানি অনেক মাছ নদীর চড়ায় লাগিয়া থাকিতে বা জ্যোৎস্না রাতে ঢেউয়ের মাথায় ভাসিয়া থাকিতে ভাল বাসে। জল শীতল তাই চন্দ্রকিরণ তথায় গাঢ় হইয়া জমিতে কিছুমাত্র বাধা পায় না। এখন সেই মৎস্যগুলি সারারাত কিরণস্নাত হইয়া কোনট. বা মরিয়া যায় আর কতকগুলি বা শেষরাত্রে জেলের শীকার হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে সেই মাছ খাইবামাত্র গাত্রজ্বালা হয় বা অপর কোন উপসর্গ আসিয়া জুটে। বেশী পরিমাণ খাইলে মস্তিষ্কবিকার বা সহসা মৃত্যুও হইয়া থাকে। মৎস্যের ন্যায় চন্দ্ররশ্মিপিপাসী অন্য নরভোজ্য প্রাণীও আমাদের উদরস্থ হইলে কুফল ফলিয়া থাকে।

চন্দ্রের কিরণ যখন আকাশপথ হইতে ক্রমশঃ অধোগামী হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তখন উহার কোন প্রকারের অঘটন্ ঘটাইবার ক্ষমতা থাকে না—ঐ সঞ্চরণমান্ রশ্মি শুধুই শৈত্যপরিপূর্ণ তাই উহার প্রাথমিক আক্রমণ কিছুমাত্র কুফল উৎপাদন করিতে পারে না। জ্যোৎস্নারাতে ছুটাছুটি করিলে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা অতি অল্প কিন্তু স্থির হইয়া উপুর নিয়ে মাথা পাতিলেই সর্ব্বনাশ।

চন্দ্ররশ্মি জলীয় পদার্থে পরিপূর্ণ থাকায় উহা উর্দ্ধদেশ হইতে অনবরত একস্থানেই পতিত হইতে থাকে আর কোথাও ছড়াইয়া পড়ে না, বাদলধারারন্যায় শুধু স্থানবিশেষে প্রহত হইতে থাকে, উহাকেই ইংরাজীতে 'Polarization' কহে। কিন্তু সূর্য্যের সাধারণতঃ এইরূপ কোন Polarization নাই তাহা পুর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই দেখা যায় চন্দ্রকিরণ দুই আকারে জীবজগতে বিকীর্ণ হইতেছে তন্মধ্যে Polarizationই স্থায়ী আর সঞ্চরণমান চন্দ্ররশ্মি ক্ষণিকের। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে,—দ্বিতীয় প্রকার রশ্মিতে যদি অনিষ্টকারী কিছু না রহিল তবে প্রথমটীতে আসিল কি করিয়া! তাহার উত্তর এই হইবে যে যাবৎ চন্দ্ররশ্মি Polarized না হয় তাবৎ উহার দ্রব্যগুণ বিকশিত হয় না, —তাই যখন উহা গাঢ় হইয়া জমিতে আরম্ভ করে তখনই উহাতে বায়ুমণ্ডলের মধ্যদিয়া বিষাক্তদ্রব্যের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয় এবং তখনই কৌমুদীরাশি বিষে পরিণত হইয়া পড়ে। সেইস্থানে উপবেশন করিলে যত সহজে আমাদের মোহ ও বিকারগ্রস্ততার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় জ্যোৎস্নায় হাঁটিতে আরম্ভ করিলে তাহা হইতে পারে না। কিন্তু ক্রমশঃ উন্মুক্ত কৌমুদীধারা মস্তক প্লাবিত করিয়া সেখানেও Polarized হইবার চেষ্টা পায়—যদি সম্পূর্ণরূপে Polarized হইয়া পড়ে তাহার ফল মৃত্যু বা উৎকট-উন্মত্ততা! Polarized হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিষাক্ত পদার্থ মস্তিষ্কে ঢুকিতে আরম্ভ করে এবং সমগ্র ধমনী দিয়া আর্দ্রতা বহিয়া রক্তের তেজ সন্ধীভূত করিয়া দেয়।

এই Polarized চন্দ্ররশ্মিতে কি কি পদার্থ রহিয়াছে বৈজ্ঞানিক ব্রায়ার তাহাব নির্দ্ধারণ করিলেও এখনও এ বিষয় চাপা রাখিয়াছেন। তবে তিনি এই Polarization-এর কুফলের যে সকল চমৎকার প্রমাণ প্রদর্শিত করিয়াছেন তাহাতে ইহার ক্ষতিকারিতা ক্রমশঃ সকলে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন।

অষ্ট্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সমাজে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে ইহার প্রথম পরীক্ষা হয়। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দ্বিপ্রহর সমাগত হইলে যখন চন্দ্র-ধারায় সমগ্র প্রান্তর পরিস্নাত হইল, তখন ব্রায়ার পূর্ব্বরক্ষিত এক খণ্ড স্পঞ্জের নিকট একটী পেয়ালায় একটুকরা মাছ রাখিয়া দিলেন, আর দেওয়াল সংলগ্ন তারে ফিতায় আঁটিয়া আর এক টুকরা মাছ ঝুলাইয়া দিলেন। দর্শকবৃন্দ অধীর প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতে লাগি-লেন। পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পেয়ালা আনিয়া দেখিলেন এই সময়ের মধ্যে সেই পেয়ালার মাছ একেবারে পচিয়া গিয়াছে। তারে ঝুলানো মৎস্যখণ্ডটীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন উহা ঠিক অবিকৃত রহিয়াছে। পেয়ালার মৎস্যখণ্ডটী পচিবার কারণ বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। স্পঞ্জটী প্রায় ক্রমাগত আট ঘণ্টা কাল Polarized হইয়া ছিল আর তাহারই সন্নিকটে পেয়ালার মৎস্যখণ্ডটী থাকায় বিষাক্ত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয়মৎস্য সঞ্চরণশীল (direct light) আলোকে থাকায় কোন প্রকারের দোষসংস্পর্শে না আসিয়া অবিকৃত রহিয়া গিয়াছিল। সেই পাত্রে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতে পাইলেন যে direct light polarized light অপেক্ষা অনেক উত্তাপশীল এবং অপেক্ষাকৃত হীন উত্তাপই যত অনর্থের কারণ! এই ঘটনার পর য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক স্থানেই ইহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে;—যাঁহারা এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই চমৎকৃত হইয়া গিয়াছেন যে এতদিন পরে আর একটা নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার সদ্যঃ বিকাশে জীবজগতে গুরুতর ভ্রমের অপনোদন হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার বৈজ্ঞানিক এই খানেই নিরস্ত হন নাই। যাহাতে চন্দ্ররশ্মির বিষাক্ত সংস্পর্শটুকু পৃথিবীতে আর বিষম দুর্ঘটনার চিহ্নমাত্র আঁকিতে না পারে তাহারই জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বপ্ন শিশু

তোমারে করিয়া কোলে ঘুম ভাঙে মোর,
তোমারে জাগাই আমি আঁখির সোহাগে,
লইয়া বুকের পাশে স্নেহ-সুখে ভোর
কাটে রাত্রি স্বপ্ন আর সুপ্তি অনুরাগে!

এ নিদাঘে সারাদিন তুলি বারে বারে
জীবন-অমিয়া মোর তোমারে পিয়াই,
তৃপ্ত করি শান্ত করি, ওগো একেবারে
তোমারে অমর আমি করিবারে চাই!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গড়ের মাঠ

আমরা কল্‌কাতা ছেড়ে যদি সামান্য কোনো একটী গ্রামেও যাই তা'হলে সে জায়গায় কোথায় কি আছে না আছে আমরা ভাল করেই তা দেখি। সেখানে কোথায় একটী ছোট নদী বালুর ভিতর দিয়ে তর তর করে বয়ে যাচ্ছে—কোথায় তার তীরে কুঁড়ে ঘরগুলি সুন্দর ছবির মত সাজান রয়েছে—কোন্ জায়গায় সুন্দর একটী নারিকেল বাগান, —কোথাও বা বড় প্রকাণ্ড একটা গাছে নানা রকম লতা জড়িয়ে উঠেছে; কখন্ ঘাটে এসে একটী কুলবধূ কলসীকাঁখে কেমন সুললিত গতিতে জল তুলে নিয়ে গেল, এ সমস্তই আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু এই কল্‌কাতা সহর এত বিশাল যে এর অভ্যন্তরে বাস করেও আমরা তার কোথায় কি দ্রষ্টব্য জিনিস রয়েছে তার কিছুই প্রায় জানি না। এমন কি আমাদের ঠিক চোখের সামনে এমন যে এক বিস্তৃত গড়ের মাঠ পড়ে আছে যার পাশ দিয়ে আমরা প্রতিদিনই আনাগোনা করি তার ভিতরে যে কত দেখ্‌বার জিনিস রয়েছে তাও আমরা ভাল ক'রে জানিনে। এই যে অক্টারলনি মনুমেণ্ট বোধ হয় কল্‌কাতার অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এর উপর উঠে সমস্ত সহরের দৃশ্য দেখাটা ইজিপ্টের পিরামিডের উপর ওঠার মতই একটা কল্পনার বিষয়।

ইডেন গার্ডেন এই মহানগরীর এক অতি রমণীয় উদ্যান। বোধ হয় সকলেই কোনো না কোনো দিন এর সৌন্দর্য্য দেখে তৃপ্ত যে ছবি ও মূর্ত্তি রয়েছে তার ভিতর যে কত কীর্ত্তিকাহিনী নিহিত তা অনেকেরই নিকট অবিদিত। আমরা যদি এখানে এই মূর্ত্তিগুলি উদ্ধৃত করে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করি তা'হলে বোধ হয় তা পাঠকদের নিকট নিতান্তই পুরাতন কথা বলে মনে হবে না।

রেড রোডের ধারে সুবিস্তীর্ণ ময়দানে আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি। আমাদের রাজারাণীদের মধ্যে কেবলমাত্র ইঁহার মূর্ত্তি গড়ের মাঠে সংস্থাপিত হয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ইনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতের শাসনদণ্ড হস্তে ধারণ করেন। মূর্ত্তিটীতে ভিক্টোরিয়ার উদারতার ভাবটুকু বেশ ফুটে উঠেছে।

রেড রোড হইতে ইডেন গার্ডেনের দিকে যেতে উদ্যানের অতি সন্নিকটে প্রথমেই যোদ্ধ্‌বেশে অশ্বোপরি লর্ড হার্ডিং। ইনি একজন সুবিখ্যাত বীরপুরুষ। ডিউক অব ওয়েলেসলি ইঁহারই হাতে নেপোলিয়ানের তরবারি সমর্পণ করেছিলেন। ইঁহারই কালে প্রথম শিখ্‌যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। সে সময় ইঁহার অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।—বীরের উপযুক্ত বেশেই বীরের স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে। ইনি কিছুকাল ভারতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। ইনি আমাদের বর্ত্তমান লাট সাহেবের পিতামহ।

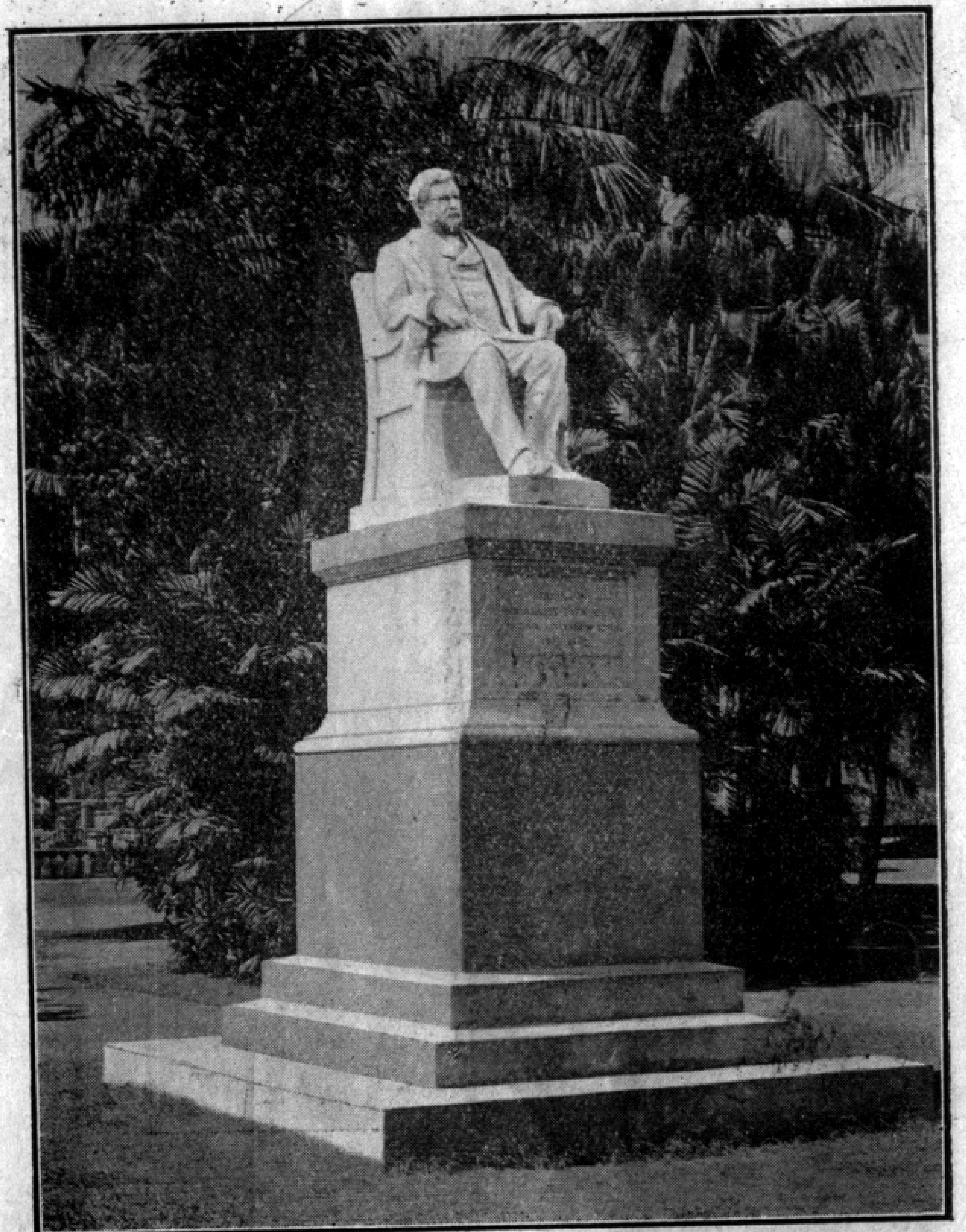
এই উদ্যান থেকে ডেলহেউসি স্কোয়ারে যেতে স্যার এস্‌লি ইডেনের ছবি দেখতে



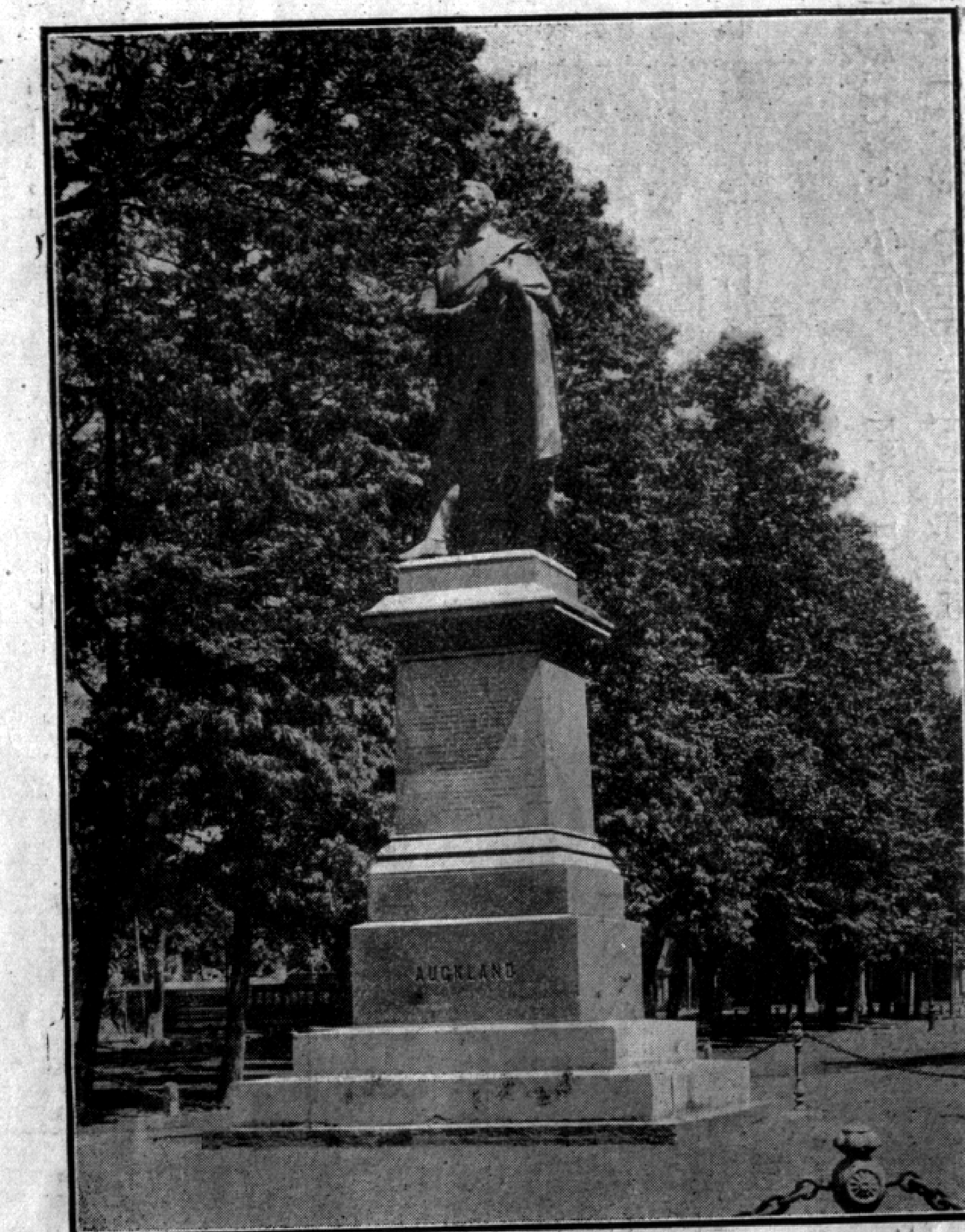
সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া



লর্ড হার্ডিং



স্যর এসলি ইডেন



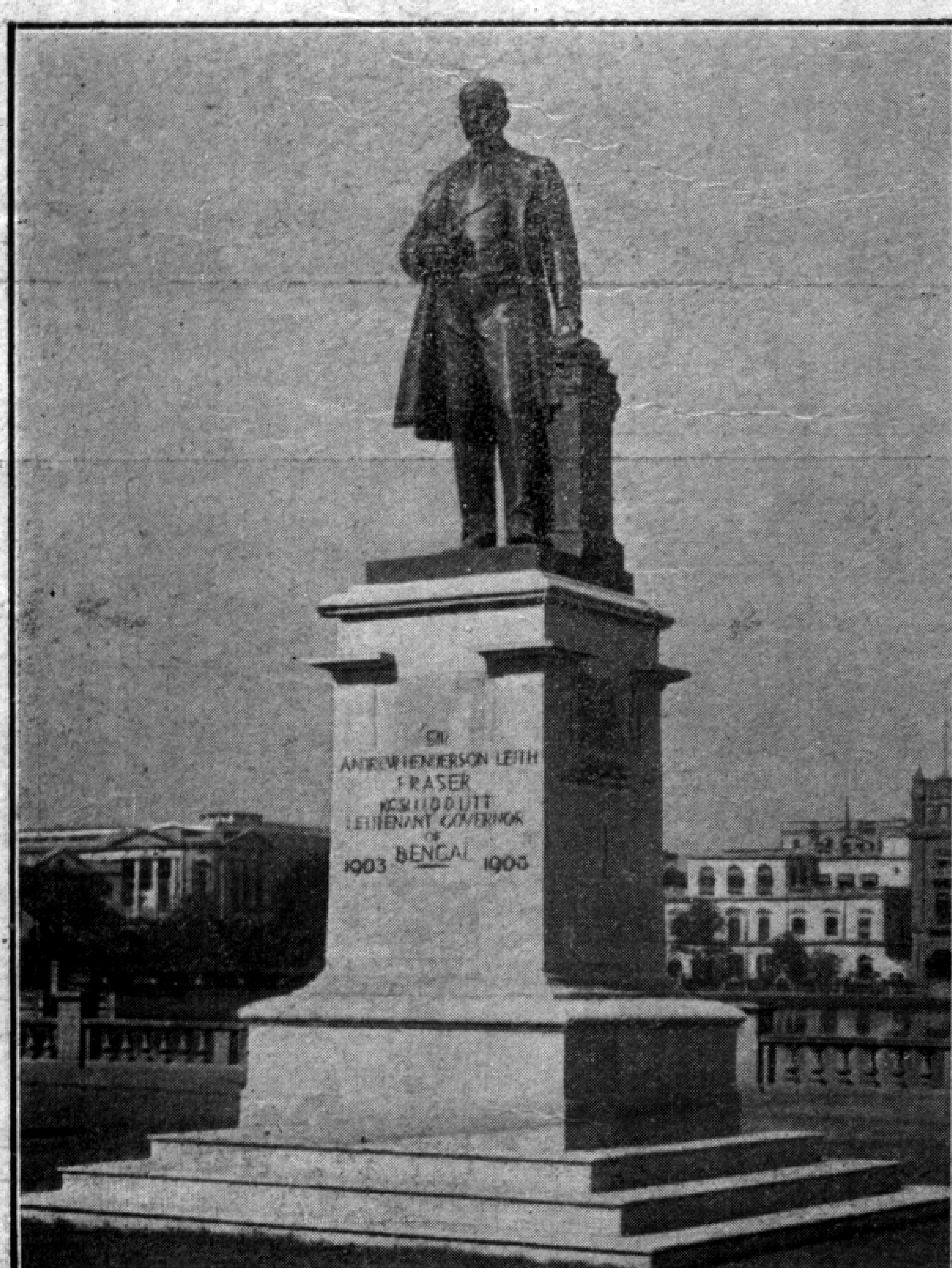
লর্ড অকল্যাণ্ড

বাংলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। ইনি এদেশবাসীর বিশেষ প্রীতি-ভাজন হয়েছিলেন —তাই সাধারণের টাকায় এঁর মূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। এঁর নামেই ইডেন উদ্যান স্থাপিত।

মিসেস্ ইডেন লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ভগিনী। এই উদ্যানের পাশেই উত্তর দিকে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। ইনি একজন গবর্ণর জেনারাল।

এই উদ্যানে স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের প্রতিমূর্ত্তিটী নূতন সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ইনি বাংলার শেষ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরেরই ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী।

ইনি ও স্যর ইডেন মাত্র এই দুইজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের প্রতিমূর্ত্তি গড়ের মাঠে স্থাপিত দেখা যায়। বাকী অধিকাংশই গবর্ণর জেনেরাল ও সেনাপতিদের। ইহাদের চিত্র আমরা পরের সংখ্যায় প্রকাশ করিব।



স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার

সমালোচনা

হিন্দোলা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, বি এ, ৯০ আমহার্ষ্ট্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। এখানি কবিতা-পুস্তক। কবি সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতন, অপরিচিত। কিন্তু তাঁহার কবিতাগুলিতে ভাবৈশ্বর্য্য আছে, মৌলিকতা আছে। কবিতাগুলি শুধু ছন্দে-গাঁথা কথার উচ্ছ্বাস-মাত্র নহে—তাহাতে রস আছে, প্রাণ আছে। অধিকাংশ কবিতাতে অপরিণত হাতের ছাপ থাকিলেও এই নবীন কবির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।

শক্তি। শ্রীমতী অমলা দেবী প্রণীত। ১১ নং কলেজ স্কোয়ার মডার্ণ পাবলিসিং কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। এখানি নাটক। প্রসিদ্ধ লেখক উইলসন ব্যারেট প্রণীত Sign of the Cross নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। রামানুজের ধর্ম্ম-প্রচারকে ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া লেখিকা নাটকখানিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। Sign of the Cross-এর নায়ক Mercus এর আদর্শে সেনাপতি শঙ্কর রাও এবং Merciaর আদর্শে শক্তিচরিত্র গঠিত হইয়াছে। নাটকের আখ্যানটি খুব যে সমঞ্জস হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না এবং তাহারই ফলে মোটের উপর নাটকখানির গ্রন্থি স্থানে স্থানে এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছে। এ ত্রুটিসত্ত্বেও নাটকের ভাষা বেশ সহজ ও সরল, গানগুলিও সুমধুর হইয়াছে। সুতরাং এ সকল ছোটখাট ত্রুটিসত্ত্বেও নাটকখানি যে সুখপাঠ্য হইয়াছে, সে কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

সঙ্গীত কুসুম। শ্রীমতী নীরদা মিত্র প্রণীত। বিবিধ পুষ্প-বিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীত এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সঙ্গীতের সমালোচনা বড় কঠিন ব্যাপার। সুর-সংযোগে গীত না হইলে সঙ্গীতের মাধুর্য্য ঠিক উপভোগ করা যায় না। তবে এ সঙ্গীতগুলিতে বিশেষত্ব বা কবিত্ব কিছু দেখিলাম না। মূল্য লিখিত নাই।

অমিয় সঙ্গীত। শ্রীমতী নীরদা মিত্র দ্বারা প্রকাশিত। হুগলি, চক্ রোড, ভবানী প্রেসে মুদ্রিত। এগুলিও দেব দেবী ও সমাজ-বিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীতের সমষ্টি। 'সঙ্গীত কুসুম' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি এ গ্রন্থ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। এ গ্রন্থেরও মূল্য লিখিত দেখিলাম না।

মন্দিরা। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ২১৫ চৌরঙ্গি, মানসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। প্যারাগন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই দশ আনা মাত্র। এখানি কবিতা পুস্তক। অনেকগুলি খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য। নূতন লেখক হইলেও বইখানিতে কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অনেকগুলি কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক কবিগণের ভাবের ছায়া-পাত হইয়াছে।

পল্লী। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন কুশারী দেবশর্ম্মা প্রণীত। ঢাকা উয়াড়ী, ভারত মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারি, বেলতলি আট পাড়া, ঢাকা। মূল্য সাধারণ বারোআনা, বাঁধাই এক টাকা। এখানিও কবিতা-পুস্তক। গ্রন্থের মুখবন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এক নিবেদন আঁটিয়া দিয়াছেন—সেখানি নামে নিবেদন হইলেও কার্য্যে অনুজ্ঞার মতই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পাঠককে আপনা হইতে পড়িয়া কবিতাগুলির সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে না দিয়া নিজ-হইতে গ্রন্থের সার্টিফিকেট আঁটার সম্বন্ধে কোন দিনই আমাদের সহানুভূতি নাই। পাঠককে ধোঁকা দেওয়াই এই সকল সার্টিফিকেটের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া আমাদের ধারণা। 'নিবেদন'-লেখকের ধৃষ্টতা দেখিয়াও আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি। নিজে একটি উচ্চমঞ্চ

তৈয়ার করিয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিয়া তিনি তাঁহার এই নবীন লেখকটিকে সাধারণ্যে পরিচিত করিয়া দিতেছেন। একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "নিজে কবিতা লিখিতে পারি বলিয়া একটু কবিত্বাভিমান ছিল, দিন দিনই তাহা সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।" ইহাই কি সার্টিফিকেটের মূল্য ধরিতে হইবে? আমাদের দুর্ভাগ্য, নিবেদন-লেখকের কোনও কবিতা পাঠ করিবার সুযোগ আমাদিগের ঘটে নাই। এই সকল নাম ও পরিচয়-হীন নিবেদন-লেখকের আশ্রিত-বাৎসল্য প্রহসনের পক্ষে সুন্দর উপাদান হইতে পারে। 'পল্লীর' কবিতাগুলি পাঠ করিলাম। কবিতাগুলিতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও তরুণ কবি করুণানিধানের ভাবের ছায়া যে যে অংশে পড়িয়াছে, সেই সেই অংশই শুধু রস মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে; অপরাংশে কোন বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, পল্লী-কবির ভাষা সরল, মিষ্ট এবং বাহুল্য-বর্জ্জিত। তিনি এই ঢক্কা-নিনাদীর ভূমিকাদি ও অপরের ভাবানুসরণের মোহ কাটাইয়া যদি সাধনা করেন, তবে কালে কবিতা-রচনায় তিনি সফলতা লাভ করিতে পরিবেন।

পুষ্পবাণ-বিলাসম্। [মহাকবি কালিদাস বিরচিতম্] শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার কৃত পদ্যানুবাদ সমেতম্। শ্রীগণপতি সরকারেণ প্রকাশিতম্। কলিকাতা, ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। মহাকবি কালিদাস-রচিত "পুষ্পবাণ-বিলাসম্" সংস্কৃত ভাষায় একখানি আদি-রসাত্মক ক্ষুদ্র কাব্য। এখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ; অনুবাদ ছন্দে গ্রথিত, তবে বিশেষত্ব-হীন।

শরীর-পালন-বিধি। শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর কর প্রণীত। ৪৭-১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। শরীর-পালন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাথমিক সহজ বিধি এই গ্রন্থে পয়ার ছন্দে রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থে কবিত্বের সন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, সন্দেহ নাই। তবে এরূপ বিষয় সমধিক চিত্তাকর্ষক করিয়া ছন্দে গড়িতে হইলে ছন্দোবন্ধে লেখকের অসাধারণ শক্তি থাকা প্রয়োজন। বর্ত্তমান গ্রন্থ-লেখকের সে শক্তি আছে বলিয়া মনে হইল না। তবে গ্রন্থখানি স্কুলপাঠ্য হইবার পক্ষে যে একেবারে অযোগ্য হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না।

ওমর-গীতি। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বি-এল প্রণীত। কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। প্রসিদ্ধ পারস্য কবি ওমর খৈয়ম-রচিত 'রুবায়াতে'র ফিট্‌জেরাল্ড কৃত ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছে। এখানি ছন্দে রচিত। লেখকের ভাষা ভাল; অনুবাদও চলনসই হইয়াছে। ছাপা বাঁধাই ভাল।

গীতা-বিন্দু। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী প্রণীত। সাথী প্রেস ও মেটকাফ্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এখানি গীতার বঙ্গানুবাদ। মূলের সহিত মিল বুঝাইবার জন্য গ্রন্থের বাম পৃষ্ঠায় সংস্কৃত মূল বঙ্গীয় অক্ষরে এবং দক্ষিণ পৃষ্ঠায় তাহারই বঙ্গানুবাদ পদ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। তবে লেখক অনুবাদে মূলের কথা বাদেও দুই একটি কথা ছন্দের খাতিরে জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহাতে মূলের মর্য্যাদা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহাই আনন্দের বিষয়। অনুবাদে লেখক সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পদ্যানুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ও তেজ উভয়ই সংরক্ষিত হইয়াছে। গীতা-গ্রন্থের যে কয়েকখানি পদ্যানুবাদ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের আকার ছোট—পকেটে রাখা যায়। ছাপাও বড় অক্ষরে। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে; সেগুলি মন্দ হয় নাই।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



লক্ষ্মী-নারায়ণ

Manoranjan Press,
Girgaon-Bombay

ভারতী

৩৮শ বর্ষ]　　　　ভাদ্র, ১৩২১　　　　[৫ম সংখ্যা

স্রোতের ফুল

(৮)

মালতী খুড়িমার ঘরে গিয়াই বলিল—মাসিমা, আমায় একখানা কাপড় দাও ত।

—এখন কাপড় কি করবি? নাইবি নে?

—নাইব ত। নাইবার ঘর কোন্‌দিকে?

—এ কি তোর কলকেতা যে ঘরের মধ্যে জলের কল আছে? পুকুর ধরবার মতো ঘর ত হয় না।

মালতী এ বাড়ীতে আসিয়া এতক্ষণে হাসিল। সে হাসি চাপিয়া বলিল—পুকুর নাইবা ধরল; পুকুরজলের ঘড়া ধরবার মতন ঘর ত আছে।

—তোলাজলে নাইবি কি? চ পুকুর দেখিয়ে দিয়ে আসি?

—না মাসিমা, আমি চাকর-বাকরদের সামনে পুকুরে নাইতে পারব না।

—পুকুরে নাইবি নে ত তোকে জল তুলে দেবে কে? তোর মাসির চোদ্দটা

—আমাকে পুকুর দেখিয়ে দেবে চল, আমি জল তুলে আনছি।

খুড়িমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তুই জল তুলবি কি বলিস্?

—তুললামই বা। আমাদের যখন চাকর-দাসী নেই, তখন নিজের কাজ নিজে করলামই বা?

খুড়িমা জোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—না না, ওসব ছোটলোকপনা এখানে খাটবে না। এ জমীদারের বাড়ী, এখানকার আদবকায়দা মেনে তোকে চলতে হবে। এম্‌নিই ত তোর জন্যে যতদূর মাথা হেঁট হবার তা হয়েছে.......

মালতী হাসিয়া বলিল—এ ত ভারি চমৎকার জমিদারী আদবকায়দা দেখছি। পুরুষের সামনে নাইতে লজ্জা নেই, আবরুর জন্যে জল তুললেই মর্য্যাদা নষ্ট!

মালতীর হাসি ও পণ্ডিতপনা দেখিয়া খুড়িমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। রুক্ষ স্বরে

তুললি দেখছি। বারো মাস ত্রিশ দিন তোকে নিয়ে আমার কেমন করে' চলবে ?

আবার সেই হাড়জ্বালানো হাসি হাসিয়া মালতী বলিল—তা কিছু ভেবো না মাসিমা। দুদিন একত্তরে থাকলেই আমার চালচলন তোমাদের সয়ে যাবে, আর তোমাদের আদবকায়দাও আমার অভ্যাস হয়ে আসবে।

এই কথায় খুড়িমা অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়া গনগন করিতে লাগিলেন, মালতীকে কি যে বলিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। মালতী বুঝিল যে তিনি রাগিয়াছেন। তখন সে বলিল—তবে মাসিমা, একখানা আমায় কাপড় দাও; ঘাট থেকে ভিজে কাপড়ে আমি কিছুতেই আস্‌তে পারব না।

এই রফায় কথঞ্চিৎ নরম হইয়া খুড়িমা বলিলেন—বাক্সের চাবি দে, কাপড় বা'র করে' দি।

—আমার বাক্সয় সব পেড়ে কাপড়। পেড়ে কাপড় আর পরব না। তোমার একখানা থান কাপড় দাও মাসিমা।

খুড়িমা খুসী হইয়া কাপড় আনিতে গেলেন। মালতী হাতের চুড়ি খুলিয়া বাক্সে রাখিল।

বিধবার বেশে মালতীর নূতনতর শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

স্নানাহার নিষ্পন্ন হইয়া গেলে খুড়িমা মালতীকে বলিলেন—যা, রাণীদিদির কাছে গিয়ে বস্ গে। সদাসর্ব্বদা তাঁরই কাছে থাকবি, মন জুগিয়ে সেবা যত্ন করবি, বুঝলি ?

গিন্নির প্রসাদ অর্জ্জনের আশায় মালতী

গিন্নি আহারান্তে শয়ন করিয়া আছেন। রোহিণী ও হাবার মা পদসেবা করিতেছে। বিছানার একপাশে বসিয়া বিনোদ ও বিনি ইকড়িমিকড়ি খেলিতেছে। গিন্নি স্মিতমুখে পুত্রকন্যার অর্থহীন খেলা দেখিতেছিলেন। সহসা দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হইল মালতী। গিন্নির মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর হইয়া চক্ষু নত করিয়া রহিলেন।

মালতী এই উপেক্ষা সহ্য করিয়াও গিন্নির পদসেবার ভাগ লইবার জন্য রোহিণীর পাশে বিছানায় বসিতে যাইতেছিল। গিন্নি একেবারে—হাঁ হাঁ হাঁ, কর কি—বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। মালতী থতমত খাইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

গিন্নি বলিলেন—ও কাপড়ে বিছানা ছুঁয়ো না বাছা।

মালতী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—এ কাপড় ত ভালো মাসিমা; আমি নেয়ে মাসিমার কাচা কাপড় পরেছি।

—কাচা কাপড় হলে কি হয়, ঘাগরা ত পরেছ! ঘাগরা পরে' তুমি আমাদের কোনো জিনিষপত্তর ছুঁয়ো না বাছা, বলে রাখছি!

মালতীর যেন মাথা কাটা যাইতেছিল। থাকা ও যাওয়া দুইই তখন তাহার দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। মালতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গিন্নি আর একটি কথাও তাহাকে বলিলেন না। রোহিণী মজার গন্ধ পাইয়া মালতীর অনুসরণ করিল।

জয়া প্রভৃতি কয়েকটি পুরস্ত্রী একখানি গালিচা বিছাইয়া দশপঁচিশ খেলিতেছিল। ইহারা জমিদার-পরিবারভুক্ত আশ্রিত; কাহারো সহিত সামান্য সম্পর্ক আছে, কেহ কেহ বা একেবারে নিঃসম্পর্ক। সকলেই সধবা; বিধবা কেবল জয়া। অনাথা বিধবা দেখিয়া হরিবিহারী যখন তাহাকে নিজের অন্তঃপুরে আশ্রয় দেন তখন গিন্নি অনেক আপত্তি ও অশ্রুজল বৃথা ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এখন তাঁহার সহিয়া গিয়াছে; কিন্তু বিপিন তাহাকে এখনো দেখিতে পারে না। অপর রমণীরা কেহ গিন্নির বাপের বাড়ীর গ্রামসম্পর্কে আত্মীয় কেহবা শ্বশুরবাড়ীর সুবাদে আত্মীয়; তাহাদের স্বামীরা জমিদার-সরকারে গোমস্তাগিরি ও নেশাভাঙ করে, এবং ইহারা সমস্ত দিন অকাজে গুলতান করিয়া কাটায়।

মালতী সেই ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষমা বলিল—জয়া পিসি, ঐ মালতী ছুঁড়ি যাচ্ছে, ওকে ডাক ডাক।

জয়া ডাকিল—ওগো ও মালতী, এই দিকে একবার পায়ের ধূলো না হয় পড়লই।

মালতী শান্তশীতল চন্দ্রকিরণের মতন আপনার চারিদিকে সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া নিঃশব্দ ললিত গতিতে ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বধূরা তাড়াতাড়ি একগলা ঘোমটা টানিয়া হাতের দানের কড়ি ফেলিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিল; ঝিউড়িরা অবাক হইয়া মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া নিজেদের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সকলে মাছের চোখের মতন ভাবহীন দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছে দেখিয়া মালতীর অত্যন্ত হাসি আসিল। কেহই কিছু বলে না দেখিয়া সে বলিল—তোমরা খেল না ভাই। আমায় দেখে অত লজ্জা করলে চলবে কেন? আমি ত এখন তোমাদেরই একজন।

কাহারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল জয়া বলিল—বস।

মালতী মাটিতে বসিল। জয়া বলিল—ওখানে কেন, ওখানে কেন? গালচের ওপর উঠে বস না ভাই।

মালতী হাসিয়া বলিল—না, আমি বেশ আছি। আমি ম্লেচ্ছ মানুষ, তোমাদের আবার ছুত টুত হবে।

লোককে ম্লেচ্ছ বলিয়া নাক সিঁটকানো যায়, কিন্তু সে যখন সেই নিন্দা গায়ে পাতিয়া লয় তখন অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হয়। মনুষ্যধর্ম্ম তখন সমাজধর্ম্মের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়ই। জয়া মালতীর কথায় লজ্জিত হইয়া বলিল—না না, গালচের আসনে দোষ নেই—শাস্তরেই আছে বৃহৎকাষ্ঠে গজপৃষ্ঠে দোষ নাস্তি।

মালতী হাসিয়া বলিল—শাস্তরের কি মতিগতি ঠিক আছে? বিধানও দেয়, বারণও করে। কোনটা মানা যাবে? কাজ কি ভাই গণ্ডগোলে, আমি তফাতেই থাকি। তোমরা খেল, আমি দেখি।

ক্ষমা বলিল—তুমিও খেলবে এস না।

—আমি খেলতে জানি নে।

—কেবল পড়তেই জান?

—হাঁ৷ ঐটেই যে শুধু শিখেছি। তোমরা শেখালে খেলতেও পারব।

পাঁচুর মা দুই আঙুলে ঘোমটা ফাঁক

করিয়া মোক্ষদার কানের কাছে মালতী শুনিতে পায় এমনতর স্পষ্ট অথচ চাপা গলায় বলিল—ওমা! কি ঘেন্না! কি লজ্জা! মেয়েমানুষ পড়তে পারে তা আবার বড় গলা করে' বলা হচ্ছে! এই জন্যেই ত বিধবা হয়েছে, লক্ষ্মী ছায়া মাড়াচ্ছেন না, পরের দুয়োরে মাঙতে আসতে হয়েছে! মেয়েমানুষের কি এত অনাচার সয় গা?......আচ্ছা জিজ্ঞাসা কর না ভাই, ও গান গাইতে পারে?

মালতী হাসিয়া বলিল—তুমিই জিজ্ঞাসা কর না কেন। আমি তোমাদের সমবয়সী, আমার সঙ্গে কথা বলতে এত লজ্জা।

পাঁচুর মা মুখ ঘুরাইয়া জনান্তিকে বলিল —আ মরণ! ওঁর মতন ত আমি বেহায়া নই!

মোক্ষদা এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল—তুমি গান করতে পার ভাই?

মালতীর মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। বলিল—একটু একটু পারি।

ক্ষমা গালে হাত দিয়া চোক পাকাইয়া বলিল—ওমা! তুমি দেখছি একেবারে খৃষ্টান!

—কেন খৃষ্টান কিসে হলাম? তোমরা কি বাসরঘরে গিয়ে গাও না?

ক্ষমা গাল ফুলাইয়া বলিল—সে বাসরঘর এক, আর সাধে সুখে গান গাওয়া আর। দুটো কি সমান হল?......আচ্ছা, তোমরা পুরুষের গলা ধরে' নাচ?

মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। মালতী ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মালতী ঘরের চৌকাঠ পার হইতে না হইতে সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল, যেন এমন কৌতুককর জীব জন্মে তাহারা দেখে নাই।

পাঁচুর মা ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—বাবাঃ আচ্ছা মেয়ে যা হোক! কি দেমাক্!

ক্ষমা বলিল—রূপের দেমাক রে রূপের দেমাক্! পাছে রূপ ঢাকা পড়ে তাই মুখের ওপর এক রত্তিও ঘোমটা টানা হয় না! রূপ যেন আর কারো হয় না!

জয়া বিজ্ঞ ভাবে বলিল—রূপ দেখিয়েই ত ওসব লোকের পশার!

মোক্ষদা এতক্ষণ চুপ করিয়া সকলের মন্তব্য শুনিতেছিল। সুন্দর মুখ সোনার কাঠির মতো নিজের চারিদিকের সুপ্ত সৌন্দর্য্যকে জাগাইয়া তোলে। মালতীর অপরূপ রূপ এই-সব রূপহীনাদের মনের মধ্যে বড় বেশী রকম জাঁকাইয়া বসিয়াছিল, নিজেদের পরাভব অত্যন্ত তীব্রভাবে লজ্জা দিতেছিল বলিয়াই, সেই অপরাজিত রূপকে মুখে অস্বীকার করিবার জন্য ইহাদের এত আগ্রহ। মোক্ষদা উহারি মধ্যে দেখিতে নেহাৎ মন্দ নয়। তাই সে মালতীর রূপ একেবারে অস্বীকার করিতে পারিল না। বলিল—তা যা বলিস ভাই, দেখবার মতন রূপ বটে! মেয়ে ত নয়, যেন একখানি ছাঁচ! এমন দুধে-আলতার মতন রং কখনো দেখিনি! গালে টুসকি মারলে বোধহয় রক্ত ফেটে পড়ে!

পাঁচুর মা অবজ্ঞাভরে বলিল—দূর! তুই যেমন ন্যাকা! গালে রং মেখেছে।

...৯...সেই দেখিস নি সেবার বিনির ভাতের সময় ব্যাঙ্গল থেটার এসেছিল, যে মাগী রাধিকে সেজেছিল তাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছিল। দিনের বেলা যখন অন্দরে বেড়াতে এল দেখি ওমা সে কী কালো, কী কুচ্ছিত, পঞ্চাশ বছরের বুড়ি! সে যে সে, তা মনেই হয় না......

পাঁচুর মাকে বাধা দিয়া মোক্ষদা বলিল —তা যা বল বউ, রঙে কৃত্রিম করতে পারে, গড়নে ত আর কৃত্রিম চলে না। কী নিখুঁত গড়ন!

পাঁচুর মা ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিল— ছাই গড়ন! অমন সেজেগুজে থাকলে আমাদেরও সুন্দর দেখায়।

জয়া বলিল—হাঁ লা মোক্ষদা, ছিরিটা দেখলি তুই কোনখানে। চোখ দুটো তো গরুর চোখের মতন ড্যাবড্যাব করছে, যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে......

ক্ষমা বলিল—নাকটা ত সূর্পণখার মতন আধ হাত লম্বা......

পাঁচুর মা হাসিয়া মোক্ষদার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—সর্ব্ব দোষ হরেৎ গোরা!

মালতী যে অতি কুৎসিত, ঠকাইয়া সে আপনাকে সুন্দর বলিয়া চালাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। তখন মোক্ষদা সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিল—একদিন মালতীর গান শুনতে হবে।

পাঁচুর মা বলিল—তার আবার কি? ও ত গান গাইবার জন্যে মুখিয়েই আছে। কথায় বলে—ওরে ক্ষ্যাপা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়? ...ক্ষ্যামা ঠাকুরঝি, যা না ভাই মালতীকে ধরে আন না।

—সে কি ডাকলে এখন আসবে? তার চেয়ে চ আমরাই তার কাছে যাই।

—সেখানে যদি খুড়িমা থাকেন?

—এখন খুড়িমা কোথায়? তিনি এখনো ঠাকুরঘরে, নয়ত হবিষ্যি চড়িয়েছেন।

তখন সকলে মিলিয়া মালতীর সন্ধানে যাত্রা করিল।

মালতী আপনার ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া যাহাদের আচরণের কথা ভাবিতেছিল তাহাদেরই আবির্ভাবে বিরক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। সে তাহাদের দিকে চাহিতে বা কোনো কথা বলিতে পারিল না।

ক্ষমা বলিল তুমি ভাই আমাদের ওপর রাগ করে' চলে এলে, তাই আমরা তোমার কাছে ঘাট মানতে এলাম।

মালতী কুণ্ঠিত দৃষ্টি তাহাদের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—ওকি কথা ভাই, আমার কাছে ঘাট মানবে কি? আমি রাগ করিনি।

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, রাগ করনি বুঝব যদি তুমি একটা গান কর।

মালতী মুস্কিলে পড়িল। ইহাদের নিকট গান করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না, গান না করিলেও তাহার রাগ করা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। একটু ভাবিয়া মালতী বলিল—আমার গান তোমাদের ভালো লাগবে না, শেষকালে তোমরা আমায় ঠাট্টা করবে।

ক্ষমা বলিল—না না, ঠাট্টা করব কেন? তোমায় একটি গাইতেই হবে।

মালতী লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া বলিল— গান গাওয়া থাক ভাই, ওঘরে রাণী-মাসিমা

আছেন, মাসিমা এখুনি আসবেন, ওঁরা শুনতে পেলে কি বলবেন ?……

ক্ষমা বলিল—না না, তোমার বাজে ওজর আমরা শুনব না! খুড়িমা কোথায় তার ঠিক নেই, তাঁর ওপরে আসতে সেই যার নাম তিনটে। রাণী-মাসিমা এতক্ষণ ঘুমুচ্ছেন, আর আমরা দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি…

মালতী আজই সবে এ বাড়ীতে আসিয়াছে। এ বাড়ীর যাহারা পুরাতন বাসিন্দা তাহারা যে তাহাকে অভ্যর্থনা করে নাই, পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নাই, একটা মামুলি ভদ্রতার কথা পর্য্যন্ত বলে নাই, এবং তাহারাই যে এখন তাহাকে অপরিচয় সত্ত্বেও বিনা ভূমিকায় গান করিবার জন্য জেদ করিতেছে, তাহারা যে তাহাকে একটি কৌতুককর জীব মনে করিতেছে, ইহাতে মালতীর মন অত্যন্ত বিরক্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। গান গাহিবার প্রবৃত্তি তাহার কিছুতেই হইতেছিল না।

মালতী অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমরা জেদ করছ তাই একটা গাচ্ছি। কিন্তু আর গাইতে বলো না।

জয়া বলিল—আগে একটা গাওই ত, তারপর আর বলব কি না সে বোঝা যাবে।

মালতী মাথা নত করিয়া মৃদু গুঞ্জনে গাহিতে লাগিল—

"আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।"

মালতীর সমস্ত অন্তরের প্রার্থনা যেন এই গানে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। তাহার মধুর বিকম্পিত করুণস্বরের অনুরণনে ঘরখানি ভরিয়া গেল। এক দণ্ড সকলে মুগ্ধ স্তব্ধ নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া মোক্ষদা বলিল—বাঃ! কি গলা তোমার ভাই!

তখন একে একে সকলের মুখ খুলিল। ক্ষমা বলিল—হ্যাঁ, গলাটি মন্দ নয়, কিন্তু গানটা ছাই, শুধু কথার হেঁয়ালি। নিধু বাবু কি গোপালে উড়ের টপ্পা জানো না তুমি? একটা কি ছাই গান যে গাইলে। একটা বেশ ভালো দেখে টপ্পা গাও।

পাঁচুর মা বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐটি গাওনা, ঐ যে কি ভালো মনে আসছে না—মনে করে দে-না ভাই ঠাকুরঝি, সেই যে সেই খেমটাওলিরা সেবার গেয়েছিল……

ক্ষমা বলিল—কোন্‌টা? সেই

"ভাঙা বাগান যোগান দেওয়া ভার,
ফুলে নেই বাহার।"

সেইটে?

পাঁচুর মা চোখ মটকাইয়া মুচকি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐটে গাওনা ভাই।

মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমি ওসব গান জানিনে।

মোক্ষদা বলিল—না না, ভাই, তুমি যা জানো তাই আর একটা গাও।

মালতী দৃঢ়স্বরে বলিল—আমি ত আগেই বলে রেখেছি, আর আমি গাইব না।

জয়া বলিল—তোমার যে একেবারে ধনুকভাঙা পণ দেখছি গো!

ক্ষমা বলিল—কেন গো, গরব হল না কি?

পাঁচুর মা বলিল—সেই সেবার কলকেতা থেকে খেমটাওলিরা এসেছিল, তাদের যত গান ফরমাস করতাম ততই ত গাইত। বল্লে না পেত্যয় যাবে ভাই, তাদের একজন ঠিক তোমার মতন ছিল দেখতে, হুবহু, গালের ঐ তিলটি পর্য্যন্ত। কেমন ঠাকুরঝি, সত্যি কি না?......

অপমানে মালতীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহার সমস্ত দেহমন যেন অশুচি স্থানে পড়িয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল! মালতী উঠিয়া দৃঢ় পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ক্ষমা, পাঁচুর মা কত ডাকিল, মালতী একবার ফিরিয়াও চাহিল না। পাঁচুর মা নাক সিঁটকাইয়া বলিল—ছুঁড়ির ঠ্যাকার দেখেছিস্ একবার? তবু যদি নিজের চাল চুলো কিছু থাকত!

জয়া বলিল—নষ্ট লোকের মুখ টন্‌কো—কথাতেই বলে। দেখিসনি ছোটতরফের কালীতারাকে? বিধবা মাগী ছোটবাবুর কাছে এসে বেশ আছেন, কিন্তু কেউ একটু কিছু বললেই অমনি তাঁর মানে ঘা পড়ে!

পাঁচুর মা বলিল—হ্যাঁ জয়া মাসি, কালীতারার নাকি ছেলে হবে? ওমা কি ঘেন্না!

ক্ষমা বলিল—উনি বলছিলেন যে নিবারণ মুখুয্যে আর কালীতারার ভাসুর রঘুনাথ দেওয়ান চুপচাপ সব ঢেকে ফেলতে ছোটবাবুকে পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু

মোক্ষদা দয়ার্দ্র স্বরে বলিল—অমন নিষ্ঠুর কাজে রাজি কি হওয়া যায় দিদি! এখনো ত পেটে ধরনি; যখন ধরবে তখন জানবে ছেলের কি দরদ।

এই কথা শুনিয়া সকলের মনই একটি স্নেহার্দ্র বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া নিজেদের নারীত্ব উপলব্ধি করিল। অল্পক্ষণ কেহ কোনো কথা বলিতে পারিল না।

পাঁচুর মা হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল—তা যেন হল, কিন্তু অত বড় মানী লোকটা ছোটবাবু, তার ত মান বাঁচাতে হবে!

জয়া বলিল—সেই জন্যে ত ছোটবাবু বলেছে যে কালীতারা তার কথা না শুনলে তাকে বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

মোক্ষদা ব্যথিত হইয়া বলিল—আহা বেচারি, তা হলে কোথায় দাঁড়াবে? ওর ভাসুর দেওয়ানি পাবার জন্যে ওকে ছোটবাবুর কাছে এনে দিয়েছে। বিধবা হয়ে অবধি ভাসুর আর জায়ে ওর কি কম খোয়ারটা করেছে। ঘরকন্নায় দাসীর মতন খাটিয়ে এক মুঠো খেতে দিত না, মারত পর্য্যন্ত। এখন ছোটবাবু তাড়িয়ে দিলে ওরা কি আর ঘরে ঠাঁই দেবে?

জয়া বলিল—তা ওর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হবে।

মোক্ষদা ব্যথিত স্বরে বলিল—না না, অমন কথা বলো না জয়া পিসি। ও কি অমনি ছোটবাবুর কাছে এসেছিল? ছোটবাবু বিদ্যাসাগরের মতে বিয়ে করবে স্বীকার করাতে তবে এসেছিল। আহা

ছোটবাবু চলে যায়, ওর মনে হয় বুঝি পায়ে বাজছে, পায়ের তলায় বুক পেতে দিতে পারলে তবে যেন ওর মনের খেদ মেটে। সেবার ছোটবাবুর ব্যামো হতে আহার নিদ্রে ছেড়ে কি সেবাটাই করলে—ছোটরাণী-বৌ তার সিকিও করেনি। কালীতারা ত ছোট-বাবুকে নিজের সোয়ামী বলেই জানে। পুরুতে দুটো মন্তর পড়ালেই কি শুধু বিয়ে হয়? সত্যি কথা বলতে কি, আমরা আমাদের সোয়ামীকে অমন করে ভালবাসতে পারিনি। তবু আমরা সতী, আর কালীতারা অসতী!

জয়া মুখ নাড়িয়া বলিল—ও সব ঢং লো ঢং! নষ্ট মেয়েদের ঐ রকম লোক-দেখানি ভালোবাসা, নইলে ওদের চলবে কেন?

জয়ার কথা শুনিয়া মোক্ষদা চটিয়া গিয়া বলিয়া ফেলিল—হাঁ তা হবে, নষ্ট মেয়েদের স্বভাব কেমন তা আমরা কেমন করে' জানব, তোমার জানা থাকা সম্ভব।

—কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! মোক্ষদা পোড়ারমুখীকে আমি আজ দেখে নেব, এই চল্লাম আমি রাণীবৌয়ের কাছে।—বলিয়া জয়া ফরফর করিয়া চলিয়া গেল! রোহিণী নূতন মজার সন্ধানে জয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

মোক্ষদা ভয়ে মুখ মলিন করিয়া বলিল—কি হবে ভাই? দিদি, যা না ভাই ওকে ফিরিয়ে আন।

ক্ষমা হাসিয়া বলিল—তুই ক্ষেপেছিস! ও মুখেই আস্ফালন করে' গেল, কাউকে কিছু রাণীমাসি ওর কথা জানে না। তবু, চ দেখিগে······

সকলে জয়াকে শান্ত করিতে ছুটিল।

(৯)

মালতী বিরক্ত হইয়া পুরস্ত্রীদের কদর্য্য আলোচনা পরিহার করিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু রোহিণীর কৃপায় তাহাদের বাকি আলাপটুকু শুনিতে বাকি রহিল না। কালীতারার কাহিনী শুনি। একদিকে কালী-তারার প্রতি করুণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল, অপরদিকে সমস্ত জমিদার-পরিবারটির স্ত্রী পুরুষ সকলেরই চরিত্রে এমন একটা অভদ্র ছাপের পরিচয় সে পাইতেছিল যে সকলের প্রতি ভয় অবিশ্বাস ও ঘৃণায় তাহার মন শিহরিয়া উঠিতেছিল। এখন সে বিপিনের গৃহে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনাকেও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। সে ভয়ে ভয়ে আপনাকে সকলের সংস্রব হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে রাখিতে লাগিল।

মালতী যে এই বাড়ীর দশজনের একজন হইয়া মিশিয়া যাইতে পারিতেছে না, সে যে স্বতন্ত্র থাকিয়া সকলের মনের সামনে স্পষ্ট হইয়া থাকিতেছে, ইহার জন্য খুড়িমা তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে লাগিলেন। একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মালতীর আগমনে জমিদার-পরিবারের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা-প্রণালীতে যে একটু বিপরীত বেসুর বাজিয়া উঠিয়াছিল তাহার জন্য মালতীর সঙ্গে সঙ্গে খুড়িমাও বিশেষ করিয়া সকলের আলোচনার পাত্রী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে খুড়িমা কিছুতেই

বাধামুক্ত করিয়া তুলিতে পারিতেছিলেন না; মালতীও সর্ব্বদা তাঁহার কাছে খোঁচা খাইয়া খাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে মাসিকে ভক্তিশ্রদ্ধায় আপনার জন বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। মাসিমাকে তাহার যেন জেলখানার প্রহরীর মতন মনে হইতে লাগিল; এবং এই-সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনার জন্য মনে মনে সে তাহার মাসিমাকেই দায়ী করিতে লাগিল, যেন তিনিই তাহাকে জোর করিয়া বা ঠকাইয়া এই বাড়ীতে আনিয়া বন্দিনী করিয়াছেন।

মালতীর অভিমানী তেজস্বী প্রকৃতি সকলের নিকট অনাদর ও আঘাত পাইতে পাইতে বিদ্রোহে উদ্যত বজ্রের মতন কঠিন একগুঁয়ে হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে সে কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত করাও আর আবশ্যক মনে করিল না; সে নিজের খেয়াল-মত পুরামাত্রায় স্বাধীনভাবেই চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার এই উদ্ধত বিদ্রোহ লোককে যতই তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল, তাহার রোকও ততই বাড়িয়া চলিল।

বিদ্রোহী হইয়া সর্ব্বদা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত থাকিয়া শত্রুপক্ষকে ভয় দেখাইয়া হঠাইয়া রাখা চলে, কিন্তু তাহাতে নিজেরও নিশ্চিন্ত হইয়া আরাম করিবার উপায় থাকে না। চৌধুরী-পরিবারের ঘরকন্নার কর্ম্মের বাহিরে পড়িয়া মালতী একাকী নিজেকে লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে নিজের বাড়ীতে থাকিতে সমস্ত দিন পিতামাতার সেবা করিয়া, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াইয়া, বৌঝিদের শিল সেলাই শিখাইয়া, গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনাকে আপনি বোধ করিবার অবসরই পাইত না। এখানে আপনার কাছে আপনি সে বড় স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছিল এবং তাহার অন্তরে যে সেবাপরায়ণা কল্যাণী নারীপ্রকৃতি ছিল তাহা অবলম্বনের অভাবে অহরহ আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মনের সব ইচ্ছা জোর করিয়া চাপিয়া মারিতে মারিতে তাহার মনও বোবা হইয়া উঠিতেছিল, সে নিজের মনের মধ্যে আনন্দের তৃপ্তির অভয়ের তেমন অসঙ্কোচ সাড়া আর পাইতেছিল না। তখন তাহার সেই আপনার নিরুপদ্রব নির্জ্জন গৃহখানির স্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়া জাগিয়া হায় হায় করিয়া উঠিতে লাগিল। সেখানে তাহার কেহ সহচরী ছিল না; তা না থাকুক, সেখানে পুস্তকের সাহচর্য্য ত কেহ নিবারণ করিতে আসিত না। এখানে এই বাণীর সপত্নীমন্দিরে তাঁহার আসন-শতদলের পাপড়ি ত একটিও খসিয়া পড়িতে পারে না; যদি বা কখনো পড়ে লক্ষ্মীর অসংখ্য বাহনের তীক্ষ্ণ নখচঞ্চুর প্রহারে তাহা অধিকক্ষণ টিকিতে পারে না। মালতীর জেদ হইল অসাধ্যসাধন করিতে হইবে—লক্ষ্মীর মন্দিরে বসিয়া লক্ষ্মীর বাহনদের দেখাইয়া দেখাইয়া বাণীর আসন-শতদল এখানেই বিছাইতে হইবে!

মালতীর সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেলে গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার জন্য তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। একদিন সে দেখিল বিপিনের ঘরে সারি সারি আলমারিতে অসংখ্য বই সাজানো আছে।

কিন্তু বিপিন ত বাড়ীতে নাই। সে কাহার নিকট হইতে এই আনন্দ-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবে? নবকিশোর ত বিপিনের বন্ধু, সে কি কিছু ব্যবস্থা করিতে পারে না? বিপিনের লাইব্রেরীতে পাঠের অধিকার যদি সে দিতে না-ই পারে, সে নিজে ত আপাতত কিছু বই সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। মালতী নবকিশোরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মালতীকে আনিয়া অবধি নবকিশোর অন্দরে কদাচিৎ আসে; আসিলেও মালতীর সঙ্গে দেখা করে না। মালতীকে লইয়া জমিদারের অন্তঃপুরে যে বিষম আন্দোলন চলিতেছিল, তাহার যথেষ্ট আভাস নবকিশোর বাড়ীতে বসিয়াই পাইতেছিল; তাহাতে সে মালতীর জন্য ক্লেশ অনুভব করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র সাধ্য ছিল না যে সে কোনো প্রকার সাহায্য করিয়া মালতীকে রক্ষা করিতে পারে। সে কিঞ্চিৎ মাত্রও চেষ্টা করিলে মালতীর চারিদিকে যে কুৎসার কালি ছড়াইয়া পড়িবে, তাহাতে মালতীকে আরো ক্লেশ দেওয়াই হইবে। মালতীর নির্য্যাতনের সংবাদে সে নিজেই নিজের মনের মধ্যে উদ্ভিন্নমান আগ্নেয়-গিরির মতো জ্বলিতেছিল, ফাটিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া ধরিতে শুধু বিপিনের আসার অপেক্ষা। বিপিন আসিলে তাহাকে মালতীর রক্ষায় নিযুক্ত করিতে হইবে স্থির করিয়া বিপিনের প্রতীক্ষায় নবকিশোর ছটফট করিতেছিল। বিপিন ঘরের ছেলে; এক বাড়ীতে থাকিয়া সর্ব্বদাই মালতীর হইবে না; তাহাতে তাহারও নিন্দার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু ভরসা শুধু এই যে সহজে কেহ মুখ ফুটিয়া বিপিনের নামে কুৎসা রটনা করিতে পারিবে না।

মালতী কিন্তু বিপিনকে চেনে না। তাহার আগমনে বই পড়িতে পারিবার সুবিধার সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহার অনুমতি লইবার জন্য নবকিশোরকেই দরকার হইবে। তাই নবকিশোরকে সংবাদ দিতে ইচ্ছা করিয়া একদিন সে তাহার মাসিমাকে বলিল—"মাসিমা, তোমরা ত কোন কাজকর্ম্ম আমায় ছুঁতে দাও না। সমস্ত দিন চোরের মতন এমন একলাটি মুখ বুজে কেমন করে' বসে থাকি বল ত!

খুড়িমা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—তা আমি কেমন করে জানব দিন তোমার কেমন করে' কাটবে? তুমি কি আমার বশে চলছ, যে আমায় জিজ্ঞেস করতে এসেছ? ঠ্যাকারে কারো সঙ্গে কথা কওয়া হয় না, কারো ত্রিসীমানায় যাওয়া হয় না। ইচ্ছে সুখে একলা থাকবি, তার আমি কি করব?

মালতী বলিল—তা মাসিমা, তোমাদের বাড়ীর লোকগুলি যে রকমের, তাঁদের সঙ্গে মিলে মিশে চলা আমার কর্ম্ম নয়।

খুড়িমা তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু তোর জন্যে যে আমার সুদ্ধ খোয়ার হচ্ছে। উঠতে বসতে সবাই আমায় ব্যঙ্গ করে বলে—মালতীর মাসি, মালতীর মাসি; আবার তোর কথা বলতে হলে তখন আর তোর নামটা কারো মনে পড়ে না, বলে—খুড়িমার

মালতী ব্যথিত হইয়া বলিল—এর সমস্ত দোষই কি আমার মাসিমা? আমায় তবে বেহালায় পাঠিয়ে দাও। এখানে এসে অবধি ত আমারও সোয়াস্তি নেই, তোমাদেরও সোয়াস্তি নেই!

খুড়িমা গম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—আমি ত তোমায় এখানে আনতে পাঠাই নি। তুমি ধিঙ্গি মেয়ে, আপনি নাচতে নাচতে এসেছ, আপনি আপনার মতে চলছ। যা খুসি তাই কর গে। আমি এ সবের কিছু জানি নে।

খুড়িমার এই অভিমান মালতী বুঝিতে পারিল না। সে একটু ঝাঁঝের সহিতই বলিয়া উঠিল—তুমিও যেমন আমায় আনতে পাঠাও নি, আমিও তেমনি আপনি ব্যস্ত হয়ে তোমাদের এই নরকের জেলখানায় আসি নি। আমাকে নিয়ে এসেছেন নবকিশোর বাবু। তাঁকে ডাকিয়ে দাও, আমি তাঁর সঙ্গেই বোঝাপড়া করব।

খুড়িমা তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—আ মর পোড়ারমুখী! এততেও তোর হায়া নেই? ধন্যি মেয়ে জন্মেছিলি তুই? উড়ে বসতে পুড়ে যায়—এমন শতেকখোয়ারী তুই! কোথায় লজ্জায় মরে থাকবে, না আবার চোপা করা হচ্ছে!

মালতী কি বলিতে যাইতেছিল। উচ্ছ্বসিত চোখের জল দমন করিতে গিয়া সে আর কোনো কথা বলিতে পারিল না। এক বুক উচ্ছ্বসিত অশ্রুর মুখে সমস্ত শক্তি চাপা দিয়া সে পাষাণের মতো বসিয়া রহিল। তাহার একগুঁয়ে অভিমানী স্বভাব কেবল বাধার পর বাধা পাইয়া পাইয়া প্রবল বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল; এখন সে যুদ্ধোন্মুখ, এখন তাহার কান্না শোভা পায় না। সে স্থির করিয়া লইল এখানে সে কাহারো কেহ নহে, তাহার যাহা করিবার আছে তাহা তাহাকে একলাই করিয়া তুলিতে হইবে। সে সকলকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার সঙ্কল্প নীরবে মনের মধ্যে দৃঢ় করিয়া তুলিতে লাগিল।

খুড়িমা যদি একটু নরম হইয়া ভালো মন্দের বিচার তাহারই উপর ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে মালতী কখনো কাহারো অপ্রীতিকর আচরণ করিতে পারিত না। কিন্তু খুড়িমা আবাল্য জমিদারের গৃহিণী, স্বামীর সোহাগিনী ছিলেন; শাশুড়ী ননদের অধীনে কোনো দিন তাঁহাকে থাকিতে হয় নাই; তিনি হুকুম করিতেই অভ্যস্ত; তারপর অবস্থার ফেরে পড়িয়া পরাধীনতার দুঃখের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রোশে দগ্ধ হইতেছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি এমন একজন লোককে পাইয়াছিলেন যে শুধুই তাঁহার বোনঝি নয়, তাঁহার আশ্রিতও বটে। হুকুম করিয়া অধীনে দাবাইয়া রাখিবার মধ্যে যে একটি বিলাসিতার আনন্দ আছে, তাহার প্রলোভন খুড়িমা মালতীকে পাইয়া কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না।

এ দিকে মালতীও কখনো কাহারো অধীনে থাকিয়া হুকুম মানিয়া চলে নাই। সমবেদনায় করুণহৃদয় পিতামাতার স্নেহযত্নের শীতল ছায়ায় সে অবিরোধ স্বাধীন ভাবেই বিচরণ করিয়াছে। আজ অকস্মাৎ অচেনা অপ্রীতিকর পরিবেষ্টনের মধ্যে আটক পড়িয়া

পদে পদে প্রতিরোধ সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না।

এইরূপে দুই দিক হইতেই বিরোধের ঝড় উত্থিত হইয়া একদিন ভীষণ সংঘাতে প্রলয় তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাসায়নিক গবেষণার ফল *

রাসায়নিক গবেষণা বর্ত্তমান যুগে জাতীয় উন্নতির কতদুর সাহায্য করিতেছে তাহা এতাদৃশ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যথাযথ ভাবে আলোচিত হইতে পারে না। রসায়নের সাহায্যে অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিস কিরূপ অবশ্য ব্যবহার্য্য পদার্থে পরিণত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে বলিয়া আশা করা যায়, এবং এই ব্যবহারিক রসায়নের উন্নতির কোন স্তরে আমাদের ভারতবাসীর অথবা বঙ্গবাসীর স্থান,—তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

আলকাতরা

আধুনিক রসায়ন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের কথাই প্রথমতঃ বলিতে হয়; আনুসঙ্গিক ভাবে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কথাও উল্লেখ করিব। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ হইতে পারস্য, গ্রীস্ ইটালি প্রভৃতি দেশে নানাবিধ রং রপ্তানি হইত, নীলের বিষয় আপনারা সকলেই জানেন। আমাদের দেশের প্রায় সকল প্রকার রংই উদ্ভিদ্‌জাত—গাছগাছরা হইতে প্রস্তুত। কিন্তু রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল উদ্ভিদ্‌জাত রঙের (Vegetable dyes) মূল উপাদানীভূত গঠনরহস্য (Constitution) পরিজ্ঞাত হইয়া পাশ্চাত্য রসায়নজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই সকল জিনিস উৎকৃষ্ট প্রণালীতে এবং স্বল্পব্যয়ে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা (spceial reactions) শত শত নূতন রং আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু আপনারা জানেন এই সকল রং মাত্র একটি দেখিতে বিশ্রী, দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস আল্‌কাতরা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। লাল, নীল, সবুজ, গোলাপী, হল্‌দে ইত্যাদি যে কোন রং আমাদের কাপড়ের পাড়ে ও মনোহারী ছিট্ প্রভৃতিতে দেখিতে পাই সবই আল্‌কাতরা হইতে প্রাপ্ত জিনিস হইতে রসায়ন গবেষণার ফলে রসায়নজ্ঞের সৃষ্টি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সকল দেশের লোকই আলকাতরাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত; ক্যানিস্টারের টিন রং করা ভিন্ন তাহা এ দেশে বিশেষ কোন কার্য্যে আসিত না, কিন্তু ফ্যারাডে, গ্রিস্, হফমান্, পার্কিন প্রমুখ রসায়নজ্ঞগণের পৌরোহিত্যে ইহার প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইয়াছে। এখন ইহাকে পতিত কে বলে?

---

* পাবনা উত্তর বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

অপ্রীতিকর গন্ধময় ও কালোরূপীই বা কে বলে? এখন ইহা রূপান্তরিত হইয়া প্রতি দেশের ঘরে ঘরে বহুরূপী ভাবে সসম্মানে বিরাজ করিতেছে!

একদিকে আল্‌কাতরা হইতে যেমন নানাবিধ মনোমুগ্ধকারী রঙের আবিষ্কার, অপর দিকে সেইরূপ আল্‌কাতরা হইতে তির্য্যকপাতন দ্বারা যে সকল জিনিস পাওয়া যায় তাহার একটি পদার্থ হইতে স্যাকারিন্ (Saccharine) নামে এক অদ্ভুত মিষ্ট পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মিষ্টতা চিনি অপেক্ষা চারিশত পাঁচশত গুণ অধিক। কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে রাসায়নিক গবেষণার ফলে আল্‌কাতরা হইতে স্যাকারিনের মত মিষ্ট পদার্থ প্রস্তুত হইবে।

সোরা

বঙ্গদেশ নীলের জন্মস্থান; নীল ও সোরা বঙ্গদেশ হইতে ইউরোপে জাহাজ ভরিয়া চলিয়া যাইত। বিহারেও নীলের চাষ ও সোরা সংগ্রহ হইত, কিন্তু বাংলাতে সমধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইত। এমন কি যাহারা গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে সোরা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত, তাহারা "নুনিয়া" নামে আজও অভিহিত হইয়া থাকে; পরিষ্কৃত সোরাকে ইউরোপে "বাংলা সোরা" (Bengal Saltpetre) বলিত। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলস্থিত চিলি দেশে প্রকৃতির লীলায় সমুদ্ভূত সোরাস্তর আবিষ্কৃত হওয়ায় বঙ্গদেশের "নুনিয়ার" কার্য্য লোপ পাইয়াছে। এই চিলি দেশস্থ সোরা-স্তরও (sodium nitrate) ডাক্তার এম্, ভার্‌গারার গণনায় ইংরাজি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নিঃশেষ হইবে। ভবিষ্যতে সোরা প্রস্তুত সহজে স্বল্পব্যয়ে কি উপায়ে করা যায় তজ্জন্য পাশ্চাত্য রসায়নজ্ঞগণ বহুদিন গবেষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা দ্রব তীক্ষ্ণ ক্ষার (Caustic Alkali Solution) এবং বৈদ্যুতিক শক্তিবলে বায়ুমণ্ডলস্থ নেত্রজন* (Nitrogen) ও অক্ষজনের (১) (Ooxygen) যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তৎসাহায্যে নর্‌ওয়ে দেশে ও জার্ম্মাণিতে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সোরা প্রস্তুত করিতেছেন। বিস্ফোরক পদার্থ এবং নাইট্রিক অম্ল প্রস্তুতার্থে ও ক্ষেত্রে সার দিবার জন্য সোরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; সুতরাং তাহা বিক্রয় করিয়া ঐ সকল দেশে প্রভূত অর্থাগম হইবে, সন্দেহ নাই।

নীল

বঙ্গদেশে নীল চাষের কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই; নীলের লীলা এখন ইতিহাসের গাথা—অতীতের কাহিনী। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশের নীল, রেশম প্রভৃতি পারস্য, গ্রীস্, ইটালিতে রপ্তানি হইত। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "প্রাচীন ভারতে নৌকুশলতার ইতিহাস" নামক মূল্যবান ইংরাজি গ্রন্থ আমাদিগকে অনেক বিক্ষিপ্ত ও লুক্কায়িত ব্যাপার জ্ঞাপন করিতেছে।

(১) জাতীয় শিক্ষা সমিতির রসায়নের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিভাষা।

বোধ হয় ইংরাজি ষষ্ঠদশ শতাব্দিতে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃকই নীল, রেশম প্রভৃতি সমধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতে আরম্ভ হয়।

কিন্তু একটী কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পাশ্চাত্য জগৎ আমাদের মত—যেমন আছি তেমনি অবস্থায় থাকিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। কোন প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য তাহারা কতক সময় পরমুখাপেক্ষী হইলেও, নিজেদের অভাবের কথা তাহাদের মনে জাগরূক থাকে এবং তাহামোচনের নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনে তাহারা কাল বিলম্ব করেনা। বায়ার্, হয়মান্, হীমান্ প্রভৃতি মণীষিগণের গবেষণার ফলে আজ জার্ম্মানি নীলের একচ্ছত্র রাজা। বর্ত্তমান সময়ে আল্‌কাত্‌রা হইতে তির্য্যকপাতন প্রণালীতে (Distillation) প্রাপ্ত প্রদার্থ হইতে নীল প্রস্তুত হইতেছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানির নীল প্রথমে বাজারে বাহির হয়; এই কয়েক বৎসর মধ্যেই বঙ্গদেশের নীল (Bengal Indigo) পূর্ব্ব হিসাবের অনুপাতে শত করা মাত্র চল্লিশ ভাগ উৎপন্ন হইতেছে; মূল্যও জার্ম্মানির কৃত্রিম রাসায়নিক নীল প্রচলনের পর পূর্ব্বমূল্যের এক তৃতীয়াংশ হইয়াছে। বাংলার উদ্ভিদজাত নীল আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিতেছে না।

কর্পূর

পাশ্চাত্য জগৎ রসায়নের সাহায্যে যতটা সম্ভব, অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। কর্পূর জাপানের এক-চেটে সম্পতি ছিল বলিলেই চলে; সম্প্রতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রসায়নাগারে কর্পূর প্রস্তুত আরম্ভ হইতেছে; সুতরাং কর্পূর-বাণিজ্যে জাপানের একাধিপত্য বোধ হয় আর অধিকদিন স্থায়ী হইবে না।

কৃষিকার্য্য

ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মাটিতে যাহা জন্মে না, অন্য উপায় উদ্ভাবনে তাহারা সে অভাব মোচন করিয়া থাকে; কেবল তাহাই নহে নিজেদের অভাব পূরণ করিয়া তদ্বারা বিদেশ হইতে অর্থাগমেরও সংস্থান করে। আর আমরা মাটির উপর জীবন ধারণ করিয়া দিন দিন মাটিই হইয়া যাইতেছি! কৃষিকার্য্যের প্রতি আমরা উদাসীন; আমাদের শিক্ষিত জনের বিবেচনায় যে, ওটা একটী নীচ কাজ, এবং ভাবনার বিষয় নহে—একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

রেশম

রেশমের অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে; রেশমের চাষ রক্ষার জন্য রাজসাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ গবর্ণমেণ্ট হইতে যথেষ্ট চেষ্টা করা হইতেছে; কিন্তু রেশম চাষ যে পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, তাহা আশা করা যায় না। সম্প্রতি কার্ড্‌নেট্, ক্রস্ এবং বীভান্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৃক্ষত্বক্ হইতে প্রাপ্ত পদার্থ কোষাত্মক (celullose) হইতে কৃত্রিম রেশম-সূত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদিও এখন তাহা বাজারে উপস্থিত হয় নাই, তথাপি ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে জার্ম্মানির শর্করার ন্যায় এই

কৃত্রিম রেশম বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় প্রকৃত রেশমের সপিণ্ডকরণ সাধন করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিবে।

রবার ও চা

আর দুই একটী জিনিসের মাত্র উল্লেখ করিব, রবার ও চা। রবার ও চা বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইতেছে। প্রায় বিশ বৎসর হইল রসায়নাগারে রবার প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছিল। বিগত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম্ র‍্যাম্‌জে, পার্কিন ও ম্যাথিযুজ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রবার প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; লণ্ডন সহরে যে রবার প্রস্তুত মানসে একটী যৌথ কারবার খোলা হইয়াছে সে সংবাদ আপনারা সংবাদ পত্র হইতে অবগত আছেন। সময় সাপেক্ষ হইলেও সুদূর সমুদ্রপার হইতে রাসায়নিক রবার বর্ত্তমান সময় হইতেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সাবধান করিয়া দিতেছে—"এই আমি আসিতেছি।"

চা সম্বন্ধেও এইরূপ। পাশ্চাত্য দেশে বাঙ্গালা, আসাম ও সিংহল দ্বীপের চা অধিক মূল্যে ও প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ লাভ অধিক দিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চা-র মধ্যে কেফিন্, ট্যানিন্ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ যে পরিমাণে আছে, তাহার রসায়নিক সংমিশ্রণে কৃত্রিম চা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তবে আপাতত ইঙ্গিতে ভীত হইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই।

বঙ্গদেশ

রসায়নের এবং রাসায়নিক গবেষণার কত ঘনিষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিলাম। এখন বঙ্গদেশের উন্নত রাসায়নিক গবেষণা সন্ধন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। ব্যবহারিক রসায়নে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রভৃত অভাব মোচন করিতেছে; এবং আপনারা সকলেই অবগত আছেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয় ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য। আয়ুর্ব্বেদ ও নব্যরসায়ন সম্বন্ধে কিছু দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন" শীর্ষক সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা, ঢাকা, ও রাজসাহীতে রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন এরূপ রসায়নিক গবেষণার সার্থকতা কি? এ সাধনার সিদ্ধিই বা কোথায়?

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় তাঁহার "বৈজ্ঞানিক জীবনীতে" মাইকেল ফ্যারাডের গবেষণাকে উপলক্ষ্য করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "অনেকের বিশ্বাস যে বিশুদ্ধ রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে গবেষণার কোন প্রয়োজন নাই, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা ঘটি, বাটি, ছাতা, জুতা, কাচ, কাগজ প্রভৃতি প্রয়োজনীয়" দ্রব্য যাহাতে এদেশে উৎপন্ন হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিন এইরূপ

কি লাভ?" যাঁহারা এরূপ প্রশ্ন করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বিশুদ্ধ রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার উন্নতি না হইলে এই সকল "প্রয়োজনীয়" দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার আবিষ্কারের আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পৃথিবীর কোনও কাজে আসিবে কি না—এ চিন্তা করিবার অবসর বৈজ্ঞানিকের নাই। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৈজ্ঞানিকের গবেষণার উপর পৃথিবীর তাবৎ "প্রয়োজনীয়" দ্রব্যের উৎপত্তি নির্ভর করিতেছে। ফ্যারাডে যখন এতটুকু তরল ক্লোরেন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন কি তিনি ভাবিয়াছিলেন যে পরবর্ত্তী কালে তাঁহার প্রস্তুত তরল ক্লোরেন শত সহস্র বোতল স্বর্ণের খনিতে ব্যবহৃত হইবে? ফ্যারাডের দূরদৃষ্টি কখনও দেখিতে পায় নাই যে তাঁহার আবিষ্কৃত বেঞ্জিন হইতে তাঁহার ভবিষ্যৎবংশীয়েরা বিচিত্র বর্ণের শত শত প্রকার রং প্রস্তুত করিবে। ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক গবেষণার ফলস্বরূপ আজ বিশ্বে বিদ্যুৎ একটি পরমা শক্তি রূপে বিরাজ করিবে?" কে বলিবে বঙ্গদেশের রাসায়নিকগণের গবেষণা কালে বিবিধ "প্রয়োজনীয়" দ্রব্য প্রস্তুত কল্পেও সহায়তা করিবে না?

শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী এম্, এ

নবজন্ম

দুখানি সুন্দর হাত কোমল করুণ,
বার বার স্পর্শ করি জাগাল অরুণ,
পাণ্ডুর কপোল 'পরে, আনিল প্রভাত,
সযতনে রজনীর মুছি অশ্রুপাত
মুদ্রিত কোরকপুটে মধু সঞ্চারিয়া
কুহক-গুঞ্জনে দিল নিখিল ভরিয়া!

দুটি আঁখি, দীপ্তি যার ছায়ায় কোমল,
শারদ-প্রভাত-সম স্নিগ্ধ সুবিমল
নীলিমার নিঃশেষ প্রসার, রশ্মি তারি
অভিষিক্ত প্রান্তরের অন্তর বিদারি
অযুত অঙ্কুরে দিল জন্ম অভিনব,
জাগে বিশ্বে শ্যামলের লীলার বিভব!



লীলা-তরঙ্গ

জন্মাষ্টমী

বিশ্বে আজি ওতঃপ্রোত তড়িতের সঘন স্পন্দন,
বিদ্যুতের দৌত্য চলে মিলাইতে ছিন্নভিন্ন মেঘে ;
অন্ধ-করা অন্ধকারে বদ্ধ দৃষ্টি, যামিনী গহন,
বন্দীর মন্দিরে হায় ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা আছাড়িছে বেগে।

লুপ্ত যত গতিপথ ভরা বরষার অশ্রুধারে,
জাগে উপবাসী চিত্ত বিশ্বাসের বিত্ত বুকে করি',—
গতিহীন মুক্তিহীন প্রব্যথিত শৃঙ্খলের ভারে,—
আনন্দের নাহি লেশ, জাগি' তবু যাপিছে শর্ব্বরী।

এলে কি এলে কি ওগো গুপ্তচারী শিশু যাদুকর ?
মধু-দৈত্য অধিকারে মোহ-ঘেরা মথুরা নগরে ?
প্রাচীরের হের ফের,—লোহার কবাট ভয়ঙ্কর,—
তা' সবে ভেঙে কি এলে অপথের মাঝে পথ ক'রে ?

এলে কি আনন্দরূপ! পুলকিয়া সুপ্ত নীপবন
ফণীফণা-ছত্রশিরে শান্ত শিশু আনন্দে-নির্ভয়!
রাখালেরে কোল দিতে আচারীর নাশিতে পারণ
এস তুমি দর্পহারী! এস প্রেমী! এস সর্ব্বজয়!

এস আলো-করা কালো! এস ফিরে কালিন্দীর কূলে,
বাজাও মুরলী তব,—যমুনা উজান যাহে বয়,—
এস রাস-নৃত্যে ফিরে দোলে দুলে ঝুলনায় ঝুলে
এস তুমি হে কিশোর! রিক্ত শাখে এস কিশলয়!

এস ইন্দ্র-অর্ঘ্য-হারী! নব বেদ কর উচ্চারণ!
নিয়ম-দারুণ দেশে হোক ফিরে তারুণ্যের জয় ;
ভগ্ন-পাণ্ডু পাণ্ডবের এস বন্ধু! এস জনার্দ্দন!
এস পাঞ্চজন্যধারী কংসের বংশের চিরভয়!

বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে জাগে দেশ তব প্রতীক্ষায়,
তব জন্মতিথি-দিনে কীর্ত্তনি' তোমার কীর্ত্তিকথা ;
এলে কি বিচিত্রকর্ম্মা! পুনরায় এলে কি ধরায় ?
জরাভরা ভারতের চিত্তবাসী চির-তরুণতা !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জ্যোতিঃহারা

(গল্প)

সূর্য্যাস্তের পর গোধূলির ম্লান আলোটুকু সন্ধ্যার শ্যামাঞ্চলে তখনও নিঃশেষে মিলাইয়া যায় নাই। রমানাথ ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়াই পীড়িতা স্ত্রীর বিছানার উপর বসিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল, "শুন্‌চ, আজ একটা ভাল খপর আছে।" রোগী দ্বারের দিকে পিছন করিয়া শুইয়াছিল; স্বামীর সাগ্রহ আহ্বানে মুহূর্ত্তে পাশ ফিরিয়া কহিল, "থিয়েটারে বইখানা নিলে বুঝি ?"

তখন বর্ষা কাটিয়া শীত সবে-মাত্র পড়ি' পড়ি' করিতেছিল। লেপ না সহিলেও গায়ে কাপড় রাখিতে হয়। পথে চলিতে সাদা কালো সবুজ রাঙ্গা ডুরে চেক্ নানা রঙ্গের নানা আকারের গরম কাপড় দৃষ্ট হয়। রমানাথের ঘর্ম্মাক্ত ললাটে চুলগুলা জড়াইয়া গিয়াছিল। আরক্ত মুখ ও উদ্বেলিত বক্ষের দ্রুত স্পন্দন তাহার মানসিক চাঞ্চল্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। পত্নীর ক্ষীণ দুর্ব্বল হাতখানি আপনার কম্পিত হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল, "নিয়েচে ত বটেই। তা-ছাড়া জান, ইলা, তারা বলেছে, এই হপ্তা থেকেই রিহার্সাল সুরু হবে। তিন হপ্তার মধ্যেই অভিনয়।" ক্ষয় রোগের নিষ্ঠুর চিহ্ন-অঙ্কিত পত্নীর পাণ্ডু মুখ ও দীপ্ত চক্ষুর পানে সুগভীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া রমানাথ পুনরায় কহিল, "তারা কি দেবে, জান? নগদ দু'শ টাকা! যে রাত্রে প্লে হবে, সেই রাত্রেই টাকা পাওয়া যাবে। আর তার পরদিনই সকালের গাড়ীতে তোমায় নিয়ে মধুপুর চলে যাব।—শুনেচ ত, ডাক্তার বলেচেন, একটু বলকারক পথ্য আর ভালো হাওয়া,—এই পেলেই তুমি সেরে উঠ্‌বে। দু'শ টাকায় এখানকার সমস্ত দেনা মিটিয়ে দিলেও আমাদের হাতে যথেষ্ট কিছু থাকবে।"

স্বামীর স্নেহাবনত দৃষ্টির সহিত আপনার আনন্দোৎফুল্ল দৃষ্টি মিলাইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে ইলা কহিল, "কি বললে তারা? খুব ভাল হয়েচে, বললে ত? আমি ত বলেইছিলুম, দেখ্‌লে নিশ্চয় নেবে—অমন লেখা নেবে না, আবার?" গর্ব্বে ইলার অধর-ওষ্ঠ স্ফুরিত হইতেছিল। ঈষৎ নত হইয়া রমানাথ স্ত্রীর জ্বর-তপ্ত ললাটে চুম্বন করিয়া কহিল, "লোকের চোখ যে তোমার চোখ

নয়—ইলা, তাই না ভয় পাই, সাহস করে এগুতে পারি না—পাছে লোকে মনে করে, এই ত লেখা,—বের করাই ধৃষ্টতা! এরও আবার দাম চায়!—আমার ভারি আহ্লাদ হচ্ছে, ভরসা হচ্ছে, ইলা, আবার তোমায় ভাল করে তুল্‌তে পার্‌ব।" ইলার নেত্র-পল্লবে যে জলের রেখা দেখা দিয়াছিল, তাহা গোপন করিবার জন্য সে কথা সে ফিরাইল, কহিল, "পাওনাদাররা এলে বলো, এবার তাদের টাকা তুমি শীগগিরই শুধে দেবে!"

রমানাথ কহিল, "ঠিক বলেছ, ইলা।"

আজই প্রত্যূষে আসিয়া পাওনাদারের দল বাড়ী-চড়াও হইয়া রমানাথকে যখন কঠিন কথার বাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছিল, এবং রমানাথ স্বপক্ষে বলিবার একটি কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া ছল-ছল ম্লান নেত্রে নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়াছিল—ইলা তখন কোন মতে দেওয়াল ধরিয়া আসিয়া উপরের দালানে জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিয়াছিল! নিরুপায় স্বামীর সে বিবর্ণ পাণ্ডু মুখে বেদনার যে কাতরতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া ইলার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, কি সে দুর্ভাগিনী! স্বামীর কষ্টের এতটুকু লাঘব করিবার সামর্থ্য তাহার নাই, শুধুই রোগের পশরা লইয়া অনর্থক স্বামীর পায়ে শৃঙ্খল হইয়া সে আঁটিয়া রহিয়াছে! তাহার প্রাণ দিলেও যদি পাওনাদারের ঋণ শোধ হয়, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই সে আপনার এই প্রাণখানাকে বলি দিয়া স্বামীকে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দিয়া জুড়াইয়া বাঁচে!

ইলার বুকে বেদনাটা টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল—মুখে তাহার কোন কথা ফুটিল না। ইলার সে ভাব রমানাথ লক্ষ্য করিল।

তাড়াতাড়ি সে কোটের পকেট হইতে একশিশি ঔষধ ও একটি ডালিম বাহির করিল। ইলার চক্ষু বাধা মানিল না—জলে ভরিয়া উঠিল। হতভাগিনী সে! তাহারই জন্য স্বামীর অর্থ এবং চাকুরী সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বামী নিজে পেটে না খাইয়া গায়ের আলোয়ানখানি এমন কি ঘটী-বাটিপর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া স্ত্রীর রোগের ঔষধ-পথ্য ও ডাক্তারের ভিজিট সমানে যোগাইয়া আসিতেছেন। সে কথা তিনি কোন দিন মুখে আনেন নাই, বটে। কিন্তু সে ত সব জানে! স্বামীর কোন উপকারেই সে লাগিল না—কেবল তাঁহাকে দুঃখ দিবার জন্যই যেন তাহার জন্ম হইয়াছিল!

২

চিরদিন কখনও সমান যায় না, এই প্রবাদ-বাক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, রমানাথ। তাহার পিতা কৃষ্ণধনের তিনচারিখানি কাপড়ের দোকান, লোহার কারবার—সহরে যথেষ্ট নাম। শৈশবের আট বৎসর পরম সুখে কাটাইয়া রমানাথ মাতৃহীন হইল এবং মাসখানেকের মধ্যেই এক অপরিচিতা বালিকা তাহার মাতার শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া দণ্ডমুণ্ডেরও কর্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া বসিল। বিমাতার বয়স অল্প; রমানাথের চেয়ে তিন চারি বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনায় সপত্নী-পুত্রকে সে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া ছিল। বাপ-মায়ের

আদুরে ছেলে রমানাথ শরীরের যত্ন করিতে জানিত না, কাজ কর্ম্ম কিছুই শিখে নাই—বিমাতা অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহার এই সকল দোষ-ত্রুটি ক্ষালন করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। পড়া-শুনায় রমানাথের মন ছিল না, পাঠ্য পুস্তকের অস্তিত্বে প্রায়ই তাহাকে সন্দিহান থাকিতে হইত। অর্থের এরূপ অযথা অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়িয়া যান—এরূপ অমিতব্যয়িতার প্রশ্রয় দিয়া পুত্রের মস্তক-ভক্ষণরূপ শত্রুতা সাধন ত আর তাঁহার দ্বারা সম্ভব নহে! অগত্যা লেখাপড়ার দায় এড়াইয়া রমানাথ পথে পথে ডাণ্ডাগুলি খেলিয়া বেড়াইতে সুরু করিল। ব্যবসায়ী লোক কৃষ্ণধন ছেলের সামান্য জমাখরচ বোধ হইলেই খুসী হইতেন, যখন শুনিলেন, ছেলের পড়ায় আদৌ মন নাই, সে স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ছেলেটা মানুষ হলো না! আমি চোখ বুজলেই দেখ্‌ছি এত বড় কারবারটা মাটি হয়ে যাবে—হরি হে দয়াময়!" কৃষ্ণধনের দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক নিকুঞ্জবিহারী দিদির নিকটে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতেছিল; এবং কৃষ্ণধনের অবর্ত্তমানে কারবারটা যে মাটি হইয়া যাইবে না, ভগিনী ও ভগিনী-পতির মনে এমন ভরসাও উদ্রেক করিয়া তুলিতে সে ত্রুটি রাখে নাই।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না—রমানাথেরও দিন কাটিতে ছিল—তাহার অনেকগুলি ছোট ছোট ভাই-ভগিনী হইয়াছিল। রমানাথ তাহাদের কোলে পিঠে করিয়া বেড়ায়—অবসরমত নিকুঞ্জের পরিত্যক্ত বইগুলা নাড়িয়া দেখে। বয়সের সহিত পাঠেও তাহার অনুরাগ জন্মিতেছিল—ক্রমে সে দেখিল, পাঠে আনন্দ আছে! কালির আঁচড়গুলা দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরের মত একান্তই অলঙ্ঘনীয় নহে, প্রবেশ ও নির্গমের সুন্দর বর্ত্মও বিদ্যমান আছে। নূতন নেশায় অনেকগুলা বাঙ্গলা নভেল সে পড়িয়া ফেলিল—আর এই নভেল-সংগ্রহের সূত্রে তাহার এক কবি বন্ধুও জুটিয়া গেল। তাহারই সংসর্গে পড়িয়া রমানাথের কবি ও লেখক হইবার সাধ হইল। লুকাইয়া সে রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ লবঙ্গলতার চক্ষে একখানা কবিতার কাগজ একদিন পড়িয়া গেল। লবঙ্গ লেখা-পড়া জানিত—সে পড়িয়া দেখিল, কবিতাটা প্রণয়িনীর উদ্দেশে লিখিত—

প্রথম যেদিন দেখা তোমায়-আমায়,—
মনে পড়ে সে দিনের কথা!
কি আলোক, কি পুলক ভ'রে ছিল বুকে,
কত আকুলতা!
মনে পড়ে, বসন্তের জ্যোৎস্না যামিনী,
ঢেলেছিল কি মধু কিরণ!
মনে পড়ে, বাতাসের কত আনাগোনা,
লুটি ফুল-বন!
আজ আছে জ্যোৎস্না-নিশি, আজও সে বাতাস
পরশিয়া বহিছে তেমনি!
আজও আছি তুমি-আমি, শুধু মাঝে নাই,
সেদিনের সেই প্রাণখানি!

কবিতা পড়িয়া লবঙ্গ অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া রহিল। এত-বড় ব্যাপারটা গোপন রাখিয়া ছেলের সর্ব্বনাশের পন্থা সুগম করিয়া দেওয়া কিছু মায়ের কর্ত্তব্য নহে, কাজেই কথাটা কর্ত্তার কানে উঠিল। ব্যাপার শুনিয়া কৃষ্ণধন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন—

পুত্রকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিয়া অচিরে এক দরিদ্রা বিধবার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। পিতার তিরস্কারের অর্থ সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও রমানাথ বুঝিল, নভেল বা কবিতা লেখা তাঁহার মনঃপূত নহে। রমানাথ লেখা ছাড়িল না; সতর্ক হইল মাত্র।

৩

এই সময় কৃষ্ণধন আবার পীড়ায় ভুগিতেছিল। অনেক চিকিৎসা হইল, কিন্তু ফল কিছু হইল না। ইহলোকের সহিত একদিন সকল সম্পর্ক তিনি চুকাইয়া বসিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রমানাথ শুনিল, তিনি বিষয়-সম্পত্তি কিছুই রাখিয়া যান নাই, বাড়ীখানা লবঙ্গলতার নামে উইল হইয়াছে—কারবার ফেল হইতেছিল, নিকুঞ্জ নিজ-অর্থ দিয়া তাহা খরিদ করিয়াছে। বিমাতা অচিরেই বাড়ী ভাড়া দিয়া পুত্র-কন্যা লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। অগত্যা রমানাথকে বলিতে হইল, তুমি আপনার পথ দেখ।

রমানাথ আপত্তি করিল না। রমানাথের স্ত্রী ইলার মায়ের কাশী-প্রাপ্তি হইয়াছিল। সংসারে তাহারও আর কেহ নাই! সম-বেদনাতুর দুইটি চিত্ত তাই অতি-সহজে এক হইয়া গেল। কৃষ্ণধনের এক বন্ধু রমানাথকে কলিকাতায় এক সওদাগরি অফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে চাকুরী করিয়া দিলেন। রমানাথ ইলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল। প্রথম দুই বৎসর বড় সুখেই কাটিয়াছিল। এমন সুখ রমানাথের জীবনে তাহার

রমানাথ খাটিয়া পয়সা আনে, ইলা প্রাণপণে তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা করে। অনেক সময় অবসর পাইলেই রমানাথ নাটক লেখে, ইলা অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে শতমুখে তাহার প্রশংসা করে। ছাপার পয়সার অভাব, তাই বই ছাপান হয় না—নতুবা ইলার বিশ্বাস ছিল, যে এ-সব বই যদি ছাপা হইয়া একবার দোকানে প্রবেশাধিকার পায়, তাহা হইলে দুই দিনেই সমস্ত বই নিঃশেষ হইয়া যায়; তখন যোগান দেওয়াই দায় হইয়া উঠিবে।

তারপর হঠাৎ একদিন ইলার শরীরে ক্ষয় রোগ দেখা দিল। অল্প আয়, গরিবের অত কেন—ভাবিয়া প্রথম প্রথম সে রোগ গোপন করিয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিত। ফলে রোগ বাড়িয়া গেল, রমানাথ জানিতে পারিল। সে ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা সুরু করিল। শেষে এমন হইল, কামাইয়ের জন্য তাহার চাকুরীটি খোয়া গেল। ঘরের জিনিষ পত্র বেচিয়া কিছুদিন কাটিল। ইলা কহিল, "তোমার দু-একখানা নাটক থিয়েটারে দাও—ওরা খুব পছন্দ করবে।" রমানাথ হাসিল। লিখিত সে শুধু আত্ম-তৃপ্তির জন্য, সাধারণে প্রকাশ করিবার সাহস তাহার ছিল না। ইলার উৎসাহে অনেক হাঁটাহাঁটির পর, শেষ ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে দুইশত টাকায় "জ্যোতিঃহারা" নাটকখানি তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। রমানাথ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইলা আনন্দে মধুপুর যাইবার দিন গণিতে লাগিল।

নাটকের রিহার্সাল দেখিবার জন্য

কিছুদিন হইতে থিয়েটারে যাইতে হইতেছিল। নাটকখানা ম্যানেজারের ভারি পছন্দ হইয়াছে। অভিনেতা অভিনেত্রীরাও বেশ দক্ষতার সহিত রিহার্সাল দিতেছে। কয় দিনেই রমানাথের সেখানে বেশ একটু খাতির জমিয়া গিয়াছিল। ম্যানেজার প্রায়ই তাঁহাকে থিয়েটার দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। ইচ্ছা থাকিলেও রমানাথ সে কথা রাখিতে সাহস করে না। বাসায় ইলা একা। তাহার জ্বরটাও কয়দিন হইতে আবার বাড়ের মুখে চলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর হইতেই সে কেমন আচ্ছন্ন-মত থাকে। রমানাথের মনে হয়, তাহার "জ্যোতিঃহারা" নাটকের অভিনয়ের ঈপ্সিত রাত্রির মধ্যকার এই দিন কয়টাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া যদি সরাইয়া ফেলা যাইত! স্বামী-স্ত্রীতে অনেক সময় এই কথারই আলোচনা হয়। টাকাটা হাতে পাইলেই এখানকার দেনাপত্র মিটাইয়া দিয়া সেই দিনই তাহারা কাশী যাইবে। ইলা কহিল, "মধুপুরের বাংলার ভাড়া বড় বেশী। তা ছাড়া সেখানে কিই বা দেখবার শোন্‌বার আছে? তার চেয়ে কাশী ভাল। বাড়ীও সস্তা, ঠাকুর-দেবতাও আছেন। আর যদি মরতেই হয়, কাশীতে মলে বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে স্থান পাব। তারকব্রহ্ম-নামে শিব স্বয়ং যেখানে মুক্তিদাতা—সেস্থান ছেড়ে পাহাড়ে অগঙ্গা দেশে না যাওয়াই ভাল।"

রমানাথ তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া কথা থামাইয়া দুই সজল ভর্ৎসনা-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, কহিল, "ইলা, ফের ঐ সব কথা কইচ! তুমি জান, তুমি না বাঁচলে আমিও বাঁচব না। বাঁচতে পারব না!" গভীর সুখে ইলার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কূলে-কূলে ভরিয়া উপছিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সজল চোখের সপ্রেম দৃষ্টি স্বামীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া সে কহিল, "তোমায় ছেড়ে স্বর্গে যেতেও আমার ইচ্ছা করে, না। মনে হয় আমি না থাকলে তোমার কত কষ্ট হবে, তবু তোমার কোন উপকারে কোন সেবাতেই লাগলুম না! আমার জন্যই তোমার যত কষ্ট—"বাধা দিয়া রমানাথ তাহাকে আদর করিয়া ভুলাইয়া অন্য কথা পাড়িল।

কাশীতে ইলার এক মাসিমা আছেন। তিনি বিধবা কাশী-বাসিনী। বিবাহের পূর্ব্বে ইলা একবার মায়ের সহিত তাঁহার কাছে গিয়াছিল—তাই কাশীর বিষয়ে তাহার অনেকখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল। ইলা কহিল, "মাসিমাকে লিখে দাও, তিনি আমাদের জন্যে ছোট-খাট দেখে বাড়ী কি ঘর ভাড়া করে রাখ্‌বেন। বাঙ্গালীটোলা বড় ঘেঞ্জি আর নোংরা। অসির দিকেই ভাল। ওদিকের গঙ্গার জল যেন কাঁচের মত। চক্‌চকে, নীল জল! কি চমৎকার দেখতে! কত সাধু সন্ন্যাসী ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ করে পথে চলেন! কেমন সব গঙ্গায় স্নান করে স্তব পাঠ করেন,—কত ভালই লাগত! তেমন করে আর কি চলে বেড়াতে পারব, না, গঙ্গায় নাইতে পারব—" তাহার করুণ কণ্ঠে বিষাদের ঝঙ্কার হাসির মধ্যে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল।

রমানাথ তাহার তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলায় সস্নেহভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে কহিল, "পারবে বই কি,—নিশ্চয়

পারবে—ডাক্তার বলেছেন, হাওয়া বদলালে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাবে। জ্যোতিঃহারার টাকা ক'টা পেলেই তোমায় আমি খাড়া করে তুলব, ইলা। এ ক'টা দিন কোন মতে চোখ বুজে কাটিয়ে দাও।"

নূতন স্বাস্থ্যলাভে ইলার শীর্ণ দেহখানি বর্ষা কালের ভরা নদীর ন্যায় কেমন কূলে কূলে পূর্ণতায় ভরিয়া উঠিবে, নব বসন্তাগমে শীতশীর্ণা লতিকার দেহ আবার কেমন করিয়া নবমুঞ্জরিত পত্র-পুষ্পে শোভা সম্পদে উদ্ভাসিত হইবে, কল্পনা-নেত্রে কবি রমানাথ তাহারই একটা মোহিনী ছবি আঁকিয়া তুলিতেছিল। তাহার ভাব-প্রবণ তরুণ হৃদয় সহজে নিরাশ হইতে চাহে না —অমঙ্গলকে অন্ধকারে সরাইয়া মঙ্গলের উজ্জ্বল মূর্ত্তিকেই সে পূর্ণ বিশ্বাসের বলে আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিতেছিল। ইলাকে ভাল হইতে হইবে—নহিলে যে তাহার পক্ষে জীবন-ধারণ একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে!

৪

একটানা জীবন-স্রোতে নূতনত্বের সম্ভাবনায় কিছুদিন হইতে ইলার শরীর একটু ভাল মনে হইতেছিল—কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হইল না।

জ্বর প্রত্যহই হইতেছিল। ক্ষীণ দেহ ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া বিছানায় মিলাইয়া আসিতেছে! রমানাথ তাহা লক্ষ্য করিতেছিল—তবু সে আশা ছাড়িতে পারে নাই। ডাক্তার বলিয়াছেন, "বায়ু পরিবর্ত্তনই ঔষধ।" স্নেহান্ধ স্বামী সে কথার অর্থ বোধ করিতে পারিল না। রোগ যে এখন চিকিৎসার অতীত হইয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া সে বিশ্বাস করিবে! জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, অবশেষে শেষ সুখটুকু, তাহার জীবনের একমাত্র আশা, একমাত্র অবলম্বন, ইলা! সেই ইলাও যদি ঝটিকাচ্যুত নীড়টুকুর ন্যায় একদিন ঝোড়ো বাতাসে খসিয়া পড়ে, তবে তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে! তাহারই মুখ চাহিয়া যে সে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তৈলাভাবে গ্যাস পোষ্টের নীচে বসিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া নাটক লেখে; আর তাহারই উৎসাহ-বাক্যে, তাহারই মিষ্ট হাসিতে সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়, বাঁচিয়া মানুষ হইবার তাহার সাধ জন্মায়! এই নাটক-প্রকাশেরই জন্য প্রত্যেক থিয়েটারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত লাঞ্ছনা, কত অপমান তাহাকে সহিতে হইয়াছে! শুধু ইলার মুখ চাহিয়াই সে-সব সে সহ্য করিয়াছে। অবশেষে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের ম্যানেজারের চোখে তাহার জ্যোতিঃহারার আদর হইয়াছে। টাকা অগ্রিম দিবার কথা ছিল না। সে কথা তুলিলে ম্যানেজার পাছে বই ফেরত দেন, সেও তাই সাহস করিয়া সে কথা কহিতে পারে নাই। এমন দিন ছিল, যখন পুস্তকের প্রকাশ ও প্রশংসা-লাভই তাহার কাম্য ছিল, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই! পুস্তকের সুখ্যাতি বা নিন্দায় কিছুই যায় আসে না! প্রকাশেও কিছুমাত্র উদ্বেগ নাই! এখন চাই শুধু পয়সা,—যে পয়সার অভাবে তাহার ইলা বিনা চিকিৎসায় চলিয়া যাইতেছে, আগে সেই পয়সা চাই! তাই রমানাথ কোন সর্ত্তে প্রতিবাদ করিল না।

৫

ইলা কহিল,"থিয়েটারে যাবে না! সে কি হয়? যেতে হবে তোমার—বাঃ, কত কষ্ট করে লিখ্‌লে, সবাই দেখ্‌বে, খালি তুমিই দেখ্‌বে না! না,—সে হবে না!"

সারা কলিকাতা নগরী যে নূতন নাটক "জ্যোতিঃহারা"-প্রণেতা রমানাথের নামাঙ্কিত প্লাকার্ড মালা বক্ষে ধরিয়া সহর বাসীর-চিত্তকে কৌতূহলে রঙ্গালয়ের পানে আকর্ষণ করিতেছিল—সেই রমানাথের নিজের মনে যে সেই ঈপ্সিত রজনীর ঈপ্সিত দৃশ্যাবলীর প্রতি কোনই আকর্ষণ ছিল না, তাহা নহে। তবু সে ইলাকে একা রাখিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার কথা মনে আনিতেও সাহস করিল না। সে কহিল, না, সে যাইবে না।

ইলা শীর্ণ ওষ্ঠে মৃদু হাস্যরেখা ফুটাইয়া কহিল, "বাঃ—তা কি হয়! আমি দেখব না, তুমি দেখ্‌বে না, সে হবে না। তোমায় দেখতেই হবে। তোমার চোখে আমি দেখব। যেতে তোমায় হবেই।" আনন্দ ও উদ্বেগে ইলার স্বর কাঁপিতেছিল। স্বামীর বিজয়গর্ব্বে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে ব্যর্থতার এতটুকুও স্থান ছিল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম আকাশের শেষ রক্তআভা জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া মুমূর্ষুর শেষ হাসিটুকুর মতই একবার উজ্জ্বল হইয়া মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। রমানাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

শনিবার। সেদিন সন্ধ্যায় মেঘেও বিস্তৃত আয়োজন। বাতাস বেগে বহিতেছিল। ঘনপুঞ্জ মেঘরাশির মধ্য দিয়া ম্লান জ্যোৎস্না ইলার ঘরে অর্দ্ধমুক্ত গবাক্ষ-পথে প্রবেশ করিতেছিল। প্রদীপ জ্বালা হয় নাই, তৈলাভাব। রমানাথ ঘরে ঢুকিয়াই মৃদু স্বরে কহিল, "ইলা, ঘুমুচ্চ!"

ইলা ঘুমায় নাই, জাগিয়াই ছিল, কহিল, "না, কৈ তোমার কোট দেখি।"

রমানাথ কাছে আসিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে হাসিয়া কহিল, "পথে যেতে যেতে ভেবে দেখ্‌লুম, কোটের দরকার হবে না। ঘড়া বেচে কোট গায়ে দেব? ছিঃ! আর তা-ছাড়া লোকে দেখ্‌তে আস্‌বে, জ্যোতিঃহারার নায়ক-নায়িকাদের। তাদের আমি কোন দারিদ্র্য বা অভাবের দুঃখ এতটুকু জান্‌তে দিই নি, ইলা। খুব জমকালো পোষাকই তারা পর্‌বে। গ্রন্থকারের জামা থাক্‌ বা না থাক্‌, তার জন্য থিয়েটারে দর্শকদের কোন ক্ষতি হবে না। তার পর জামা কিনলে ছেঁড়া জুতোটা, ময়লা কাপড়খানা, তালি-লাগান র‍্যাপারটা—সবাই মিলে তাদের দুর্ভিক্ষের মূর্ত্তি আর চেপে রাখ্‌তে পারবে না। তার চেয়ে ওদের না ঘাঁটানোই ভাল মনে করে সেই টাকাটায় দু'শিশি গ্রেপজুস্ কিনে আন্‌লুম। কাল সকালেই আমরা কাশী যাব। পথে তোমার দরকার হবে।"

ঘরে আলো ছিল না। মেঘান্তরালে ম্লান জ্যোৎস্না ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। রমানাথের হাতের উপর দুই ফোঁটা তপ্ত জল গড়াইয়া পড়িল। ব্যথিতভাবে সে কহিল, "ইলা, কাঁদ্‌চ! আমি কি কষ্ট দিলুম!"

হাত দিয়া চোখ মুছিয়া হাসিয়া

স্বামীর হাতখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ইলা কহিল, "না, না, কষ্ট বলো না। বড় আনন্দ পাই। তোমার ভালবাসা আমায় সেখানে গিয়েও শান্তি দেবে। দুঃখ এই, এত স্নেহের কোন দিনই আমি যোগ্য হলুম না।"

"ইলা, ফের ঐ কথা! তুমি আমায় কর্‌তে চাও কি—?" রমানাথের গম্ভীর কণ্ঠে ব্যথিত ভর্ৎসনা ফুটিয়া উঠিল। ইলা হাসিল—অন্ধকারে রমানাথ সে হাসি দেখিতে পাইল না, দেখিলে ভয় পাইত। কত করুণ, কত নৈরাশ্যময় সে ম্লান হাসিটুকু! ইলা কহিল, "আচ্ছা, আর কখনও বল্‌ব না—বল, আমার সব দোষ, সব অপরাধ আজ ক্ষমা কর্‌লে!" রমানাথ নত হইয়া তাহার উত্তপ্ত ললাটে মৃদু চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া গাঢ় স্বরে কহিল, "তাই বললে যদি তুমি সুখী হও, তবে বলছি,—করলুম! কিন্তু অপরাধ তোমার কি, ইলা?

অদূরে ঘোষালদের বাড়ীর বড় ঘড়িটায় আটটার ঘা বাজিয়া গেল। ইলা তাড়া দিয়া কহিল, "যাও, দেরি করো না। আরম্ভ হয়ে যাবে যে।"

এত দিনের এত সাধের জ্যোতিঃহারার অভিনয়, তবু উঠিতে রমানাথের মোটেই মন সরিতে ছিলনা। যশঃ-প্রার্থী লেখকের নৈরাশ্যের আশঙ্কা-জনিত এ কুণ্ঠা নহে, অতিরিক্ত আনন্দের অবসাদও তাহাকে বিচলিত করে নাই—সে যেন কোন্ অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা অনুভব করিতেছিল। অলস কণ্ঠে সে কহিল, "থাক্ ইলা। আজ আমার একটুও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। অন্যদিন তখন যাব।"

ইলা সকৌতুক হাসি হাসিয়া কহিল, "তাই বই কি—আমি একলা থাক্‌ব, তাই ছুতো হচ্চে! ওগো, না গো, না, ভয় করো না। সত্যি তোমাকে যেতে হবে। দেখে এসে আমায় সব বলো।"

অনেক বাদানুবাদের পর ইলার কথাই রহিল—সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক চিত্তে মৃদু গতিতে সহস্রবার ইলাকে সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিয়া রমানাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে মহা-সমারোহে সে রাত্রে "জ্যোতিঃহারা" নাটকের অভিনয় হইতেছিল। দর্শকের দল অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে থিয়েটার দেখিতেছিল। মুখে মুখে এই অশ্রুতনামা নূতন নাট্যকারের প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি বক্সে উপবিষ্ট রমানাথের কানে ভাসিয়া আসিয়া তাহার উদ্বেলিত চিত্তে দোলা দিয়া যাইতেও বিরত ছিল না। মেঘমুক্ত রবিরশ্মির ন্যায় তাহার যশঃরশ্মি বুঝি এইবার উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে! নাটক লিখিয়া সে নাম কিনিবে, বিমুখ ভাগ্য-লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিবে! সুখের পর দুঃখ—দুঃখের পর সুখ, বিধাতা-লিখিত নাটকে মানব-ভাগ্যের ইহাই চিরন্তন বিধান! চক্রনেমির চক্র বুঝি এবার ঘুরিয়া চলিয়াছে! রমানাথের প্রস্তরাচ্ছাদিত ললাট-তলের শিলাখণ্ডও বুঝি এবার খসিয়া পড়ে! অদৃষ্টা-কাশের কালো মেঘগুলা অনুকূল বাতাসে

উড়িয়া গিয়া বুঝি-বা আবার নীল-নির্ম্মল আকাশ প্রকাশ পায়! ইলাকে বাঁচাইবার উপায় হইয়াছে! রাত্রি-প্রভাতেই তাহারা কাশী চলিয়া যাইবে। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যাবলীর পানে রমানাথ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহার মন সেখানে ছিল না। সে দেখিতেছিল, সেই অন্ধকার কক্ষে রুগ্ন-শয্যাশায়িনী ইলাকে! সহসা তাহার চোখের সম্মুখে দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! রমানাথ দেখিল, সম্মুখে নদী—নদীতে চন্দ্রচ্ছায়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! নদীতীরে ধু-ধূ বালু—সে বালুরাশির শেষ নাই! নদীরও পারাপার নাই! গাছ-পালা নাই! নদীতে বালুতে আকাশে মিশিয়া সব এক হইয়া গিয়াছে! রমানাথ সেই নদীতীরে বালুকা-সৈকতে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া আছে—আর ঊর্দ্ধে জ্যোতির্ম্ময় আলোক-গোলকের মধ্যে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ইলা। ইলা বলিতেছে, "এই দেখ, আমি আরাম হইয়া গিয়াছি—রোগের যন্ত্রণা দারিদ্র্যের দুখ আর আমায় স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—এখানে স্নেহ প্রেম ভালবাসা সকলই আছে! শুধু কামনা নাই, নিরাশা নাই, প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, সন্দেহ নাই, চাঞ্চল্য নাই! স্বচ্ছসলিলা তটিনীর মতই এ প্রেম পরিপূর্ণ! তুমি আসিবে কি?"

রমানাথের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—চাহিয়া সে দেখিল, গভীর কোলাহলে "এন্‌কোর" "এন্‌কোর" শব্দের সহিত পতিত ড্রপ্‌সিন্‌ খানা আবার শূন্যে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রমানাথ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল। ম্যানেজার আসিয়া তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিলেন, কহিলেন, "অনেকগুলি বড়লোক আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান্‌। বইখানার একরাত্রেই আশ্চর্য্য নাম হয়ে গেল, মশায়—এমন মণিকে কি না খনির গর্ভে লুকিয়ে রেখেছিলেন?" রমানাথের ব্যাকুল চিত্ত সেই অন্ধকার কক্ষে একখানি রুগ্ন মুখের কাছে তখন ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল। তবু শিষ্টতা-রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া দুই পাঁচ জনের সহিত দুই একটা কথা কহিতে হইল। কহিয়াই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

* * *

অন্ধকার কক্ষে দাঁড়াইয়া ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে সে ডাকিল, "ইলা!" কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রোগীর ঘুম ভাঙ্গানো যে অনুচিত, সে কথা উদ্বেগে যেন সে ভুলিয়া গিয়াছিল। ইলার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে সে অগ্রসর হইল। কেহ উত্তর দিল না। রমানাথ সহসা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। আনন্দে আশায় ভয়ের কোন কথাই তাহার মনে হয় নাই—ইলা ত এমন গাঢ় ঘুম কখনও ঘুমায় না। যখন ভাল ছিল, তখনও নয়।

কাছে গিয়া ইলার গায়ে মাথায় হাত দিয়া রমানাথ দেখিল, কপাল ঠাণ্ডা হিম হইয়া গিয়াছে। তাহারও কপাল বহিয়া ঘাম ঝরিতেছিল, হাত পা ঠাণ্ডা অবশ হইয়া আসিতেছিল। তাড়াতাড়ি জানালাটা সে খুলিয়া ফেলিল। ভোরের আলো ইলার বিবর্ণ ম্লান মুখে, মুদ্রিত চোখে, শীর্ণ অধরে ছড়াইয়া পড়িল। শুকতারা নিষ্প্রভ হইয়া উষার আরক্ত আলোক-আস্তরণের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ভোরের

পাখীগুলা জাগিয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। খোলা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস ইলার মৃদু নিশ্বাসের ন্যায়ই তাহাকে ঘেরিয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিল।

রমানাথ বিছানায় বসিয়া দুই বাহুর স্নেহ-নিবিড় বেষ্টনে ইলাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার হিম-শীতল কপোল-তলে কপোল রাখিয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্যের ন্যায় ডাকিল, "ইলা—ইলা।" তাহার কণ্ঠস্বরের মৃদুতায় সে ইলার ঘুম ভাঙাইতে, অথবা তাহাকে ঘুম পাড়াইতে চাহিতেছে, তাহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না।

শ্রীসুরূপা দেবী।

মধ্যযুগের ভারত

(Mazeliere-এর ফরাসী হইতে)

শেষ কথা

নবম ও দশম শতাব্দীর মধ্যে, ভারতে যে রূপান্তর উপস্থিত হয়, তাহার ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে সংসাধিত হয় নাই, পরন্তু য়ুরোপের মত দ্রুতভাবেই সংসাধিত হইয়াছিল।

সেই সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন ভারতবাসীর মধ্যে পঞ্চমাংশ মুসলমান; এবং হিন্দু-ধর্ম্ম, দুই বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম, ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব। ভারতবর্ষ তখন আর বিশ্বব্রহ্মবাদী নহে। কতকগুলি পণ্ডিত ছাড়া কোন হিন্দু, জীবের সহিত জীবের স্রষ্টাকে একীভূত করে না। এবং ভারত তখন আর প্রকৃতভাবে পৌত্তলিকও নহে। ব্রাহ্মণেরা, শিক্ষিত লোকেরা, দেবমূর্ত্তিগুলিকে সাংকেতিক রূপ বলিয়া—বিগ্রহ বলিয়া মনে করে। জনসাধারণও, ভগবান ও ভগবানের মূর্ত্তি—এই দুয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং ভারত তখন আর ততটা বহুদেববাদীও নহে। অনেকে একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করে, এবং আরও অনেকে, বিভিন্ন দেবতাকে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করে, এবং সকলেই, এক দেবতা অন্য সমস্ত দেবতার উপরে অধিষ্ঠিত এইরূপ বিশ্বাস করে।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব আরও স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত "দেবপ্রসাদের" (grace) মতবাদটিতে ঐ প্রভাবের কার্য্য বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। ভারতীয় দেবতারা ক্রুদ্ধ দেবতা ছিলেন। পরিশেষে এক দয়াময় দেবতা আবির্ভূত হইলেন, তিনি অভিসম্পাত না করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন; এবং আরাধনার পরিবর্ত্তে তিনি ভক্তদিগের নিকট হইতে প্রেম চাহিলেন।

সমগ্র ভারত একটি রাষ্ট্র। এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার

মধ্যেও, এই একতার ভাবটি অন্তর্হিত হয় নাই। রাজকর্ম্মচারীগণ যখন রাজা হইল তখনও তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-উপাধি "নিজাম" ও "নবাব" বজায় রাখিল। মরাঠারা নূতন সাম্রাজ্যগঠনের চেষ্টা করে নাই, পরন্তু তাহারা মোগল-সম্রাটের নামেই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এবং কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকল রাষ্ট্রেরই শাসনপদ্ধতির মূলনীতি একই প্রকার ছিল;—সেই সমস্ত শাসননীতি গোড়ায় চীন, পারস্য ও কালিফ্-রাজ্য হইতে গৃহীত হয়।

ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার ভাবটি সকল রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও,—বিভিন্ন জাতির আবির্ভাবে, বিভিন্ন ভাষার সংগঠনে ভারতের নৈতিক একতা উচ্ছিন্ন হইল। প্রাচীন ভারতে, সকল লেখকই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন, এবং সকলেরই মানসিক ভাবভঙ্গী একই ধাঁচার ছিল; এই বিষয়ে এতটা সমতা ছিল যে, কোন গ্রন্থের লিখনভঙ্গী ও ভাব দেখিয়া সেই গ্রন্থকারের দেশনির্ণয় করা কঠিন হইত। কিন্তু তাহার পর, প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় স্বতন্ত্র মৌলিক সাহিত্য উৎপন্ন হইল;—সে মৌলিকতা শুধু প্রকারগত নহে, পরন্তু বস্তুগত।

সামন্ততন্ত্র ও মোগলদিগের কেন্দ্রগত শাসনের প্রভাববশত সমাজও নূতন করিয়া গঠিত হইল। পূর্ব্বে কেবল বর্ণ-ভেদমূলক উচ্চনীচতাই ছিল; জাইগীরদার ও কৃষক-প্রজার মধ্যে স্বত্বঘটিত সেরূপ তীব্র পার্থক্য ছিল না। তাছাড়া ব্রাহ্মণেরা সমস্ত আইনসম্মত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। কি মুসলমান, কি হিন্দু—একজন নিম্নতম সৈনিকের ক্ষমতা ব্রাহ্মণের ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক হইল।

এসিয়া হইতে, য়ুরোপ হইতে—ভারত যেমন নূতন ধরণের শিল্পকলা ও সাহিত্য শিক্ষা করিল, সেইরূপ নূতন নূতন বিজ্ঞানও শিক্ষা করিল। ভারতের বাণিজ্য ভারতকে সমস্ত পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ করিল; ভারতের শ্রমশিল্প রূপান্তরিত হইল। মোগল-আমলে বড় বড় পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। এমন কি, দেশের বহির্ভাবটা পর্য্যন্ত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল। বিভিন্ন প্রকারের চাষ আরম্ভ হইল, বড় বড় পথ দিয়া স্বার্থবাহরা চলিতে লাগিল, প্রাসাদসমন্বিত বৃহৎ নগরসমূহ সমুত্থিত হইল, ভিন্ন ধরণের গৃহসকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। লোকের পরিচ্ছদেও মুসলমান প্রভাব পরিলক্ষিত হইল। রাজারা, সৈনিকেরা, ধনশালী ব্যক্তিরা বেশী করিয়া বেশবিন্যাস করিতে লাগিল;—অবশ্য ইহা সভ্যতার উন্নতি-নিদর্শন বলিতে হইবে। আমীর ওমরাওদিগের পত্নীরা অন্তঃপুরমধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিত; প্রায় বাহির হইত না,—নিতান্তপক্ষে অবগুণ্ঠিত হইয়া বাহির হইত।

শেষ-চারি শতাব্দীর মধ্যে সভ্যতা যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ মধ্যযুগে, সামন্ততন্ত্র ও বৈদেশিকদিগের বিজয়াভিযান। অশ্বারোহী সৈনিকদল, রাজায় রাজায় লড়াই; অস্ত্রসজ্জার মধ্যে—বল্লম ও ধনুর্ব্বাণ; সাহিত্য—নিতান্ত সাদাসিধা ও গৃহধর্ম্মরঞ্জিত; কৃষকেরা মজুরে পরিণত, নগরগুলি সংকীর্ণ ও জনতাপূর্ণ; শ্রমশিল্প—

স্বল্পপুষ্ট। ষোড়শ শতাব্দীতে,—"নবজাগরণের" বিষম বেগ, কেন্দ্রীভূত রাজ্যশাসন, হিন্দুস্থানে শান্তি, ভারতের প্রান্তসীমায় যুদ্ধবিগ্রহ, ও কামানের ব্যবহার; পদাতিক সৈন্য তখনও নিকৃষ্ট, এবং অশ্বারোহী-সৈন্য মধ্যযুগের অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত; দর্শনশাস্ত্র, কবিতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৌতূহল, ও মানসিক সাহসের বিকাশ। সম্রাটের খাসমহলের প্রজাদিগের আংশিকভাবে স্বাধীনতা লাভ, নগরগুলা গুলজার; সমস্ত পৃথিবীর সহিত বাণিজ্য চলিতে থাকায় শ্রমশিল্প নবীকৃত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে,—স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্র, সুশৃঙ্খলা, শান্তি; অশ্বারোহীর দল শিক্ষিত সৈন্য হইয়া দাঁড়াইল এবং জায়গীর-দারেরা রাজদরবারের আমীরওমরাওর পদে অভিষিক্ত হইল। তখনকার পরিচ্ছদ ততটা সামরিক ধরণের নহে; সাধুভাষায় রচিত সাহিত্য; মন বেশী সংযত, ততটা কৌতূহলপ্রবণ নহে; বর্দ্ধনোন্মুখ সমৃদ্ধি; —যে জাতি অভ্যুদয়ের চরমশিখরে উঠিয়াছে তাহারই মত সমস্ত লক্ষণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে —অধঃপতন, ভোগসুখে মগ্ন হইয়া রাজারা নির্বীর্য্য; চারিদিকে বিদ্রোহ, যুদ্ধবিগ্রহ; আমীর ও শাসনকর্ত্তারা আপনদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল; অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধরণের বন্দুক-ধারী সৈন্যমণ্ডলী; সাহিত্য—মার্জ্জিত, যুক্তিযুক্ত, বাগ্মীসুলভ; কিন্তু তাহাতে না-আছে কল্পনাশক্তি, না-আছে তীব্র অনুভূতি; কারিগর ও কৃষকেরা করভারে আক্রান্ত ও দৈন্যগ্রস্ত; আমীর-দিগের গৃহে,—ধনশালী দোকানদার, ও সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্যসেবকের গতিবিধি; সুকুমার ধরণের ভোগবিলাস এবং এমন একটা সূক্ষ্মরুচি শিষ্টতার ভাব যাহা ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে লোকদের স্থূলরুচির আচরণে ও কথাবার্ত্তায় যেন মর্ম্মাহত হয়।

হিন্দুদিগের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মধ্যযুগের যুদ্ধবিগ্রহ ও ইসলামধর্ম্মের মর্ম্মভাব, অপেক্ষাকৃত রূঢ়প্রকৃতি জাতিদিগের মধ্যে কতকগুলি সামরিকগুণ ফুটাইয়া তুলিয়াছিল—সে সব গুণ এ পর্য্যন্ত ভারতে অজ্ঞাত ছিল।(১) রাজপুত, শিখ্, তামুল ও মহারাঠাদিগের ন্যায় প্রাচীন ভারতের কোন জাতিই এই সকল গুণের পরিচয় দেয় নাই। প্রত্যুত ইতরসাধারণ লোকেরা আজও পর্য্যন্ত মৃদুপ্রকৃতি ও ভীরু-স্বভাব। বিজেতা প্রভুর প্রতি চাটুবাদ ও দাসবৎ ব্যবহার; বিজিত প্রভুর প্রতি উদাসীনতা, কখন-কখন বিশ্বাসঘাতকতা, কখন বা নিষ্ঠুরাচরণ—সচরাচর ইহাই তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়। যাহাই হউক সকলেরই মধ্যে যে একটা সৌহার্দ্দবন্ধনের বাসনা ছিল, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানাদি সেই বাসনা পূর্ণ করিল।

বহু শতাব্দী যাবৎ বৌদ্ধ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়াছে। পৃথিবীর দুঃখকষ্টের মধ্যে সকল মনুষ্যই যে সমান এই ভাবটা বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা ইসলামধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আরোপ করাই অধিক সঙ্গত। যে সামাজিক ভেদাভেদ হিন্দুর এত প্রিয়,—মুসলমান

(১) গ্রন্থকার কি আমাদের মহাভারত পাঠ করিয়াছেন? বোধ হয় করেন নাই—তাহা হইলে এরূপ মত প্রকাশ করিতেন না—শ্রীজ্যো—

সে ভেদাভেদ মানেনা। যে কেহ রাজপুত নহে, রাজপুত তাহাকেই অবজ্ঞা করিত, এবং লুণ্ঠনকারী মারাঠা, যে থান হইতেই পায়, নিজের জন্য ধন হরণ করিয়া আনিত। তাহার পর হইতে, যে বিদ্বেষবুদ্ধি লোকদিগকে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিল সেই বিদ্বেষবুদ্ধি অনেকটা কমিল। ডোম, সাঁওতাল, চর্ম্মকার, ঝাড়ুবর্দ্দার, জলবাহক আর ততটা নীচ বলিয়া পরিগণিত হয় না, এবং তাহাদের সান্নিধ্য মাত্রই আর অশুচিতা উৎপাদন করে না। কেবল কতকগুলি ব্রাহ্মণ এখনও পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দূর হইতে বর্জ্জন করে। পল্লীগ্রামে, সকল ব্যবসায়ের লোকেরাই পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কহে, মেশামেশি করে,—কেবল তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসায়ের একচেটিয়া ভাবটি খুব সতর্কতার সহিত রক্ষা করে এবং আবহমান কাল পর্য্যন্ত যে সকল নিষেধ চলিয়া আসিতেছে সেই সকল নিষেধ মানিয়া চলে।

সর্ব্বশেষে হিন্দুদের মধ্যে এই ধারণাটা জাগিয়া উঠিল যে, সমাজ স্বভাবতই রূপান্তরিত হইয়া থাকে, এবং আরও রূপান্তরিত হউক এইরূপ একটা বাসনারও উদ্রেক হইল। যাহারা অতীব দরিদ্র, যাহারা অবজ্ঞার পাত্র—তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্যপ্রচারিত এই কথাগুলি বলিতে লাগিল যে, ভগবানের নিকট—পদের কোন উচ্চনীচতা নাই; আবার কেহ কেহ—যেমন শিখ, মারাঠা ও তামুল—বন্দুক ধরিল, এবং যুদ্ধ করিয়া পদ-মর্য্যাদার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইবার জন্য প্রয়াসী হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে,—ভারতে যে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে তাহারই যেন একটা পূর্ব্বাভাস মনে মনে সকলেই অনুভব করিতে লাগিল।

(২)

বৈদেশিকের প্রভাবাধীনে ভারত নবীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু ভারত তাহার নিজস্ব ভারতীয় ভাব ত্যাগ করে নাই; তাহার স্বকীয় সামাজিক গঠন অর্থাৎ বর্ণভেদপ্রথা বজায় রাখিয়াছিল। কোন্ তত্ত্বগুলি বর্ণভেদপ্রণালীর বিরোধী ছিল, কি কি কারণে বর্ণভেদ প্রণালী জয়ী হইল, এবং সেই সকল তত্ত্ব, বর্ণভেদপ্রণালীর উপর কি গভীর পরিবর্ত্তন আনিল, এই সমস্ত অনুশীলন করা আবশ্যক।

*

* *

দুইটি তত্ত্ব বর্ণভেদপ্রণালীর সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল:—সামন্ততন্ত্র ও ইস্‌লাম। বর্ণভেদ প্রণালীতে সামন্ততন্ত্রের পূর্ণতা ছিল না বলিয়া অভিজাতবর্গ বর্ণভেদপ্রণালীকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাজপুতানা ছাড়া আর কোথাও সফলতা লাভ করে নাই। (২) অন্যসর্ব্বত্র বর্ণভেদপ্রণালীর বনিয়াদের উপর সামন্ততন্ত্র সংস্থাপিত হয় এবং কালক্রমে সামন্ততন্ত্র, বর্ণভেদপ্রণালীর গঠনেও ঈষৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। সামন্ততন্ত্র, ৯/১০ অংশ লোককে মজুর-অবস্থায় পরিণত করিয়া, সমাজকে গভীরভাবে রূপান্তরিত করে।

(২) রাজপুতানায় আজও বর্ণভেদ প্রণালী আছে বটে কিন্তু রাজপুত জাতের বাহিরে অন্য জাতের পদমর্য্যাদায় [illegible]

ইস্‌লাম-তত্ত্ব অন্য প্রকারে স্বীয় শক্তি প্রকটিত করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় মুসলমান ধর্ম্মও সাম্য ঘোষণা করিল। আর সে কি-বিরাট সাম্যবাদ! বৌদ্ধধর্ম্ম লোকদিগকে শুধু একজনের কর্ত্তৃত্বাধীনে ভিক্ষু-জীবনের অধিকার প্রদান করিল; বৌদ্ধধর্ম্ম বলিল, বর্ণভেদ প্রথা ত্যাগ করিবার জন্য, আর কিছুই আবশ্যক নাই, শুধু ব্রহ্মচর্য্য, সংঘের আজ্ঞাপালন ও দরিদ্রের ব্রত গ্রহণই যথেষ্ট। ইস্‌লাম, হিন্দুকে আমীর করিতে চাহিল, সৈনিক করিতে চাহিল; ইস্‌লাম হিন্দুর সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মোচন করিল, হিন্দুর পদমর্য্যাদার পথ উদ্‌ঘাটন করিল; আরও অধিক —ইস্‌লাম হিন্দুকে বিজেতার মণ্ডলীভুক্ত করিল, পূর্ব্বতন প্রভুদের উপর তাহার প্রভুত্ব দিল। অথচ মুসলমানেরা সংখ্যায়, ভারতবাসী লোকের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র ছিল। এবং তন্মধ্যে অনেকেই গোড়ায় বৈদেশিক, অনেকেই বলপূর্ব্বক-মুসলমান-ধর্ম্মে-দীক্ষিত হিন্দুর বংশধর। তবেই দেখা যাইতেছে, বর্ণভেদের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াই হিন্দু ইস্‌লামকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। কেন বর্ণভেদের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য হিন্দুর এতটা আসক্তি? তাহার কারণ, হিন্দু জানিত, বর্ণভেদ প্রথাই তাহার প্রাণ বাঁচাইবার উপায়।

উহা তাহার মূল-জাতিত্ব রক্ষা করিবারও উপায়। কেননা, মধ্যযুগের অরাজকতায় মধ্যে, এবং ব্রাহ্মণ্যিক সভ্যতার অধঃপতনের পর, ভারতের, শক বা মোগল হইয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল।

উহা হিন্দুর ধর্ম্মেরও রক্ষাকবচ। রামানুজ, কবীর, নানক, ইঁহারা ইস্‌লামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সুফীদের ধর্ম্মমত অপেক্ষাও তাঁহাদের ধর্ম্মমত মুসলমান-ধর্ম্মমত হইতে কম তফাৎ। যদি বর্ণভেদপ্রথা না থাকিত তাহা হইলে, ভারত খুব সম্ভব মুসলমান হইয়া যাইত।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থাসম্বন্ধেও বর্ণভেদ প্রণালী একটা রক্ষার পথ। কারণ জাতিভেদপ্রণালী, সামন্ততন্ত্রকে প্রতিরোধ করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল, মজুরত্ব হইতে পদক্রমানুসারে লোকদিগকে মুক্তিদানে সমর্থ ছিল; কারণ, জাতিভেদ প্রণালী না থাকিলে পারস্য ও তুর্কের ন্যায় ভারত একজন স্বেচ্ছাচারী রাজার ক্রীড়নক হইয়া পড়িত; উক্ত দুই দেশে যে সকল সমাজশ্রেণী, বিজয়ী প্রভুর অপ্রতিহত শক্তিকে বাধা দিত, ইসলাম-প্রচারিত সাম্যবাদ ঐ সমস্ত শ্রেণীকে বিনষ্ট করিয়াছিল।

তাছাড়া বর্ণভেদপ্রণালী, আর্থিক হিসাবেও হিন্দু জাতির একটা রক্ষার উপায়। আধুনিক য়ুরোপের শ্রমশিল্পমূলক ও গণতন্ত্র মূলক সভ্যতার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সাম্যই ধনবৃদ্ধির প্রধান হেতু। পৃথিবীর মধ্যে মুসলমান কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌গামী। অবশ্য ইসলামের যে অবনতি হইয়াছে তাহার অনেকগুলি কারণ আছে; এই অবনতি, কোরাণের উপদিষ্ট অদৃষ্টবাদের উপর, সুফীদিগের নিশ্চেষ্টতাবাদের উপর আরোপ করা যাইতে পারে; এরূপও বলা যাইতে পারে যে,

কৃষিকর্ম্মে ও শ্রমশিল্পে সেমিটিক জাতির বড় একটা রুচি ছিল না, দৈহিক শ্রমের প্রতি তাহাদের বিরাগ ছিল; এরূপ বলা যাইতেও পারে,—অচলিষ্ণু জীবন, শান্তি, সর্ব্বাঙ্গীণ রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানাদি, এবং সাহিত্য-বিজ্ঞানের অনুশীলন—এই সমস্ত যে-সভ্যতার প্রধান লক্ষণ,—তাহার সহিত, যাযাবর ও যোদ্ধৃজাতির উপযোগী মুসলমান-ধর্ম্ম কখনই খাপ খায় না। কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখি, বাগ্দাদে, স্পেনদেশে, ইজিপ্টে, আকবরের ভারতে, সুলিমানের তুর্কিস্থানে এই ইসলাম ধর্ম্ম কিরূপ দীপ্তিময়ী সভ্যতা আনয়ন করিয়াছিল, তখন এই সকল তর্কের মূল্য অনেকটা কমিয়া যায়। সকল মুসলমান-দেশেরই আর্থিক উন্নতি, রাজার যথেচ্ছাচার শাসনে স্থগিত হইয়া যায়। ইস্‌লাম,—যথেচ্ছাচারিতার সম্মুখে, ব্যক্তিচেষ্টাকে অসহায় করিয়া রাখিয়াছিল; এবং য়ুরোপের ন্যায়, এসিয়ামাইনরের ন্যায়, আফ্রিকার ন্যায় যখন ভারতেও ইস্‌লামধর্ম্ম অপ্রতিবিধেয় অবনতি আনয়ন করিল, তখন একমাত্র বর্ণভেদপ্রণালীই বিশৃঙ্খলার প্রতিরোধক হইয়া দাঁড়াইল। তখন না-ছিল দেওয়াণী আইন, না-ছিল ফৌজদারী আইন; জোর-দখলীকার, ভাগ্যান্বেষী, দস্যুর দল, এসিয়া ও য়ুরোপের সমস্ত জাতি—শিকার-জন্তুর মত ভারতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু বর্ণভেদপ্রণালী রহিয়া গেল;—উহার নিয়ম ব্যবস্থা হিন্দুমাত্রই পালন করিতে লাগিল; উহার (passive resistance) সহিষ্ণুতামূলক প্রতিরোধিতা, বৈদেশিকদিগের আক্রমণকে চূর্ণ করিয়া দিল।

*
* *

তথাচ বর্ণভেদ-প্রণালী রূপান্তরিত হইল। বর্ণসংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই বৃদ্ধি নানা কারণে ঘটিল। প্রথমত প্রাচীন সমাজের অবনতি এবং তদুৎপন্ন সামাজিক বিশৃঙ্খলা। প্রাচীন রাজবংশ-সমূহের পতন, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির উপায়াভাব, মুক্তিলাভের বাসনা, মধ্য-এসিয়ার বর্ব্বরদিগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষণের আবশ্যকতা, ভাগ্যান্বেষী ও দস্যুদলের আবির্ভাব—এই সমস্ত কারণে প্রণোদিত হইয়া দেশের প্রধানেরা নিজ নিজ দুর্গে আবদ্ধ থাকিয়া আপনাদিগকে দেশাধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেইরূপ,—যে কারণে য়ুরোপের জনসাধারণ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, কতকটা সেই কারণেই, একই অঞ্চলের কতকগুলি ভূম্যধিকারী, একই ব্যবসায়ের কতকগুলি কারিগর, পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য এক একটা দল বাঁধিল। কিন্তু য়ুরোপের জনসাধারণ অস্ত্রের দ্বারা আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, আর হিন্দুরা অচলিষ্ণুতা, মৃদুতা, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। এই প্রথম কারণটার সহিত আরও কতকগুলি কারণের সংযোগ হইল যথা:—জাতিবিশেষের সংগঠন, লোক-ভাষার পরিপুষ্টি, ক্রমাগত নূতন নূতন রাজ্যের সংস্থাপন, নূতন নূতন সামন্ত-রাষ্ট্রের পত্তন। তাছাড়া, সভ্যতার উন্নতি, বৈদেশিকদিগের জনহিতকর প্রভাব,—যাহা হইতে নূতন নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইল। পরিশেষে,

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মান্দোলন হইতে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংখ্যা এতটা বৃদ্ধি হইল, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামত এতটা তীব্র হইয়া উঠিল যে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোকের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া একেবারে পৃথক হইয়া পড়িল। এবং এই সকল বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ায়, সমস্ত বর্ণভেদ-প্রণালীটাই সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইল। একটা নূতন পত্তনভূমি স্থাপিত হইল। সামাজিক পদমর্য্যাদা ও প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তে, ব্যবসায় ও বাসস্থানই মূলজাতিগত উৎপত্তির পত্তনভূমি হইয়া দাঁড়াইল। সকল নামগুলিই নূতন এবং মূল শব্দার্থ হইতে একটু ভিন্ন। যথা :—কায়স্থ, বৈদ্য, কামার, সোনার ইত্যাদি (৩)

আইনী-আকবরীতে আবুল-ফজল মনুর চারি শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাছাড়া ম্লেচ্ছ নামক আর এক পঞ্চম শ্রেণীরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আরও এই কথা বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণেরা দশ শ্রেণীতে বিভক্ত :—প্রথম তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ন্যূনাধিক নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণ্যিক কর্ত্তব্য সকল পালন করিয়া থাকে; অন্য শ্রেণীগুলি, ক্ষত্রিয়বৃত্তি, বৈশ্যবৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করে; সপ্তম শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষু এবং অষ্টম শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কতকগুলি পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ ইহাদিগের নীচে, তাহাদিগের আচরণ ম্লেচ্ছ ও চণ্ডালের ন্যায়।

আবুল-ফজল বলেন, ক্ষত্রিয় মাত্রই হয় চন্দ্রবংশীয়, নয় সূর্য্যবংশীয় ;—রাজপুতদিগের মধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত।

তাহার পর তিনি আরও বলিয়াছেন :—ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ৫০০ শাখা আছে; তন্মধ্যে ৫২টী শাখা উচ্চ পদবীর এবং ১২টী শাখা সম্মান-যোগ্য। কিন্তু প্রকৃত ক্ষত্রিয় এখন আর কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ক্ষত্রিয়-বংশধরদিগের মধ্যে অধিকাংশই অস্ত্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু তাহারাও ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর কতকগুলি ক্ষত্রিয় অস্ত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; তাহারা রাজপুত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহারা শত সহস্র গোত্রে বিভক্ত।

বৈশ্য ও শূদ্রেরাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত। বৈশ্য-শাখার অন্তর্ভূত বেণিয়া-নামক এক শ্রেণীর মধ্যেই ৮৪ বিভাগ বিদ্যমান।

***

যেমন বর্ণের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল সেই সঙ্গে নিয়মের কঠোরতাও বাড়িতে লাগিল।

বৈদেশিকের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিই এই কঠোরতার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

আমি মুসলমান নহি—ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতি আমার কোন ঝোঁক নাই—এই কথা দৃঢ়রূপে বলিবার জন্যই যেন হিন্দুরা পুরাতন প্রথাগুলি খুব আঁকড়াইয়া ধরিল। এই ধর্ম্মোৎসাহ হইতেই ধর্ম্মান্ধ মুসলমানেরও

(৩) ঐরূপ তেলী, কম্ভার, তাঁতী, নাপিত ইত্যাদি। ইহার অনেকগুলি (যাহার নাম প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় না) মুসলমান রাজত্বকালের পূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছিল।

অত্যাচার আরম্ভ হয়, আবার এই কারণেই হিন্দুরাও মুসলমানের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইস্‌লাম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করিবার জন্য নানক শিখসম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। নানক সমস্ত পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের প্রতিবাদী হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে, শিখদিগের এই একটি সঙ্কল্প সর্ব্বপ্রধান হইল:—মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা। তাহারা তখন দুর্গার পূজা আরম্ভ করিল, দুর্গার নিকট নরবলি দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন গুরু আপনার পুত্রকে বলি দিল। পৌত্তলিকতাদ্বেষী মুসলমানের সূক্ষ্ম মর্ম্মে আঘাত দিবার জন্য তাহারা গো-পূজাও আরম্ভ করিল। এমন কি, হিন্দুদের মধ্যে খাদ্যের বাছ-বিচার, পরিচ্ছদের বাছ-বিচার, দৈনিক স্নান, গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি, এবং প্রাচীন-প্রথানুবর্ত্তিতাও দেশানুরাগের প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইল।

নিয়মের কঠোরতার কারণ আর এক দিক দিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

যদি কঠোর নিয়ম স্থাপন করিয়া ব্যবসায়গুলির একচেটিয়া ভাব বজায় রাখা না যায়, তাহা হইলে, এই অসংখ্য বর্ণ-বিভাগগুলি অচিরে বিলুপ্ত হইবে, এইরূপ তাহারা আশঙ্কা করিয়াছিল। আর, বর্ণগুলি বংশানুক্রমিক হওয়ায়, ভিন্ন বর্ণের সহিত বিবাহও এইরূপে নিষিদ্ধ হইয়া পড়িল।

সাধারণ লোকের আচরণের উপর ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্বাবধান ও খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল —উহাই নিয়মের কঠোরতার প্রধান হেতু বলিয়া মনে হয়। পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগের অতি শোচনীয় অধঃপতন হইল। অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি, ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্ট সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শনেরও অবনতি হইল। আবার অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদিগের নিকট হইতেও কিছু শিখিতে সম্মত হইল না।

যে বিদ্যাশিক্ষায় একমাত্র ব্রাহ্মণদিগের অধিকার ছিল—লোক-সাহিত্যের বিকাশে, তাহাও তাহাদের হস্তচ্যুত হইল। মুসলমানের আক্রমণে তাহাদের মন্দির, তাহাদের মঠ, তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়, সমস্তই বিধ্বস্ত হইল। সংস্কৃতের অনুশীলন গৃহের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। রাজাদিগের অনুগ্রহেই বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন সংরক্ষিত হইয়াছিল।

তারপর, সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশগুলি মুসলমানের হস্তগত হইল। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী শেষ-রাজাগুলি ছিলেন,—হয় রাজপুত, নয় দ্রাবিড়ী; উহাদের অধিকাংশই অনক্ষর। বিজয়নগরের পতনের পর, কোন রাজারই তেমন বেশী রাজস্ব ছিল না। বড় লোকের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকায়, সকল ব্রাহ্মণই, এমন কি উচ্চশ্রেণীর গৃহস্থ ব্রাহ্মণেরাও ভিক্ষার দ্বারা উপজীবিকা লাভ করিতে বাধ্য হইল। কোন এক রূঢ় জাতির প্রভাব এবং কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতির প্রভাব, ব্রাহ্মণদিগের চরিত্রকে কলুষিত করিল। অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের মতে হিন্দুধর্ম্ম, কতকগুলি কবি-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে, অথবা সূক্ষ্মতত্ত্বসকল সাধারণ লোকের বোধগম্য

করাইবার জন্য, কতকগুলি সাংকেতিক মূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। মধ্যযুগে, ব্রাহ্মণেরা যাহাদের সহিত একত্র বাস করিত সেই শকজাতীয় বর্ব্বরদিগের ন্যায়, সেই বঙ্গদেশীয় অসভ্যদিগের ন্যায়, তাহারাও পৌত্তলিক হইয়া উঠিল, কুসংস্কারপরায়ণ হইয়া উঠিল, কাষ্ঠপ্রস্তর-পূজক হইয়া উঠিল। আবার কুসংস্কারের সহিত স্বার্থ আসিয়া মিলিত হইল। তখন তাহারা এমন সকল অনুষ্ঠানের উদ্ভাবনা করিল, যাহা ব্রাহ্মণের দক্ষিণা-সহকৃত সাহায্য ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ব্যবস্থাপত্র বিক্রয় করিবার জন্য তাহারা ব্যবস্থার সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিল।

গার্হস্থ্যজীবনের খুঁটিনাটি কার্য্যের উপরেও তাহাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সর্ব্বত্রই তাহাদের গুপ্তচর থাকিত, তাহারাই অনুক্ষণ খবর আনিয়া দিত। কোন কৃষকের কোন গরু যদি পীড়িত হইত, অমনি তাহাকে নদীতে লইয়া যাইতে হইত। যদি ঐ গরু গৃহে মরিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে প্রভূত পরিমাণে অর্থদান করিতে হইত, তাছাড়া প্রায়শ্চিত্তও করিতে হইত। Travernier একজন কৃষককে হামাগুড়ি দিয়া পথ চলিতে দেখিয়া ছিলেন।

আইনী আকবরীতে এক জায়গায় একটা কৌতূহলজনক ব্যাপারের বর্ণনা আছে :—

যখন কোন ব্যক্তি মরণাপন্ন হয়, হিন্দুরা তাহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া মাটিতে রাখিয়া দেয়, তাহার মাথা মুড়াইয়া দেয় (কেবল বিবাহিতা রমণীদের মস্তকমুণ্ডন হয় না) তাহার পর তাহার সমস্ত শরীর ধৌত করা হয়। ব্রাহ্মণেরা মুমূর্ষুর সম্মুখে মন্ত্র পাঠ করে ও ভিক্ষাস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করে। গোবর ও তৃণে মাটী ঢাকিয়া দেওয়া হয়; মাথা উত্তরে পা দক্ষিণে—এইভাবে মুমূর্ষুকে চীৎ করিয়া শুয়াইয়া দেওয়া হয়। যদি কাছাকাছি কোন নদী কিম্বা পুষ্করিণী থাকে, তাহার জলে আ কটি পর্য্যন্ত তাহাকে দাঁড় করিয়া রাখা হয়। মরিবার পর যখন পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন আত্মীয়েরা তাহার মুখে গঙ্গাজল ঢালিয়া দেয়; সোনা, পান্না, হীরা, মুক্তা মুখের ভিতর পূরিয়া দেয়—তাহার পর গো-দান করে, বক্ষের উপর তুলসীপাতা স্থাপন করে, এবং যে-দেশের যে-সাম্প্রদায়িক চিহ্ন, সেই তিলক প্রভৃতি চিহ্ন ললাটে অঙ্কিত করে।

মৃত দেহ লইয়া আসিবামাত্রই, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, ভ্রাতা, শিষ্য বন্ধুবান্ধব তাহাদের মাথা ও দাড়ী কামাইয়া ফেলে, (অন্যেরা দশদিনের জন্য অপেক্ষা করে) শবকে একটা নূতন ধুতি পরাইয়া দেয় এবং একটা মোটা চাদরে তাহাকে আচ্ছাদিত করে। বিবাহিতা রমণীর দেহে তাহার দৈনিক পরিচ্ছদটাই পরানো থাকে। কোন নদীর ধারে মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়, এবং উহা পলাশ কাঠের চিতাশয্যার উপর স্থাপিত হয়। মন্ত্র পাঠান্তে মুখের মধ্যে একটু ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হয়, চোখের উপর, নাকের উপর, কানের উপর এবং অন্যান্য রন্ধ্রস্থানে কতকগুলি সোনার দানা রাখা হয়। তাহার পর মুখাগ্নি করা পুত্রের কাজ; তাহার অবিদ্যমানে, সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এবং তাহার অবিদ্যমানে, জ্যেষ্ঠকে এই কাজ করিতে হয়। মৃতের পত্নীগুলি হাতধরাধরি করিয়া মৃতদেহকে আলিঙ্গন করে, তাহার সহিত চিতায় পুড়িয়া মরে।

আবুল-ফজল বলেন, উপস্থিত ব্যক্তিরা চিতায় উঠিতে রমণীদিগকে নিষেধ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার পরেই আবার তিনি বলিতেছেন, হিন্দুবিধবাদিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;—স্বামী মরিয়াছেন শুনিয়াই যাঁহাদের প্রাণবিয়োগ হয়; যাহারা শোকে

অভিভূত হইয়া চিতার আগুনে পুড়িয়া মরে; যাহারা লোক-লজ্জার খাতিরে সহমৃতা হয়; যাহারা চিরপ্রথা মানিয়া-চলিবার জন্য সহমৃতা হয়; যাহারা চিতাগ্নিতে বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত হয়।

তাই বলিতেছি, এই সময়ে বর্ণভেদ প্রথার নিয়ম ও ব্রাহ্মণের অত্যাচার যার-পর-নাই কঠোর ছিল। সে যাই হোক্, এই কঠোরতাই অপ্রতিবিধেয় অধঃপতনের প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

প্রথমত ব্রাহ্মণদের অত্যাচার। তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ নিয়মব্যবস্থা হইতেই প্রকাশ পায় যে, প্রাচীন প্রথার সকল নিয়ম পরিপালিত হইত না। যেমন বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণেরা হিন্দুদের স্কন্ধে আর্য্যদের প্রথা সকল চাপাইয়া দিয়াছিল, তেমনি আবার তাহারা হিন্দুদের প্রথা সেই সকল নব্যজাতির উপর চাপাইয়া দিল যাহারা বর্ব্বরদিগের আক্রমণের পরে গড়িয়া উঠে। কিন্তু যে সকল অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে কতকগুলি ছিল প্রাচীন, কতকগুলি খুব আধুনিক, কতকগুলি মহৎভাবসূচক ও সুনীতিমূলক, এবং অধিকাংশ হাস্যজনক, জঘন্য, এমন-কি পাপাবহ; এবং এই বৈচিত্র্য হইতেই সংশয়বাদ উৎপন্ন হইল; অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সংশয়বাদ শিক্ষিত ও ধনশালী ব্যক্তির মধ্যেই বদ্ধ ছিল; ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হইল।

পক্ষান্তরে, বর্ণগুলি ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত হওয়ায় সমস্ত বর্ণভেদপ্রণালীরই অবনতির পথ প্রস্তুত হইল। যে সকল প্রাচীন বর্ণ সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং যে সকল বর্ণের অনুরূপ সামাজিক শ্রেণীভেদও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—রাষ্ট্রবিপ্লবে ও বৈদেশিক প্রভাবে, খণ্ডাংশে বিভক্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না।

কিন্তু মধ্যযুগের অরাজকতায়, অসংখ্য নূতন বর্ণের উদ্ভব হইল; তাহাদের মধ্যে না-ছিল কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম—না-ছিল কোন নির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহার; তাহারা যেন হঠাৎ গজাইয়া উঠিয়াছিল। আজিকার দিনেও এমন অনেক বর্ণ আছে—যাহার অন্তর্ভূত লোকসংখ্যা খুবই কম; তন্মধ্যে অনেকগুলি শীঘ্রই লোপ পাইবে; এবং কতকগুলি পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছে। প্রধান বর্ণগুলিও এইরূপ বিভক্ত হইয়া এই প্রকারেই বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু এই ক্রমবিকাশের পর্য্যালোচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকারভুক্ত। এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, মধ্যযুগ হইতেই বর্ণভেদপ্রণালীতে 'ভাঙ্গন' ধরিয়াছে। এই বিষয় সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার দরুণ, মধ্যযুগের কার্য্যটা ভাল করিয়া কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু এই বিশৃঙ্খলাই মধ্যযুগের কার্য্যসিদ্ধ করিয়াছে। আরও কিছুকাল পরে, আমরা দেখিতে পাইব, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভারতীয় সমাজ রূপান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু এই প্রভাবের ফল সমাজের উপর প্রকটিত হইবার পূর্ব্বেই বর্ণগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের পরিণাম—বৈদেশিকের আক্রমণ, নূতন নূতন জাতির,—নূতন নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব,

সামন্ততন্ত্র, ইসলাম, ও মোগল-শাসনের আবির্ভাব।

***

এক্ষণে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে একটা তুলনা গ্রহণ করা যাক্; তাহা হইলে আমরা ভারতীয় মধ্যযুগের বিশেষ লক্ষণটি আরও ভাল করিয়া ধরিতে পারিব। উহার মধ্যে সমান্তরাল-ধারায় দুইটি ক্রিয়ার কার্য্য কি উপলব্ধি করা যায় না?—একটি 'গড়ন' আর একটি 'ভাঙ্গন'? যেমন একদিকে বর্ণগুলির খণ্ডবিভাগে প্রাচীন সমাজের বিনাশ সূচিত হইতেছে, তেমনি আর একদিকে, একতার দিকে প্রবণতা, ও ভারতীয় একজাতি-সংগঠন, নবসমাজের বিকাশ সূচিত করিতেছে। তা ছাড়া, মধ্যযুগে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে, গঠনোযোগী সমস্ত উপাদানই বিদ্যমান ছিল, এবং ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণতা সম্পাদনের পক্ষে যে একটি প্রধান উপাদানের অভাব ছিল—য়ুরোপীয় সভ্যতাই সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য উদ্যত।

তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, প্রাচীন সমাজের ভাঙ্গনের কাজ এত ধীরে ধীরে সাধিত হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে সেই দেহগঠনের কথা একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি,—যে সকল জীবদেহ পৃথক্কৃত কোষাণুর দ্বারা গঠিত নহে, পরন্তু এরূপ সদৃশ কোষাণুর দ্বারা গঠিত যাহারা আপনাদিগকে খণ্ডিত করিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু উৎকৃষ্ট দেহগঠনের জরা ও মৃত্যু, সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষীকৃত কোষাণুদিগের অন্তর্ধানেই সম্পাদিত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে কতকগুলি নিকৃষ্ট দেহ-গঠনে, জরা অজ্ঞাত এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা ব্যতীত তাহার মৃত্যু হয় না। সেইরূপ ভারতীয় বর্ণভেদ প্রণালীর ন্যায় আদিম ধরণের একটি সামাজিক দেহ-গঠনও, বহুশতাব্দীর অবনতির পর, বিভিন্ন অসংখ্য হেতুর প্রভাব ব্যতীত কখনই সহসা অন্তর্হিত হইতে পারে না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চড়ক বা নীলপূজার মূলতত্ত্ব

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসের প্রমাণ)

মহাবিষুবসংক্রান্তিতে 'চড়কপূজা' হওয়ার কথা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। একসময় এই চড়ক পূজায় বিশেষ ধূমধামই হইত। দুর্গাপূজার সময় যেমন ঢাকের বাদ্যে পল্লীগ্রাম সকল প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে চড়কপূজার সময়ও তদ্রূপ পল্লীগ্রাম সকল ঢাকের বাদ্যে প্রতিধ্বনিত হইত এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে হরগৌরী নৃত্যে ও সঙ্গীতে প্রমোদোন্মাদিত হইত। চড়কপূজার এই আভাসমাত্র শুনিয়া হরগৌরীর সহিতই যে চরকপূজার প্রধান যোগ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার মূল ইতিহাস উদ্ধার

তেমন সহজসাধ্য নহে। বহু প্রাচীন কালের উৎসব বলিয়া কালের বিচিত্র পরিবর্ত্তনের দ্বারা ইহাতে বিচিত্র রূপান্তর সঙ্ঘটিত হওয়ায় ইহা এরূপই জটিলাকার ধারণ করিয়াছে যে বৃদ্ধের রূপ দেখিয়া তাহার শৈশব রূপের অনুমান করা যেরূপ দুঃসাধ্য ইহার বর্ত্তমান রূপ দেখিয়া আদিরূপের কল্পনাও সেরূপই দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা চড়ক উৎসবের আদিরূপের সন্ধান করিতেই ব্যাপৃত হইব।

উৎসবটী যদিও 'চড়কোৎসব' নামে প্রসিদ্ধ—শাস্ত্রে কিন্তু 'চড়ক' বলিয়া কোন উৎসবের নাম পাওয়া যায় না বা ইহার কোন বিধানও দৃষ্ট হয় না। মহাবিষুব বা চৈত্র সংক্রান্তিতে আমরা নীল লোহিত নামক দেবতার পূজার বিধানই মাত্র প্রাপ্ত হই। এস্থলে এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি শব্দকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত হইতেছে:—

চৈত্রেমাসি তস্য ব্রতবিধানং যথা:—

"চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্য্যান্ নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ।
স্নাত্বাত্রিসন্ধ্যং রাত্রৌচ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে নীললোহিতে।
উপোষ্য হুত্বা সংক্রান্ত্যাংব্রতমেতৎ সমর্পয়েৎ॥"

ইতিমাসকৃত্যে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্।

চৈত্রমাসে নীললোহিতের ব্রতের বিধান আছে যথা বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে—"সংযতেন্দ্রিয় ও হবিষ্যাশী হইয়া ত্রিসন্ধ্যা ও রাত্রিতে স্নানকরতঃ নৃত্য গীত ও বিশেষ আমোদের দ্বারা চৈত্রমাসে শিবের উৎসব করিবে। ভগবান্ নীললোহিত প্রসন্ন হইলে কি লাভ না হয়? সংক্রান্তিতে উপবাসী থাকিয়া যজ্ঞ সম্পাদনকরতঃ ব্রতের উদ্যাপন করিতে হয়।"

এখানে 'নীললোহিত' যে শিবকে বুঝাইতেছে তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি। অভিধানেও আমরা শিবপর্য্যায়ে 'নীললোহিত' নাম প্রাপ্ত হই। এই নীললোহিত দেবতার নাম হইতেই যে চড়কপূজার 'নীল-পূজা' নাম হইয়াছে তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

চড়ক পূজার যে বিধান উপরে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে যেমন নৃত্যগীতাদির প্রকরণ দেখা যায়—তেমনই সবিশেষ নিষ্ঠাও যজ্ঞের প্রকরণও দেখা যায়। ইহাতে চড়কপূজা যে মূলে বৈদিক ক্রিয়া ছিল তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এই পূজার অনুষ্ঠান চৈত্রমাস ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকায় ইহা যে কেবল বিষুব-সংক্রান্তিরই উৎসব নহে পরন্তু বসন্তঋতুরই উৎসব তাহাই আমাদের নিকট প্রতীতি হয়। চৈত্রমাস যে বসন্ত ঋতুর অন্তর্গত তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। শব্দকল্পদ্রুমে 'চৈত্র বৈশাখৌ বসন্তঃ' বলিয়া চৈত্রমাসকে বসন্তঋতুর প্রথমমাস রূপেই গণনা করা হইয়াছে।

আমরা নীললোহিতদেবতার উপরি উদ্ধৃত পূজা বিধানে যে হোমের উল্লেখ পাইয়াছি তাহা হইতেই নীললোহিতরূপ-বিকাশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতে পারি। বসন্তকালে চতুর্দ্দিকে সুনীল আকাশ যখন শোভা পাইত তখন উন্মুক্ত স্থানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে চতুর্দ্দিকের নীলবর্ণ আকাশ ও মধ্যস্থিত রক্তবর্ণ অগ্নি এই উভয়ের যোগে যে নীললোহিতরূপ প্রকটিত হইত তাহাই নীললোহিত দেবতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র অগ্নিরই বিকাশ শিব আবার রুদ্রের বিকাশ। এই প্রকারে শিবও অগ্নিরই বিকাশ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত নীল-লোহিতহোমাগ্নি শিব হইয়াছেন। বেদে

রুদ্র বজ্রাগ্নিরই নাম। বজ্র মেঘ হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং মেঘের নীলবর্ণ ও বজ্রাগ্নির রক্তবর্ণ হইতেও, রুদ্র বা শিবের নীললোহিত নাম উৎপন্ন হইতে পারে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ইহার শিখা হইতে যখন ধূম নির্গত হয় তখন ধূমের কৃষ্ণবর্ণবশতঃ ইহার যোগে বেদে অগ্নি 'নীলকণ্ঠ' রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অগ্নি রক্তবর্ণ বলিয়া তাহার নীলকণ্ঠ যোগে "নীল-লোহিত" নাম বিশেষরূপেই খাটে। অগ্নির ধূম্রময় রূপ হইতে শিব যেমন 'নীলকণ্ঠ' হইয়াছেন তেমনই তাঁহার রক্তবর্ণ রূপ হইতেও শিব 'নীললোহিত' হইয়াছেন। এই প্রকারে যেরূপেই হউক অগ্নির বিকাশ বলিয়াই যে শিবের নাম 'নীললোহিত' হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। নীললোহিত পূজা বসন্তকালে বিহিত হওয়ায় বসন্তের নীল আকাশের সহিত রক্তবর্ণ অগ্নির যোগে শিবের নীললোহিত নামটী যে এই বিশেষ স্থলে বিশেষরূপেই উপযোগী হইয়াছে তাহাও আমরা পরিষ্কার ভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

বসন্ত সমাগমে প্রকৃতিরূপে যেমন নব-জীবনের সঞ্চার হয় জীব রাজ্যে তেমনই নব-জীবনের সঞ্চার হয়। নৃত্যগীতাদি ইহারই ফল। নীললোহিত-পূজার নৃত্যগীতোৎসবে এই নবজীবনের ভাবই আমরা প্রতিফলিত দেখিতে পাই। বসন্তের সহিত এই প্রকারে কেবল যে নৃত্যগীতোৎসবেরই যোগ দেখা যায় তাহা নহে কিন্তু ইহাতে দোলা বা দোলন উৎসবের যোগও দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত হইয়াছে বসন্তে বর্ণনীয়ানি যথা :—

"সুরভৌ দোলা কোকিল মারুত সূর্য্যগতি
তরুদলোদ্ভিদাঃ।
জাতীতর পুষ্পচয়াম্র মঞ্জরী ভ্রমর ঝঙ্কারাঃ॥"

ইতিশব্দকল্পদ্রুম ধৃত কল্পলতায়াং প্রথমস্তবকঃ।

বসন্ত ঋতুর বর্ণনীয় বিষয় যথা—"বসন্তকালে দোলা কোকিল সূর্য্যগতি (উত্তরায়ণ গতি), বৃক্ষের নবপত্র বিকাশ, জাতি ভিন্ন পুষ্প সকল, আম্রমুকুল, ভ্রমরঝঙ্কার (বর্ণনীয়)।"

পুরাণে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গের যে আখ্যান পাওয়া যায় তাহাতে আমরা বসন্ত ঋতুরই বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাই যথা :—

"শম্ভুং সমাসাদ্য বিবিক্তরূপী।
তস্থৌ বসন্তং বিনিযোজ্য শশ্বৎ॥"

কালিকাপুরাণ ৯ম অধ্যায়।

"অনন্তর মদন শিবসমীপে গমনপূর্ব্বক বসন্তকে সতত নিযুক্ত রাখিয়া প্রচ্ছন্ন রূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

বসন্তের কামোত্তেজনা দ্বারা শিবের আসঙ্গ স্পৃহা বলবতী হইলে তিনি দক্ষকন্যা সতীর সহিত পরিণীতা হন। সতীর বর্ণ পুরাণে "মসৃণ নীলাঞ্জন শ্যাম" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

"স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন শ্যাম শোভয়া শোভসে হর।
দাক্ষায়ণ্যাযথাচাহং প্রাতিলোম্যেন পদ্মযা॥"

কালিকাপুরাণ ১১শ অধ্যায়।

"মহেশ্বর! বর্ণবৈপরীত্যে আমি যেমন কমলা যোগে শোভা পাইতেছি, সেইরূপ তুমিও সেই স্নিগ্ধ নীলাঞ্জনশ্যামলা দাক্ষায়ণীর সংসর্গে শোভা পাইতেছ।"

দক্ষ একজন প্রজাপতি। তাঁহার নাম বেদেও পাওয়া যায়। সুতরাং শিবের দক্ষ কন্যা বিবাহ আখ্যানটী যে বহু প্রাচীন তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

এক্ষণে শিবের দক্ষকন্যা বিবাহটী প্রকৃত কি ব্যাপার তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। ইহা আমাদের নিকট উত্তরকুরুতে

শীতকালের ছয়মাস অস্তমিত থাকার পর বসন্তকালে প্রথম সূর্য্যোদয়ের রূপক বলিয়াই বোধ হয়। শীতকালে সূর্য্য দক্ষিণায়ন গতিতে বিষুবরেখার নিম্নগামী হইয়া উত্তরকুরুতে সম্পূর্ণ অস্ত প্রাপ্ত হইলে আকাশ ভাগ হিমানী দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বত্র অন্ধকার পরিব্যাপ্ত থাকিত বলিয়া তখন তথায় ইহার প্রকৃত বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত না। সূর্য্যের পুনর্ব্বার উত্তরায়ণ গতির সঙ্গে সঙ্গে যখন শীতের পর বসন্তকালের আবির্ভাব হইতে থাকে তখন আকাশ হইতে নীহারজাল অন্তর্হিত হইয়া আকাশ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয় ও স্বাভাবিক গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে। চৈত্র মাসে আকাশ নিরন্তর এইরূপই পরিচ্ছন্ন থাকে যে এমন কি রাত্রিতেও চন্দ্রকে নীহারাচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন :—

"কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীৎ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেষয়োঃ।
হিমনির্ম্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব ॥"

এই সময়ে সূর্য্য উত্তরায়ণ গতিতে বিষুবরেখায় আসিয়া উপস্থিত হইলে উত্তরকুরুতে তাহাকে শীতকালের ছয় মাসের পর প্রথম উদিত দেখা যাইত। বসন্তের সুনির্ম্মল নীলাকাশে অরুণোদয় ইহাই শিবের সহিত সতীর পরিণয়। নীলবর্ণ আকাশ ও রক্তবর্ণ প্রভাত সূর্য্যের যে যুগল মিলন তাহাই "নীললোহিত" রূপ। এই প্রাকৃতিক ব্যাপারের দ্বারা পৌরাণিক শিবসতী পরিণয়ের ব্যাখ্যা করিলে আমরা অতি সুন্দর ব্যাখ্যাই প্রাপ্ত হইব। উত্তরকুরুতে শীতকালের অস্তমিত সূর্য্যই ধ্যানস্তিমিত শিব। বসন্ত কালের সুনীল আকাশই সতী। বসন্ত সমাগমে আকাশের যে নির্ম্মলতা হইতে থাকে তাহাই সতীর জন্ম ও বৃদ্ধি। বসন্তের প্রাদুর্ভাবে সূর্য্য যে ক্রমে বিষুবরেখার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন তাহাই বসন্তের প্রভাবে শিবের ধ্যানভঙ্গ ও তাঁহার সতী পরিণয়ের ব্যগ্রতা। তৎপর বিষুবরেখায় সূর্য্য উপস্থিত হইয়া যে সুনীল গগনে রক্তবর্ণে প্রথম প্রকাশিত হন তাহাই সতীর পরিণয় এবং উভয়ের একত্র যোগই 'নীললোহিত' মূর্ত্তি। এখানে নীললোহিতের আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি পুরাণেও যে এতদনুরূপ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় তাহা নিম্নোক্ত স্কন্দ পুরাণের 'নীললোহিত' নামের নির্ব্বচন পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে :—

"নীলং যেন মমাঙ্গন্ত রসাক্তং লোহিতং ত্বিষা।
নীললোহিত ইত্যেব ততোঽহং পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
বোম্বে মুদ্রিত ভানুজি দীক্ষিত টীকাসমন্বিত
অমরকোষটীপ্পনীধৃত মুকুটটীকা।

"যেহেতু আমার নীল অঙ্গ প্রভাদ্বারা লোহিতবর্ণ রঞ্জিত হইতেই আমি "নীললোহিত" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছি।"

এস্থলে নীলবর্ণ আকাশ প্রথমোদিত লোহিতবর্ণ সূর্য্য কিরণের দ্বারা রক্তিমাভ হইলে যেরূপ হয়—সেই প্রকার রূপেরই যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহার সহিত পুরাণের সতীশিব সংযোগের বর্ণনা মিলাইলে অতি সুন্দর সাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে :—

"হরস্ত পুরতোরেজে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনপ্রভা।
চন্দ্রাভ্যাসেহঙ্কলেখেব স্ফটিকোজ্জ্বল বর্ষ্মণঃ॥" ১৮
কালিকাপুরাণ ১০ম অধ্যায়।

"স্ফটিকোজ্জ্বল মহাদেবের সমীপে সেই স্নিগ্ধ

ললিতাঞ্জনসমপ্রভা দাক্ষায়ণী চন্দ্রমধ্যে কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

দক্ষকন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহের বিবরণ যেমন আমরা পুরাণে প্রাপ্ত হই ত্বষ্টৃকন্যা সরণ্যুর সহিত সূর্য্যের বিবাহের বৃত্তান্তও আমরা তেমনই বেদে দেখিতে পাই যথা :—

"ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি॥" ১

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল—১৭ সূক্ত।

"ত্বষ্টানামক দেব আপন কন্যার (সরণ্যুর) বিবাহ দিতেছেন। এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল।"

ইহা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে পৌরাণিক শিবের দক্ষকন্যা সতীর বিবাহ আখ্যায়িকা বৈদিক সূর্য্যের ত্বষ্টৃকন্যা সরণ্যুর বিবাহ আখ্যায়িকারই অনুকরণে কল্পিত কিন্তু অনুকরণ বলিলে ঠিক হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। এক বৈদিক আখ্যায়িকাই সূর্য্য স্থলে শিব ও সরণ্যু স্থলে সতী নামের পরিবর্ত্তন দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে বলিলেই ঠিক হয় বলিয়া আমরা মনে করি। এই নাম পরিবর্ত্তনও যে কেবল কল্পনা বলে হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু স্বাভাবিক বিকাশসূত্রেই হইয়াছে। বস্তুতঃ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সূর্য্যই যে ক্রমে শিবে পরিণত হইয়াছেন তাহা পরিষ্কার রূপেই উপলব্ধি করা যায়। রুদ্রই শিবের বৈদিক আদিরূপ। একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমরা 'বৈবস্বত' ও 'সবিতা' নামে সূর্য্যকে অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই। শিব 'অষ্টমূর্ত্তি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সূর্য্যকে তাঁহার

অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম মূর্ত্তিরূপে পরিগণিত দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

"পৃথিবী সলিলং তেজোবায়ুরাকাশমেবচ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সোমরাজী চেত্যষ্টমূর্ত্তয়ঃ॥"

"পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, ও যজমান এই অষ্টমূর্ত্তি॥"

এই অষ্ট মূর্ত্তির বর্ণনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে শিব যখন প্রাধান্য লাভ করিলেন তখন তিনি সমস্ত দেবতাকেই নিজের মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়া লইলেন। এইরূপেই তিনি 'মহাদেব' ও 'মহেশ্বর' হইয়াছেন। অপর দেবতার সঙ্গে তিনি যেমন সূর্য্যকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন তেমনই সূর্য্যের দক্ষকন্যা বিবাহের রূপকটীও আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন।

সতীর দেহত্যাগের পর শিবের হিমালয় কন্যা পার্ব্বতীর পরিণয় ব্যাপারে শিবের পৌরাণিক রূপ পরিহার পূর্ব্বক তান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহণেরই যেন ইতিহাসসূত্র ধরিতে পাওয়া যায়।

সতীতে আমরা বৈদিকধর্ম্মেরই মূর্ত্তি দেখিতে পাই। তিনি যে দক্ষযজ্ঞে দেহ ত্যাগ করেন, তাহাতে বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কারেরই আভাস পাওয়া যায়। জটিল যজ্ঞ পদ্ধতির স্থলে সরল পূজাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন ইহাই সেই সংস্কার। এই প্রকারে সতীকে আমরা বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের সন্ধিস্থলরূপিনী দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং শিব সতী রূপে যে আমরা বৈদিক সূর্য্যাকাশ রূপই প্রতিভাত দেখিব তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আমরা বিস্তর যে 'নীলমাধব' নাম

প্রাপ্ত হই তাহাও উত্তর কুরুবাসী আর্য্যদিগের নিকট বসন্তকালের সূর্য্যোজ্জ্বল আকাশ দৃশ্যের ইতিহাসই আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে। মাধব শব্দ মধু শব্দ হইতে উৎপন্ন। মধু শব্দের অর্থ বসন্ত বা চৈত্রমাস। সুতরাং মাধব শব্দের অর্থ বসন্তকালের বা চৈত্রমাসের দেবতা। ইহার 'নীল' বিশেষণের দ্বারা ইনি যে নীলবর্ণ আকাশের দেবতা তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এই "নীলাকাশ দেবতা" আমরা বসন্তকালে বা চৈত্রমাসে নীলাকাশে লক্ষিত সূর্য্য বলিয়াই বুঝি। সূর্য্য ও বিষ্ণু যে অভিন্ন তাহা "তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—"জ্ঞানিগণ বিষ্ণুর সেই পরম স্থান আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন," এই প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্র হইতেই প্রমাণিত হয়।

'নীললোহিত,' ও 'নীলমাধব' শিবও বিষ্ণুবাচী হইলেও এই প্রকারে বসন্তকালীন সূর্য্যেরই নামান্তর হইতেছেন। এই তত্ত্বটী স্মরণ রাখিলে আমরা যেমন নীলপূজার প্রকৃত রহস্যোদ্ভেদে সমর্থ হইব—তেমনই দোলোৎসব প্রভৃতি অপর উৎসবের রহস্যোদ্ভেদেও সমর্থ হইব।

নীলপূজা সাধারণতঃ চড়ক নামেই প্রচলিত। একটী গাছের মাথায় আড়াআড়ি ভাবে কাষ্ঠখণ্ড জুড়িয়া ঘুরান হয় তাহাকেই 'চড়ক' বলে বা চড়ক ঘুরান বা গাছ ঘুরানও বলে। পূর্ব্বোক্ত চড়কে ঝুলিয়া যেমন গাছের চারিদিকে ঘুরা হয় তেমনই মাটীতে থাকিয়াও গাছের চারিদিকে

চড়কোৎসবটী যে বহু প্রাচীন বসন্তোৎসবেরই লুপ্তাবশেষ; শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশের May Pole বা বসন্তযূপ নামক সুপরিচিত বসন্তোৎসবের বর্ণনা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এস্থলে আমরা ইংরেজী হইতে May Poleএর একটী বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"According to Bourne, the after part of May-day, was chiefly spent in dancing round a tall pole, which is called a May-Pole, which being placed in a convinient part of the village, stands there as it were consecrated to the goddess of flower without the least violation offered to it in the whole circle of the year."

Ref. Hone's Everyday Book-Beeton's Dictionary of Universal Information.

"বৌরণের বর্ণনানুসারে বসন্তোৎসবদিবসের শেষাংশ "বসন্তযূপ' নামক উচ্চযূপের চতুর্দ্দিকে নৃত্যে অতিবাহিত হইত। এই যূপ গ্রামের সুবিধাজনক অংশে স্থাপিত হইয়া তথায় বসন্তদেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত হইয়াই যেন দণ্ডায়মান থাকে। সমগ্র বৎসরাবর্ত্তনের মধ্যে ইহার পবিত্রতা অণুমাত্রও লঙ্ঘিত হয় না।"

পাশ্চাত্য পূর্ব্বোক্ত May Pole উৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইংরেজীতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

The celebration of Mayday probaly had its origin in the worship of Flora, who was supposed to be the goddess of flower, and whose rites were solemnized at that season by the ancients. The earliest notice of the celebration of Mayday in this country was by the Druids, who used,

to light large fires on the summits of hills in honour of the return of spring" Ibid.

"বসন্তদিবসের উৎসব সম্ভবতঃ ফ্লোরা নামক পুষ্প-দেবীর পূজা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহার পূজাবিধান সকল প্রাচীন লোকেরা এই ঋতুতেই (পুষ্পঋতুতে) সম্পাদন করিতেন। ইংলণ্ডে বসন্তদিবস উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান ড্রুইডদিগের দ্বারাই করা হইত। ইঁহারা বসন্তের প্রত্যাবর্ত্তনকে অভিনন্দিত করিবার জন্য পাহাড়ের উপরে বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন।"

পাশ্চাত্য বসন্তযূপোৎসবের পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে বসন্তযূপই যে চড়কের আদি রূপ তাহা বুঝিতে পারা যায়। বসন্ত কালে বিষুবরেখায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর সূর্য্য দর্শনের অত্যুৎকট আনন্দ হইতেই যে এই উৎসবের উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই অনুমিত হয়। আমরা নীল পূজায় যে যজ্ঞবিধির উল্লেখ পাইয়াছি ড্রুইডদিগের বহ্ন্যুৎসব তাহার নিদর্শ বলিয়াই যেন মনে হয়। বিশেষতঃ আমরা May Pole উৎসবের যূপটীকে যে পবিত্র বলিয়া উল্লেখ পাইয়াছি তাহাতে চড়ক গাছটী যে যজ্ঞীয় যূপেরই রূপান্তর তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। ড্রুইড্গণ যেরূপ ভীমরূপী পুরোহিত শ্রেণী ছিলেন—সেইরূপ পুরোহিত যোগেই চড়ক পূজায় সন্ন্যাসী সংগ্রহ হওয়া অসম্ভাবিত নয়।

চড়ক উৎসবে আমরা বেত্রহস্তে নর্ত্তনের উল্লেখ শাস্ত্রে পাই যথাঃ—

"চৈত্রমাস্যথমাঘেবা যোহর্চ্চয়েৎ শঙ্করং ব্রতী।
করোতিনর্ত্তনং ভক্ত্যা বেত্র পাণির্দ্দিবানিশম্॥
মাসং বাপ্যর্দ্ধমাসং বা দশসপ্তদিনানিবা।
দিনমানং যুগং সোঽপি শিব লোকে মহীয়তে॥
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডম্।

"যে ব্রতপালনকারী চৈত্র অথবা মাঘমাসে ভক্তির সহিত শঙ্করের পূজা করে ও বেত্রহস্ত হইয়া একমাস, অর্দ্ধমাস, দশ বা সপ্তদিন, দিবারাত্র নর্ত্তন করে তিনি দিনসংখ্যক যুগকাল শিবলোকে পূজিত হইয়া থাকেন॥"

বর্ত্তমান চড়কোৎসবেও বেত্রের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বসন্তোৎসবেও আমরা তদ্রূপ বৃক্ষশাখা লইয়া নর্ত্তনের বিবরণ প্রাপ্ত হই যথা ঃ—

Many of the rites, such as pulling off branches adorning them with nosegays and crowns of flowers, dancing rouud a Pole decked with garlands had no doubt their origin in the heathen observance practised in this season in honour of Flora, the goddess of flowers."

National Encyclopwdia.

"বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া উহাদিগকে পুষ্পস্তবক ও পুষ্পমাল্যে ভূষিতকরতঃ যূপের চতুর্দ্দিকে নর্ত্তন প্রভৃতি বহুবিধ অনুষ্ঠানেরই মূল যে এই ঋতুতে পুষ্পদেবী ফ্লোরার পূজার জন্য অনুষ্ঠিত পৌত্তলিকদিগের ক্রিয়াকলাপে নিহিত রহিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।"

এখানে বসন্ত যূপোৎসবটীকে পৌত্তলিক ধর্ম্মমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে ইহার বহু প্রাচীনত্বই সংসূচিত হইতেছে; এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয়দিগের মধ্যে এই উৎসবের সবিশেষ সৌসাদৃশ্য সন্দর্শনে ইহা যে আর্য্যদিগের উত্তরকুরুতে একত্রাবস্থানের সময়ই পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহাও সংসূচিত হইতেছে।

চড়কোৎসবে আমরা যে চড়ক ঘুরিতে দেখি ইহাকে আমরা চক্রেরই রূপান্তর বলিয়া মনে করি। কারণ চড়ক শব্দ আমাদের নিকট 'চক্র' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। সূতাকাটার যন্ত্র চর্কাও এই চক্র শব্দেরই অপভ্রংশ। সংস্কৃত ব্যাকরণে

বর্ণ বিপর্য্যয়ের যে নিয়ম আমরা দেখিতে পাই—তাহার দ্বারাও এরূপ অপভ্রংশ ব্যাখ্যাত হইতে পারে। চড়ক শব্দও চর্‌কা শব্দেরই ন্যায় চক্র শব্দেরই অপভ্রংশ। চড়ক শব্দটীকে আমরা বরঞ্চ চর্‌কা শব্দ অপেক্ষা চক্র শব্দের অধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়াই মনে করি। চর্‌কা শব্দে একটী আকার বেশী কিন্তু চড়ক শব্দে যেরূপ কোন আকার বেশী নাই তবে 'র'স্থানে 'ড়'হইয়াছে ইহাই যা বৈষম্য। অপভ্রংশস্থলে এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। পাশ্চাত্যভাষায় চক্রের অর্থবাচক যে সার্কল্ (circle) শব্দ পাওয়া যায়, ইহাকে 'চক্র'শব্দেরই অপভ্রংশ মনে করা যাইতে পারে। 'চক্রশব্দের' রকারটীর স্থান এস্থলে 'ক'কারের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াই এই রূপান্তর ঘটিয়াছে। ইহা হইতে 'চক্র' শব্দের বর্ণবিপর্য্যয়ে কিপ্রকারে অপভ্রংশ 'চড়ক' ও 'চর্‌কা' শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে তাহার স্পষ্ট নিয়মই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

এই চড়ক বা চক্রকে আমরা সূর্য্যেরই রূপক বলিয়া মনে করি, কারণ সূর্য্য মণ্ডলাকার বলিয়া ইহা 'চক্রাকার' বা 'চক্ররূপ' বলিয়াই বর্ণনা করা যাইতে পারে। বিষুবরেখায় সূর্য্য যখন উত্তরায়ণ গতিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন তখন সেই সূর্য্যমণ্ডল যে উত্তর কুরুতে উদিতরূপে দৃষ্ট হইত এবং অস্তমিত না হইয়া আকাশে পূর্ব্ব পশ্চিম ও পশ্চিমপূর্ব্বে ভ্রাম্যমান বলিয়া বোধ হইত। চড়ক তাহারই রূপক। 'চক্র' সূর্য্যের রূপান্তর হইয়াই ইহার নামান্তর বিষ্ণুরও রূপক হইয়াছে। তাহাতেই 'সুদর্শনচক্র' বিষ্ণুর অস্ত্র হইয়াছে এবং শালগ্রামচক্র বিষ্ণুর বিগ্রহ হইয়াছে।

সূর্য্যকে শীতকালের ছয় মাসের পর প্রথম দর্শন করিতেন বলিয়াই আর্য্যগণ একমাস পর্য্যন্ত তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রমোদোৎসব করিতেন চড়কোৎসব তাহারই প্রতিচ্ছায়ারূপে কল্পিত হইয়াছে।

কেবল চড়কোৎসব নহে, পরন্তু দোলোৎসব ও রাসোৎসবও আমরা এই প্রকারে প্রাগুক্তরূপ সূর্য্যোৎসবের প্রতিচ্ছায়া-রূপেই কল্পিত দেখিতে পাই। উত্তরকুরুতে বসন্ত সমাগমে সূর্য্য তথাকার আকাশে দোলায়মানরূপে পরিদৃষ্ট হইলে যে উৎসব প্রবর্ত্তিত হইত তাহা বিষ্ণুর দোলযাত্রায় পরিণত হইয়াছে। শাস্ত্রে দোলযাত্রার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে চড়কোৎ-সবের সহিত ইহার একইকাল দেখা যায় যথা :—

"চৈত্রেমাসি শীতেপক্ষে তৃতীয়ায়াংরমাপতিম্।
দোলারূঢ়ং তমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত হরিভক্তিবিলাস।

"চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে দোলারূঢ় বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিয়া কলিতে একমাস তাঁহাকে দোলাইবে।"

চড়কোৎসবও এইরূপে আমরা সমগ্র চৈত্রমাসব্যাপী বলিয়াই বিধান দেখিয়াছি।

আমরা প্রথমেই যে বসন্তকালের বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে দোলার উল্লেখ পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য বসন্তোৎসবেও আমরা দোলার উল্লেখ পাই।(১) এই দোল

(১) "And one would dance as one would spring,
Or bob or bow with leaving smiles,
"And one would swing, or sit and sing &c,"—W. Barnes.

খাওয়া বসন্তকালের একটী আমোদ। বসন্তকালের এই আমোদ হইতেই দেবতারও দোলোৎসব কল্পিত হইয়াছে ইহাই সম্ভবপর।

রাসোৎসবও যে পূর্ব্বে বসন্তকালে হইত তাহার উল্লেখ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।(২) রাসোৎসব মণ্ডলাকারে কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে গোপিকাদিগের নৃত্য। এই মণ্ডলের নাম রাসমণ্ডল বা রাসচক্র। কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে সূর্য্যের রূপান্তর বলিয়া বুঝিয়া এই মণ্ডল বা চক্র যে সূর্য্যেরই রূপক তাহা বুঝিতে পারা যায়। বসন্তকালে বিষুবরেখায় আসিয়া সূর্য্য উত্তরকুরুতে প্রথম উদিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া যে মণ্ডলাকারে নৃত্যের প্রমোদোৎসব উত্তরকুরুবাসীদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইত তাহাই রাসনৃত্যের মূল। পূর্ব্বোদ্ধৃত পাশ্চাত্য May Pole বা May day উৎসবের সহিত ইহারও বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। বর্ত্তমানের রাসোৎসব কিন্তু বসন্তকালে না হইয়া শরৎকালে হইয়া থাকে। বোধ হয় বসন্তকালে ইহার অনুরূপ দোলোৎসব হয় বলিয়া একসময়ে একরূপের দুইটী উৎসব না হইয়া দুইটী দুই ভিন্নকালে ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশেষতঃ বসন্তকালে যেমন মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে শরৎকালেও তেমনই মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং বসন্তকাল যেমন বিশেষ উৎসবের উপযোগী সময়, শরৎকালও তেমনই বিশেষ উৎসবের উপযোগী সময়।

বৌদ্ধধর্ম্মেও চড়কের ন্যায় উৎসবের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এই উৎসবের নাম বৌদ্ধদিগের মধ্যে চোড়্গ বা চোড়্। বিশ্বকোষে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ—

"তিব্বতের ভৌতিক নৃত্যের (Devil dance) কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। প্রধানতঃ এই উৎসব বৎসরের শেষদিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হিমিস্, লদাক্, সিকিম, ভোটান প্রভৃতি সকল স্থানের লামারাই এই উৎসবে যোগ দিয়া থাকেন। এই উৎসব কোথায় লো-সি স্কু-রিং আবার কোথাও চোড়্ বা চোড়্গ নামে প্রসিদ্ধ। এই চোড়্গ উৎসব বর্ষশেষে তিন চারি দিন থাকিতে আরম্ভ হয়। আরম্ভের পূর্ব্বে বহুদূরস্থিত গ্রাম হইতে জনসাধারণ দলে দলে আসিয়া উৎসব স্থানে সম্মিলিত হন। কোন বৃহৎ মঠের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে উৎসব মণ্ডপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিব্বতীয় লামাদিগের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান উৎসব। এই চোড়্ বা চোড়্গ উৎসবই বাঙ্গলায় চড়ক নামে সর্ব্বজন বিদিত। এই চড়ক উৎসবের ব্যাপার হিন্দুশাস্ত্রে নাই। ইহা বৌদ্ধকাণ্ড। ইহা বৌদ্ধপ্রাধান্য কালে তিব্বতীয় লামাদিগের মত এদেশীয় শ্রমণেরাই এই উৎসব করিতেন। তৎকালে বৌদ্ধরাজা হইতে আবাল বৃদ্ধবনিতা প্রজাসাধারণে মহোৎসাহে এই উৎসব দেখিতেন। শ্রমণেরা নানা সাজে সাজিয়া তিব্বতীয় লামাগণের মত নানা অভিনয় ও ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, মহা সমারোহে, ধর্ম্মরাজ ও মহাকালের পূজা হইত। তিব্বতে এখন তাহার পূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গে চড়কের সং ও অন্যান্য ব্যাপারে সেই প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবের ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র জাগরূক।"

বিশ্বকোষকার 'চোড়্গ' হইতেই 'চড়ক' নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমরা

(২) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ২৮ অধ্যায়।

বরঞ্চ হিন্দুদিগের 'চড়ক' হইতেই বৌদ্ধদিগের 'চোড়গ' নাম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বুদ্ধ বিষ্ণুঅবতারের মধ্যে পরিগণিত হইরাছেন। ইহাতে বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্য তাঁহাতে আরোপিত হওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক! বিষ্ণুকে আমরা সূর্য্যেরই রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই 'বিষ্ণু' নামে আমরা সূর্য্যের 'বিবস্বৎ' নামের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী তেজের অর্থই প্রকাশিত দেখি। বুদ্ধের 'অমিতাভ' নামটীতেও আমরা এইরূপ বিশ্বপ্রকাশ প্রভার অর্থই প্রকাশিত দেখিতে পাই। বুদ্ধের 'ধর্ম্মচক্র' আমাদের নিকট সূর্য্যের চক্ররূপের অনুকরণেই কল্পিত বলিয়া বোধহয়। সেই ধর্ম্মচক্রেরই রূপক স্বরূপে চড়ক পূজার অনুষ্ঠান হইত বলিয়া আমরা মনে করি। বিশ্বকোষে চোড়গে 'ধর্ম্মরাজ' পূজার যে উল্লেখ আছে—সেই ধর্ম্মরাজও ধর্ম্মচক্রেরই রূপক বলিয়া বোধ হয়। 'ধর্ম্মরাজের' সহিত মহাকালের পূজার যে উল্লেখ পাওয়া যায়, এই মহাকাল আমাদের নিকট মহাদেবেরই রূপ বলিয়া মনে হয়। এই প্রকারে চোড়গে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় দেবতারই সংমিশ্রণ হইয়াছে।

আমরা বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে জগন্নাথের রথোৎসবের ন্যায় রথোৎসব দেখিতে পাই—তাহাও সূর্য্য বা বিষ্ণুর চক্রেরই অনুকরণে কল্পিত।

প্রাগুক্ত পর্য্যালোচনা সকল হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে নীল বা চড়ক পূজায় বৈদিক, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম মতেরই সংমিশ্রণ হইয়াছে। কিন্তু এবংবিধ সংমিশ্রণের মধ্যেও বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে পূজার মূলতত্ত্বটীকে আমরা পরিষ্কার রূপেই প্রতিভাত দেখিতে পাই।

ছয় মাস অদর্শনের পর উত্তরায়ণ গতিতে সূর্য্য বসন্তকালে বিষুবরেখায় আসিয়া উত্তরকুরুতে প্রথম উদিত হইলে যখন নীলাকাশে তাঁহার তরুণঅরুণচ্ছবি দর্শন করিয়া উত্তরকুরুবাসী আর্য্যগণ তাঁহার জবাকুসুম সঙ্কাশ" রূপকে অভিনন্দন ও অর্চ্চনা করিবার জন্য হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন তখন নীল আকাশের উপর রক্তবর্ণ সূর্য্যে যেমন নীললোহিত দেবরূপ প্রকটিত হইত তেমনই নীল আকাশের তলে রক্তবর্ণ হোমাগ্নিতেও নীললোহিত দেবরূপ প্রকটিত হইত। তখন যূপকাষ্ঠের উপর আকাশে একদিকে চক্রাকার সূর্য্য বিরাজিত হইতেন। —অন্যদিকে যূপকাষ্ঠের সন্নিকটে যজ্ঞস্থলে অগ্নিরূপী শিব বিরাজিত হইতেন।

এই প্রকারে উত্তরকুরুবাসী আর্য্যদিগের নিকট শীতকালে ছয়মাস অস্তমিত থাকার পর বসন্তকালে সূর্য্যের প্রথম উদয়ে তাঁহার অভিনন্দনের জন্য যে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মোৎসব হইত চড়ক ও নীল পূজায় যে তাহারই নিদর্শন স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুগণ সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

লাইকা

(১৪)

ঊষার শীতল বায়ু স্পর্শে লাইকার মূর্চ্ছা বা নিদ্রা ভাঙ্গিল। সে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, তাহার স্মরণ হইল যে সে সমস্ত রাত্রি এই মাঠেই কাটাইয়াছে। এজন্য তাহার কোন ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার প্রিয় বন্ধু দেবীপ্রসাদের মাতা তাহার অদর্শনে হয়ত অযথা চিন্তিত হইবেন এই আশঙ্কায় সে কিছু উদ্বিগ্ন হইল।

আলস্য ত্যাগ করিয়া লাইকা উঠিল। পূর্ব্বাকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ মৃদু রক্তাভায় রঞ্জিত, মধ্যভাগে দিগন্তর রেখা যেন নিম্নস্থ কোন মহাজ্যোতির উজ্জ্বলতায় গভীর রক্তোজ্জ্বল। সেই দৃশ্য দেখিয়া লাইকার গত রাত্রির স্বপ্ন স্মরণ হইল।

সে প্রথমত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইল, কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন! সে কি দেখিল? যাহা দেখিল তাহাই বা কি?—

পরক্ষণেই তাহার পথশ্রান্ত ক্লান্তিবিবর্ণ মুখশ্রী আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া গেল! সে দুই হাত তুলিয়া উদয়োন্মুখ সূর্য্যরশ্মিকে প্রণাম করিয়া সেই মৃৎপ্রস্তর স্তূপ হইতে নামিয়া গেল।

পথে দেখিল দেবীপ্রসাদ আসিতেছে লাইকাকে দেখিয়া বলিল, "এই যে? আমি তোমাকেই ডাকিতে যাইতেছিলাম। কাল বাড়ীতে রাখালের নিকট শুনিলাম তুমি টিলার উপর বসিয়া গান করিতেছিলে, সেই জন্য আর তোমায় বিরক্ত করিতে আসি নাই, ভাল আছ ত লাইকা?

"ভাল থাকিব না ত কি হইয়াছে আমার"? —উচ্চ হাসিয়া লাইকা বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করিল। দেবীপ্রসাদের এই স্নায়বিক পীড়াটি অত্যন্ত প্রবল ছিল,—সে সহসা এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া মহা বিব্রত হইল, এবং বন্ধুর এই হাস্যপ্রবণতার কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়কাতর ভাবে বলিল,—"ছাড়িয়া দাও,—ও লাইকা তোমার আজ কি হইয়াছে ভাই, সকাল বেলায় এত হাসিতেছ কেন— সমস্ত দিন এই রকমে কাটাইবে নাকি?— ছাড় ছাড়—তোমার পায়ে পড়ি ভাই,—"

লাইকা তাহাকে দুই হাতে উপরে তুলিয়া মাথা টপ্‌কাইয়া উল্টাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া উচ্চ হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল—পরে বিস্ময় বিমূঢ় দেবীপ্রসাদ উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

সেদিন মহানন্দে লাইকা দেবীপ্রসাদের মাতৃদত্ত অন্নাদি ভোজন করিল। বন্ধুর বালক বালিকা গুলিকে লইয়া খেলা করিল এবং বন্ধুপত্নীর নিকট গিয়া দেবীর নামে দুই একটা মিথ্যাকথা বলিয়া দুইজনে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া খানিকক্ষণ খুব হাসিল। পরে শোনা গিয়াছিল পত্নীর এই মান ভাঙ্গিতে দেবীপ্রসাদকে দশ মুদ্রা ব্যয়ে একখানি

উৎকৃষ্ট রেশমী সাড়ী ক্রয় করিতে হইয়াছিল কারণ লাইকা নাকি বলিয়াছিল ঠিক্ ওইরূপ সাটীই সে বন্ধুকে কয়দিন পূর্ব্বে পাটনার বাজারে ক্রয় করিতে দেখিয়াছে!

রাত্রির আহারান্তে সকলে যখন শয়নে যাইতেছেন—তখন লাইকা দেবীকে বলিল অদ্যই উষাকালে সে অন্যত্র যাইবে। দেবী একটু ক্ষুব্ধ হইল, বলিল,—"সে কি লাইকা এই দুই দিন থাকিয়াই চলিয়া যাইবে?—কেন —আমি কি অপরাধ করিলাম?—"

"অপরাধ কি রে পাগল! ও কথা কেন বল ভাই!—তবে দেখি"—বলিতে বলিতে লাইকার মুখভঙ্গী কেমন সুকোমল হইয়া উঠিল, চক্ষুতে যেন গাঢ়ভাব দেখা গেল—সে বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখ চুম্বনে উদ্যত হইল।

সলজ্জে দেবীপ্রসাদ তাহার বেষ্টন মুক্ত করিয়া বলিল—"তোমাকে আমি পারিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা কর! কিন্তু জানিও লাইকা, এত দিন পরে আসিয়া"—

"চুপ্ চুপ্—বাধা দিস্নে—বাধা দিস্নে! ওরে দেবী তুই জানিস্ না!" দেবী বলিল "কি জানিনা বল!"

লাইকা বলিল, "জানিস না এই যে লাড়লী এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার মাতারও বড় নিদ্রা আসিতেছে—আর তিনি মনে মনে লাইকাকে গালি দিতেছেন! চল্ তুই জানিস্ না কিছু।"

দেবীপ্রসাদকে ঠেলিয়া লইয়া লাইকা তাহার শয়ন গৃহে দিয়া আসিল, বধূর তখনও আহার শেষ হয় নাই ঘরে একা দুইটি শিশু শয়ন করিয়া আছে,—দেখিয়া লাইকা বলিল, এ কি বধূ ঠাকুরাণী কোথায়? এখনও তাহার রাগ ভাঙ্গিস নাই দেবী?

দেবী কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া লাইকা বলিল,—"চুপ্ চুপ্! তোকে আর বলিতে হইবে না, আমি জানি তুই চির দিনের গর্দ্দভ! বধূ ঠাকুরাণী! বধূ ঠাকুরাণী! —বধূ ঠাকুরাণী কোথায় গেলে?"—

দেবী আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, "চুপ চুপ লাইকা! তোমার পায়ে পড়ি।"

(১৫)

প্রভাতে লাইকা চলিল। পরিচিত গ্রামপথ, সকলেই তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিতে চায়, ধরিয়া রাখিতে চায়,—হাসিয়া হাসিয়া লাইকা তাহাদের মিষ্ট সম্ভাষণ করিল, দু এক দিনের ভিতরই ফিরিয়া আসিবে আশ্বাস দিয়া সে দ্রুত চলিতে লাগিল। একদিন পথে গেল, পরদিন প্রায় সন্ধ্যায় সে রাজগৃহের নিকটস্থ এক গ্রামে উপস্থিত হইল। সহসা পরিচয় দিতে সাহস নাই, সে গ্রামপ্রান্তে এক অজ্ঞাতনাম দেবালয়ে আসিয়া থাকিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজগৃহে গমন করিবে।

গভীর রাত্রে লাইকার ঘুম ভাঙ্গিল, কেমন করিয়া সেখানে যাইবে, কি বলিবে ইত্যাদি নানা চিন্তায় তাহার মন বিহ্বল হইতেছিল; দূর হইতে যে সুখের মূর্ত্তি তাহার চক্ষে অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর বোধ হইতেছিল সেই বাঞ্ছিত বস্তুর সান্নিধ্যে তাহাকে যথেষ্ট মেঘাবৃত দেখিল!

সকল চিন্তার নাশের উপায় আছে,

একমাত্র সেই প্রিয়তমার দর্শনই সকল আঘাতের ঔষধ—কিন্তু!—

একটি প্রকাণ্ড কিন্তু লাইকার হৃদয়ে উদিত হইল। যদি সেই যত্নলালিতা রাজকন্যা—গরবিনী ভূপালনন্দিনী এই নামে মাত্র স্বামী—যে একরূপ ঘৃণাভরেই এতদিন তাহাকে ভুলিয়া আছে সেই নিষ্ঠুর স্বামী—অক্ষম দরিদ্র দীনহীন লাইকাকে দেখিয়া ঘৃণা করেন?—একমাত্র অন্তর্যামীই তাহার অন্তরের সীমাহীন সাগর তুল্য ভালবাসা দেখিতেছেন,—মানুষের চক্ষু তাহা যদি না দেখে?—

এই পঙ্কিল চিন্তায় লাইকা মরমে মরিয়া গেল! সে যাহাকে দেবী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই আঁধার ভাবনা তাহাকে কষাঘাত করিল—অতঃপর তাহার নিজের আকাঙ্ক্ষিতার ও আপনার মধ্যের এই পার্থক্য তাহাকে পীড়িত করিল, স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ঘরে সে আর থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে বায়ুর মৃদু স্পর্শ,—বৃক্ষ পাতার তরুণ মর্ম্মর,—সুকোমল সহানুভূতির ন্যায় তাহাকে আসিয়া ঘিরিল, বাহিরে আসিয়া সে অনেকটা শান্তি লাভ করিল।

তখন ভাবিয়া ভাবিয়া লাইকা স্থির করিল,—না এভাবে যাওয়া হইবে না, প্রথমত ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহার পর রাজবাটীর রাজকন্যার সমস্ত বার্ত্তা লইয়া তবে সেখানে যাইতে হইবে।—ইহাও ভাবিল যে সন্ন্যাসী বেশই সর্ব্বাংশে নিরাপদ।

সন্ন্যাসীর বেশ তাহার সঙ্গেই ছিল, মধ্যে কয়দিন দেবীর নিকটে সে বেশ ত্যাগ করিয়াছিল মাত্র। সেই রাত্রিতেই সে আবার গৈরিক ভস্মাদি গ্রহণ করিল,—যথাসাধ্য আকারেও ছদ্মভাব ধরিতে চেষ্টা করিল। প্রভাতে পথে বাহির হইয়া লাইকা দেখিল অতি পরিচিত ব্যক্তিরাও আর তাহার প্রতি ফিরিয়া দেখে না—তখন সে বুঝিল তাহার ছদ্মবেশ ঠিক্ হইয়াছে! তখন নিশ্চিন্ত মনে রাজধানীর পথ ধরিয়া চলিল!

বেলা দুই প্রহরের সময় সে নগরে প্রবেশ করিল। রাজপথ লোকারণ্য, চারিদিকে অসংখ্য প্রাসাদশ্রেণী দৃষ্টিরোধ করিয়া দাড়াইয়া আছে,—লাইকা প্রথম বিচলিত হইল, সে কোথায় চলিয়াছে? কোথায় গিয়া প্রথম দাঁড়াইবে?—সেই নগরী সেই পথ, যেখানে লাইকা পূর্ব্বে অবাধ গতিতে ভ্রমণ করিয়াছে,—আজ কিন্তু সেইখানেই তাহার মুহুর্মুহু পথভ্রান্তি হইতে লাগিল,—সে কোথায় যাইবে?—কেন যাইতেছে?—যে আশায় চলিয়াছে তাহা পূর্ণ হইবে কি না?—হায় সংসার! তোমার কোথাও কি নিশ্চিন্ততা নাই?—এত দুর্ভাবনা এত অনিশ্চয় সংশয় লইয়া পৃথিবীর মানুষ কেমন করিয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে বাস করিতেছে?—

ভাবিতে ভাবিতে লাইকা নিজের প্রাণের দুর্ব্বলতায় মনে মনে হাসিল! যথার্থ,—সে সংসারের পক্ষে এমনি অকর্ম্মণ্যই বটে! তবে ভগবানই বা এ অপদার্থকে সৃজন করিয়াছেন কেন? আর জননী ধরিত্রী দেবী—যে দীন সন্তান তাহার কোন উপকারে

আসিল না তাহার সকল ভার কেন বহন করেন?

হে সর্ব্বশক্তিমান্! অহেতুক দয়াশীল! তোমার শক্তির জয় হউক! তোমার নাম ধন্য হৌক! অধম লাইকা যেন তোমার দয়ায় অবিশ্বাসী না হয়,—কে বলে সংসার দুঃখের?

প্রফুল্ল চিত্তে সে তখন নগর চত্তরের পার্শ্বে এক বিশাল দীর্ঘিকার সোপানে আসিয়া বসিল। অনেক পথিক অনেক সন্ন্যাসী সেখানে বসিয়া আছে,—কেহবা ইটের চুল্লী জ্বালাইয়া খিচুড়ী পাকাইতেছে। জলে বালক বালিকাগণ ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া স্নান করিতেছে, গ্রামবৃদ্ধেরা কেহ জলে কেহ সোপানে বসিয়া আহ্নিক করিতে করিতে মাঝে মাঝে বালকদিগের প্রতি সঙ্কোচ দৃষ্টি করিতেছেন।

ইহারই মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া একজন প্রসন্নমূর্ত্তি নাগরিকের নিকট লাইকা বসিল। তিনি বাজার করিয়া এক প্রকাণ্ড পুঁটলী বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছেন,—সম্প্রতি কিছু শ্রান্তি দূর করিবার মানসে এখানে আসিয়া বসিয়াছেন! তাঁহার কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আলাপ ইচ্ছার ব্যগ্রভাব দেখিয়া সে বুঝিল ইহারই নিকটে তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইবার আশা আছে।—

লাইকাকে কাছে দেখিয়াই তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—"কি সাধু বাবা,—কোথা হইতে আগমন হইল, কোথায় যাইবেন?" ইত্যাদি কথায় তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে লাইকাও তাহার কথায় ব্যগ্রভাবে যোগ দিল, মনের মত মানুষ পাইয়া গল্পপ্রিয় লোকটি গৃহগমনের কথা ভুলিয়া গেল। তিনিও যে সম্প্রতি প্রয়াগধাম গিয়াছিলেন, সেখানকার পাণ্ডানীরা কিরূপ প্রচণ্ডা, গঙ্গায় জল কত অল্প—ইত্যাদি নানা বিবরণ দিলেন। তাঁহার পিতামহী যে অতিদূর ও দুর্গম তীর্থ শ্রীজগন্নাথ জী দেখিতে গিয়াছিলেন তাহাও বলিতে ভুলিলেন না; পরে যখন শুনিলেন লাইকা সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও বদ্রিনারায়ণ দর্শন করিয়াছে তখন ত সাধুর প্রতি তাঁহার এমন অগাধ ভক্তি জন্মাইল যে বাড়ীতে যদি বৃদ্ধা মাতা না থাকিতেন ত ঝগড়াহী বধূর মায়া ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চয় বাবাজির চেলা হইয়া তাহার সহিত তীর্থে তীর্থে বেড়াইতেন।

অবশেষে নগরের কথা, হাট বাজারের কথা—সরিসার দর চড়িয়া যাওয়ায় তেল কত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে সে কথা হইতে হইতে লাইকা ধীরে ধীরে রাজবাটির কথা পাড়িল।

রাজবাটির কথায় হঠাৎ সেই বাচাল প্রৌঢ়টির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল,—কিছু প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়া দিয়া বলিলেন, আহা হা রাজার কথা বলিবেন না।—সেই দারুণ শোকের পর আর তাঁহার নাকি মুখে হাসি নাই—, সে দিন শুনিলাম—

লাইকা বিস্মিত ভাবে বাধা দিয়া বলিল,—শোক? কোন শোক? সম্প্রতি রাজবাটীতে কি কাহারও কিছু হইয়াছে?—

"জানেন না আপনি?" আশ্চর্য্য হইয়া তিনি বলিলেন,—"আপনি ইহাও—জানেন

না! রাজকুমারী—আমাদের রাজকন্যা সে ৺কাশীধাম করিয়াছেন!—হাঁ বাবাজি কাশীতে পুরুষ মরিয়া ত শিব হয় স্ত্রীলোক মরিয়া কি ভগবতী হয় না কি?—"

লাইকা বোধ হয় কথা গুলি শুনে নাই, বিস্ফারিত চক্ষে প্রজ্জ্বলিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল— "রাজকন্যা—! কোন রাজ-কন্যা?—"

"আঃ তাহাও জানেন না?—আপনি কি কখনো এদেশে আসেন নাই? আমাদের রাজার ত আর সন্তান নাই—ঐ একমাত্র কন্যা ছিলেন বারি দেবী!"

লাইকা বাহিরে পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিল কিন্তু প্রাণ তাহার হৃদয়ের মধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একবার সে দৃষ্টি তুলিল—একি নূতন দৃশ্য? এই কি সেই পৃথিবী?—রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটাদি অপসৃত হইলে তাহার যেরূপ কঙ্কালসার মূর্ত্তি বাহির হয় তেমনি করিয়া ধরণীর সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত বর্ণ সকল আলোক সরাইয়া দিল? একি কর্কশ দৃশ্য? কি ভীষণ মূর্ত্তি—?

বচনপটু নাগরিক বলিয়া যাইতে ছিলেন—"হাঁ সেই বারি দেবীর বিবাহ হইয়াছিল লাইকাজির সহিত,—তাহাকে জানেন বাবাজি?"

রুদ্ধ স্বরে লাইকা বলিল "জানি—তারপর?"

তারপর কিন্তু তিনি স্বামীর আর দেখা পান নাই! লাইকা নাকি সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন; তাঁহার ত বিবাহ করিবার মোটে অভিপ্রায় ছিল না মহারাজাই জোর করিয়া বিবাহ দেন, কিন্তু ফল আর কি ভাল হইল বলুন, লাইকাজিও দেশত্যাগী হইলেন। রাজকুমারীও স্বামী হারাইয়া প্রাণে বাঁচি-লেন না!"

মৃদু স্বরে লাইকা জিজ্ঞাসা করিল "তাঁহার কি পীড়া হইয়াছিল জানেন?—"

"না কৈ তাহাত শুনি নাই! এখানে ত তাঁহার মৃত্যু হয় নাই যে জানিব! তবে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর বড় দুর্ব্বল ছিল শুনিতাম, কখনোত সাধ করিয়া কিছু খাইতেন না বা পরিতেন না,—রাণী মা নাকি সেজন্য কত দুঃখ করিতেন!"

তিনি আরও কত কি বলিতেছিলেন, লাইকা তাহা শুনিতেছিলনা—সে স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল, "এততেও লোকের হৃদয় আমার প্রতি অনুকুল?—এমন ঘৃণিত জীবকে এখনও সংসারের লোক ভালবাসে?—ছি ছি!" এই ভালবাসাই তখন লাইকার অসহ্য বোধ হইল,—যাহাকে দেবতারা ঘৃণা করেন—যাহাকে তাহার প্রাণাধিকা বারি ক্ষমা করে নাই তাহাকে অপরে কেন ক্ষমা করিবে—কেন ভাল বাসিবে? মৃত্যু যাহাকে ঘৃণায় স্পর্শ করে নাই—সে আবার জগতের প্রীতির স্পর্শ পাইবে কেন?—যে সর্ব্বস্বহারা প্রাণ কেন এখনও তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে?—

তাহার শুষ্ক মুখে চক্ষে বেদনার দাহন নাগরিকও লক্ষ্য করিলেন,—শশব্যস্তে বলিলেন, "হাঁ বাবাজি! বড় দুঃখের কথাই বটে—আপনি কি বড় কষ্ট বোধ করিলেন এ কথায়?—

লাইকা কি বলিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন,—“এই সন্ন্যাসী সাচ্চা লোক বটে নতুবা পরের দুঃখে পরে এত ব্যথা পাইবে কেন?”—অতপর আর, গল্প জমিতেছে না দেখিয়া সাধুবাবাকে প্রণাম করিয়া পোটলা লইয়া লোকটি চলিয়া গেলেন। চারিদিকে তেমনি কোলাহল উত্তেজনা উৎসাহ,—কিন্তু লাইকার অন্তঃকরণ তখন নীরব হইয়া গিয়াছিল। দুপ্রহরের তীক্ষ্ণ রৌদ্র মাথার উপর আসিল,—ক্রমে গড়াইয়া মুখে পড়িল, পথিকেরা তখন সকলেই ছায়ায় গিয়া বসিয়াছে কিন্তু লাইকা উঠিল না, কচিৎ দু একটি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা তাহাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল “বাবাজি রৌদ্রে বসিয়া কেন?” কিন্তু উত্তর না পাইয়া মীমাংসা করিয়া লইল যে সাধু হয়ত সমাধিতে আছেন।

বেলা শেষ; আবার সোপানতলে জনতা দেখা দিল, তখন লাইকা উঠিল। কাহাকেও কোন কথা না গঙ্গাভিমুখে চলিল। গঙ্গাতীরও জনশূন্য নয়—বসন্ত প্রদোষে কত নরনারী জলে নামিয়া সমস্ত দিনের—শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত দেহ শীতল করিতেছে। খেয়াঘাটে ছোট ছোট নৌকাগুলি জনপূর্ণ, নগরের কাজ শেষ করিয়া—দোকান বাজার করিয়া সকলেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে। লাইকা সে দিক দিয়া গেল না,—কম্পিত দ্রুত চরণে সে এ সকল দৃশ্য এড়াইয়া শ্মশান ঘাটে নামিল।—

“মা পতিতোদ্ধারিনি! এ অধম সন্তানকে তুমি ক্ষমা করিবে না?—এত কষ্ট এত ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি সে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় চায় তুই কি তাহা দিবি না মা জননি?—”

লাইকা একেবারে জলের নিকট আসিয়া শুইয়া পড়িল;—বড় যে কান্না পায়! মাথার সব চুল যে এক একটি করিয়া ছিঁড়িতে ইচ্ছা করে—আর সর্ব্বাপেক্ষা গভীর আকাঙ্ক্ষা হইতেছে যে বুকের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া হৃদয়ের সমস্ত রক্ত এই গঙ্গার জলে ঢালিয়া দেয়!—

তীরের শ্মশান দৃশ্য ক্রমে অস্পষ্ট হইতেছিল,—সন্ধ্যার অন্ধকার প্রগাঢ়;—কতক্ষণ সে এইভাবে পড়িয়া থাকিল! দূরে দূরে মন্দির দেবালয়ে আরতির বাদ্য উঠিয়াছিল,—“শান্তি শান্তি পরিপূর্ণ কল্যাণ!”—কিন্তু লাইকার জীবন কি অশান্ত! কি অমঙ্গলময়?—প্রভু! হরি দীনবন্ধু! উপায় দাও—লাইকাকে এ আত্মহত্যার ভীষণ সংকল্প হইতে বাঁচাও!—”

তখন শোকবিদগ্ধ লাইকার শুষ্ক ওষ্ঠ ভেদ করিয়া অতি করুণ স্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল,—

“ভয় বিহ্বল চিত কতহুঁ ন পরতিত
কবহুঁ ন মিলন আশা,—
চির করম হীন হীন ভজন দীন
কাঁহা মেরা মিলে বিশোয়াসা?”

ক্রমে অশ্রুজলে সে শোকসঙ্গীতও ডুবিয়া গেল,—এতক্ষণে লাইকা কাঁদিল, শোক যেখানে আসিয়া দারুণ পাষাণের মত চাপিয়াছিল তাহা যেন কিছু মুক্তি পাইল

তাই সে সেইখানে দৃষ্টি করিয়া কি একটা গূঢ় অভিমানের ভাবে নীরব অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। কেন? সে কি এত অপরাধ করিয়াছিল যে সে আর ক্ষমা পাইল না? —কে তাহার নাম "দীনদয়াল" রাখিয়াছিল? পাষাণ—পাষাণ নিষ্ঠুর!—তুমি যে স্বয়ং রাধিকার নয়নে জল দেখিয়াছিলে! লাইকা ত অতি হীন!

ক্রমে সে শ্রান্ত নয়ন মুদিল, চক্ষুপ্রান্ত দিয়া ধীরে ধীরে জলধারা গড়াইতেছিল,—হাসিও আসিতেছিল,—আশা? এখনও সে কোন আশা করে নাকি? ভগবান! তুমিই জান সে এখন কি চায়!

সহসা অতি দূরে মৃদুকরুণ গুঞ্জনবৎ সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল। সে সুর সে রাগিনী লাইকার অপরিচিত নয়—শুনিবামাত্র সে উৎকর্ণ হইল। তীর বহিয়া কে গীত গাহিতে গাহিতে আসিতেছে, সুমিষ্ট কণ্ঠে কে এ গান গায়? লাইকার প্রাণ যেন সেই সুরে আকণ্ঠ ডুবিয়া গেল—ক্ষণকালের জন্য সে সকল ভুলিয়া গান শুনিতে লাগিল। এত মধুর? এই পৃথিবীতে এই মানুষের কণ্ঠেই কি সুধার আবাস?—লাইকার শিরায় শিরায় সেই সুধাস্রোত বহিয়া গেল।

গীতধ্বনি ক্রমে নিকটস্থ হইতেছিল, ক্রমে প্রত্যেক শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। লাইকা কান পাতিয়া শুনিল।—

"শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম!
শুন সখি শুন শুন অমৃত সমান
মধুর মধুর শ্যাম নাম!
শ্যাম নাম কি গুণ হাম মুরখ নারী
কভু নাহি বরণনে শঁকে,
নাম জপ কারণ শিব পঞ্চানন
দশ নয়নে জনু লঁখে।
শুন সখি শুন মেরো ভাষা!
কাহে লো স্বজনি ত্যজবি পরাণি
কাহে ত্যজবি সব আশা।
শ্যাম সরব তেরা শ্যাম গরব তেরা
শ্যাম লাগি সব দেহ দান,
তহুঁ নাম মধুর কভু নহি ছোড়বি
গাহ সখি গাহ শ্যাম নাম।
জগত পরতর শ্যাম সুন্দর
তহুঁ পরতর তহুঁ নাম!
অব সদয় বিধি নাম মিলল যদি
জানহ মিলব শ্যাম!"

গায়ক ক্রমে দূর হইতে নিকটে আসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে লাইকার নিকটবর্ত্তী উচ্চ পাড় দিয়া চলিয়া আবার ক্রমে ক্রমে দূরে অতিদূরে চলিয়া গেল।—লাইকার তাহার প্রতি লক্ষ্যও করিল না কেবলমাত্র সঙ্গীত স্রোতেই তাহার প্রাণ ভাসিয়া গিয়াছিল—সংসারে তাহার চিত্ত ছিল না। গীত শেষ হইল কিন্তু বাতাস যেন এখনও তাহার গুঞ্জনধ্বনিতে, গঙ্গার জল যেন তাহার কলনাদে তাহারই প্রতিধ্বনি গাহিতেছে!

লাইকা উঠিয়া দাড়াইল;—দেখিল এ কী পরিবর্ত্তন আবার? সেই পৃথিবী! সেই পরমাসুন্দরী, রূপ রসে সুগন্ধময়ী—মোহময়ী ধরণী! যাহা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহার চক্ষে একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল! আবার তাহার পূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রকাশিত।

কোন্ ঐন্দ্রজালিক মায়াদণ্ড স্পর্শে তাহার মোহ দূর করিল? আছে—আছে—এখনও তাহার আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে;—

বারি মরিয়াছে কিন্তু তাহার চিন্তা আছে—স্মৃতি আছে! তাহাই লইয়া ত সে অনায়াসে জীবন ক্ষেপ করিতে পারে!

"শ্যাম! শ্যাম—শ্যাম শ্যাম শ্যাম—শ্যাম!"

হরি তুমি সত্যই দীনদয়াল!

কর্ম্মহীন লাইকার কাতর প্রার্থনাও তোমার কাছে বিফল হয় নাই। বড় দুঃখে সে তোমায় ডাকিয়াছিল, ডাকিব বলিয়া ডাকে নাই, শুধু বেদনার আবেগে ডাকিয়াছিল, তবু তুমি আসিয়াছ প্রভু! তবু এ অধমকে দেখা দিয়াছ বিশ্বমূর্ত্তি?—ওগো, কেমন তুমি—প্রিয়তম! কত দয়া তোমার? কেন তোমায় বোঝা যায় না? তুমি এত মধুর তবু সময় সময় তোমায় পাষাণের মত কর্কশ দেখায় কেন? কেন? ওগো কেন?

পার্শ্বের বালুকাস্তূপে ভর দিয়া বসিয়া লাইকা ভাবিতেছিল; তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার এলায়িত দেহ ঢলিয়া পড়িল, রুদ্ধকণ্ঠে অতি মৃদু সঙ্গীতগুঞ্জন শ্রুত হইল, অতি ক্ষীণ হাসির ছায়ায় তাহার সমস্ত মুখখানি উজ্জ্বল—অন্যের অশ্রাব্য স্বরে আপনার সুকণ্ঠে আপনি মুগ্ধ কাননকোকিলের স্বরে সে গাহিতেছিল,—

অবহুঁ নহি সমঝে শ্যাম কোত চতুরালি রে!
বন্‌শী ফুকারী বোলাসে মোর
কাঁহা কাঁহা ঘুমাই রে।
যব খোঁজয়ি সাহারা ঢুঁড়য়ি বন
নাহি মিলে তেরি দরশ রে,
নয়ন লোর বহত ঘোর, আশ টুটি' যাই রে।
ফিরিনু নিরাশে ঘরমে হায়
মরণ কাম মাঙ্গিরে!
অব দেখি মেরা মদন মোহন দুয়ারি আইরে!
হসত মধুর নয়ন চতুর করত নাগরাই রে!"

শোকতাপ ভুলিয়া লাইকা আনন্দে গীত গাহিতে লাগিল। রাত্রি গভীর,—কতক্ষণ যে সে এভাবে কাটাইল তাহার স্থির নাই,—অবশেষে গাহিতে গাহিতেই সে উঠিল। চারিদিকে অন্ধকার—দূরে নগরে হর্ম্যাশিরে আলোক জ্বলিতেছে, অস্ফুট জনকোলাহল শোনা যায়,—সেইদিকে চাহিয়া লাইকা একবার কাঁপিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার?

কিন্তু তখন তাহার হৃদয় সঙ্গীতে পূর্ণ ছিল—সেই বেদনা—সেই পুনরুত্থিত শোককে সবলে সরাইয়া অন্তর গাহিল।

শ্যাম গরব তেরা শ্যাম সরব তেরা
শ্যাম লাগি সব দেহ দান
শ্যাম মধুর নাম কভু নহি ছোড়বি
গাহ সখি গাহ শ্যাম নাম।

আবার লাইকার প্রাণ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল—সে দ্রুত চরণে উর্দ্ধে উঠিল! গীত সুস্বর! ইহার নিকট কি শোক তাপ দাঁড়াইতে পারে? জগৎ একদিকে আর সঙ্গীত এক দিকে! হৃদয়বীণার মধুর মূর্চ্ছনায় যেন সমস্ত আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল—সেই সঙ্গে লাইকাও উঠিল। ধীর পদে অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিল। তাহার পর দেখিতে দেখিতে সেই নিবিড় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

গড়ের মাঠ

(২)

ময়দানে কেবল একটি মাত্র দেশীয় লোকের প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার। তাঁহার দানশীলতায় এদেশবাসীর অনেক উপকার হয়েছে।

ইডেন গার্ডেনে ফেরবার পথে হাইকোর্টের ঠিক সামনেই লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি! ইনি যে সময়ে এদেশের শাসনকর্ত্তা সে সময় ইংলণ্ডে সুবিখ্যাত মেকলে সাহেব সুপ্রিম কাউন্সিলের আইনসদস্য ছিলেন। বেন্টিঙ্কের মূর্ত্তিবেদির উপর যে কথাগুলি লিখিত তাহা মেকেলে সাহেবেরই রচনা। *

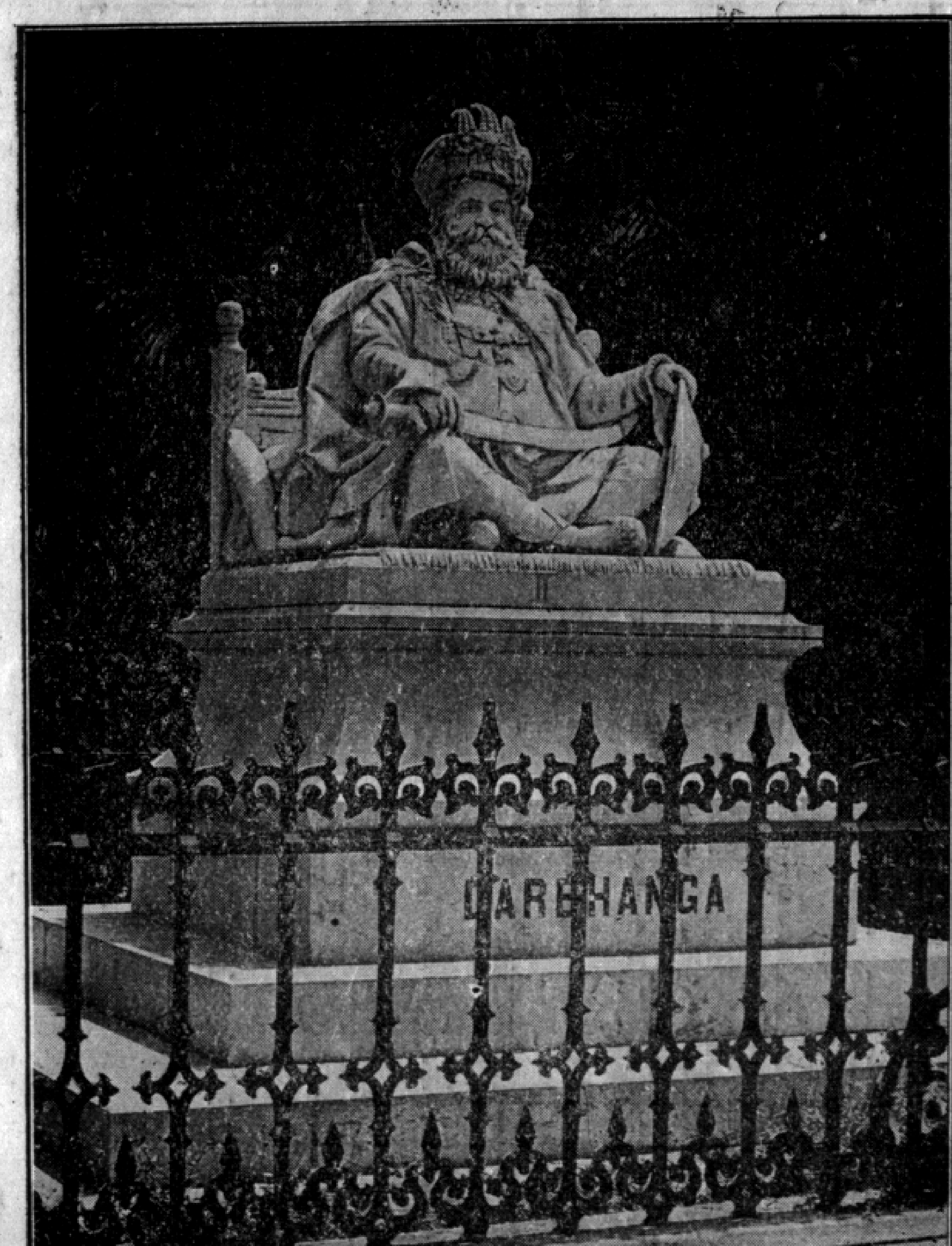
এদেশবাসীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য লর্ড বেন্টিংক্‌ যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। সতীদাহ ইত্যাদি অনেক নিষ্ঠুর প্রথারও তিনিই মূলোৎপাটন করেন।

তার পর উদ্যানের অন্যদিকে গঙ্গার ধারে যখন আমরা নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করবার জন্য গিয়ে দাঁড়াই তখন ষ্ট্রাণ্ডের অবিরাম জনস্রোত ও গাড়ীঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে স্যার উইলিয়ম পিলের শ্বেতমূর্ত্তিটী চোখের সামনে ফুটে উঠে। ইনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় নৌ-সেনাপতি হয়ে এদেশে এসেছিলেন। কল্‌কাতায় কেবলমাত্র এই একজন নৌসেনাপতির মূর্ত্তিই দেখতে পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌর যুদ্ধে ইনি মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছিলেন।

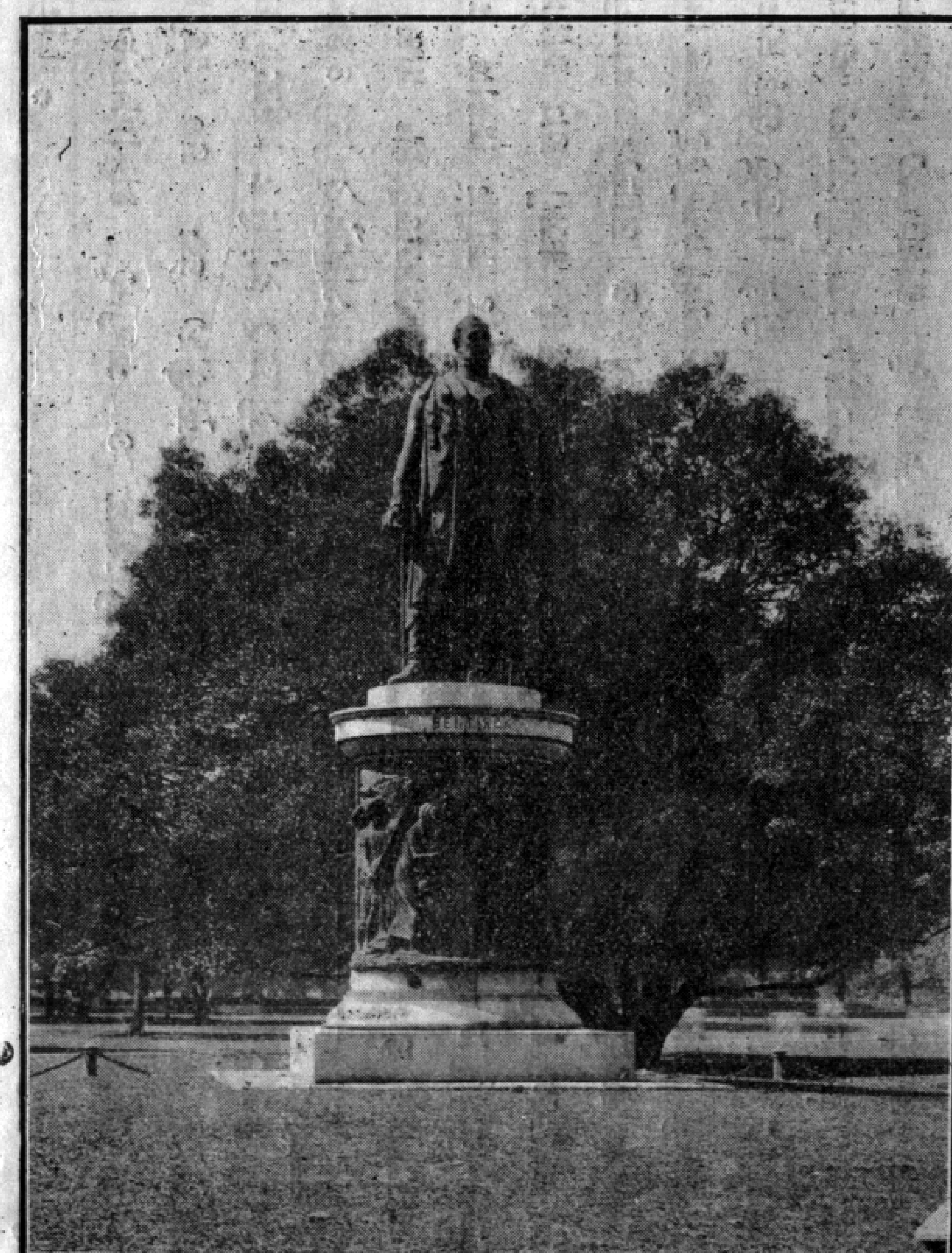
ষ্ট্রাণ্ড থেকে নদীর ধারে ধারে কিছুদূরে প্রিন্সেপ ঘাট পর্য্যন্ত গেলে সেখানে অশ্বোপরি উপবিষ্ট যে একজন যোদ্ধার প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায় তাঁর নাম রবার্ট ফর্ণেলিস (First Baran Napier of Magdala)। ইনি ১৬ বৎসর বয়সে এদেশে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রবেশ করেন এবং বার বৎসর পরে দার্জ্জিলিং Hill station প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার জীবনী নানা তথ্যে পূর্ণ। মিউটিনীর সময় অনেক সাংঘাতিক যুদ্ধে উপস্থিত থেকে ইনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ ভীল দস্যু তাণ্ডিয়া টোপী ও তাহার প্রায় ১২ হাজার দস্যু অনুচরকে ইনি মাত্র সাত শত সৈন্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। এই জন্য তাঁকে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে Knight Commander উপাধি ভূষণে ভূষিত করা হয়। লর্ড এলগিনের মৃত্যুর পর অন্য একজন রাজপ্রতিনিধি এদেশে আসা পর্য্যন্ত ইনি কয়েকদিন এদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইনি এবিসিনিয়া দেশে এক অভিযান নিয়ে যান। এবং ৬ মাসের মধ্যে যুদ্ধ কৌশলে সেখানে ইংরেজ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে নানা সম্মান ও

---

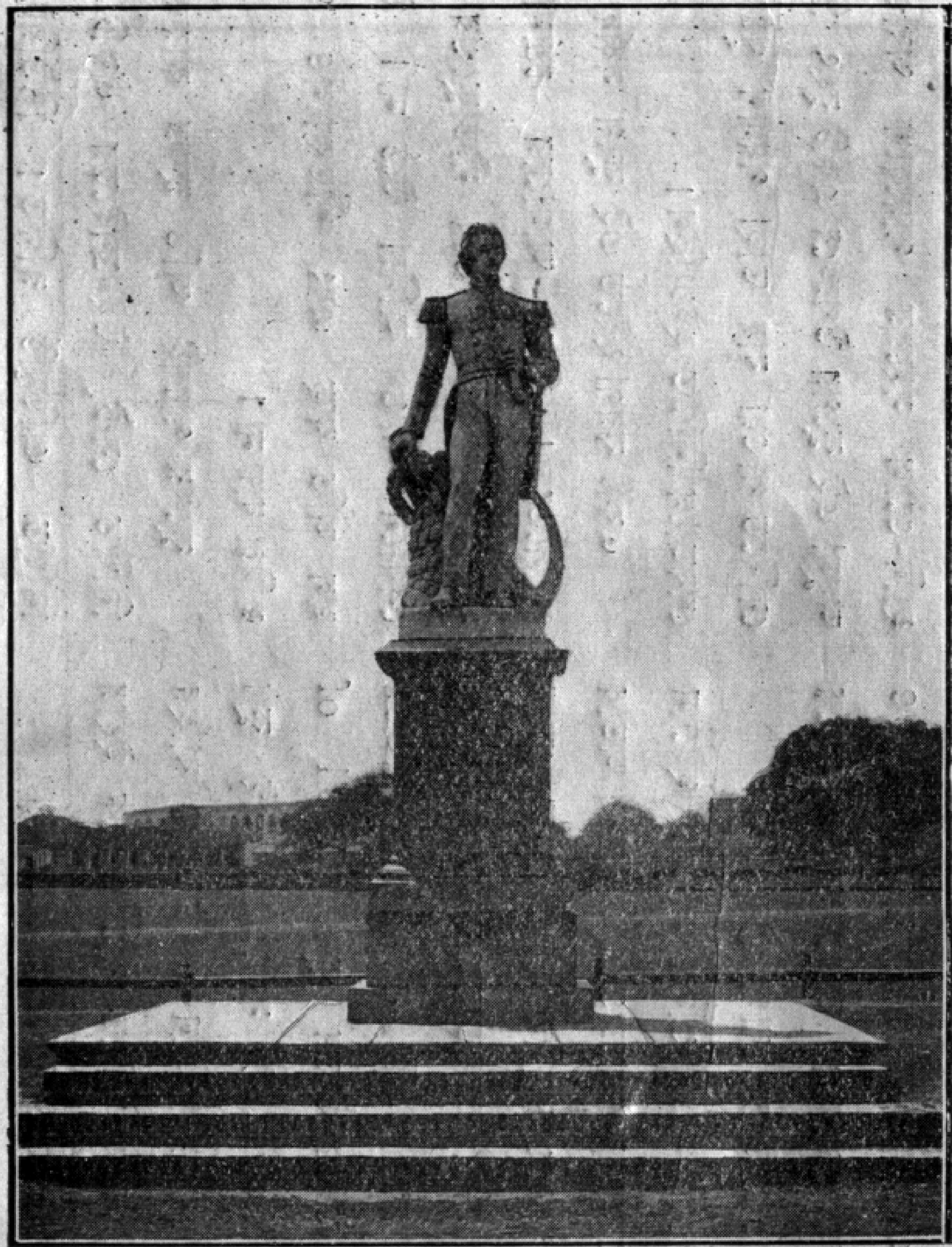
* "He abolished 'cruel rites', and effaced humiliating distinctions ; he gave liberty to the exprssion of pubiic opinion ; his constant study it was to elevate the intellectual and moral Character of the nations commited to his charge."



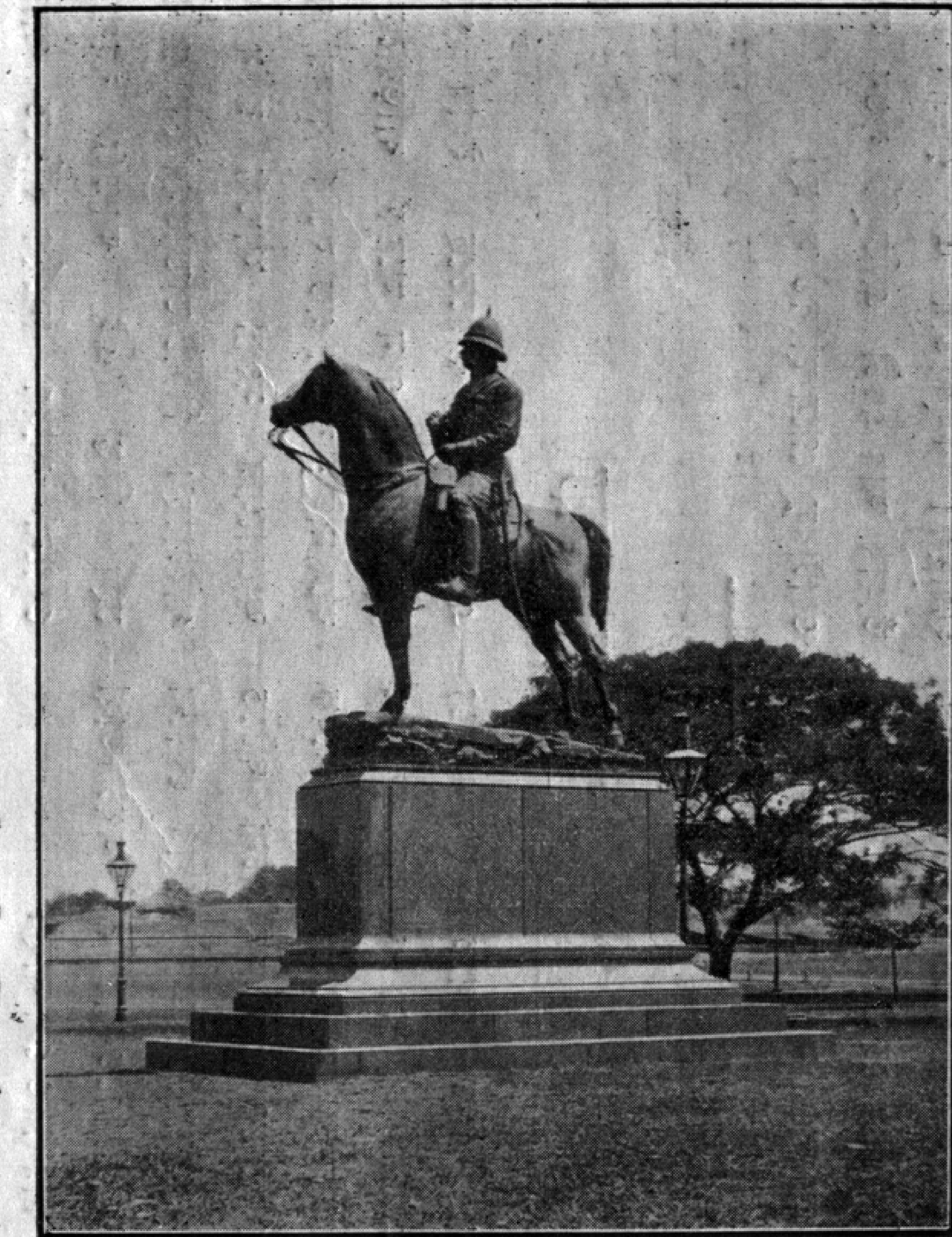
দ্বারভাঙ্গার মহারাজা



লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক



স্তর উইলিয়ম্ পিল্



সেনাপতি ব্যারণ নেপিয়র অফ্ ম্যাগ্দালা

উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি পরে কিছুদিন ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে বিলাতের ছোট বড় সকলেই গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন। সেন্টপল গির্জ্জায় ইঁহাকে রাজসম্মানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কল্‌কাতার এই মূর্ত্তিটীর ন্যায় তাঁহার আর একটী প্রতিমূর্ত্তি লণ্ডন সহরে ওয়াটারলু প্লেসে স্থাপিত আছে।

স্থান-মাহাত্ম্য

অধুনা শিক্ষিত জগতে স্থান-মাহাত্ম্য বলিয়া একটা জিনিষের অস্তিত্ব খুব কম লোকেই স্বীকার করিবে। কিন্তু অনেক সময় স্থান বিশেষে এমন সব ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় যে পার্থিব বিজ্ঞান তাহার কোনো মীমাংসা করিয়া দিতে পারে না, অথচ তাহা অবিশ্বাস করিবারও জো নাই।

এই স্থান-মাহাত্ম্য আমাদের দেশে চিরকালই লোকে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে এবং এজন্য প্রতিবৎসর যাত্রীর সংখ্যাও কিছু কম হয় না। তারকেশ্বর এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য স্থান।

অনেকেই হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে ইংরেজদের ভিতরও এ বিশ্বাসের অভাব নাই। ইংলণ্ডে বহুদিন হইতে কোন কোন স্থানে রোগ-শান্তির জন্য রুগ্ন-যাত্রীদের সমাগম হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের ভিতর সেইণ্ট উইনফ্রাইডের কূপ (Well of St. Winefride) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কূপ সম্বন্ধে লণ্ডন ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকদিগকে ইহার কিছু বিবরণ সংকলন করিয়া দিতেছি।

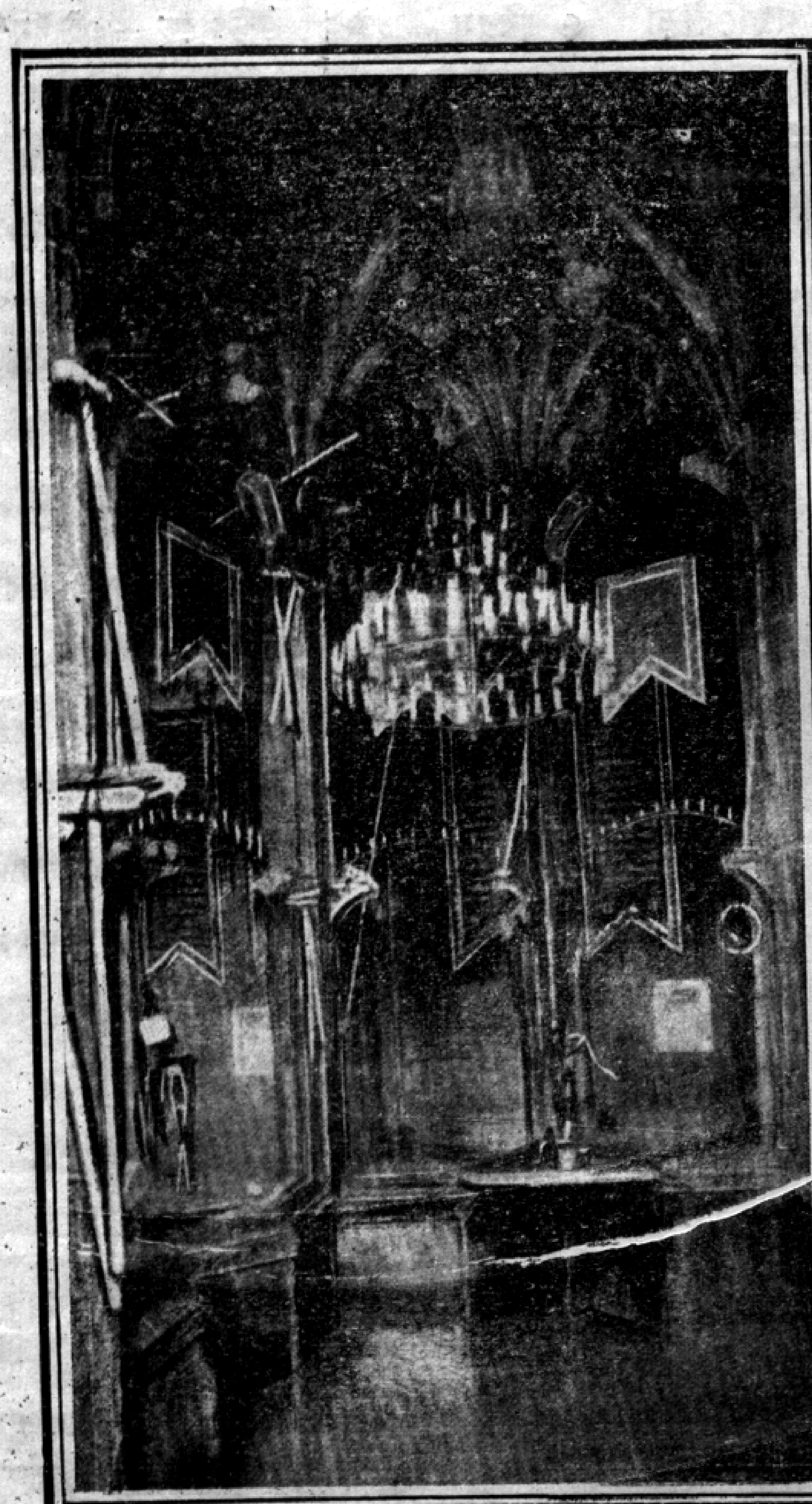
গত বারো শত বৎসর ধরিয়া এই কূপ অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়া আসিতেছে এবং এখনো করিতেছে। ইহার খ্যাতি পূর্ব্বের চেয়ে এখন অনেক বাড়িয়াছে বই কমে নাই; কারণ গত কয়েক বৎসর যাবৎ আরোগ্যের সংখ্যা আশ্চর্য্য রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশিষ্ট ডাক্তারগণ ইহা দেখিতেছেন কিন্তু এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কোনো কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছেন না।

ইহা ওয়েলস্ প্রদেশের একটি পর্ব্বতোপরিস্থ হালি-ওয়েল সহরের পাদদেশে অবস্থিত। অধুনা এই কূপের উপর যে একটি বৃহৎ গির্জ্জা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

একটি ঝরণা হইতে এই কূপে সর্ব্বদা জল আসিতেছে। ঠিক আমাদের চন্দ্রনাথের সীতা-কুণ্ডের মতন। তবে সীতাকুণ্ডের মত সেখানে আগুন জ্বলিয়া উঠে না। ইহার জল অতি স্বচ্ছ এবং শীতকালেও তাহা জমিয়া যায় না।

কূপের পাশেই অতি সুন্দর কারুকার্য্য-নির্ম্মিত সেন্ট্ উইনফ্রাইডের একটি নব-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত। পিউরিটানরা যখন বিদ্রোহী হয় তখন ইহার প্রাচীন মূর্ত্তিটি উহারা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই মূর্ত্তিটির কাছেই সেণ্ট বিয়োনোর প্রস্তর। যাত্রীরা কূপের জলে স্নান করিয়া আসিয়া সেখানে হাঁটু-গাড়িয়া প্রার্থনা করে। চারিদিকের খিলান ইত্যাদিতে কানাখোঁড়া প্রভৃতি রোগীর বহু যষ্টি ঝোলান রহিয়াছে, ইহারা নীরবে এই কূপের আশ্চর্য্য ক্ষমতার সাক্ষ্য দিতেছে; যাত্রীরা আরোগ্য হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এগুলি সেখানে রাখিয়া গিয়াছে।



কূপমধ্যে রোগমুক্ত ব্যক্তিদিগের পরিত্যক্ত যষ্টি

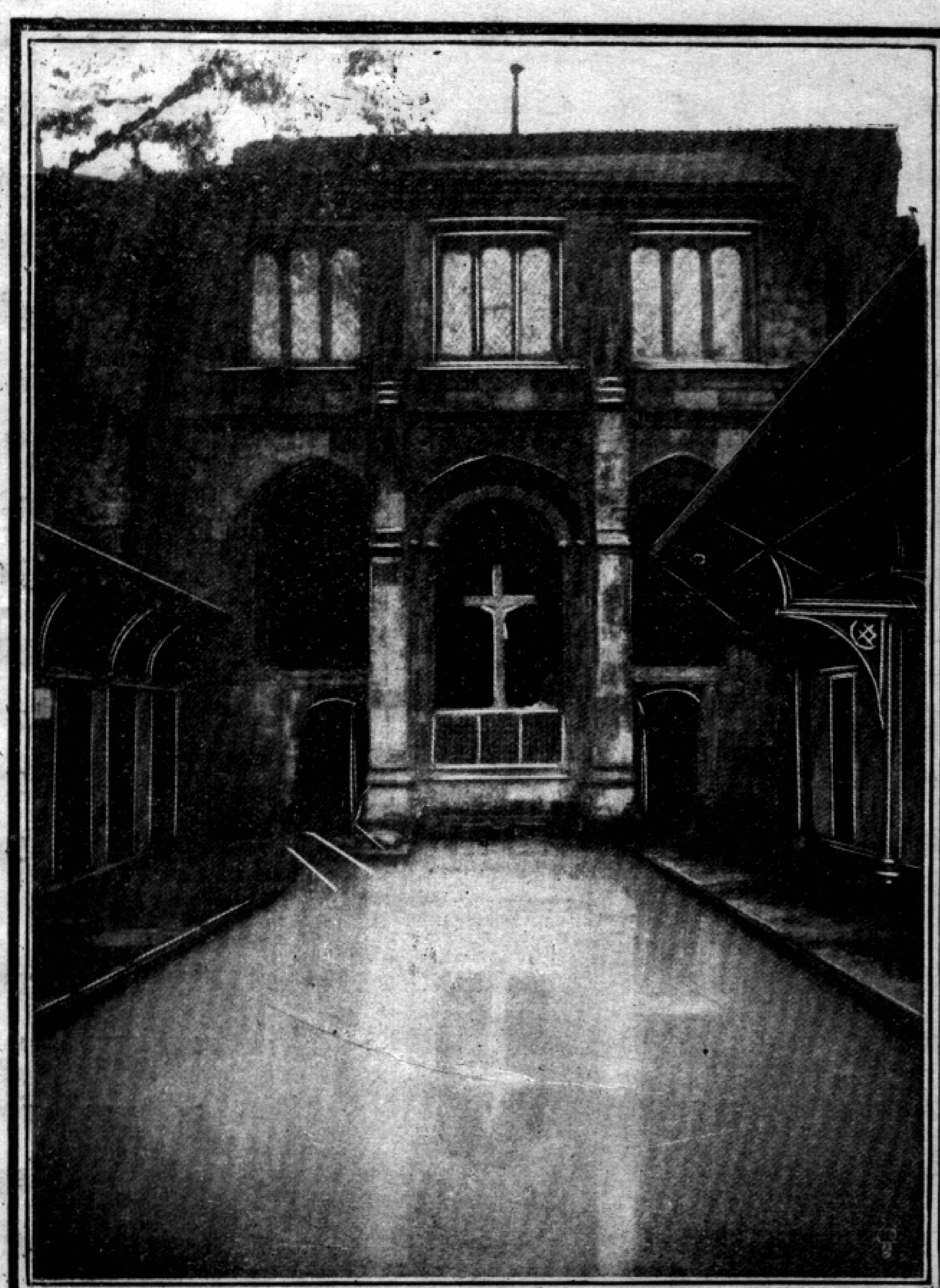
কূপের খুব নিকটেই যাত্রীদের স্নান করিবার জন্য একটি বাঁধানো পুকুর আছে এবং উহার পাশে কাপড় ছাড়িবার জন্য ছোট ছোট অনেকগুলি কুঠরী রহিয়াছে। এখানে ঈষ্টারে রবিবার হইতে নবেম্বরের তেরো দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুপুরে উপাসনা হইয়া থাকে।

সারা বছরই ইহা যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে কিন্তু জুন ও নবেম্বর মাসেই যাত্রীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী হয়। যাত্রীরা এখানে রোজই প্রাতঃকাল ছয়টা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত স্নান করিতে পারে। কিন্তু প্রাতে নয়টা হইতে বারোটা ও বিকালে আড়াইটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত শুধু রমণীদের জন্য এবং বাকি সময়টা পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

কতকগুলি বিশেষ দিনে সন্ধ্যাবেলা নিকটস্থ গির্জ্জা হইতে ভক্ত যাত্রীগণ মশাল ও পতাকা হস্তে একটি মিছিল বাহির করিয়া কূপ পর্য্যন্ত যায়। সেখানে সকলে সমবেত হইয়া এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করে—"হে উজ্জ্বল নক্ষত্র, হে বৃটিশজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্প, হে বিপদাপন্ন যাত্রীদের আশা ও ভরসা স্থল, আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন ভগবান আমাদের আশীর্ব্বাদ করেন; হে পবিত্র কুমারি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো।"

উহার নিকটে একটু উচ্চভূমিতে দরিদ্র যাত্রীদলের থাকিবার জন্য একটি আবাস আছে। দৈনিক এক শিলিং মাত্র মূল্যে এখানে তাহাদিগকে আহার্য্য ও বাসস্থান দেওয়া হয়। যাহারা খুবই দরিদ্র তাহাদিগকে কিছুই দিতে হয় না। এই বাড়ীটি পরসেবায় নিযুক্ত কয়েকটি 'ভগিনীর' তত্ত্বাবধানে আছে। তাঁহারা এই গরীব যাত্রীদিগকে সকল রকমে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে চেষ্টা করেন। প্রতিদিন অন্ধ খোঁড়া যাত্রীদিগকে কূপে স্নান করাইবার জন্য লইয়া যান।

লাঠিতে ভর করিয়া দলে দলে তাহারা যাইতেছে, রোগমুক্তির আশায় সেই বেদনা-বিধুর মুখগুলি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে; তারপর ফিরিয়া আসিবার সময় কাহারো বা রোগ-মুক্তির জন্য মুখে আনন্দের উচ্ছাস আর কাহারো বা স্বভাবতঃ ম্লান বিরস বদন —রোগ শান্তি হয় নাই বলিয়া অধিকতর ম্লান ও বিরস হইয়া উঠিয়াছে—এই মর্ম্মস্পর্শী



যাত্রীদের স্নানের স্থান

বৃক্ষ সর্বদাই সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন এই অত্যাশ্চর্য্য কূপের ইতিহাসটা এইরূপ :— খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিয়োনো নামে একজন ধর্ম্মাত্মা সেখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি থিউত নামে একজন দলাধিপতির অনুমতি লইয়া সেখানে একটি গির্জ্জা প্রস্তুত করিলেন। এই থিউতের উইনফ্রাইড বলিয়া একটী কন্যা ছিল। তাঁহার জন্ম সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। থিউত তাঁহার কন্যার শিক্ষার ভার বিয়োনোর উপর অর্পণ করিলেন।

একদিন রবিবারে উইনফ্রাইডের শরীর ভাল না থাকায় তাঁহার মাতাপিতা সকলেই উপাসনার জন্য গির্জ্জায় গেলেন, কিন্তু অসুস্থ বলিয়া তিনি একা বাড়ীতে রহিলেন। এমন সময় রাজা এলেনের পুত্র কারাদক আসিয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইল। পাপমতি কারাদক তাঁহাকে নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। কিন্তু উইনফ্রাইড কিছুতেই সম্মত না হওয়াতে কারাদক ভয়ানক চটিয়া গেল। ইহা দেখিয়া উইনফ্রাইড তাঁহার পিতার কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন কিন্তু কারাদক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া তরবারি দ্বারা তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল।

১১৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রুজবেরির এবট রবার্ট এই কূপের যে ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ডের 'বড্‌লিয়ান' লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। তাহাতে এইরূপ লেখা আছে যে উইনফ্রাইডের মস্তক যেখানে পড়িল সেই স্থানের মাটি ফুঁড়িয়া একটি জলধারা বাহির হইল এবং তাহাই আজও পর্য্যন্ত বহিয়া যাইতেছে। তিনি আরো লিখিয়াছেন, "তাঁহার দেহ হইতে যে-রক্ত ধারা বাহির হইল তাহা পর্ব্বত বাহিয়া নীচে পতিত হইতে লাগিল ও পর্ব্বতের সেই সকল পাথর লালে-লাল হইয়া উঠিল। সেই সকল রক্তবর্ণ পাথর দেখিয়া মনে হয় যেন ঠিকই রক্ত মাখা। পাথরগুলি হইতে লাল দাগ কিছুতেই উঠানো যায় না। ঐ সকল পাথরে যে-সকল শৈবাল জন্মে তাহাতে ধূপ ধুনার গন্ধ পাওয়া যায়।"

এই সকল পাথর আজো বর্ত্তমান আছে। অনেক সময় লালদাগ গুলি ঠিক রক্তের দাগ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখন আবিষ্কার হইয়াছে উহা একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবাল হইতে সৃষ্ট। নর্থ-ওয়েল্‌সে এই রকম শৈবাল মাঝে মাঝে অনেক দেখা যায়।

কিম্বদন্তী এই যে বিয়োনোর আকুল প্রার্থনায় উইনফ্রাইড আবার জীবন লাভ করিয়া ৯৬০ খৃষ্টাব্দে কুমারী অবস্থায় ইহলীলা সম্বরণ করেন। শ্রুজবেরিতে তাঁহাকে গোর দেওয়া হয়। কিন্তু অষ্টম হেন্‌রি যখন ইংলণ্ডের ধর্ম্মকে পোপের কর্ত্তৃত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন তখন তিনি ছোট বড় অনেক মঠ ধ্বংস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার দেহ তাঁহার গোরস্থান হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। অধুনা তাঁহার শুধু একটি অঙ্গুলি মাত্র এই কূপ-মঠে রক্ষিত আছে বলিয়া কল্পিত। সেখানে তাঁহার শবাধারের একটি কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে।

বহু প্রাচীন কাল হইতে সেন্ট উইন

ফ্রাইডের কূপে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে সেগুলি সবই লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। শুধু যে মূর্খ দরিদ্ররাই সেখানে যায় তাহা নয়, প্রাচীন কাল হইতেই দেশের গণ্যমান্য রাজা মহারাজা সকলেই সেখানে অতি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গমন করিতেছেন, এবং সেই কূপের রোগ শান্তির আশ্চর্য্য ক্ষমতা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। এ সব দেখিয়া কোনো বিচারশক্তিশীল ব্যক্তিই ব্যাপারটা এইবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না।

এই কূপের দুই মাইল দূরে বেসিন্দার্কে একটি গির্জ্জা ছিল। আজো উহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। একাদশ খৃষ্টাব্দে সেখানকার এক পুরোহিত উইনফ্রাইডের যে জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি সেখানকার যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছেন তাহাও লিখিত আছে।

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি তাঁহার সেই পুস্তকে রহিয়াছে। একদিন এক দরিদ্র রমণী তাহার পুত্রকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। পুত্র জন্মাবধি বোবা। পুত্রকে আনিয়া সেখানে স্নান করানো হইল এবং তাহার মুখেও খানিকটা জল ঢালিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরই তাহার মূকত্ব ঘুচিয়া গিয়া মুখে কথা ফুটিল।

আরেক দিন এক জন্মান্ধ বালিকাকে সেখানে আনা হইল। তাহাকে স্নান করানোর পর তাহার ঘুম পাইল। ঘুম হইতে যখন সে জাগিয়া উঠিল তখন সে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে।

আর একটি অধিকতর আশ্চর্য্য ঘটনা; একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন লোক তাহার মৃত কন্যাকে গোর দিবার জন্য উইনফ্রাইড গির্জ্জাতে লইয়া আসিল। গির্জ্জার বেদীর সম্মুখে মৃত বালিকাকে শোয়াইয়া রাখিল। সেদিন আর গোর দেওয়া হইল না। পরদিন প্রভাতে যখন গির্জ্জার দরজা খোলা হইল তখন সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দেখিল যে, মেয়েটি বাঁচিয়া উঠিয়াছে এবং খাবার চাহিতেছে।

হাজারো রকম রোগের সেখানে শান্তি হইয়াছে, এই প্রকার খবর প্রাচীন লেখা ও জনরব হইতে জানিতে পারা যায়।

১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রেভারেণ্ড ফিলিপ লেটন এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষীভূত যথেষ্ট প্রমাণ-যোগ্য অনেক ঘটনা তিনি একটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য গির্জ্জা ও কূপ ইত্যাদিতে ক্যাথালিকদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু লেটন সাহেবের পুস্তক হইতে দেখা যায় যে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের বন্যা যখন ইংলণ্ড তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল তখনো এই কূপের সুনাম ও ক্ষমতার প্রতি কেহ ভক্তিহীন হয় নাই।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে স্যর রোজার বোডেনহাম কে, সি, বি, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। অনেক বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরা তাঁহার কিছু করিতে পারিলেন না এবং সে রোগ চিকিৎসার অতীত বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। তখন তিনি অন্যের পরামর্শানুসারে এই কূপে স্নান করিবার জন্য আগমন করিলেন। শুনা যায় স্নান

করিয়া যখন উঠিলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সেই অবধি আর কখনো তাঁহার সে ব্যারাম হয় নাই!

সেই সময়কার আরেকটি আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, তখনকার বৃটিশ নৌসৈন্যের খাদাঞ্চির স্ত্রী মিসেস্ জেরি নিউমেন বাত-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং তাহাতে তাঁহার হাত পা বাঁকিয়া যায়। রাজ্যের অনেক গণ্য মান্য লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। ইংলণ্ডের রাজডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। কিন্তু কোনোই ফল হইল না। তখন তিনি নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই কূপে আসিয়া স্নান গ্রহণ করিলেন কিন্তু প্রথমবার স্নানে বিশেষ কোন ফল লাভ হইল না। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তিনি পুনরায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তিনি এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছিলেন যে অন্যের সাহায্য লইয়াও আঠার বৎসর যাবৎ তাঁহার দাঁড়াইবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এবার আসিয়া কয়েকবার স্নান করাতে তাঁহার রোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গেল। যাঁহারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারাই ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আজকাল এই বিজ্ঞানের দিনে লোকে সহজেই মনে করিবে যে সম্ভবতঃ কূপের জলে এমন সব রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত আছে যাহাতে রোগ সারিতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এই কূপের জল লইয়া বহু রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন কিন্তু প্রতি গ্যালন জলে মাত্র চৌদ্দ গ্রেণ খড়িমাটি ও চার গ্রেণ কেলসিয়াম সালফেট্ ভিন্ন আর কিছু পান নাই। কাজেই তাঁহারা মত দিয়াছেন যে ঐ জলে রোগ শান্তি হইবার মত কোনো গুণ নাই।

আর এক কথা, বিগত দুই শতাব্দি যাবৎ যাঁহারা সেখানে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই প্রটেষ্টাণ্ড অর্থাৎ তাঁহাদের উইনফ্রাইডের অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস নাই। তথাপি কেন যে এই কূপোদকে দুশ্চিকিৎস্য-মহারোগও সারিয়া যায় তাহা বুদ্ধি বিচারের বহির্ভূত; বিজ্ঞানও এখনও পর্য্যন্ত ইহার কোনো কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছে না।

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

নবাব

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফেলিসিয়া

কক্ষে ফেলিসিয়া, নবাব ও ডাক্তার জেঙ্কিন্স বসিয়াছিলেন।

মৃত্তিকা লইয়া নবাবের মূর্ত্তি গড়িতে গড়িতে ফেলিসিয়া ডাক্তার জেঙ্কিন্সের পানে চাহিয়া কহিল, "আপনার ছেলের খপর কি, ডাক্তার জেঙ্কিন্স? তাকে আর

আপনার বাড়ীতে দেখতে পাই না যে! বেশ লোকটি! কোথায় গেল?"

জেঙ্কিন্স কহিলেন, "কোথায় গেল! সে খপর তুমি যেমন জানো, আমিও তেমনি জানি। সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ও বাড়ীতে তাঁর পোষাচ্ছিল না। স্বাধীনতার হাওয়া পেয়েছেন—"

হাতের তুলিটা টেবিলের উপর ফেলিয়া ফেলিসিয়া ঘুরিয়া বসিল, ডাক্তারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ঐ খানটায় মাপ করবেন, ডাক্তার সাহেব। এই স্বাধীনতার হাওয়া কথাটিকে নিয়ে আপনারা আজকাল ভারী তাচ্ছল্য সুরু করেছেন—যেন সেটা ভারী বিদ্রূপ, ভারী অপরাধের ব্যাপার! দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে যে ব্যাচারারা চেপে পিষে সারা হচ্ছে, তারা যদি আপনাদের খেয়ালমত আপনাদের খানার টেবিলের চতুর্দ্দিকে খোসামুদের মত বসে থেকে আপনাদের ছোট তুচ্ছ বাজে কথায় সায় দিয়ে তার তারিফ করতে না পারে, মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা পায়, অমনি তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের এই বিদ্রূপ-বাণ কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বেরিয়ে পড়বে! আপনারা চান্, তারা আপনাদের জুতোর তলা চেটে পাতে-পড়া দু'টুকরো ছেঁড়া রুটি আর মাংসর হাড় মুখে পুরে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করবে! সেইটি যারা না করে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা পাবে, তাদের একেবারে মস্ত অপরাধ, না? স্বাধীন হাওয়া, —সেটা ঠাট্টার কথা নয়। তাদের স্বাধীন হাওয়া যে দেশে বয়ে যায়, সে দেশ ধন্য হয়! যে স্বাধীন হাওয়া দোষের, সে হাওয়ায় আপনারা ঘুরে বেড়ান, সে হাওয়া আপনাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে মিশে আছে! আপনাদের মানে আপনি, ডিউক, মপাভঁ, বোয়াল্যান্দ্রঁ, এদের;—যারা সমাজে বিনা দ্বিধায় উচ্ছৃঙ্খলতা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, যাদের ধর্ম্ম নেই, ইজ্জৎ নেই, দুনিয়াটাকে খালি ভোগের জায়গা বলে যারা জেনে রেখেছে —নিজের বিলাসের জন্য অপরের সর্ব্বনাশ করতে যাদের চোখের পাতা এতটুকু পড়তে জানে না, স্বাধীন হাওয়া দোষের তাদের—"

ফেলিসিয়ার মাথার শিরাগুলা উত্তেজনায় দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে আজ ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতই ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আরও সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ডাক্তার জেঙ্কিন্স বাধা দিয়া কহিলেন, "ফেলিসিয়া, স্থির হও।"

ফেলিসিয়া কহিল, "না, আপনিই বলুন, আমার কথা ঠিক কি না! আপনাদের জীবনের লক্ষ্য কি! শুধু পয়সা—তা সে পরের মাথায় হাত বুলিয়েই হোক, আর তাদের চোখে ধুলো দিয়েই হোক। আপনারা চান্ শুধু পয়সা আর বিলাস, ভোগ! কোন ভাল জিনিষে আপনাদের রুচি আছে! সাহিত্যের দিকে ঝোঁক সে শুধু নামের জন্য—ছবির তারিফ করেন নামের জন্য—নাম কিনতে চান্ শুধু আপনারা—কাজ চান না।"

জেঙ্কিন্স উপায়ান্তর না দেখিয়া মৃদু হাসিল, হাতের দস্তানাটা খুলিতে খুলিতে

বলিল, "হুঁঃ—ছেলেমানুষ! তোমার সঙ্গে তর্ক করব কি!"

নবাব এতক্ষণ স্থিরভাবে সকল কথা শুনিতেছিলেন। এখন তিনি কহিলেন, "কিন্তু উনি ঠিক কথাই বলেছেন, ডাক্তার! আমরা জীবনে করলুম কি—করছিই বা কি! পয়সার জন্য প্রথম বয়সটা পাগলের মত কাটিয়ে দিয়েছি—আর এখন নাম বাজাবার দিকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য! যে করে এ টাকা হয়েছে, তা কে না জানে! কিন্তু আমার 'পোজ্‌টা ভেঙ্গে গেল, বোধ হয়, মাদামোসেল—"

ফেলিসিয়া কহিল, "থাক, আর গড়ব না। আর এক দিন হবে'খন।"

অদ্ভুত বালিকা, এই ফেলিসিয়া। সে একজন আর্টিষ্টের কন্যা। পিতা সিবাস্তিয়ন রুই একজন প্রতিভাশালী আর্টিষ্ট ছিল। শৈশবেই ফেলিসিয়ার মাতার মৃত্যু হয়—মাকে সে কখনও চক্ষে দেখে নাই। স্ত্রী ছিল, সিবাস্তিয়নের চোখের মণি। স্ত্রীকে হারাইয়া এই মেয়েটিকে বুকে ধরিয়াই সিবাস্তিয়ন কোন মতে খাড়া ছিল। শৈশব হইতে পিতার কলাগৃহটির মধ্যেই ফেলিসিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার জগৎ এই ক্ষুদ্র ঘরটিকে লইয়াই। কাদা লইয়া সে পুতুল গড়িত, কোনটা দুই দিন থাকিত, কোনটাকে বা গড়িয়াই সে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। অল্প বয়স হইতেই এ কাজে তাহার কেমন একটু অশিক্ষিত-পটুত্ব জন্মিয়াছিল। পিতা সিবাস্তিয়ন কন্যার ভুল শুধরাইয়া দিত, শিল্পের সূক্ষ্ম কৌশলগুলাও বুঝাইয়া শিখাইতে ছাড়িত না।

এমনই করিয়া গঠন-শিল্পে যখন ফেলিসিয়া ধীরে ধীরে আপনার শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইতেছিল, তখন সহসা একদিন সিবাস্তিয়ন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে অক্ষম ও অপটু হইয়া পড়িল। তাহার গৃহে শিল্প-নৈপুণ্যের তারিফ করিতে যে সকল লোক আসিত, ডাক্তার জেঙ্কিন্স তন্মধ্যে একজন। জেঙ্কিন্সের সহিত সিবাস্তিয়নের কতকটা সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। তাহার উপর এই পীড়া উপলক্ষ করিয়া সেই সৌহার্দ্দ্য রীতিমত পাকিয়া উঠিল।

ডাক্তার জেঙ্কিন্স নিত্য তাহাকে দেখিতে আসিতেন। বন্ধুকে কত আশ্বাসের কথা বলিয়া ভুলাইতেন; ফেলিসিয়াকেও উৎসাহ দিতে ভুলিতেন না। বন্ধুর গৃহে এখন তিনি একরূপ অভিভাবকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সব সন্ধান রাখা, খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় প্রত্যেক জিনিষটির তদ্বির করা, এ সকলের কোনটাতে একদিনের জন্যও কখনও তাঁহার এতটুকু শৈথিল্য দেখা যায় নাই।

ফেলিসিয়ার দিনগুলা নিতান্তই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনভাবে কাটিতেছে। এ নির্জ্জনতা-ভঙ্গ-কল্পে ডাক্তার প্রায় প্রত্যহই ফেলিসিয়াকে মাদাম জেঙ্কিন্সের নিকট লইয়া আসিতেন; সারা দিন মাদামের সাহচর্য্যে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় ডাক্তার আবার ফেলিসিয়াকে নিজেই সঙ্গে করিয়া তাহার গৃহে পৌছাইয়া দিয়া যাইতেন। কন্যায় প্রতি ডাক্তারের এতখানি স্নেহ-মমতা দেখিয়া রোগ-শয্যা-শায়িত অক্ষম সিবাস্তিয়ন কতকটা আরাম বোধ করিতেন।

ফেলিসিয়া রাত্রে পিতার শয্যার পার্শ্বে

বসিয়া শিল্প-সম্বন্ধে নানা আলোচনার কথা পাড়িত, পিতা প্রসন্ন চিত্তে তাহাকে সকল তত্ত্ব বুঝাইয়া দিত। কোনদিন-বা ফেলিসিয়া বসিয়া বই পড়িত, সিবাস্তিয়ন বিছানায় শুইয়া শুনিয়া যাইত! ফেলিসিয়া মূর্ত্তি গড়িত, সিবাস্তিয়ন মুগ্ধ নেত্রে কন্যার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিত—আশার আনন্দে প্রাণ তাহার ভরিয়া উঠিত।

এদিকে কিন্তু শরীর তাহার ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। নিজে সে স্পষ্টই বুঝিতেছিল,এ দেহ প্রাণখানাকে বহিবার পক্ষে ক্রমেই যেন অধিকতর অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে—মৃত্যু যেন ক্রমেই তাহার অলক্ষ্য কর বাড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে। মেয়ের দশা কি হইবে ভাবিতে গিয়া নিশ্বাস তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিত—বুকের মধ্যে অব্যক্ত একটা বেদনা টন্ টন্ করিয়া উঠিত। ফেলিসিয়া পাছে সে বেদনার এতটুকু আভাষ পায়, এই আশঙ্কায় প্রায়ই তাহাকে সে চোখের আড়ে রাখিবার চেষ্টা করিত। ডাক্তার আসিলেই স্নেহান্ধ পিতা ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে জানাইত—ফেলিসিয়া অনেকক্ষণ এই বদ্ধ গৃহে পড়িয়া আছে, তাহাকে বাহিরের মুক্ত বায়ুতে একটু বেড়াইয়া আনো। বন্ধুর এই অনুরোধ রক্ষা করিতে ডাক্তার কোনদিন এতটুকু অবহেলা করেন নাই, ফেলিসিয়াও অনেকখানি বহির্জগৎকে চকিতে দেখিয়া লইবার অবকাশ পাইয়া তাহা ছাড়িতে চাহিত না।

এমন সময় সহসা এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে সরলা কিশোরীর উন্মুখ চিত্ত প্রচণ্ড বাধা পাইল; অবিশ্বাসে ভয়ে ঘৃণায় একান্ত সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অন্যদিনের মত জেঙ্কিন্সের সহিত ফেলিসিয়া সেদিনও তাঁহার গৃহে গিয়াছিল। মাদাম জেঙ্কিন্স গৃহে ছিলেন না—দুই দিনের জন্য কোথায় তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য ফেলিসিয়া এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করে নাই। ডাক্তারের বয়স ও পিতার সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের পরিমাণ—ভাবিয়া ডাক্তারের স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে পঞ্চদশ-বর্ষীয়া কিশোরী ফেলিসিয়াকে স্বগৃহে লইয়া যাইতে ডাক্তারও দ্বিধা বোধ করেন নাই। বয়সে পঞ্চদশ হইলে কি হয়, সরলতায় ফেলিসিয়া সপ্তমবর্ষীয়া বালিকারই অনুরূপ ছিল।

সন্ধ্যার সময় জেঙ্কিন্স ফেলিসিয়াকে লইয়া বাগানে আসিয়া বসিলেন। মাথার উপর অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছিল—কুঞ্জে বসিয়া দুই চারিটা পাখীও বড় মিঠা গাহিতেছিল। সিবাস্তিয়নের বিষয়েই উভয়ের কথা হইতেছিল—সহসা ফেলিসিয়া একটা কঠিন বাহু পাশে আপনাকে বদ্ধ দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তখনই সে বাহুপাশ সবলে ঠেলিয়া অগ্নিময় দৃষ্টিতে সে ডাক্তারের পানে চাহিল। মাথার উপর তখন দুই চারিটামাত্র নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, আকাশের এক প্রান্ত হইতে ক্ষীণ চাঁদের মৃদু আলোক-কণা জাগিয়া দেখা দিয়াছে—ফেলিসিয়া সম্মুখেই দেখিল, ডাক্তারের অধরের কোণে বক্র একটা হাসির রেখা! তাহার মনে হইল, কঠিন আঘাতে ঐ হাসিটাকে সে চূর্ণ করিয়া দেয়! সে দৃষ্টি, সে বাহু-বন্ধনের অর্থ কি,

তাহা বুঝিতে ফেলিসিয়ার বিলম্ব ঘটিল না —সে নভেল পড়িয়াছিল, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ও দেখিয়াছিল—ঘৃণায় তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ঘন-কম্পিত দীর্ঘ-শ্বাসে ডাক্তারের দুরভিসন্ধি মেঘের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ডাক্তার আপনার অবস্থা বুঝিয়া তখনই জানু পাতিয়া ফেলিসিয়ার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিল। এ শুধু ক্ষণিক মোহ মাত্র! ভ্রান্তি,—দুর্ব্বল ভ্রান্তি শুধু! এমন স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, মধুর বাতাস, —আর সম্মুখে অপূর্ব্ব-রূপিনী তরুণী,—মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চিত্তে বিকার ঘটিয়াছিল! সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল! ক্ষমা, ক্ষমা কর, ফেলিসিয়া! যদি সে জানিত, ডাক্তার তাহাকে কতখানি ভালবাসেন! আপনার প্রাণের অধিক, জগতে তাঁহার যাহা-কিছু আছে, সেই সর্ব্বস্বেরও অধিক ভালবাসেন! দৃষ্টিতে অবজ্ঞা হানিয়া ফেলিসিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,— নির্লজ্জ কাপুরুষ, এ কথা কোন্ মুখে বলিতেছ, তুমি! তুমি না পিতার বন্ধু— চলিয়া যাও—এখনই আমাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দাও।

যন্ত্র-চালিতের মত জেঙ্কিন্স ফেলিসিয়াকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল—গাড়ীতে সে উঠিয়া বসিলে, গাড়ীর মধ্যে মুখ পুরিয়া ক্ষমা চাহিয়া মৃদু স্বরে ডাক্তার কহিল, "এ সম্বন্ধে আর একটি কথা না। তোমার বাপের কাণে গেলে এখনই সে বেচারা মারা যাবে।"

এমনই করিয়া পুরুষ ফাঁদ পাতে,—সরলা নারী না জানিয়া সে ফাঁদে ধরা দেয়! ফেলিসিয়া পা পর্য্যন্ত তখনও কাঁপিতেছিল। সে কোন কথা কহিল না।

ফেলিসিয়ার প্রকৃতি ডাক্তারের জানা ছিল। তাই সে পাষণ্ড পরদিন—যে-মুখে পূর্ব্বদিন বন্ধু-কন্যাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিল, সেই মুখেই হাসি ফুটাইয়া সিবাস্তিয়নের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সিবাস্তিয়ন সহজভাবে অন্য দিনের মতই কথা পাড়িল; ফেলিসিয়া কথাটা তবে সত্যই তাহাকে বলে নাই! জেঙ্কিন্সের প্রাণ জুড়াইয়া বাঁচিল।

পিতাকে ফেলিসিয়া সে কথা বলে নাই, সত্য। নাই বলুক, সেই দিন হইতে কিন্তু তাহার চিত্তে একটা পরিবর্ত্তন আসিল। পুরুষকে সে ঘৃণা করিতে শিখিল, অবিশ্বাস করিতে শিখিল! পিতার উপর রাগ হইতে লাগিল, কেন তিনি তাহাকে সম্মান-রক্ষার উপযোগী শিক্ষা দান করেন নাই! এতদূর দুঃসাহস একটা বৃদ্ধ বর্ব্বরের, যে তাহার অঙ্গে সে হাত দেয়!

কন্যার এ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া পিতা ডাক্তারকে কহিল, "দেখ ত ডাক্তার,— ফেলিসিয়ার মেজাজটা ক'দিন ভাল দেখছি না, ওর কোন অসুখ-বিসুখ হল না ত।" নির্লজ্জ ডাক্তার অচপল কণ্ঠে জবাব দিল, "একটু হজমের গোলমাল হয়েছে—ওষুধ দিয়ে যাচ্চি, ব্যস্ত হয়ো না।" ব্যস্ত হইবার প্রয়োজনও ছিল না।

সিবাস্তিয়নের জীবনের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছিল—দুই-এক দিনের মধ্যেই সে ইহলোকের সহিত সকল দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিল। মৃত্যুর সময় ডাক্তারকে

করিয়া সিবাস্তিয়ন বলিল, "ডাক্তার, ফেলিসিয়াকে তোমারই হাতে দিয়ে গেলুম। ওকে দেখো—ওর আর কেউ নেই!"

ফেলিসিয়া কাঠের মত নিশ্চল ভাবে বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল—এ কথায় এতটুকু সে বিচলিত হইল না। ডাক্তারের কানে কথাটা কঠিন বিদ্রূপের মতই তীব্র ঠেকিল; তবু তিনি গাঢ় স্বরে কহিলেন, "দেখব। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

ফেলিসিয়ার যেন কোন জ্ঞান ছিল না। দুঃখটা এত প্রচণ্ডভাবে তাহাকে আঘাত করিল, যে, তাহার কাঁদিবারও শক্তিও লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, মুহূর্ত্তে যেন পৃথিবীখানা মরুভূমির মতই বিশাল ও অবলম্বনহীন হইয়া পড়িয়াছে। বিপদের রাত্রি অজগরের মতই যেন চতুর্দ্দিক গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই আলোকহীন বিশাল মরু-প্রান্তরের মধ্য দিয়া তাহাকে দীর্ঘ জীবন কাটাইয়া যাইতে হইবে! কোথায় আশ্রয়, কোথায় অবলম্বন! কেহ নাই, কিছু নাই! তাহার উপর সিবাস্তিয়ন এক পয়সা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে নাই। ফেলিসিয়ার স্কন্ধে সংসারটা প্রচণ্ড ভারের মতই চাপিয়া বসিল। সিবাস্তিয়নের আর্টিষ্ট বন্ধুরা আসিয়া পরামর্শ দিল, সব বেচিয়া ফেল। বেচিয়া দেনা শোধ কর! এই ঘর, এই আসবাব-পত্র পিতার স্মৃতিতে ভরপূর রহিয়াছে,—প্রাণ ধরিয়া সেগুলাকে বিক্রয় করা ফেলিসিয়ার শক্তিতে কুলাইল না। চোখের জল মুছিয়া সে বলিল, "পরামর্শ দিয়ো না গো—তোমরা। এ দেনা-শোধের উপায় যেমন করে হোক আমি করবই। কিছু বিক্রী করব না।" বন্ধুর দল ফেলিসিয়ার একগুঁয়েমি দেখিয়া বিরক্ত চিত্তে প্রস্থান করিল।

রাত্রে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ফেলিসিয়া একটা উপায় স্থির করিল। সে তাহার ধর্ম্ম-মা ক্রেনমিজকে বিপদের কথা জানাইয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিল। ক্রেনমিজ উত্তর দিল, "ওদের কথা তুমি শুনো না, মা। তুমি কিছু বিক্রী করো না! যতদিন আমি আছি, তোমার ভাবনা কি? আমার বার্ষিক আয়, পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক—সে ত তোমাকেই দিয়ে যাব। তুমি ছাড়া আমারও আর কেউ নেই। সে টাকা তোমারই। আমি এখানকার সব চুকিয়ে বুকিয়ে ওখানে যাচ্ছি। দুটি মায়ে ঝীয়ে আমরা একসঙ্গে থাকব। বুড়ো বয়সে আমাকেও ত একজনের দেখা চাই। তুমি আমায় দেখবে। তুমি তোমার কাজ নিয়ে থেকো, আমি সংসার দেখবো। সিবাস্তিয়ন গেছে, দুঃখের কথা,—কিন্তু আমি যখন এখনও রয়েছি, তখন তুমি একেবারেই নিরাশ্রয় হওনি।"

চিঠিখানার ছত্রে ছত্রে প্রচুর স্নেহ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। ফেলিসিয়া চিঠি পড়িয়া সুস্থ হইল। তাহার চোখে জল আসিল। চিঠিখানাকে বুকে চাপিয়া উচ্ছ্বসিত আগ্রহে সে কহিল, "তুমি এসো মা—তুমি এসো। এ জনহীন পৃথিবীতে আর আমি একলা থাকতে পারি না। ভয়ে আমার গা শিউরে উঠছে—চারিধারে পাপ আর ভণ্ডামি দেখে মাথা আমি তুলতে পারছি না, মা।"

ক্রেনমিজ আসিল। আপনার গৃহ ছাড়িয়া, বাস ছাড়িয়া ক্রেনমিজ ফেলিসিয়াকে আপনার

স্নেহের নীড়ে আশ্রয় দিল; আসন্ন বিপদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। ফেলিসিয়া সান্ত্বনা পাইল। তাহার মূর্ত্তি-গঠন আবার পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতে লাগিল। এই কলা-চর্চ্চাই তাহার জীবনের একমাত্র সুখ, একমাত্র অবলম্বন। একদিন জেঙ্কিন্স আসিয়া ফেলি-সিয়াকে সাহায্য-দানে অগ্রসর হইলে রুক্ষ স্বরে ফেলিসিয়া সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিল। ডাক্তার ধীরপদে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, ক্রেনমিজ মৃদু স্বরে ফেলিসিয়াকে কহিল, "বেচারা ডাক্তার তোমার বাপের বন্ধু ছিল, ফেলি। তাকে অমন কড়া কথায় বিদেয় করাটা তোমার ভাল হয়নি—একজন পুরুষ অভিভাবক থাকাটা মঙ্গলের কথা! হাজার হোক, তোমার বাবার বন্ধু ত।"

"বন্ধু! হাঁ, বন্ধুই বটে! একটা ভণ্ড বদমায়েস—"

ফেলিসিয়া সহসা আপনাকে সংযত করিয়া ফেলিল। তাহার মনের মধ্যে রোষের যে আগুন জ্বলিতেছিল, সে তাহাকে জোর করিয়া নিবাইয়া দিল।

ইহার পর হইতে ডাক্তার এ গৃহে আসা একেবারে রহিত করিলেন না। মাঝে মাঝে বন্ধু-কন্যার তদ্বির করিতে আসিতেন। শিষ্টাচারের অনুরোধে ফেলিসিয়া তাঁহার প্রতি রোষটাকে আর উচ্ছ্বসিত হইতে দিল না—সহজভাবেই সে কথাবার্ত্তা কহিবে, স্থির করিল। ডাক্তারের মনের উপর যে পাষাণখানা চাপিয়া বসিয়াছিল, এ ব্যাপারে সেখানা অল্পে অল্পে সরিয়া গেল।

একদিন সকালে ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, ফেলিসিয়ার ষ্টুডিওর পার্শ্বের ঘরে ক্রেনমিজ বসিয়া আছে। ডাক্তার তাহাকে অভিবাদন করিয়া ফেলিসিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় ক্রেনমিজ বাধা দিয়া কহিল, "যেয়ো না, ডাক্তার। ও ঘরে কেউ না যায়,—ফেলি মানা করে দিয়েছে। আমি তাই চৌকি দিচ্ছি!"

"তার মানে?"

"মানে, ফেলি কাজ করছে। কেউ যেন এখন তাকে বিরক্ত না করে!"

ডাক্তার নিষেধ না মানিয়া এক পা অগ্রসর হইলেন। ক্রেনমিজ কহিল, "না, না, যেয়ো না। আমায় তাহলে ভারী বকবে, ফেলি।"

"ও ত একলাই আছে?"

"না। নবাব আছেন। নবাবের মূর্ত্তি গড়া হচ্ছে।"

"আশ্চর্য্য! মূর্ত্তি গড়ছে ত আমার যেতে কি—" ডাক্তার গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার বুকে যেন একটা খোঁচা ফুটিল। ফেলিসিয়ার বয়স হইয়াছে, সে ত আর এখন কচি খুকীটি নহে, একটা পুরুষের সহিত নির্জ্জন ঘরে সে একেলা! তিনি সবলে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ক্রেনমিজও শশব্যস্তে তাঁহার অনুসরণ করিল।

দ্বার খোলার শব্দে চকিত হইয়া ফেলিসিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, তীব্র স্বরে কহিল, "এর মানে কি, ডাক্তার? মা—"

ক্রেনমিজ কহিল, "আমি ঢের মানা করেছি মা—তা না শুনে ডাক্তার জোর করে ঘরে ঢুকলেন।"

ফেলিসিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "ডাক্তার—"

সে স্বরে যেন আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। শুনিয়া নবাবও শিহরিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার কোন কথা বলিতে না পারিয়া ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা টানিবার চেষ্টা করিলেন। ফেলিসিয়া কহিল, "যান, যান আপনি— এখনই এ ঘর থেকে চলে যান। কার হুকুমে আপনি—"

ডাক্তার কহিলেন, "কিন্তু শোন ফেলিসিয়া, আমি কি বলি—"

ফেলিসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, "না, কোন কথা শুন্‌তে চাইনে আমি। চলে যান! না হলে এ বেয়াদপির শাস্তি পাবেন—একজন মহিলার ঘরে তার বিনা অনুমতিতে—" সহসা থামিয়া গিয়া ফেলিসিয়া নবাবের দিকে চাহিল, কহিল, "আপনাকে তাহলে আর আটকে রাখব না, নবাব বাহাদুর। বাকীটুকু এখন আপনাকে না পেলেও আমি শেষ করতে পারব। আপনি তাহলে আসুন—"

নবাব কোন কথা না বলিয়া সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। ক্রেনমিজ সঙ্গে আসিয়া দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিল।

নবাব চলিয়া গেলে ডাক্তার কথা কহিবার অবকাশ পাইলেন। তিনি কহিলেন, "ফেলিসিয়া, তুমি পাগল হয়েছ—এ কি তোমার ব্যবহার—!"

"কি ব্যবহার, ডাক্তার?"

"এই লোকটার সঙ্গে একলা তুমি ঘরের মধ্যে বসে আলাপ কর—"

"চুপ কর, ডাক্তার, এ কথা জিজ্ঞাসা করবার তোমার কোন অধিকার নেই।"

"অধিকার আছে, ফেলিসিয়া—আমি তোমার বাপের বন্ধু। তুমি না মানো, তবুও তোমার ভাল-মন্দর জন্য দায়ী আমি—"

ফেলিসিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল। সে হাসির প্রতি কণা যেন তীরের মতই জেঙ্কিন্সের প্রাণে বিঁধিল, তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। ফেলিসিয়া কহিল, "তুমি দায়ী! চুপ কর ডাক্তার—আমি—আমি সে সব পুরোনো কথা ভুলে গেছি। তা আবার নতুন করে মনে পাড়িয়ে দিও না। যাও, না হলে ভাল হবে না।"

"তবু এর আমি কৈফিয়ৎ চাই, ফেলিসিয়া। এই বুনো জানোয়ারটার সঙ্গে এত কি তোমার কাজের কথা ছিল—?"

"জানোয়ার! কাকে জানোয়ার বলছ?"

"এই নবাব—না, বাজে কথায় ভুলিয়ে দিয়ো না। ফেলিসিয়া, তুমি কে, তা একবার ভেবে দেখো। তোমার জন্য ডিউক—সে ত মরে—যত ব্যারণ, ডিউক, তোমার কাছে পাত্তা পায় না—ঐ ছোঁড়া দ্য গেরিটা অবধি যে তোমাকে দুই চোখ দিয়ে গিলে ফেলতে চায়—অথচ ছোঁড়ার অত রূপ, অমন চেহারা—কিন্তু তাকেও তুমি আমোল দাও না—আর এই নবাব, তার উপর তোমার এত টান কেন,—এ আমি জানতে চাই।"

"কেন—শুন্‌বে? তবে শোন, ডাক্তার—নবাবকে আমি বিয়ে করবো।" ফেলিসিয়ার স্বর স্থির, অচপল!

জেঙ্কিন্স চমকিয়া উঠিলেন। কে যেন পাথর ছুড়িয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। মুহূর্ত্তে আপনাকে সম্বরণ করিয়া তিনি কহিলেন, "কিন্তু তুমি জানো তাকে তার এক স্ত্রী

আছে—আর সেই স্ত্রী এখনও অনেক দিন বাঁচবার আশা রাখে। শরীর তার খুবই মজবুত আছে। দু দিন হল, পঙ্গপালের মত একদল ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে নবাবের কাছে এসেছে। তারা সব নবাবেরই ছেলে-মেয়ে—"

ফেলিসিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে কি বলিবে স্থির করিতে পারিল না।

সম্মুখে তাহার নবাবের মূর্ত্তিটা চীৎকার করিয়া যেন কত-কি বলিতেছিল—বিদ্রূপের হাসি জেঙ্কিন্সের চোখের কোণে জড়ো হইতেছিল—ফেলিসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য চৈতন্য হারাইল। সবেগে মূর্ত্তিটার কাছে সে সরিয়া আসিল—আক্রোশে সেটাকে ধরিয়া নাড়া দিয়া চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কাদার মূর্ত্তি কাদা হইয়া ভূমে লুটাইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(৫)

বোম্বাই গিয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেক গ্রন্থ কিনিয়া ফেলিলেন, এবং অধিকাংশ সময়েই ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। এখানে অবস্থান কালে তিনি আরও একটি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন—সে সেতার বাদ্য। এক গুজ্‌রাটী মুসল্‌মান তাঁহাকে সেতার শিখাইত। ক্রমশঃ ওস্তাদের জানা সমস্ত গৎই অভ্যাস করিয়া গুরুর পুঁজি-পাটা প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিলেন। যাহাই হউক এই ওস্তাদের কাছে তিনি সেতারে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

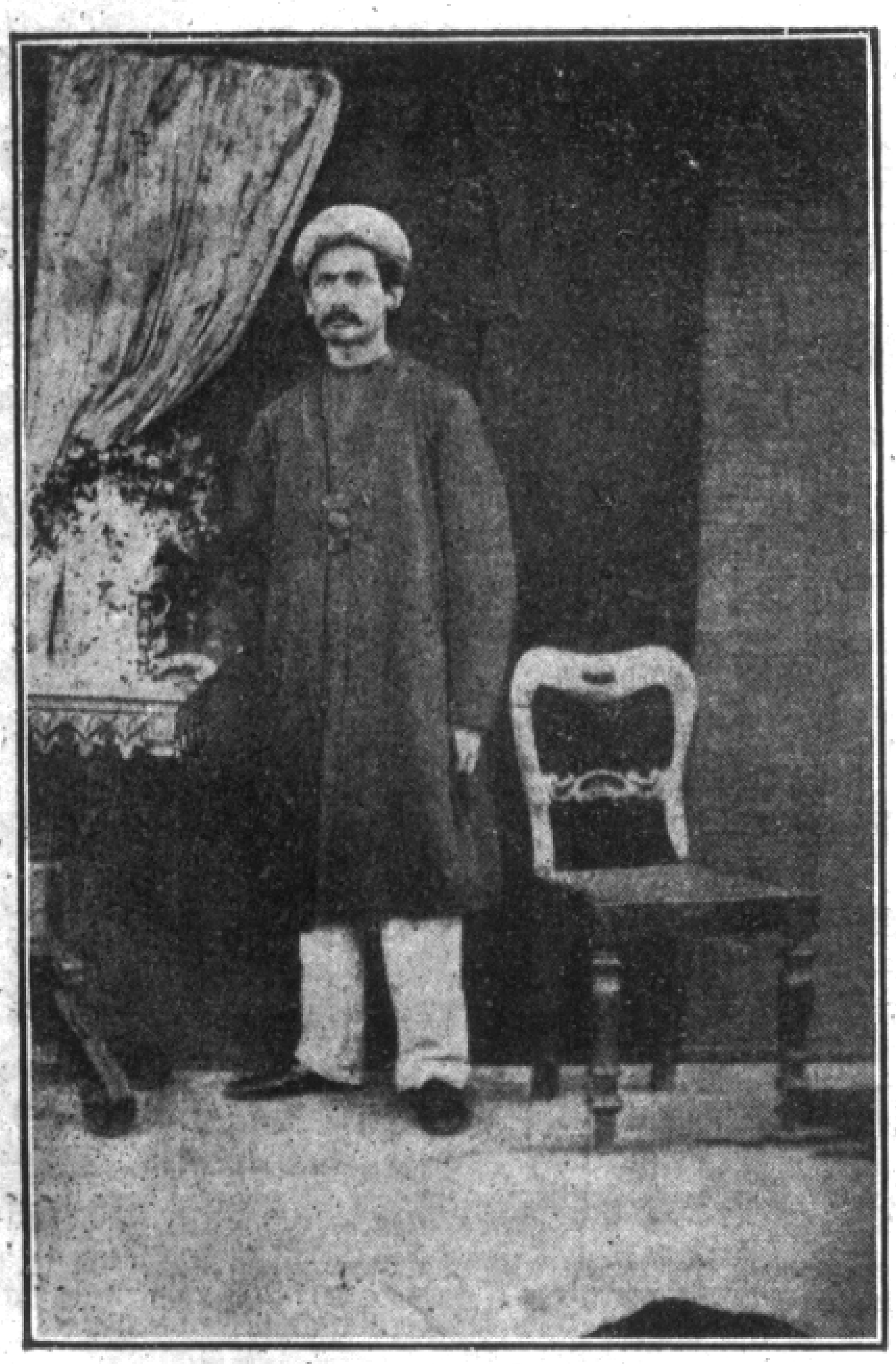
বোম্বাই হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সেতার শুনিয়া বাড়ীর সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বিশেষতঃ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয় তাঁহার সেতার শুনিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। গুণেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে (ostrich) সাত্রোক্ পক্ষীর ডিমের তুম্বে একটি সুন্দর সেতার তৈরি করাইয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। জ্যোতিবাবু এ সেতারটিকে তাঁহাদের বাড়ীর একটা আল্‌মারির উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন, কি করিয়া পড়িয়া সেটি ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি বলিলেন, অভ্যাসের অভাবে এক্ষণে তাঁহার সেতারের হাত আদপেই নাই।

নিম্নে তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"সে সময়ে সেতারের খুব রেওয়াজ ছিল। সৌখীন যুবকেরা প্রায়ই তখন ঐ যন্ত্র শিক্ষা করিতেন। আমার ভগিনীপতি ৺ সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তখন জ্বালাপ্রসাদ নামক একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট সেতার শিখিতেন। তিনি যে সকল গৎ শিখিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্ণৌ ঢং-এর। ওস্তাদ্‌জী আমার শিক্ষিত গৎগুলি শুনিয়া বলিলেন—এগুলি দিল্লী ঢং-এর। দিল্লী

ঢং-এর গৎগুলি একটু বেশী সাদাসিধা। তখন সারদাবাবুর বৈঠকখানায় প্রায়ই প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক প্রভৃতি গুণীগণের জটল্লা হইল। সারদাবাবু একজন সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি বেশ ধ্রুপদও গায়িতে পারিতেন।"

দ্বিজেন্দ্রবাবুর পুরাণো কোন-রকমে কায-চলা একটা পিয়ানো ছিল; দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোতিবাবু তাঁর ঘরে ঢুকিয়া সেই পিয়ানো বাজাইতেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু দেখিতে পাইলেই "ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে" বলিয়া ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেন, কিন্তু জ্যোতিবাবু তবুও সেই পিয়ানো বাজাইবার প্রলোভনটি কিছুতে চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। যাহাই হউক, এম্‌নি করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া পিয়ানোতেও তাঁর একটু হাত হইয়াছিল।



শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইহাঁদের বাড়ীতে একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম্ ছিল, অবসর মত জ্যোতিবাবু সেটির উপরেও সাকৃরেদী চালাইতেন। এমনি করিয়া হার্ম্মোনিয়মেও তাঁর বেশ একটু জ্ঞান জন্মিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম আসিল, তখন এ দেশে এই যন্ত্রটা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে চলিত হয় নাই। সমাজে তখন গানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ সেই যন্ত্র বাজাইতেন। পরে দ্বিজেন্দ্রবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবু যখন ছাড়িয়া দিলেন তখন এই যন্ত্রটি বাজান জ্যোতিবাবুর একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। সমাজে তখন স্বর্গীয় বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী মহাশয় গান করিতেন। ইহাদের বাড়ীতে বোম্বাই অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুদিন গায়ক ছিলেন। জ্যোতি বাবু ইঁহাদের দুইজনের গানের সঙ্গেই হার্ম্মোনিয়াম্ বাজাইতেন। এইরূপে বাজাইতে বাজাইতে, তাঁহার হার্ম্মোনিয়মের হাত বেশ পাকিয়া উঠিল। সকলেই ইঁহার হার্ম্মোনিয়ম বাজনার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জ্যোতি বাবু বলিলেন, "তখন হার্ম্মোনিয়ম-বাদক বলিয়া আমার খুব একটা নাম-ডাক ছিল। কিন্তু এখন কত ভাল ভাল হার্ম্মোনিয়ম্ বাদক হইয়াছে যাহার কাছে আমি কলিকা পাই না।"

ব্রাহ্ম সমাজে এবং বাঙ্গলা গানের সঙ্গে হার্ম্মোনিয়ম বাজান' এই প্রথম সুরু হইল। তৎপূর্ব্বে অনেকেই এই যন্ত্রের সহিত অপরিচিত ছিলেন। জ্যোতি বাবু বলিলেন যে,

"আমার মনে পড়ে, একদিন রামতনু

লাহিড়ী মহাশয় আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একটি নোট্‌বুক্ থাকিত, যাহা কিছু নূতন তাঁহার নজরে পড়িত তাহাই সেই নোট্ বুকে টুকিয়া রাখিতেন। সেই বৃদ্ধের অপরিসীম জ্ঞান পিপাসা ছিল। পিয়ানোর সহিত হার্ম্মোনিয়মের কি তফাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া, সমস্ত তথ্য তিনি তাঁহার নোট্‌বুকে টুকিয়া রাখিলেন। তাঁর "good day," "bad day" ছিল। তিনি যখনই আমাদের এখানে আসিতেন, এক পেয়ালা চা খাইতেন। জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে "উঃ"—"আঃ" করিতে করিতে যখন তিনি আসিতেন তখনই দেখিতাম, সেদিন তাঁর "bad day"। তবু এমনি তাঁর জ্ঞান-পিপাসা, জ্বরে কাতরাইতে কাতরাইতেও, নূতন কিছু দেখিলেই প্রশ্ন করিতে ছাড়িতেন না, এবং যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিতেন তখনি তাঁহার নোট্‌বুকে টুকিতেন। তিনি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। যখনই তিনি আসিতেন, বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে কাছে ডাকিয়া গল্প যুড়িয়া দিতেন। আমার সঙ্গে যখনই দেখা হইত, তিনি আমাকে বলিতেন,—"তোমার ঠাকুরদাদা ৺ দ্বারিকানাথ ঠাকুর মেডিকাল কলেজ স্থাপনের জন্য কত যত্ন ও সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা Medical College এর Record খোঁজ করিলে জানিতে পারিবে।"

হার্ম্মোনিয়ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে সমাজে বিষ্ণু বাবুর গানের সঙ্গে মান্না নামে একজন হিন্দুস্থানী সারঙ্গ বাজাইত। এই মান্নার মত নিপুণ সারেঙ্গী কলিকাতায় তখন আর কেহই ছিল না। পরে হার্ম্মোনিয়ম আসিলে সারঙ্গ উঠিয়া গেল। জ্যোতিবাবু বলিলেন; "ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে হিন্দু রাগরাগিণী ঠিকমত বাজান একরূপ অসম্ভব।"

মান্নার একটা অদ্ভুত শখ্ ছিল। বাড়ীতে সে সদা সর্ব্বদা মহাদেবের মত সাপ জড়াইয়া বসিয়া থাকিত। সাপও সব কেউটে গোক্ষুরা প্রভৃতি বিষাক্ত সাপই ছিল। সাপগুলিকে গায়ে জড়াইবার আগে সে তাহাদের বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিত। কিন্তু ভাঙ্গিয়া দিলেও নাকি আবার গজায়, তাই সাপের দংশনেই অবশেষে তাহার মৃত্যু হয়।

মহাত্মা রামমোহন রায় মহাশয়ের আমল হইতেই কৃষ্ণ ও বিষ্ণু দুই ভাই সমাজের গায়ক ছিলেন। কৃষ্ণকে জ্যোতি বাবু কখনও দেখেন নাই—তাঁহাদের সময়ে বিষ্ণুই গান করিতেন। অন্যান্য ওস্তাদদের গানের চেয়ে বিষ্ণুর গানই সকলে পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গান করার একটা বিশেষত্বও ছিল। ওস্তাদেরা যেমন রাগিণীকে তান-অলঙ্কারে ছেয়ে ফেলে, তাহাতে রূপের চেয়ে অলঙ্কারেরই প্রাধান্য হয়, বিষ্ণু তেমন কিছু করিতেন না। তিনি অল্প-স্বল্প তান দিতেন বটে কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। ইহা ছাড়া, গানের কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটীও পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং পদ দুইই বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ অপেক্ষা খেয়ালই বেশী গাইতেন। বিষ্ণুর এই হিন্দি গান ভাঙ্গিয়া সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা

করেন। এই সময়ে সত্যেন্দ্র নাথের গান লোকে খুব ভালবাসিত। তঁাহার রচনায় এমনি একটা সহজ সুন্দর কবিত্ব ছিল এবং সুরের সঙ্গে ভাবের এমনি একটা মাথামাখি ছিল যে তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত।

তারপর সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই চলিয়া গেলে, জ্যোতিবাবু, তাঁহার সেজ্ দাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ) ও বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতেন। এই বিষয়ে মহর্ষিদেব তাঁহাদের খুব উৎসাহ দিতেন।

তখন বড়বড় গায়কদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হইত। জ্যোতিবাবুর তিনজনকে বেশ স্পষ্ট মনে আছে ঃ—রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার রাজচন্দ্র রায় এবং যদু ভট্ট। রমাপতি নিজে একজন ভাল গায়ক ত'



হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিলেনই, তার উপর তিনি নিজেও অনেক গান রচনা করিতেন। সে সমস্ত গান এখন আমাদের দেশে সুপরিচিত। তাঁর গানের শেষে "রমাপতি ভণে" বলিয়া ভণিতা থাকিত। যদু ভট্টও নিজে হিন্দি গান রচনা করিতেন। তাঁহার গানের সুর-বিন্যাসে যথেষ্ট নিপুণতা এবং মৌলিকতা ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি পাখোয়াজের নূতন নূতন অনেক উৎকৃষ্ট বোলও রচনা করিতেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "আমি দেখিয়াছি কলিকাতার তখন কোন কোন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী তাঁহার নিকট বোল আদায় করিবার জন্য বাস্তবিকই তাঁহার পায়ে তৈল মর্দ্দন করিত। ইঁহাদের গান ভাঙ্গিয়া তখন আমি এবং বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) আমরা অনেক ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম। কি সৌখীন কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলে, সেইটি টুকিয়া লইয়া আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্ম সঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালায় সঙ্গীতের উন্নতি এমনি করিয়াই হইয়াছে। এর পরেই শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের আমল। তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভা এখন ব্রহ্ম সঙ্গীতকে প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। নানা সুর, নানা ভাব, নানা ছন্দ, নানা তাল ব্রহ্মসঙ্গীতে আজ তাঁহারই দেওয়া। তাঁর বীণা এখনও নীরব হয় নাই।"

তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় সঙ্গীত চর্চ্চাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। নাটক অভিনয় করিবার দিকেও তাঁহার ঝোঁক্ ছিল। এবিষয়ে তাঁহার গুণু

দাদারও খুব অনুরাগ ছিল। তাঁহারা দুজনে মিলিয়া বাড়ীতেই একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি করিলেন। অভিনয়, তাহার আয়োজন, অভিনয়োপযোগী নাটকনির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল। সমিতির গৃহ হইল, তাঁহাদেরই "ও-বাড়ী"তে। সমিতির নাম হইল Committee of five। কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবাবু, অক্ষয়বাবু (চৌধুরী) জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি ৺ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচ জনে এই নাট্য সমিতির সভ্য হইলেন।

কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা। জ্যোতিবাবু পূর্ব্বে যখন কেশববাবুদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন, তখন হইতেই কৃষ্ণবিহারী বাবুর সঙ্গে তাঁহার আলাপপরিচয়।

"কৃষ্ণবিহারী বাবু ইতিপূর্ব্বে "বিধবা বিবাহ" নাটকে পড়ুয়ার পাঠ গ্রহণ করেন। তাই এই বিষয়ে তাঁহার একটু অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া আমরা মানিতাম। তিনিই আমাদের অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন।"

প্রথমে মহাকবি মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" নাটক অভিনীত হইল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারীর জননীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় খুব ভালই হইয়াছিল। সকলেই অভিনেতা ও অভিনয় পারিপাট্যের খুব প্রশংসা করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

নীচের ঘরে অহোরাত্রই—হয় নাচ, নয় গান, নয় বাদ্য, নয় "পঞ্চজনে"র নাট্য-সমিতিতে বাদানুবাদ কিছু না কিছুর একটা গোলমাল চলিতই। বাড়ীখানি সারাদিন হাস্যকলরবে ও গানবাদ্যে মুখরিত হইয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বামাচরণ বলিয়া একজন যাত্রাদলের ছোক্‌রা আসিয়া নাচগানে তাঁহাদের আমোদ বর্দ্ধন করিত। তাঁহাদের একটা "Eating Club"ও ছিল। সে ক্লবে পালা করিয়া এক একজনের খাওয়াইতে হইত। সে ভোজের বেশী আড়ম্বর ছিল না। লুচি কচুরী সন্দেশাদি খাইয়াই সকলে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিত। ক্রমশঃ একতলার ঘরে, এইরূপ আমোদ ও রিহার্শ্যালের মাত্রা এত অধিক চড়িয়া উঠিল যে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দোতালাবাসী অভিভাবকগণ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ফলে রিহার্শ্যালের মাত্রা কিছু কমিয়াছিল, কিন্তু ভিতরের উদ্দীপনা পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল।

পরে মধুসূদনের আরও একখানি নাটক "একেই কি বলে সভ্যতা"র অভিনয় হইয়া গেল। জ্যোতিবাবু সার্জ্জন সাজিয়া ছিলেন। এ সব অভিনয়ে প্রধান শ্রোতার দল—তাঁহাদেরই বাড়ীর লোক, কখনকখনও দুই একজন বন্ধুবান্ধবও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন।

বাড়ীর লোকে বরাবরই এ সমস্ত ছেলেখেলা ভাবিতেন। কিন্তু এখন বেশ দেখা যাইতেছে যে এই ছেলেখেলার ভিতর দিয়া কেমন নীরবে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা দিক দৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহারা দেখিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনয়োপযোগী নাটক মাত্র দুই তিনখানি। কিন্তু তাহাতে লোকশিক্ষার মত কোন' জিনিষই নাই। আমোদের পরিসমাপ্তি আমোদে না হইয়া

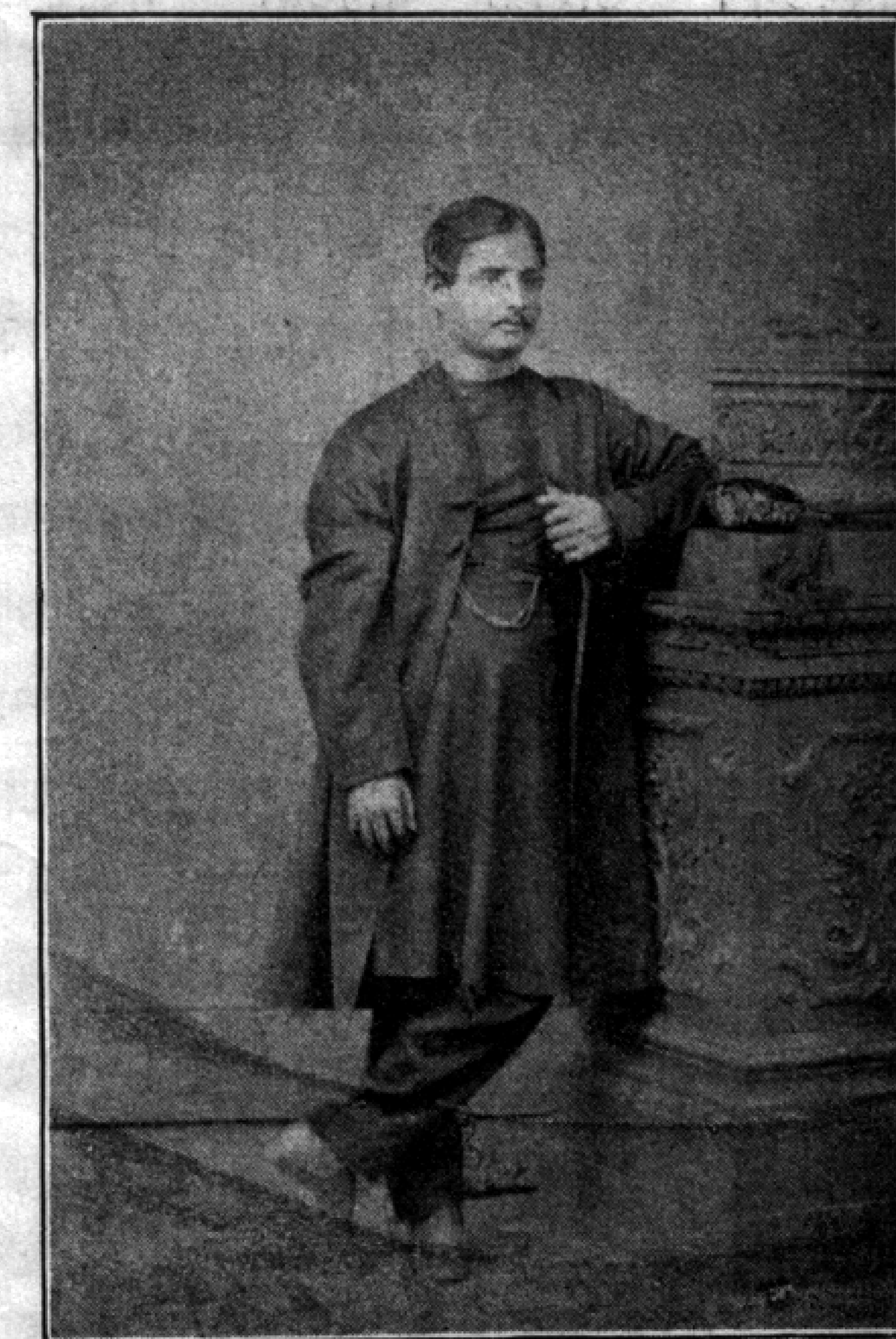
যাহাতে শিক্ষার হয়, তজ্জন্য ইঁহারা একটু চঞ্চল হইলেন। তৎক্ষণাৎ Committee of fi∧e ইঁহাদের পূর্ব্বকথিত "স্যার" গৃহশিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর নিকট গিয়া তাঁহাকে সামাজিক নাটকের উপযোগী বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ঈশ্বরবাবু ঠিক করিয়া দিলেন—বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়। বিষয় যেমন স্থির হইল, অমনি কাগজে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে যিনি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উপর একখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক রচনা করিতে পারিবেন, এবং যাঁহার রচনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রাপ্ত রচনা পরীক্ষার জন্য বিচারক নিযুক্ত হইলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কৃষ্ণবিহারী বাবুর ছোট কথা পছন্দ হইত না বলিয়া তিনি বিচারকের ইংরাজীতে নাম দিলেন "Adjudicator !"

অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকখানি নাটক পাওয়া গেল, কিন্তু পুরস্কার প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া একখানিও বিবেচিত হইল না। এরূপ প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ সুফল ফলিল না দেখিয়া Committec of five স্থির করিলেন যে, একজন প্রসিদ্ধ নাটককারের উপর ভার অর্পণ করাই সুবিধাজনক। তখন বাঙ্গলা লেখক অতি অল্পই ছিল। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এ সময়ে "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই শেষে এ ভার প্রদত্ত হইল। তিনি একখানি সামাজিক নাটক লিখিতেও স্বীকৃত হইলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেনঃ—"পণ্ডিত রামনারায়ণ ইংরাজি জানিতেন না, তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শে নাটক রচনা করিতেন। তাঁহাকেই প্রকৃতরূপে আমাদের National dramatist বলা যাইতে পারে।"

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন আর যাহাতে ছেলেমানুষী অথবা কোনরূপ "ধাষ্টামো" না হয়, সেজন্য তাঁহারাই এ কার্য্যের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এবং পুরস্কারের পরিমাণও পাঁচশত করিয়া দিলেন। জ্যোতিবাবুরা যেমন নিস্কৃতি পাইলেন তেমনি অধিকতররূপে উৎসাহিতও হইয়া উঠিলেন।

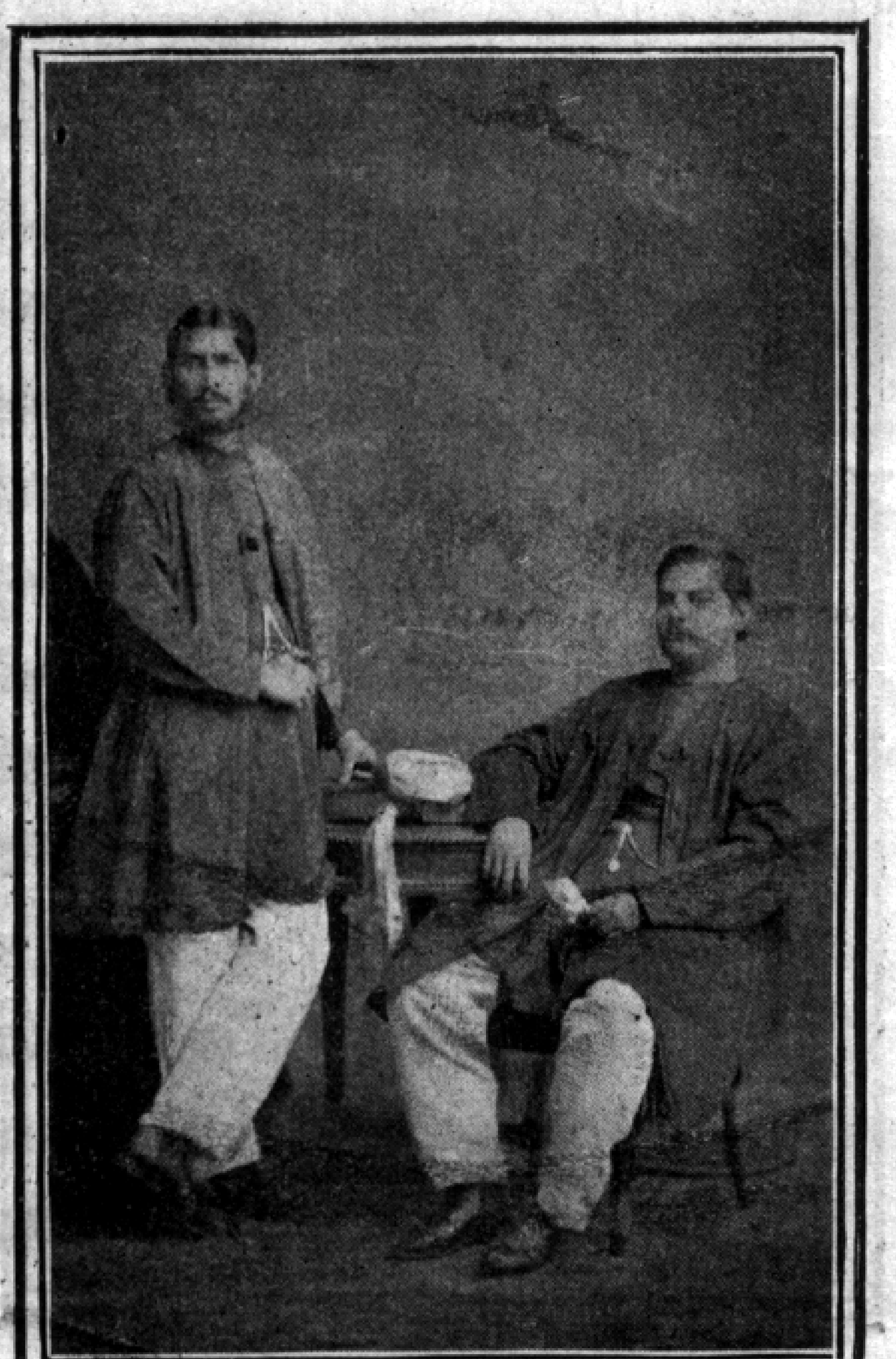
নাটক রচিত হইল। নাটকের নাম ছিল "নবনাটক"। যেদিন এই উপলক্ষ্যে তর্করত্ন মহাশয়কে পুরস্কার প্রদান করা হয় সে একটি স্মরণীয় দিন। কলিকাতার সমস্ত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, সভার মধ্যস্থলে একটা রূপার থালায় নগদ ৫০০৲ টাকা সাজাইয়া রাখা হইল এবং সভাস্থলে নাটকখানি আগাগোড়া পঠিত হইল। শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। তখন ঐ পাঁচ শত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রদান করা হইল। তিনিও ইহাতে খুব খুসী হইলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "পণ্ডিত রামনারায়ণের এই "নবনাটকে" একটু বিদেশী আদর্শের গন্ধ আছে। আমাদের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কোন বিয়োগান্ত নাটক নাই; তিনি ইংরাজি

শিক্ষিত লোকদিগের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়া এই সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিলেন।



সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

"এখন "বড়"র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইতে লাগিল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া Scene আঁকিতে লাগিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবর-তটস্থ "জগমন্দির" প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত ভগিনীপতি ৺নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি) সাজিলেন নট, আমার নিজের এক ভগিনীপতি ৺যদুনাথ "চিন্তুতোষ"



নীলকমল মুখোপাধ্যায় ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়

আর এক ভগিনীপতি ৺সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশ বাবুর বড় স্ত্রী। এবং আমাদের অন্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জন্য অন্যান্য পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু ইহাতেও কুলাইল না। বাহির হইতেও অভিনেতার আমদানী করিতে হইল। ক্রমে আফিসের কর্ম্মচারী কতকগুলি ভদ্রলোক অভিনয়ে যোগ দিলেন। শেষে অভিনয়ে যোগ দিবার জন্য অনেক উমেদার আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন পরীক্ষা করিয়া করিয়া অভিনেতা নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল। তারপর সমস্ত ভূমিকা স্থির হইয়া গেলে, দোতলার বড় ঘরে রিহার্সাল বসিয়া গেল। প্রথমে শুধু পাঠ চলিতে লাগিল। দুই একজন সমজদার লোক উপস্থিত

থাকিতেন। তাহারা পাঠভঙ্গী সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন ও ভুল সংশোধন করিয়া দিতেন। তারপর ক্রমে অঙ্গভঙ্গীর শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। এইরূপ ছয় মাস কাল যাবৎ রিহার্সাল চলিল। আবার রাত্রে বিবিধ যন্ত্রসহকারে কন্‌সার্টের মহলা বসিত। আমি কন্‌সার্টে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতাম।

এইরূপে অভিনয়ের উদ্যোগ আয়োজনে কিছুকাল আমাদের খুব আমোদে কাটিয়াছিল। তারপর যেদিন প্রকাশ্য অভিনয় হইবে সেই দিন এক অভাবনীয় কাণ্ড উপস্থিত হইল। যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইয়াছিল, অভিনয়ের ঠিক্ পূর্ব্বেই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইবার ভয়ে সাজ-ঘরে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে, আমাদের বাড়ীর ডাক্তার দ্বারি বাবু উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই খাড়া করিয়া তুলিলেন। অন্য সকলেই, যথাসময়ে ষ্টেজে প্রবেশ করিয়া অভিনয় করিতে লাগিল। কেবল স্ত্রীবেশে-সজ্জিত আমার কবি-বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী শেষ মুহূর্ত্তে কিছুতেই সাহস করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। আমাদের অনুরোধ উপরোধ সবই ব্যর্থ হইল। কি করা যায়, অগত্যা তাঁহাকে বাদ দিতে হইল।

অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (Scene) অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিবার জন্যও অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল। বনদৃশ্যের সিন্‌খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যকার বনের মতই বোধ হইত। এই সব জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহাদের পারিশ্রমিকস্বরূপ এক একটি পোকার দাম দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইত।

অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীরমধ্যে কখন বা হাসির ফোয়ারা ছুটিত, কখন বা



ডাক্তার দ্বারিকানাথ গুপ্ত

অশ্রুজলের ধারা বর্ষিত হইত। যখন গবেশ বাবুর ছোট গিন্নি ও বড় গিন্নি, গবেশবাবুর এক এক পা দখল করিয়া তৈল মর্দ্দন করিবার জন্য পা লইয়া টানাটানি করিত—ঝগড়া করিত,—বলিত—"এটা আমার পা, তুই আমার পা-টায় কেন তেল মাখা'চ্ছিস" ইত্যাদি, এবং তখন গবেশবাবুর যেরূপ অবস্থা ও মুখভঙ্গী হইত তাহা দেখিয়া দর্শকেরা হাসিয়া খুন হইত। বড় স্ত্রী গবেশবাবুকে বশ করিবার জন্য "ঔষধ করায়" গবেশবাবুর উদরটা ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিয়াছিল। গবেশবাবু যখন তাহার লম্বোদরটি আরও ফুলাইয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে বসিতেন, তখন সেই দৃশ্যই সকলের হাস্যোদ্রেক করিত; আবার ডাক্তার দ্বারিবাবু কিংবা ডাক্তার বেলি সাহেব দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত থাকিলে, তিনি রোগের যন্ত্রণায় কাত্‌রাইতে কাত্‌রাইতে ক্ষীণকণ্ঠে যখন বলিতেন, "একবার দ্বারিবাবুকে ডেকে আন," "বেলি সাহেবকে ডেকে আন"—তখন ডাক্তারেরা খুব খুসী হইতেন, এবং দর্শকমণ্ডলীর মধ্যেও একটা হাসির রোল পড়িয়া যাইত। অক্ষয়বাবুর অভিনয়ে একটা বিশেষত্ব এই ছিল, তিনি বই ছাড়া অনেক কথা উপস্থিত মত নূতন বানাইয়া বলিতেন। আমরা তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"অত লোকের সাম্‌নে বেহায়ামি করিতে আপনার কি একটুও সঙ্কোচ হয় না?" তিনি বলিলেন:—"আমার একটা মন্ত্র আছে, আমি তখন দর্শকদিগকে বানর বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি।" আমার ভগিনীপতি ৺যদুনাথও খুব একজন ভাল Comic Actor ছিলেন—তিনিও উপস্থিত মত মন-গড়া অনেক কথা বলিয়া দর্শকদিগকে হাসাইতেন। গবেশবাবুর পারিষদ "চিত্ত-তোষের" পাঠে তিনি প্রতিপদে গবেশবাবুর বাক্য "জল উঁচু-নীচু"-ধরণে সমর্থন করিয়া লোকের হাস্যোদ্রেক করিতেন। আর একবার হাস্যের তরঙ্গ উঠিত যখন চ্যাপটা-নাক, রং-ফরসা "রসময়ী" গোয়ালিনী দুধের কেঁড়ে কাঁকে প্রবেশ করিয়া "কৌতুকের" সহিত রসালাপ করিত,। শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী এই "কৌতুকে"র পাঠ লইয়াছিলেন। তিনিও একজন Comic Actor। অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই ভবরঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, কেবল একমাত্র তিনিই এখনও স্বশরীরে বর্ত্তমান। আমার এক শ্যালক ৺অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছোট গিন্নির ভূমিকায় যখন আর্শির সম্মুখে বসিয়া, প্রসাধন করিতেন ও যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা রূপসীর হাব-ভাব প্রকাশ করিতেন, তখন সে অভিনয়েও দর্শকেরা খুব আমোদ পাইত। আর দুইজন tragic Actor ছিলেন। ৺বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃত লালের জ্যেষ্ঠ) যখন সুবোধের ভূমিকায় সংসার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গৃহ ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া নৈশ অন্ধকারে বন-বাদাড় দিয়া চলিয়াছেন এবং যখন ৺সারদাপ্রসাদ বড় স্ত্রীর ভূমিকায়, সপত্নীর জ্বালায় দগ্ধ হইয়া মর্ম্মভেদী আক্ষেপোক্তি করিতেন, তখন দর্শকবৃন্দ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না। তারপর গবেশবাবুর মৃত্যু হইলে, "অমলা" "কমলা" "চন্দ্রকলা" প্রভৃতি গবেশবাবুর পুরস্ত্রীগণ এরূপ মড়াকান্না যুড়িয়া দিত

যে পাড়ার লোকদিগের আতঙ্ক উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রাম নারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া "যা—রা পলাট্ (plot) নাই, পলাট্ নাই বলে এখানে এসে একবার দেখে যাক্'', সমালোচকদিগের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিয়া তিনি আস্ফালন করিতে লাগিলেন।"

এ নাটকখানি দর্শকগণকে এত মোহিত করিয়াছিল যে, তাঁহাদের অনুরোধে একাধিক রজনী "নবনাটক" অভিনীত হইয়াছিল। যে উদ্দেশ্যে এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম তাহা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কেননা "নবনাটক' তখন দেশে বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।

একদিনকার অভিনয়ে একটা বেশ কৌতুককর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। জ্যোতিবাবু নটীর বেশ পরিয়াই সাজঘরে (Green room) কন্‌সার্টের সহিত হার্ম্মোনিয়ম্ বাজাইতেছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত Seton Car সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কন্‌সার্ট শুনিবার জন্য এবং কি কি যন্ত্রে কন্‌সার্ট বাজিতেছে দেখিবার জন্য কন্‌সার্টের ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। ঢুকিয়াই "Beg your pardon, জেনানা, জেনানা" বলিয়া অপ্রতিভ হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, জেনানা কেহই ছিলেন না, যাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তিনি স্ত্রী-সাজে-সজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

নটীবেশে জ্যোতিবাবুকে সংস্কৃত রচিত একটি বসন্তবর্ণনার গান গাহিতে হইত। তাহার প্রথম লাইন ছিল—

"মলয়ানিল পরিহার পুরঃসর" ইত্যাদি।

তখন কন্‌সার্ট পদবাচ্য ভাল কন্‌সার্ট ছিল না বলিলেই হয়। এক ছিল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে; তার পর "নব নাটক" উপলক্ষ্যে এ বাড়ীতে আর এক দল হইয়াছিল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাবু তখন এই কন্‌সার্টের গৎ তৈরি করিয়া দিতেন। তারপর এখন ত গলিতে গলিতে কনসার্ট। তখনকার হইতে বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

লেডি হার্ডিং

গত ১১ই জুলাই বিলাতের কোন শুশ্রূষাগৃহে (Nursing Home) বড় লাট পত্নী লেডি হার্ডিংএর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা কতদূর দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিবার নহে। আমরা প্রকৃতই যেন আত্মীয়বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে লেডি হার্ডিং ভারতবাসীর কতখানি হৃদয়

যে অধিকার করিয়াছিলেন তাহা এই দুর্ঘটনা জনিত অসংখ্য সভাসমিতিতে এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ নানাপ্রকার আয়োজনে প্রতীয়মান হইতেছে।

তাঁহার মৃত্যুর পর বোম্বাইয়ের "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" লিখিয়াছে—"Lady Hardinge was essentially a womanly woman"—একথাটি যে কতদূর সত্য তাহা প্রত্যেক ভারতবাসী—বিশেষত ভারতীয় নারীরা—মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। আরও বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, নারীমঙ্গল যে সকল কার্য্যে তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন তাহার কিছুই শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, লেডি হার্ডিং জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিংএর সহিত বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সহিত পারস্য, সেণ্ট-পিটার্সবর্গ প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন।

ভারতে আসিয়া তিনি কেবল মাত্র



লেডি হার্ডিং

সভাসমিতিতে যোগদান, বিদেশে ভ্রমণ, কিম্বা পরিতোষিক বিতরণ করিয়াই সময়ক্ষেপ করেন নাই। লর্ড হার্ডিং যেমন সর্ব্বদা রাজকার্য্যে নিযুক্ত তিনিও সেইরূপ নারী ও শিশুদিগকে সুস্থ ও সবল করিবার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নিম্ন লিখিত সৎকার্যের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত এবং এই সৎকার্য্য গুলির জন্যই তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ের এত খানি স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(১) অশিক্ষিত "দাই" ও "নার্স" দিগকে সেবাকার্য্যে সুশিক্ষিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যালয় স্থাপন।

(২) যে সকল নারীর সাধারণ হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আপত্তি আছে তাহাদের জন্য গৃহে গৃহে চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত।

(৩) বিভিন্ন প্রদেশে নারী চিকিৎসালয় স্থাপন।

(৪) লেডি হার্ডিংএর প্রধান কীর্ত্তি, দিল্লীতে সমগ্র ভারতের জন্য "নারী-চিকিৎসালয়"—স্থাপন। এই চিকিৎসালয়ের ভিত্তি তিনি নিজেই স্থাপন করিয়া যান এবং এই জন্য ১৪ লক্ষ টাকাও সংগ্রহ করেন।

(৫) দিল্লিতে প্রবেশ কালে যেদিন লর্ড হার্ডিং মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পান সে দিন স্মরণীয় করিবার জন্য লেডি হার্ডিং লর্ড হার্ডিংএর জন্মদিনে "শিশুরদিন" ("children's day") উৎসব অনুষ্ঠিত করেন। এই দিনে বিভিন্ন সহরে ও

গ্রামে স্কুলের ছেলেরা একত্র হইয়া আনন্দ ও উৎসবে নিযুক্ত থাকে।

উপরে সংক্ষেপে লেডি হার্ডিংএর সৎ-কার্য্যগুলির তালিকা দেওয়া গেল। এই সকল সৎকার্য্যগুলি যে ভারতের পক্ষে কত উপকারী তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দিল্লিতে প্রবেশকালে যখন লর্ড হার্ডিং হঠাৎ আহত হন তখন তিনি তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়াও এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিচলিত না হইয়া স্বামীর সেবা ও শুশ্রূষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার এই সাহসে মুগ্ধ হইয়া ইউরোপীয় ও ভারতীয় নারীগণ তাঁহাকে একটি 'casket' প্রদান করেন।

গত ২১এ মার্চ্চ লর্ড হার্ডিং তাঁহার পত্নীকে বোম্বায়ে বিদায় দিয়া আসেন। এত শীঘ্রই যে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইবে কেহই জানিত না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসরও পার হয় নাই।

তাঁহার নাম ও সৎকার্য্যগুলি স্মরণীয় করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন হইতেছে, কলিকাতায় তাঁহার একটি তৈলচিত্র স্থাপন হইবে এইরূপ ঠিক হইয়াছে। আমাদের মতে তাঁহার প্রস্তাবিত দিল্লির "নারী-চিকিৎসালয়"টি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই তাঁহার প্রকৃত স্মৃতিরক্ষা হইবে। ইহার জন্য ১৪ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বশুদ্ধ ২০ লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই কয়েক লক্ষ টাকা কি সমগ্র ভারত হইতে সংগৃহীত হইবে না?

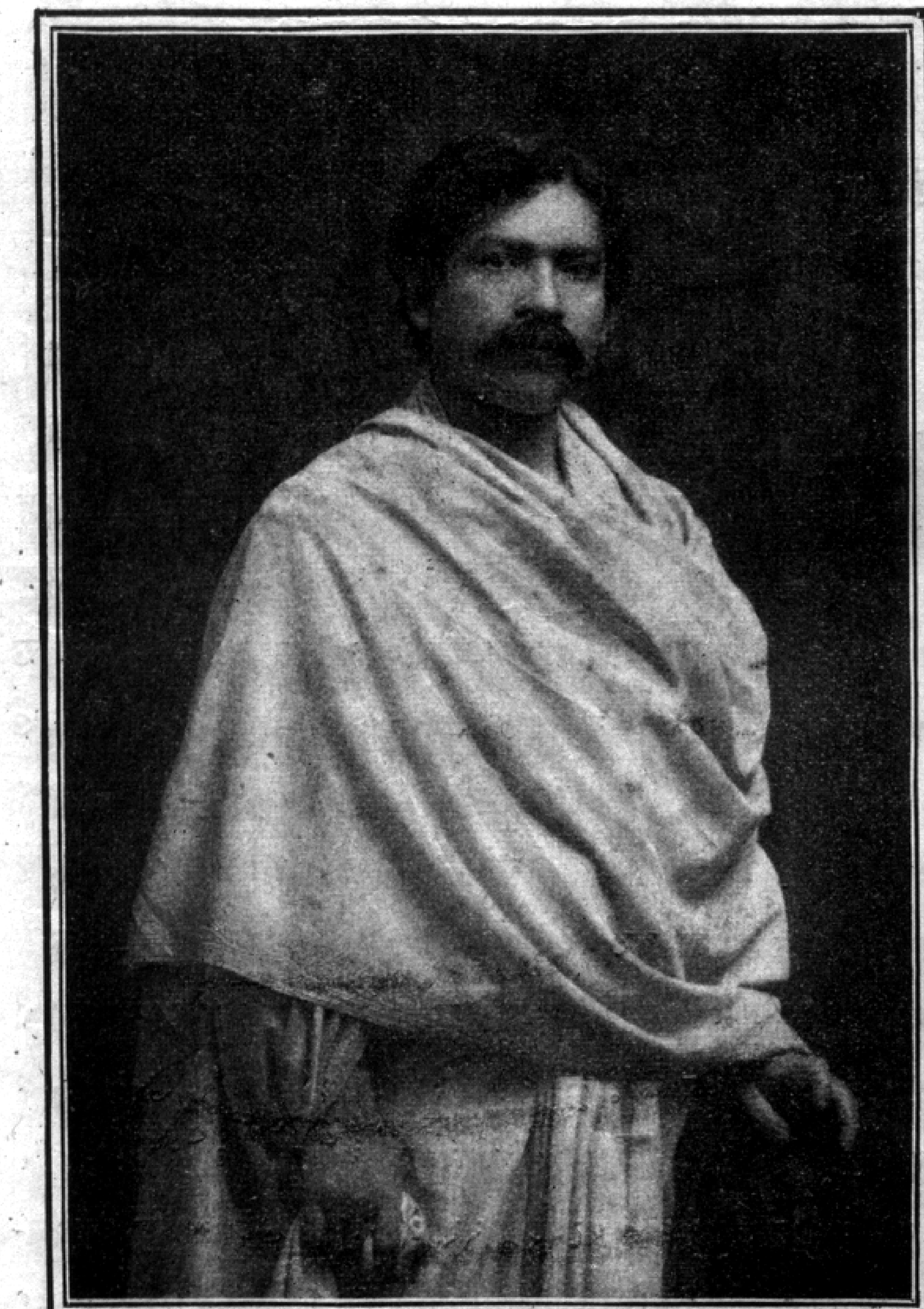
ডাঃ জগদীশ চন্দ্র বসু

আজ কাল সংবাদপত্র খুলিলে প্রায়ই দেখা যায় যে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানসমাজে প্রচার করিয়া ইউরোপীয় সুধীবৃন্দকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেছেন। এতদিন পরে ভারতবর্ষ শিষ্যভাবে নহে, সমকক্ষ ভাবে নহে, গুরু ভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল—ইহা যে কত বড় আশার কথা তাহা প্রত্যেক ভারতবাসী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নবাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া, তাঁহার এই আবিষ্কার গুলি কিরূপ ভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহাই বলিব। বিলাতের "রয়াল সোসাইটির" নাম বোধ হয় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন; এই বিজ্ঞান সভা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানালোচনার প্রধান স্থান। এই বিজ্ঞান-সভার সম্মুখে বক্তৃতা করা কেবল মাত্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দিগের ভাগ্যে ঘটে। এই রয়েল সোসাইটিতে তাঁহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি প্রচার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আচার্য্য বসু মহাশয় বিলাত গিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও তিনি একবার এই সভায় বক্তৃতা করেন।

তাঁহার বক্তৃতা দিনের (Friday Evening discourse) সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sir James Dewer.

উদ্ভিদের যে আমাদের মত প্রাণ আছে, সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে এই সভার সম্মুখে তিনি সেদিন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। কোন গাছ লাজুক ও অলাজুক, কোন গাছ অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া দেয়, আর যখন মৃত্যু আসিয়া গাছকে পরাভূত করে তখন কি করিয়া হঠাৎ সর্ব্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়—এই সকল সাড়ার প্রণালী তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের দ্বারা সকলকে দেখাইয়াছেন। সকালবেলা উদ্ভিদেরা যে আমাদের মত অসাড় এবং দ্বিপ্রহরের গরমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ঝড় কিম্বা দৈব দুর্য্যোগের সময় মৌনভাব অবলম্বন করে—স্নান করাইয়া লইলে গাছের জড়তা দূর হয়—ক্লোরোফরমে ডুবাইয়া রাখিলে গাছের সংজ্ঞা লোপ পায়—গাছের এই সব যে স্বতঃ স্পন্দন তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই যন্ত্রের নাম তরুলিপি যন্ত্র। এই যন্ত্রের সুক্ষ্মতা ও আশ্চর্য্যরূপ প্রস্তুতপ্রণালী দেখিয়া ইউরোপের অনেক বৈজ্ঞানিক প্রথমে বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই যে ইহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত।



ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু

তাঁহার লণ্ডনের আবাস "Maida vale" বৈজ্ঞানিক-দিগের তীর্থ স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনৈতিক আর্থার ব্যালফুর তাঁহার গৃহে আসিয়া এই তরু-লিপি যন্ত্রে উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দন প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিলাতের বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক Starling এবং Oliver স্বীকার করিয়াছেন যে আচার্য্য বসুর এই নূতন তত্ত্বগুলি অনেক বৈজ্ঞানিক ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া উদ্ভিদ জগতের অনেক উপকার সাধিত করিবে। "MetaPhysics of nature" পুস্তকের গ্রন্থকার বলিয়াছেন কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে এমন নূতন আবিষ্কার আর হয় নাই।

আচার্য্য বসুর সম্বর্দ্ধনা কেবল মাত্র ইংলণ্ডেই আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই; তাঁহার এই নবাবিস্কৃত তত্ত্বগুলি পৃথিবীর সুধীবৃন্দের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত ২৭শে জুন তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়ানাতে গমন করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি Imperial Universityর সম্মুখে নিজের আবিষ্কারগুলি প্রমাণদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টার অধ্যাপক Rolisch আচার্য্য বসুকে ধন্যবাদ দিবার সময় বলিয়াছেন যে এই আবিষ্কারগুলির জন্য সমগ্র ইউরোপ ভারতবর্ষের নিকটে ঋণী। ভিয়েনার কয়েকজন বিখ্যাত উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ আচার্য্যবসুর এই নূতন তত্ত্বগুলি শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

এতদিন পরে আচার্য্যবসু জড় ও জীবের মধ্যে ঐক্য সাধন করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিলেন। ভারতবর্ষের পুরাতন ঋষি বাক্য "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" এতদিনে ইয়োরোপে প্রচারিত হইল। তাঁহার এই বিজয়বার্ত্তায় বঙ্গজননী ধন্য হইলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা সফলতা লাভ করুক ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ইউরোপে যুদ্ধ

অনেকদিন হইতে রাজনৈতিকেরা পৃথিবীতে একটা সুখের রাজ্য (Utopia) স্থাপনের আশা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এই কাল্পনিক রাজ্য কেবল কল্পনায় শেষ না হইয়া অনেকবার সঙ্কল্পে পরিণত হইয়াও উদ্যোগীগণের চেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ করিয়াছে। বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার একবার এইরূপ এক বিশ্বরাজ্য (World State) স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; পবিত্র রোমরাজ্যও (Holy Roman Empire) এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। তারপর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এইরূপ একটা উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হন। এই তিন চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে হেগ-শান্তিসভা, আন্তর্জাতিক সালিসী সভা প্রভৃতি সভা-সমিতিগুলি পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপনে প্রবৃত্ত আছে। মহামতি কার্ণেগীও এই জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সকলেরি আশা ছিল পৃথিবীর সমস্ত জাতি আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগে এই কাল্পনিক সুখরাজ্যকে বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। দার্শনিক ও রাজনৈতিকের এই সুখ-স্বপ্ন এতদিনে আকাশ কুসুমে পরিণত হইল। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হউক—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। কিন্তু এই শান্তি-স্থাপনের আশা যে সুদূর-পরাহত তাহা একান্ত শান্তি প্রয়াসীকেও স্বীকার করিতে হইবে।

প্রথমেই বল্কান যুদ্ধ এই শান্তি-স্থাপন-প্রয়াসকে বাধা দিয়াছে। অন্যান্য কারণ যাহাই থাকুক, বল্কান রাজ্য সমূহের প্রধান

উদ্দেশ্য ছিল, তুর্কীদিগকে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করা।

তারপর এই বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ। —এই যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত একদিকে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়া, সার্ভিয়া ও বেলজিয়াম; অপর দিকে জর্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া। পুরাকালের সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ইয়োরোপে নেপোলিয়নের যুদ্ধ ব্যতীত বোধ হয় পৃথিবীতে এত-বড় যুদ্ধ আর কখনও হয় নাই।

এখন কথা উঠিতেছে—এই বিরাট যুদ্ধ ব্যাপারের কারণ কি? এই যুদ্ধের কারণ বুঝিতে হইলে একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। এই যুদ্ধের কারণ কেবল মাত্র অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের মৃত্যু বলিলে চলিবে না। অনেক দিন হইতে ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলি পরস্পরের প্রাধান্য ও শক্তি-স্থাপনের জন্য প্রতি বৎসর যুদ্ধের জাহাজ নির্ম্মাণ ও সৈন্য বৃদ্ধি করিতে নিযুক্ত আছে। এই প্রাধান্য-স্থাপন-চেষ্টাই জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব উৎপাদিত করিবার প্রধান কারণ। প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য জার্ম্মানী ১৪ বৎসরের মধ্যে ৫টী আইন (German Navy Acts) পাশ করিয়াছেন। ১৯১২ সালে এইজন্য খরচ হইয়াছে সর্ব্বশুদ্ধ—২২৬০৯০০১ পাউণ্ড এবং ১৯১৭সালে খরচ হইবে ২২৬৫১০০০ পাউণ্ড। এই সকল অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য জার্ম্মানীতে প্রায় প্রতি বৎসর নূতন ট্যাক্স বসিতেছে। এই ট্যাক্স দিতে জার্ম্মানীর সাধারণ লোকদিগের কি অবস্থা দাঁড়ায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এদিকে ঠিক হইয়া গেল যে ইংলণ্ড দশটী জাহাজ নির্ম্মাণ করিলে জার্ম্মাণী নির্ম্মাণ করিবে ছয়টি! এই দৃষ্টান্তে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যই সৈন্য ও জাহাজ বৃদ্ধির দিকে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উত্তর—Preparation for war is the best security for Peace—ইউরোপ-ব্যাপী এই যে যুদ্ধ ইহারও উদ্দেশ্য অবশ্য শান্তি তাহা কে অস্বীকার করিবে—!!

এখন বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করা যাক। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া—হাঙ্গেরী বস্‌নিয়া ও হার্জগভিনা নামক প্রদেশগুলি দখল করিয়া বসেন; সেই সময় হইতেই এই যুদ্ধ কলহের সূত্রপাত; Declaration of London (1871) অনুসারে অন্যান্য রাজ্যের আদেশ গ্রহণ না করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করায় অষ্ট্রিয়া আইন ভঙ্গ করে। এই নব অধিকৃত প্রদেশে, সার্ভিয়া ও অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীয় শ্লাভ জাতির অধিবাস অত্যন্ত বেশী; রুষিয়ার দক্ষিণ প্রদেশে শ্লাভ জাতির আধিপত্যই অধিক। অষ্ট্রিয়ার অধীনস্থ এই শ্লাভ জাতি স্বভাবতঃই সার্ভিয়ার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, এইরূপ অবস্থায় সার্ভিয়ার উপর অষ্ট্রিয়ার প্রবল প্রাধান্য না থাকিলে শ্লাভ প্রজাদিগকে বশে রাখা বড়ই কষ্টসাধ্য।

এদিকে অনেক দিন হইতে ইউরোপে "Pan-Slavism" নামক একটা নূতন তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধীন শ্লাভজাতিকে মুক্ত করিয়া এক বিরাট শ্লাভ রাজ্য স্থাপন করা। এই Pan-Slavism এর স্রোত

বোহেমিয়াবাসী Slovak Johannkollar সৃষ্টি করেন। প্রথমে ইহার উদ্দেশ্য ছিল, অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর শ্লাভদিগকে একত্র করা; এখন রুষিয়া অষ্ট্রিয়া বুলগেরীয়া ও সার্ভিয়ার শ্লাভদিগকে একত্র করা এই Pan-Slavism এর এক মাত্র উদ্দেশ্য। অষ্ট্রিয়ার শ্লাভজাতি রুষিয়ার সহিত যোগদান করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক, কারণ রুষিয়ান গভর্ণমেণ্ট শ্লাভ দিগকে অত্যন্ত সহানুভূতির চক্ষে দেখেন এবং অষ্ট্রিয়া অপেক্ষা তাহারা তথায় অধিকতর সুখে আছে। এই জন্য রুষিয়ার সহিত অষ্ট্রিয়ার মনোমালিন্য উপস্থিত। অষ্ট্রিয়ার এই "পান-সার্ভিয়ান" দল অষ্ট্রিয়া গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের উদ্দেশ্য মুক্তি লাভ করিয়া সার্ভিয়ার সহিত মিলিত হওয়া। কোন উপায়ে অষ্ট্রিয়া এই দলটীকে খর্ব্ব করিয়া সার্ভিয়াকে জব্দ করিয়ার পন্থা উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

এদিকে আর একটী ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল। অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চ ডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ড বসনিয়ার সারাজেভো সহরে বেড়াইতে আসিয়া একজন সার্ভিয়ান কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। এই হত্যাকারী এই Pan-Slavism এর সহযোগী।

আর্চডিউকের মৃত্যুর পর অষ্ট্রিয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন যে, এই হত্যা ব্যাপারে সার্ভিয়ার হাত সম্পূর্ণ রূপেই আছে। সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য অষ্ট্রিয়ায় একটী বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হইল। সার্ভিয়াকে খর্ব্ব করিবার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না; তাই অষ্ট্রিয়া ১৪ই জুলাই সার্ভিয়াকে এক চরম প্রস্তাব Ultimatum প্রেরণ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে "সার্ভিয়ার মধ্যে যে আন্দোলন চলিয়াছে—সার্ভিয়াকে তাহা দমন করিতে হইবে; স্কুল-সমূহে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বিনাশ করিতে হইবে; অষ্ট্রিয়া গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে কতকগুলি সার্ভিয়ান রাজকর্ম্মচারীকে কার্য্যচ্যুত করিতে হইবে। সারাজেভোয় আর্চডিউকের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান ও দণ্ড বিধানের জন্য একটী কমিটী গঠন করিতে হইবে এবং এই কমিটিতে অষ্ট্রিয়ায় কয়েকজন সদস্য থাকিবে। আর সারাজেভোর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত-ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট সার্ভিয়ান মেজর ও অপর রাজকর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

সার্ভিয়া একেবারে বর্ণে বর্ণে অষ্ট্রিয়ার প্রস্তাব-মত কাজ করিতে অস্বীকার করিল,—হত্যাকাণ্ডের তদন্তকমিটিতে অষ্ট্রিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে পারিবে না; সার্ভিয়ান কর্ম্মচারীদিগকে বিচার না করিয়া পদচ্যুত করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। সার্ভিয়ার উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া অষ্ট্রিয়া ২৮শে জুলাই যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এদিকে বল্কান প্রদেশে অষ্ট্রিয়া যাহাতে কোন মতে আধিপত্য স্থাপন করিতে না পারে, তজ্জন্য রুষিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। রুষিয়া এই সময় ঘোষণা করিল, শ্লাভজাতি যাহাতে অষ্ট্রিয়ার অত্যাচারে বিনষ্ট হইয়া না যায়, তজ্জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। সেই জন্য রুষিয়া সৈন্য

সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। এবং রুষিয়ার চারিদিকে সার্ভিয়াকে সাহায্য করিবার ধুম পড়িয়া গেল।

অনেক দিন হইল জার্ম্মানী অস্ট্রিয়া ও ইটালি Tripple Alliance সূত্রে গ্রথিত। এই Alliance অনুসারে তিন জাতি পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য; বিশেষতঃ অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানী উভয়েই হাপসবার্গ-বংশ সম্ভূত। অস্ট্রিয়াকে দমন করিবার জন্য যখন রুষিয়া প্রস্তুত হইতেছে, তখন জার্ম্মানী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তাই জার্ম্মানী রুষিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, রুষিয়ার সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য সঞ্চালনের কারণ কি? রুষিয়া ইহার কোন কারণ প্রদর্শন করিতে না পারায় জার্ম্মানী রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল—জার্ম্মানী স্থির থাকিতে না পারিয়া ফ্রান্সকেও তাহার সৈন্য-সঞ্চালনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মানীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না। সুতরাং ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা হইল। এদিকে ইতালি জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধে যোগদান করে নাই, সে জন্য জার্ম্মানী ইতালিকে বার বার অনুরোধ করিতেছে —বোধ হয় এই জন্য শীঘ্রই জার্ম্মানী ইতালির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করিবে।

ইউরোপের অন্যান্য রাজ্য বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মানী বেল-জিয়ামের নিরপক্ষতা অগ্রাহ্য করিয়া বেলজিয়ামের লীজ সহরে প্রবেশের চেষ্টা করিল। ইংলণ্ড এতদিন কোন পক্ষই গ্রহণ করে নাই। যাহাতে পুনরায় শান্তি স্থাপনা হয়, সেই জন্য ইংলণ্ড বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। এদিকে ইংলণ্ড সৈন্য সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইল, কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুই বুঝা গেল না।

কিন্তু যখন জার্ম্মানী বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য করিতে সচেষ্ট হইল এবং উত্তর সমুদ্রে (North Sea) বিরাট নৌবাহিনী প্রেরণ করিল, তখন ইংরাজ মন্ত্রী Sir Edward Grey পার্লামেণ্টে বলিলেন, জার্ম্মানী যদি বেলজিয়ামের নির-পেক্ষতা স্বীকার করে ও সমুদ্র-পথে ফ্রান্সের উত্তর দিক আক্রমণ না করে, তবে ইংলণ্ডের সহিত জার্ম্মানীর আর কোন বিবাদ থাকিবে না। বেলজিয়াম ইংলণ্ডের বন্ধু বলিয়া ইংলণ্ড এই নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে বাধ্য এবং জার্ম্মাণ-নৌবাহিনী যদি ফ্রান্সের উত্তরে উপস্থিত হয়, তবে ইংলণ্ডে আসিতে ঠিক এক ঘণ্টা সময় লাগিবে। এইজন্য ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে বেলজিয়াম আক্রমণ করিতে নিষেধ করিল এবং সমুদ্র পথে ফ্রান্সের উত্তর প্রদেশে না আসিতে অনুরোধ করিল; জার্ম্মানী এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল না; তখন অগত্যা ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল! এইরূপে এই বিরাট যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছে। এই যুদ্ধের ফল এখন সুদূর-পরাহত, কিন্তু এই যুদ্ধ যদি বেশী দিন ধরিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে সমস্ত দেশের অবস্থা যে কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই যুদ্ধের সময়ে একবার আমাদের

অবস্থা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের কলোনিগুলি—দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা ইহারা সকলেই ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে তৎপর—তাহাদের সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজগুলি ইংলণ্ডের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। আজ যদি ভারতবাসী যুদ্ধ করিবার অনুমতি পাইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষ একাই সমস্ত শত্রুসৈন্য অপেক্ষা অধিক সৈন্য দান করিতে সমর্থ হইত। ইংলণ্ড যুদ্ধে জয় লাভ করুক,—ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও প্রার্থনা! কেননা ভাগ্যসূত্রে আমরা ইংলণ্ডের সহিত জড়িত—ইংলণ্ডের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল। ইংলণ্ডে যেমন এ-সময় ঘরাও বিবাদ দূর হইয়াছে, সেইরূপ আমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের কারণ যতই থাকুক—এসময় আমরা একান্ত-পক্ষে ইংলণ্ডের সহিত এক। ইংরাজ যদি প্রত্যেক ভারত-বাসীকে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে দেখিবেন তাহারা ইংলণ্ডের জন্য অকুতোভয়ে আত্মবিসর্জ্জন করে কি না! আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার পক্ষে ইংলণ্ডের ইহাই উত্তম অবসর।

সমালোচকের পত্র

শ্রীমতী "গুচ্ছ"-প্রণেত্রী

অপরিচিতাসু

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার "গুচ্ছ" আমাকে উপহার দিয়া, এবং সে সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে চাহিয়া, আমাকে সুখী ও সম্মানিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিদানে আপনার কোনপ্রকার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারিব কি না সন্দেহ। কারণ প্রকৃত সমালোচকের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক,—ভূয়োপঠন, বিশ্লেষণ, বিচারশক্তি, সাহিত্যের আইনকানুন জ্ঞান এবং স্বাভাবিক রসবোধ,—ইহার প্রায় কোন গুণই আমাতে নাই। লেখা-পড়া যৎকিঞ্চিৎ জানিলেই কিছু সমালোচক হওয়া যায় না, বরং নিজের ত্রুটিগুলি বেশী অনুভব করা যায় মাত্র।

তবে পরোক্ষে যখন শুনিতেছি লেখিকা বিশেষ করিয়া আমারই মত চাহিয়াছেন, তখন তিনি যে রীতিমত জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ প্রত্যাশা করেন না, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। সুতরাং মেয়েলীভাবে কথাপ্রসঙ্গে যাহা মনে আসে তাহাই নির্ভয়ে বলিয়া যাইতে সাহসী হইলাম।

আপনি ত "গুচ্ছ"টি সমাদরে হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তাই কথামালার শৃগালের ন্যায় আস্বাদন না করিয়াই "টক" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবার পথ রাখেন নাই। "গল্পগুলি ছাই হইয়াছে!" এই শৃগাল-জাতীয় সমালোচনার আর যে দোষ থাকুক্ না কেন, ইহাতে অতি সহজে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু কথামালার পশুগণ মানুষের অনুকরণ করিলেও মানুষের পক্ষে তাহাদের অনুকরণ করা সাজে না,—এখানেই ত তফাৎ এবং মুস্কিল!

আর-এক শ্রেণীর সমালোচনাকে "ফুল্‌লো আর মর্‌লো" জাতীয় বলা যাইতে পারে,—শুষ্ক, সংক্ষেপ এবং ব্যাগারঠেলা। যথা:—"আপনার পুস্তকখানি পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এবং গল্পগুলি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। ইতি।"—কিন্তু স্ত্রীলোকের দ্বারা এত সংক্ষেপে কাজ বা কথা সারা কোনকালে সম্ভব হয় নাই, আমার দ্বারাও হইবে না।

তৃতীয় এক শ্রেণীর সমালোচনাকে সম্পাদকীয় বলা যাইতে পারে, কারণ সম্পাদকজাতীয় জীবগণকেই তাহার প্রচুর ব্যবহার করিতে দেখা যায়। তাহাতে সরসতার চেষ্টা আছে, কিন্তু বারম্বার আবৃত্তির ফলে

দৈববাণীও চর্ব্বিতচর্ব্বণে পরিণত হয়। তাহার নমুনা এইরূপ:—"আপনার "গুচ্ছ" প্রকৃত আঙ্গুর গুচ্ছের ন্যায় সরস ও সুমিষ্ট, পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত, রমণীর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের ন্যায় রমণীয় ও কমনীয়। যিনি সংসার মরুর তাপে উত্তপ্ত এবং উত্ত্যক্ত, তিনি এই বিকচ গুচ্ছের শীতল ছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি হরণ করুন, ইহার অমৃত রসপানে পিপাসা দূর করুন্।" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ অমৃতে আমার অরুচি হ'য়া গিয়াছে, আপনারও বোধ করি ইহাতে অভিরুচি নাই।

যাহা হউক আর বৃথা ভূমিকায় সময় নষ্ট করা উচিত হয় না। এতক্ষণ যে করিয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কাজের কথার চেয়ে বাজে কথা বলা মেয়েদের পক্ষে বেশী সহজ। কেন ভাল লাগে বা মন্দ লাগে, তাহা অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া কেন যে এত শক্ত তাহা বোঝা ভার। "কেন ভালবাসি?" উত্তরে কবি বলিয়াছেন "আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি।" কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ আমি কবি নই,—তাই পরের কিম্বা নিজের কোন প্রশ্নেরই অমন সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছন্দ উত্তর প্রদানে একান্ত অক্ষম। অতএব নিতান্ত চলিত-ভাষায় শাদা কথা শুনিয়াই আপনার সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

নিজে যাহা করিতে পারি না তাহা অপরে অনায়াসে করিতেছে দেখিলেই তাহাকে বাহবা দিতে ইচ্ছা যায়। আপনি যে গল্প লিখিয়াছেন, তাহা আমি কখনোই লিখিতে পারিতাম না। সুতরাং প্রথমেই সেই হিসাবে আপনি আমার অভিনন্দনের পাত্রী।

দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালী মেয়ের অতীত ও বর্ত্তমান বিবেচনা করিয়া দেখিলে—(ভবিষ্যৎ,—কালের অন্ধকার গর্ভে নিহিত)—সে যে মাতৃভাষায় গল্প লিখিবার মত ভাষাজ্ঞান এবং চিন্তা ও কল্পনাশক্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট বাহাদুরীর বিষয় মনে হয়। আমিও ত কতক পরিমাণে জানি মেয়েদের পক্ষে বাস্তবের অধিকার ছাড়াইয়া কল্পনারাজ্যে জাল বুনিবার সুযোগ কত কম, বাধা কত বেশী। এই হিসাবেও বঙ্গলেখিকার উদ্যমমাত্রেই প্রশংসনীয়।

কিন্তু আমরা পূরাদস্তুর সফরাজেট হই, না হই, অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা লাভের প্রত্যাশী ও প্রয়াসী। সুতরাং শুধু মেয়ের লেখা বলিয়া কাহারও লেখা ভাল বলিলে, তিনি সে প্রশংসাকে ব্যঙ্গনিন্দা মনে করিতে পারেন, এমন আশঙ্কা আছে। সে ভ্রম যথাসম্ভব দূর করিবার নিমিত্ত আমি নিরপেক্ষভাবেই বলিতেছি যে, আপনার ভাষা সরল, সুমার্জ্জিত ও সুসঙ্গত—তাহাতে কাঁচা হাতের কোন চিহ্ন নাই। পক্ষান্তরে কোন প্রকার রচনানৈপুণ্য বা শব্দচাতুর্য্যেরও চেষ্টা নাই। আমি বলি সে চেষ্টা না করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ যে লিখনভঙ্গী স্বভাবতঃ আসে না, তাহা হৃদয়গ্রাহীও হয় না।

গল্পের ভাষার ন্যায় গল্পের কাঠামও কষ্টকল্পিত নহে,—এক ঘেয়েও নহে। বারোটি গল্পের আখ্যানবস্তু প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। অধিকাংশই পল্লীজীবনের চিত্র। বাঙ্গালী-জীবনে বাস্তবিক না ঘটিতে পারে এমন কোন আজগুবি বা বিদেশী ঘটনাচক্রের সাহায্য লইবার চেষ্টামাত্র করা হয় নাই। আমাদের দস্তুরবাঁধা ঘটনাবিহীন জীবনে সামান্য গল্পের উপযোগী খোরাকও খুঁজিয়া বাহির করিতে সম্ভবতঃ অনেকখানি কল্পনা-শক্তির দরকার। "সম্ভবতঃ" বলিতেছি এই জন্য, যে আমি এ বিষয়ের ব্যবসায়ী নহি। সুতরাং কারিগরীর পারিশ্রমিক আন্দাজে দিতে হইতেছে। অব্যবসায়ী হইলেও দুই একটি মন্তব্য সসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

একটি এই যে, বাস্তবজীবনে ঘটনাগুলির স্বাভাবিক পরিণতি যতটা সময়সাপেক্ষ, দুই এক স্থানে যেন তাহাপেক্ষা সে গুলিকে বেশী তাড়াতাড়ি অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইয়াছে;—যেমন ঘড়ি বন্ধ হইলে, দম দিবার সময় তাহাকে যথা সময়ে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কাঁটা ইচ্ছামত ঘুরাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় বা স্থানের মধ্যে শেষ হওয়াই ছোট গল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। সচল ঘড়ি যেমন স্বল্প-পরিসরে চব্বিশ ঘণ্টার সত্যসাক্ষ্য দেয় বলিয়াই তাহার যাহা কিছু মূল্য, কল্পনাও তেমনি বাস্তবের সুর তাল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে তবেই

তাহা সার্থক সাহিত্য নামের যোগ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিশেষ করিয়া "পরিবর্ত্তন"এর শেষ অংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেখানে বড়-বউকে—সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের বিধবা, বিলাতফেরৎ ঘরের সৌখীন মহিলা, ও গরীব ব্রাহ্মণপাচিকার ভূমিকা ত্রয়ের মধ্য দিয়া যেন ঘোড়দৌড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহাকে হাঁফ ছাড়িবার, বা পাঠককে চক্ষের পাতা ফেলিবার অবসরমাত্র দেওয়া হয় নাই।

দ্বিতীয় মন্তব্যটি এই যে, পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর "সবুজ পত্রের" জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "বাঙ্গালা ছন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে যেমন বাঙ্গলা শব্দের সমতল ভূমিতে যুক্তাক্ষর রোপন করিয়া বৈচিত্র্য সাধনের উপদেশ দিয়াছেন,—সেইরূপ আমার মনে হয় গল্প মাত্রেরই সমতল ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে একটু কথোপ-কথনের ঢেউ খেলাইয়া না দিলে নিতান্ত একঘেয়ে লাগিবার সম্ভাবনা। ছেলেবেলায় কোন নূতন গল্পের বই পড়িবার আগে মনে আছে তাহার পাতা উল্টাইয়া যাচাইয়া লইতাম; এবং যেখানিতে স্থানে স্থানে ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাইনে উত্তর প্রত্যুত্তর আছে দেখিতাম, সেই খানিই মনে হইত ভাল লাগিবে। গল্প শুনিবার লোভ ছেলেবুড়ার প্রায় সমান ও প্রায় একই মনোভাব হইতে উৎপন্ন। তফাতের মধ্যে ছেলেরা ঠাকুরদাদার গল্পের মৃদু গুঞ্জনের ফাঁকতালে 'হুঁ' দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িলে কেহ দোষ দেয় না, বরং গল্পকে ধামাচাপা দিয়া নিশ্চিন্ত হয়! কিন্তু বুড়াদের ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে গল্প বলা হয় না। তাই বলিতেছি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাহাতে সে উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, তাহার একটি প্রকৃষ্ট উপায় আমার মনে হয় কথোপকথনের অবতারণা। মুখের গল্পে বিবিধ মুখের ভাব ও গলার স্বরে সহজেই যে বৈচিত্র্য সাধন করিতে পারা যায়, লিখিত গল্পে আমরা সেই দুই প্রধান সহায়ে বঞ্চিত, তাহা ভুলিলে চলিবে না। সব সময়ে একটি অদৃশ্য বক্তার প্রতি পাঠককে তাহার মনোযোগ আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য না করিয়া গল্পের চরিত্রগুলিকে নিজের মুখে কথাবার্ত্তা কহিতে দিলে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ দেওয়া হয়, এবং তাহাদের অপেক্ষাকৃত জীবন্ত করিয়া তুলিবার সাহায্য করা হয়। শেষ গল্প "বশীকরণ"এ এই প্রাণ-সঞ্চারের একটু চেষ্টা আছে।

গল্প কয়টির মধ্যে "প্রতীক্ষায়" কল্পনাটিও নূতন, বিষয়টিও ভাল ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রবাবুর "ক্ষুধিত পাষাণের" ছায়া উহাতে পড়িয়াছে বলিয়া যেন মনে হয়। আমি ত জানি সেই গল্পই ভাল, যাহার বর্ণনায় চোখের সামনে ছবি ফুটিয়া উঠে; এবং সেই লেখকই তত ক্ষমতাপন্ন যাহার কাল্পনিক চরিত্র গুলি যত বেশী দিন পর্য্যন্ত মাথায় ঘোরে। যাঁহার রচিত চরিত্রগুলি কখনোই মন হইতে মুছিয়া যায় না তিনিই পাঠকলোকে অমর হইয়া থাকেন। কিন্তু তেমন সৌভাগ্যশালী কয়জন,—তবে কালোহ্যং নিরবধি!

"অভাগিনীর কাহিনী" একটি বৃদ্ধ আফিংখোরের মুখে দিবার কল্পনাটি ভাল;—বুড়ার ছবিটিও মন্দ আঁকা হয় নাই। "বিজয়া" পূর্ব্বেই পড়িয়াছিলাম, এবং "মেলো-ড্রামা" ধরণের বোধ হইলেও, ভালই লাগিয়াছিল। স্থানে স্থানে বর্ণনায় বেশ সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে। সব গল্পগুলিরই একটি প্রধান গুণ এই যে, কোথায়ও ভাবের আতিশয্য বা বর্ণনার আড়ম্বর নাই। আজকাল আর সাহিত্যে সময়-অসময়ে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা কথায় কথায় সফেন বক্তৃতার স্থান নাই,—বিশেষতঃ ছোট গল্পে।

আর কত লিখিব? পুঁথি ক্রমশঃই বাড়িতে চলিল। পত্রদ্বারা সমালোচনা করিলাম, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

নিবেদিকা
জনৈক পাঠিকা

পিপীলিকা

(২)

বংশবৃদ্ধি এবং বংশরক্ষা করাই পিপীলিকা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন উহাদের নিকট মহত্তর বা উচ্চতর আদর্শ আর কিছুই নাই। পিপীলিকা-শিশুকে জন্মগ্রহণের পর হইতেই এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যে পিপীলিকা-শিশু স্বজাতীয়দের প্রতি তাহার কি কি কর্ত্তব্য আছে সে জ্ঞান লাভ করে এরূপ নহে, ইহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এ সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। অতি প্রথমে ইহারা কেবলমাত্র ডিম্ব গুটী (larva) এবং কীট (pupa) গুলির তত্ত্বাবধান করিতে ও যত্ন লইতে শিক্ষা লাভ করে। ক্রমে বয়স ও শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। বিপক্ষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পিপীলিকা-পরিবারের প্রত্যেকেই যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া থাকে কিন্তু অল্পবয়স্ক শিশুদিগকে সেই সমরস্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে উহারা যুদ্ধের সময় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিবে এরূপ নহে। যে সময় বাহিরে অবিশ্রান্ত সংগ্রামে সৈনিক পিপীলিকারা শত শত প্রাণ আহুতি প্রদান করে গৃহের ভিতরে তখন অতি সুশৃঙ্খলার সহিত পিপীলিকা-শিশুরা নানা কার্য্যের তত্ত্বাবধান তৎপর হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর পিপীলিকা-শিশুকে শত্রু মিত্র চিনিবার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। পিপীলিকা-শিশুরা যে জাতীয় শত্রুকে স্বভাবতঃই চিনিতে পারে না নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

একটা আয়নার বাক্সে মিষ্টার ফোরেল বিভিন্ন জাতীয় তিন প্রকার পিপীলিকা-শিশু আবদ্ধ করিয়া তাহাদের নিকটে অন্য ছয় জাতীয় পিপীলিকার গুটী রক্ষা করিলেন। এই বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা কিন্তু পরস্পরের জাতীয় শত্রু। পিপীলিকা-শিশুরা পরস্পর কলহ বিবাদ না করিয়া একসঙ্গে গুটিগুলিকে পোষণ করিয়াছিল। শেষে গুটিগুলি ফুটিয়া উঠিলে শত্রুজাতীয় অনেক প্রকার পিপীলিকার একত্র সমাবেশ হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাদের মনে কোনরূপ শত্রুতার কথা উদিত হয় নাই এবং ইহারা একত্রে সুখী পরিবারের ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া দিন কাটাইয়াছিল। এক সঙ্গে এক স্থানে থাকিয়াও যে তাহাদের চিরন্তন শত্রুতার কথা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও হৃদয় জাগরূক হয় নাই—ইহাই তাহার প্রমাণ। শত্রু-চেনা, পিপীলিকাদের শিক্ষার একটী অঙ্গ। শিক্ষা না পাইলে এই 'শত্রুতা' বিদ্যা তাহাদের আয়ত্ত হয় না।

পিপীলিকাদের পরিণয়-ব্যাপার অতি বিচিত্র পদ্ধতিতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে যুবক ও যুবতী পিপীলিকারা একদিন আকাশে উড্ডীন হয়

এবং সেই অবস্থায় পরস্পরের নির্দ্দেশক্রমে স্বামী স্ত্রীতে পরিণীত হয়। হয়ত দেখা যাইবে কোনও এক উজ্জ্বল অপরাহ্নে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখাসংযুক্ত যুবক ও যুবতী পিপীলিকারা বিবরের বাহিরে আসিতেছে এবং একসঙ্গে শূন্যে উড়িয়া উড়িয়া 'শোভাযাত্রা' বাহির করিয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রামিক পিপীলিকারা গৃহের বহির্গমন পথ প্রশস্ত করিয়া দেয় এবং আবশ্যকমত নূতন পথও প্রস্তুত করিয়া থাকে। অসংখ্য পিপীলিকা এইরূপে অনেকদুর পর্য্যন্ত শূন্যে উড়িয়া বেড়ায়। এইরূপে কয়েকঘণ্টা অতিক্রম করিলে পিপীলিকা রমণীদের গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে।

অতঃপর উহারা শূন্য হইতে ভূমিতে অবতরণ করে। এই সময়ের ভিতর তাহাদের পাখাগুলি ঝরিয়া পড়ে। পুরুষগুলি প্রায় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশাল দেহ লইয়া নড়িতে চড়িতে না পারায় সহজেই উহারা পাখী টিকটিকী ইত্যাদির উদর মধ্যে স্থান লাভ করে। যে কয়টা কোনও প্রকারে উহাদের কবল হইতে রক্ষা পায় তাহারাও খাদ্যাভাবে শীঘ্রই মৃতুকে বরণ করিয়া লয়। ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের শ্রামিক পিপীলিকারাও এ অবস্থায় উহাদের প্রতি ফিরিয়া চায় না। বিবাহ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের প্রতি শ্রামিকদের সকল কর্ত্তব্যের অবসান হইয়া যায়। কেবল এই দিনের প্রতীক্ষাতেই তাহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

গর্ভবতী পিপীলিকা-রমণীদেরও অনেকেই পুরুষদেরই ন্যায় মৃত্যু লাভ করে। যে কয়েকটী কোনও প্রকারে কোন গর্ত্ত বা অন্য কোনও প্রকার নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া প্রাণে বাঁচে তাহারা কেহ বা কোনও পরিত্যক্ত গৃহে ডিম্ব প্রসব করিয়া নিজেরাই এক এক পৃথক পিপীলিকা সম্প্রদায় সৃজন করে কেহবা পুনরায় নিজেদের পূর্ব্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যেখানে একদিন সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেখানে এবার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া লয়।

মিষ্টার ফোরেল কিন্তু বলেন বিবাহ যাত্রার, পর কোন রমণী-পিপীলিকাই নিজ গৃহে পুনঃ প্রবেশ করে না। তিনি বলেন বিবাহ যাত্রার পূর্ব্বে গর্ভ সঞ্চার হয় এমন কতকগুলি পিপীলিকা-রমণীকে শ্রামিকেরা রাণী করিয়া দেয়। অন্য রমণী-পিপীলিকার প্রতি তাহারা কোনও যত্নই লয় না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত কিন্তু ভিন্নরূপ।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

পুরাতন স্মৃতি

(১)

ঠাকুরমা, সেই ছেলেবেলায়, ঘুম পাড়াবার ফন্দিতে,
এক-যে-রাজার মজার গল্পের হুঁ-হুঁ জোড়া সন্ধিতে
এমনি করে ঢেলে দিতেন নিদ্রালসের আবলি,
নেতিয়ে পড়তে হতই ঘুমে, রাজা রাণী যা বল্লেই।
শুনিনাই ত আগাগোড়া ভাবছি তবু কল্পনায়
এ সংসারে রসোপুষ্ট এমন মিষ্ট গল্প নাই।
নানা উপন্যাসের গ্রন্থে ভরা এমন আলমারি;
রুদ্ধ তাহে কেবল শুদ্ধ বাতাসটুকু জানালার-ই।
কথায়, ভাবে, সুরে, তালে, মিলিয়ে বাঁধা রচনায়,
হাঁপিয়ে উঠি, মাথা কুটি গতদিনের শোচনায়!
পাইনা ফিরে, তবুও ঘুরে বেড়াই তাহার সন্ধানেই;
আয়রে প্রাচীন ঘুম-পাড়ানি! আজ যে চোখে তন্দ্রা নেই।

নেইক তাজা শাঁসাল প্রাণ। গল্পে এখন শানায় কই?
পরীর রাজ্যে ওড়ার মত শক্তি আমার ডানায় কই?
হারানো সে পরাণ কোথা কৌতূহলে কাণ-খাড়া?
মিইয়ে আছি বাসি মুড়ি, কিংবা চিটে ধান ঝাড়া।
গুঁড়িয়ে গেছে স্বপ্ন আমার, খুঁড়িয়ে চলে প্রান্তরে।
ওরে রে সেকালের সাথী, সবাই তোরা শ্রান্ত রে!

(২)

গেছে স্বপ্ন, গেছে খেয়াল; যাক্‌গে তাহে ভাবনা কি?
শিশুর বিশ্বে আছে স্বপ্ন; করব তাকে আপনার-ই।
তন্দ্রাশূন্য চোখে বসে ঘুম পাড়াব শিশুকে;
আশীর্ব্বাদের হাত বুলাব তাদের অসুখ-বিসুখে।
তাদের হাস্যে প্রফুল্লতায়, হেসে হব আটখানা;
মুঞ্জরিয়ে উঠবে আবার এই যে শুষ্ক কাঠখানা।

বলব রাজার মজার কথা তাদের প্রাণে প্রাণ গেঁথে;
শুনবে সবে কৌতূহলে তোতার মত কান পেতে;
কোথায় গেল রাজার ছেলে, রাগের মাথার ভুলচুকে,
একটি রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার-মুল্লুকে।
দেখলে কোথায় একলা ছাতে মালা গাঁথে ফুল তুলি,
কুঁচের বরণ রাজার মেয়ে;—মেঘের বরণ চুলগুলি।

আয়রে কচি কোমল বিশ্ব, আমার বুকে ঝাঁপ দিয়ে!
বাড়াই তোদের পরমায়ু মৃত্যুটাকে শাঁপ দিয়ে।
হাওয়ায় চড়ে ছাওয়ায় ছাওয়ায় সবুজ বনের কোল দিয়ে,
আয় রে নেমে পরীর ছানা সোনার ডানায় দোল দিয়ে।
আমার দেহের দীর্ঘ জীবন ঢেলে দিব,—মূল্য তার!
আয় রে আস্য হাস্য ভরা, বিশ্বজোড়া-ফুল্লতার।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সমালোচনা

বুদ্ধের জীবন ও বাণী—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস। কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের সাধনার ইতিহাস ও তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলীর স্থূল মর্ম্ম এই গ্রন্থে যথেষ্ট নিপুণতার সহিত সঙ্কলিত ও আলোচিত হইয়াছে। কেবলই ভাবের দোহাই দিয়া গ্রন্থকার বুদ্ধদেবের মহত্ত্ব খাড়া করিবার প্রয়াস পান নাই, রীতিমত যুক্তির সমাবেশে আপনার বক্তব্যকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুদক্ষ সমালোচকের ন্যায় তিনি বুদ্ধদেবের জীবনী ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্বের আলোচনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধে অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমরা পাঠ করিয়াছি, সেগুলির সহিত বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রভেদ এইটুকু, সেগুলিতে সেণ্টিমেণ্টের প্রাবল্য বড় অধিক, এ গ্রন্থখানি কিন্তু intellectual study। এ গ্রন্থপ্রণয়নে লেখক কয়েকখানি বৌদ্ধ-শাস্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফলে সকল দিক দিয়া তিনি তথ্যগুলির আলোচনা করিতে পারিয়াছেন এবং সে আলোচনাও নিপুণ যুক্তির বলে একেবারে প্রাণে আসিয়া আঘাত করে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম এ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। একস্থলে তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন,—

"ইতিহাসে বুদ্ধের এক রূপ, বৌদ্ধসাধকদের কাছে আর এক রূপ, সেখানে তাঁহারা তাঁহাকে পূজা করেন, একেবারে বুদ্ধেরই তপস্যা করেন। এই দুই রূপের সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য করা কি কঠিন! সত্যের জরীপে মহাপুরুষের চরিত্র যায় শুকাইয়া, ভক্তের প্রেমবারি-সেচনে অনেক সময় যায় পচিয়া। * * * সেই সামঞ্জস্যের জন্য গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। * * * এই গ্রন্থে বুদ্ধের ঐতিহাসিক শুষ্ক মূর্ত্তিও নাই, আবার তিনি একেবারে দেবতা হইয়া অতিপ্রাকৃত হইয়াও উঠেন নাই। এখানে তাঁহার সাধক বেশ। যে বেশে তিনি নিজে সাধনা করিয়াছেন, সেই বেশেই সকল দেশের সকল যুগের ও সকল সম্প্রদায়ের সাধকের হৃদয়ে অসাধারণ সেবা-রস ও অপূর্ব্ব সাধন-রস সঞ্চার করিতেন। তাই এই গ্রন্থে তিনি অতিপ্রাকৃত নন।"

ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব, এবং ইহার জন্যই এ গ্রন্থের সার্থকতা। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই প্রভৃতি সুন্দর।

উত্তররামচরিত—(মহাকবি ভবভূতি প্রণীত) শ্রীমতী বিমলা দাসগুপ্তা কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনূদিত। কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, উইলকিন্স মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। "নিবেদনে" লেখিকা বলিতেছেন, "মহামতি ভবভূতি তাঁহার এই গ্রন্থে সীতা দেবী, ঋষি-কন্যা আত্রেয়ী, বনদেবতা বাসন্তী, ভগবতী বসুন্ধরা এবং ভাগীরথী অরুন্ধতী প্রভৃতির অবতারণা করিয়া উন্নত নারী-চরিত্রের উদারতা, সৌজন্য, আত্মসম্ভ্রম, ও বিনয়ের যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ অভাস দেওয়াই এই গ্রন্থ অনুবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। * * * এইরূপে যতই এ দেব-ভাষার চর্চ্চা অন্তঃপুরে বিস্তার লাভ করিবে, ততই বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীগণ আপনা হইতেই এই সকল আদর্শানুযায়ী স্ত্রী-চরিত্রের অনুসরণ করিতে অভিলাষী হইবেন।" লেখিকার এই সাধু উদ্দেশ্যের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তিনি যে কালধর্ম্মের প্রভাবে বিদেশী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস কিম্বা বিশেষত্বহীন তৃতীয় শ্রেণীর রোমান্স অনু-বাদের মায়া কাটাইয়া সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে রত্নচয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এজন্য তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। অনুবাদ ভালই হইয়াছে।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—দ্বিতীয় খণ্ড। মেরুতত্ত্ব অর্থাৎ মেরু, সুমেরু মহামেরু তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী রায় প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা, বাঁধাই সাতসিকা মাত্র। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থকার-রচিত পৃথিবীর পুরাতত্ত্বের প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়াছিলাম। তখনই আমরা গ্রন্থকারের বিপুল অধ্যবসায়, অনুশীলনী-শক্তি ও তথ্য-সংগ্রহের ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। এই গ্রন্থ পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত হইবে। সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বঙ্গসাহিত্যের যে যথেষ্ট গৌরব বাড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় সহযোগে তিনি যুগযুগান্তকালের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্য দেশ হইলে আজ গ্রন্থকারের নামে জয়জয়কার পড়িয়া যাইত। গ্রন্থখানি এমনই কৌতূহলোদ্দীপক, রচনা-প্রণালী এমনই সরল যে, সম্পূর্ণ অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও এ গ্রন্থ পাঠে মুগ্ধ হইবেন, এক অজ্ঞাত সত্যের আলোক পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। গ্রন্থকারের আলোচনার মূল্য বিশেষজ্ঞেরা বিচার করুন, কিন্তু আমরা অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও গ্রন্থখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া অনেক কথা জানিয়াছি, শিখিয়াছি। গ্রন্থকারের ভূমিকা পাঠ করিয়া আমরা কিন্তু মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "নাটক-নভেল-প্লাবিত বঙ্গদেশে পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড) তিন বৎসরে ২০০ খানিমাত্র বিক্রয় হইয়াছে। * * * প্রথম খণ্ড ঋণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবারে দ্বিতীয় খণ্ডও ঋণ করিয়াই প্রকাশ করিলাম। বাসগৃহাদি ডবল বাঁধা পড়িল। ইতিহাস অধিক বিক্রয় হয় না। মাতৃভাষার সেবার জন্য ঋণ করিলাম, যদি শোধ করিতে না পারি, বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ তাহা শোধ করিবেন।" বাঙ্গালীর পক্ষে ইহার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি আছে?

পুষ্পাহার—শ্রীমতি উর্ম্মিলা দেবী প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য কাপড়ে বাঁধা পাঁচসিকা, কাগজের মলাট একটাকা মাত্র। এখানি সাতটি গল্পের সমষ্টি। "কয়েকটি গল্প ইংরাজী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত; কোনটি বহুপূর্ব্বে পঠিত বিদেশী গল্পের ছায়ার উপর রং-ফলাইয়া সম্পূর্ণ নিজের ভাবে ও ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বাকী কয়টি মৌলিক। কোনটিই অনুবাদ নহে।" গ্রন্থে কয়েকখানি ছবি আছে, তন্মধ্যে একখানি রঙিন। ছাপা বাঁধাই ভালো। গল্পগুলি অপূর্ব্ব না হউক—পড়িতে ভাল লাগে। ভাষার লালিত্য আছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

Reg. No C. 523]

ভারতী

আশ্বিন, ১৩২১





"চলতহিঁ পেখনু নয়ন পসারি"

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

কান্তিক প্রেস] [২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

ভারতী

লাইকা

(তৃতীয় অংশ)

(১৬)

সন্ন্যাসিনীর সহিত বারির সাক্ষাতের পরের কথা!

পিতা মাতা সম্মানহানির ভয়ে—লজ্জায় তাহার মৃত্যু সংবাদ রটাইলেও সে যে এখনও জীবিতা! এখনও সে স্বামী দর্শনাশায়—পিতামাতার ক্রোড়, রাজসুখভোগ ত্যাগ করিয়া ভিখারিণী জীবনের মহাদুঃখ বরণ করিয়াছে!

প্রথম প্রথম সন্ন্যাসিনী ভাবিয়াছিলেন রাজকন্যা এ পথশ্রম সহ্য করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ? যদিও তাঁহার সাহস ছিল যে হিন্দুকন্যা স্বামীর নামে সকল অসাধ্যই সাধন করিতে পারে—তথাপি তাহার কমনীয় শরীর রৌদ্রজলের সকল অত্যাচার গ্রহণ করিতে পারিবে ত?

বারি কিন্তু পারিল! বনে বনে পথে পথে ঘুরিয়াও তাহার অম্লান দেহকান্তি তেমনি জ্যোতির্ম্ময় ছিল। শরীর শীর্ণ মুখশ্রী বিষণ্ণ—কিন্তু তপস্যানিষ্ঠ হৃদয়ের দিব্যালোকে পদ্মনেত্র দুটি যেন সর্ব্বদাই জ্বলিত! তাহার রক্তহীন সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধরে এমন একটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইত যাহাতে তাহার সেই বালিকার ন্যায় ক্ষুদ্র মুখেও স্থিরবুদ্ধি নারীর মহিমা প্রকাশিত হইত!

প্রথমে সাবিত্রী তাহাকে বয়ঃকনিষ্ঠা দেখিয়া যাহা মনে করিয়াছিল ক্রমে বুঝিল তাহা ভুল,—এই স্বল্পকায়া নারীর কোন শিক্ষাই অসম্পূর্ণ নহে—হৃদয়ের পরিণতি প্রায় পুরুষের ন্যায় বিস্তৃত ও সরল—তাহাতে কোন ক্ষুদ্রতা বা অসামঞ্জস্যের স্থান নাই,—সে আপনার জ্ঞানে আপনি বলিষ্ঠ,—সহজ কার্য্যে সে কাহারও মুখাপেক্ষা করে না,—তাহার কার্য্যও সুচারু নির্দ্দোষ ও অনন্যসাধারণ!—সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য তাহার এই চরিত্র মহিমা কিছুতেই প্রকাশিত নাই! আকৃতি কোমল—মুখ নির্ব্বাক্, কার্য্য গোপন,—বহুদিন ধরিয়া তাহার সাহচর্য্য না করিলে তাহাকে সহসা বোঝা যায় না!—

পরে দেখা গেল বারি সাবিত্রীর সন্ন্যাস-চরিতের বিন্দুমাত্রও অনুকরণ করিতেছে না —বরং সাবিত্রীই বারির স্তব্ধ হৃদয়ের অনুসরণ করিতেছে,—সেই তাহার স্বভাবে মুগ্ধ।—ক্রমে সাবিত্রী ইহাও ভাবিত—যদি লাইকা আসে,—বারি চলিয়া যায়—তবে সে থাকিবে কেমন করিয়া? ঘুম ভাঙ্গিয়া যদি বারির জাগ্রৎ স্থির চক্ষু দুটি দেখিতে না পায় তবে সে দিন তাহার কাটিবে কেমন করিয়া?—আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য, বারির পিতামাতা এই কন্যাকে হারাইয়া আজও বাঁচিয়া আছে কেমন করিয়া?

সন্ন্যাসিনী ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি আনিয়া দিতেন,—তখনকার দিনে সন্ন্যাসী ফকিরের ভিক্ষার কোন দুঃখ ছিল না, সম্পন্ন গৃহস্থ অতিথি সন্ন্যাসী যোগী পাইলে কৃতার্থ হইতেন —ভিক্ষাও মুষ্টিমেয় ছিল না,—এক জনের ভিক্ষায় তিন জনের যথেষ্ট হইত—তাহার পর দুই বালিকা-সন্ন্যাসিনীতে রন্ধনের পালা পড়িত!—

বারি বলিত "দিদি তুমি কাঠ জোগাড় কর আমি ততক্ষণ স্নান করিয়া চাল ডাল গুলি ধুইয়া রাখি!"...

প্রথম প্রথম সাবিত্রী হাসিত—রাজার একমাত্র দুহিতা বারি—সে আবার রন্ধনের কি জানে?—শত শত সূপকার যাহার আজ্ঞাধীন সে আবার পাথরের চুলা কাটিয়া কাঠে ফুঁপাড়িয়া রান্না করিবে?—সে বলিত —"তা ভাল, আমি কাঠ আনিতেছি কিন্তু তুমি আর আগুনের জ্বালে আসিও না বারি!—বরং ভাখ আমি কেমন করিয়া রান্না করিতেছি! শুধু ডাল আর আলু সিদ্ধ দিয়ে ভাত খাইতে তোমার বড় কষ্ট হবে না ভাই?—"

বারি একটু হাসিল উত্তর দিল না। কাঠ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী দেখিল বারির স্নান হইয়া গিয়াছে, দুই একটা শুষ্ক ডাল পাতা লইয়া চুলা জ্বালিয়া তাহাতে ভস্‌লা চাপাইয়াছে।

"ও কি চড়াইলে?"—বলিয়া সে নিকটস্থ হইল, দেখিল ডাল চাল ঘৃত আলু একসঙ্গে দিয়া তাহাই নাড়িতেছে!—তখন সাবিত্রী হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল—"ও দিদি, কি করিলে ভাই! আজ কি তুমি চাল ডাল ভাজা খাইয়া থাকিবে না কি? অমন করিয়া কি চাল ডাল শুধু চড়াইতে আছে?—যদি আগে জল দিতে তবু বা খিচুড়ী হইত!"—

বারি বলিল, "আঃ থামনা দিদি! তা একদিন কি আর চাল ভাজা খাইয়া থাকিতে পারিবে না? এক কাজ কর এখন, ঐ ভাখ চারটি চাল রাখিয়াছি দোকান হইতে হইতে দুটি জিরালঙ্কা আর একটু হলুদ লইয়া এস!"

"কেন? অততে দরকার কি?"

হাসিয়া বারি বলিল, "দরকার নাই বা কিসে? এত ঘি আলুরই বা দরকার কি? তোমরা কি মোহনভোগ করিয়া খাওনা? এখন যাও শীঘ্র ফিরিও!

সাবিত্রী শীঘ্রই ফিরিল তখন বারি আবার ফরমাস করিল—"জ্বালটার উপর নজর রাখ আমি হলুদটা পিষিয়া লই!"—সাবিত্রী বলিল কেন আমিই পিষি না। আর পিষিবই বা কিসে? আমরা ত শিল বহিয়া বেড়াই না!"

বারি তাহার পিঠে এক কীল বসাইয়া বলিল—তোর মাথায় এখনি আমি একটা শিল চাপাইয়া দিব—এত পাথর পড়িয়া আছে আর তুমি শিল খুঁজিয়া পাও না? তাইত বলিলাম,—তুই বস্, আমি হলুদ আর মরিচটুকু গুঁড়াইয়া আনি!—"

তখন হাঁড়ীর মধ্যে দৃষ্টি করিয়া সাবিত্রী বলিল "এই যে জল দিয়াছিস ভাই!—" ভাজা চাল কি সিদ্ধ হইবে? আর ও কিরে বারি! আলুগুলা অত কুচাইয়া দিয়াছিস্ কেন?—গলিয়া যাইবে না?—তুলিবই বা কেমন করিয়া—আর ঐ টুকু ত আলু সিদ্ধ, তার জন্য অত মরিচ গুঁড়া কেন করিতেছিস্ ভাই—থাক্ তোর হাত লাল হইয়া গেল!"—

বারি নিপুণ হস্তে রন্ধন করিতে লাগিল,—রন্ধনের গন্ধে ও বর্ণে সাবিত্রী বুঝিল ইহা তাহাদের নিত্য আহার্য্য খিচুড়ীরই রূপান্তর—কিন্তু রাজকুমারীর হস্ত স্পর্শে তাহা নূতন ও লোভনীয় হইয়া উঠিতেছে! আরও বুঝিল যে রন্ধন ব্যাপারেও বারির কিছুই শিখিবার নাই, জ্বাল দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁড়ী নামানো চড়ানো পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মেই তাহার নৈপুণ্য ও অভ্যস্ত ভাব প্রকাশ পায়—প্রস্তুতপ্রণালীও নূতন ও সুদৃশ্য! সাবিত্রী বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল!

রন্ধন শেষে হাঁড়ী ঢাকা দিয়া বারি বলিল, মা কখন আসিবেন জান?

সাবিত্রী বলিল—"তিনি পূজায় বসিয়াছেন—শীঘ্রই আসিবেন, ততক্ষণ তুমি একটু শ্রম দূর কর ভাই! আমি না হয় আলু কটা সানিয়া রাখিতেছি!—"

হাসিয়া বারি বলিল, "এই একটু খিচুড়ী করিতে আমার আবার শ্রম হইল কোথায়? আর আলুও তুলিতে হইবে না,—বরং—"

বলিতে বলিতে বারি আবার হাসিয়া ফেলিল! সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হাসিলে যে?"—

হাসিতে হাসিতে তাহার কাঁধে হাত দিয়া মৃদুস্বরে বারি বলিল,—"তুই গাছে চড়িতে জানিস্ দিদি?"—

সাবিত্রীও হাসিয়া উঠিল,—"কেন বল্ দেখি? জানি বলিয়াইত বোধ হয়!"—

"এই তেঁতুল গাছটায় চড়িতে পারিবি কি?"—

"কেন? জিবে জল সরিতেছে নাকি? কিন্তু তেঁতুল যে কাঁচা ভাই—?"

"আঃ কাঁচা কি আমিই দেখি নাই?—তুই পাড়িতে পারিবি কি না তাই বল?"—

সাবিত্রী তখন গাছে উঠিল।—গোটাকত ফল ফেলিয়া দিয়া বলিল—"আর চাই কি?"—

কুড়াইতে কুড়াইতে বারি বলিল,—আর না রক্ষা কর!"

তাহার পর সেই অম্লফলকে মৃদুতাপে পোড়াইয়া—খোলা বীচি ফেলিয়া লবণ গুড় সংযোগে বারি চাট্‌নী প্রস্তুত করিল। সাবিত্রী দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, মৃদু হাসিয়া সে বলিল; 'আমাদের দ্বারায় এত হয় না ভাই, পোড়া পেটের জন্য কে এত করে বল?"

"এত আর কি করিলাম? ভাত ত তুমিও রাঁধিতে,—ডাল আলু এ সকল

লইয়া একটা কিছু করিতেও,—আমি আর অধিক কি করিলাম?"—

সাবিত্রী বলিল, "বটে?—ওই সব ঝাল-মস্‌লা—তেঁতুল গুড় লইয়াই যদি আমরা এতটা সময় নষ্ট করি, তবে কি করিয়া চলে?"

বারি এইবার মুখ নীচু করিল। খানিকক্ষণ পরে অতিমৃদু হাসিয়া বলিল,—"কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—এই রান্নার ব্যাপার শেষ হইবার পর মার আসা পর্য্যন্ত আমরা কি করিতাম দিদি?—এখন আর আমাদের কি কায আছে বল?"

সাবিত্রীও হাসিল, বলিল, "না কায কিছুই নাই, তবে যাহা করিতেছিলাম তাহাই বা এমন কি গুরুতর কায ভাই।"

"চুপ করিয়া বসিয়া থাকার অপেক্ষাও কি গুরুতর নয়?"

"অনর্থক! তুই সমান অনর্থক!—"

ব্যস্তস্বরে বারি বলিয়া উঠিল,—"অনর্থক? দিদি ইহা অনর্থক?"

হাসিয়া সাবিত্রী উত্তর করিল, "আঃ তুই ব্যস্ত হস্‌ কেন ভাই? নিজের আহারের চিন্তা আমাদের মত সন্ন্যাসিনীদের পক্ষে খুব অনর্থক।"

বারি নতমুখে আপনার অঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতেছিল,—সাবিত্রীর উত্তরের কিছু পরে মৃদু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"আমিত ইহা নিজের জন্য করি নাই—আমার পক্ষে কেন অনর্থক অসার্থক হইবে ভাই?—যতটুকু সময় আমি বসিয়া বা অযথা চিন্তা করিয়া কাটাইতাম—সে সময় টুকুতে কিছু কায করিয়া বা নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যদি একটুও তৃপ্তি আনিতে পারি, তবে আমার ঐ ব্যয়িত সময় টুকুর জন্য কি এত ক্ষতি হইবে?"

সাবিত্রী হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—বলিল, "উঃ উঃ! ভারি লোকের জন্য ত রাঁধিয়াছ! এদের আবার তৃপ্তি আর অতৃপ্তি!—"

সাবিত্রী আরও কি বলিতেছিল এমন সময় দেখিল, বারির মুখখানি যেন ঈষদারক্ত,—চোখ দুটি এত নীচু যে তাহাতে বিশেষ সন্দেহ হয় যেন তাহা আর প্রকৃতিস্থ নাই!—দৌড়িয়া তাহার নিকটে আসিয়া সে হাত ধরিল,—"ওকি, ওকি, বারি!—পাগল নাকি? বাহা-বাহারে মেয়ে! রাগ করিয়া বসিলি যে! আমি যে তোকে ক্ষেপাইতেছিলাম তাহা আর বুঝিলি না ভাই? কিন্তু সত্য বলিতেছি আমার মনে হইতেছে যে কতক্ষণে মা আসেন যে তোর হাতের ওই মিষ্টি রান্না খাইয়া বাঁচি! সত্য—আমি প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলাম ভাই!"—

বারি হাসিয়া তাহার কাঁধে মাথা দিল, চোখে সত্যই জল! মুছাইতে মুছাইতে সাবিত্রী বলিল,—"ইস্‌ রাগ দেখেত বাঁচিনে তোর! ফের যদি এমন চোখে জল এনেছিস্‌ তবে দেখিস্‌—"

বারি তাহার বাহুতে একটি চিম্‌টি কাটিয়া বলিল—"তবে বল!"

"কি বলিব?"

"আমাকে প্রত্যহ রাঁধিতে দিবে!"

"প্রত্যহ!—আচ্ছা তাহা না হয় হইবে,—কিন্তু তাহা এত যাচাইয়া লইতেছিস্ কেন বল্ দেখি?"

"অতি মৃদুস্বরে বারি বলিল, "বড় ভাল লাগে ভাই! মানুষকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে আমাকে বড় ভাল লাগে! আমার রান্না খাইয়া যদি কেহ সুখ্যাতি করেন আমার মনে হয় এই আমার স্বর্গসুখ!—দিদি! আমি প্রত্যহ রাঁধিব তুমি খাইয়া প্রশংসা করিও কেমন?"

"আর যদি বিশ্রী রান্না হয়? তবু প্রশংসা করিতে হইবে না কি?"—

বারি হাসিয়া নিরুত্তরে থাকিল। সাবিত্রী বলিল, "ও ভাই তবে শোন! এই শুধু ভাত কি মোটারুটি খাইতে খাইতে আমার কত দিন যে কান্না পায় তা আর তোকে কি বলিব! মাকে লুকাইয়া—সত্য বলিতেছি তুই হাসিস্ কেন?—মাকে লুকাইয়া বাজার হইতে ফল মিষ্ট কিনিয়া খাই। কোন মহাজন কি সাধুর নিমন্ত্রণ পাইলে যে আমার কত খুসি হা বারি—তা—সত্যই বলিতেছি, তুই অবিশ্বাস করিস্ না, মনে যা হয় তাই বলিতেছি, তবে সন্ন্যাসের সংযম?—সে ত যথাসাধ্য পালন করিতেছি! কিন্তু মনের কথা ত মনের অগোচর নাই!"—

বারি হাসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল—সাবিত্রী আবার তাহাকে আলিঙ্গন করিল। বলিল, "হাঁ, তাহাই বলিতেছি! তুই প্রত্যহ ভাল করিয়া ভাত রুটি করিয়া দিস্ আমি আহ্লাদ করিয়া খাইব!"

বারি তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "সত্য বলিতেছ?"—

"সত্য! তোর গা ছুঁইয়া বলিতেছি!"

তখন দুইজনে সেই ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—সাবিত্রী বুঝিতেছিল যে তখন বারির রুদ্ধ হৃদয় ঠেলিয়া কি একটা আঁধার মেঘ উঠিবার চেষ্টা করিতেছে আর প্রবল চেষ্টায় সে তাহা রোধ করিতেছে!—সেও তেমনি হৃদয়ভেদী স্নেহ ও সহানুভূতির সহিত তাহাকে বুকে চাপিয়া থাকিল,—বারি তাহা বুঝিল!—

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিলে সন্ন্যাসিনী আসিলেন। তখন দুইজনেই তাহার সেবায় ব্যস্ত হইয়া গেল।—

(১৭)

সন্ন্যাসিনী কিছু বিস্মিত হইলেন, বারিকে ত কৈ কেহ অন্বেষণ করিল না?—তিনি প্রথমত তাহাকে যথাসাধ্য লুকাইয়া রাখিতেন কখনো ছদ্মবেশও দিতেন ক্রমে দেখিলেন কোথাও সে কথার আভাস-মাত্র নাই, কেহ একবার ভ্রমেও কোন কথা উচ্চারণ করে না; বারির প্রসঙ্গ যেন শেষ হইয়া গিয়াছে।—

তাঁহারা আবার কাশী আসিলেন, আসিয়াই জনরব শুনিলেন—রাজনন্দিনীর মৃত্যু হইয়াছে!—শুনিয়াই তিনি সমস্ত বুঝিলেন,—বারি মৃদু হাসিল। তথাপি তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না, অতি সাবধানে একবার রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে ঐ একই কথা, 'রাজার একমাত্র কন্যা সম্প্রতি ৺কাশীলাভ করিয়াছেন!'

সকলেই এক বাক্যে সেই কথাই বলে—কেহ কোন সন্দেহ মাত্র করে না!

দেশে আসিয়া বারি অত্যন্ত অনমনস্ক ভাবে ছিল—সে কোন কথা কহিল না,—সন্ন্যাসিনী প্রসন্ন অথবা দুঃখিত কিছুই হইলেন না বরং যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী কাঁদাইয়া ভাসাইল!—এত বড় কুকথা কেমন করিয়া রটনা হইল? পিতামাতায় কি বলিয়া প্রচার করিল?

বারি বিরক্ত ভাবে বলিল, "তবে কি বলিবে যে আমার গুণবতী কন্যা গৃহত্যাগিনী হইয়াছেন?"

সাবিত্রী তাহা মানিল না, "মা গো মা! এমন বিশ্রী কথাও কি উচ্চারণ করিতে আছে? বলিল না কেন যে সে মথুরা বা হরিদ্বারে গিয়াছে! যদি লাইকার দেখা পাওয়া যায় আর পাইবেই বা না কেন? বারি এমন কি পাপ করিয়াছে যে চিরজীবন তাহাকে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে!—তখন? তখন কি বলিয়া রাজা কন্যাজামাতাকে আবার ঘরে লইবেন?

তাহার কথা শুনিতে শুনিতে বারি বিরক্ত হইল—"কি ছেলেমানুষী কর দিদি?" বলিয়া উঠিয়া গেল,—তথাপি সাবিত্রীর বকুনী থামিল না। আর লাইকাই বা কেমন মানুষ? এমন রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী—এমন সুন্দর এমন মধুর এমন স্ত্রীকে কাঁদাইয়া পলাইয়াছে? শুধু কি কান্না?—আজ তাহারই জন্য শত আদরের আদরিণী—সলিল সোহাগের জল-নলিনী মরুভূমে আসিয়া পড়িয়াছে! এত পথের কষ্ট, শুইবার কষ্ট, খাইবার কষ্ট সর্ব্বোপরি মনের শতমুখী অগ্নিশিখার জ্বালা এ কার জন্য সে সহ্য করিতেছে?—লাইকার জন্যই ত?—আহা—হা! অভাগা লাইকা জানিত না যে একজন দেবী তাহার জন্য এমন কঠিন তপস্যা করিতেছে!—সে জানে না যে ভগবান তাহার জন্য যে মন্দাকিনী ধারা মর্ত্ত্যে পাঠাইয়াছেন তাহা কেমন স্বাদু—কেমন অমৃতময় কেমন পবিত্র! ওরে পাষাণ একবার ফিরিয়া আয়! একবার ছাখ—তোরও জীবন সার্থক হোক্ আর এই অভাগিনী দুঃখিনীরও কষ্ট মোচন হোক্!

জানে না, দুর্ভাগ্য লাইকা কিছুই জানে না যে তাহার বারি কেমন! জানিলে ফিরিত! নিশ্চয় ফিরিত—স্বয়ং ভগবান এমন অকপট ত্যাগের এমন সমর্পণময় ভালবাসায় বাঁধা পড়েন লাইকা মানুষ বৈ ত না!

আর হতভাগ্য রাজারাণী! তাঁহাদের বড় দোষ নাই—এ মেয়েকে হারাইয়া তাঁহারা যে সুখে আছেন তাহা নয়—তাহা কখনই নয়! অনেকটা দুঃখেই তাঁহারা এ জনরব প্রকাশ করিয়াছেন!—ভাবিলেই বেশ বোঝা যায় যে কত ব্যথা বুকে চাপিয়া তবে একথা তাঁহারা উচ্চারণ করিয়াছেন!

ভাবিতে ভাবিতে সাবিত্রীর ইচ্ছা হইতে লাগিল, একবার রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করে! তিনি এখন কি অবস্থায় আছেন দেখিয়া আসে! কিন্তু সাহসে কুলাইল না,—সন্ন্যাসিনীকে কিছুতেই বলিতে পারিল না। তখন লাইকাকে লইয়া পড়িল! সন্ন্যাসিনী আসিতেই প্রশ্ন করিল,—

"হাঁ মা! লাইকাকে তুমি দেখিয়াছ?"

হাসিয়া তিনি বলিলেন,—"কেন বল

দেখি ?"—বলিয়াই তিনি বারির প্রতি চাহিলেন,—সে লজ্জিত হইল সাবিত্রীর উপর রাগ করিল কিন্তু প্রসঙ্গটা ত্যাগ করিয়া উঠিতেও পারিল না। সন্ন্যাসিনীও তাহা বুঝিলেন।

সাবিত্রী আবার বলিল,—"বল না মা, তিনি কেমন ?"—

"কেমন কি রে পাগলি !—মানুষ আবার কেমন হইবে ?"—

সাবিত্রী বলিল—"শুধু মানুষের মত মানুষ ?—তবে সংসারে এত লোক থাকিতে রাজা তাঁর একমাত্র কন্যাকে সেই সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন কেন ? অমিত বুঝিতেই পারি না মা,—যে এমন কাণ্ডটা কি করিয়া ঘটিল ? কেন যে রাজা—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কেন ?—কেন তাহা যে লাইকাকে না দেখিয়াছে সে বুঝিবে না মা ! তোমরা কখনো তাহাকে দেখ নাই, তাহার মুখের কথা শোন নাই তাই তাহার বিরুদ্ধে চিন্তা করিতে পারিতেছ ! রাজা তাহাকে ঠিক্ চিনিয়াছিলেন—তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়াছিলেন—কিন্তু সেত পৃথিবীর বাঁধনে বাঁধা পড়িবার জীব নয়। সে সোনার পাখী যে কোন উদয় অস্তাচলের শিরে উড়িয়া বেড়ায় তাহা কে জানে ?

সন্ন্যাসিনী বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইলেন। বারি অধোমুখে কি ভাবিতেছিল,—সাবিত্রী একটু হাসিয়া বলিল,—"সে না হয় শুনিলাম, কিন্তু লোকটি কেমন তাহা ত বুঝিলাম না মা ? তাঁহার প্রশংসা শুনিতে শুনিতে কাণ ভারি হইয়া আছে—কিন্তু তবু আমার অনুমান তাঁহাকে বুঝিতে পারে না ! তিনি বিবাহই বা কেন করিলেন—আর যদি করিলেন তবে স্ত্রীকে ত্যাগই বা করিলেন কেন ?"

ঈষৎ বিরক্ত ভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "শোন নাই কি যে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তাহার বিবাহ হইয়াছিল—" বলিতে বলিতে তিনি থামিয়া গেলেন—বারির প্রতি চাহিয়া অপ্রতিভ হইলেন,—তাহার মুখ কি ম্লান !—কপালে নীল শিরা উঠিতেছে ! সাবিত্রীও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল তাড়াতাড়ি বলিল, "চুপ কর মা, চুপ কর ! তোমার লাইকা খুব ভাল তাহা জানি, এমন লক্ষ্মীকে যে চোখের জলে ভাসাইয়া রাখিয়াছে সে আবার—'(পরে একটু ঢোক গিলিয়া) হাঁ দেখিও মা বারির এত কষ্ট বিফলে যাইবে না, আমি বলিতেছি দেখিও, লাইকা যদি নিজে আসিয়া ইহার পায়ে না ধরে আমার নামই মিথ্যা !"

বারির চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। সে সাবিত্রীর হাত ধরিয়া বলিল, "থাম দিদি ! তোমার পায়ে পড়ি ভাই ! আমি জানি যে আমার এই কষ্ট তাঁহার সাধনায় হয়ত বাধা দিবে,—তবু মন কেন বশ করিতে পারি না—কেন এ চিন্তা ভুলিতে পারি না তাহা ভগবানই জানেন !—তবে সেই অন্তর্যামীই বুঝেন যে আমি কায়মনে কেবল তাঁহার কুশলই প্রার্থনা করি,—দীনবন্ধু যদি দয়াময় হন তবে ত আমার আশা বিফল হবে না ভাই !"

সন্ন্যাসিনী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—'না না, বারি ? তুমি ঠিক্ বোঝ নাই,—লাইকার স্বভাব তাহা নয় ! সে যে পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সুখে

আছে বা অন্য কোন চিন্তায় তোমাকে ভুলিয়াছে ইহা মনে করিও না। তবে অনেক সময় আমিও বুঝিতে পারি না যে সে কেন মাঝে মাঝে তোমায় দেখা দিয়া যায় না বা কোন সংবাদ দেয় না! তাহার কোমল হৃদয়ের কথা বা ভাব ত তোমরা জান না—কাহাকেও কোন কষ্ট দেওয়া তাহার জীবনের ইতিহাস ছিল না।”

তখন সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, “যেমন ছিল না তেমনি খুব ভাল করিয়া হইল!”

ক্ষুব্ধ ভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, “না মা, তাহাও ঠিক নয়, আমি বুঝিতে পারিতেছি না সে শারীরিক সুস্থ কি না? কৈ এদানী ত আর তাহার কোন সংবাদ পইেতেছি না!—ওকি মা বারি তুমি কাঁপিয়া উঠিলে কেন?—

ধীর স্বরে বারি বলিল, “কিছু না মা! তবে আমি ঠিক জানি যে আমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে! আপনি তাহার কি করিবেন?—”

তাহার পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সন্ন্যাসিনী বলিলেন “আঃ পাগল মেয়ে!—কি দুর্ভাবনা কর মা?—না, আমি তাহা বলি নাই,—তবে ইহাও সত্য যে এখন লাইকা কোথাও পড়িয়া আছে,—নতুবা প্রায় ত তাহার সংবাদ পাইতাম!”

খানিকক্ষণ পরে বারি প্রশ্ন করিল, “কতদিন সংবাদ পান নাই মা?”

সন্ন্যাসিনীর ললাটে একটি চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছিল,—অন্যমনস্ক ভাবে তিনি উত্তর করিলেন,—“বেশী দিন নয়!”—

বারি তাঁহার মুখপানে চাহিয়াছিল—দেখিল, কিন্তু আর প্রশ্ন করিল না, সাবিত্রীর চোখে স্পষ্ট জলের রেখা—কিন্তু তখনই নিঃশব্দে সে উঠিয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিল—দূরে কোন্ গ্রামে আরতির কাঁসর শব্দ বাজিতেছিল! তখন সেই নীরব আঁধার ভেদ করিয়া স্পষ্টস্বরে বারি বলিল—“সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হয় তুমি আহ্নিক করিবে না মা?”

সন্ন্যাসিনী যেন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“হাঁ।”

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(৬)

জ্যোতিবাবু বলেন যে “আমাদের অন্তঃপুরে আগে সেই “ভবিষ্যুক্ত” বৈষ্ণবীটি বাঙ্গালা পড়াইত। তার পর কিছুদিন একজন খৃষ্টান্ মিশ্‌নরী মেম আসিয়া ইংরাজী পড়াইয়া যাইত। ইহার পর অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। এই সময়ে আমার সেজদাদাও (হেমেন্দ্রনাথ) মেয়েদিগকে “মেঘনাদ বধ” প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তার পর

মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল যে, মেয়েদের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং তাঁহাদের হৃদয় মনের ঔদার্য্যও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা বেশ উপভোগ করিতেন। এর অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে আমার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী (বর্ত্তমান্ ভারতী সম্পাদিকা) কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেগুলি শুনাইতেন, আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

বিবাহের পর তিনি "দীপ নির্ব্বাণ" নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। "দীপনির্ব্বাণ" প্রকাশিত হইলে পর সকল কাগজেই ইহার খুব প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। "পৃথিবী" নামে ইনি একখানি গভীর গবেষণা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পুস্তকও প্রকাশিত করিয়াছেন—সেখানিও সর্ব্বজন প্রশংসিত। (১)

তাহার পর ক্রমশ তাঁহার উপন্যাসের

(১) বঙ্গাব্দ ১১৮৩ (ইংরাজী ১৮৭৭) সালে স্বর্ণকুমারীর দীপনির্ব্বাণ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরেই তাঁহার "ছিন্নমুকুল" নামে আর একখানি উপন্যাস এবং "বসন্ত উৎসব" নামে একখানি গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। ১২৮৭ সালে তাঁহার "গাথা" প্রকাশিত হয়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে স্বর্ণকুমারীই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে গীতিনাট্য ও গাথা রচনা করেন। গাথা ও গীতিনাট্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদানুসরণ করিয়াছেন। এই সময়ে স্বর্ণকুমারী নিয়মিতরূপে ভারতীতে লিখিতেন। ১২৮৮ সালে তাঁহার "মালতী" নামে আর একখানি ছোট উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁহার ষষ্ঠ গ্রন্থ "পৃথিবী" ধারাবাহিকরূপে ভারতীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ। বাঙ্গলা দেশে এবং বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণকুমারী সর্ব্বপ্রথম মহিলা-ঔপন্যাসিক। ইঁহার পূর্ব্বে অন্য কোনও বঙ্গমহিলা বঙ্গভাষায় উপন্যাস, গীতিনাট্য, অথবা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তৎকালে Calcutta Review (Jany. 1881) সাধারণী, Indian Mirror, Brahmo Public Opinion, নববিভাকর, Sunday mirror (Sept II, 1889), Hindoo Patriot. বান্ধব (পৌষ ১২৮৫) প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদ পত্রাদিতে সুদীর্ঘ সুখ্যাতিপূর্ণ সমালোচনাও বাহির হইয়াছিল। যাহাই হউক, স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যখ্যাতিতে তখন দেশবাসীর চক্ষে স্ত্রীশিক্ষার একটি অতি পবিত্র মাধুর্য্যপূর্ণ শুভঙ্করী মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নিম্নে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর পুস্তকাবলী ও তাহাদের প্রথম প্রকাশের তারিখও লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম—দীপনির্ব্বাণ (১২৮৩, ইং ১৮৭৭), ছিন্নমুকুল (১২৮৫), বসন্ত উৎসব (১২৮৬), গাথা (১২৮৭) মালতী (১২৮৮) পৃথিবী (১২৮৯) নবকাহিনী (১২৮৩), মিবাররাজ (১২৯৬) বিদ্রোহ (১২৯৭) স্নেহলতা (১২৯৯), ফুলের মালা (১৩০১), কবিতা ও গান (১৩০২) কাহাকে (১৩০৫) ইমামবাড়ী (১৩০৮ ইং ১৯০১) কৌতুক নাট্য (১৩০৮, ইং ১৯০১) দেবকৌতুক (১৩১২) কনে বদল (১৩১৩) পাকচক্র (১৩১৯) রাজকন্যা (১৩২০)। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণকুমারীর রচিত কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকও আছে; যথা—গল্পস্বল্প, সচিত্র বর্ণবোধ, বাল্য বিনোদ, প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ এবং কীর্ত্তিকলাপ।

লেখিকা মহাশয়ার ভ্রমণ এবং নক্ষত্র জগৎ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ যাহা ভারতীতে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল—এখনও সেগুলি অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। ১৭ই শ্রাবণ ১৩২১। শ্রীবসন্ত।

উপর উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল আমার দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইত।

আগে আমাদের বাড়ীতে অবরোধ প্রথা খুবই মানিয়া চলা হইত। মেয়েদের এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে হইলেও ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কীতে চড়িয়া যাইতে হইত; এবং পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ২।১ জন করিয়া দরোয়ান যাইত। যে সকল পুরস্ত্রীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তাঁহাদিগকে পাল্কী করিয়া লইয়া গিয়া গঙ্গার জলে পাল্কী শুদ্ধ চুবাইয়া আনা হইত। কিন্তু মেজদাদা অবরোধ প্রথার উচ্ছেদকল্পে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফল ক্রমশ ফলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশ আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে গাড়ীর চলন হইয়া পড়িল।

"স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যখন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হয় তখন আমাদের অন্তঃপুরে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে আমাদের



জানকীনাথ ঘোষাল

শুইবার ঘরে খাট বিছানা ছাড়া অন্য কোনও তেমন আস্‌বাব পত্র থাকিত না; কিন্তু জানকী বাবু আসিয়াই তাঁহার ঘরটি নানাবিধ চৌকি কৌচ কেদারায় অতি পরিপাটিরূপে যখন সজ্জিত করিলেন, তখন তাঁহার অনুকরণে আমাদের অন্তঃপুরের সমস্ত ঘরগুলিরই শ্রী ফিরিল। মোটকথা অন্তঃপুরের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইল এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। জানকী আমাদের পরিবারে আরও একটি নূতন জিনিষের প্রবর্ত্তন করেন। সেটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

"অক্রুর চন্দ্র দত্তের বাড়ীর রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় কলিকাতায় তখন সুবিখ্যাত amateur হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক। তিনিই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে হোমিওপ্যাথি তন্ত্রে দীক্ষিত করেন। জানকী তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসেন। রাজেন্দ্র বাবু এক রকম নূতন রান্না আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার নাম "রাজভোগ।" তাঁহার নবাবিষ্কৃত এই রান্নাটি খাইতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় তিনি একদিন আমাদের বাড়ীতে তাহার উদ্যোগ করিয়া দিলেন। চাল ও ডাল চড়াইয়া, আমাদিগকে বলিলেন "এইবার তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা, ইহাতে নিক্ষেপ কর"। এ কথায় আমরা কেউ আমসত্ব, কেউ তেঁতুল, কেউ মাছ, কেউ গুড়, কেউ লঙ্কা, কেউ রসগোল্লা প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই দিলাম। আহা, সে যে কি উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা আর কহতব্য নয়! তাঁহার সহিত আমরাও সারি বন্দি হইয়া "রাজভোগ" ভোজনে বসিয়া গেলাম,

কিন্তু মুখে দিবা মাত্রই মাতৃদুগ্ধ পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

"এই সময়ে সেজদাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ) একবার খুব পীড়িত হইয়াছিলেন। আমাদের গৃহ চিকিৎসক বেলি সাহেব তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। আবার তলে তলে রাজেন্দ্র বাবুর হোমিওপ্যাথিও চলিতেছিল। একদিন রাজেন্দ্রবাবু রোগীর ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন এমন সময় বেলিসাহেব রোগীকে দেখিতে আসেন। দুয়ারেই দুইজনের চারি চক্ষের মিলন। রাজেন্দ্র বাবুকে যেমন দেখা, বেলি সাহেব একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে টুপি ফেলিয়াই একছুটে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন "মার্চেন্ট্ আবার ডাক্তার?" এই বিপদে গণেন্ দাদা সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন।

"গণেন্ দাদা একজন লেখক ছিলেন। নাট্যাকারে তিনি বিক্রম উর্ব্বশী অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি অতি চমৎকার ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাও করিতে পারিতেন। "গাও হে তাঁহারি নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম" প্রভৃতি সুন্দর গানগুলি তাঁহারই রচিত। তিনি ইতিহাস খুব ভাল বাসিতেন। অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে। অপ্রকাশিত রচনা এখনও থাকিতে পারে। তিনি খুব অল্প বয়সেই মারা যান্।"

এই সময়েই শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্য ও উৎসাহে "হিন্দুমেলা" প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়েরা মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ এবং মনোমোহন বসুও এই মেলায় খুব উৎসাহী ছিলেন। এ মেলায় তখন কৃষি, চিত্র, শিল্প ভাস্কর্য্য, স্ত্রীলোক দিগের সূচি ও কারুকার্য্য, দেশীয় ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শিত হইত। এ উপলক্ষ্যে কবিতা প্রবন্ধাদিও পঠিত হইত। নবগোপাল বাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ভারতবিষয়ক উত্তেজনা-পূর্ণ একটা কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময় কবিতা লিখিতেন না, বা এর পূর্ব্বেও কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা (২) লিখিলেন। কবিতা রচিত হইলে, নবগোপাল বাবু গণেন্দ্র বাবুকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। জ্যোতি বাবু সেখানে কবিতা পাঠ করিলে, তিনি (গণেন্দ্র বাবু) "বেশ হয়েছে, এটা এবার মেলায় পড়তে হবে" বলিয়া ইহাকে উৎসাহিত করিলেন। সেবারকার মেলায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (এখন শাস্ত্রী) শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু—এই তিন জনের তিনটি কবিতা পঠিত হয়।

---

(২) ১৩১৩ সালের পৌষ সংখ্যা "ভারতী"তে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীবসন্ত।

জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া ৺হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর সেটি বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে পাঠ করেন। সেবারকার মেলায় সভাপতি ছিলেন ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কোনপ্রকার বাড়াবাড়ি না হয়, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য বন্ধুভাবে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতে স্বদেশী ভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্তমহাশয় পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী



গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লিখিয়া লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন; তাহার পর ৺রাজনারায়ণ বসু হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া ও ৺নবগোপাল মিত্র তাহা অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া এই স্বদেশী ভাবের প্রবাহে খুব একটা ঢেউ তুলিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজই স্বদেশী ভাবের কেন্দ্র ছিল। যখন কেশব বাবু ও তাঁহার দলবল আদি ব্রাহ্মসমাজকে ত্যাগ করিলেন, তখন নবগোপাল বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের পতাকা গ্রহণ করিয়া, সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া ও মৌখিক বক্তৃতা করিয়া আদিসমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। স্বদেশীভাব প্রচার করিবার জন্য পিতৃদেবের অর্থসাহায্যে National paper নামক এক ইংরাজি সাপ্তাহিক বাহির হইল। কতকগুলা "মড়া খেগো" ঘোড়া লইয়া তিনিই প্রথম বাঙ্গলী সার্কাসের সূত্রপাত করেন। আজ যে Bose circus এর কৃতিত্ব দেখা যায় উহা তাহারই পরিণতি। তিনি এত করিলেন, এখন তাঁহার কেহ নামও করে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। তাঁহার একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকা খুবই আবশ্যক।"

এই সময়ে ক্যাথরাঁ (Cathrin) নামে একজন ফরাশী ৺হেমেন্দ্রনাথের নিকট কোনও একটি কায কর্ম্মের জন্য আসিয়াছিল। হেমেন্দ্রবাবু তাহাকে ত্রিশটাকা বেতনে পাচক নিযুক্ত করিলেন। সে পাকও করিবে ফরাশীও পড়াইবে। একবার হেমেন্দ্রনাথ সপরিবারে বোলপুর গিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।

"প্রতিভা (এখন Mrs. Asutosh Chaudhuri) তখন দুই বৎসরের শিশু। ক্যাথরাঁকেও সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গলা মতে আমাদের ব্রাহ্মণ যাহা রাঁধিত—ক্যাথরাঁও তাহাই খাইত। তাহাতে সে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট ছিল না—তবে ভাতের পরিমাণটা তার অনেক বেশী ছিল। সে আমাদের সঙ্গে ফরাশীতেই কথা বলিত, ফরাশীতেই গল্প করিত। তাহার কারণ সে ফরাশী ভিন্ন আর কোন ভাষাই জানিত না। আমাদের বিলাতী খানা খাইবার ইচ্ছা হইলে সেই রাঁধিত। সে অল্প খরচে নানাবিধ ডিস্ প্রস্তুত করিতে পারিত। সে আবার অবসরমত প্রতিভাকে দোলও দিত। তাহার জন্য গাছে সে একটা দোল্না টাঙ্গাইয়াছিল। দোল্ দিতে দিতে সে "হাপ্‌লা—হাপ্‌লা—" করিয়া সোল্লাসে চীৎকার করিত। সে আবার সেজদাদাকে জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌ও শিখাইত। ক্যাথরাঁ বোলপুরে থাকিতে থাকিতে সেখানকার খোয়াড় হইতে কতকগুলি স্ফটিক-পাথর জমা করিয়াছিল। তারপর এক একটা কাঠি বেশ পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ঐ সব পাথরগুলি ফলার মত করিয়া বসাইয়া একরূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিল। কলিকাতার King Hamilton কোম্পানিরা তাহার প্রত্যেকটী ষোল টাকা হিসাবে কিনিয়া লইল। এই সব পাথর আমরা কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার দ্বারা যে কোনও কায হইতে পারে, এ আমাদের মাথায় কখনও আসে নাই। কিন্তু সে একজন সামান্য অল্পশিক্ষিত ইয়ুরোপীয়,—পাথরগুলিকে কেমন কাযে লাগাইল! শুধু কাযে

লাগাইল না, তার দ্বারা দুপয়সা রোজগারও করিল। ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে এই প্রভেদ!"

তখন জোড়াসাঁকো বাড়ীতে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ডিনার দেওয়া হইত। ক্যাথরাঁই ডিনার প্রস্তুত করিত। একদিনকার ডিনারে তৎকালীন্ হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। আর একবার বঙ্কিমবাবুকে খাওয়ান হইয়াছিল।

ক্যাথরাঁর রন্ধনে সিদ্ধহস্ত ছিল। ফরাশীরা অবশ্য রান্নার জন্য বিখ্যাত। ইয়ুরোপের সমস্ত বড় বড় লোকের ঘরে ফরাশী পাচকই থাকে। ফরাশীদের রান্না অনেকটা আমাদেরই মত। ইংরাজদের যেমন এক একটা গোটা জানোয়ার টেবিলে ধরিয়া দেওয়া হয়, ফরাশীদের রীতি সেরূপ নয়। তাহারা মাংস বেশ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া, তাহাতে নানারূপ আনাজ ও মশলা দিয়া বেশ সুস্বাদু ও মুখরোচক করিয়া পাক করে। সে শাক্‌সব্‌জী প্রভৃতি নিরামিষ ডিশও অতি সুন্দর মুখরোচক করিয়া রাঁধিতে পারিত। আমাদের যেমন শাকের ঘণ্ট, শুক্তো প্রভৃতি আছে, সেও Sauce ও মশলা দিয়া সেই ধরণের এক একটা জিনিষ প্রস্তুত করিত। জ্যোতিবাবুদের সে "চণ্ডীপাঠ হইতে জুতা সেলাই" পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই করিত—সে হিসাবে তাহার বেতন খুবই অল্প বলিতে হইবে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে ইঁহাদের নিকট ছিল, তারপর একবার ছুটি লইয়া বাড়ী যায়। সেখান হইতে সে পত্রাদি লিখিত; কিন্তু ফরাশী জর্ম্মান্ (Franco-German) যুদ্ধ বাধার পর হইতে, আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় বেচারা সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছে,—অন্ততঃ জ্যোতিবাবুর ধারণা এইরূপ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পিপীলিকা

(৩)

মানুষ যেমন দুগ্ধবতী গাভী পালন করিয়া থাকে পিপীলিকারাও তেমনি সেই উদ্দেশ্যেই কতকগুলি পোকা পুষিয়া থাকে। এই পোকাগুলি একপ্রকার মিষ্ট রস প্রদান করে সেই রস পিপীলিকারা পরিতৃপ্তির সহিত পান করিয়া থাকে। হুবার সাহেব সর্ব্বপ্রথম এই পিপীলিকা গাভীর (Aphides) অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন তাহারা এই গাভী-পোকার কতকগুলি ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে ঠিক নিজেদের ডিম্বের ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সেগুলি "ফুটিয়া" গাভী-শিশুর জন্ম হইল। এই

শিশুগুলি অতি যত্নসহকারে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। পিপীলিকারাই ইহাদের খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। তদ্বিনিময়ে পিপীলিকারা উহাদের গাত্র হইতে উত্তম সুমিষ্ট রস দোহন করিয়া লইত। উহাদের দোহন প্রণালী এইরূপ :—

পিপীলিকারা তাহাদের পালিত গাভীর উদরের নিম্নদেশে ধীরে ধীরে শুঁড় দ্বারা আঘাত করিতে থাকে—এবং কিছুক্ষণ এইরূপ ভাবে আঘাত করিবার পরই উহাদের শরীরের উক্ত স্থান হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়। এই রস পিপীলিকারা দুধের ন্যায় তৃপ্তিসহকারে পান করে।

এ সম্বন্ধে ডারুইন বলেন—"প্রাণীজগতে সম্পূর্ণরূপে নিস্বার্থভাবে অপরের উপকারের জন্য কোন কাজ করার এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পিপীলিকাদের এই গাভী জাতি (aphides)। তাহারা যে স্বেচ্ছায় এই দুগ্ধ বা রস প্রদান করে নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

"একটি বৃক্ষের উপরিস্থিত প্রায় ১২টি পিপীলিকা-গাভীর নিকট হইতে আমি সমস্ত-পিপীলিকাকে স্থানান্তরিত করিলাম এবং কয়েকঘণ্টার জন্য উহাদের গাভীর নিকটে আসা স্থগিত রাখিলাম। এই সময়ের ভিতর পিপীলিকা-গাভীগুলি দুগ্ধ নিষ্ক্রমণের জন্য নিশ্চয়ই যে ব্যগ্র হইবে আমি সে বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। আমি একটি অণুবীক্ষণ সাহায্যে উহাদিগের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু উহাদের কাহাকেও আপনা আপনি রস নির্গত করিতে দেখিলাম না। অতঃপর আমি উহাদের উদরের নিম্নদেশে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিলাম। এইরূপে পিপীলিকাদের দোহন প্রণালী অবলম্বন করিয়াও কোনও রস নিঃসৃত হইল না। আমি তখন একটি পিপীলিকাকে সেখানে প্রবিষ্ট করাইলাম। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম প্রচুর দুগ্ধবতী এই গাভীগুলিকে লক্ষ্য করিয়া পিপীলিকাটি আনন্দে অধীর হইয়াছে। একবার এ গাভী একবার ও গাভী এইপ্রকার করিয়া সমস্ত গাভীগুলিরই নিম্নোদরে উহার শুঁড় দ্বারা ধীরে ধীরে আঘাত করিবামাত্র এক এক ফোঁটা রস নিঃসৃত হইতে লাগিল। পিপীলিকাটি অতি আহ্লাদসহকারে তৃপ্তির সহিত সে রস পান করিল। অতি অল্পবয়স্ক গাভীগুলিও এইপ্রকার ব্যবহার করিল।" ইহাতেই বুঝা যায় এই দুগ্ধপ্রদান অভ্যাসটী ইহাদের প্রকৃতিগত। হুবারের পর্য্যবেক্ষণ বৃত্তান্তে দেখা যায় পিপীলিকাদিগকে উহাদের গাভীরা নিতান্ত অপছন্দ করে না। (১) কারণ এই রস নিজ নিজ দেহ হইতে নিঃসৃত হওয়া উহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যকীয়। অতএব উহারা পিপীলিকার সাহায্যে ইহা সম্পাদিত করিয়া লয়। যদিও এমন কোনও প্রমাণ নাই যে এক জাতীয় প্রাণী নিঃস্বার্থভাবে অন্য প্রাণীর কোন উপকার করে তবুও প্রত্যেকেই অন্যের প্রকৃতিগত অভ্যাসটুকু হইতে কোনও

(১) Origin of Species, Darwin Edition of John Murray Page 193-94.

উপকার প্রাপ্ত হইবার সুযোগ ছাড়ে না।

পিপীলিকাদের এই 'গাভী' রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় দুইজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞের পরীক্ষিত দুইটী বৃত্তান্তের এস্থানে ভাবানুবাদ করিয়া দিতেছি।

স্যার জন লবক্ (২) বলেন, "আমার সংগৃহীত পিপীলিকাগাভীর ডিমগুলি যখন ফুটিল তখন ভাবিলাম ইহারা Lasius flavus জাতীয় পিপীলিকা। দেখিলাম ছোট থাকিতেই ইহারা গৃহের বাহিরে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে।

"মধ্যে মধ্যে সাধারণ পিপীলিকারাও এগুলিকে বাহিরে নিয়া আসিত। আমি ইহাদিগকে ঘাসের মূল খাইতে দিলাম কিন্তু তাহা বৃথা হইল। কয়েক দিন পরেই সেগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আমি পুনরায় ডিম্ব সংগ্রহ করিলাম, পুনরায় সেগুলি ফুটিল। কিন্তু এবারও আমি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তবে এবার পূর্ব্বকার অপেক্ষা অনেকটা ফল লাভ করিয়াছিলাম। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চের প্রথম ভাগে ডিমগুলি ফুটিতে আরম্ভ করে। আমার প্রস্তুত L. Flavus জাতীয় পিপীলিকাগৃহের নিকট একটা কাচের বাক্সে কতকগুলি নানাজাতীয় সজীব উদ্ভিদ রক্ষিত হইয়াছিল। এই সকল উদ্ভিদ সাধারণত পিপীলিকা বিবরের আশে পাশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিপীলিকারা কতকগুলি শিশু গাভীকে এই উদ্ভিদগুলির নিকট আনয়ন করিল। কিছুকাল পরেই একটি ডেইজি (daisy) গাছের পাতার উপর কতকগুলি পিপীলিকাগাভী দেখিতে পাইলাম। পিপীলিকারা সেই উদ্ভিদের চারিদিক ঘিরিয়া মাটীর প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া সেগুলিকে সুরক্ষিত করিল। এইরূপে গ্রীষ্মকাল অতীত হইল। ৯ই অক্টোবর তারিখে দেখিতে পাইলাম গাভীগুলি অনেক ডিম্ব প্রসব করিয়াছে। ডেইজি গাছটি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তাহাতে অনেক নূতন গাভী রহিয়াছে। একই প্রকার ডিম্বও অনেকগুলি সেখানে দেখিতে পাইলাম।"

পিপীলিকারা যখন নিজ গৃহে গাভী প্রতিপালন করে তখন সেগুলি যে সেখানে ডিম্ব প্রসব করিবে তাহাও নিশ্চিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে এই গাভীজাতীয় প্রাণীরা ঠিক্ পিপীলিকা গৃহে বাস করে না; পিপীলিকা-গৃহের সন্নিকটে ইহাদের খাদ্য-উদ্ভিদের মূলে ইহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। এই স্থানেই ইহারা ডিম্ব প্রসব করে এবং এই ডিম্বগুলিকে পিপীলিকারা নিজ গৃহে লইয়া গিয়া সেখানে যত্নসহকারে সেগুলিকে উদ্ভিদের মূলে রাখিয়া দিয়া যায়।

বুকনীর (৩) বলিতেছেন :

"আমার বাগানে রোপিত দুইটি ash বৃক্ষের চারার মধ্যে একটি পাঁচ ছয় বৎসরের ভিতর পূর্ণায়তন লাভ করিল; কিন্তু অন্যটি প্রতি বৎসর মুকুলিত হইবার সময়ে লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা-গাভী কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত

(২) Ants Bees & Wasps.

(৩) Geistes leben der Thiere

হইয়া যাইত। এগুলি কচি কচি পাতা এবং কুঁড়িগুলিকে বিনষ্ট করিয়া বৃক্ষটির বৃদ্ধির পথে সমূহ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। যখন বুঝিতে পারিলাম এইপ্রকার বিঘ্নের একমাত্র কারণ ঐ পিপীলিকা-গাভী তখন সেগুলিকে ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হইলাম। পর বৎসর মার্চ্চ মাসে আমি পিচকারির সাহায্যে বৃক্ষটিকে উত্তমরূপে ধৌত করিলাম—ফলে মে মাস পর্য্যন্ত বৃক্ষটি উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। নূতন পাতা ও ফুলে বৃক্ষটী লক্ লক্ করিতে লাগিল! দেখিয়া আমার খুব আনন্দ হইল; কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। একদিন প্রভাতে দেখিতে পাইলাম, যথেষ্ট পরিমাণ পিপীলিকা বৃক্ষটীর গোড়ায় দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম পিপীলিকারা এক একটী গাভী সঙ্গে করিয়া লইয়া সেগুলিকে বৃক্ষের পাতায় পাতায় সংরক্ষিত করিতেছে। শীঘ্রই বৃক্ষের নিম্নদেশের পাতাগুলি উহারা একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! তারপর কয়েক সপ্তাহের ভিতর পুনরায় বৃক্ষটী পূর্ব্বের ন্যায় শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমি বৃক্ষস্থ সমস্ত পিপীলিকা-গাভীকে ধ্বংস করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুদিনের ভিতরই আমার বাগানের পিপালিকারা দূর প্রদেশ হইতে নূতন গাভী ধরিয়া আনিয়া পুনরায় সে বৃক্ষে স্থাপিত করিয়াছে দেখিলাম।”

পূর্ব্বে একস্থানে বলা হইয়াছে যে, অনেক পিপীলিকা নিজ আবশ্যক অপেক্ষা অতিরিক্ত দুগ্ধ পান করিয়া সেই অতিরিক্ত পরিমাণ দুগ্ধ অন্য পিপীলিকাদের পান করিতে দেয়। এই প্রণালীতেই রাণীপিপীলিকাদিগকেও দুগ্ধ পান করাইয়া থাকে।

(৪)

সাধারণতঃ তিন জাতীয় পিপীলিকার ভিতর দাসদাসী রাখিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহের দাসদাসী বৃদ্ধি করা ইহাদের একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উহারা সুযোগ ও সুবিধামত অন্য পিপালিকাগৃহ আক্রমণ ও তল্লাস করে। এবং প্রায়ই এইরূপে বিপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামের পর বিজেতাদল বিজিত পিপীলিকাগৃহের যাবতীয় গুটি (larva) লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। এই লুণ্ঠিত গুটিগুলিকে উহারা উপযুক্ত যত্নসহকারে প্রতিপালন করে এবং তাহা হইতে অসংখ্য পিপীলিকা শিশু দাস হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর উহাদিগকে নানাপ্রকার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। সারা জীবন অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় উহারা প্রভু দিগের নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিয়া যায়। তাহাতে একটুও শৈথিল্য করে না। প্রভুদের গৃহকে উহারা নিজ গৃহের ন্যায় মনে করিয়া থাকে। F, Sanguinea—জাতীয় পিপীলিকা সংখ্যায় অতি অল্প দাস রাখে। কিন্তু F. Rufescenes-দের আবার দাস বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছাটা বেজায় প্রবল।

F, Sauguineaদের দাস কম বলিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য ইহারা নিজেরাই সম্পন্ন করে। মাত্র গৃহাভ্যন্তরের খুঁটিনাটি কাজই দাস দাসীর উপর ন্যস্ত হয়। উহাদের দাসগুলি কখনও বিবরের বাহিরে

আসিবার অনুমতি পায় না—বাহিরে আসিবার তাহাদের কোনও অধিকার নাই। প্রভুরা ইহাদের বিশ্বস্ততার উপর অতি অল্পই নির্ভর করে। এবং সেই জন্যই ইহাদের পলায়ন আশঙ্কা করিয়াই—গৃহের বাহিরে আসিতে দেয় না। যদি কোনও কারণে গৃহ পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহাহইলে প্রভুরা তাহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যায়।

F. Rufescene দের যেমন অসংখ্য দাস তেমনি তাহাদের যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যই দাস দাসীর উপর ন্যস্ত। পুরুষ বা রাণী পিপীলিকারা ত কোন কাজই করে না—এমন কি শ্রমিক পিপীলিকাদেরও দাস জুটাইবার জন্য উৎসাহ ও পরিশ্রম যতটা দেখা যায়—অন্য কোনো প্রকারের কার্য্যে তাহাদের শ্রমপ্রিয়তার নিদর্শন মোটেই পাওয়া যায় না। কাজেই একমাত্র ভৃত্যদের উপর সমস্ত পরিবার নির্ভর করিয়া থাকে। প্রভুরা গুটি এবং কীটগুলির ভরণ পোষণ বা যত্ন তত্ব লওয়ার নামটী করেন না। অতি সামান্য গৃহকর্ম্ম হইতে গৃহ পরিবর্ত্তন ইত্যাদি গুরুতর কার্য্য পর্য্যন্ত ভৃত্যদের উপর ন্যস্ত হয়।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী

মাতৃত্ব

মাতৃসৃষ্টি জগতের কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। মাতৃত্ব উদ্ভিদ্ ও জীবরাজ্যের একটা সার্ব্বজনীন ও অতি প্রয়োজনীয় নীতি। ক্ষুদ্রতম পুষ্পকোষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর উদ্ভিদ্ ও জীবশ্রেণীর মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া উচ্চতম স্তন্যপায়ী জীবে ইহার পূর্ণ পরিণতি। মাতৃত্ব জীবাভিব্যক্তির একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।

জীবরাজ্যে প্রকৃতির নানাবিধ কার্য্যের মধ্যে মাতৃ সৃষ্টি একটা প্রধান সম্পাদন কার্য্য। প্রণিধান করিয়া দেখা যায় যে, এই মাতৃত্ব অতি অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকৃতির নিম্নস্তরে বর্ত্তমান্। ইহার সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রকৃতির স্তরে স্তরে একটা চেষ্টা চলিতেছে, পুরাতন ভাব পরিত্যক্ত হইতেছে এবং নিয়ত আদর্শের আবির্ভাব হইতেছে। উচ্চতম স্তরে একটী সম্পূর্ণ মাতৃত্বের নির্ম্মাণ হইতেছে।

একটী পরিবারের সংগঠনই গোড়া হইতে প্রকৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য। পরার্থচেষ্টা জীবনের প্রথম বিকাশের সময়েই অসম্পূর্ণ আকারে স্বভাব ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। উদ্ভিদ্ জগতে পুষ্পোৎপাদক বৃক্ষে আমরা মাতৃত্বের ভবিষ্যৎ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। এই মাতৃত্ব বৃক্ষবীজে এক একটী জীবনাঙ্কুরের চতুষ্পার্শে আবরণের উপর আবরণের রচনার দ্বারা উহাকে সুরক্ষিত করে এবং ঐ আবরণ মধ্যে উক্ত জীবনের প্রথম বিকাশের নিঃসহায় মুহূর্ত্তের জন্য আহার্য্যের আয়োজন করিয়া দেয়। একটা বৃক্ষের জীবনেতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যে এই ফলপুষ্পোদ্গম রূপ পরার্থপরতাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

সেই জন্য বৈজ্ঞানিকগণ পুষ্পোৎপাদক বৃক্ষকেই বৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন।

জীবরাজ্যের প্রারম্ভে মাতৃত্বের অভাব। সমস্ত মৌলিক জীব মাতৃহীন। তাহাদের কোন বিশেষ আশ্রয়ও নাই এবং তাহাদের জন্য যত্ন করিবারও কেহ নাই। জননী বসুন্ধরাই তাহাদের একমাত্র মাতৃস্থানীয়া। কিন্তু আমরা যতই জীবসৌধের শিখর সন্নিকটে উপস্থিত হইতে থাকি, ততই রক্ষণকারী মাতৃত্বের সত্তা আমাদের নিকট অনুভূত হইতে থাকে। ঠিক কোন্ স্থান হইতে মাতৃত্বের আরম্ভ, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ইহা যে একটা সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! সাধারণত বলা যায় যে, বাৎসল্য প্রকৃতির একটা বিশেষ স্বভাব। কিন্তু প্রকৃতির অর্দ্ধাংশ মেরুদণ্ডহীন জীবচরিত্রে এই বৃত্তি আছে কিনা সন্দেহ। যদি থাকে, তবে তাহা অত্যন্ত অল্পমাত্রায় বিদ্যমান্। মেরুদণ্ডশালী জীবের চরিত্রে এই বৃত্তি বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান্। আদিম অবস্থায় প্রকৃতি জীবকে এরূপভাবে গঠিত করিয়াছিল যে, তাহাদের মাতার প্রয়োজন ছিল না। জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই তাহারা নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং তাহারা ঐ কর্ম্মে সক্ষমও ছিল। সেদিন জগতে জননী বর্ত্তমান্ ছিল কিন্তু মাতা ছিল না। সন্তান উৎপাদন করাই তাহার কার্য্য ছিল সন্তানের প্রতি ফিরিয়া চাহিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না। সেই অযুতযুগব্যাপী আদিম অবস্থায় জগৎ প্রেমহীন ও নীরস ছিল। ইহা মাতৃহীনের রাজ্য ছিল।

প্রকৃতির নিম্নস্তরে অদ্যাপি সেই বিধানের পরিবর্ত্তন হয় নাই। লক্ষ লক্ষ প্রকার জীবের জন্মকালেই মাতৃবিয়োগ হয়। উদাহরণ স্বরূপ কর্কটের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে এই বিধানের প্রাধান্য থাকিলেও মাতৃত্বের ঈষৎ অস্পষ্ট আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপের স্থলকর্কট বৎসরের এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে দল বাঁধিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করে এবং সমুদ্র তরঙ্গে তাহাদের অণ্ড প্রসব করিয়া ফিরিয়া যায়। যে বৃক্ষপত্র তাহার পূর্ব্বপুরুষ গুটীপোকার প্রিয় এবং ভক্ষ্য, প্রজাপতি সেই পত্রে অণ্ড প্রসব করে। অণ্ড সংরক্ষণের নিমিত্ত পত্রের পশ্চাদ্দিকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সে ঐ অণ্ড স্থাপিত করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর জীবচরিত্রে—ঐ অণ্ডাসক্তিতে —অণ্ডকে যথাসময়ে যথাস্থানে স্থাপিত করা, জল বায়ু এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা এবং খাদ্যের আয়োজন প্রভৃতি কর্ম্মে—মাতৃত্বের প্রথম আভাষ দেখা যায়। কিন্তু ডিম্বের প্রতি যত্ন ও সন্তান বাৎসল্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ। একটা চরিত্রগত যন্ত্রচালিত সংস্কার, অপরটা বুদ্ধিবিবেক প্রণোদিত কার্য্য। অণ্ড হইতে সন্তানোৎপত্তির সময় যদি ঐ প্রজাপতি বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলেও সে ঐ অণ্ডপ্রসূত গুটীপোকার প্রতি যত্নবান্ হইতে পারিত না। কারণ, ঐ বায়ুবিহারী বিচিত্রপক্ষধারী পতঙ্গ-জননীর সহিত এই মৃত্তিকাচারী কীটের কোন শরীরগত সাদৃশ্য নাই। এই কীটের ক্ষুধাতৃষ্ণা বিপদাদির সময়ে তাহাকে সাহায্য

করিবার জন্য প্রজাপতির কোনই ক্ষমতা নাই! ঐ পতঙ্গকে গুটীপোকার মাতৃস্থানীয় করিবার জন্য প্রকৃতির উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়া অণ্ডপ্রসব করিয়াই উহার মৃত্যু হয়।

নিম্নশ্রেণীর জীবমধ্যে মাতৃস্নেহের অভাবের একটা বিশেষ কারণ আছে! এই শ্রেণীস্থ জীবেরা একসঙ্গে বহুসংখ্যক সন্তানের উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই জন্য ঐ সকল সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত মাতৃস্নেহের প্রয়োজন হয় না অথবা এ ক্ষেত্রে মাতৃ-স্নেহ সম্ভব নহে। মোটামুটি দেখিতে গেলে এক একটী সন্তান উৎপন্ন করিয়া তাহার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করা অপেক্ষা এক সঙ্গে বহুসংখ্যকের সৃষ্টি করিয়া নিয়তির হস্তে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া, বোধ হয় প্রকৃতির পক্ষে উৎকৃষ্টতর এবং অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ব্যাপার হইত। কিন্তু এরূপ বিধানের কিছুমাত্র নৈতিক ফল নাই। এই প্রকার সন্তান হইলে মাতৃভাবের বিকাশ হইবার সম্ভাবনা অল্প। এরূপ অবস্থায় ভাল বাসিবার, সময়, সুযোগ এবং পাত্র কিছুই থাকে না।

নিম্ন শ্রেণীর জীবের এই ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ সহজ সন্তানবাৎসল্য হইতে উচ্চতম মাতৃপ্রেমের বিকাশ সাধন করিবার পূর্ব্বে, প্রেমকে জগতের নিকট একটা প্রয়োজনীয় সামগ্রী করিয়া, অণ্ডের সীমার বাহিরে অণ্ডপ্রসূত সন্তানের উপর ইহার বিস্তার সাধন জন্য প্রকৃতিকে তাহার কতকগুলি নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রথমতঃ এক সঙ্গে অল্প সংখ্যক সন্তানোৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ জননীর সহিত প্রসূত সন্তানের এরূপ সাদৃশ্য থাকিবে, যেন জননী উহাদিগকে চিনিতে পারে। তৃতীয়তঃ জন্মের সময় সন্তানগণের দৈহিক অবস্থা এরূপ অসম্পূর্ণ করিতে হইবে, যেন তাহারা তখন নিজেই জীবন যাত্রা আরম্ভ করিতে অক্ষম হয় এবং জননীর সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। চতুর্থতঃ জননীকে বাৎসল্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে হইবে। প্রকৃতি বাস্তবিক এই সকল সুন্দর নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছে। ঐ চতুর্ব্বিধ বর্ণের সাহায্যে প্রকৃতি মাতৃত্বের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই যে, অতি ক্ষুদ্র জীব এক সঙ্গে শত, সহস্র এমন কি লক্ষ সন্তানও প্রসব করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে মাতৃ-যত্ন অসম্ভব এবং মাতৃত্ব বিকাশের ঘোর অসুবিধা। সেই জন্য জীব যতই উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছে তাহার সন্তান-সংখ্যা ততই কমিয়া আসিয়াছে। মৎস এবং ভেক একসঙ্গে হাজার ডিম্ব প্রসব করে। উচ্চতর জীব সরীসৃপের উচ্চতর সন্তান-সংখ্যা একশত। আর একটু উচ্চে পক্ষি-শ্রেণির মধ্যে সন্তানের উচ্চতম সংখ্যা দশ। উচ্চতম জীব মানবের সন্তানসংখ্যা এক। একটা বিস্তৃত যত্নকে একের উপর কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রেমের পরিণতি সাধন এই সংখ্যাহ্রাসের উদ্দেশ্য।

এইবার জননীর সহিত সন্তানের সাদৃশ্যের কথা। যেমন এক সঙ্গে হাজারকে ভালবাসা কঠিন, তেমনই ভ্রূণকেও ভালবাসা

সহজ নহে। নিম্নশ্রেণীতে জননীর সহিত সন্তানের সাদৃশ্য খুব কম। জননীর চিনিবার শক্তি যদিও খুব বেশী হয়, তাহা হইলেও সে তাহার সন্তানকে চিনিতে পারে না। প্রবাদ আছে কোকিল তাহার প্রসূত অণ্ড কাকের নীড়ে স্থাপিত করিয়া কাককে প্রতারিত করে। এইজন্য কোকিলের নাম পরভৃৎ। নানাবিধ রেশমকীট ও প্রজাপতির মধ্যে পতঙ্গজননীর সহিত গুটীপোকার কোনই সাদৃশ্য নাই। কিন্তু দেখা যায়, জীব যতই উন্নত হইয়াছে, ততই এই সাদৃশ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এজন্য প্রকৃতি হঠাৎ ভ্রূণের কোন বাহ্যিক পরিবর্ত্তন করে নাই। সে কেবল ঐ ভ্রূণের একটু আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র। কেবলমাত্র সে অণ্ডগত জীবকে আদেশ করিয়াছে যে, "যত দিন পর্য্যন্ত তুমি তোমার জননী-সাদৃশ্য লাভ করিতে না পার, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে ঐ অণ্ডাবরণের মধ্যে বাস করিতে হইবে। ফলে তোমার অণ্ড-জীবন কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর হইবে"। অণ্ডজ-জীব যতই উন্নত হইতে থাকে, তাহার অণ্ডজীবন ততই দীর্ঘতর হয়। প্রকৃতি তাহার অঙ্কিত চিত্র একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করে না। কেবল তুলিকার সাহায্যে কয়েকটা নূতন রেখা টানিয়া সে ঐ চিত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করে মাত্র। প্রকৃতি নিজের কার্য্যের একটা মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। সে কোন কৃতকর্ম্ম আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে চাহে না, কেবল আবশ্যক হইলে উহা সংস্কৃত করে মাত্র।

উন্নত জীবরাজ্যে জননীর সহিত সন্তানের সাদৃশ্য যদিও সম্পূর্ণ নহে, তথাপি উহা যথেষ্ট। হংসশিশুকে দেখিলে কখন পারাবত-শিশু বলিয়া মনে হয় না; কুক্কুরছানাকে কেহ ছাগ অথবা মেষশাবক বলিয়া ভুল করে না বা বিড়ালশাবককে কেহ শশকশিশু বলে না।

মাতৃত্বের অভিব্যক্তির তৃতীয় প্রণালীটি উল্লিখিত দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই সন্তানটী যদি সক্ষম বীর হইত, তাহা হইলে জননী এবং সন্তানের মধ্যে পরিচয় স্থাপন অনাবশ্যক হইয়া পড়িত এবং ঐ কার্য্যের জন্য কোন কৌশল উদ্ভাবনেরও প্রয়োজন হইত না। সন্তানের সহিত মাতার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও বাধ্যবাধকতা স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রকৃতি একটী সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে। জীব যতই উন্নত শ্রেণীতে আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের শৈশব-দুর্ব্বলতা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুর্ব্বলতার সময় আত্মরক্ষার জন্য সন্তান জননীর সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। অতি নিম্নশ্রেণীর জীবশিশু জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতেই জীবন-যাত্রায় সক্ষম। জননীর সাহায্য প্রার্থনা করা দূরের কথা, জননীর সহিত পরিচিত হইবারও তাহার প্রয়োজন নাই। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের জীব পক্ষি শিশু তাহার শৈশবাবস্থায় রক্ষণা-বেক্ষণ, ভরণ-পোষণ প্রভৃতির জন্য জননীর সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহার আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শৈশবান্তে যখন সে স্বতন্ত্রভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে

সমর্থ হয়, তখন সে চিরদিনের জন্ম জননী-সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করে। ভবিষ্যতে সন্তান ও জননীর মধ্যে কেহ কাহাকে চিনিতেও পারে না। স্তন্যপায়ী জীব সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর জন্তু। ইহাদের শৈশব দুর্ব্বলতার পরিমাণ ও কাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আবার দেখা যায়, এই একই শ্রেণীর অন্তর্গত জীবসমূহের মধ্যে ক্রমশঃ উন্নত স্তরে জননীর অঙ্কাশ্রয়ের জন্য আগ্রহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। শৈশবাবস্থায় মনুষ্যশিশু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল এবং ঐ দুর্ব্বলতা অধিককাল স্থায়ী। এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া হয়ত কেহ বলিবেন, অভ্যুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটা সুদীর্ঘ শৈশব-দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করিয়া জীবকে পরমুখাপেক্ষী করা অপেক্ষা জন্মমুহূর্ত্তেই তাহাকে জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত করাই ত অধিকতর নিপুণতা। কিন্তু তাহা না করিয়া প্রকৃতির এ বিপরীত ব্যবস্থা কেন? ইহার উত্তর এই যে, জীবকে জীবনসংগ্রামে সক্ষম করাই যদি প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে উক্ত ব্যবস্থা সমীচীন হইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রকৃতির চরম লক্ষ্য আধ্যাত্মিক। স্বজীবনার্থে সংগ্রাম এই আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির একটা সহযোগী প্রণালী মাত্র। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে প্রকৃতির উদ্দেশ্য নৈতিক পরিণতি ও জীবদেহের নির্ম্মাণ-কৌশলের পরিণতি সাধন। নিষ্ঠুরতার পরিবর্ত্তে স্নেহের স্থাপন এবং আশ্রয়, প্রেম ও মাতৃত্বের অবতারণা করা। এই সুচিন্তিত সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীর সাহায্যে প্রকৃতি ধীরে ধীরে বল্লাকর্ষণের দ্বারা উদ্ধত হৃদয়হীন শিশুগণকে শান্ত করিয়া গৃহাশ্রয়ী করিয়াছে এবং জননীর বিশুষ্ক অন্তঃকরণে স্নেহ মমতার সুমিষ্ট নির্ঝরের সৃষ্টি সহকারে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করিয়া, জীব-চরিত্র সংযত করিয়াছে।

প্রকৃতির চতুর্থ প্রণালীটী—যাহার দ্বারা জননী বাৎসল্য-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে—তাহা শারীরিক হিসাবে মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চার, আর নৈতিক হিসাবে উহা বাৎসল্য প্রেম। এই চতুর্ব্বিধ প্রণালী-সংস্কৃত জীবনবিধি পূর্ব্বতন জীবনবিধি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। শৈশবাবস্থায় জীব পরিণতবয়স্ক জীব অপেক্ষা দৈহিক ও মানসিক উভয় বিষয়ে হীন। সুতরাং শৈশবে জীবের বিপদ সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অতএব যে সকল শ্রেণীর জীবকে শৈশব হইতে স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হয়, তাহাদের জীবনাতিবাহন অত্যন্ত কঠিন এবং বিপদসঙ্কুল। পরন্তু যদি এই যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই তাহাকে যথেষ্ট বলিষ্ঠ, সক্ষম সাহসী করিয়া গঠিত করা যায়, তাহা হইলে সেই জীবন প্রণালী সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। উন্নত শ্রেণীর জীবনে প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করিয়াছে। এইরূপ শারীরিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অভিব্যক্তিও সংসাধিত হইয়াছে। যৌনত্ব এবং তৎসহযোগী স্ত্রীলোকের শান্ত সহিষ্ণুতা সৃষ্টির সহিত সামাজিক ও সুন্দর পারিবারিক সম্পর্কের সূচনা হইয়াছে। এই সম্পর্ক স্থাপন জীবের ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয় প্রকার জীবনেরই অনুকূল।

যে দিন প্রথম মানব সন্তানটী জন্মগ্রহণ করার পর প্রকৃতির অঙ্কে শায়িত হইয়াছিল,

সেই দিনটী অভিব্যক্তির ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন। কারণ, মনুষ্যের অভ্যুন্নতির পূর্ণতা সম্পাদন করিতে এবং জগতে স্নেহের প্রচার করিতে যেন সেই ক্ষুদ্র শিশুটী জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। জননী সন্তানকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, ইহা সত্য। কিন্তু সন্তানই জননীর শিক্ষক, ইহাও একটী পূর্ণতর সত্য। কারণ, ইতিপূর্ব্বে যখন সন্তান জননীর শিক্ষক ছিল না, তখন জগতে কোটী কোটী জননীর আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু উচ্চ স্নেহ তখন জন্মগ্রহণ করে নাই। কোমলতা, সাধুতা, পরার্থপরতা, ভালবাসা, যত্ন, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি গুণসকল তখন কোরকস্থ ছিল। তখন জনয়িত্রী ছিল, কিন্তু মাতৃত্ব ছিল না। প্রকৃত মাতৃত্বের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত মানব শিশুর সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল। স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগতে দুইটী নৈতিক বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। একটী সন্তানকে তাহার জননীর প্রতি আগ্রহশালী করিবার জন্য শিক্ষিত করিয়াছিল, অপরটী জননীকে সন্তানবাৎসল্য শিক্ষা দিয়াছিল। এক্ষণে এই বিদ্যালয়-জীবন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিয়া স্নেহের বিকাশ সাধনের সুযোগ স্থাপিত করা অভিব্যক্তির পঞ্চম চেষ্টা।

অধিকাংশ জীব এই বিদ্যালয়ে কেবল কয়েক দিবস বা সপ্তাহের জন্য অবস্থান করে। কেবল মানবশিশুর শিক্ষাকাল সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। মনে কর একটী মনুষ্য ও বানর একই দিনে এবং একই সময়ে জন্মগ্রহণ করিল। কয়েক সপ্তাহ মধ্যে দেখা যাইবে যে, ঐ বানর শিশু বৃক্ষারোহণ, তাহার জননীর ন্যায় শব্দ করণ, এবং আহার প্রভৃতি জীবনোপযোগী কার্য্যে সক্ষম হইয়াছে। আরও কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা যাইবে যে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে জীবনধারণ করিতে সক্ষম হওয়ায় সে তাহার মাতৃপার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়াছে। পক্ষান্তরে এই উভয়কাল এবং আরও কতকটা সময় ব্যাপিয়াও ঐ মানব শিশুটী ভক্ষণ, আবরণ, আত্মসংরক্ষণ প্রভৃতি কোন কার্য্যেই সক্ষমতা লাভ করিতে পারে নাই। তাহার এখনও যেন অর্দ্ধ জাগরিত অবস্থা। ইহার শরীরের অস্থি, মাংসপেশী প্রভৃতি অংশ ঐ বানর শিশুর সমান, কিন্তু অক্ষম। ঐ মানবশিশুর চক্ষু আছে, তথাপি সে যেন দেখে না; কর্ণ আছে, তথাপি সে যেন শ্রবণ করে না এবং হস্তপদাদি আছে, তবুও সে চলিতে অক্ষম। দেখিলে যেন বোধ হয়, শরীর গঠনে প্রকৃতির চেষ্টা এখানে ব্যর্থ।

এই বিলম্বের দুইটী কারণ আছে। প্রথমটী নৈতিক। নৈতিক শিক্ষার জন্য মানবশিশুকে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মাতৃপার্শ্বে অবস্থান করিতে হয়। দ্বিতীয়টী শারীরিক। বানরশিশুর মস্তিষ্কের গঠনের সহিত মানব শিশুর মস্তিষ্কের পার্থক্য অনেক। বানরের সহিত তুলনায় মানব মস্তিষ্ক যেন একটা অতিরিক্ত অঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। বানরের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র এবং উহা একটা ইতর প্রাণীর জীবনকার্য্যোপযোগী বলিয়া সরল ভাবে সুতরাং অল্পকাল মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মানবজীবন কার্য্যসক্ষম করিবার জন্য মানব মস্তিষ্ককে কোমল এবং যথেষ্ট জটিল ভাবে নির্ম্মিত করিতে হইয়াছে। সেই জন্য উহার নির্ম্মাণ কিছু দীর্ঘতর সময়সাপেক্ষ।

এই স্থান হইতে যথার্থ মানসিক অভিব্যক্তির আরম্ভ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতের নৈতিক অভ্যুন্নতির সাহায্য হইয়াছে।

একটী ইতর জীবনের চালনার উপযোগী যন্ত্র প্রকৃতির শিল্পশালায় একদিনেই নির্ম্মিত হইতে পারে। কারণ, ইহার চক্রের সংখ্যা অল্প, ইহা সরলভাবেই নির্ম্মিত এবং ইহার বিভিন্ন অংশের সংযোগপ্রণালী অত্যন্ত সূক্ষ্ম নহে। জন্মগ্রহণ করার পর একটী ইতর প্রাণী তাহার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যাহা করিবে, সে কার্য্য তাহার পিতৃপিতা-মহাদির দ্বারা লক্ষ লক্ষ বার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী ক্ষমতাসকল ঐ জাতীয় জীবের বংশগত এবং মজ্জাগত স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখন একটী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন ঐরূপে একটা বাঁধা যন্ত্রের সাহায্যে বাঁধা নিয়মে চলিবার নহে। সে নূতন কার্য্য করিবে, নূতন বিষয় চিন্তা করিবে, এবং জীবনের নূতন পন্থা সমূহের সৃষ্টি করিবে। মনুষ্যজীবনের অর্দ্ধাংশের নিমিত্ত বংশগত স্বভাবের কোন ক্ষমতা নাই। মনুষ্যের প্রত্যেক বংশধর এই বিঘ্ন-বহুল সংসারে আপনাপন অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পন্থা নির্ম্মিত করিয়া এবং প্রকৃতির সহস্র পরিবর্ত্তন-শীলতার মধ্য দিয়া আপনাকে সযত্নে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই সমস্ত সক্ষমতার জন্য আয়োজন বড়ই জটিল। বানর শিশুর দেহের মধ্যে কেবল মাত্র তাহার পিতৃপুরুষানুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর পুনরানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কতকগুলা ছাঁচে ঢালা যন্ত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু মনুষ্যদেহে সহজ সংস্কারগত কার্য্যের নিমিত্ত সে গুলির স্থাপনা ত করিতে হয়ই, তদ্ব্যতীত তাহার মস্তিষ্কে খানিকটা স্বাধীন বুদ্ধিরও আয়োজন করিয়া দিতে হয়। এই শক্তির বলে সে নূতন কর্ম্মের অনুষ্ঠান, নূতন পন্থার আবিষ্কার করে এবং উচ্চতর আদর্শের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। আমাদের শ্বাস যন্ত্র, যখন আমরা উহার কথা ভুলিয়া যাই, তখনও স্বকার্য্য সাধিত করিতে থাকে। আমরা থামাইতে চেষ্টা করিলেও আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র সর্ব্বশরীরে রক্ত সঞ্চালিত করিতে থাকে। আশঙ্কা উপস্থিত হইলে আমাদের নেত্রপল্লব স্বতই নিমীলিত হয়। এই জাতীয় অঙ্গসমূহ অগণিতবার ঐ একই কার্য্য সম্পাদিত করিয়া আসিতেছে। সেই জন্য ঐ সকল শক্তি তাহাদের এক একটা স্বভাবগত অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং উহাদের নির্ম্মাণে অধুনা প্রকৃতিকে অধিক সময় নষ্ট করিতে হয় না। কিন্তু এই উচ্চতম অঙ্গ মস্তিষ্ক একটী সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। ইহার কর্ত্তব্যের পরিধি এবং নিত্য নূতন কর্ত্তব্যের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইহা এক্ষণে এমন কার্য্য করিতেছে, যাহা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ করিতে শিখে নাই। মস্তিষ্কের পুরাতন অংশটা শৈশবের প্রথম অংশেই নির্ম্মিত হইয়া যায়। কিন্তু নূতন অংশটার নির্ম্মাণ এবং যথাযথরূপে সংস্থাপনের নিমিত্ত অনেক সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। একখানা পালচালিত নৌকার খোল এবং পাল প্রস্তুত হইলেই উহাকে জলে ভাসাইতে পারা যায়। কিন্তু একখানি ষ্টীমারের জন্য এঞ্জিন কলের আবশ্যক। এই এঞ্জিন কল নির্ম্মাণের জন্য যে অধিকতর সময়টুকু ব্যয়িত

হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ ঐ ষ্টিমারের যে কোন স্থানে ইচ্ছামত গতি পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা, ঝড়তুফানের সময় ইহার নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণাবলীর দ্বারা হইয়া থাকে। সেই জন্য দীর্ঘ শৈশববিশিষ্ট মানবজীবন অন্যান্য জীবন অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ এবং সক্ষম।

উচ্চতর মস্তিষ্ক সৃষ্টির পূর্ব্বে নৈতিক হিসাবে প্রত্যেক বস্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অচিরস্থায়ী ছিল। জীবসকল জন্মগ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত এবং শিশুগণ স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র ছিল। তখন নিঃসহায়ের জন্য কেহ দুঃখ করিত না, বেদনার উপশম করিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং শান্তি ও যত্নের নিমিত্ত একটী মুহূর্ত্তও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সেকালে সন্তানের ক্ষুদ্র দেহস্থ জীবনের স্ফুলিঙ্গটী নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম করিলেও জননীর অন্তঃকরণে কোন চঞ্চলতা উপস্থিত হইত না। জনক জননীর দ্বারা সন্তানের কোন দৈহিক অথবা সন্তানের দ্বারা জনক জননীর কোন নৈতিক উপকার সংসাধিত হইত না। তখন শিশুরা শৈশব চাহিত না এবং বৃদ্ধেরও কোন সহানুভূতি ছিল না। এমনকি স্তন্যপায়ী জীবেরও বাৎসল্যের পরিধি অতীব সঙ্কীর্ণ ছিল। যে সিংহী আজ তাহার শিশুর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, সে হয়ত কাল সেই শিশুর সহিত মৃত্যু পর্য্যন্ত যুদ্ধে নিযুক্ত। মেষ শাবক যতক্ষণ মেষশাবক থাকে, ততক্ষণই সে তাহার জননীর যত্নের সামগ্রী, কিন্তু বড় হইলেই জননী আর তাহাকে চিনিতেও সক্ষম নহে। এই সকল স্থলে স্নেহ, যতক্ষণ উহা বর্ত্তমান পরে ঐ স্নেহের কোন স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত আর তাহাদের মস্তিষ্কে থাকে না। মাংসাশী জীবের মধ্যে দেখা যায়, যে শৈশবে সন্তান কিছুকাল মাতৃস্নেহ ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ সময় পিতৃস্নেহ লাভ করা দূরে থাক্ সে পিতৃহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেই ধন্য হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর জীবেরা (উদাহরণ স্বরূপ বিড়ালের উল্লেখ করা যাইতে পারে) পিতৃ আয়ত্তের বাহিরে গোপনে জননী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত মাতৃজননীর আবির্ভাব হয় নাই, সে পর্য্যন্ত প্রেমের অভিব্যক্তির কোনই সুযোগ ছিল না।

পুরুষ জাতির তুলনায় স্ত্রী জাতি একটু নিশ্চেষ্ট স্বভাব। এই নিশ্চেষ্ট স্বভাবের দ্বারা সে কিছুকাল স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে সক্ষম। ইহা ধৈর্য্যের অঙ্কুর। অনুশীলনের দ্বারা এই অঙ্কুরটীকে শাখাপ্রশাখাশালী করিয়া অক্ষুণ্ণ মূর্ত্তিমান ধৈর্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত প্রকৃতি যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছে। সে মাতৃ অঙ্কে দুর্ব্বল শিশুটীকে শায়িত করিয়া মাতাকে আদেশ করিয়াছে, "ইহারই সাহায্যে ধৈর্য্যশীলতার অনুশীলন কর। ইহার লালন পালনের প্রত্যেক কার্য্যে তোমার ধৈর্য্য-শীলতার আবশ্যক হইবে।" শিশুর দেহে কোনরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে মাতা তাহার মুখে এবং প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে সেই যন্ত্রণাচিহ্নের উপলব্ধি করিয়া থাকে, এই ক্ষমতা ধৈর্য্যানুশীলন জাত। এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে সন্তানের বেদনা জননী অনুভব করিতে সক্ষম হয়। এই বেদনাবোধজনিত দ্বিতীয় গুণ—সহানুভূতি। সহানুভূতি প্রণোদিত হইয়া মাতা আর্ত্ত শিশুর বেদনা লাঘবের

যত্নপরতা গুণ জননীর চরিত্র গত হইয়া যায়। এই রূপে ধৈর্য্য, সহানুভূতি ও যত্নপরতা এই গুণত্রয় মানবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

এই প্রকারে সন্তান পালনের সময় হয়ত কতিপয় জননীর ক্রোড়স্থিত শিশুর সম্মুখে একটা আকস্মিক বিপদ, আহারাভাব, পীড়া ইত্যাদি—উপস্থিত হইল। হয়ত এই নূতন বিপদ হইতে সন্তান রক্ষণ সেই জননীর ক্ষমতা বা ধৈর্য্যের সীমাবহির্ভূত, হয়ত সেই জননী আজ পর্য্যন্ত সন্তান রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছে, তাহার অধিক আর সে কিছু কবিতে পারে না। এরূপ স্থলে ঐ নিঃসহায় শিশু একাকী বিপদের সম্মুখীন হইতে অসমর্থ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং ঐ অনুপযুক্তা জননীর বংশ-সূত্র এই স্থানে ছিন্ন হইয়া পড়িল। এইখানে সন্তানের মৃত্যুতে জননীরও মৃত্যু। পক্ষান্তরে হয়ত অপর এক জননী অনুরূপ অবস্থায় তাহার আত্মদেহ পর্য্যন্ত উৎসর্গীকৃত করিয়া সন্তানকে রক্ষা করিল। সেই জন্য এই উপযুক্তা জননীর বংশসূত্র অচ্ছিন্ন রহিল। এই স্থানে আত্মত্যাগ জগতে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য চরিত্রে রোপিত হইল। এইরূপে প্রাচীন কাল হইতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সাহায্যে অনুপযুক্তা জননী জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে এবং যোগ্যতরা তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। অর্থাৎ অসম্পূর্ণ অপরিণত মাতৃত্ব দিনে দিনে সম্পূর্ণ এবং পরিণত হইতেছে।

সেই আদিম অসভ্য মানবজননী এবং তাহার শিশুটী জগতের কি মহৎ উপকার সাধিত করিয়াছে, উপরোক্ত উদাহরণ হইতে তাহা অনুমান করা যায়। যে দিন সেই প্রথম নিঃসহায় দুর্ব্বল শিশুটীর সাহায্যপ্রার্থনাসূচক প্রথম আর্ত্তস্বর সেই প্রথমা জননীর হৃদয়খানি কোমলতা এবং বাৎসল্য প্রেমের ধারায় পরিপ্লুত করিয়াছিল, যে দিন সেই জননী একটী মুহূর্ত্তেরও জন্য সেই শিশুটীর দুর্ব্বলতা অথবা যন্ত্রণার প্রতি মনোযোগিনী হইয়াছিল, যে দিন সে সহানুভূতির কোন্ অননুভূত কার্য্য অথবা ইঙ্গিতের দ্বারা মাতৃত্বের অনির্ব্বচনীয় আভাষ টুকুর বিকাশ করিয়াছিল, সেই শুভলগ্নে প্রকৃতির শিল্পালয়ে এক নূতন শিল্পী এক নূতন কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেই আদিম শৈশব যতই ক্ষণস্থায়ী হউক উহা প্রকৃতির উরসে যে অমৃত-নির্ঝরের সৃজন করিয়াছে, তাহার ধারা দীর্ঘতর বিস্তৃতির সহিত জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক কেন্দ্রসমূহ পর্য্যন্ত পরিপ্লুত করিয়া সনাতন কাল প্রবহমান্ থাকিবে। ইহার কুলবাসী মানবগণ সেই অমৃত সলিল পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে। একটী ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অকিঞ্চিৎকর বটে। কিন্তু ইহারই মধ্যে মানবজাতির ভবিষ্যৎ আশা বিরাজ করিতেছে। অক্ষম শৈশবাবস্থা ব্যতিরেকে আমাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে আমরা জীব জগতে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী হইতে পারিতাম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! কিন্তু তাহা হইলে আত্মোৎসর্গ গুণ মানব চরিত্রে প্রবেশ লাভ করিত না, সামাজিকতা জগতের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইত না এবং তৎসঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম জগতে স্থান লাভ করিতে পারিত না।

শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী।

বন্ধু

ইংরাজী হইতে

তাহারা দুই বন্ধু। দুই জনে ভারী ভাব, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, বেড়ানো, খাওয়া, পরা, সমস্ত কাজ দুইজনে একসঙ্গে করে। কিছু পাইলে দুইজনে ভাগ করিয়া লয়, একজনকার কিছু হারাইয়া গেলে দুইজনে একসঙ্গে তাহার খোঁজ করে। একজন হাসিলে অপরে হাসে, একজন কাঁদিলে অপরে কাঁদে। দুটী শরীর হইলেও তাহাদের প্রাণ যেন একটি।

তাহা হইলে কি হয়, একদিন হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া একজনকে লইয়া গেল। অপরজন তাহাকে বাঁচাইতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার মৃত্যুর পর অনেকদিন অবধি সে শোকচিহ্ন ধারণ করিল, অনেক কাঁদিল। শেষে ক্রমে ক্রমে বন্ধুর স্মৃতি তাহার কাছে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। সে আবার হাসিল, আবার সংসারের কাজে নূতন করিয়া যোগ দিল।

কয়েক বছর কাটিয়া গিয়াছে; আজ তাহার বিবাহ; এক কলওয়ালার মেয়েকে সে বিবাহ করিবে। উৎসবের মধ্যেও সে বন্ধুকে ভুলে নাই। তাড়াতাড়ি বন্ধুর সমাধির নিকট ছুটিয়া গিয়া সে ডাকিল,

"বন্ধু, বন্ধু!"

কোনো সাড়া নাই। দূরে ঝোপের আড়ালে চাঁদ উঠিল।

"বন্ধু, ও বন্ধু, বন্ধু" বলিয়া সে দুই তিনবার সমাধির উপর হাত চাপড়াইল। তবু উত্তর নাই।

"বন্ধু—"

এতক্ষণে বন্ধু সাড়া দিল। সে বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার বন্ধু পাশে দাঁড়াইয়া। বন্ধু কহিল,

"কিহে, খবর কি; আজ যে হঠাৎ—"

"হঠাৎ নয় ভাই, আজ আমার বিয়ে।"

"বিয়ে! বল কি! এঃ, এ খবরটা আগে দিতে হয়। তা আমাকে কি করতে হবে বল?"

"বাঃ, তুমি যে এরি মধ্যে সব ভুলে গেলে। তুমি নিতবর হবে বলেছিলে যে?"

"ওহো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। আচ্ছা একটু দাঁড়াও; আমি জামা কাপড়টা পরে আসি।" বলিয়া সে অন্তর্হিত হইল; একটু পরেই আবার আসিল। তখন তাহার আর আগেকার বেশ নাই—সে দিব্য বাবু সাজিয়াছে।

বিবাহ হইয়া গেল। বর কনেকে লইয়া বাড়ী ফিরিল।

বন্ধু কহিল, "ভাই আমি চলি"

"সে কি, এরি মধ্যে? একটু কিছু মিষ্টিমুখ করে গেলেনা?"

"না ভাই—"

"বেশ, চল; আমি তোমাকে পৌঁছে দিইগে।"

দুইজনে আবার সমাধির কাছে আসিল। সে কহিল, "বন্ধু!"

"কি ভাই!"

"তোমার দেশটাত আমাকে দেখালে না। চল না, আজ একটু ঘুরে আসি"

"কি যে বল তুমি! বাড়ীতে লোকজন রয়েচেন; তুমি যদি এ সময় তাঁদের না বলে কয়ে, হঠাৎ চলে আসো, তো তাঁরা কি ভাববেন বল দিকিন? আর বন্ধুনীই বা কি ভাববেন!"

"না, তা হোক। তারা তো চিরকাল থাকবে, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা ত আর রোজ রোজ হবে না। "চল, চল।"

"বেশ" বলিয়া বন্ধু সমাধি পার্শ্ব হইতে একটা ঘাসের চাপড়া তুলিয়া ফেলিল।

নীচে একটা সুড়ঙ্গ; ভিতরে তেমন আলো নাই। দুজনে নামিল। খানিকক্ষণ চলিয়া দেখিল, তাহারা একটা মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে। মাঠটী নানা শস্যে ভরা; চারিদিকে অসংখ্য গো মহিষ প্রভৃতি নানাবিধ গৃহপালিত জন্তু চরিতেছে।

"বন্ধু, এ কি রকম?

"কি?"

"এখানে এত ধান, ঘাস, জল রয়েচে, অথচ গরুগুলো এত রোগা যে?"

"ওদের কি গরু ভেবেচ নাকি? ওরা পৃথিবীরই মানুষ। যখন বেঁচেছিল, তখন কাউকে এক পয়সা দেয়নি, আপনিও ভোগ করেনি; তাই এখানে এই অবস্থা।"

ঘুরিতে ঘুরিতে দুইজনে আর একটা যায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে বেশী গাছ পালা নাই; অথচ গরু বাছুরগুলা বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

"বাঃ, এযে দেখ্‌চি, ঠিক উল্টো! কি রকম হল, বল দিকিন?"

"ওরা ছিল অল্পসন্তুষ্ট লোক। যা পেত সে সমস্তই উপভোগ করত; যা দরকার তার বেশী চাইত না। তাই ওরা পৃথিবীতে সুখী ছিল, এখানেও তাই।"

দুইজনে আবার চলিল। কিছুদূর গিয়া বন্ধু কহিল, "ওহে!"

"কি!"

"একটু এখানে দাঁড়াবে? এখানে আমার একটু কাজ আছে। চটপট সেরে আসব, পাঁচ মিনিটের মধ্যে। দেখো, তুমি অন্য যায়গায় চলে যেওনা যেন"

"বেশ"।

বন্ধু চলিয়া গেল। তাহার ঘুম পাইতেছিল; ঢুলিতে ঢুলিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। যখন উঠিল, তখন দেখিল বন্ধু তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার গা ঠেলিতেছে।

"ওহে, ওঠ, ওঠ"

"উঃ—"

"ওঠ।"

ধরমড়িয়া সে উঠিয়া পড়িল। বন্ধু কহিল, "চল ফেরা যাক্; প্রায় আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার দেরি হল।"

"চল।"

দুজনে হুহু শব্দে উপরে উঠিয়া আসিল। যখন বাহিরে আসিল, তখন সে দেখিল, এরি মধ্যে চন্দ্র অস্তোন্মুখ; সে একটা

কাঁটাঝোপের মধ্যে বসিয়া আছে। অনেক কষ্টে বাহির হইয়া সে কহিল,

"বন্ধু, তবে চলি ?"

"এসো, কি আর বলব।"

সমাধিক্ষেত্র হইতে সে যখন বাহির হইল, তখন ভোর হইয়াছে। রাস্তায় দুচার জন লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! লোক গুলাকে ত তাহার অচেনা বোধ হইতেছে! সম্মুখের পথ তুষারাবৃত! বাঃ, পৃথিবীটা এরি মধ্যে বদলাইয়া গেল নাকি! এই সন্ধ্যা বেলায় বরযাত্রীর দল 'বরফ বরফ' করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। রাস্তাগুলা ঘর বাড়িগুলাও যে অন্যরকম দেখাইতেছে! চোখে ধাঁধা লাগিয়া গেল নাকি! নিজের বাড়ী সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। অনেক ঘুরিয়াও নিজের বাড়ির সন্ধান না পাইয়া, সে রাস্তায় একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়, অমুক লোকের বাড়িটা কোথায় ?"

"জানি না, মশায়; ও নামে ত এখানে কেউ নেই ;অন্য গাঁয়ে হবে বোধ হয়।"

রাগে তাহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। লোকটা বলে কি! সে এমন জলজ্যান্ত রহিয়াছে, অথচ লোকটা বলে কিনা, এগাঁয়ে ও নামে কোন লোক নাই! এরা পাগল হইল না কি!

নাঃ—লোকটা বোধ হয় এগাঁয়েরই নয়। সে আরো দুই তিন জন ভদ্রলোককে আপনার বাড়ীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু কেহই তাহার ঠিক উত্তর দিতে পারিল না। একজন বলিল, "আ মোলো, বেটা পাগল নাকি! দাওত পুলিশে ধরিয়ে। এমন যোয়ান চেহারা, আবার ন্যাকামি করা হচ্ছে!"

পাগল! পুলিশ! ন্যাকামি! এর অর্থ কি! সে আশ্চর্য্য হইয়া অর্দ্ধোন্মত্তের ন্যায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আঃ, এতক্ষণে সে একটা—চেনা বাড়ি পাইয়াছে। এই ত তাহাদের গির্জ্জা! এক ছুটে সে—একেবারে পুরোহিতের কাছে গিয়া উপস্থিত!

"মশাই—"

একি, এও যে—অন্য লোক! যাই হোক্ এ মিথ্যা বলিবে না।

"মশায়—, আমার বাড়ি কোথা বলুন্ ত! কাল সবে বিয়ে করেচি! আমার নাম শ্রীঅমুক, শ্রীমতী অমুকের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েচে।"

"কাল বিয়ে! উঁহুঃ, কাল তো কোনো বিয়ে হয়নি। দেখি, খাতা দেখি।"

খাতা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এক রাত্রির মধ্যে এত বিবাহ হইয়া গিয়াছে, অথচ সে টেরও পায় নাই! সে যে—খাতার গোড়ায় নাম সই—করিয়াছিল। পুরোহিতকে এত পাতা—উল্টাইতে দেখিয়া তাহার ভারি হাসি পাইল।

"ওখানে নয়, মশায়, গোড়ার দিকে; ৪৩এর—পাতায়। আমার ঠিক মনে আছে।"

পুরোহিত অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন; পরে ৪৩এর পৃষ্ঠা খুলিয়া কহিলেন,

"হ্যাঁ, ও নামের একজন লোক আছে দেখচি! সেত আজ তিনশ ছিয়াশি বছরের কথা! ৯০৭ সালে!

পুরোহিতও পাগল হইয়াছে নাকি!

সে আবার ছুটিয়া বন্ধুর সমাধিপার্শ্বে গিয়া ডাকিল, "বন্ধু, বন্ধু!"

"কি?"

"এ কি হল, বন্ধু? এযে সব বদলে গেছে। লোকগুলা সব বদ্ধপাগল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর চেয়ে তোমার দেশ ভাল।"

"তবে এসো আমার সঙ্গে।"

দুই বন্ধুতে আবার বহুদিন পূর্ব্বেকার মত হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া গেল।

... ...

পরদিন প্রাতে গ্রামের লোকেরা দেখিল, সমাধিক্ষেত্রে একটা বহু পুরাতন সমাধির উপর কল্যকার উন্মাদ যুবকের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীরত্নাবলী দেবী

ইতরপ্রাণীর দ্বন্দ্বযুদ্ধ

আমরা কুকুর বিড়ালের কলহ সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। হস্তী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পুরুষ জন্তুই স্ত্রীলাভের জন্য এইরূপ মারামারি করে। কিন্তু বহুসময়ে ইতর-প্রাণীদিগের মধ্যে কেন যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড ঘটে তাহার কোন প্রত্যক্ষ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কুকুরে ইঁদুর মারে কিন্তু খায় না। খেঁকশেয়ালী তাহার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া সত্ত্বেও অকারণ বন্যপক্ষী হত্যা করিয়া সেইখানেই ফেলিয়া যায়। খাইবার জন্য বোধ হয় দু একটি পাখী লইয়া যায়।

ষাঁড়দের মধ্যে দলের নেতৃত্ব লইয়া প্রায়ই যুদ্ধ হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ষাঁড়ই দলের নেতা হয় কিন্তু অল্পবয়স্ক উচ্চাভিলাষী প্রতিদ্বন্দ্বীরা সর্ব্বদাই



ষাঁড়ের যুদ্ধ

এই অভিপ্রায়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধে যে জয়ী হয়, সেই দলের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হয়। মধ্যে মধ্যে শান্তপ্রকৃতি গাভীরাও প্রভুদের অনুকরণে শিঙ্ নত করিয়া অপর গাভীকে আক্রমণ করে।

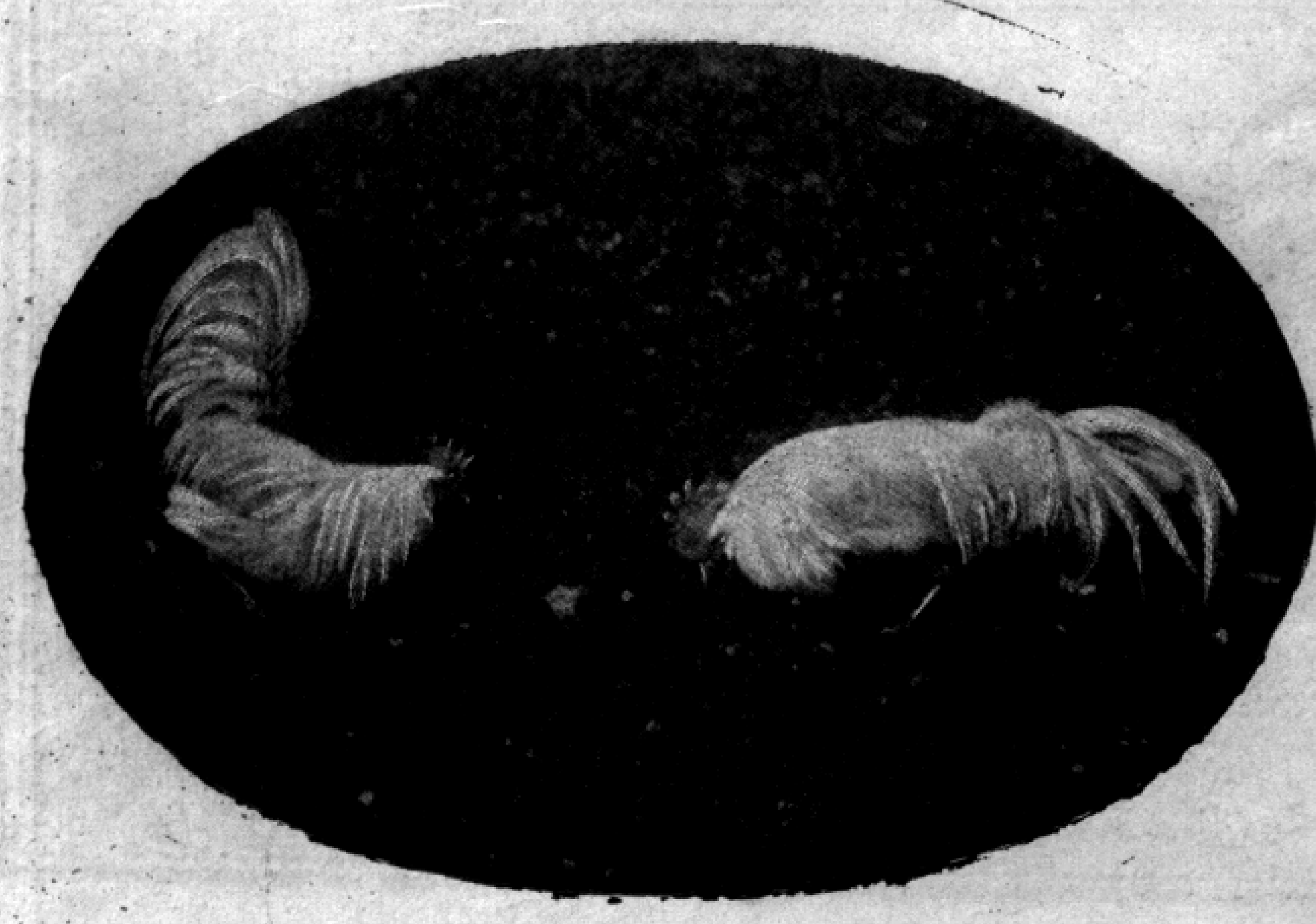
লোকেরা প্রায়ই দ্বন্দ্বপ্রিয় প্রাণীদের লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে ভালবাসে। মোরগদিগের মধ্যে যুদ্ধ যদিও এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; তথাপি এক সময় উহা ইংরাজদিগের জাতীয় ক্রীড়াকৌতুক ছিল। আজকাল যেমন ঘোঁড়দৌড়ে লোক বাজি রাখে, সেই রকম পূর্ব্বে মোরগদিগের যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে তাহারা বাজি রাখিত। এবং বোধ হয় ইহাও সম্ভব যে, যুদ্ধের সময় মানবদর্শকগণের ন্যায় মোরগরাও সমান কৌতুক উপভোগ করিত।

চীনদেশীয় লোকেরা বহুদিন পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছিল যে ঝিল্লী (crickat) পতঙ্গগণ অত্যন্ত যুযুৎসু। তাহাদিগকে যত্নসহকারে শিক্ষিত করিতে পারিলে, ভাল দ্বন্দ্বপ্রিয় পতঙ্গের দল সৃষ্ট হইতে পারে। এখন চীনদেশের ছোট বড় সকল গ্রামেই "crickat-club" স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী পতঙ্গগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া টেবিলের উপর রাখা হয়। তাহারা খাঁচার ভিতর হইতে কিছুক্ষণের জন্য পরস্পরের প্রতি নিরীক্ষণ করে। তার পর রক্ত যখন গরম হইয়া উঠে, তখন তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

হরিণদের মধ্যেও এইরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। অরণ্য ভ্রমণকারীরা প্রায় জঙ্গলের ভিতর দুটি হরিণের অস্থিচর্ম্ম দেখিতে পান। হরিণদের শিঙ্গুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকে। তখন বুঝিতে পারা যায় যে এই শোচনীয় পরিণামের উৎপত্তির কারণ হরিণদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

কখনকখন দুটি হরিণ পরস্পরের প্রতি আক্রমণ করিলে, তাহাদের শিঙ্ সংলগ্ন হইয়া যায়। তখন আর তাহারা আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারে না। এবং নিরুপায় হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়। অবশেষে অনাহার ও ক্লান্তি তাহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়।

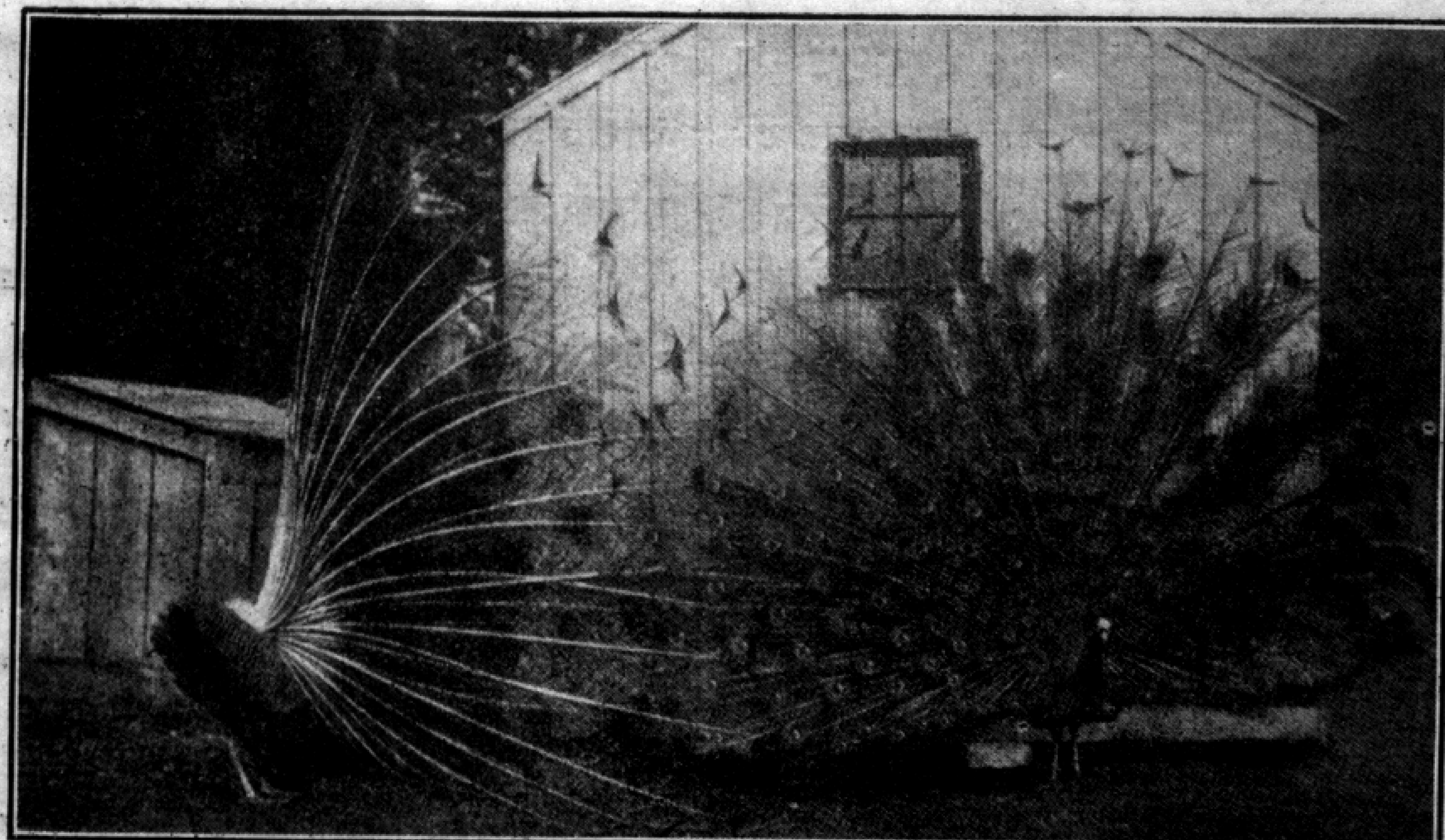
ময়ূরগণ সাধারণতঃ তাহাদের বিস্তৃত বিচিত্র লেজের জন্যই বিখ্যাত।



মোরগের যুদ্ধ

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই লেজের জন্যই তাহাদের এত গর্ব্ব! সাধারণত জাঁকজমকপ্রিয় পরিচ্ছদগর্ব্বিত নিস্তেজ লোককেই ময়ূরের সহিত তুলনা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ময়ূরও তেজহীন নহে পুচ্ছ নাড়া দিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকে না। ময়ূরও সময়ে সময়ে ব্যাঘ্রের ন্যায় বীরদর্পে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে দুইটি ছবি প্রদত্ত হইল।

প্রথম ছবিতে দুটি ময়ূর অপমান সূচক গর্জ্জন করিয়া দম্ভের সহিত তাহাদের লেজ বিস্তার করিতেছে। ২নং ছবিতে একটি



একটি ময়ূর অন্যটির ঘাড়ে পড়িতেছে



দুটি ময়ূর দম্ভের সহিত লেজ বিস্তার করিতেছে

ময়ূর তাহার শত্রুর ঘাড়ে প্রচণ্ডভাবে হঠাৎ লাফাইয়া পড়িতেছে। অনেক সময় এইরূপ যুদ্ধে ময়ূরেরা পালাইবার ভাণ করে। এই কৌশলকে ইংরাজ সেনাপতিরা "strategic movement" বলিয়া থাকে। কখন কখন যুদ্ধপ্রবৃত্ত ময়ূরেরা শূন্যে উঠিতে থাকে এবং তাহা দ্বারা কে বেশী বলবান্ তাহা স্থির করে। তাহারা সে সময় তাহাদের লেজের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়।

মানুষদের সম্বন্ধেও যেমন, পশু পক্ষীদের মধ্যেও সেইরূপ যে বেশী বলবান্ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু সর্ব্বত্রই এই নিয়ম খাটে না। নিম্নলিখিত কৌতুকজনক ঘটনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার একজন আবিষ্কারকের দ্বারা ইহা বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার ভাষাতেই শুনুন,—

"একদিন বনের গভীর প্রদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে তীব্র চীৎকার শুনিতে পাইলাম। মাথা তুলিয়া গাছের দিকে তাকাইয়া দেখি যে, জমী হইতে ৬।৭ গজ উচ্চে একটি ভয়ঙ্কর বিয়োগান্ত নাটিকার অভিনয় হইতেছে। একটি শিকারী বাজ জাতীয় পক্ষী ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মক্ষীভুক পক্ষীদের বাসা আক্রমণ করিতে আসিতেছে, বাসাটিতে সদ্যঃপ্রসূত ডিম্ব আছে।

এবার বাজপক্ষীকে এক অসন্তোষজনক শিক্ষা লাভ করিতে হইল। বিহগদম্পতি তীরের ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র ডানার দ্বারা শত্রুকে তাড়া করিল, তাহার গাত্রে তাহাদের ছুঁচের ন্যায় ধারাল ঠোঁটের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দিল; অথচ শত্রুর করাল কবল হইতে অতীব দক্ষতার সহিত আপনাদের রক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে বাজপক্ষী রণে ভঙ্গ দিল। তথনও বিহগবিহগী তাহার অনুসরণ করিল এবং তাহাকে ঘৃণ্য উপহারে রঞ্জিত করিয়া বিদায় দিল। এই অসমান যুদ্ধে ক্ষুদ্র জয়ীদের প্রশংসা



সাপের শিকার-কৌশল

করিয়া হাততালি না দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না।”

ইহা যথার্থই সত্য যে প্রাণীজগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারে। আবিষ্কারকগণ বলেন যে, আটিক সমুদ্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র হাঙ্গর আছে. তাহাদের ইংরাজীতে “dog-fish বলে! তাহারা একত্র মিলিত হইয়া তিমি মৎসকেও আক্রমণ করে।

তিমি মৎস একবার লেজ নাড়া দিলেই এইরূপ শত শত ক্ষুদ্র জীব মারা যায়। কিন্তু তাহারাও খুব চতুর, সময় বুঝিয়া আক্রমণ করে! যতক্ষণ না তিমি সমুদ্রের উপর ঘুমাইয়া পড়ে ততক্ষণ তাহারা অপেক্ষা করে। তার পর ঘুমাইলেই ঐ মাছের ঝাঁক এক সঙ্গে তাহার দেহের উপর উঠিয়া পড়ে এবং সকলে একত্র মিলিয়া তাহাকে কামড়ায়। যতক্ষণ না তিমি খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাহাদের আয়ত্তের মধ্যে আসে ততক্ষণ তাহারা এই কৌশল প্রয়োগ করিতে থাকে। পরে যথার্থই তাহারা এই নিরুপায় ভীষণ জন্তুটিকে জীবন্ত অবস্থাতেই খাইয়া ফেলে!

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্রোতের ফুল

(১০)

নবকিশোর মালতীকে এক রকম জেদ করিয়া এখানে আনিয়া এই লাঞ্ছনার আবর্ত্তে ফেলিয়াছে; তাহার উপর আসিয়া অবধি তাহার একবারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, মালতী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গেছে সে খবরটা পর্য্যন্ত না লইয়া সে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া আছে; ইহা মালতীর কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে নবকিশোরের নিশ্চিন্ত শান্তি ভঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এখন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতে হইলে কোনো দাসীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া ত উপায় দেখা যায় না। দাসীর সর্দ্দারণী রোহিণীকে কোনো অনুরোধ করিতে মালতীর প্রবৃত্তি হইল না। হাবার মা বলিয়া হাবার মা ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব; এই মনে করিয়া মালতী তাহাকে একদিন নির্জ্জনে পাইয়া মিনতির স্বরে বলিল—হাবার-মা আমার একটু উপকার করতে পারবে?

হাবার মা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল —কি দিদিমণি?

—তুমি যদি একটু দয়া করে নবকিশোর বাবুকে ডেকে দাও।

—এ আর বড় কথা কি দিদিমণি? এখুনি ডেকে আনছি।—বলিয়া প্রস্থান করিল।

পথে রোহিণীর সঙ্গে দেখা। রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁলা হন হন করে' কোথায় চলেছিস?

—কোথায় আবার যাব? এই মালতী দিদিমণি একবার দাদাঠাকুরকে ডেকে দিতে বল্লে তাই একবার ভট্‌চায্যি-বাড়ী যাচ্ছি।

—ও! দূতী হয়েছিস!

হাবার-মা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—তুই দূতী হ গে যা! তোর সাতগুষ্টি দূতী হোক গে! পোড়ারমুখীর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!…যাই দেখিন রাণীমাকে বলে দেই গে……

হাবার-মা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল রোহিণী চটিল না; মুচকি হাসিয়া চোখ মটকাইয়া বলিল—যা না, রাণীমাকে বলে দেখ গে না, রাণীমা পুজো করবেন 'খন। মালতী ছুঁড়ি একজন পুরুষ মানুষকে ডাকতে বল্লে আর তুই ডাকতে ছুটলি—রাণীমা টের পেলে যে তোর চাকরী যাবে। ভাগ্যিস তোর আমার সঙ্গে দেখা হল?

হাবার-মা ভীত হইয়া বলিল—সত্যিই ত! ভাগ্যিস তুই ডেকে জিজ্ঞেস করলি! যাই বলিগে যে দিদিমণি, আমা দিয়ে এ কাজ হবে না।

রোহিণা বলিল—দূর নেকী। তাতে আর তোর বিপদ কাটল কৈ? রাণীমা যদি টের পায় যে হাবার-মাকে মালতী এই কথা বলেছিল কিন্তু হাবার-মা আমাকে কিচ্ছু জানায় নি, তখন রাণীমার কাছে কোন্ মুখে কি জবাব দিবি? তার চেয়ে এখনি রাণীমাকে সব কথা বলগে যা—তোর ওপর কেনো ঝুঁকিই পড়বে না।

হাবার-মা রোহিণীর বুদ্ধি বিবেচনা দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল—ঠিক বলেছিস! তাই বলিগে তবে।

হাবার-মাকে গিন্নির কাছে নালিশ করিতে পাঠাইয়া দিয়া রোহিণী এক ছুটে মালতীর কাছে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—দিদিমণি, করেছ কি, অ্যাঁ! এমন অল্প বুদ্ধি তোমার!

মালতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কেন, কি করেছি?

রোহিণী পরম ব্যথিত ভাবে কপালে চড় মারিয়া বলিল—করেছ আমার মাথা আর আমার মুণ্ড! দাদাঠাকুরকে ডাকতে চাও তা আমায় বললে হত। আমায় ত তুমি চক্ষে দেখতে পার না! তোমার বিশ্বাসের লোক হল কিনা হাবার মা! সে ওদিকে রাণীমার কাছে গিয়ে সব বলে দিয়েছে।

মালতী বিরক্ত হইয়া বলিল—তা বল্লেই বা! এর মধ্যে লুকোবার কি আছে?

রোহিণী গালে হাত দিয়া পরম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—অবাক করলে দিদিমণি! পুরুষ মানুষকে ডেকে পাঠাবে কি গাঁয়ে ঢেঁঢরা পিটিয়ে! আমাদেরও এককালে সোমত্থ বয়েস ছিল বটে, কিন্তু এমন বুকের পাটা ছিল না বাপু!

মালতী ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া বলিল—দূর হ তুই আমার সামনে থেকে!

রোহিণী মুচকি হাসিয়া চোখ মটকাইয়া বলিল—ইস্ বাপরে! রাণী আর কি! ভয়ে পিঁপড়ের গর্ত্তে লুকোবো নাকি? এখনি রাণীমা এসে কাকে দূর করেন দেখা যাবে!

মালতী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে লজ্জায় অপমানে আসন্ন লাঞ্ছনার সম্ভাবনায় অভিভূত হইয়া মালতী আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। সে ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

খুড়িমা মেঝেয় বসিয়া মালা জপ করিতে-

ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন অসময়ে গিয়ে শুলি যে?

মালতী কি উত্তর দিবে? সে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল।

খুড়িমা বকিতে লাগিলেন—সকল অনাছিষ্টি! সকল কুলক্ষণ! গুরুজনকে একেবারে অগ্রাহ্যি!...

মালতী প্রতিক্ষণে গিন্নির আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কাহারো পদশব্দ হইলেই সে চমকিয়া উঠিয়া মনে করিতেছিল এইবার লাঞ্ছনার ঝড় তাহার মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে। কেহ কথা বলিতেছে শুনিলে তাহার মনে হইতেছিল তাহারই কুৎসা আলোচনা হইতেছে। সে এই বাড়ীতে আসিয়া অবধি তাহাকে লইয়া ঘোঁট করা মেয়েমহলে একটা প্রধান বিলাসিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাবার-মা যে হাবার-মা সেও যে তাহাকে অপমান করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না ইহাই মালতীর মনে বড় বেশি বাজিয়াছিল।

হঠাৎ গিন্নি প্রচণ্ড ক্রোধে দ্রুত গমনের চেষ্টায় মেঝে কাঁপাইয়া খুড়িমার ঘরে আসিয়াই তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—বলি ছোটবৌ, বোনঝির কীর্ত্তি শুনেছ?

খুড়িমা অবাক হইয়া একবার গিন্নির আর বার মালতীর মুখের দিকে চাহিলেন। মালতী বালিশে মুখ গুঁজিয়া আড়ষ্ট মড়ার মতো পড়িয়া আছে।

গিন্নি যেরূপ সালঙ্কারে মালতীর নূতন কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনা করিলেন তাহাতে মালতীর অসময়ে শয়নের কারণ খুড়িমার নিকট ভয়ানক স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গিন্নির কথার প্রতিবাদ করিয়া মালতীর মন চীৎকার করিয়া বলিতেছিল—মিথ্যা মিথ্যা সব আগাগোড়া মিথ্যা!—কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে একটি কথাও আপনার পক্ষ সমর্থনের জন্য বলিতে পারিল না।

গিন্নি ঘর হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন—এমন মেয়ের ঠাঁই আমার ঘরে হবে না, এ আমি পষ্ট বলে দিচ্ছি ছোট বৌ। তুমি বোনঝির জন্যে অন্য জায়গা দেখ। আর রসবতী বোনঝিকে ছেড়ে থাকতে না পার তুমি শুদ্ধ ঠাঁই দেখ। এই আমার শেষ কথা।

ঘর নিস্তব্ধ। সে নিস্তব্ধতা খুড়িমা ও মালতীর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতন চাপিয়া বসিয়া শ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিতেছিল। খুড়িমার ইচ্ছা হইতেছিল মালতী তাঁহাকে বলুক—মাসিমা, এ সমস্ত মিথ্যা কথা, আমি নির্দ্দোষী। আর মালতীর মনে হইতেছিল খুড়িমা তাহাকে প্রশ্ন করুন, তিরস্কার করুন, লাঞ্ছনা করুন; এমন নির্ব্বাক্ স্বীকারের দ্বারা তাহাকে অপরাধী করিয়া বসিয়া থাকা একেবারে অসহ্য।

খুড়িমা কিছুতেই কথা বলেন না দেখিয়া মালতী উঠিয়া বসিয়া আপনাকে খুড়িমার দৃষ্টির সামনে প্রকাশ করিয়া ধরিতে চাহিল। তথাপি খুড়িমা তাহাকে লক্ষ্য করিলেন না দেখিয়া মালতী অভিমানদৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মাসিমা, আমাকে তুমি বেহালায় পাঠিয়ে দাও। আমি এ বাড়ীতে আর এক দণ্ড থাকব না বলেই নবকিশোর বাবুকে ডাকতে বলেছিলাম।

এত বড় কাণ্ডের পর মালতীর কণ্ঠে

এতটুকু সঙ্কোচ নাই, বাক্যে এতটুকু কুণ্ঠা নাই, যে জন্য দিকে দিকে ধিক্কার ছি ছি করিয়া ফিরিতেছে সেই কথা জোর করিয়া বলিতে লজ্জা নাই, দেখিয়া খুড়িমা একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। সন্দেহের অন্ধকার-জালে জড়াইয়া তিনি চিন্তা করিতেছিলেন এই জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সত্যের আলোকে বাহির হইয়া পড়িবেন কি না; অন্ধের মতো হাতড়াইয়া মরার চেয়ে চোখ মেলিয়া পুড়িয়া মরা ভালো কিনা। এমন সময় হঠাৎ মালতী কথার আঘাতে তাঁহার সন্দেহ-জালের মধ্যে যে একটি বড় রকম ছিদ্র করিয়া দিল, তাহার মধ্য দিয়া লাফাইয়া বাহির হইতে গিয়া খুড়িমার প্রতিকূল মন একেবারে জালে জঞ্জালে জড়াইয়া জট পাকাইয়া গেল। তিনি আর প্রশ্ন মাত্র না করিয়া অজস্র তিরস্কার করিয়া যাইতে লাগিলেন—পোড়ারমুখী শতেকখোয়ারী হাড়জ্বালানী! দূর হয়ে যা! দূর হয়ে যা!

মালতী আর একটি কথাও না বলিয়া চুপ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

(১১)

মালতীর এই নূতন লাঞ্ছনার খবর নবকিশোরের অগোচর রহিল না। সে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মতন নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিল। সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রাণ দিয়া এই অসহায়া অবলাকে রক্ষা করিতে পারিলে সে করিত, কিন্তু তাহার কেবলই মনে হইতেছিল উপায় নাই, উপায় নাই। মালতীকে রক্ষা করিবার সামান্য চেষ্টাও তাহার প্রতিকূলেই যাইবে।

নবকিশোর হাতের উপর মাথা রাখিয়া মালতীকে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে দেখিয়া নবকিশোর উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া পিতার আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন—বাবা কিশোর, তুমি একবার অন্দরে যাও, শুনতে পাচ্ছি মালতী নাকি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে।

নবকিশোর মাথা নত করিয়া বলিল—এত কাণ্ডের পর আমার যাওয়া কি ঠিক হবে?

—এত কাণ্ড হয়েছে বলেই ত তোমার যাওয়া আরো বেশি দরকার। প্রথমতঃ নিশ্চয় কোনো অভাব জানাবার জন্যেই মালতী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। তারপর তাকে যে রকম অন্যায় ভাবে উৎপীড়ন করা হচ্ছে তাতে তাকে সান্ত্বনা দেওয়াও ত দরকার।

—কিন্তু আমি গেলে মালতীর কি অধিকতর লজ্জার কারণ হবে না?

—না বাবা, তুমি গেলেই তার লজ্জাটা সহজ আর সহনীয় হয়ে যাবে।

নবকিশোর একটু চিন্তা করিয়া বলিল—তবে আমি এখনি যাই।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—হ্যাঁ যাও বাবা।

নবকিশোরের চালচলন স্বভাবতই দৃপ্ত। আজ সে আরো মাথা সোজা করিয়া, পদক্ষেপ আরো দৃঢ় করিয়া, মুখভাবে আরো অসঙ্কোচ ফুটাইয়া যেন সমস্ত নিন্দা, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত অপমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার

জন্যই জমিদারের অন্তঃপুরের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

নবকিশোর অন্দরে গিয়া উপস্থিত হইতেই চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই এই বেহায়ার অতিসাহস দেখিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া বিদ্রূপের হাসি ও অব্যক্ত টিটকারি চালাচালি করিতে লাগিল। নবীনারা মুচকি হাসিয়া বলাবলি করিল— মাথায় যেন টনক নড়েছে! রূপসী বিম্বেধরীর ডাক! হাওয়ার মুখে ছুটে চলে! স্থির কি আর থাকা যায়!

নবকিশোরের তীক্ষ্ণ সচেতন দৃষ্টি হইতে এসকলের কিছুই এড়াইল না। তথাপি সে সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া সপ্রতিভ ভাবে বড় গলা করিয়া ডাকিল—মা!

নবকিশোরের বজ্রগম্ভীর আহ্বান সকল কোলাহল নিরস্ত করিয়া দিয়া কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত হইল। আজ এত কাণ্ডের পর তাহার আহ্বানের উত্তরে গিন্নি তাঁহার অভ্যস্ত প্রসন্ন সরলতায় "কেন রে কিশোর?" বলিয়া সাড়া দিতে পারিলেন না। তাঁহার আদেশে রোহিণী উপরের দালান হইতে উঠানে দণ্ডায়মান নবকিশোরকে বলিল— দাদাঠাকুর, রাণীমা এই এ ঘরে আছেন।

নবকিশোর প্রসন্ন স্মিতমুখে অসঙ্কোচ সহজ পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া গিন্নির ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। গিন্নি তখন একখানি খয়ের রঙের শাল গায়ে জড়াইয়া শাদা ধবধবে পুরু বিছানার উপর বড় একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন; নবকিশোর গিয়া তাঁহার কোলের কাছে বসিয়া বলিল —বিপিন নেই বলে মা একবার আমার খোঁজও কর না। মা যখন ডাকে না, তখন ছেলেই মাকে দেখতে এল। বিপিনের এগজামিনের আর বেশি দেরি নেই।

নবকিশোর কথা বলিয়া বুঝিতে পারিল তাহার কথাগুলো ভারি খাপছাড়া রকমের হইল, সে কিছুতেই যেমন করিয়া বলিলে ভালো হইত তেমন করিয়া কথা বলিতে পারিল না। সে তখন আনমনে গিন্নির পায়ের আঙুলের আংটি খুঁটিতে মনোনিবেশ করিল।

গিন্নিও নবকিশোরের কথার উত্তরে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কেবলি মনে হইতেছিল এ বাড়ীতে সেই দজ্জাল মেয়েটা আছে যে এই কতক্ষণ আগে নিজে উপযাচিকা হইয়া এই তরুণ যুবাকে ডাকিতে চাহিয়াছিল। এবং সেই জন্যই আজ নবকিশোরের আগমনটা তাঁহার নিকট তেমন সাধারণ বা সহজ ঘটনা বলিয়া বোধ হইতেছিল না।

নবকিশোর গিন্নির সহিত কেনোরূপ আলাপ জমাইতে না পারিয়া হঠাৎ যেন চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল—সন্ধ্যে হয়ে গেল, যাই একবার খুড়িমা আর মালতীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

এ কথায় গিন্নির মন ভীত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নবকিশোরকে নিষেধ করিতেও পারিলেন না। তাহার রকম দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে নবকিশোর বিদ্রোহীর ভাবে সকল বাধা অগ্রাহ্য করিবার জন্য উদ্ধত ও প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। নবকিশোর যখন দেখিল যে গিন্নি তাহাকে তিরস্কার বা নিষেধ কিছুই করিলেন না, তখন সে একটু

অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত ভাবে খুড়িমার কক্ষের দিকে চলিয়া গেল।

নবকিশোর অদৃশ্য হইয়া গেলে গিন্নি চুপি চুপি বলিলেন—যা ত রোহিণী, আড়ি পেতে শুনগে ত কি কথা হয়।

রোহিণীর মন আপনা হইতেই ছটফট করিতেছিল; এখন হুকুম পাইয়া সে মহানন্দে গুপ্তচরের কার্য্যে ছুটিয়া গেল।

নবকিশোরের কণ্ঠ ও পদশব্দ ভুল করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। তাহার সাড়া পাইয়া খুড়িমা লজ্জায় ও আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ ও সঙ্কুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি দেয়ালের হুক হইতে মালা নামাইয়া জপ করিতে বসিলেন, আর মালতীর এতক্ষণকার রুদ্ধ বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া চোখের জলে গলিয়া পড়িতে লাগিল।

নবকিশোর দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিল —খুড়িমা।

খুড়িমা উত্তর দিলেন না; ঘন ঘন মালা চালনা করিতে লাগিলেন, যেন জপে ব্যাপৃত থাকাতেই কথা বলিতে পারিতেছেন না। ইহা দেখিয়া মালতী মুখ ফিরাইল।

নবকিশোর খুড়িমার সাড়া না পাইয়া ডাকিল—মালতী।

মালতী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আসুন।

নবকিশোর খুড়িমার সাড়া না পাইলে বাহির হইতেই হয়ত ফিরিয়া যাইত। কিন্তু মালতী বেহায়ার মতো তাহাকে ডাকিয়া বসিল। খুড়িমার নিকট ইহা ভীষণ ধৃষ্টতা ও তাঁহারই প্রতিকূলতা বলিয়া মনে হইল। তিনি দৃষ্টিতে নিজের মনের সমস্তখানি ক্রোধের উত্তাপ পুঞ্জীভূত করিয়া মালতীকে ভস্ম করিয়া ফেলিতে চাহিতেছিলেন।

খুড়িমার কোনো সাড়া না পাইয়া কেবল মাত্র মালতীর আহ্বানে এই আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে মালতীর ঘরে প্রবেশ করিতে নবকিশোরের এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল। পর মুহূর্ত্তেই সে ভাবিল নিশ্চয় খুড়িমা ঘরে আছেন, নতুবা মালতী এমন অসঙ্কোচে তাহাকে আহ্বান করিত না, নবকিশোর ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে গিয়া দেখিল খুড়িমা দেয়াল ঠেস দিয়া হাঁটু উঁচু করিয়া বসিয়া বেগে মালা ঘুরাইতেছেন এবং মালতী এক পাশে দৃপ্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মালতীর মুখখানি তখন শ্রাবণ পূর্ণিমার মতো জলে মেঘে আলোতে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর দেখাইতেছিল।

নবকিশোর মুগ্ধ নেত্রে মালতীর দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া খুড়িমা মালতীর দিকে কটমট করিয়া চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও বেহায়া মেয়েটা নবকিশোরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। তখন খুড়িমা জপ শেষ হওয়ার ভান করিয়া তাড়াতাড়ি মালা মাথায় ঠেকাইয়া মালতীকে বলিলেন —মালতী, যা না, কাপড়গুলো সন্ধ্যে ডিঙোবে, তুলগে না।

মালতী তাহার মাসিমাকে সংক্ষিপ্ত একটি 'যাচ্ছি' বলিয়া নবকিশোরকে বেশ স্পষ্ট কণ্ঠেই বলিল—আমি আপনাকে একবার ডেকে পাঠাব কতদিন থেকে ভাবছি, কিন্তু আপনাকে একবার ডেকে দেবে এতটুকু উপকারও এ বাড়ীর লোকের কাছ থেকে

প্যাবার জো নেই। আপনি এসেছেন, ভালোই হয়েছে, আমায় স্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন……

মালতীর এই দুঃসাহস দেখিয়া খুড়িমা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মালতী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। তাহার মধ্যে তখন বিদ্রোহ প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। সে বুঝিতেছিল এ বিদ্রোহ তাহারই বিনাশ ও দুঃখের হেতু; কিন্তু পদে পদে অপমানে মাথা নত করার চেয়ে সেও শ্লাঘ্য, সেও শ্রেয়।

নবকিশোর বলিল—তুমি বাড়ী চলে যেতে চাচ্ছ কেন? মার কাছে ছিলে, মাসির কাছে এসেছ…এখানে তোমার কি দুঃখ?

মালতী প্রত্যেক কথা ঘৃণার সহিত জোর দিয়া দিয়া বলিল—এখানে আমার কি সুখ তাই জিজ্ঞেস করুন। মাসির অতিরিক্ত স্নেহে আর অন্য সকলের যত্নে এখানে তিষ্ঠানো আমার দায় হয়ে উঠেছে। এমনি যত্ন যে কেউ আমাকে একটি কাজ ছুঁতে দেন না, কাছে ঘেঁসতে দেন না, রাত্রিদিন মিষ্টি কথায় কান জুড়িয়ে রেখেছেন, কারণ আমি একটা শেমিজ পরি, আমি মালা হাতে করে দুনিয়ার লোকের কুৎসা করি নে, আমি মনের মধ্যে নরক পুষে ঘোমটা ঢাকা দিয়ে সাধু হতে জানিনে, তাই আমি ম্লেচ্ছ, আমি খৃষ্টান, আমি অস্পৃশ্য! এ বাড়ীর শুদ্ধশীলাদের সঙ্গে আমার বনবে না। আপনি আমাকে নিয়ে এসেছেন, আপনিই আমাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে রেখে আসুন। আমি এখানে আর একদিনও থাকব না।

খুড়িমা মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—তা থাকবে কেন? বলি, যাবি কোন চুলোয় পোড়ারমুখী! একবার বলবেন নিয়ে চল, আবার বলবেন রেখে এস…কে তোর বাবার চাকর আছে শতেকখোয়ারী!

মালতী এই তিরস্কারে দৃকপাতও না করিয়া নবকিশোরকে বলিল—আমার এই-সব লাঞ্ছনা অপমানের জন্যে আপনি দায়ী। আমি ত আসতে চাইনি। আপনি আমাকে জোর করে এনেছেন। এখন আপনি আমায় রেখে আসতে বাধ্য!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আমি যে-জন্যে তোমায় এনেছি সে কাজ ত এখনো সম্পন্ন হয়নি; এই সূত্রপাত হয়েছে মাত্র। বিপিন না আসা পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, সহ্য করতে হবে।

—কিন্তু এ বাড়ীর সকল লোকেরই মন এমন সন্দিগ্ধ আর কুৎসিত যে এ সংসর্গে ভদ্রলোক থাকতে পারে না।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—এই রকম হওয়াটাই ত স্বাভাবিক। যারা রক্তসম্বন্ধ ছাড়া স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক শুধু স্বামীস্ত্রীরূপেই জানে, আর কোনো রকম সম্পর্ক যে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে থাকা সম্ভব এ যারা কখনো দেখেনি বা কখনো কল্পনাও করে না, তাদের মন ত ওরকম হবেই। তাদের ভদ্র করে' তুলতে হবে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাদের। যখন এরা দেখবে যে রক্তসম্পর্কশূন্য হয়েও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকতে পারে তখন এদের মনও পবিত্র হয়ে উঠবে, তখন অসম্পর্কীয় স্ত্রীপুরুষের ঘনিষ্ঠতা আর অন্যায়

—কিন্তু ততদিনে যে আমি ক্ষেপে উঠব।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—না, তুমি ক্ষেপে উঠতে পাবে না। আমাদের কাজে সাহায্য করতেই ভগবান তোমায় আমাদের মধ্যে এনে ফেলেছেন।

মালতী ক্ষণেক নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—তবে আমাকে খানকতক বই পাঠিয়ে দেবেন; আমার দিন আর কাটে না।

নবকিশোর বলিল—এখন আপাতত বইটইয়েরও দরকার নেই। এ বাড়ীতে জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল বইয়ের প্রবেশ নিষেধ। এখন যে আন্দোলনটা উদ্যত হয়ে উঠেছে এইটেই আগে সহ্য কর, এর ওপর বইয়ের খোঁচা পেলে এই আন্দোলন যে মূর্ত্তি ধারণ করবে তা কিছুতেই সহনীয় হবে না। আর অল্প ক'টা দিন চুপচাপ করে সয়ে থাক। বিপিনের আসতে আর বেশি দেরি নেই, সে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মালতী মাথা নত করিয়া ভাবিতে লাগিল—বিপিন আসিলেই কি সব ঠিক হইয়া যাইবে? এই জমিদার-সংসারে তাহাকে একটু আরাম শান্তি দিতে সক্ষম কেউ যদি থাকে তবে সে কি একমাত্র বিপিন? সেই বিপিন তাহাকে এই-সমস্ত কুৎসিত উৎপাত হইতে রক্ষা করিতে চাহিবে কি না, পারিবে কি না, তাহা ভবিতব্যই জানে। তবু মালতী আশা করিয়া সকল উৎকণ্ঠা দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিল, বিপিনকে ভাবী উদ্ধারকর্ত্তা বন্ধু বলিয়া মনে মনে তাহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে লাগিল। আগ্রহে তাহার আগমন অভিনন্দন করিতে লাগিল।

মালতীর মৌন, সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া নবকিশোর খুড়িমার দিকে ফিরিয়া স্মিতমুখে বলিল—দেখ খুড়িমা, তোমার ক্ষেপা মেয়েটিকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেলাম।...সন্ধ্যে হল, এখন তবে আসি।

খুড়িমা নিরুত্তরে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিলেন। নবকিশোর তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া প্রস্থান করিল।

খুড়িমা নবকিশোর ও বিপিনকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। কিন্তু মালতীকে লইয়া বিক্ষোভের যে আঘাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হইতেছিল তাহার জন্য মনে মনে তিনি নবকিশোরকেই গৌণভাবে দায়ী করিয়া আসিতেছিলেন। সে যদি মালতীকে আনিয়া উপস্থিত না করিত, তবে এত জ্বালা তাঁহাকে পোহাইতে হইত না। তাহার পর নবকিশোরের আজিকার কথা শুনিয়া খুড়িমার মনে সন্দেহ হইতেছিল মালতী ও বিপিনকে লইয়া নবকিশোর কি জানি কি একটা অনাসৃষ্টি ষড়যন্ত্র করিতেছে। তিনি নবকিশোরের কথা ভালো করিয়া বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার সন্দেহ ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এজন্য তাঁহার মন নবকিশোরের এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপিনের প্রতিও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। তাহাদের দৃষ্টি ও সংসর্গ হইতে মালতীকে দূরে রাখা খুড়িমা একটা মহৎ কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন।

(১২)

নবকিশোর চলিয়া গেলে সকলেরই জানিবার কৌতুহল হইতেছিল সে মালতীর সহিত কি পরামর্শ করিয়া গেল। কিন্তু খুড়িমার ভয়ে কেহ মালতীর কাছে ভিড়িতে সাহস করিতেছিল না।

রোহিণী ফিরিয়া আসিয়া গিন্নিকে বলিল —রাণীমা গো রাণীমা, বল্লে না পেত্যয় যাবে, দাদাঠাকুরের সাড়া পেয়েই মালতী তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এসে আপনি দাদাঠাকুরকে ডেকে হাত ধরে' ঘরে নিয়ে গেল! একটু সরম হল না, একটু ডর হল না! মেয়েমানষের বুকের পাটা দেখে ডরে আমার বুকটা এখনো ঢিপঢিপ করে কাঁপতে নেগেছে! বাপরে বাপ! এমন মেয়ে বাপের জন্মে দেখিনি!

এই বলিয়া রোহিণী একবার গালে হাত দিয়া ঘাড় কাত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল; তার পরেই বুকে হাত দিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া ভয়ের অভিনয় করিতে লাগিল। বাস্তবিকই রোহিণীর বুক ভয়ে কাঁপিতেছিল; কিন্তু তাহা মালতীর বুকের পাটা দেখিয়া নহে; আর একটু হইলে তাহার আড়ি পাতা নবকিশোরের কাছে ধরা পড়িয়া যাইত; এবং নবকিশোরের মেজাজ কাহারও অজানা ছিল না।

গিন্নি রোহিণীর অভিনয়ে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তারপর? তারপর? ছোটগিন্নি কোথায় ছিলেন? কি পরামর্শ হল?

—খুড়িমা ঐ ঘরেই ছিল। মালা জপ করছিল; দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথা কইলে না। মালতী বাড়ী চলে যাবে বলে দাদাঠাকুরের কাছে বায়না ধরলে। খুড়িমা তাতে কত রাগ করতে লাগল; দাদাঠাকুর কত কি বলে বোঝাতে লাগল—তার এক বর্ণও বুঝ্‌তে পারলাম না, আমরা কি ছাই ইংরিজি ফার্সী জানি। শেষকালে দাদাঠাকুর বল্লে দাদাবাবু বাড়ী আসুক তোমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না......

গিন্নি মধ্য হইতে বলিয়া উঠিলেন—আমার বিপিনের অমন স্বভাব নয়। কিশোর ছোঁড়াকেও ত ভাল বলে জানতাম। কলি-কালের ছেলে মেয়েদের চেনবার জো নেই! যা ত একবার ছোটবৌকে ডেকে আনগে ত।

রোহিণীর মুখে গিন্নির তলব শুনিয়া খুড়িমার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—দিদি কেন ডাকছেন রোহিণী?

রোহিণী পরম নিরীহ মানুষটির মতন বলিল—তা আমি কেমন করে জানব খুড়িমা?—কিন্তু তাহার ছোট ছোট গোল গোল চোখ দুটো সয়তানী কৌতুকচ্ছটায় মিটমিট করিতে লাগিল।

খুড়িমা রোষকষায়িত লোচনে একবার মালতীর দিকে চাহিয়া রোহিণীর সহিত প্রস্থান করিলেন।

খুড়িমা গিন্নির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—দিদি ডাক্‌ছ?

গিন্নি মুখ ভার করিয়া বলিলেন—ভাসুরপোর সঙ্গে কি পরামর্শ হল?

গিন্নির কথার ভঙ্গিতে ক্ষুণ্ণ হইয়া খুড়িমা বলিলেন—কি আর পরামর্শ হবে দিদি? মালতী কিশোরকে বলছিল কলকাতায় রেখে আসতে।

গিন্নি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবেই বলিলেন—তারপর? কবে যাওয়া ঠিক হল?

—কিশোর এখন নিয়ে যেতে চাইলে না।

রোহিণী অমনি মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল —কেন, তুমিও ত যেতে দিতে চাইলে না, কত বকলে!

খুড়িমা বুঝিলেন রোহিণী আড়ি পাতিয়া সব কথা শুনিয়া আসিয়া আগে ভাগেই গিন্নিকে সব জানাইয়া রাখিয়াছে। এখন কিছু গোপন করিবার প্রয়াস বৃথা। তখন তিনি রোহিণীর কথা যেন শুনিতেই পান নাই এমনি ভাবে নিজের কথার ধারাবাহ রূপেই বলিতে লাগিলেন—আমিও মালতীকে বল্লাম, এমন জায়গাতেই তুই শাসন মানছিস নে, নিজে স্বাধীন হলে ত রক্ষে রাখবিনে। ভালো ছিল্লেয় ভাগ্যক্রমে যদি এসে পড়েছিস তবে হাতের লক্ষ্মী সাধ করে পায়ে ঠেলতে চাচ্ছিস কেন?

—না ছোট বৌ, অমন জাঁহাবাজ মেয়ের ঠাঁই আমার এ বাড়ীতে আর হবে না। তুমি ওকে সামলে রাখতে পারবে না। শেষে কি তোমার বোনঝির জন্যে আমাদের সুদ্ধ মাথা হেঁট হবে? এর মধ্যেই ত তোমার বোনঝির গুণের কথায় গাঁময় ঢি ঢি পড়ে গেছে। আজ ত সন্ধ্যে হল, কালকে কিশোরকে ডেকে আমি বলব ওকে রেখে আসুক গে। আমি এত পরের ঝক্কি সইতে পারব না! এমন সব ম্লেচ্ছপনা দেখতে পারব না!

খুড়িমা মিনতির স্বরে বলিলেন—দিদি, বড় গাছেই ঝড় লাগে; বট অশথ গাছেই পাখীরা বাসা বাঁধে, অপবিত্র করে; কিন্তু তাতে গাছের গৌরবই বাড়ে, বট অশথ মানুষের কাছে দেবতার পূজো পায়। তোমার বড় ছিল্লেয় কত লোক শান্তিতে আশ্রয় পেয়েছে। মেয়েটাকে যদি পায়ে একটু স্থান দিয়েছ তবে ওকে একেবারে রসাতলে ফেলে দিয়ো না। তুমি ওকে ত্যাগ করলে ওর সর্বনাশ হবে।

খুড়িমার কথায় গিন্নির বিরাগ হ্রস্ববেগ হইয়া গেল। প্রসন্ন অনুকম্পার সহিত বলিলেন—তা ত বুঝছি ছোট বৌ, কিন্তু ও মেয়ে কি শোধরাবার? নুয়ে ডুব দেয় না, ডিঙি মেরে চলে, একেবারে ধিঙ্গি! ভয় হয় পাছে ওর দেখাদেখি অন্য বৌঝিগুলো পর্য্যন্ত বিগড়ে যায়।

খুড়িমা চোখ মুছিয়া বলিলেন—দিদি, তুমি সতী লক্ষ্মী ভাগ্যিমানি; তুমি আশীর্ব্বাদ কর ওর মতিগতি ফিরবে। এখানে এসে হাত শুধু করে' থান ত পরেছে। অন্য সব বদখেয়ালও ক্রমে ক্রমে ছাড়বে।

গিন্নি বলিলেন—তবে আগে ওর ঐ ঘাগরাটা ছাড়াও ছোট বৌ! ঐ ঘাগরাটাই যত নষ্টের গোড়া!

খুড়িমার সহিত যখন গিন্নির কথাবার্ত্তা হইতেছিল সেই অবকাশে ক্ষমা, মোক্ষদা, জয়া, পাঁচুরমা প্রভৃতি এক দঙ্গল নবীনা ও প্রবীণা গিয়া মালতীকে আক্রমণ করিয়াছিল। ক্ষমা ডাকিল—ওলো ভাই মালতী, কি কচ্ছিস লো?

আজ এই গায়ে পড়িয়া সাধিয়া ভাব করিতে আসার উদ্দেশ্য মালতী বেশ বুঝিতে পারিল। সে কোন উত্তর না দিয়া একমনে প্রদীপের কাছে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া সুপারি কাটিতে লাগিল।

মালতীর উত্তর না পাইয়া ক্ষমা জনান্তিকে বলিল—উঃ! গুমর দেখলে হেসে আসে!—মালতীকে বলিল—কথা কচ্ছিসনে কেন ভাই? কিসের জন্যে এত রাগ?

পাঁচুর মা ক্ষমার কানে কানে অথচ

মালতী শুনিতে পায় এমন ভাবে বলিল—রাগ নয়ক অনুরাগ!

মালতীকে তথাপি নিরুত্তর দেখিয়া ক্ষমার অক্ষমা ক্রোধে উদগ্র হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু আজ শীঘ্র মালতীর সহিত ঝগড়া করার ইচ্ছা তাহার ছিল না; নবকিশোরের সহিত মালতীর আলাপটা জানিয়া লইবার আগ্রহ তাহাকে সংযত করিয়া রাখিতেছিল। বারবার তিনবার চেষ্টা করিয়া দেখা শাস্ত্র-সঙ্গত; এজন্য পুনরায় কপট হাসি হাসিয়া ক্ষমা যাত্রার স্বরে বলিল—ওলো ধনী মানিনী রাই, তোমার মানের গোড়ায় ছাই, আমি মান ভিক্ষে চাই, পড়ি তোমার পায়!—বলিয়া মালতীর পা ধরিতে গেল।

মালতী শ্লেষকটুস্বরে বলিল—ছি! ওকি! তোমরা সব পুণ্যাত্মা মানুষ! মেলেচ্ছ খৃষ্টানের পায়ে হাত দিতে আছে!

মালতীকে কথা বলিতে শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া সকলে তাহার সম্মুখে কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। ক্ষমা বলিল—নে ভাই, তোর ঠাট্টা রাখ। আমরা আবার ধর্ম্মিষ্টি কিসে? তুই ভাই, অমন করে মুখ গোমড়া করে থাকিস কেন? তোর এখানকার কিছুই পছন্দই হয় না।

পাঁচুর মা চুপি চুপি অথচ মালতী শুনিতে পায় এমন ভাবে বলিল—কেবল কিশোর ঠাকুরপো ছাড়া।

মালতী তাহার ডাগর আঁখি দুটি ঘৃণা ভৎসনায় ভরিয়া পাঁচুর মার দিকে চাহিতেই সে মাথা নীচু করিল।

ক্ষমা এসব যেন লক্ষ্যও করে নাই এমনি নিরীহ ভাবে বলিল—তুমি নাকি চলে যেতে চাচ্ছ? তা কিশোরদাদা কি বললে?

মালতী বিরক্তির স্বরে বলিল—তোমাদের কিশোরদাদা বললেন, তুমি যাবজ্জীবন এই নরকযন্ত্রণা ভোগ কর।

ক্ষমা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—তুই অত রেগে রেগে কথা কইছিস কেন ভাই?

পাঁচুর মা বলিল—তা ভাই, রাগ ত হতেই পারে। হাজার হোক মেয়েমানুষ, নিজে থেকে মুখ ফুটে একটা কথা বল্লে, অথচ কিশোর ঠাকুরপোর কি যে আক্কেল, স্বীকার হল না। এতে না রাগ হয় কার? আমরা হলে লজ্জায় ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিতাম!

মালতী এই প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিতে যাইতেছিল—তোমরা আমার ঘর থেকে দূর হও।—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল এ ঘরে তাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই। অগত্যা সে-ই সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। ইহাদের এই-সব নিষ্ঠুর নিগূঢ় সরব নীরব ঘাতপ্রতিঘাত তাহার ধৈর্য্যের উপর অত্যন্ত বেশি অত্যাচার করিতেছিল।

মালতী চলিয়া গেলে ইহারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিয়া উঠিল। পাঁচুর মা হাসিয়া বলিল—ইস! দেমাক দেখে বাঁচিনে! তবু যদি নিজের চালচুলো থাকত!

পাঁচুর মা এমন ভাবে কথাটা বলিল যেন তাহাদের সকলেরই চালচুলো যথেষ্টই আছে।

ক্ষমা বলিল—চ চ, দেখি ছুঁড়ি কোথায় গেল। ওকে সহজে ছাড়া হবে না।

মালতীকে কোন্ কোন্ বাক্যবাণে অতঃপর বিদ্ধ করিতে হইবে তাহারই পরামর্শ করিতে করিতে সকলে মালতীর সন্ধানে নির্গত হইল। মালতী যে নিজেকে সকলের কাছ হইতে নির্লিপ্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল তাহাই এই-সকল নিষ্কর্ম্মা কুৎসাপ্রিয় পুরাঙ্গনাদিগকে তাহার বিরুদ্ধে অধিকতর উত্তেজিত করিতেছিল। ইহারা এই নিরুপায়া দাম্ভিকাকে কাছে কাছে ধরিয়া রাখিয়া ঘৃণা ও পীড়ন করিবার বিলাসসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে চায় না বলিয়াই মালতীর উপেক্ষায় জ্বলিয়া মরিতেছিল। পলাতক শিকারের পশ্চাতে ব্যাধের মতো ইহারা মালতীকে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে তাড়াইয়া লইয়া ফিরিতে লাগিল। মালতী কোনো ঘরের কোণের অন্ধকারে লুকাইয়া নিজের আহত হৃদয়টিকে যে এক দণ্ড শুশ্রূষা করিবে এমন একটু অবকাশ পাওয়া তাহার পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিল—যেখান-সেখান হইতে সকলের তীক্ষ্ণ কৌতুক-দৃষ্টি আসিয়া তাহার ক্ষতস্থানটিই উদ্ঘাটন করিতে গিয়া নির্ম্মম আঘাত করিতে থাকে। এখানে স্বাধীন ভাবে প্রাণ ভরিয়া বেদনা ভোগ করিবার মতনও একটু নিরালা জায়গা নাই, কৌতূহলদৃষ্টির কণ্টকে আচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত বাড়ীটা তাহার একলার পক্ষেও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বোধ হইতেছিল। পিঞ্জরাবদ্ধ আহত পাখীর মতো তাহার উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা শুধু তাহার নূতন আঘাতেরই কারণ হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্মেনী-দেশের উপকথা

অজাগর

(ফরাসী হইতে)

বহুপুরাকালে,—আর্মেনী-দেশের ধারে ধারে যে সকল পর্ব্বত আছে সেই সকল পর্ব্বতের ও-পারে এক রাজা ছিলেন।

এই রাজা খুব ধনশালী ও পরাক্রান্ত। ইহার অগণ্য-পরিমাণ সোনা ও রূপা ছিল, অনেক বড় বড় নগর ছিল, আর অসংখ্য সৈন্য ছিল। কিন্তু তাঁহার কোন সন্তান ছিল না; তাই এত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার মনে সুখ ছিল না। তিনি বলিতেন:—"আমার পরে, আমার বংশ রক্ষা করে এমন কেহই থাকিবে না। রাজা হয়ে কি-লাভ ?"

তাঁহার জীবনে এমন কিছুই ছিল না যাহাতে করিয়া তিনি সুখী হইতে পারেন।

একদিন, তাঁহার উদ্যানে একাকী বিষণ্ণ ভাবে বিচরণ করিতেছিলেন,—হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, একটি সুন্দর সাপ, ছানা-পোনা লইয়া রদ্দুর পোহাইতেছে। একটি ছানা,

খেলার ভাবে, তার মায়ের গলা জড়াইয়া আছে। আর একটি, সু-স্যুর ক'রয়া তাহার মায়ের পেটের নীচে যাইতেছে; তৃতীয়টি তার মায়ের হাঁ-করা মুখের ভিতর তার মাথাটা ঢুকাইয়া দিয়াছে। চতুর্থটি তার ত্রিশূলের মত ছোট জিভটি দিয়া তাহার মায়ের গা চাটিতেছে।

একটা ঝোপের পিছনে লুকাইয়া রাজা অনেকক্ষণ ধরিয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। পরে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া, বলিয়া উঠিলেন:—

"নিজের বাচ্চাদের উপর একটা সাপেরও ভালবাসা আছে। ওদের আদর করে' ওর কত সুখ হচ্চে। কিন্তু হতভাগ্য আমি, আমার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ, অথচ সন্তানের ভালবাসা হতে আমি একেবারে বঞ্চিত। অন্তত ভালবাসিবার জন্য যদি একটি ছোট সাপও পাই, তাহা হলে কতকটা আমার সান্ত্বনা হয়!"

কোন বিবেচনা না করিয়াই রাজা এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন; তার পর, একথা আর মনেও আনেন নাই। কিন্তু এক বৎসর অতীত না হইতে-হইতেই, তাঁহার পত্নী একটি ছোট সর্পশিশু প্রসব করিলেন। জন্মিবামাত্রই সর্পটি বাড়িতে লাগিল—খুব শীঘ্রই বাড়িয়া উঠিল। ক্ষণকালের মধ্যেই রীতিমত একটা অজাগর সাপ হইয়া উঠিল। রাণী ও তাঁর আশ-পাশে যে সব লোক ছিল—সবাই ভয়ে পলাইয়া গেল। নবজাত শিশু একলা পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সে কি-ভয়ানক কান্নার শব্দ, সে কি-চীৎকার। সেই চীৎকারে রাজবাড়ীর সমস্ত লোক থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কেহই রাজাকে সাহস করিয়া জানাইতে পারে না যে রাণী একটি সর্প-শিশু প্রসব করিয়াছেন। কিন্তু সেই শিশুর ভীষণ ক্রন্দনধ্বনি যখন রাজার কানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন লোকেরা আসল কথাটা তাঁহাকে জানাইতে বাধ্য হইল।

পূর্ব্বে রাজা যে অবিবেচনার কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথাগুলা তাঁহার মনে পড়িল। তখন তিনি নিজের আঙ্গুল কাম্‌ড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর ভৃত্য-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"এই সাপটা কত বড়? একটা মানুষের মত-কি বড়?"

—"মহারাজ! এখনও মানুষের মত বড় হয় নি, কিন্তু এমন শীঘ্র শীঘ্র বেড়ে উঠ্‌চে যে শীঘ্রই মানুষকেও ছাড়িয়ে উঠবে।"

রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলি-লেন:—"এখন কি-করা যায়? যা হবার তা ত হয়েছে। সাপই হোক, অজাগরই হোক,—এখন ত এই আমার সন্তান। এখন একে রক্ষা করতে হবে, খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে।"

সাপটার জন্য নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী আনা হল। কিন্তু সাপ সে-সব কিছুই খাইল না, আর পূর্ব্বেকার মতই ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল।

রাজ্যের সমস্ত পণ্ডিতদিগকে রাজা ডাকিয়া পাঠাইলেন। এবং তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন; "সাপকে কি-খাওয়াইতে হইবে? ক্ষুধায় জ্বালায় মরিয়া যাইবে ইহা

আমার ইচ্ছা নহে। উহার মধ্যে একজন পণ্ডিত উত্তর করিলেন: -

"আমাদের পঠিত গ্রন্থাদিতে আছে, এই প্রকারের সর্প অল্পবয়স্কা বালিকা ছাড়া আর কিছুই আহার করে না।"

অন্য পণ্ডিতেরাও এই কথায় সায় দিলেন।

তাঁহার সর্পশিশু অনশনে মরিবে ইহা যদিও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে আহার যোগান—ইহাও ন্যায্য ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি পণ্ডিতগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন:—

"ভাল, তোমাদের পরামর্শ অনুসারেই আমি কাজ করিব। যে পণ্ডিত প্রথমে আমাকে এই পরামর্শ দিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কন্যাকেই আহারার্থ সর্পশিশুকে দেওয়া যাইবে; তাহার পর, তোমরা এই কথা সমর্থন করিয়াছ, পালা করিয়া তোমাদের কন্যা-দিগকেও দিতে হইবে।"

তখন পণ্ডিতদিগের বড়ই ভাবনা হইল, তাঁহারা রাজাকে বলিলেন:—"মহারাজ! আপনার সর্পশিশুর প্রাণরক্ষার্থ আমাদের কন্যা-দিগের জীবন উৎসর্গ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি; কিন্তু সর্প আমাদের কন্যাদিগকে যদি ভক্ষণ করে, তখন আপনি কি-করিবেন? একথা বিশ্বাস করিবেন না যে, আপনার প্রজাদিগের মধ্যে সকলেই সমান রাজভক্ত ও কথার বাধ্য। যখন আপনি তাহাদিগের নিকট হইতে তাহাদের কন্যা চাহিবেন, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। তাহাতে আপনার সিংহাসন ও জীবন পর্য্যন্ত সংকটা-পন্ন হইতে পারে। বরং এক কাজ করুন, কন্যা আনিবার জন্য অন্য বিদেশী রাজ্যে দূত পাঠাইয়া দিন।"

রাজা এই পরামর্শ অনুমোদন করিলেন না। অথচ তাঁহার সর্পশিশু অনাহারে মরে ইহাও তাঁহার মনোগত ইচ্ছা ছিল না। এ ক্ষেত্রে কি-করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন রাত্রি হওয়ায়, তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন, এবং অনেকক্ষণ ভাবনা-চিন্তার পর ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নিদ্রাবস্থায় এক বৃদ্ধা রমণী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। বৃদ্ধা হইলেও, সে সুশ্রী, তার মুখের ভাবটি বড়ই মধুর। তার রূপালী চুলগুলা যেন দ্রব ধাতুর মত কিরণ ছড়াইতেছে, এবং তার মুখমণ্ডল হইতে যেন কেমন একটা দীপ্তি বাহির হইতেছে। তার মুখে বার্দ্ধক্যের রেখা পড়ে নাই। কেবল তার সাদা চুল দেখিয়াই তাহাকে বৃদ্ধা বলিয়া জানা যায়। তার দৃষ্টিতে কেমন একটা বিষণ্ণভাব,—মনে হয় যেন সে অনেক দেখিয়াছে, বহুকাল ধরিয়া চিন্তা করিয়াছে। তাহার সমস্ত দেহ হইতে যেন দয়া উচ্ছ্বসিত হইতেছে—সে যেন মূর্ত্তিমতী দয়া। সে রাজাকে বলিল:—"ছোট ছোট বালিকার বলিদানে যে তুমি সম্মত হও নি, সে ভালই করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি, কাহারও অনিষ্ট না করিয়াও তুমি পণ্ডিত-দিগের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে পার। দূর-দেশ হইতে যে সকল কন্যাকে আনা হইবে, তাহাদিগকে আমি তাহাদের

আত্মীয়দিগের নিকট আবার ফিরাইয়া দিব—কেবল একটিমাত্র কন্যাকে রাখিয়া দিব ; আমিই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।” রাজা উত্তর করিলেন :—

“তুমি যে এই আশ্বাসের কথা আমাকে বলিতেছ—তুমি কে বল দেখি ?”

—আমি সূর্য্যের জননী—অভ্রময়ী। (১) এই কথা বলিবার পরেই তাহার দেহ হইতে একটা কিরণচ্ছটা উদ্ভাসিত হইল—সেই আলোয় রাজার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল। তাহার পরেই সেই রমণী অন্তর্হিত হইল ; রাজার ঘুম ভাঙ্গিল। জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার হৃদয় আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, পণ্ডিতদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে এখন তিনি প্রস্তুত আছেন। তাঁহার রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী গিরিমালার পর-পারে তিনি দূত পাঠাইলেন। আর বলিয়া দিলেন, যতশীঘ্র সম্ভব তাহারা যেন ১০০টি কন্যা আর্ম্মেনী দেশ হইতে আনয়ন করে।

রাজা দূতদিগের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় রহিলেন। ইতিমধ্যে কিছুদিন ধরিয়া হতভাগিনী রাণী আহার ত্যাগ করিয়াছে, সেই সর্পশিশুও কিছুই আহার করে না। সাপটা কখনবা ভীষণ আর্ত্তধ্বনি করিয়া ঘরের মধ্যে গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতেছে ; কখন বা গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইতেছে, আবার নিদ্রা হইতে উঠিয়াই সেইরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছে। এইরূপে রাজা রাণী ও সর্পশিশু এই তিনজনে রাজবাড়িতে কষ্টের সহিত জীবনযাপন করিতে লাগিলেন—চাকর-বাকর সকলেই দুঃখিত ও ভয়ে কম্পমান।

ইতিমধ্যে, দূতেরা পর্ব্বত পার হইয়া একটা আর্মেনী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই গ্রামের কথা এখন বলি শোন।

এই গ্রামবাসীদের মধ্যে একটি লোক ছিল, সে তার স্ত্রী ও দুই কন্যার সহিত সেইখানে বাস করিত। সে দুইবার বিবাহ করিয়াছিল।

প্রথম বিবাহে জ্যেষ্ঠ কন্যাটির জন্ম হয় ; অনেক দিন হইল তাহার মার মৃত্যু হইয়াছে। পিতার দ্বিতীয় বিবাহে, কনিষ্ঠা কন্যাটির জন্ম হয়। ঐ লোকটি তার প্রথম কন্যাটিকে খুব ভালবাসিত। দ্বিতীয় কন্যাটীর প্রতিও যে তাহার স্নেহ ছিল না এরূপ নহে। কিন্তু তাহার দ্বিতীয় পত্নী বড়ই হিংসুটে ও দুষ্ট ছিল ; তার নিজের মেয়েকেই ভালবাসিত, আর তার স্বামীর পূর্ব্বপত্নীর গর্ভজাত মেয়েটিকে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না। জ্যেষ্ঠা কন্যা অভ্রবতী (২) পরমা সুন্দরী ; কনিষ্ঠা কন্যাটি কুচফলের মত কালো কুচকুচে। তার নাম মৌঞ্জী (৩)

অভ্রবতী সুন্দরী বলিয়া মৌঞ্জীর মা তাকে আদপে দেখিতে পারিত না, কিসে মৌঞ্জীর মত দেখিতে কুৎসিত হয়, ইহাই তাহার চেষ্টা ছিল। সে সমস্তদিন অভ্রবতীকে খাটাইত ; তাকে দিয়া ভাত রাঁধাইত, বাসন মাজাইত, গরুর দুধ দোয়াইত, ঘাসের ভারী

(১) মূলে—Arevamair.

(২) মূলে—Arevahate.

(৩) মূলে—Monchi.

বোঝা বহাইয়া আনিত। সে মনে করিত এইরূপে অভ্রবতীর সাদা মুখ কালো হইয়া যাইবে, তার হাতে কড়া পড়িবে, তার সোজা শরীর বাঁকিয়া যাইবে, তার বল ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে, এবং অল্প বয়সেই হতভাগিনীর সমস্ত লাবণ্য ক্ষয় হইয়া যাইবে। কিন্তু অভ্রবতী ইহার বিপরীতে, দিন দিন বলিষ্ঠ হইতে লাগিল, সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে মৌঞ্জী নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকায় দিন দিন আরও শীর্ণকায় ও কদাকার হইয়া উঠিল।

অভ্রবতী কাজ করিতে ভয় পাইত না; সে খুব মন দিয়া কাজ করিত, পারতপক্ষে কাজ না করিয়া সে বসিয়া থাকিত না। যাহা পুরুষের কাজ সেই সকল কষ্টকর কাজগুলা শেষ করিয়া অভ্রবতী সূতা কাটিত, পশম ও সূতার জাল বুনিত। গৃহে রেশমের সূতা তৈয়ারী করিত। যদি উৎস হইতে জল আনিবার জন্য দূরে যাইতে হইত, তবে যে হাতের কাজ আরম্ভ করিয়াছিল তাহা শেষ করিয়া লইয়া আসিত। অথবা অন্যের সহিত বাজে গল্প না করিয়া "টাকু" ঘুরাইতে বসিত।

অভ্রবতী সকল বিষয়েই নিপুণা ছিল। সে চায় করিতে জানিত, কূপ খনন করিতে জানিত, কাপড় বুনিতে জানিত, কাপড় কাটিতে ও সেলাই করিতে জানিত, রাঁধিতে জানিত, মাখন উঠাইতে পারিত, সকল জিনিসই বেশ গুছাইয়া রাখিতে পারিত। এক কথায়, অমন মেয়ের জুড়ী মেলা ভার। দুর্ভাগ্যক্রমে সে এমন এক বিমাতার হাতে পড়িয়াছিল যে, অভ্রবতী যাহা কিছু করিত, তাহার চোখে খারাপ বলিয়া মনে হইত, এবং একটা কিছু ছুতা করিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিত, লাথি মারিত; তার চুল ছিঁড়িয়া দিত, নাকে মুখে রক্ত পাড়াইয়া দিত।

সব চেয়ে তার কষ্টের কারণ এই হইয়াছিল যে, তার সৎমা তার পিতাকে বুঝাইয়াছিল যে, সে বড় একগুঁয়ে ও দুষ্ট। সে কৈফিয়ৎ দিয়া আপনাকে সাফাই করিতে পারিত না; সে বলিবার চেষ্টা করিত কিন্তু যখন সে দেখিত, তার পিতা বিমাতার কথায় বিশ্বাস করিয়াছেন, তখন বুকটা কান্নায় এমন ফুঁপাইয়া উঠিত যে দম আটকাইয়া যাইত।

যখনই তার পিতা তাকে ধমকাইতেন তখনই সে গ্রামের শ্মশানে চলিয়া যাইত। সে তার মাতার সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিত; চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িত, তার পর তার মনটা একটু ঠাণ্ডা হইত। কখন কখন সমাধিস্তম্ভের পাথরের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িত; তার মাকে স্বপ্ন দেখিত, স্বপ্নে তার মার গলা জড়াইয়া ধরিত, এইরূপ ক্ষণকালের জন্য মাতৃস্নেহের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিত। তার মা তাকে সান্ত্বনা দিত, তাকে বলিত, "বাছা! সর্ব্বদা ভাল থাকবে, সাহসের সঙ্গে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করবে! এক সময়ে নিশ্চয়ই দুঃখ কষ্টের অবসান হবে।" তখন অভ্রবতী হৃদয়ের মধ্যে একটা নূতন বল পাইত; শান্তি অনুভব করিত, দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাইত, আবার গোলাপটির মত প্রফুল্ল হইয়া উঠিত।

অভ্রবতী এরূপ প্রসন্নভাবে দীনদরিদ্র দিগকে ভিক্ষা দিত যে খুব যৎসামান্য হইলেও, তাহারা বেশী মূল্যের জিনিস অপেক্ষাও,

আনন্দিত হইত এবং তাহার সুখ সৌভাগ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিত। নিরীহ ইতর জীব মাত্রই তাহাকে দেখিয়া খুসী হইত। পক্ষান্তরে ঘরের জীবজন্তুরা, তাহার বিমাতাকে দেখিলেই তাহাদের আন্তরিক বিরাগ প্রকাশ করিত। কুকুর ভেউ ভেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিত, বিড়াল তাহাকে আঁচড়াইবার চেষ্টা করিত, সে দুধ দুইতে গেলে গরু তাহাকে দুধ দুহিতে দিত না। ষাঁড় তাকে আড়চখে-আড়চখে দেখিত, ঘোড়া ক্ষেপিয়া উঠিত, ছাগল ও ভেড়া পলাইয়া যাইত। কিন্তু ঐ সব জীব-জন্তুই অভ্রবতীকে দেখিলে, তখনই তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত, তাহাকে আদর করিত, তাহার হাত চাটিত, তার কাছে আসিবার জন্য আপনাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করিত। গরু আপনা হতেই এমন ভাবে দাঁড়াইত যে অভ্রবতী সহজে দুধ দুহিতে পারে। যখন সে জল আনিতে যাইত, আবশ্যক হইলে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে এই মনে করিয়া কুকুর তাহার পিছনে পিছনে যাইত; এবং তাহার হুকুম শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত।

কিন্তু এই সময় একটা জনরব উঠিয়াছিল যে, ঐ গ্রামে কিংবা গ্রামের আশপাশের মাঠ ময়দানে কোন অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক গেলে, সে আর ফিরিয়া আসে না; সেখানে একটা অজাগর আছে, সেই অজাগর তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। অভ্রবতী প্রায়ই একলা থাকিত, এ বিপদের কথা জানিত না; কিন্তু তাহার বিমাতা এ খবর জানিত, তাই সে মনে মনে খুসী হইয়াছিল। সেই দুষ্টা রমণী মনে মনে ভাবিল,—আমি যদি উহাকে গরু চরাইতে মাঠে পাঠাই, তাহা হইলে সে অজাগরের কবলে পড়িবে।" তাই একদিন, সে অভ্রবতীর নিকট একটা গরু ও একটা ভেড়া আনিয়া আদেশ করিল—"ইহাদিগকে তুমি মাঠে চরাইতে লইয়া যাও।" আরও বলিল—"সমস্ত দিনের আহারের জন্য এই রুটি লইয়া যাও, আর সুতা কাটিবার এই টেকোটা লইয়া যাও। টেকোয় সমস্ত সুতা জড়ান হইলে তবে রাত্রে ফিরিয়া আসিবে।" যেখানে খুব লম্বা লম্বা ও ঘননিবিড় ঘাস ছিল, বালিকা গরু ও ভেড়াদিগকে তাড়াইয়া সেইখানে লইয়া গেল। উহারা চরিতে লাগিল, আর অভ্রবতী মাটিতে বসিয়া সুতা কটিতে আরম্ভ করিল। কুকুর পিছনে পিছনে আসিয়াছিল, সেও অভ্রবতীর কাছে আসিয়া বসিল।

সূর্য্য অস্তের একটু পূর্ব্বে তাহার টেকোতে সুতা জড়ান শেষ হইয়াছিল। গরু ও ভেড়াকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য সে উঠিল; উঠিবামাত্রই হঠাৎ তাহার সম্মুখে এক সুন্দরী ও মধুরদর্শনা বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইল। অজাগরের পিতা রাজাকে যে রমণী স্বপ্নে দেখা দিয়াছিল এ সেই বৃদ্ধা। পাছে তাহার কুকুর বৃদ্ধাকে দংশন করে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি কুকুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেই বৃদ্ধা রমণী হাসিমুখে এইরূপ বলিল:—

"অভ্রবতি, ভয় পাইও না, কুকুর আমাকে কামড়াইবে না। ও বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, আমি একজন বন্ধু। দেখ্‌ছনা, ও কেমন খুসী হয়ে লেজ নাড়চে?" অভ্রবতী বলিল,—"কিন্তু তুমি কে? মা তোমাকে

আমি ত কখন দেখি নি; তুমি কি আমাদের গ্রামের লোক নও?" বৃদ্ধা উত্তর করিল:—আমি কোন গ্রামেরই নই, আমি এই পৃথিবীরই লোক নই। আমি সূর্য্যের জননী;—আমার নাম অভ্রময়ী। তোমার দুঃখে আমার মন বিচলিত হয়েছে। তোমার নির্দ্দোষ চরিত্র ও তোমার দয়া আমার বড় ভাল লেগেছে। তুমি আমার সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বোসো—আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।"

এই কথায় বিস্মিত হইয়া অভ্রবতী আরও মনোযোগের সঙ্গে বৃদ্ধাকে দেখিতে লাগিল; দেখিল এ পৃথিবীর কোন জীবের সঙ্গেই তার সাদৃশ্য নাই। তার চোখ দিয়া সূর্য্য-কিরণের মত কিরণ বাহির হইতেছে—অথচ সেই কিরণের তেজে চোখ ঝলসাইতেছে না। তার কথা কহিবার ধরণটি এমন মধুর, তার কণ্ঠস্বর এমন মিষ্ট, যেন তার নিজের মায়ের মুখের কথা শুনিতে পাইতেছে। অভ্রময়ীর পরিচ্ছদ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল; যেন সেই কাপড়, গলানো সোনা, সেলাই করা কাপড়-নহে।

অভ্রবতী সূর্য্যজননীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। মাথা নীচু করিয়া তাঁর পরিচ্ছদ প্রান্তে চুম্বন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সেই দয়াময়ী বৃদ্ধা বালিকার মাথা তুলিয়া ধরিয়া এবং তাহার উপর হাত বাড়াইয়া দিয়া এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিল:—"তোমার পদক্ষেপে যেন চামেলী ফুটিয়া উঠে; তোমার হাসিটি যেন গোলাপের মত হয়! তোমার অশ্রুবিন্দু যেন মুক্তার মত দেখিতে হয়! বৃশ্চিক বা সর্প যেন তোমাকে দংশন করিতে না পারে! তোমার মাথায় আমি যেন রাণীর মুকুট দেখিতে পাই! রজত-কাঞ্চনময় প্রাচীর ও রত্নখচিত কুট্টিমবিশিষ্ট রাজপ্রাসাদে যেন তুমি বাস কর! বাছা আমি আশীর্ব্বাদ করি, দুঃখকষ্ট যেন তোকে স্পর্শ করতে না পারে, তোর মাথার এক গাছি চুলও যেন নষ্ট না হয়।"

এই কথা বলিয়া অভ্রময়ী বালিকাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া চুম্বন করিলেন। এবং তাকে বলিলেন:—

"এই চুম্বনে তোর রূপলাবণ্য আরও যেন বৃদ্ধি পায়।"

পরে তাকে একটি ছোট গাঁটুরি দিলেন, সেই গাঁটুরির মধ্যে একটি পরিচ্ছদ ছিল। কিন্তু সে কি-পরিচ্ছদ! সে পরিচ্ছদ তারকার মত উজ্জ্বল রত্নখচিত, আর এমন সূক্ষ্ম যে কার্পাস বা রেশমের বলিয়া মনে হয় না,—মনে হয় যেন সূর্য্যকিরণে তৈরী। অভ্রময়ী বলিলেন:—

"যতদিন না বিবাহ হয়, এই পরিচ্ছদ তোমার বক্ষের উপর রাখবে; আর বিবাহের দিন, এই পরিচ্ছদ পরিধান করবে। শুদ্ধচিত্ত ও সতীসাধ্বী হয়ে থাকবে। আমি এখন যাই, আমার পুত্র আমার জন্য অপেক্ষা করচে।"

এই কথা বলিয়া অভ্রময়ী সোনার মেঘের মত দিগন্তের অভিমুখে নিঃশব্দে ও অবাধ গতিতে চলিয়া গেলেন। তাহার পুত্র সেইখানে অপেক্ষা করিতেছিল—তাহার সঙ্গে অন্তর্হিত হইলেন। অভ্রবতী এই মূর্ত্তির আবির্ভাবে হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে

ভাবিতে লাগিল,—একি স্বপ্ন? কিন্তু তখনই দেখিল, তাহার বক্ষের উপর সেই বৃদ্ধা-প্রদত্ত পরমাশ্চর্য্য পরিচ্ছদটি রহিয়াছে। তখন সে মনে করিল,—"এ স্বপ্ন নয়"; তাহার বিষাদ আনন্দে পরিণত হইল; তাহার হৃদয় উল্লসিত হইল, তার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে উল্লাসভরে কুকুরের সহিত কথা কহিতে লাগিল, গরু ও ভেড়াকে আদর করিতে লাগিল এবং এইরূপে উহাদিগকে নিজ আনন্দের একটু অংশ দিয়া উহাদের লইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। চলিয়াছে ত চলিয়াছে—পথ আর ফুরায় না—হঠাৎ দেখিল একদল অস্ত্রধারী অশ্বারোহী তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, অস্তমান্ সূর্য্যের শেষ রশ্মিতে তাহাদের বর্ম্ম ঝক্‌মক্ করিতেছে। কুকুরটা অশান্ত হইয়া তাহার প্রভুর চারিধারে ঘুরিতেছে, আর তাহার মুখের দিকে তাকাইতেছে; সেও অনুমান করিল—এরা সৎ লোক নহে। কিন্তু ওরা যদি ধরিতে আসে, ওদের হাত এড়াইয়া কি করিয়া পলায়ন করিবে? সে লোকের মুখে শুনিয়াছে, দস্যুরা কখন কখন অল্প বয়স্ক বালক বা বালিকাদিগকে ধরিয়া উহাদিগকে দাসরূপে বাজারে বিক্রয় করে। ভাল মাল হইলে—অর্থাৎ দেখিতে বলিষ্ঠ ও সুশ্রী হইলে—বিক্রয় করিয়া অধিক মূল্য পায়। দস্যুরা যাহাতে সুশ্রী বলিয়া মনে না করে, এই ভাবিয়া অভ্রবতী, রাস্তার কাদামাটি মুখে মাখিল; তাহার পর মাথা হেঁট করিয়া গরুর দিকে চলিতে লাগিল।

হায়! সে সতর্কতা বৃথা হইল। অশ্বারোহীরা অগ্রসর হইয়া একজন কুৎসিত বালিকাকে দেখিতে পাইল; কিন্তু আপনাদের মধ্যে এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিল:—

"কুৎসিত হউক, সুন্দরী হউক, তাহাতে কি-আসিয়া-যায়! অজাগরের উদরে যেতে ত কোন বাধা হবে না।"

তাহার পর, উহার মধ্যে একজন খুব উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল:—

"ওরে মাইয়া, পালাবার চেষ্টা করিস্ না! আমাদের মধ্যে একজন ঘোড়সওয়ারের পিছনে তোর বস্‌তে হবে—তোকে আমরা উঠিয়ে নিয়ে যাব!"

অভ্রবতী থামিল। এখন কি করা যায়? যুঝাযুঝি করা অসম্ভব; আর তার পর, যদি দূর দেশে নিয়ে যায়, বিমাতার গৃহে থাকার চেয়েও কি বেশী দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে? সে কুকুরের নিকট বিদায় লইল, তাহাকে চুম্বন করিল, গরু ও ভেড়ার কপালে চুম্বন করিল। তাহার পর দস্যুদের একটা ঘোড়ার পিছন দিকে চাপিয়া বসিল। তাহাদের প্রভু যতই দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল, ততই গরু হম্বারব করিতে লাগিল—ভেড়া ততই উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল। কুকুর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন সরিল না। যখন চলিতে চলিতে বেদম হইয়া পড়িল তখন থামিল। ঘোড়ারা সমান ছুটিতে লাগিল। তখন বালিকা কুকুরটিকে হস্তের ইঙ্গিতে শেষবিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া দিল।

তিনটি পশু অতীব বিষণ্ণ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

দস্যুরা একটা বড় শৈলের নিকট আসিয়া পৌঁছিল; অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পড়িল এবং একটা সরু পথ দিয়া অভ্রবতীকে একটা প্রশস্ত গুহার মধ্যে লইয়া গেল। সেখানে আরও ২৪ জন মেয়ে ছিল। এইরূপে তাহাদিগকেও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে ইতিপূর্ব্বে হরণ করিয়া আনা হয়। অন্য কতকগুলি অশ্বারোহী পুরুষ তাহাদিগের উপর পাহারা দিতে ছিল। হতভাগিনীরা কাঁদিতেছিল—তাহাদের ক্রন্দন শুনিলে বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু তবু তাহারা গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে সাহস করিতেছিল না;—তাহারা গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল ও খুব মৃদুগুঞ্জনে নিরাশার কথা বলিতেছিল। অভ্রবতী তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। যদি তাহারা উহাদিগকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যে বিক্রয় করে, তবে কি উহারা দস্যুদের চোখ এড়াইয়াই স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারে না? কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই জানিত, অজাগরের খাদ্য যোগাইবার জন্যই উহাদিগকে আনা হইয়াছে—কেননা, এই সংবাদ সমস্ত দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। অভ্রবতী ইহার কিছুই জানিত না, সে সকল অবস্থার জন্যই প্রস্তুত ছিল। যদি মরিতেই হয়, সে সাহসের সহিত মরিবে। সে সেই সদাশয়া বৃদ্ধার বাক্য বিস্মৃত হয় নাই, তাই মৃত্যুর হস্ত হইতে পার পাইবে বলিয়া তাহার আশাও ছিল।

আর কতকগুলি বালিকাকেও গুহার ভিতর আনিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহাদের সকলকে বাহির করা হইল। তখন রাত্রি হইয়াছে, কিন্তু পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে পথগুলি আলোকিত। উপত্যকার গিরিপথ দিয়া বন্দিনীদিগকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যাভিমুখে আনা হইল—প্রত্যেকেই অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া, পশ্চাতে এক একজন অশ্বারোহী। উহারা সমস্ত রাত্রি ও পরদিনের দিবাভাগের একাংশ কাল ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে অজাগরের জনক সেই রাজার রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিল।

নগরে সমস্ত অধিবাসী উহাদিগকে দেখিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সকল আর্মেনি বালিকাই সুন্দরী। উহারা সকলেই অজাগরের কবলে পতিত হইবে, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়।

কেবল অভ্রবতীকে কুৎসিত বলিয়া মনে হইল—তাহার সমস্ত মুখে কাদা মাখা।

এখন রাজার আদেশ দিবার সময় উপস্থিত হইল।

এখন সর্পশিশুটি প্রকাণ্ড বড় হইয়া উঠিয়াছে—ক্ষুধিত হইয়াছে, উহার সহিত একটি ছোট মেয়ে একাকী থাকিবে, এই কথা ভাবিয়া রাজা শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহারও সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়ামূর্ত্তির কথার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি সেই মেয়েগুলিকে প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী একটি সুন্দর গৃহে রাখিয়া তাহাদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে বলিলেন এবং উহার মধ্য হইতে একটি একটি করিয়া সর্পের নিকট আনিতে আদেশ করিলেন।

রক্ষকেরা, স্ফূর্ত্তিতে যার নাম প্রথম উঠিবে তাহাকেই প্রথমে সর্পের নিকট আনিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া, অভ্রবতীকে কুৎসিত ও নির্ভয় দেখিয়া, তাহাকেই সর্পের আহারের জন্য বাছিয়া লইল।

তাহারা বলিল :—প্রথমে উহাকেই লইয়া যাওয়া যাক্, কেননা ঐ মেয়েটি অবাধে আমাদের সঙ্গে আসিবে এবং তাহা হইলে উহার দেখাদেখি অন্য মেয়েরাও সাহস পাইবে।

তাই তাহারা অভ্রবতীর হস্ত ধারণ করিয়া অজাগরের নিকট লইয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে উহারা তাহাকে বলিল :—"তোমার বিবাহ দিবার জন্য তোমাকে লইয়া যাইতেছি ; রাজপুত্র—তোমার বর ; তুমি রাণী হইবে। এইরূপ বলিতে বলিতে উহারা সর্প-পুরের সংলগ্ন একটি বাগানে আসিয়া পৌঁছিল। এই উদ্যানের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ জলের একটা চৌবাচ্চা ছিল। রক্ষকেরা সর্প-পুরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে উদ্যত হইলে, মেয়েটি উহাদিগকে বলিল :—"যে হেতু তোমরা রাজপুত্রের নিকট আমাকে লইয়া যাইতেছ, আমাকে একটু একলা থাকিতে দেও, আমি মুখ ধুইয়া লই, আমার কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া লই। আমাকে এই অবস্থায় তাঁহার নিকট লইয়া গেলে আমি বড়ই লজ্জিত হইব।"

উহারা তাহাতে সম্মত হইল, যে রক্ষকেরা পুরদ্বার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা উদ্যানের বাহিরে চলিয়া গেল।

অভ্রবতী একাকী থাকিয়া এক্ষণে মুখ হাত ধুইল, ভাল করিয়া খোঁপা বাঁধিল, আর সেই বৃদ্ধাপ্রদত্ত পোষাক পরিধান করিল।

মুহূর্ত্ত পরে, তাহার রক্ষকেরা ফিরিয়া আসিল। মেয়েটির এইরূপ বেশভূষা দেখিয়া উহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। উহাদের মনে হইল যেন দিবালোকের মধ্যে উষার আবির্ভাব হইয়াছে। কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না, উহারা যে মেয়েটিকে আনিয়াছিল সে এই মেয়ে, কিংবা এ পৃথিবীর জীব। উহারা ভাবিল, দরিদ্রা বালিকার বেশে এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেব-বালা বুঝি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া, এক্ষণে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অভ্রবতী উহাদিগকে বলিল :—"হাঁ-করিয়া অবাক্‌ভাবে একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছ কেন? যেখানে আমার যাইতে হইবে সেখানে আমাকে লইয়া যাও না।"

যে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা মনে করিয়া উহারা ভীত হইল এবং তাহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। উহারা তাহাকে বলিল :—"আমাদের ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আমরা বিবাহ দিতে তোমাকে এখানে আনি নাই, এই পুরবাসী অজাগরের মুখে তোমাকে সমর্পণ করিবার জন্য আনিয়াছিলাম। এই অজাগর সর্পই রাজার পুত্র। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর ; তুমি যদি ইচ্ছা কর, তোমাকে আমরা বাঁচাইয়া দিব, তার জন্য আমাদের ফাঁসি হয় সেও স্বীকার।

অভ্রবতী আদৌ ভয়ে বিচলিত হয় নাই। সে মনেমনে ভাবিল, তাহার সম্বন্ধে তাহার রক্ষাকর্ত্রীর একটা কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে, তিনি কখনই তাহাকে ছাড়িয়া পলাইবেন না। তাই সে আবার দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিল :—

"তোমাদিগকে আমি মৃত্যুর আশঙ্কায় রাখিতে চাহি না। পুরদ্বারের চাবিটা আমাকে দিয়া তোমরা চলিয়া যাও। আমি অজাগরকে ভয় করি না।"

সে উহাদিগের নিকট হইতে চাবিটা লইয়া দ্বার খুলিল, একটা খালি দর-দালান

পার হইয়া, একটা বড় দালান-ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটা প্রকাণ্ড অজাগর, একটা পালঙ্কের উপর প্রসারিত। প্রথমে ভয়বিহ্বল হইয়া কথা বলিতে পারিতেছিল না, পরে তাহার পূর্ব্ব-সাহস ফিরিয়া আসিল, এবং একটু দূরে দাঁড়াইয়া সর্পকে এই কথা বলিল :—

"রাজকুমার! তোমাকে আমি অভিবাদন করি। সূর্য্য-জননী অভ্রময়ীর তরফ হইতে আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। তিনি তোমার সুখস্বচ্ছন্দতা ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন।"

অজাগর মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহার জ্বলন্ত দুই চক্ষু দিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মেয়েটি শিহরিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; তাহার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল; কিন্তু তবু সে পিছু হটিল না, এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টিপাতে মেয়েটি ভীত হইয়াছে দেখিয়া, সাপ মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল! পরে আবার তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে থাকায় সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু আবার তাহার মনে পড়িল, অভ্রময়ী আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

তখন সে বলিল :—"রাজকুমার কেন তুমি আমাকে এইরূপ যন্ত্রণা দিতেছ; আর বিলম্ব না করিয়া আমাকে গ্রাস কর,—যদি আমাকে ভক্ষণ করিবার তোমার এতই ইচ্ছা হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তোমার এই সর্প-শরীরের মধ্যে মানব-আত্মা অধিষ্ঠিত থাকে, তবে আমি অভ্রময়ীর নামে তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি তোমার খোলস্ হইতে বাহির হও।" এই কথা বলিবামাত্র, সর্প কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল এবং চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর, সে কাঁপিতে লাগিল, তাহার শরীর বাঁকিয়া যাইতে লাগিল এবং হঠাৎ এরূপ একটা বিকট গর্জ্জন করিয়া উঠিল যে, সেই শব্দে সমস্ত প্রাসাদ কম্পিত হইল; রাজা লাফ দিয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া পড়িলেন।

কি হইয়াছে দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে ভৃত্যেরা আসিয়া পড়িল! আসিয়া কি দেখিল?—দেখিল, সাপের খোলসটা মাটিতে পড়িয়া আছে—ঠিক্ যেন একটা গঠনহীন আবরণ হইতে একটা প্রজাপতি সদ্যঃ বাহির হইয়া আসিয়াছে। দেখিল শুভ্র পরিচ্ছদ পরিহিত একটি উদার-দর্শন সুন্দর যুবক; তাহার পার্শ্বে, কাঞ্চন ও আলোর রশ্মির দ্বারা খচিত রেশমীপরিচ্ছদ পরিহিত, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী এক তরুণী অবস্থিতা। দুজনেই সস্মিত মুখে পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছেন।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের সমাচার পাইয়া রাজা ও রাণী আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, দৌড়িয়া আসিলেন এবং যুবকের ও অভ্রবতীর মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। তাহার পর খুব ঘটা করিয়া তাহাদের বিবাহ দিলেন। ৬ দিন ৬ রাত্রি ধরিয়া বিবাহের উৎসব চলিতে লাগিল। আর্মেনী দেশের তাবৎ তরুণীবৃন্দ বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পর উপহারের বিপুল ভার সঙ্গে লইয়া, তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ত্তমান জার্ম্মাণ শিক্ষা প্রণালী

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চৌধুরী (Mr. W. Chowdhury) বর্ত্তমান জার্ম্মাণ শিক্ষা-প্রণালীর বিষয়ে একখানি ইংরাজী ভাষায় অতি সারগর্ভ পুস্তক * লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি সহজ, সুবোধ্য, চিন্তাশীলতা ও গবেষণার পরিচায়ক।

গ্রন্থকার একটী বিখ্যাত জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পি, এচ, ডি উপাধিধারী। তিনি শিক্ষার্থে পাঁচ বৎসর কাল জার্ম্মাণ দেশে বাস করিয়া, তথাকার শিক্ষা-প্রণালী বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়া, তাঁহার গবেষণার ফল উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ভিতর সজীবতা আছে, উহা কতকগুলি অর্থহীন নীরস কথার সমষ্টি নহে। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন, বিদেশী জাতিকে বুঝিতে পারা ততোধিক কঠিন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিদেশী জাতির অন্তর্নিহিত ভাব অভিব্যক্ত করা। গ্রন্থকার জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করিয়া, জার্ম্মাণ দেশে ভ্রমণ ও বাস করিয়া, জার্ম্মাণ ভাবে নিমগ্ন হইয়া, জার্ম্মাণ জাতির জ্ঞান-পিপাসা ও শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় অতি সুচারুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

এক্ষণে ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তার করিবার নানারূপ প্রস্তাব হইতেছে। কি প্রণালী অবলম্বন করিলে শিক্ষা বিস্তার সম্যকরূপে হইতে পারে আমাদের চর্চ্চা করা আবশ্যক; সেজন্য কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোন দেশে কতদূর শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত।

ইউরোপের মধ্যে জার্ম্মাণীতে শিক্ষা-বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। কেন হইল, ও কি প্রকারে হইল; বর্ত্তমান অবস্থায় সে বিষয় আলোচনা করিলে সুফল ফলিলেও ফলিতে পারে।

শিক্ষা-বিস্তারে জাতীয় মনোগঠনের সহায়তা করে। হাম্‌বোল্ট, বেবর প্রভৃতি মনীষীগণ ভারতবাসীর সহিত জার্ম্মাণ জাতির মনো-গঠনের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখিতে পান; এবং সেই জন্য মনে হয়—আমরা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জার্ম্মাণ শিক্ষা-প্রথার উন্নতির মূল কারণ অনুসন্ধান করি, আমাদের বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা।

প্রকৃতির সহিত জীবের অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে মানবকে তাহার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয়। জ্ঞানই মনুষ্যের শক্তি। মনুষ্যের শ্রীবৃদ্ধির মূলে জ্ঞান। মানব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রথায় জ্ঞান দেবীর আরাধনা করিতেছে; ও তাহার আরাধনার বলে প্রকৃতির অপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া প্রকৃতির অদ্ভুত শক্তিনিচয় নিজ ব্যবহারে লাগাইয়া, শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রচার করিতেছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে জাতি জ্ঞান দেবীর আরাধনায় প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিতে পারিয়াছে, সেই জাতি ধরাবক্ষে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রতীচ্য জাতির উন্নতির মূলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। কি প্রকারে প্রতীচ্য জাতি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতেছে জানিতে পারিলে, প্রাচ্য জাতির উৎকর্ষ লাভ ঘটিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত জাপান।

বর্ত্তমান জার্ম্মাণ শিক্ষা-প্রণালীতে তিনটী স্তর বা ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়—নিম্নশিক্ষা, মধ্যমশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা; এবং প্রতি স্তরে দুইটী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়—সাধারণ ও শিল্পবিদ্যা বিষয়ক।

---

* The Present Educational System in Germany by W. Chowdhury, Ph. D, Printed and Published by K. P. Mookerjee & Co. at 20 Mangoe Lone. Price Rs 1-8-0.

নিম্নশিক্ষা

জার্ম্মাণ দেশে প্রত্যেক বালকবালিকাকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে হয়। জার্ম্মাণ রাজ্যে প্রতি বালক ও বালিকাকে প্রাথমিক শিক্ষা না দেওয়া অপরাধ ও আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। ১৬১৯ খ্রীঃ অঃ হইতে জার্ম্মাণীতে সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। জার্ম্মাণ দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য মানব জীবনে অহরহঃ যে সকল বিষয়ে জ্ঞানের আবশ্যক সেই সকল বিষয়ে, নীতি ও ধর্ম্ম অনুসারে শিক্ষা দিয়া স্বদেশ-প্রেমিক বালক চরিত্র গঠন করা। জার্ম্মাণ প্রাথমিক শিক্ষায় এখনও ধর্ম্ম প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ধর্ম্ম ব্যতীত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জার্ম্মাণ ভাষা, অঙ্ক, জ্যামিতি, জার্ম্মাণ দেশের ইতিহাস ও ভুগোল, পদার্থবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। জার্ম্মাণ দেশে লোয়ার প্রাইমারি স্কুলেও শিক্ষা যথেষ্ট দেওয়া হয়—প্রায় আমাদের দেশে হাই স্কুলে যতদূর শিক্ষা দেওয়া হয় ততদূর! কিন্তু বই মুখস্থ করান হয় না, হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। জার্ম্মাণদেশ হইতে "কিণ্ডার-গার্টেন" শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভূত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বালক বালিকারা স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে কিন্তু অধিকাংশ স্থলে একই বিদ্যালয়ে পাঠ করে। জার্ম্মাণেরা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বালক ও বালিকার মধ্যে প্রভেদ পছন্দ করেন না; তাঁহাদের ধারণা গৃহের মত বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদিগের বাল্যশিক্ষা একত্রে হওয়া উচিত, নহিলে শিক্ষা একদর্শী হইবার সম্ভাবনা। জার্ম্মাণেরা ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী; এবং কি প্রকারে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ে সতত যত্নশীল; এমন কি, কোন্ বিষয়ের শিক্ষা কোন্ বালকের মস্তিষ্ক ও শরীরের পক্ষে অধিকতর সুফলপ্রদ তাহাও স্থির করিতে প্রস্তুত; এবং সেইরূপ বিচার করিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সাঁতার শিখাইবার ব্যবস্থা আছে ও ছাত্রদিগকে লইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করান হয়। দুর্ব্বল ও অসুস্থ বালকদিগের জন্য ফাঁকা জায়গায় "পার্ক স্কুলের" ব্যবস্থা আছে; মূক, বধির ও অন্ধের নিমিত্ত পৃথক বিদ্যালয় আছে; স্বল্প দৃষ্টি, স্বল্প বধির, মৃগি ও অন্যান্য ব্যাধিগ্রস্ত বালকদিগের জন্য সরকারী স্কুল (helping School) আছে। দরিদ্র বালকদিগকে পঠন কালে সরকারী খরচে আহার দিবার ব্যবস্থা আছে। বহুস্থানে বালকদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি-কল্পে স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপন করা হইয়াছে; এবং সর্ব্বস্থানে ছাত্রাশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়; বালকগণ পরিভ্রমণ কালে সেই সকল স্থানে বিনা মূল্যে বা অতি অল্প মূল্যে রাত্রি কাটায় এবং প্রাতরাশ পায়। "Association for summer Nursing"এর ব্যয়ে ছাত্রদিগকে গ্রীষ্মকালে স্কুলের ছুটী হইলে উপনিবেশ বাসে (holiday colonies) পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রশিক্ষকদিগের বেতন সামান্য। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে, জার্ম্মাণিতে গড়পড়তা নিম্নলিখিত মাসিক বেতন হার ছিল

	নগরে	পল্লীগ্রামে
শিক্ষক—	১৩৮ টাকা	৯০ টাকা
শিক্ষয়িত্রী	৯৬ „	৭৮

জার্ম্মাণ প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন এতদ্দেশীয় ইংরাজ সার্জ্জেন্টের বেতনের তুল্য। ইদানীন্তন জার্ম্মাণ প্রাথমিক শিক্ষকদিগের অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও বেতন হার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষকদিগের পেনসনের সুব্যবস্থা আছে; ও শিক্ষক-দিগের বিধবা-পত্নী ও নাবালক পুত্রকন্যাগণকে রাজকোষ হইতে সাহায্য করিবার, জার্ম্মাণ আইন অনুসারে, সুনিয়ম আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অধিকাংশ স্থানে স্থানীয় স্কুল পরিদর্শকগণ স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। সর্ব্বত্র স্কুল শিক্ষার জন্য "স্কুল কমিটি" আছে।

জার্ম্মাণ দেশে প্রায় ৭০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়

উহার ছাত্র সংখ্যা ১০,০০০০০০; শিক্ষক সংখ্যা ১৬৭০০০। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গড়পড়তা প্রতি বালককে শিক্ষা দিবার বার্ষিক খরচ পড়িয়াছিল ৬৩ টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী তহবিল হইতে শতকরা ২৯ টাকা, মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে বক্রী শতকরা ৭০ টাকা লওয়া হইয়াছিল।

ইউরোপে প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত ৮৫,০০০০০০ পাউণ্ড বার্ষিক ব্যয় করা হয়; এই ব্যয়ের $\frac{1}{3}$ অংশ জার্ম্মাণ, $\frac{1}{5}$ অংশ ফ্রান্স, $\frac{1}{8}$ অংশ ইংলণ্ড, $\frac{1}{26}$ অংশ রুসিয়া বহন করে। ইহার ফলে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা জার্ম্মণিতে শতকরা ০,০০৫, গ্রেট ব্রিটনে ১০৫, ফ্রান্সে ৪০০, রুসিয়ার ৬১০৭।

জার্ম্মাণ আইন অনুসারে জার্ম্মণেরা ৬ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক বালিকাকে শিক্ষা দিতে বাধ্য। যে সকল বালক বালিকা অর্থাভাবে, ১৪ বৎসর বয়সের পর, প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দোকানে, কারখানায়, বা হোটেলে কর্ম্ম গ্রহণ করে, কিংবা পাচিকা বা ধাত্রীর উপজীবিকা গ্রহণ করে, তাহাদেরও শিক্ষার স্কুল আছে। এতদ্ব্যতীত বালক বালিকাদিগকে বাণিজ্য ব্যবসায়, কৃষিকার্য্য, ও বিবিধ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দিবারও ভিন্ন ভিন্ন স্কুল কলেজ আছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জার্ম্মাণিতে প্রত্যেক কারখানার (Factory) ডাইরেক্টর তাহার অধীনস্থ অল্পবয়স্ক কারিকরদিগের শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য; তাহাদিগকে উপযুক্ত সুযোগ দিতে ও তাহারা স্কুলে যাইয়া শিক্ষালাভ করে ইহা দেখিতে বাধ্য; এবং কারিকরগণ ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য।

মধ্যম শিক্ষা।

মধ্যম শিক্ষা দুই প্রকার। একের উদ্দেশ্য শিল্প শিক্ষা দেওয়া, অপরের উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করা।

বালকদিগের জন্য Gymnasiumes, Real Gymnasiumes এবং upper Real Schools আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে বালকদিগকে মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে জিমনেসিয়মের ছাত্রেরা লাটিন ও গ্রীক পড়িত ও তাহাদিগেরই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজাজ্ঞায় উপরি উক্ত তিন শ্রেণীর স্কুলগুলিকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ের নয়টী শ্রেণী বিভাগ আছে।

Gymnasium-এ লাটিন ও গ্রীকের প্রাধান্য। Real Cymnasium-এ ইংরাজী, ফরাসী, গণিত, বিজ্ঞান ও অল্প পরিমাণে লাটিন ও গ্রীক শিক্ষা দেওয়া হয়; Upper Real School সমূহে লাটিন গ্রীকের সম্পর্কও নাই, ইংরাজী, ফরাসী, গণিত, বিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। Upper School সমূহের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের B.Sc, শ্রেণীর মত শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষা হাতে কলমে দেওয়া হয়; প্রতি ছাত্রকে ল্যাবোরেটারীতে কাজ করিতে হয়; ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্-তত্ত্ব শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে ভ্রমণ করিতে হয়; ছাত্রদিগকে গবেষণা করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়—এমন কি, গবেষণা করিবার জন্য আবশ্যক হইলে সপ্তাহে ২। ৩ দিন ছাত্রদিগকে ছুটী দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়। অনেক বিদ্যালয়ে Sexual Ethics এবং স্বাস্থ্য নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাত্রেই বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারী। ৫ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া, একটী সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ২।১ বৎসর কাল সহকারী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিবার পর তবে শিক্ষকের পদ পাওয়া যায়। এতদ্দেশের মত যে সে লোক শিক্ষক হইতে পারে না।

জার্ম্মাণ দেশে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বালকদিগের জন্য ১২২৫টী হাইস্কুল ছিল; তাহার ছাত্রসংখ্যা ৩৭২৪৬১৩, শিক্ষক সংখ্যা ১৭,৬৪৩।

জার্ম্মাণিতে মাধ্যমিক শিক্ষার নিমিত্ত ১২০০ বালিকা বিদ্যালয় আছে। স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। বালিকাদিগকে বালক-

দিগের মত ৯ বৎসর ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়; বালিকারা বালকদিগের মত একই বিষয় পাঠ করে; কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের নিমিত্ত বালিকা বিদ্যালয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। বালিকাদিগকে বিশেষরূপে ধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহার ফলে জার্ম্মাণ স্ত্রীলোকেরা পরিমিত ব্যয়ে ও সুখস্বচ্ছন্দে গার্হস্থ্য জীবন কাটায়। কিন্তু জার্ম্মাণ স্ত্রী-শিক্ষার একটী দোষ হইতেছে, যে সকল বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে নারী স্বভাব সম্যকরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করে না; আর একটী দোষ স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে স্ত্রীলোকের কোনরূপ অধিকার নাই। পুরুষ স্ত্রী-শিক্ষা পরিচালনা করিতেছে; ফলে জার্ম্মাণি এ বিষয়ে ফ্রান্সের নিকট পরাজিত।

Mechanical, Electrical, chemical ও civil Engineering শিক্ষা দিবার জন্য জার্ম্মাণীতে ৫০টী যান্ত্রিক বিদ্যালয় ও বয়ন-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ১৩টী বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক সাড়ে তিন বৎসর কাল শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত প্রায় ২৫টী কৃষি বিদ্যালয় আছে। সমগ্র জার্ম্মাণীতে প্রায় ১২৫টী Middle Department Schools আছে। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য Training School-এর ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষকদিগের জন্য ২৫৯৩, শিক্ষয়িত্রীদিগের জন্য ১৫০ স্কুল আছে।

উচ্চ-শিক্ষা

উচ্চ-শিক্ষার দুই ভাগ। একের উদ্দেশ্য সাধারণ শিক্ষা, অপরের উদ্দেশ্য শিল্প শিক্ষা; একের অঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়, অপরের অঙ্গ "Technical universeties."

জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও অন্যান্য দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যথেষ্ট প্রভেদ। ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ন্যায় উহাতে কেবল পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না। যদিও জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহ সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত, তথাপি তাহাদিগের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করে না। প্রতি বিশ্ব-বিদ্যালয় নিজ নিজ Rector, Dean, professor প্রভৃতি নির্ব্বাচন করে। জার্ম্মাণ অধ্যাপকেরা সরকারী বেতনভোগী হইলেও স্বাধীন। জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য জ্ঞান বৃদ্ধি; সেজন্য অধ্যাপকেরা অতি স্বাধীন ভাবে জ্ঞান-চর্চ্চা করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক মতামতের জন্য অধ্যাপকের পদস্খলিত হয় না।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা দুই ভাগে বিভক্ত—(১) অধ্যাপক বা প্রোফেসর (২) প্রাইভেট ডোকেণ্ট। অধ্যাপক বেতনভোগী, প্রাইভেট ডোকেণ্ট বিনা বেতনভোগী; অধ্যাপক একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা দান করে, প্রাইভেট ডোকেণ্টের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যবস্থা নাই। এতদ্ব্যতীত লেকচারার আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি লেকচার সাধারণের জন্য ও কতকগুলি বিশেষ লোকের জন্য। সাধারণ লেকচরে কোনরূপ "ফি" দিতে হয়, কিন্তু private lecture-এর জন্য পাঁচ মার্ক (৩৷৷০ মাত্র) দিতে হয়।

অধ্যাপকদিগের আয় দুইটী সূত্র হইতে হইয়া থাকে—একটী সরকারী বেতন, দ্বিতীয় ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন। প্রসিয়ায় extra ordinary professor-এর গড়পড়তা বার্ষিক বেতন ৩২১০ মার্ক; এবং সাধারণ প্রোফেসরের (professor in ordinary) গড়পড়তা বার্ষিক বেতন ৪৫০০ মার্ক। এতদ্ব্যতীত সাধারণ অধ্যাপকেরা একটী ভাতা পান ও বাটি ভাড়া পান; তাহাতে তাঁহাদের বার্ষিক আয় প্রায় গড়পড়তা ১২০০০ মার্ক অর্থাৎ মাসিক ২১৫ টাকা আন্দাজ পড়ে। অধ্যাপকগণ শিক্ষকতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহাদিগের পূর্ণ বেতন পেন্সন পান ও তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের পরিবারবর্গ সাহায্য প্রাপ্ত হন। জার্ম্মাণ দেশে অধ্যাপক সংখ্যা অতি অল্প এবং অধ্যাপকের আয় অতি অল্প।

জার্ম্মাণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে পরিমাণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীর অন্যত্র সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। জার্ম্মাণ ছাত্রেরা নিজ নিজ অধ্যাপক বাছিয়া লয় ও তাহাদিগের যে বিষয়ে পড়িবার ইচ্ছা হয় সে বিষয়ে পড়ে, কেহ তাহাদিগকে ইচ্ছা-

বিরুদ্ধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে তাড়না করে না। জার্ম্মাণ অধ্যাপকেরা যে বিষয়ে ইচ্ছা শিক্ষা দান করিতে ও জার্ম্মাণ ছাত্রেরা যে বিষয়ে ইচ্ছা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। জার্ম্মাণ অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন—কেহ কাহাকেও কাহারও কর্ত্তব্য শিক্ষা দেয় না। ডাক্তার চৌধুরী লিখিয়াছেন:—

"He selects the subjects which he will study, enters his nams for these studies, and introduce himself to his professors who are ever ready to help him in his work."

আমাদের দেশে এক্ষণে "ছাত্র নিবাস" স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। জার্ম্মাণিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য কোনরূপ বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা নাই; তাহারা ভদ্র পরিবারে বাস করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করে। ডাক্তার চৌধুরী লিখিয়াছেন:—

"There is no boarding house for the University student; he lodges usually with a private family of the University town. There is no residential University in Germany. The Germans do not like the residential system and are of opinion that it prevents the full and spontanious evoluition of the charecter of the student, for which, constant and unrestrained contact with the outer world is necessary. Those who want to take students as lodgers, send in their names to the Beadle of the University and a student can find very easily accomodations in a good family"

অর্থাৎ জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন ছাত্র-নিবাস নাই, তাহারা ভদ্র পরিবারের

না। যে সকল ভদ্রলোকেরা ছাত্রদিগকে নিজ আবাসে স্থান দিতে প্রস্তুত তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান ও ছাত্রেরা অতি সহজে সেই সকল ভদ্রপরিবারে স্থান পায়।

জার্ম্মাণ দেশে ছাত্রেরা পীড়া কিংবা আকস্মিক বিপদপাতের নিমিত্ত জীবন বীমা করিয়া রাখে। বৎসরে ২৲র বেশী দিতে হয় না, তৎপরিবর্ত্তে পীড়া হইলে ঔষধ, পথ্য ও সুচিকিৎসা পাওয়া যায়। দুর্ঘটনা ঘটিয়া বিকলাঙ্গ হইলে ১০০০০ মার্ক, মৃত্যু হইলে ১০০০ ক্ষতি পূরণ স্বরূপ পাওয়া যায়।

জার্ম্মাণ দেশে সুশিক্ষার ফলে ছাত্রের শরীর সুস্থ সবল এবং মন উল্লাসিত থাকে; জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ও হৃদয় প্রশস্ত হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২১, ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫১৭০০ এবং শিক্ষক-সংখ্যা ছিল ৩৪০৩। শিক্ষকদিগের মধ্যে দর্শন বিভাগে ৬৭০; সাধারণ অধ্যাপক ৩৮৯, প্রাইভেট ডোকেণ্ট ৪৯৩, লেকচরার ১০১ ছিল, চিকিৎসা বিভাগে ২৯১ সাধারণ অধ্যাপক, ২৫৪ অসাধারণ অধ্যাপক, ৫০৪ প্রাইভেট ডোকেণ্ট ও ১১ লেকচারের ছিল, আইন ও রাজনীতি বিভাগে ১৯৪ সাধারণ অধ্যাপক, ৪৭ অসাধারণ অধ্যাপক, ৫১ প্রাইভেট ডোকেণ্ট, ৮ লেকচরের ছিল; শাস্ত্র বিভাগে ১৯৩ সাধারণ অধ্যাপক, ৪৯ প্রাইভেট ডোকেণ্ট ও ৯ লেকচারার ছিল। এতদ্ব্যতীত নৃত্য, গীত, ব্যায়াম প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ৮৪ শিক্ষক ছিল। জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচও যথেষ্ট হয়। কেবল প্রুসিয়ায় বিশ্ব-বিদ্যালয় বাবত বার্ষিক ২ কোটী মার্ক ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের শতকরা ৭৪ ভাগ গবর্ণমেণ্ট বহন করে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দুই প্রকার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় একটী "সরকারী পরীক্ষা" (State Examination), অপরটী "ডাক্তার" উপাধির জন্য পরীক্ষা। সরকারী কার্য্যের জন্য "সরকারী পরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। বিদেশীয় ছাত্রগণ যাহারা জার্ম্মাণ দেশে কর্ম্ম গ্রহণ

করিলেও "ডাক্তারী পরীক্ষা" দিবার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু জার্ম্মাণ ছাত্রদিগকে "সরকারী পরীক্ষা" পাশ না করিলে "ডাক্তারী পরীক্ষা" দিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া ৫ বৎসর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিলে পর, সরকারী পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হয়। পরীক্ষার কিয়দংশ মৌখিক ও কিয়দংশ লিখিয়া দিতে হয়। জার্ম্মাণ অধ্যাপকেরা নিজ নিজ ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা ছাত্রদিগের দোষগুণের বিষয় বিশেষরূপে অবগত থাকেন এবং কতকগুলি প্রশ্নের নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে উত্তর দেওয়ার উপর ছাত্রদিগের পাশ কিম্বা ফেল নির্ভর করে না। যদি কোন ছাত্র পরীক্ষায় কোন বিষয়ে ফেল হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই বিষয়ে ছয় মাস পরে পুনর্পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু এই ছয় মাস কাল সে ইচ্ছা করিলে উচ্চতর পরীক্ষার জন্ম পাঠ করিতে পারে। ছাত্রেরা হাতে-কলমে কতদূর শিক্ষা করিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ম তাহাদিগকে ২ ঘণ্টা কিংবা ৩ ঘণ্টার মধ্যে একটী practical work করিতে হয় না; তাহাদিগকে কোন বিষয়ে গবেষণা করিতে দেওয়া হয়, সময়ের কোন নির্দ্দেশ থাকে না; যাহার যতক্ষণ প্রয়োজন হয় সে ততক্ষণ ধরিয়া গবেষণা করিয়া তাহার ফল জানাইয়া হাতে-কলমে পরীক্ষা দেয়। হাতে-কলমে পরীক্ষা পাশ করিলে তবে মৌখিক পরীক্ষা দিতে পারা যায়। অধ্যাপকগণ ছাত্রেরা ল্যাবোরেটারীতে কিরূপ কার্য্য করে তাহা প্রত্যহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং পরীক্ষার সময়ে ছাত্রদিগের সম্বৎসরের কার্য্যকলাপের পরিচয় গ্রহণ করেন।

Doctor of philisophy উপাধি লাভ করিবার জন্ম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অন্যূন তিন বৎসর যে কোন জার্ম্মাণ বিশ্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। পরীক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; ছাত্র ইচ্ছা করিলেই পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিতে পারে; কিন্তু আবেদনের সহিত এমন একটী রচনা পাঠাইতে করিবার শক্তি আছে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যদি রচনা মনোনীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সাধারণ্যে পরীক্ষা করিবার জন্ম দিন ধার্য্য হয়; এবং সে যে বিষয়ে রচনা লিখিয়াছে তদ্ব্যতীত অপর দুইটী বিষয়ে পরীক্ষা লওয়া হয়। পরীক্ষা মৌখিক ও সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে গ্রহণ করা হয়। চারিজন অধ্যাপক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পরে সাধারণের সহিত তর্ক করিবার জন্ম দিন ধার্য্য হয় এবং সে সময়ে অধ্যাপকগণের উপস্থিতিতে সাধারণের সহিত তর্ক বিতণ্ডা করিতে হয়। এসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, একটী কন্‌ভোকেশন আহূত হয় এবং তথায় তাহাকে একটী বক্তৃতা করিতে হয় এবং তৎপরে তাহাকে "ডাক্তার" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ডাক্তারি পরীক্ষার "ফি" ৩০০ হইতে ৩৫০ মার্ক পর্য্যন্ত। যদ্যপি কোন ছাত্র পরীক্ষায় বিফল হয় তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধেক "ফি" ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণ দেশে উচ্চশিক্ষার ইতিহাস অতি চমৎকার। ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট চতুর্থ চার্লস প্রাগ সহরে প্রথম জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; তখন এস্থানে কেবল লাটিন ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত। তৎপরে ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায়, ১৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হেডেলবার্গে, ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কলোনে, এবং ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে এরফ্রাটে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের স্থান ছিল না; এবং কি প্রকারে জ্ঞান রাজ্যের পরিধি বিস্তার করা যাইতে পারে তাহারও চেষ্টা হইত না। ন্যায়ের কচকচি, দর্শনের বিতণ্ডা ও বক্তৃতার লহরী তৎকালীন বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহ মুখরিত করিয়া রাখিত। এতদ্ পরে উরসবার্গ, লিপজিক, রসটক, গ্রীফস্‌ওয়াল্‌ড প্রভৃতি স্থানে এবং তাহারও পরে ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রিবার্গে, ১৪৬৩ খৃঃ অব্দে ইনগলসট্যাডে, ১৪৭৭ খৃঃ অব্দে টিউবিলজেনে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে classics-এর চর্চ্চা হইত। Reformation-এর পর হইতে জার্ম্মাণীতে জ্ঞান-চর্চ্চার ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; নূতন নূতন প্রায় ২২টী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের

নগণ্য জার্ম্মাণ ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব্বে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা জার্ম্মাণ ভাষাকে হেয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন; লাটিন ভাষায় শিক্ষার আদান প্রদান চলিত; ফলতঃ মাতৃভাষার প্রতি জার্ম্মাণদিগের বীতরাগ বশতঃ উন্নতির স্রোতও প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু যেদিন হইতে লায়েবিনিজ টোমাসিয়ান প্রভৃতি ধীমান ব্যক্তিগণ জার্ম্মাণ ভাষায় জার্ম্মাণদিগকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন, সেই সময় হইতে বিজ্ঞানের অদ্ভুত চর্চ্চা আরম্ভ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জার্ম্মাণিতে শিক্ষার আদান প্রদান সম্পূর্ণ স্বাধীন; গবর্ণমেণ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করে না। লেকচারার কিংবা প্রাইভেট ডোকেণ্ট নিযুক্ত করিবার জন্ম বিশ্ব-বিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হয় না; যদিও অধ্যাপকেরা সরকারী বেতনভোগী তথাপি তাহাদিগের নিয়োগের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সেনেটের মতামতের উপর নির্ভর করে। শিক্ষক শিক্ষাদান বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন; তিনি কোন বিষয়ে ও কি প্রকারে শিক্ষা দিবেন তাহা কেহ তাহাকে উপদেশ দেন না। জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা নাই। ছাত্রেরা অধ্যাপকের লেকচারের উপর নির্ভর করে।

এতদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা তাহাদের বেতন-হার অতি অল্প বলিয়া Public service commission-এর নিকট যথেষ্ট অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু জার্ম্মাণীতে সাধারণ অধ্যাপকেরা (professor in ordinary) গড়পড়তা মাসিক ৪৫০ মার্ক (৩৩৮ টাকা) পান; অসাধারণ অধ্যাপকের বেতন ২৫৩ মার্ক (১৮৮ টাকা); প্রাইভেট ডোকেণ্ট কোন বেতন পান না।

এতদ্দেশে যে সে "অধ্যাপক" বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেয়; জার্ম্মানিতে তাহা সম্ভব নহে। বহুকাল ধরিয়া প্রাইভেট ডোকেণ্টের কার্য্য করিয়া গবেষণার বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলে অধ্যাপক পদ পাইবার সম্ভাবনা।

ডাক্তার চৌধুরী বলেন ঃ—

বাহ্য চাকচিক্য কিম্বা ছাত্র-সংখ্যার উপর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গৌরব নির্ভর করে না; অধ্যাপক ও ছাত্রের জ্ঞানদেবীর আরাধনার উপর যশঃ নির্ভর করে। পরীক্ষার যশ ও উপাধির উপর কাহারও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় নির্ভর করে না; কোন্ গুরুর নিকট কোন্ ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার উপর তাহার কতদূর বিদ্যালাভ হইয়াছে আভাষ পাওয়া যায়। উপাধি গ্রহণ না করিয়াও, পরীক্ষা না দিয়াও অতি উচ্চ শিক্ষা জার্ম্মাণ দেশে পাওয়া যাইতে পারে।

জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দরিদ্র বালকদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। School Final পরীক্ষায় সার্টিফিকেটের সহিত দুরবস্থার পরিচায়ক সার্টিফিকেট দিতে হয়। দরিদ্র বালকদিগের জন্য "ছাত্র-নিবাস" আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত জার্ম্মাণিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করেন।

পৃথিবীর শিল্পবিষয়ক বিদ্যালয় মধ্যে জার্ম্মানির "Tachnische Hochschulen" সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এক একটী Hochschulen এক একটী বিশ্ব-বিদ্যালয়। শিল্পবিদ্যার শিক্ষা যেরূপ জার্ম্মাণিতে উন্নতি লাভ করিয়াছে ব্যবসাবাণিজ্যতেও তদ্রূপ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিল্প বিদ্যালয়গুলি Doctor of Engineering উপাধি দিবার অধিকার লাভ করিয়াছে।

জার্ম্মাণির শিল্প, বিশেষতঃ রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির একমাত্র কারণ উক্ত শিল্পবিষয়ক বিদ্যালয়গুলি। এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা যতদূর সম্ভব হাতে-কলমে দেওয়া হয়; শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ইহার ফলে সেমলিজ, নরেমবার্গ এসেন, লিপজিক, জেনা, বার্লিন প্রভৃতি জার্ম্মাণ নগরগুলি পৃথিবীর মধ্যে এক একটি বাণিজ্যের সুবৃহৎ কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে।

জার্ম্মাণিতে শিল্প শিক্ষা বিষয়ে স্কুল ও কারখানার মধ্যে যথেষ্ট আদান প্রদান আছে; পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি আছে। কারখানা হইতে ছাত্রগণ যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হন; যদি কোন দুষ্প্রাপ্য বিষয়ে কোন ছাত্র পরীক্ষা করিতে চান তাহা হইলে

কোন কারখানায় আবেদন করিলে তিনি অচিরে সেই সাহায্য প্রাপ্ত হন। যদি কোন কারখানার অধ্যক্ষ পরীক্ষার নিমিত্ত ল্যাবোরেটারী স্থাপন করিতে চান, তাহা হইলে সরকারের নিকট আবেদন করিলে সরকারের সাহায্যে অনায়াসে একটী অতি উত্তম ল্যাবোরেটারী স্থাপন করিতে পারেন।

জার্ম্মাণিতে শিল্প শিক্ষার দ্বার অবারিত; যে কেহ ইচ্ছা করিলে জার্ম্মান ল্যাবোরেটারীতে শিক্ষা করিতে পারে; কোনরূপ বাধা বিপত্তি নাই। অধ্যাপক লেবিক এই অবাধ শিক্ষা প্রথার প্রবর্ত্তক। এই অবাধ শিক্ষার ফলে জার্ম্মাণ দেশে শত শত উত্তম বৈজ্ঞানিক আবির্ভূত ও শত শত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জার্ম্মাণিতে শিল্পবিদ্যালয়ে দুই প্রকার পরীক্ষা আছে; দুই বৎসর শিক্ষার পর পরীক্ষা লওয়া হয় এবং চার বৎসর বিদ্যালয়ে ও এক বৎসর কোন কারখানায় শিক্ষার পর অন্য উচ্চতর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

এক্ষণে জার্ম্মাণিতে বিদেশীয়গণকে শিল্পশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে; এবং কতক শিল্প বিদ্যালয়ে বিদেশীয়দিগের প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

জার্ম্মাণীতে ১১টী টেকনিকাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ১০০০ অধ্যাপক ও ১৩৫০০ ছাত্র আছে; এবং এই ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায় ৩০৯০ বিদেশীয়।

শিল্পবিষয়ক অধ্যাপকদিগের সহিত অনেক কারখানার সম্পর্ক থাকে এবং তজ্জন্য ছাত্রদিগকে চাকরীর জন্য উমেদারী করিতে হয় না; শিক্ষালাভ শেষ হইলে অধ্যাপকগণ কোন না কোন কারখানায় নিজ নিজ ছাত্রদিগকে নিযুক্ত করিয়া দেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু

ভারতীয় আর্য্যদিগের স্বর্গ-রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান

(উত্তরকুরুবাসের শেষ প্রমাণ)

স্বর্গরাজ্য আকাশস্থিত পরমধাম ইহাই স্বর্গসম্বন্ধে শাস্ত্র বর্ণনার মূলমর্ম্ম। আমাদের প্রচলিত সংস্কার এই মর্ম্মের দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। এই আকাশধাম আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর নহে বলিয়া কেবল কল্পনারই বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কল্পনার বিষয় হইলেও ইহাকে আমরা সম্পূর্ণ অমূলক মনে করিতে পারি না। কারণ প্রকৃত বিষয়কে ভিত্তি করিয়াই কল্পনা আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বর্গ-কল্পনার মূলে কোন্ প্রকৃত বিষয় বর্ত্তমান্ তাহারই অনুসন্ধানে আমরা এখানে প্রবৃত্ত হইব।

স্বর্গ যে আদিতে আকাশস্থিত স্থান বিশেষ ছিল না পরন্তু মর্ত্ত্যেরই ভৌগোলিক স্থান বিশেষ ছিল ইহাই আমাদের মত। ইহার প্রমাণের জন্য প্রথমে আমরা কৈলাসের সম্বন্ধেই বিবেচনা করিব। কৈলাস শিবলোকের নাম। সুতরাং ইহা যে স্বর্গস্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কৈলাসের শাস্ত্র বর্ণনা পাঠ করিলে ইহাকে হিমালয়েরই শিখর বিশেষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যথা—

"সব্যে হিমবতঃ পার্শ্বে কৈলাসো নাম পর্ব্বতঃ।" ১

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৫১ অধ্যায়।

'সূত বলিলেন, হিমালয় শৈলের বাম পার্শ্বে কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত।'

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ভৌগোলিক আধুনিক কৈলাসের অপূর্ব্ব দৃশ্য সম্বন্ধে যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতেই কৈলাস কেন যে স্বর্গলোক রূপে কল্পিত হইয়াছে তাহা পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এখানে আমরা সেই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"In picturesque beauty, says H. Strachey, Kailas far surpasses the big Gurla or any other of the Indian Himalaya that I have seen it is full of majesty,—a King of mountains."

The Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India.

"বৃহৎ গুর্লা বা অন্য কোন ভারতীয় হিমালয় প্রদেশ যাহা আমি দর্শন করিয়াছি কৈলাস পর্ব্বত বিচিত্র সৌন্দর্য্য বিষয়ে ইহাদিগকে অতিমাত্রায়ই অতিক্রম করে। ইহা মহিমাময়—ইহা পর্ব্বত সকলের রাজা।"

এই বর্ণনা আমাদিগকে ভারতচন্দ্রের বর্ণনাই স্মরণ করাইয়া দেয় :—

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।

কৈলাসের বর্ত্তমান কিউন্‌লান্ (Kiun-lun) নাম কৈলাস নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

পার্ব্বতী হিমালয়ের কন্যা, শিব হিমালয়ের জামাতা। সুতরাং হিমালয়ের সহিত কেবল শিবলোকেরই যে সম্বন্ধ তাহা নহে প্রত্যুত শিবলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শিবদুর্গারও সম্বন্ধ। গৌরীশঙ্কর শিখর নামে হিমালয়ে

স্পষ্ট নিদর্শনই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে স্বর্গ ও স্বর্গাধিষ্ঠাতৃ দেবতার আমরা মর্ত্ত্যের সহিত যোগেরই প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি।

মহাভারতের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণের জন্য মহাপ্রস্থান করিয়া হিমালয়ের উত্তরেই স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শিব ও দুর্গা তান্ত্রিক দেবতা বলিয়া ইহাদের বিকাশ সর্ব্বশেষ হওয়াতে ইহাদের অধিষ্ঠান স্থানরূপ শিবলোকের কল্পনাও সর্ব্বশেষে হইয়াছে। তাহাতেই ইহার মধ্যে ভৌগোলিক নিদর্শন যেরূপ স্পষ্টতর লক্ষিত অপর কোন দেবলোকের ভৌগোলিক নিদর্শন তেমন স্পষ্টতর লক্ষিত নহে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিমূর্ত্তির আমরা এই যে ক্রম প্রাপ্ত হই, ইহা তাঁহাদের বিকাশের ক্রম বলিয়াও বুঝিতে হইবে। অতএব বিষ্ণুর বিকাশ যেরূপ শিবের পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্রূপ বিষ্ণুলোকও যে শিবলোকেরই সন্নিকটবর্ত্তী তাহা সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়।

"কৈলাস" যেমন "শিবলোক" তৎসন্নিহিত কাশ্মীরও যে তদ্রূপ বিষ্ণুলোক তাহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 'কৈলাস' নামের লস-ধাতু যেমন শোভার অর্থ প্রকাশ করে—'কাশ্মীর' নামের কাশ-ধাতুও তেমনই শোভার অর্থই প্রকাশ করে। অতুলনীয় অশেষ শোভার আধার বলিয়াই ইহাদের এইরূপ সৌন্দর্য্যপ্রকাশক নাম হইয়াছে। কাশ্মীর যে, ভূ স্বর্গনামে পরিচিত তাহাতেও ইহাকে স্বর্গরূপে কল্পিত

সম্ভবতঃ এখানে আসিয়াই আর্য্যগণ প্রথম সুদৃঢ়রূপে আপনাদের অধিকার স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হন। এখানে আসিয়া শত্রুভয় হইতে নিশ্চিন্ত হন বলিয়াই ইহাকে তাঁহারা 'বৈকুণ্ঠ' নামে আখ্যাত করেন। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের যোগার্থ 'বিগতা কুণ্ঠা উৎকণ্ঠা অত্র'। উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ বিগত হয় এইখানে। কাশ্মীরের রাজধানীর বিষ্ণু পত্নী লক্ষ্মীর "শ্রীনামে" যে 'শ্রীনগর' নাম পাওয়া যায় তাহাতেও ইহা বিষ্ণুলোকের পুরী বলিয়াই প্রমাণিত হয়। বিষ্ণুলোকের অপর এক নাম "গোলোক ধাম।" সম্ভবতঃ কাশ্মীরেই আর্য্যগণ বিশেষরূপে গোপালন করিতে আরম্ভ করেন। পুরাণে সুরভিকেই গোজাতির আদি জননীরূপে বর্ণিত দেখা যায় এবং গোলোকেই ইহার জন্মের কথা পাওয়া যায়, যথা :—

"গবামধিষ্ঠাতৃদেবী গবামাদ্যা গবাং প্রসূঃ।
গবাং প্রধানা সুরভী গোলোকে সা সমুদ্ভবা॥"
শব্দকল্পদ্রুমধৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে সুরভ্যুখ্যান ৪৪ অধ্যায়।

কাশ্মীরের নিকটে যে চমরী নামক বিশেষ জাতীয় গাভী দৃষ্ট হয় সুরভি সেই বিশেষ গাভী জাতিকেই বুঝায় বলিয়া বোধ হয়। ইহার বিশেষ বৈলক্ষণ্য হইতে ইহা যে স্বর্গীয় গাভীরূপে বিবেচিত হইবে, তাহা সম্পূর্ণই সম্ভবপর।

বৈকুণ্ঠের নৈঋতে সারস্বত লোকের উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়, যথা :—

"প্রাচ্যাং বৈকুণ্ঠলোকস্তু বাসুদেবস্য মন্দিরম্।
আগ্নেয্যাং লক্ষ্মীলোকস্তু যাম্যাং সঙ্কর্ষণালয়ঃ॥
সারস্বতস্তু নৈঋত্যাং প্রাদ্যুম্নঃ পশ্চিমে তথা।"
শব্দকল্পদ্রুমধৃত পদ্মপুরাণম্।

বৈদিক গ্রন্থ হইতে সরস্বতী নদী কাশ্মীর দেশে প্রবাহিত বলিয়া জানা যায়। ইহাতেও কাশ্মীর দেশই যে বিষ্ণুলোকের স্থান তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিষ্ণুর বিকাশ ইন্দ্রের বিকাশের পর হয়। সুতরাং বিষ্ণুলোকের ঊর্দ্ধদেশেই যে ইন্দ্রলোকের স্থান হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই ইন্দ্রলোকের স্থান আমাদিগের নিকট বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থান বলিয়াই মনে হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ক্যানিংহাম (Cunningham) আফ্‌গানি স্থানের প্রধান নগর কাবুলের প্রাচীন নাম যে "ঊর্দ্ধস্থান" আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আমাদের অনুমানকেই সপ্রমাণ করে। ইন্দ্রলোকের মধ্যে নন্দনকাননই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ স্থান। আফ্‌গানিস্থানে যে সমস্ত সুমিষ্ট ফলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর অন্য কোথায়ও সেরূপ সুমিষ্ট ফলের গাছ নাই। সুতরাং এই সমস্ত অপূর্ব্ব ফলের গাছই যে আফ্‌গানিস্থানকে স্বর্গকাননে পরিণত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? আফ্‌গানিস্থানের প্রধান দ্রাক্ষা (আঙ্গুর) ফল যে "অমৃত ফল" নামে অভিহিত হয়, তাহাতেও ইহাকে স্বর্গের ফল বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

প্রাচীন ভূগোলে আমরা 'উদ্যান' বলিয়া একটী স্থানের নাম প্রাপ্ত হই। ইহার সংস্থান এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে :—

"Udyan was situated to the North of Peshwar on the Swat river but it is probable that it covered the whole hill-region South of the Hindukush and the

Dard country from Chitral to Indus." The Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India by Nandolal Dey p. 96.

উপরি উক্ত বর্ণনায় 'উদ্যান' পেশোয়ারের উত্তর হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ইহাতে 'উদ্যান' ইন্দ্রোদ্যান নন্দনকাননেরই নামান্তর বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

আর্য্যজাতির ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি ভারতের আর্য্যগণ হিন্দুকুশ পরিত্যাগের পরই তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্র উপাসনার উৎপত্তি হয়। সুতরাং হিন্দুকুশের দক্ষিণ দেশই যে বিশেষরূপে ইন্দ্রের অধিষ্ঠিত স্থান হইবে তাহা আনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। পুরাণে আমরা যে হরিবর্ষের নাম প্রাপ্ত হই তাহা হিন্দুকুশের দক্ষিণস্থ পূর্ব্বোক্ত দেশ বলিয়াই বোধ হয়। হরি শব্দের এক অর্থ ইন্দ্র। কালিদাস রঘুবংশে এই অর্থে হরি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন যথা—

"হরিং বিদিত্বা হরিভিশ্চ বাজিভিঃ॥"

৪৩—রঘুবংশম্—৩য় সর্গঃ।

"কপিলবর্ণ অশ্বের দ্বারা তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়া।"

হরিবর্ষ সুতরাং আমাদের নিকট হরি বা ইন্দ্রের বর্ষ বা স্থান বলিয়াই মনে হয়। হিন্দুকুশের দক্ষিণেই আফ্‌গানি স্থান অবস্থিত বলিয়া এই আফ্‌গানিস্থানকেই হরিবর্ষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রের নন্দনকাননের প্রধান পাঁচটী বৃক্ষই পঞ্চ দেবতরু বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথা:—

"পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।

পঞ্চ দেবতরুর মধ্যে ইন্দ্রের হরিনামানুসারেই 'হরিচন্দন" নাম হইয়াছে এই জন্যই ইহার অপর নাম ইন্দ্রচন্দনও পাওয়া যায়।

বল্‌খ বা বাহ্লিক আফ্‌গানিস্থানেরই অন্তর্গত। বাহ্লিক এক সময়ে উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা হইতেই অশ্বোত্তম উচ্চৈঃশ্রবা ইন্দ্রের বাহন হইয়া থাকিবে। অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা যেমন ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত গজও তেমনি তাঁহার বাহন। সম্ভবতঃ অশ্বের ন্যায় গজও এই সময়ে আর্য্যদিগের দ্বারা পালিত হইত। আফ্‌গানিস্থানের অন্তর্গত গজ্‌নি নামক স্থানে গজ রক্ষিত হইত বলিয়াই ইহারি এই নাম হইয়া থাকিবে। ইন্দ্রের পুরী "অমরাবতী" নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে জালালাবাদের প্রাচীন নাম অমরাবতী পাওয়া যায়। "প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভৌগলিক অভিধান" নামক গ্রন্থে বর্ত্তমান জালালাবাদের প্রাচীন নাম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

'Jalalabad.........Nagarhara; at the confluence of the Surkha or Surkhund and Kabul rivers. It is also called Amaravati in one of the Jatakas,"

The Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India (by Nandalal Dey of the Bengal Judicial Survice) Appendix p. 36.

আফ্‌গানিস্থানকে যে আমরা ইন্দ্রের হরিনামানুসারে "হরিবর্ষ" বলিয়া অনুমান করিয়াছি ইহার অন্তর্গত হিরাট্‌ নামক স্থানে সেই হরিনামেরই নিদর্শন বিদ্যমান বলিয়া বোধ হয়।

যায় তাহাতে ইহাকে দেবস্থান বলিয়াই বুঝিতে পারা যায় ; যথা—

"অতঃপরং কিম্প রূষাহ্বরিবর্ষং প্রচক্ষ্যতে।
মহারজত সঙ্কাশা জায়ন্তে তত্রমানবাঃ॥ ৮
দেবলোকাচ্চ্যতাঃ সর্ব্বে দেবরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ।
হরিবর্ষে নরাঃ সর্ব্বে পিবন্তীক্ষুরসং শুভম্॥" ৯
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫০ অধ্যায়।

"ইহার পর আমি হরিবর্ষের কথা কহিতেছি। এই হরিবর্ষে রজতসম প্রভাবিশিষ্ট মনুষ্যগণ জন্মিয়া থাকে। এখানকার সকল মনুষ্যই দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট দেবাকৃতি ও দেবসম দীপ্তিমান্। ইহারা সকলেই ইক্ষুরস পান করে।" বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

এখানে হরিবর্ষের লোকদিগকে যে দেবলোক হইতে চ্যুত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে হিন্দুকুশ হইতে ভারতাভিমুখে অগ্রসর আর্য্যগণই যে লক্ষিত হইতেছে তাহার স্পষ্ট আভাসই পাওয়া যায়। হরিবর্ষের লোক সকল রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় ইহারা যে উত্তরকুরুবাসী প্রকৃত আর্য্যজাতি তাহা নিঃসন্দেহরূপেই প্রতীয়মান হয়। ইহাদের ইক্ষুরস পানের কথায় আফ্‌গানিস্থানের সুস্বাদু ফল সকলের সুমিষ্ট রসপানের আভাসই আমরা পাইতেছি।

ইন্দ্রলোকের উপরে ব্রহ্মলোকের স্থান। ইন্দ্রলোক যখন হরিবর্ষ বা আফগানিস্থান বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে—তখন হরিবর্ষের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষের যে বর্ণনা পুরাণে পাওয়া যায় তাহাই ব্রহ্মলোক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। এস্থলে আমরা ইলাবৃত বর্ষের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

মধ্যমং যন্ময়া প্রোক্তং নাম্নাবর্ষমিলাবৃতম্। ১১
ন তত্র সূর্য্য স্তপতি নচজীর্য্যন্তি মানবাঃ।
চন্দ্র সূর্য্যা সনক্ষত্রাবপ্রকাশাবিলাবৃতে॥ ১২
পদ্মবর্ণাঃ পদ্মপ্রভাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ।
পদ্মপত্র সুগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥ ১৩
জম্বুফলরসাহারা হ্যনিষ্যন্দাঃ সুগন্ধিনঃ।
মনস্বিনোভুক্তভোগাঃ সৎকর্ম্মফলভোগিনঃ॥ ১৪
দেবলোকাচ্চ্যতাঃ সর্ব্বে জায়ন্তে হ্যজরামরাঃ।
ত্রয়োদশ সহস্রাণি বর্ষাণান্তে নরোত্তমাঃ॥ ১৫
আয়ুঃ প্রমাণং জীবন্তি তেতুবর্ষেত্বিলাবৃতে।
মেরোঃ প্রতিদিশং যচ্চ নবসহস্র বিস্তৃতে॥ ১৬
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫০ অধ্যায়।

ইতিপূর্ব্বে যে, সকলের মধ্যবর্ত্তী বর্ষের কথা কহিয়াছি, তাহা "ইলাবৃত" নামে খ্যাত। এখানে সূর্য্যের তাপ নাই ; চন্দ্র, সূর্য্য বা নক্ষত্র কখনও উদিত হয় না। এখনকার মনুষ্যেরা সকলেই পদ্মপলাশবৎ অক্ষিবিশিষ্ট, পদ্মবর্ণ, পদ্মবৎ সুগন্ধবিশিষ্ট ও উদারচিত্ত। ইহারা সকলেই সৎকর্ম্ম বলে জম্বুফলরস পান করিয়া নানা সুখভোগ করিয়া থাকে। দেবলোক হইতে বিচ্যুত শ্রেষ্ঠ মনুষ্যেরা এখানে জন্ম লইয়া অজীর্ণ কলেবর ও জরামরণ বিহীন হইয়া ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকে। এই বর্ষ মেরুশৈলের চারি দিকে বিরাজমান। মেরুর প্রত্যেক দিকে ইহার বিস্তার নবসহস্র যোজন। —বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

উদ্ধৃতবর্ণনা হইতে ইলাবৃত যে মেরুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বর্ষ তাহাই জানিতে পারা যায়। এই বর্ষে সূর্য্যোদয় হয় না বা সূর্য্যের উত্তাপ অনুভূত হয় না ইত্যাদি বৃত্তান্ত হইতে বর্ত্তমান মেরু-প্রদেশে যেরূপ ছয় মাস সূর্য্য সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে এবং অপর ছয় মাস সূর্য্য উদিত হইলেও বহুদূরবর্ত্তী থাকায় ইহার প্রখরতা অনুভূত হয় না—ইলাবৃত বর্ষেও যে তদ্রূপই হইত তাহাই বুঝিতে পারা যায়। উত্তরকুরু, মেরু সন্নিহিত বলিয়া ইহা যে ইলাবৃতেরই অন্তর্গত ছিল তাহাই সম্পূর্ণ

সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। আর্য্যগণ আদি মেরুস্থান হইতে নূতন বাসস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়াতেই যে তাঁহারা ইলাবৃতের স্বর্গভ্রষ্ট অধিবাসীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন তাহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। ইলাবৃতের লোক সকল অজয় অমররূপে উল্লিখিত হওয়ায় ইঁহাদিগের মধ্যে যে দেবত্ব আরোপিত হইয়াছে, ইহাও সহজ বোধ্য।

মেরুর দক্ষিণবর্ত্তী ইলাবৃত বা উত্তরকুরুই যে ব্রহ্মলোক এক্ষণে আমরা তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইব। প্রথমেই আমরা "ইলাবৃত" শব্দের মূলার্থ নিরূপণের চেষ্টা করিব। "ইলাবৃত" শব্দ ইলা ও বৃত এই দুই শব্দযোগে নিষ্পন্ন। ইলা শব্দের অর্থ 'বাক্য,' বৃত শব্দের অর্থ 'বেষ্টিত'। সুতরাং ইলাবৃত শব্দের অর্থ বাক্য দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু দেশ, বাক্যদ্বারা বেষ্টিত হওয়ার অর্থ পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হয় না। ইলা শব্দের যে দুইটী রূপান্তর আছে তাহাদের সহিত যোগ করিয়া ইলাবৃতের ব্যাখা করিলে ইহার সদর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

"রলয়োরভেদঃ"—'র' ও 'ল' অভিন্ন এই ন্যায়ে যেমন ইলা শব্দের রূপান্তর ইরা পাওয়া যায়—তেমনই 'ডলয়োরভেদঃ' এই ন্যায়ে ইলা শব্দের রূপান্তর 'ইড়াও' পাওয়া যায়। ইলা শব্দের ন্যায় ইরা শব্দের অর্থ ও বাক্য এবং ইড়া শব্দেরও অর্থ বাক্যেরই অনুরূপ 'স্তুতি।' ইরা শব্দের এক অর্থ 'সরস্বতী'ও দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী আমরা বৈদিক এক নদীর নামও প্রাপ্ত হই। ইরা শব্দের যে এক অর্থ জল আছে, (১) যাহা ইরাবতী শব্দে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইতেও নদী অর্থ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং ইলাবৃত আমাদের নিকট সরস্বতী বেষ্টিত দেশ বলিয়াই বোধ হয়। সরস্বতীর তীরে আর্য্যগণ স্তুতি করিয়া দেবতাদিগের উপাসনা করিতেন। ইড়া বা ইলা শব্দে এই দেবস্তুতির অর্থই পাওয়া যায়। বেদে স্তুতি বুঝাইতে 'ব্রহ্ম' শব্দেরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং "ইলাবৃত" স্তুতি বা ব্রহ্মবহুল দেশই হয়। স্তুতিবাচক ব্রহ্ম হইতেই দেবরূপ 'ব্রহ্মা' ও ব্রহ্মের বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং ইলাবৃত ব্রহ্ম বা স্তুতির দেশ হইতে যে ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম দেবতার দেশ হইবে তাহা সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়। মনুসংহিতায় আমরা আর্য্যদিগের প্রথমাধিষ্ঠানের যে "ব্রহ্মাবর্ত্ত" নাম প্রাপ্ত হই তাহা আমাদিগের নিকট 'ইলাবৃত' বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্মাবর্ত্তের সংস্থান মনুসংহিতায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"

"সরস্বতী দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যস্থলের দেবনির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে।"

ইলাবৃত যেরূপ স্বর্গভ্রষ্ট লোকদিগের বাসস্থান বলিয়া স্বর্গতুল্যরূপে পুরাণে উক্ত হইয়াছে এস্থলে ব্রহ্মাবর্ত্তকে দেবনির্ম্মিত দেশ বলাতে তাহাও তদ্রূপ স্বর্গস্থ স্থানই হইতেছে। সরস্বতী নদী মেরু সন্নিহিত প্রদেশে প্রবাহিত বলিয়াই পুরাতত্ত্ব বিদ্দিগের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়। (২)

(১) "ইরা ভূবাক্ সুরাপ্স স্যাৎ।"

(২) বিশ্বকোষ।

সুতরাং সরস্বতী নদী বেষ্টিত স্থানই ইলাবৃত বা ব্রহ্মাবর্ত্ত তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

"ব্রহ্মাবর্ত্ত" যেরূপ 'দেবনির্ম্মিত দেশ' রূপে বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে ইহা যে "ব্রহ্মলোক" বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে অসম্ভাব্য কিছুই নাই। ব্রহ্মকুণ্ড বা ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গঙ্গার প্রকৃত উৎপত্তিস্থান মধ্য আসিয়ার বর্ত্তমান সরীকুলহ্রদ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার পৌরাণিক নাম বিন্দু-সরোবর। ইহাতে ব্রহ্মাবর্ত্ত বা ব্রহ্মলোক যে এক সময়ে মেরু হইতে মধ্য আসিয়ার বিন্দু-সরোবর বা সরীকুল হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মার সহিত সরস্বতীর যে যোগ দেখা যায় ব্রহ্মাবর্ত্তের সহিত সরস্বতী নদীর যোগে তাহার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়।

ইলাবৃতের পরই মেরু। এই মেরুদেশ সুমেরু পর্ব্বতের উপর অবস্থিত বলিয়া 'সুমেরু' নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। এই মেরু আর্য্যদিগের মূলস্থান বলিয়া ইহা 'সুরালয়' বা স্বর্গ নামে বিদিত হইয়াছে যথা—

"মেরুঃ সুমেরুর্হেমাদ্রী রত্নসানুঃ সুরালয়ঃ॥"
অমরকোষ।

বেদের দেবগণের প্রথম বিকাশও উপাসনা এই সুমেরুতেই হয় বলিয়া ইহা প্রথম দেবস্থানরূপেই সুরালয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর্য্যদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া সুমেরুতেই যে স্বর্গের প্রথম কল্পনা হইবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। ক্রমে আর্য্যগণ সুমেরু হইতে যতই দক্ষিণে সরিয়া আসিয়াছেন ততই স্বর্গস্থান দক্ষিণে স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে কৈলাসে আসিয়া শেষ হইয়াছে। সুতরাং আর্য্যদিগের বিশাল স্বর্গরাজ্য যে সুমেরু হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত প্রসারিত তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই বিশাল ভূভাগের ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক প্রদেশই ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক ও শিবলোক প্রভৃতি দেবলোকরূপে বিভক্ত হইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তির বিকাশ হইতে এই প্রধান তিন দেবতার অধিষ্ঠিত স্থান বলিয়াই স্বর্গরাজ্যের এক নাম "ত্রিদিব" হইয়াছে।

শিবলোকই স্বর্গের শেষলোক বলিয়া হিমালয়ে ইহার ভৌগোলিক সংস্থান সুস্পষ্টরূপেই পরিলক্ষিত হয়। হিমালয়ের এক অংশের নাম "রুদ্র-হিমালয়" পাওয়া যায়। ইহার পাঁচটি শিখরের নাম রুদ্র-হিমালয়, ব্রহ্মপুরী, বিষ্ণুপুরী, উদ্গোরীকান্ত, ও স্বর্গারোহিণী।—

The Rudra-Himalaya has five principal peaks called Rudra-Himalaya (the eastern peak), Burram-poori, Bissen-poori, Oodguri-kanta, and Swarga-rohini (the western and nearest peak). These form a sort of semicircular hollow of very considerable extent filled with eternal snow, from the gradual dissolution of the lower parts of which the principl part of the stream is generated. (Frazer's Himalaya Mountains) The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India by Nundolal Dey.

এখানের বর্ণনায় জানিতে পারা যায়

যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি শিখর বিশাল অর্দ্ধবৃত্তাকার ও চিরতুষারাচ্ছন্ন এবং ইহাদের নিম্নদেশের বরফ গলিয়াই গঙ্গার প্রধান স্রোতের উৎপত্তি হইয়াছে। গঙ্গা নদী শিবের জটা হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার যে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে এখানেই আমরা তাহার ভৌগোলিক ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইতেছি।

রুদ্র-হিমালয়ের পঞ্চশিখরের নাম হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শিবলোক শেষ স্বর্গলোক বলিয়া এবং হিমালয়ে ইহার অবস্থিতি বলিয়া হিমালয়েই রুদ্রলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক এবং স্বর্গলোক, সমস্ত লোকেরই একত্র সমাবেশ হইয়া ইহাকেই সংক্ষিপ্ত স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়াছে। এমন কি সুমেরু পর্ব্বত পর্য্যন্ত হিমালয়েই কল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রুদ্রহিমালয়ের গঙ্গাবতরণস্থানেরই আমরা 'সুমেরু পর্ব্বত' বলিয়া নাম করণ দেখিতে পাই। "প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভৌগোলিক অভিধান" গ্রন্থে সুমেরু পর্ব্বত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।—

Sumeru Parvata—The Rudra Himalaya where the river Ganges has got its source.

এই প্রকারে যে মেরু বা সুমেরুকে আমরা প্রথম স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছি—তাহা অবশেষে হিমালয়েই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উত্তর দিকের সহিত আর্য্যদিগের সংস্রবরহিত হওয়াতেই পরিশেষে তাঁহারা সমগ্র স্বর্গরাজ্য হিমালয়েই কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে হিমালয়ে যেমন আমরা শিবলোকের প্রকৃত ভৌগোলিক সংস্থানের প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি তেমনই ইহাতে অপর স্বর্গলোকের ভৌগোলিক সংস্থানের প্রকৃত সন্ধানও প্রাপ্ত হইতেছি।

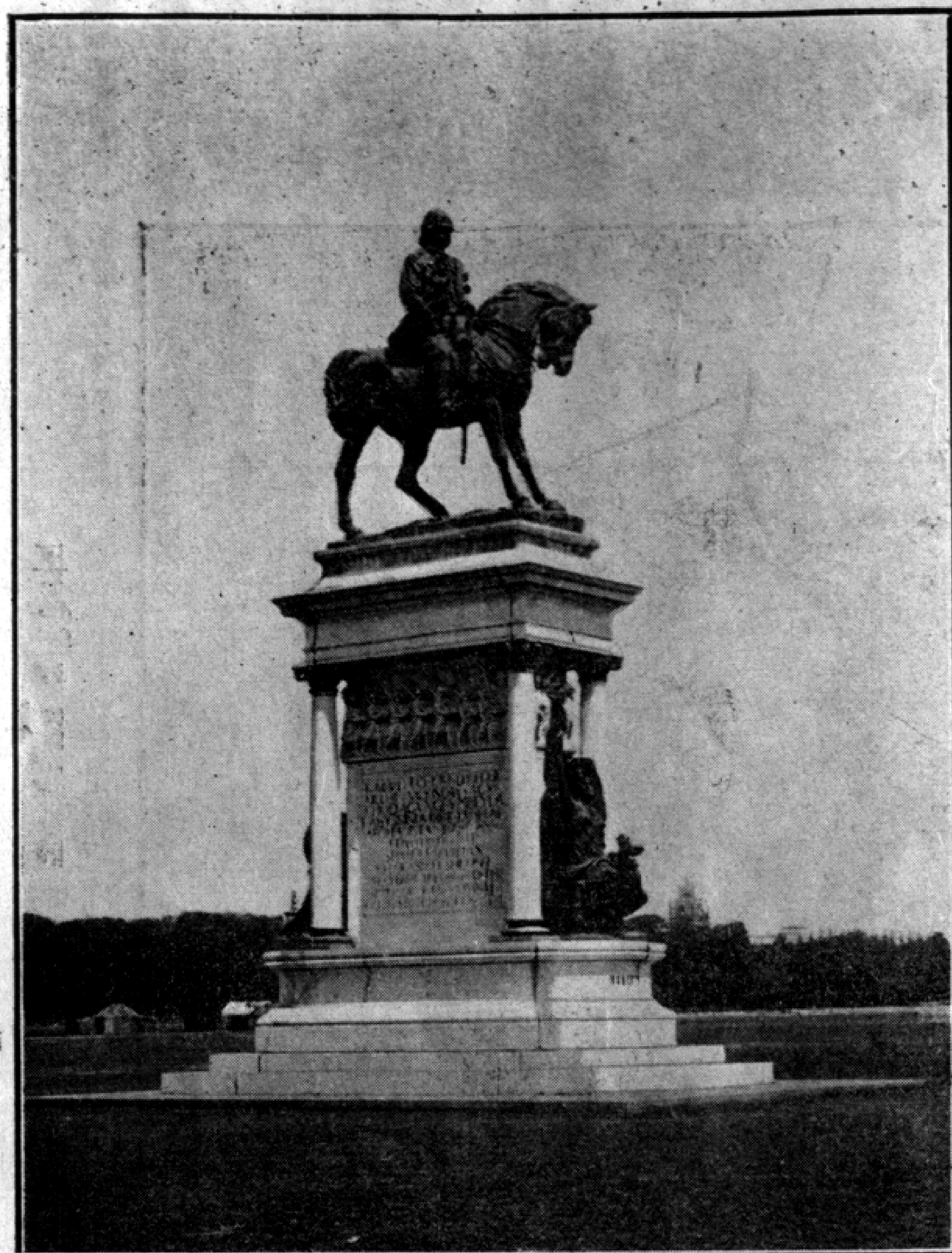
শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গড়ের মাঠ

(৩)

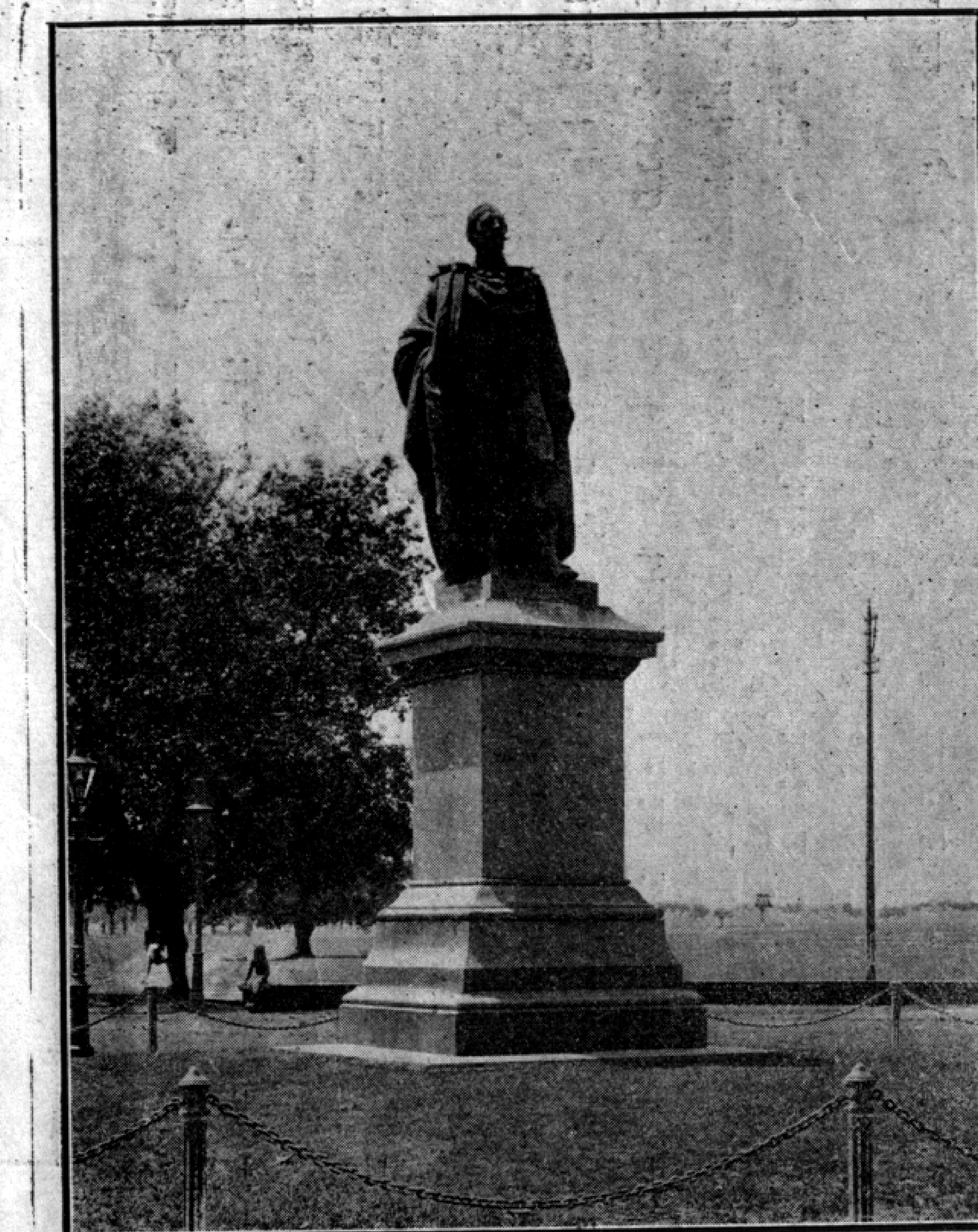
ফোর্ট উইলিয়মের প্লাসি গেটের ধারে লর্ড ডফেরিনের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ১৮৮৪—৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ক'রে ইনি মার্কুইস্ উপাধি লাভ করেন। ভারতের স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার সাহায্য কল্পে যে একটি ফণ্ড্ বর্ত্তমান আছে তাহার প্রতিষ্ঠাতা লেডি ডফেরিন। লর্ড ডফেরিনের শেষ জীবন সুখে কাটে নাই। তাঁর বড় ছেলে আর্ল অফ্ আভা (Earl of Ava) দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন;—এ ছাড়া তিনি লণ্ডন এবং গ্লোব ফাইন্যান্স কর্পোরেসনের (London & Glove Finance Corporation) সভাপতি হওয়ার অল্পদিন পরেই এ সভার অস্তিত্ব লোপ পাওয়ায় তাঁকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছিল।

রেড রোড দিয়ে, সেখান হতে ফেরবার পথে অশ্বোপরি ফিল্ড মার্শেল আর্ল



আর্ল রবার্টস্

(ফিল্ড মার্শেল)



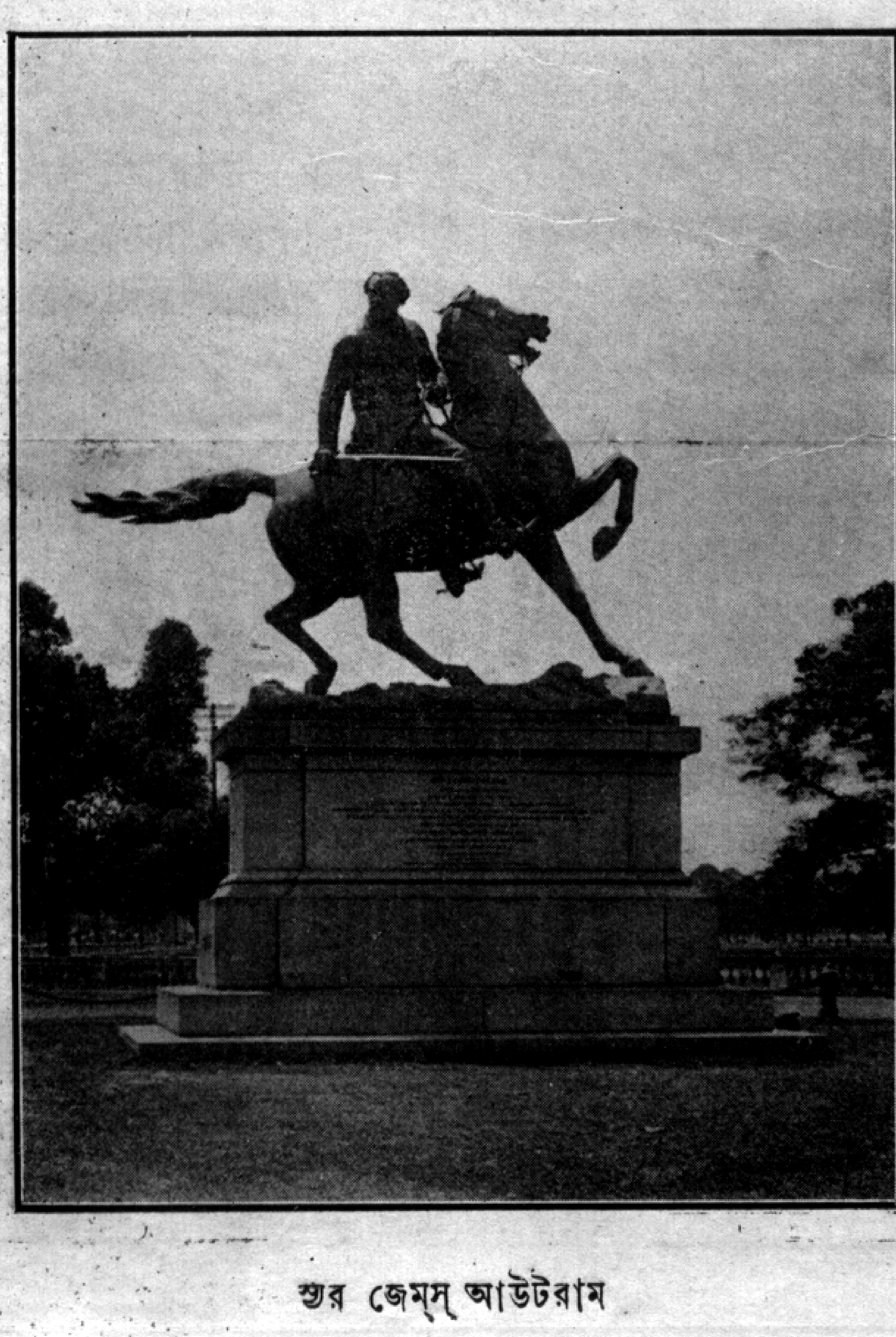
মার্কুইস্ অফ্ ডফেরিন

রবার্টস্ এবং মা ইস্ অফ ল্যান্সডাউনের প্রস্তর মূর্ত্তি মুখোমুখি সংস্থাপিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আর্ল রবার্টস্ ভারতের সেনানায়ক ছিলেন। ভারত-সাম্রাজ্যকে ইনি নূতন রাজ্য ও নূতন সম্মানে ভূষিত করেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র স্বদেশের কাজের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

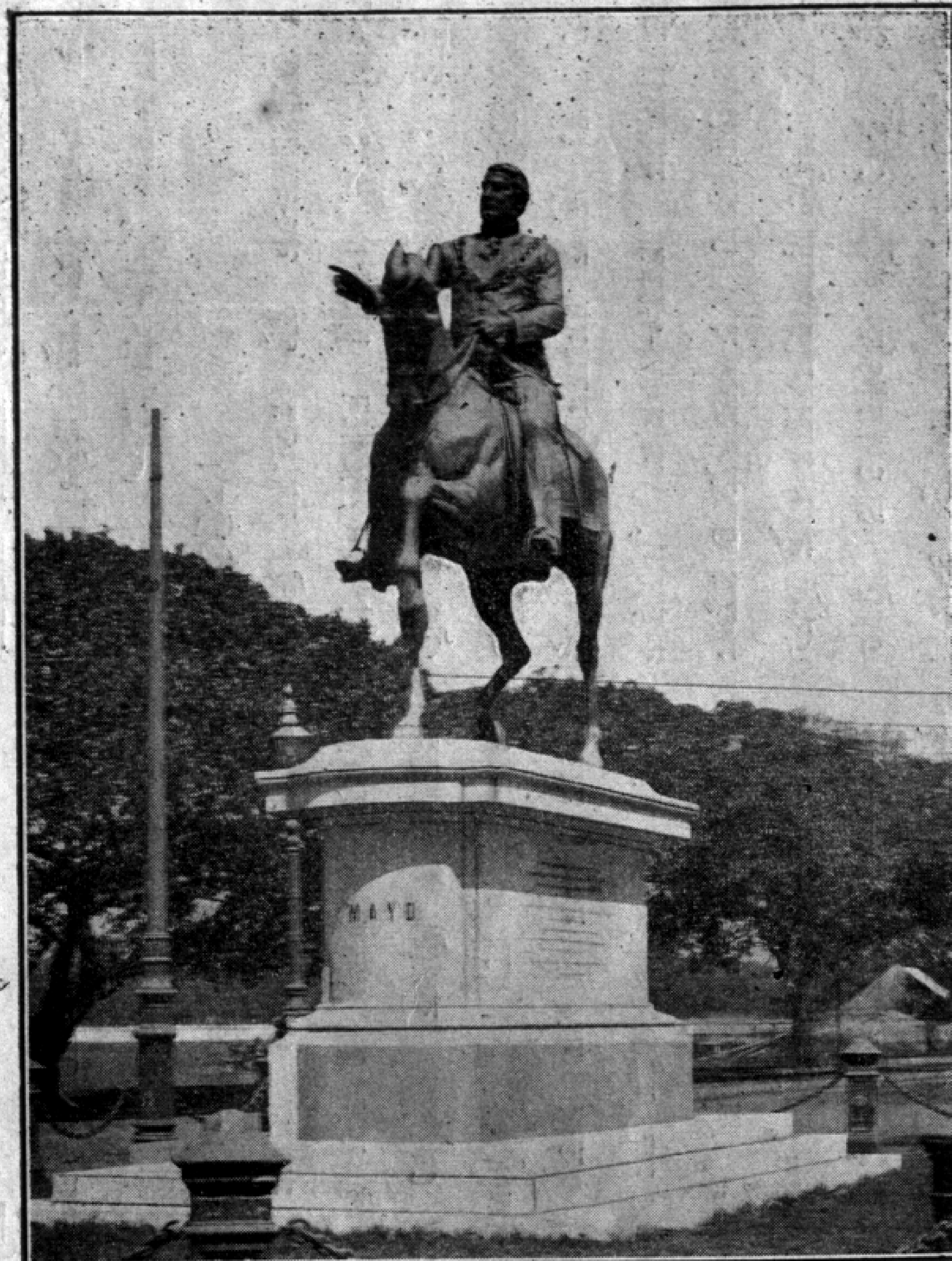
লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৮-৯৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন।—ইনি বর্ত্তমান কালে একজন স্বনামখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরেই এঁর পুত্রের সঙ্গে আমাদের ভূতপূর্ব্ব লাটসাহেব লর্ড মিন্টোর কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে।

তার পর আর্ল অফ্ মেয়ো। Earl of Mayo ১৮৬৯-৭২ খৃষ্টাব্দে এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এঁর রাজত্বকালে দেশে কোনও রূপ যুদ্ধ বিগ্রহ বা অশান্তি ছিল না। সহসা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, ৮ই ফেব্রুয়ারী গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

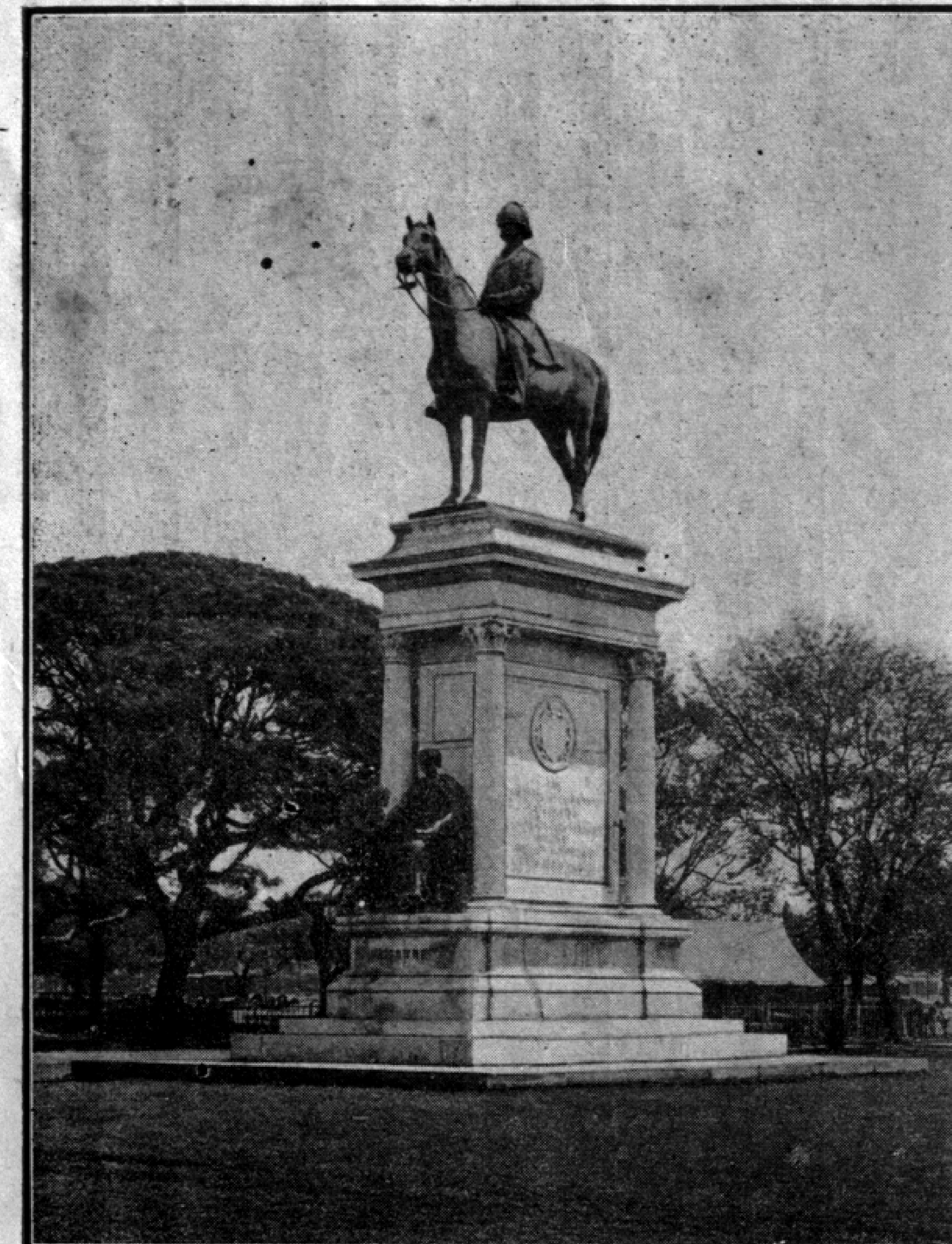
পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে স্যর জেমস্ আউট-রামের প্রতিমূর্ত্তি। তিনি একজন বীরপুরুষ ও মহাপুরুষ ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌনগরীতে বিপক্ষের অগ্নিবর্ষণের



স্যর জেমস্ আউটরাম



আর্ল অফ্ মেয়ো



মার্কুইস্ অফ্ ল্যান্সডাউন

ভিতর দিয়ে তিনি যেরূপ অসম সাহসে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে সৈনিকদের বিশেষ লোভনীয় অতি উচ্চ সম্মান প্রদান করবার প্রস্তাব করা হয়। সে সম্মান প্রত্যাখ্যান করে ইনি বিশেষ মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়ে গেছেন।

গড়ের মাঠের এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে দুএকটি মূর্ত্তির অভাব আমাদিগকে বড়ই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। ভুতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরেলদের মধ্যে লর্ড ক্যানিং এবং লর্ড রিপণের মুর্ত্তি এখানে নাই, অথচ তাঁরা দুই জনেই কিরূপ সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা ছিলেন তা সকলেই জানেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যদি লর্ড ক্যানিং শাসনকর্ত্তা না থাকতেন তবে পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয় হত তা সহজেই অনুমান করা যায়। লর্ড রিপণের মহানুভবতা ও সাম্যনীতি ভারতবাসীর হৃদয় এখনো ভক্তি পূর্ণ ক'রে রেখেছে। অথচ এই দুই জনেরই স্মৃতিচিহ্ন গড়ের মাঠে নাই। ইহা কি ন্যায়ধর্ম্মবাদী গুণগ্রাহী ব্রিটিসরাজের পক্ষে কলঙ্কের কথা নয়। আশাকরি এমন এক দিন আসবে যখন তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই দুই মহাপুরুষের সম্মান করবেন।

নবাব

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাদাম জাঁসুলে।

বারো বৎসর পূর্ব্বে নবাবের বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রীর কথা পারির বন্ধুমহলে নবাব একদিনও প্রকাশ করেন নাই। তাহার কারণ ছিল। সমাজে-মজলিসে কুলমহিলার প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করাটা প্রাচ্যজাতির স্বভাব নহে। নারী ঘরের লক্ষ্মী, ঘরের অধীশ্বরী। বাহিরে তাহার কথা লইয়া হাস্য কৌতুক করাটা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বলিয়াই তাহাদের ধারণা। বহুকাল প্রাচ্যজাতির সংসর্গে থাকিয়া প্রাচ্যজাতির এই বিশেষত্বটুকু নবাবেরও প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই মাদাম জাঁসুলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পারির বন্ধুমণ্ডলী সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

তাই যখন সহসা একদিন তাহারা শুনিল, মাদাম জাঁসুলে আসিতেছেন, তখন বিস্ময়-কৌতূহলে পরস্পরের চোখে-চোখে একটা চাওয়া-চাওয়ি হইয়া গেল। গৃহেও একটা নূতন সম্ভাবনার সাড়া উঠিল। ঘর দ্বার সংস্কৃত ও সুসজ্জিত করা, চাকর-দাসীর সংখ্যা বাড়ানো, আসবাব-পত্রের নব-আবির্ভাবে গৃহলক্ষ্মীর অভিনন্দনের সূচনা দেখা গেল। একদিন সকলে শুনিল মার্শেল হইতে স্পেশাল ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত; গাড়ী ও লোকজন ষ্টেশনে ছুটিল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই নবাবের গৃহ নব-কলরোলে মুখর হইয়া উঠিল।

সঙ্গে নিগ্রো দাস-দাসী, অঙ্গে অলঙ্কারের বিপুলতা লইয়া স্থূল-দেহা মাদাম জাঁসুলে নবাবের সজ্জিত প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

ট্রেণের এই সুদীর্ঘ যাত্রায় মাদামের অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইয়াছিল। ক্লান্ত স্থূল দেহ-খানাকে টানিয়া সোপান অতিক্রম করিয়া ত্রিতলে অধিরোহণ করা মাদামের শক্তিতে কুলাইল না। দুইজন নিগ্রো বান্দা চেয়ার ধরিল; মাদাম তাহাতে উপবেশন করিলে বান্দাদ্বয় সেই চেয়ারে করিয়া মাদামকে উপরে লইয়া গেল। মাদামের স্থূল দেহ দেখিয়া তাঁহার বয়স নির্ণয় করা সুকঠিন—পঁচিশ হইতে চল্লিশ অবধি যে কোন বছরই খাটিতে পারে। মুখশ্রী ভালো, চোখ টানা হইলেও তাহাতে ভাবের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। পোষাক ও অলঙ্কারের বাহুল্যের মাত্রা এমনই অতিরিক্ত যে প্রথম দর্শনেই দর্শকের তাক্ লাগিয়া যায়। এত ঐশ্বর্য্য বহিয়া বেড়ায় —এ যেন একটা সিন্দুকের মত—যেমন প্রকাণ্ড তেমনই সসার !

মাদাম এক ধনী বেলজিয়ানের কন্যা। টিউনিসে মাদামের পিতার কোরালের প্রকাণ্ড কারবার ছিল। জাঁমুলে ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়া এখানে কয়েক মাস চাকুরি করিয়াছিলেন, মাদামোসেল আফ্‌সিন্—মাদামের কুমারী নাম—তখন দশ বৎসরের বালিকা মাত্র। বর্ণে অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য, মাথায় কেশের রাশি, সমস্ত অবয়বে স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণ ছায়া লইয়া মাদামোসেল আফ্‌সিন্ প্রকাণ্ড ব্রুহামে চড়িয়া প্রতি সন্ধ্যায় পিতার অফিসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত। তখন অফিসের ছুটীর সময়। ভাগ্যান্বেষী জাঁমুলে সারাদিনের পরিশ্রমের পর অফিস হইতে বাহির হইবার সময় প্রত্যহই এই দশমবর্ষীয়া সুন্দরী বালিকাটি কৌতূহলী নেত্রের সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেন। বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য, বালিকার কমনীয় গৌর কান্তি তরুণ জাঁমুলের মনের উপর ধীরে ধীরে আপনার প্রভাবটুকু বিস্তার করিতেছিল। ক্রমে এমন হইল, অফিসে কাজের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিবার সময় জাঁমুলে অধীর ভাবে সন্ধ্যার এই মধুর ক্ষণটুকুর প্রত্যাশা করিত! কখন্ সন্ধ্যা আসিবে, অফিসের ছুটী হইবে এবং অফিসের ফটকের সম্মুখে ব্রুহামে উপবিষ্টা এই বালিকাকে জাঁমুলে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবে।

এমনই ভাবে দিন কাটিতেছিল। চক্ষু প্রত্যহই এই রূপ-সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়া যায়; মনের শ্রান্তি ঘুচাইয়া দেয়। জাঁমুলে শুধু সেইটুকু পাইয়াই আপনার জীবন সার্থক জ্ঞান করে। এদিকে বালিকার বয়স যে বাড়িয়া উঠিতেছিল, যৌবন সযত্নে তাহার তুলিকা বুলাইয়া এক অপরূপ মাধুরীতে বালিকার অঙ্গ নিখুঁত ভাবে ভরিয়া তুলিতেছিল, মুগ্ধ জাঁমুলে তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন পারিল।

সেদিন সারা আকাশ এক অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটায় সাজিয়া উঠিয়াছিল। নব বসন্তের স্নিগ্ধ সমীর উতলা বহিতেছিল। অফিসের দেওয়াল-গাত্রে সংলগ্ন লতার ফাঁকে গোলাপী ফুলের গুচ্ছে রঙীন্ ঢেউ ছুটিয়াছিল। কিশোরী আফ্‌সিনের প্রাণেও প্রকৃতি বুঝি সেদিন একটা দোলা দিয়া গিয়াছিল। আফ্‌সিন ঐ গোলাপী ফুলের একটা গুচ্ছ-সংগ্রহের জন্য গাড়ীতে বসিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। জাঁমুলে আসিয়া তাহার পানে

চাহিতেই আফ্‌সিন্ তাহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিল। জাঁম্লুলের প্রাণ সহসা যেন এক সোনালি নেশায় ভরিয়া উঠিল। তাহার শিরাগুলার রক্ত তালে তালে নাচিয়া ছুটিল। পা তাহার কাঁপিতেছিল। সে নিকটে দাঁড়াইলে আফ্‌সিন্ আর কথা কহিতে পারিল না—শুধু ফুলগুলার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া একটা ইঙ্গিত করিল। জাঁম্লুলে বুঝিল। সে ক্ষিপ্র হস্তে একটা গুচ্ছ ছিঁড়িয়া লইয়া আফ্‌সিনের হাতে ধরিল। আফ্‌সিন্ ফুল লইয়া মৃদু হাসিল। ঐ হাসি! অনঙ্গ এই মধুর ক্ষণটুকুরই প্রতীক্ষা করিতেছিল!—সে তাহার ধনুর ছিলায় টান দিল। জাঁম্লুলের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে কোনমতে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, এ যেন কোন্ নন্দনের অপ্সরী সুধার পাত্রখানি হাতে ধরিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত! জাঁম্লুলে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। চারিদিকে চাহিয়া অতিসন্তর্পণে আফ্‌সিনের হাতখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাতে মৃদু চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিল। তাহার মনে হইল, স্বর্গ যেন আজ কোন্ সুদূর লোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে! আফ্‌সিনেরও দেহ কাঁপিয়া উঠিল। তাহার বুকের মধ্যটা দুলিয়া উঠিল। সে মুখ নত করিল—জাঁম্লুলের দিকে আর চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না।

তাহার পর শুধুই আলো, শুধুই হাসি, শুধুই আনন্দ! এ আনন্দ চরম সার্থকতা লাভ করিল সেইদিন, যেদিন আফ্‌সিনের সহিত মহাসমারোহে জাঁম্লুলের জীবন-গ্রন্থি বাঁধা পড়িল। এই বিবাহ আশ্রয় করিয়াই জাঁম্লুলে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা-আহরণে সক্ষম হইল।

তাহার পর ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে নবাব পারিতে আসিলেন। মাদাম কিন্তু টিউনিসেই রহিলেন। দুই জনের মনের এই মিলটুকু চিরদিনই ছিন্ন রহিয়া গেল! পারিতে না থাকিলে নবাবের চলে না—অতুল ধনের অধিকারী হইয়া নির্ব্বাসিতের মত দিন কাটাইয়া তৃপ্তি নাই। যশ চাই, কীর্ত্তি চাই। দশজনকে দেখিয়া দেখাইয়া তবেই না ধনের গৌরব! নবাব পারিতে আসিলেন। মাদামের এ সব ভালো লাগে না। ব্যস্ত পারির উত্তাল কোলাহল-কল্লোলে এই ধরণীর নিভৃত কোণ-অধিবাসিনীর সহ্য হয় না! নিরালা টিউনিসের মাটিই তাহার আরামের। মাদামের কাজেই আসা ঘটিল না। পুত্র কন্যা লইয়া তিনি টিউনিসে রহিয়া গেলেন। নবাব একেলা ভৃত্য-পরিজন লইয়া পারিতে আসিলেন।

পারিতে আসিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া নবাবের প্রাণে দারুণ অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল। এখানে নিত্য মিলন মজলিস। স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে মিলিয়া আমোদ উল্লাসের পূর্ণ পাত্র উপভোগ করিতেছে। স্ত্রীপুরুষে অবাধ মিলন! আর তিনি নিতান্তই নিঃসঙ্গ, একা! এখানে স্বামীর সকল কাজে স্ত্রীর কোমল হাত দুইটি কাঠিন্যের মধ্যেও অপরূপ লালিত্যের সৃষ্টি করিতেছে। স্বামীর সকল কাজে স্ত্রীর কি সাগ্রহ সহানুভূতি, সহজ সহায়তা—তাহা যেমন অনায়াস, তেমনই রমণীয়! কঠিনে কোমলে অপরূপ সামঞ্জস্য! আর তিনি একা—একা—তাঁহার আকাঙ্ক্ষা-উদ্যমে স্ত্রীর সহানুভূতি-পাত দূরের কথা! স্ত্রী

তাহার অর্থও গ্রহণ করিতে চাহে না তাহার সন্ধান রাখিবার জন্য স্ত্রীর চেষ্টা নাই, বুঝি সামর্থ্যও নাই! স্ত্রী সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন! কি দুর্ভাগা তিনি!

কিন্তু না,—চেষ্টা চাই। চেষ্টা করিয়া স্ত্রীর মনকে নোয়াইতেই হইবে। তিনি স্থির করিলেন, মাদামকে পারিতে আনাইবেন।

ঘটনা-চক্রেরও আবর্ত্তন ঘটিল। টিউনিসের টাঁকশালের ভার জাঁসুলের হাত হইতে স্খলিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হেমারলিঙের হাতে পড়িল। ইহার জন্য কতখানি মান, কতখানি প্রতিপত্তি ছিল। নিমেষে ছায়াবাজীর মত তাহা উবিয়া গেল। এ গৌরব হারাইয়া টিউনিসে আসর রাখিবার আর কোনই প্রয়োজন নাই! মাদামকে এ সকল বুঝাইয়া নবাব তাহাকে পারিতে আসিবার জন্য অনুরোধ করিল। বারবার অনুরোধ উপরোধের তরঙ্গে মাদামের চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, আর পারাও যায় না! নিত্য অনুরোধ, উপরোধ —দূর হৌক—তাহার চেয়ে পারিতে গেলে এ-সকল দায়ের হাত এড়ানো যাইবে! মাদাম পারিতে আসিতে স্বীকৃত হইলেন।

তখন নবাবের আর কতকগুলা কাজ বাড়িয়া গেল। মাদামকে আদব-কায়দা শিখাইবার জন্য একজন গভর্ণেস রাখা হইল। মাদাম মনে মনে চটিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। তাঁহার বিরক্তি ধরিয়া ছিল। কেন এ সব অকারণ জঞ্জালের সৃষ্টি করা। গভর্ণেস নিয়োগের পূর্ব্বে এই ব্যাপার লইয়া

মাদাম কিছুতেই বুঝিলেন না, তাঁহার চলা ফেরা বসা দাঁড়ানোর ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপের কি অধিকার আছে—তাহার প্রয়োজনই বা কি! নবাব নিরাশ হইয়াও হাল ছাড়িলেন না! কারণ যেমন করিয়া হৌক, বাড়ীতে পার্টি প্রভৃতির আয়োজন করিলে মাদামকেই ত অতিথি-জনের অভ্যর্থনার ভার লইতে হইবে! কোথাও যাইতে হইলেও ত একটা আদব-কায়দার প্রয়োজন আছে—মাদাম বিরক্ত হৌক—গভর্ণেসের সাহায্যেও কতকগুলা চাল অভ্যাস হইয়া যাইতে পারে! ইহা ভাবিয়াই নবাব গভর্ণেস-নিয়োগে মাদামের কাছ হইতে বাধা পাইয়াও দমিলেন না। ছেলের জন্যও বেশ মোটা মাহিনার শিক্ষক নিযুক্ত হইল—লেখাপড়ার জ্ঞান যত হৌক না হৌক, বড় লোকের ছেলের চালটাই যে স্বতন্ত্র এবং তাহা শেখার যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, নবাব তাহা বুঝিয়াছিলেন। শিক্ষক বাছিয়া দিবার ভার লইলেন, ডাক্তার জেঙ্কিন্স! এমন সুহৃদ নবাবের আর কে আছে!

এইবার নিজের পালা। আজ অমুক সভায় মোটা চাঁদা দিয়া, কাল পিকচার-গ্যালারির নামে চেক্ কাটিয়া পরশু আর্ত্ত আর্টিষ্টকে সাহায্য দান করিয়া নবাব পারির হৃদয়-জয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ডাক্তার জেঙ্কিন্স পরামর্শ দিয়াছিলেন, কৌন্সিলে ঢুকিতে হইলে কিম্বা ডেপুটি হইতে হইলে এগুলার প্রয়োজন। এইগুলাই উপযুক্ত চার! নবাব এখন অহর্নিশি কাজের মধ্যে ডুবিয়া রহিলেন। নিশ্বাস ফেলিবার

যেটুকু অবসর হইত, তাহা স্বে গেরির সাহায্যে!

দ্যে গেরি দুই একবার বুঝাইয়াছিল, এসব বাজে কাজে এত টাকা দিবার প্রয়োজন কি! ইহাদের সামর্থ্য কোথায়! নবাব হাসিয়া বলিতেন, "দাঁড়াও না, গেরি, এসব দু-একটা বাজে কাজ চাই বই কি! তারপর যেদিন—জমকানো যাবে—" স্বে গেরি নবাবের এ স্বপ্ন ভাঙ্গিতে চাহিত না। নবাব বলিতেন, "পাগানেতি বলেছে, কর্সিকার ডেপুটি রোগে পঙ্গু হয়ে রয়েছে। শীগ্‌গির কাজ ছেড়ে দেবে—তখন আমার পালা। আমার জন্যে সব উঠে পড়ে লাগচে। মেসেঞ্জার কাগজে কি বেরিয়েচে, দেখেচ—ও কাগজখানার ভারী পশার আজকাল। বড় জোর কলম—তারপরে ঐ বেবলিহাম আতুর—আশ্রমের ব্যাপার! ঐ একটা কাজ ফ্যালাও করে তুলতে পারলেই,—ব্যস্! কৌন্সিলে ঢোকবার সুবিধা হবে! তুমি ছেলে মানুষ, এ-সব বোঝ না। শুধু দেখে যাও—আমি চাই, দেশের মধ্যে একজন হতে—তার জন্যে খরচ করা কিছু চাই বই কি। তারপর এটা হলে—কতখানি লাভ, কতখানি ভাব দেখি!"

গেরি চুপ করিয়া থাকিত। সে ভাবিত, হায়, পারির সমাজ, রক্ত-পিপাসু জল্লাদের মতই তোমরা খরধার খাঁড়া উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছ! এই নিরীহ মির নবাবকে মারো, তাহাতে দুঃখ নাই—তবে তাহাকে বৃথা আশ্বাসে ভুলাইয়া মারিও না! তাহাকে মারিতেই যদি চাও, মারো, কিন্তু বলিয়া মারো যে, নবাব, আমরা তোমার রক্ত চাই! তোমার অর্থ চাই! অলস মরীচিকার মায়ায় ভুলাইয়া বন্ধু সাজিয়া তাহাকে হত্যা করিয়ো না! দোহাই তোমাদের! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শারদীয়া

শরতসমীর আজি বনানীর তন্ত্রীরাজি
টানিয়া বেঁধেছে প্রাণপণে,
করুণ বিলাপ সুরে নিখিল উঠেছে পুরে
চৌদিকে ছড়ায় জীর্ণ পত্রাবলি সনে!
প্রতি মূর্চ্ছনায় তার বেজে ওঠে হাহাকার,
শূন্যতা বাড়ায় শূন্য মনে,
বিরহ-বেদনা-মাঝে যে বাসনা নিত্য বাজে
কে পুরাবে আশা তার এ মর্ত্ত্য ভুবনে?

বসন্ত গিয়েছে চলে, শৈল অন্তরালে
একটি অশোক তবু সংখ্যাতীত কুসুমের জালে
বনলক্ষ্মী পায়ে ধরি দোহাই তোমার
দুরন্ত পবনে যেন বোলনাক তার সমাচার,
এখনি নাশিবে দীপ্তি করি ছারখার।

শরৎ প্রান্তর আজ পরেছে কিঙ্খাব সাজ
সোনালী, সুনীল, রাঙা ফুলের বাহার,
এত বর্ণ কোথা হ'তে এল ধরণীর পথে
যখন ফাটিক স্বচ্ছ ঝরিছে নীহার?

চেয়ে আছি শরতের চন্দ্রমার পানে,

সকল ভাবনা মোর কিরণের জালে
জড়ায়ে, ছড়ায়ে গেছ আকাশে পাতালে,
স্বপ্নে যায় আনমনে কোন অজানায়—
মন্ত্র তার টানিল কি একেলা আমায় ?

কাশগুচ্ছ হেলাইয়া ধবল উত্তরী
যেওনা যেওনা বলে ডাকে বারে বারে,
মিনতি না মানি হায় শরৎ-সুন্দরী
হেমন্তে রাখিয়া যায় তারে তুষিবারে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মুক্তি

আমি একটি সামান্য জীবনের ছেঁড়া-একটুকরা ইতিহাস বলিতে বসিয়াছি। হয় তো গল্পের আসর ইহাতে জমিবে না।

মুক্তি গৃহস্থ-ঘরের বৌ হইয়া যে-দিন কলিকাতা-সহরের সদর রাস্তায় পানের খিলি বেচিতে বসিল সে দিন তার সঙ্কোচ যতটা না হইয়াছিল তার চেয়ে ঢের বেশি সে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। বারো বৎসর বয়সে বিবাহিত হইয়া আসিয়া, মুক্তি স্বামীর সহিত কলিকাতার একটা স্যাঁৎসেঁতে গলির মধ্যে সেই যে প্রবেশ করিয়াছিল তার পর এই ছয়-বৎসরের মধ্যে আর সেখান হইতে সে বাহির হইতে পায় নাই। সেই ছোট্ট অন্ধকার ঝুপ্সী ঘরটির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তার এমনি ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে জগতের কোথাও যে আলো আছে, বাতাস আছে তা তার মনেই পড়িত না। আজ হঠাৎ একেবারে এতটা আলোর মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সে দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল—তার অন্ধকার-অভ্যস্ত চোখ সে আলোর পানে ভালো করিয়া মেলিতেই পারিতেছিল না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গৃহস্থ-ঘরের অন্তঃপুরিকা হইয়া মুক্তির পক্ষে বাজারের পানওয়ালি হওয়া কেমন করিয়া সম্ভব হইল। অনেকে কথাটাকে হয় ত আজগুবি মনে করিবেন। কিন্তু আমি বলিতেছি, ব্যাপারটি সত্য। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় আমি সাক্ষী ডাকিতে রাজি আছি—মুক্তিকে কলিকাতা-সহরের অনেকেই পান বেচিতে দেখিয়াছে।

অত্যন্ত অনাদরে ও অবহেলায় মুক্তি মানুষ হইয়াছিল। একে গরীবের ঘরের মেয়ে, তার উপরে সে যখন খুব কচি তখন তার মা মারা যায়—কাজেই আদর তার ভাগ্যে জোটে নাই।

কচি মেয়ের দোহাই দিয়া মুক্তির বাপ আবার বিবাহ করিয়াছিল বটে কিন্তু মেয়ের তাতে বিশেষ-কিছু সুবিধা হয় নাই। কারণ সতীনের মেয়েকে ভালো বাসিতে পারে এতটা উদারতা মুক্তির সৎ-মায়ের ছিল না।

মুক্তি ভয়ে ভয়েই দিন কাটাইত,—যতদূর সম্ভব আপনাকে গোপন করিয়া চলিত—কারণ যেখানে যতটুকু সে সৎ-মায়ের চোখে পড়িত সেইখানেই তার

শাসন ছিল, আদর ছিল না। এই নিজেকে গোপন করিয়া চলাটা মুক্তির এমন স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল যে স্বামীর কাছেও নিজের হৃদয়টিকে সে মেলিয়া ধরিতে পারে নাই। স্বামীও তাহাকে পাইবার জন্য কোনো দিন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সে জিনিষটা তার ধাতেই ছিল না।

মুক্তির স্বামী কলিকাতার কোন্ আপিসে অল্প-মাহিনায় সামান্য চাকরি করিত। সে এ-সংসারে বেশি-কিছু চাহিত না, অল্পেতেই খুসি ছিল এবং সেই অল্পটুকুও না পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠিবার মতো তেজ তার ভিতরে ছিল না। সে ছিল নিরীহ ভালোমানুষ। তার এই নিরীহতা এতটা বিরাট ছিল যে কোনোরূপ উত্তেজনাই তাহাকে তেমন করিয়া চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারিত না। তার উপরে সে ছিল নকলচাঁদ বাবাজীর শিষ্য। এমন গুরুভক্ত শিষ্য কলিকালে দুর্লভ। সে চিত্ত স্থির করিবার জন্য গুরুর উপদেশে প্রতিদিন গঞ্জিকা সেবন করিত। তার গাঁজার মাত্রা ক্রমেই এমন বাড়িয়া উঠিতেছিল যে লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল কোন্ দিন বা সে চিত্ত-স্থির-রাখা বিষয়ে অতবড় মহাত্মা নকলচাঁদ বাবাজীকেই ছাড়াইয়া উঠে।

নকলচাঁদ বাবাজী চক্ষু-মুদিয়া উপদেশ দিতেন—কামিনী-কাঞ্চনের মোহ বড় ভয়ঙ্কর মোহ! মাছ যেমন জালে আটকায় এবং তাহাতেই মরে; মানুষ তেমনি করিয়া এই কামিনী-কাঞ্চনের মায়াজালে পড়িয়া নরকে ডুবিয়া মরিতেছে!

মুক্তির স্বামী গুরুর এই অমূল্য উপদেশ গদগদচিত্তে জোড়হাত করিয়া বসিয়া শুনিত এবং তাহা পালন করিবার বিধি-মত চেষ্টা করিত। কাঞ্চনসম্বন্ধে সে এক-রূপ নিশ্চিন্ত ছিল, তার দায় বড় ছিল না, কারণ সে জিনিষটা আসিবার পথেই ফিরিয়া যাইত এবং অধিকাংশ সময়ই তার আসিবার বালাই থাকিত না। কিন্তু কামিনীটি তো তেমন নয়—সে যে দিন-রাত্রি চোখের সামনে জাজ্বল্য হইয়া আছে। সেই জন্য মুক্তির স্বামী যতক্ষণ বাড়িতে থাকিত চিত্ত-স্থির-রাখিবার মহৌষধ ভক্তিভরে সেবন করিত। সে মনে মনে তারিফ করিত—কি আশ্চর্য্য দ্রব্যগুণ! মানুষের এত বড় শত্রু যে কামিনী তাও এই দ্রব্যগুণে একমুহূর্ত্তে চোখের সামনে হইতে সাফ্ পরিষ্কার হইয়া যায়,—তার চিহ্নমাত্রও থাকে না! এমন জিনিষ থাকিতে মানুষ কেন সংসারের পাঁকে ডুবিয়া মরে সে ভাবিয়া পাইত না। এ কি সামান্য জিনিষ! যোগ-সাধনের চরম অবস্থা যে সমাধি তাও এই দ্রব্যগুণে মুহূর্ত্তের মধ্যে করায়ত্ত হয়। কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই—এত বড় জগৎখানাই কোথায় তলাইয়া যায়। ভাগ্যে সে নকলচাঁদ বাবাজীকে পাইয়াছিল তাই তো এ-যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল। সে ভাবিত মানুষগুলো কি বোকা। এমন সাধু মহাত্মা জলজ্যান্ত থাকিতে লোকে কিনা হা অন্ন, হা বস্ত্র করিয়া কাঁদিয়া মরে?

নকলচাঁদ বাবাজীর পায়ে আসিয়া পড়িলেই তো সব গোল চুকিয়া যায়।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তার মন যখন বিশ্বসংসারের সমস্ত মানবের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া উঠিত তখন সে দূর হোক্ গে-ছাই বলিয়া আবার চিত্ত স্থির করিবার আয়োজনে বসিয়া যাইত।

এমনিতর ছায়ার মানুষ লইয়া মুক্তিকে ঘর করিতে হইত। স্বামীর যে একটা অস্তিত্ব আছে তাহা সে অনুভব করিবারই সুযোগ পাইত না। স্বামীর আদর তো ছিলই না, অত্যাচারটাও যদি থাকিত তা হইলেও না হয় সেই অত্যাচারের আঘাতে স্বামীর একটা ছাপ তার উপরে পড়িতে পাইত। কিন্তু যেখানে কেবল অবহেলা সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো সম্বন্ধই জমিয়া উঠিতে পায় না। তা ছাড়া মুক্তি ছিল একলা-ঘরের একলা মানুষ। আর-পাঁচ জনকে লইয়া যে তার হৃদয়ের ছন্দ উঠিবে পড়িবে তারও জো ছিল না। কাজেই সে আপনার মধ্যে আপনি এত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া থাকিত যে তার দুঃখী-ঘরের আসবাবহীন ফাঁকা জায়গাও সে বেশি-করিয়া জুড়িতে পারিত না। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইত, প্রতিদিনের কর্ত্তব্যগুলি সে একটির পর একটি করিয়া সারিয়া রাখিত, তাহাতে তার আনন্দও ছিল না, দুঃখ ছিল না। কলের পুতুল যেমন করিয়া চলে ফেরে তেমনি করিয়া সে চলিত ফিরিত।

কেবল একজায়গায় সে মানুষকে একটুখানি পাইয়াছিল। সে বামার মা। সে ছিল ঠিকা দাসী। যে দুঃখী-পাড়ায় মুক্তিরা থাকিত এই বামার মা ছিল সেই পাড়ার একমাত্র দাসী। সে সকাল বিকাল দু বেলা সদর রাস্তার ধারে বসিয়া পান বেচিত, দুপুর বেলা ঝড়ের মতো পাড়ার মধ্যে আসিয়া ঘরে ঘরে নির্দ্দিষ্ট-মতো কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত, কেউ যদি এতটুকু অতিরিক্ত ফরমাস করিত তো অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিত। তার সেই মারমূর্ত্তি দেখিয়া কেউ আর দ্বিরুক্তি করিবার সাহস করিত না।

বামার মার সঙ্গে পাড়ার কারুরই আর-কোনো সম্পর্ক ছিল না, কেবল কাজের সম্পর্কই ছিল। কাজ সারা হইলেই সে ছুটিয়া পালাইত, কাহারো পানে ফিরিয়া তাকাইত না—দুদণ্ড দাঁড়াইয়া কথা কহিবার অবসর তার ছিল না। কাজেই বহুদিন পর্য্যন্ত মুক্তির নিঃসঙ্গ জীবনের উপর বামার মা নিজের ছায়াটুকুপর্য্যন্ত ফেলিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

মুক্তির জ্বর হইয়াছিল। সে একলাটি পড়িয়াছিল। সেদিন তার স্বামীর ছুটির দিন, কিন্তু গুরুজীর আড্ডায় আজ ভারি এক মোচ্ছব, কাজেই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, মুক্তির দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সময় হইল না। তার পর দুইদিন একেবারে অদৃশ্য। উৎসবের উল্লাসে বাবাজীর শিষ্যেরা এতটা চিত্ত স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল যে তাহা দেখিয়া আশপাশের লোকদের চক্ষুস্থির হইবার উপক্রম হইয়াছিল;—দুদিন

মাটিয়া ছাড়িয়া উঠিবার কাহারো সামর্থ্য ছিল না।

মুক্তি অন্ধকার ঘরের মধ্যে মলিন বিছানায় একা চুপটি করিয়া পড়িয়াছিল। তৃষ্ণায় তার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু উঠিয়া জল খাইবে এমন শক্তি ছিল না। সে নীরবে, শুষ্ক কণ্ঠ ও শুষ্ক আঁখি-পল্লব তুলিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া ছিল।

বামার মা কাজ করিতে আসিয়া অনেক ডাকাডাকির পর যখন সাড়া পাইল না তখন সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মুক্তি তাহাকে দেখিল, কিন্তু জল-দিবার ফরমাসটুকু করিতে সাহস করিল না। নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কাহারো নিকট কিছু চাহিবার অধিকার যে তার আছে এমন কথাও সে ভাবিতে পারিত না। সে হয় ত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জল না চাহিয়া চুপ করিয়া থাকিত। কিন্তু বামার মার একটি ব্যবহারে সে যেন সাহস পাইল।

বামার মা মুক্তির শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল,—"ও মা অসুখ করেছে বুঝি!" বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি নিজের ভিজে হাতখানা থপ্ করিয়া আঁচলে মুছিয়া মুক্তির কপালের উপর পাতিয়া দিল।

মুক্তির বোধ হইল সেই স্পর্শটিতে তার সমস্ত দেহ যেন জুড়াইয়া গেল। কি স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ! মুক্তি চোখ বুজিয়া রহিল। তার মনে হইতে লাগিল, এই স্পর্শের মধ্য দিয়া সে এমন একটি জিনিষ পাইল যার স্বাদ সে জীবনে কখনো পায় নাই। বামার মা হাত তুলিয়া লইবার পরও অনেকক্ষণ মুক্তির কপালের উপর সেই স্নিগ্ধ স্পর্শটুকু লেপিয়া রহিল।

মুক্তি এতক্ষণে বামার মার কাছে জল চাহিল; কিন্তু কণ্ঠ এত শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল যে কথা বাহির হইল না,—শুধু ঠোঁটের একটি আকুল কম্পন সেই শীর্ণ মুখখানির উপর দিয়া বহিয়া গেল।

বামার মা বুঝিতে পারিল, বলিল—"জল খাবে বাছা?"

মুক্তি একটু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বামার মা তাড়াতাড়ি জল গড়াইয়া আনিল। তার হাত হইতে ঘটি লইবার যেন মুক্তির তর-সহিতে ছিল না,—সে এমনিভাবে উঠিয়া বসিল। এবং একনিশ্বাসে সমস্ত জল পান করিয়া শুইয়া পড়িল। বামার মা একটা জোর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—"বাছারে আমার! মুখে একটু জল-দেবার কেউ নেই গা!"

সেই দিন হইতে আর বামার মা মুক্তির বাড়ির কাজ সারা হইলেই ছুটিয়া পালাইতে পারিত না। কাজের পর দু দণ্ড সময়ের বৃথা অপব্যয় তার নিত্যই ঘটিতে লাগিল।

বামার সঙ্গে মুক্তির চেহারার কোনো সাদৃশ্যই ছিলনা কিন্তু তবুও বামার মার কেমন মনে হইতে লাগিল যেন মুক্তি ঠিক বামারই মতো। ভারি আশ্চর্য্য মিল! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কথা,—সেই সব! আজ কয়েক বছর হইতে বামার মা প্রতিদিনই মুক্তিকে দেখিতেছে, তার বামা বহুকাল হইল তাহাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেছে, তার

চেহারা তার ভালো-করিয়া মনেই পড়েনা, কিন্তু এতদিন তো এটা চোখে পড়ে নাই যে মুক্তি তার বামারই মতো! হঠাৎ সেই অসুখের দিন হইতে এইটে তার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং যতই দিন যাইতেছে পরস্পরের চেহারার মধ্যে যে একটু-আধটু অনৈক্যের রেখা ছিল তাহাও মুছিয়া যাইতেছে। মুক্তিকে যতই দেখিত বামার মার কেবলই মনে হইত—বামা তো আমার এত বড়টাই গো! এমনিই! এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বামা যে তার নাই একথা বামার মা ভুলিয়া যাইতে বসিল।

বামার মাকে পাইয়া মুক্তি যেন একটা আশ্রয় পাইল। সেই আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তার হৃদয়-কুঁড়িটি একটু একটু করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তারই সৌরভ তার দেহের সমস্ত অলিগলির ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার সমস্তটাকে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। বামার মার কাছে মুক্তির আর কোনো সঙ্কোচ নাই—সে যা-খুসি-তাই আবদার করে, কাজের সময় বহিয়া গেলেও বামার মার আঁচল টানিয়া বসাইয়া রাখে, দেরী করিয়া আসিলে রাগ করে এবং চলিয়া যাইতে চাহিলে অভিমান করে।

বামার মাও মুক্তির কাছে একেবারে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল। সে যে মুক্তিকে লইয়া কি করিবে খুঁজিয়া পাইত না। তার কেবলই ইচ্ছা হইত মুক্তিকে তার বুকের ভিতর করিয়া রাখে। তার নিজের সেই সামান্য সমস্তটুকু মুক্তিকে উবুড়-করিয়া দিয়াও তার তৃপ্তি হইতেছিল না। সে আরো দিতে চাহিত, আরো দিতে চাহিত। যে কথাটি কানে শুনিত মুক্তিকে না বলিলে তার প্রাণ ঠাণ্ডা হইত না; যে জিনিষটি চোখে লাগিত সেটি মুক্তির জন্য না নিতে পারিলে ভারি দুঃখ থাকিয়া যাইত।

হারানো ধন ফিরিয়া পাইলে তার যত্ন বাড়ে। বামার জন্য যতটা না করিতে পারিয়াছিল তার চেয়ে ঢের বেশি সে মুক্তির জন্য করিতে লাগিল। মুক্তির কাছে বেশিক্ষণ থাকিতে পায় না বলিয়া সে দু-এক ঘরের কাজ ছাড়িয়া দিল এবং যে কয়েক ঘরের কাজ রহিল তাহাতেও শৈথিল্য পড়িয়া গেল। মুক্তির উপরই তার মন পড়িয়া থাকিত। যখনই সময় পাইত একবার মুক্তিকে না দেখিয়া গেলে তার চলিত না এবং যাই-যাই-করিয়া উঠিতে উঠিতে এতটা কাজের সময় বহিয়া যাইত যে তার জন্য তাহাকে মনিবের কাছে তিরস্কার সহিতে হইত। বিকাল-বেলা তার অনেক কাজ ছিল; তবু সে যেমন করিয়া পারে একটু সময় করিয়া মুক্তির চুলটা বাঁধিয়া দিয়া যাইত। এবং পানের দোকানে যখন খরিদ্দার থাকিত না তখন পায়ের বুড়া-আঙুলে একটা দড়ি বাঁধিয়া মুক্তির জন্য চুলের গুছি তৈরি করিত;—তাহাতে এমন তন্ময় হইয়া থাকিত যে অনেক সময় খরিদ্দার হাঁকাহাঁকি করিলে তবে চমক ভাঙিত।

মুক্তির উপর বামার মার ভালো বাসার অত্যাচারও ছিল। সে চুল বাঁধিবার সময় মুক্তির মাথা লইয়া এতটা তেল-জ্যাব-জেবে করিয়া দিত, এতটা নীচে অবধি পেটো পাড়িয়া দিত, চুলের গোড়া এতটা শক্ত করিয়া বাঁধিত যে ইহার কোনোটাই সুখের

ছিল না। কিন্তু এইগুলাই মুক্তির বিশেষ করিয়া ভালো লাগিত। চুল ভালো থাকিবে বলিয়া বামার মা যখন চুলের গোড়া কড়্‌কড়ে করিয়া বাঁধিয়া দিত, তখন মুক্তির সমস্ত মাথাটা টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইটাতেই সে আনন্দ বোধ করিত। এবং এইরূপ আনন্দের প্রতি একটা লোভ মুক্তির মনে মনে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল।

সন্ধ্যাবেলাটি ভারি চমৎকার কাটিত। বামার মা অনেক রূপকথা জানিত, মুক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বামার মার কাছে বসিয়া সেই সকল রূপকথা শুনিত। স্বপ্নপুরীর সেই সব কাহিনী সন্ধ্যার আবছায়ার উপরে একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিত। সেখানকার ভয়-ভাবনা, আশা-ভালোবাসা মুক্তির হৃদয়টাকে লইয়া দোলের পর দোল দিতে থাকিত। নানা বিপদের পর, পক্ষিরাজ ঘোড়ায় করিয়া, রাজকুমার তার প্রিয়তমা রাজকুমারীকে লইয়া পালাইতেছে—পক্ষিরাজের উদ্দাম গতিতে ভীত রাজকুমারী দুই বাহু দিয়া রাজপুত্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে—এই সব কথা যখন শুনিত তখন মুক্তির মনে হইত যেন সে নিজেই সেই রাজকুমারী। তার কল্পনায় রাজকুমারের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতে তার বুক দুরদুর্ করিতে থাকিত। আবার রাজকুমারী যখন রাজকুমার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বনে বনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে তখন সেই রাজকুমারীর কান্না মুক্তির বুকের ভিতর হইতে আপনি গুমরিয়া উঠিত। তার পর সর্বশেষে মিলনের দিনে রাজপুত্র রথে করিয়া আসিয়া যখন বলিত—রাজকুমারী চল! তখন মুক্তির হৃদয় আগেভাগে সেই রাজপুত্রের রথের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিত। মুক্তি যখন একলাটি থাকিত সে এই সমস্ত কাহিনী মনের পৃষ্ঠা হইতে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বার বার করিয়া পড়িত—এর নূতনত্ব সে শেষ করিতে পারিত না।

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে মুক্তির দিন একরকম কাটিতেছিল কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে সব ওলট-পালট হইয়া গেল।

গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না—এই প্রবাদটা যখন নকলচাঁদ বাবাজীকেও বাদ দিল না তখন বাবাজীর বড় মুস্কিল হইল। প্রতিদিন তার আয় কমিতেছিল। শেষে এমন হইল যে যে-সব ভক্তেরা রোজ তার প্রসাদটুকু পাইয়া শুধু কৃতার্থ হইবার জন্য আসিত তাদেরও গাঁজার বরাদ্দের উপর টান পড়িল। চিত্ত আর তেমন স্থির হইতেছেনা, ভজন সাধনের ব্যাঘাত হইতেছে—এই বলিয়া ভক্তেরা দলে দলে অন্য মহাপুরুষের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। নূতন খরিদ্দারও জোটে না, পুরাতন খরিদ্দারও ভাঙিয়া যাইতেছে এমন করিয়া আর ক' দিন চলে? কাজেই নকলচাঁদ বাবাজী জাল-গুড়াইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মুক্তির স্বামী কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছিল,—সে বাবাজীর পা কিছুতেই ছাড়ে নাই। চিত্তস্থির হইবার ব্যাঘাত ঘটিতেছে বলিয়া তারও মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিত বটে কিন্তু বাবাজীকে ছাড়িয়া যাইতে তার মন সরিত

না। ইহকাল তো কিছুই নয়—পরকালের জন্যই তো ভাবনা, সেইজন্য এই পরকালের গতিসম্বন্ধে তার ভারি একটা লোভ ছিল। সে ভাবিত, বাবাজীর কৃপায় যখন স্বর্গের অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছি তখন শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে ;—বাবাজীকে ছাড়া নয়।

বাবাজীরও তাহাকে না হইলে চলিত না। সে বাজার হইতে ঘি আটা আনিয়া দেয়, ধুনীর আগুন জ্বালে, ফাইফরমাসটা খাটে, সকাল সন্ধ্যা পদসেবাটাও বেশ করে—এই সব আরাম বাবাজী অনেক দিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছে, চট করিয়া তাহা ত্যাগ করা বাবাজীর পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই এই চেলাটি যাহাতে হাতছাড়া না হয় সে দিকে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সে একদিন এই ভক্তটির কাঁধের উপর বার দুই তিন থাবড় দিয়া বলিল—"বাচ্ছা, আমি দেখচি তোরই ভিতর খাঁটি চিজ আছে; ভণ্ড যারা তারা সব ভেগেছে। এখন চল, তোর উপায় করে দি।"

মুক্তির স্বামী গুরুজীর এই কথায় একেবারে গদগদ হইয়া উঠিল। সে তো আগে হইতেই জানিত যে মহাপুরুষেরা কঠোর পরীক্ষার পর তবে স্বর্গে যাইবার পথের খবরটা ফাঁস করেন; সেই জন্যই তো সে এমন-করিয়া এতদিন বাবাজীর পা ধরিয়া পড়িয়াছিল। এখন এই মহা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে মনে করিয়া তার গর্ব্ব হইতেছিল। গুরুজীর কৃপা হইয়াছে—এই আনন্দে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া দুই হাত দিয়া গুরুজীর পা জড়াইয়া রহিল।

তার পর একদিন গা-ময় ভস্ম মাখিয়া গুরুদেবের তল্পিতল্পা ঘাড়ে করিয়া সে গুরুজীর পিছন পিছন কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মুক্তির কথাটা হঠাৎ একবার মনে হইয়াছিল; কিন্তু সে যে তার ধর্ম্মপথের প্রতিবন্ধক—মোক্ষলাভের অন্তরায়! এই জন্য সে তৎক্ষণাৎ মুক্তির কথাটা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিল এবং তখনই গাঁজার কলিকায় কষিয়া একটা দম দিতে বসিয়া গেল। পাছে এই খবর নিজে মুক্তির কাছে দিতে গেলে কোনো ফ্যাসাদে জড়াইয়া পড়ে সেই ভয়ে সে যাইবার সময় মুক্তির সহিত দেখা করিতে গেল না;— একটা উড়ো-লোক দিয়া খবরটা পাঠাইয়া দিল।

মুক্তির স্বামী যে আছে বামার মা শুধু এইটুকুই জানিত; তার সহিত কোনো পরিচয় ছিল না বলিলেই চলে। সে যখন মুক্তির কাছে আসিত তখন প্রায়ই তার স্বামী বাড়ি থাকিত না; যদি দৈবাৎ কখনো চোখে পড়িত, পাশ-কাটাইয়া চলিয়া যাইত। কাজেই মুক্তির স্বামী যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে এ সন্দেহটি পর্য্যন্ত বামার মার মনে আসিতে পারে নাই।

মুক্তিও কিছু বলে নাই—বলিবার কোনো তাগিদ যেন তার মন হইতে উঠে নাই। তার মনটি এমনি ভীরু ছিল যে সকল-রকম অবস্থাকে নিঃশব্দে মানিয়া লওয়াটাই তার ধর্ম্ম ছিল। দুঃখ যখন

তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, সে জড়সড় হইয়া তার পানে শুধু চাহিয়া থাকিত;—এবং সেই দুঃখটা তার মাথার ঝুঁটি ধরিয়া যখন নাড়া দিতে থাকিত তখনও সে এমনি ভয়ে ভয়ে থাকিত যে আর্ত্তনাদও করিতে পারিত না। সমস্ত দুঃখকে সে বুকের মধ্যে চাপিয়া কাঠ হইয়া থাকিত।

স্বামী যে তার একটা সহায় এমনভাবে স্বামীকে দেখিবার অবকাশ মুক্তির কথনো হয় নাই, কাজেই স্বামী যখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল তখন সে নিজেকে যে খুব নিঃসহায় মনে করিল তা নয়; বামার মার সঙ্গে তার যেমন দিন কাটিতেছিল তেমনি দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু একজায়গায় একটু বাধিল। স্বামী চলিয়া যাইবার দিন দুই পরে বামার মা বাজারের পয়সা চাহিলে মুক্তি বলিল—"বাজার করবার দরকার নেই।"

বামার মা অবাক্ হইয়া মুক্তির পানে চাহিয়া রহিল।

মুক্তি আর কথাটি কহিল না। তার বলিবার কথা সমস্ত যেন ঐ-খানেই শেষ হইয়া গেছে। পয়সা নাই তাই বাজার হইবেনা—এর আগে কিম্বা এর পরে যে কোনো কথা আছে তাহা তার মন ভাবিতেই ছিল না।

বামার মা কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটা উড়াইয়া দিতে পারিল না—সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আসল কথাটা বাহির করিয়া লইল।

বামার মা কিন্তু কথাটা ঠিক মনের সঙ্গে

কেবলই মুক্তিকে প্রশ্ন করিতে লাগিল—"বলনা মা, কিছু ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে বুঝি?"

মুক্তি যতই বলে—"না।" বামার মা কিছুতেই সে কথা কানে তুলিতে চাহে না। সে কেবলই চাহিতেছিল মুক্তি বলুক—"হাঁ।" নইলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না।

তারপর দিনের পর দিন চলিয়া গেলে বামার মার আপনা-হইতেই যখন দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে মানুষ ঝগড়া করিয়া এতদিন কখনো ঘর ছাড়িয়া থাকে না তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুক্তির পাশে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সে সময়ে তার নিজের জীবনের কথাই মনে পড়িতেছিল। সে যে ভুক্তভোগী! তার বামাকে বুকে ধরিয়া সে যে-দিন একা নিঃসহায় অবস্থায় পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেদিনকার কথা তার মনে পড়িতে লাগিল—কী ভীষণ অসহায়তা!—কোনো দিকে কোনো কূল পাওয়া যায় না! আজ মুক্তিরও সেই অবস্থা মনে করিয়া তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। একটা মিথ্যা সন্দেহে তার স্বামী যখন তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল তখন স্বামীর উপর সে তেমন করিয়া রাগ করিতে পারে নাই—হাজার-হউক স্বামী তো বটে! সে দিন সে স্বামীকে ধিক্কার দেয় নাই, নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়াছিল। কিন্তু আজ মুক্তির এই অবস্থা দেখিয়া সে পৃথিবীর সমস্ত স্বামীর উপর হাড়ে চটিয়া গেল এবং তাহাদের সকলকার মুখাগ্নি করিয়া দিল।

বিবাহ হইবার পর মুক্তির বাপের বাড়ি হইতে কেউ আর মুক্তির কোনো খবর লয়

নাই। মুক্তির সংমা নূতন সংসার বেশ করিয়া জমাইয়া লইয়াছিল। তার ছেলে-মেয়েদের লইয়া সে নিজে সংসারটা এমন করিয়া জুড়িয়া বসিয়াছিল যে মুক্তির জন্য এতটুকু স্থান পড়িয়া থাকে নাই। তার উপর অনাটনের সংসার। যাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া রাখা যায় এমন লোককে ডাকিয়া নিজের ভাতের ভাগ দিতে পারে এতটা উদারতা সাধু-সমাজেই দুর্লভ—তা মুক্তির সংমা তো কোন্ ছার।

বাপের বাড়ির দিকে মুক্তিরও কোনো টান ছিল না। সেখানে তার এমন-কিছুই ছিল না যাহাকে সে আপনার বলিতে পারে। সেই জন্য বামার মা যখন বাপের বাড়ির কথা তুলিল তখন মুক্তি অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিল—"সেখানে আমার কেউ নেই বামার মা!"

পৃথিবীতে বামার মার মতো আপনার লোক মুক্তি কাহাকেও জানিত না। বাপের বাড়ির কথা উঠিতেই মুক্তির ব্যাকুল হাতখানা বামার মার আঁচলটা জোর-মুঠিতে আঁকড়াইয়া ধরিল।

মুক্তির ঘরে সঞ্চয়ও ছিল না, গায়ে অলঙ্কারও ছিল না—এয়োতি-নাম রক্ষা করিবার জন্য হাতে দুগাছি পিতলের চুড়ি ছিল মাত্র। বামার মারও যে আয় ছিল তাতে তার একলার পেটটি কষ্টে চলিত। তার উপর ইদানি মুক্তির জন্য তাহাকে আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে হইয়াছিল। কাজেই তার একার উপর নির্ভর করিয়া দুজনের দিন চলা দায় হইয়া উঠিল। বামার মা মনে মনে বলিত, আমি তো অনেক উপবাস করিয়াছি—উপবাস আমার গা-সহা। এই বলিয়া সে নানা অছিলায় মাঝে মাঝে উপবাস দিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ-কিছু সুবিধা হইল না। মুক্তি ভারি আপত্তি করিত। সে বলিত—"তুমি অমন করে উপোস কর কেন? তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে উপোস করব।"

বামার মা বলিত—"আমার যে উপোস করা দরকার মা। তাতে শরীর ভালো থাকে। বুড়ো-মানুষ বেশী খেলে গতর মাটি হবে যে।"

বামার মার অন্ন খাইতে হইতেছে বলিয়া পাছে মুক্তি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় সেই জন্য বামার মা মুক্তিকে শুনাইয়া রাখিত যে, সে যাহা দিতেছে তাহা ধার বলিয়াই দিতেছে—জামাই যখন ফিরিয়া আসিবে তখন সুদসুদ্ধ আদায় করিয়া তবে ছাড়িবে।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই সঙিন্ হইয়া উঠিতে লাগিল। শুধু পেটের অন্ন লইয়া যদি কথা হইত তাহা হইলে না হয় এক-রকম-করিয়া চলিয়া যাইত—কিন্তু তা তো নয়, অভাব যে চারিদিকে। মুক্তির পরণের কাপড় সেলাই করিয়া, তালি দিয়া, নানা রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছেঁড়া বাঁচাইয়া কোনোরকমে লজ্জা নিবারণ হইতেছিল, শেষে তাও আর চলে না; ঘরের ভাড়ার জন্য তাগাদার পর তাগাদা আসিতেছে; মুক্তির স্বামীর আমলে মুদির দোকানে যে দেনা ছিল তার জন্য মুদি আসিয়া মুক্তিকে যাচ্ছেতাই শোনাইয়া যায়; কলের জল অশুচি বলিয়া তার স্বামী গঙ্গা-জল খাইত, তার ধার আছে বলিয়া এক-

দিন একটা উড়ে ভারী ঘর হইতে জলের ঘড়াটা জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। এমনি কতদিকে যে কত উৎপাৎ তার ঠিক নাই, নিরুপায় বলিয়া কেহ তাহাকে ক্ষমা করিত না। মুক্তি মুখটি বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিত!

শেষে আর উপায় না দেখিয়া বামার মা একদিন মুক্তিকে বলিল—"মা, এক কাজ করবি, আমার সঙ্গে পান-বেচতে যাবি?"

সকালে আপিসের সময় বামার মার পানের দোকানে ভারি ভিড় হইত। সে একলা সকলকে পান জোগাইয়া উঠিতে পারিত না। তাড়াতাড়ির সময়, বাবুরা যে দণ্ড দাঁড়াইয়া পান লইবে তা হইত না, অনেক খরিদ্দার ফিরিয়া যাইত। সেই জন্য বামার মার মনে হইতেছিল যদি এই সময়ে মুক্তি আসিয়া একটু সাহায্য করে তো অনেকটা সুসর হয়।

নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন কুটাকে আশ্রয় করে মুক্তি পান-বেচিবার প্রস্তাবটা তেমনি করিয়া গ্রহণ করিল।

বড় রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ির গায়ে ছোট্ট একটু রক—তারই এক কোণে ছিল বামার মার পানের দোকান। দোকানের সরঞ্জাম বিশেষ-কিছু ছিল না;—একটি দড়ি দিয়া বাঁধা ভাঙা টিনের বাক্স এবং তার ভিতর কয়েকটি গোল গোল টিনের কৌটা। বামার মার পাশে একটুখানি জায়গা করিয়া মুক্তি সেই দোকানে আসিয়া বসিল। মুক্তির ছিন্ন মলিন বস্ত্র, কপাল অবধি ঘোমটাটুকু টানা, তার সেই শুষ্ক করুণ মুখখানির উপরে টানা-টানা দুইটি চোখ স্থির হইয়া ভাসিতেছে—শুধু এইটুকু দেখা যাইতেছিল।

মুক্তি স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তার মনটা চারিদিককার নূতন জিনিস দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তার অনভ্যস্ত চোখ মনের সেই ঔৎসুক্য নিজের মধ্যে কিছুতেই জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছিল না;—তার চোখ যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল। এবং তার দৃষ্টির সেই করুণ নীরবতার উপরে তার বোবা-হৃদয়টির আভাস থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল।

মুক্তি এমন জড়সড় হইয়া ছোট্টটি হইয়া বসিয়াছিল যে রাজ-পথের চারিদিকার চঞ্চলতা ও বিরাটতার মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া দায়। কিন্তু তবুও তার আবির্ভাবে আশেপাশে চারিদিকে একটা চঞ্চলতার ঢেউ বহিয়া গেল। অনেকের উৎসুক দৃষ্টি তার উপরে বারে বারে পড়িতে লাগিল। আপিসের বাবুরা দোকানের ধারে এমন করিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল যে সেই ভিড় দেখিবার জন্যই লোকের ভিড় জমিয়া গেল। মুক্তির হাত হইতে পান লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। সে দিন বাবুদের আপিস যাইবার তাড়াতেও একটু শৈথিল্য দেখা গেল, পান না লইয়া কেহ নড়িল না, এবং পান হাতে লইয়াও বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি এই অছিলায় অনেকে দাঁড়াইয়া রহিল। এমনও হইল যে অপেক্ষা করিতে করিতে তাহাদের হাতের পান ফুরাইয়া গেল, এবং আবার পান

লইতে হইল। তাহাতে সময়ের এবং অর্থের সে অপব্যয় হইল তার জন্য তাহারা এতটুকু ক্ষোভ প্রকাশ করিল না।

মুক্তি এত জনসমাগমে একটু থত মত খাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিতেছিল না যে তারই জন্য এইটে ঘটিতেছে—সে ভাবিতেছিল বুঝি এমনি ধারাই রোজ হয়।

দোকানের সমুখে দাঁড়াইয়া খরিদ্দাররা নানারূপ জল্পনা করিতেছিল, মুক্তির কানে তার গুঞ্জন-ধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল। সে মুখ নীচু করিয়া পান সাজিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা উচ্চকণ্ঠের হাসি বা কথায় সে চমকিয়া উঠিয়া তার সেই টানাটানা অস্ফুট চোখ তুলিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিতেছিল। তার সেই দৃষ্টিটুকুকে সকলে এমনিভাবে গ্রহণ করিতেছিল যেন সেটি তাদের পরম আরাধনার ধন!

মুক্তির হাতে যখন কাজ রহিল না সে অলস দৃষ্টিতে রাস্তার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটি মানুষের পিছনে যতদূর পারে সে তার দৃষ্টিটিকে বহিয়া লইয়া যাইতেছিল, তার পর সে মানুষটি অদৃশ্য হইয়া গেলে আবার নূতন মানুষের পিছনে দৃষ্টিকে বাঁধিয়া দিতেছিল। এমনি করিয়া সে মানুষের পর মানুষই কেবল দেখিয়া যাইতেছিল। তার পর সে-রাত্রে সে যখন নিদ্রা গেল তখন তার মাথার ভিতরে কেবল মানুষের মুখ বিজ্‌বিজ্‌ করিতেছে।

পথের লোক যে তার পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া যায় এটা অল্প দিনের মধ্যেই মুক্তির নিকট ধরা পড়িল। যে দিন এই খবরটি একটি মানুষের চোখ দিয়া তার মনের মধ্যে প্রথম পৌঁছিল সেই দিন হইতে দেখিল তার দিকে লোকের চাহিবার যেন আর অন্ত নাই! সে অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু যে-লোকটির দ্বারা এই খবর সে প্রথম পাইল, কি জানি কেন, তার মনটি তাহাকেই বিশেষ চিহ্নিত করিয়া রাখিল। আর বাকি-লোকের চাহনি অসংখ্য চাহনির মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেল।

সে লোকটির সঙ্গে মুক্তির যখন প্রথম চোখের মিলন হয় তখন ঠিক্‌-দুপুর বেলা। রাস্তার গোলমাল প্রায় থামিয়া আসিয়াছে, দু-একটিমাত্র লোক চলাচল করিতেছে। মনে হইতেছিল যেন একটা প্রকাণ্ড অলসতা রাস্তার এধার-ওধার-জুড়িয়া গা-মেলিবার আয়োজন করিতেছে। মুক্তির মনের ভিতরও একটা অলসতা ধোঁয়ার মতো উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সে আপনার মনে বসিয়া ধীরে ধীরে পান সাজিতেছিল। হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখে একটি অনিমেষ দৃষ্টি তার মুখের উপর পড়িয়া আছে। মুক্তি প্রথমে কোনো খেয়াল করিল না, সে চোখ নামাইয়া লইল। খানিকক্ষণ পরে তার চোখ যখন অন্যমনস্ক-ভাবে আবার সেই দিকে গিয়া পড়িল তখনও দেখিল সেই দৃষ্টি সেইভাবেই রহিয়াছে। কতক্ষণ যে সেই চাহনিটি তেমনি করিয়া চোখের সামনে ভাসিতেছিল তাহা মুক্তি মনে রাখিতে পারিল না; কিন্তু তার মনে হইতে লাগিল এই দৃষ্টিটি

যেন কতদিন ধরিয়া তারই উদ্দেশে যাত্রা করিয়া আজ এইমাত্র তার কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। মুক্তির মনের ভিতর কেবলই সেই চাহনিটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আপিসের বাবুরা যখন পানের দোকানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইত তখন মুক্তি চোখ তুলিবার বড় অবসর পাইত না;—যেটুকু উপর দিকে চাহিত তাহাতে শুধু ভিড়টাই চোখে পড়িত—আলাদা-করিয়া মানুষ চোখে পড়িত না। কিন্তু দুপুর বেলার সমস্ত অলসতা ও নির্জ্জনতার উপরে সেই যে দৃষ্টিটি ভাসিয়া উঠিত সেইটিই বিশেষ করিয়া মুক্তির মনে ছাপ মারিয়া দিত। রাস্তায় সে এত লোক দেখিত যে কাহাকেও তার মনে রাখা সম্ভব হইত না—কিন্তু এই-যে-লোকটি সমস্ত মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া একলা দাঁড়াইত তাহাকেই বিশেষ করিয়া মনে রাখার সুযোগ বারম্বার ঘটিয়া উঠিতে লাগিল। কাজেই মুক্তি মন হইতে তাহাকে মুছিয়া ফেলিবার অবসর পাইল না।

মুক্তির যে দুবেলা দু মুঠা জুটিতেছে, পরণের কাপড় মিলিয়াছে, ইহাতে বামার-মা খুসী ছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মুক্তিকে দেখিয়া তার ভাবনা হইত—এমনি করিয়াই কি মেয়েটা ঘরছাড়া ছন্দছাড়া হইয়া থাকিবে। একএকসময় তার মনে অনুশোচনা হইত—হয়ত বা তারই অদৃষ্টে মেয়েটার এমন দশা হইল। সে হতভাগিনী যেখানে

ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সে মনে মনে অনুতাপ করিয়া বলিত—"কেন মর্‌তে মুক্তির কাছে গেলুম। চাল নেই চুলো নেই এই আবাগীর সঙ্গে পড়ে বাছাকেও আমার ঘর-ছাড়া হতে হল!" মুক্তির কথা ভাবিয়া তার চোখে জল আসিত।

বামার মা চুপ করিয়া থাকিতে পারে নাই। সে গোপনে মুক্তির স্বামীর সন্ধান করিতেছিল। নকলচাঁদ বাবাজীর যে-সব শিষ্য ছিল তাহাদের বাড়ি হাঁটাহাটি করিয়া অনেকবার বিফলমনোরথের পর সে নকলচাঁদ বাবাজীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছিল; এবং আধা-লেখাপড়া-জানা একটা লোককে ধরিয়া অনেক খোসামোদ করিয়া মুক্তির স্বামীকে একখানা চিঠি লেখাইয়া সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। এখন সে উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল।

মুক্তির সেই মনের মানুষটি মনের মধ্যেই থাকিয়া যাইত। সে যে কোনো দিন আসিয়া মুক্তির সামনে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে তাহা মুক্তি কল্পনাও করিতে পারে নাই।

একদিন দুপুরবেলা বামার মা বাজারে পান আনিতে না কি করিতে গিয়াছিল, মুক্তি একলাটি বসিয়া ছিল। কোথা হইতে হঠাৎ সে আসিয়া বলিল—"মুক্তি এস!"

"মুক্তি এস!"—এই কথাটা মুক্তির হৃদয়ের উপর সজোরে একটা ঘা দিল। সে যেন শুনিল রূপকথার রাজপুত্রের মুখের সেই কথা—"রাজকুমারী এস!"

পর রাজপুত্র তো এমনি করিয়াই আসিয়া অভাগিনী রাজকন্যাকে ডাক দিয়াছিল। রাজকন্যা তখন তার প্রিয়তমেরই পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল। মুক্তির চোখের সামনে জল্‌জল্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল সেই রাজপুত্র—সেই রাজপুত্রের রথ! সে আর বিলম্ব সহিতে পারিল না, দুরুদুরু হৃদয়ে রাজপুত্রের রথের উপর গিয়া উঠিয়া বসিল।

তার পর বৈকালে যখন সে চৌ-রাস্তার মাথায় একলা দাঁড়াইয়া চারিদিকে আকুল হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল তখন কোথায় তার সেই রাজপুত্র, কোথায় বা তার রথ! তার চোখের উপর পৃথিবীর আলো ম্লান হইয়া আসিতেছিল। রাজপুত্রের রূপ ধরিয়া এ কোন্ রাক্ষস তাহাকে ভুলাইয়া গেল। তার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল।

তার পর যখন বামার মার দোকানে আসিয়া পৌঁছিল তখন বাণবিদ্ধ পাখীর মতো সে লুটাইতেছে।

বামার মা একলাটি দোকানে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। আজ সে মুক্তির স্বামীর চিঠি পাইয়াছে, সে লিখিয়াছে তীর্থধর্ম্ম-করা তার আর পোষাইতেছে না, বাড়ি ফিরিবার মন আছে, কিন্তু হাতে পয়সা নাই, ভিক্ষা করিয়া করিয়া পথ-খরচের জোগাড় করিতেছে, টিকিটের দামটা জমিলেই সে বাড়ি ফিরিয়া আসিবে। বামার মা ভাবিতেছিল টিকিটের দামটা কত? এবং কষ্টেসৃষ্টে কোনো-রকমে সেটা এখান হইতে পাঠানো যায় কি না। এমন সময় মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। বামার মা তার দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গিয়েছিলি মা?"

মুক্তি তার সেই বড়-বড় চোখ-দুটা হইতে আগুন-ঠিকরাইয়া বলিয়া উঠিল—"যমের বাড়ি!"

বামার মা হতভম্ব হইয়া মুক্তির সেই জ্বলন্ত চোখের পানে চাহিয়া রহিল। মুক্তির স্বামীর চিঠি তার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল।

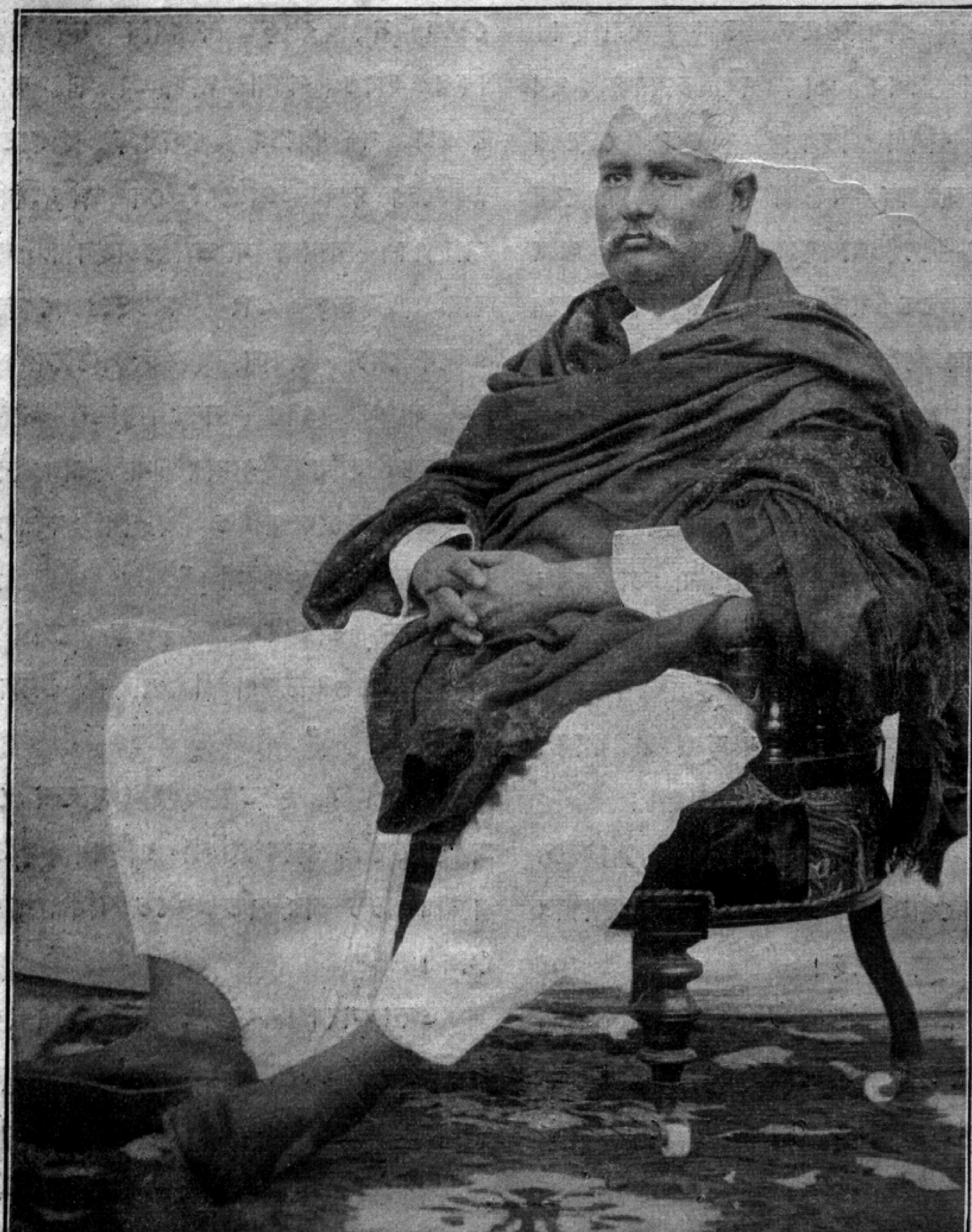
এমন সময় একজন খরিদ্দার জোর-গলায় হাঁকিল— "এক পয়সার পান।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্দ্ধনা

গত ৫ই ভাদ্র আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীমহাশয়ের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইল বলিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সেদিন তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছেন। ইহাতে দেশের সকলেই আনন্দিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আজ যে উন্নতির অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার মূলে রামেন্দ্রসুন্দরের একান্ত যত্ন, কঠোর পরিশ্রম এবং তাঁহার সমস্ত হৃদয়ের প্রীতি জড়িত হইয়া আছে।



আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

এই সাহিত্য পরিষদকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলাসাহিত্যের তিনি যে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন—এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি বিবিধ রত্ন দান করিয়াছেন; এবং তাঁহার দ্বারা বিজ্ঞানের যে অমর ধারাটি প্রবাহিত হইয়াছে তাহা শাখা-প্রশাখায় উচ্ছ্বসিত হইয়া চিরদিন তাঁহার জয়গান করিবে।

সেদিনকার সাহিত্য পরিষদের সভা বিদ্বজ্জন সমাগমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলা-দেশের সকল-শ্রেণীর সাহিত্যিক সে দিন রামেন্দ্রসুন্দরকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে রামেন্দ্রসুন্দরকে অভিনন্দন করেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরও একটি অভিনন্দন ছিল তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এই অভিনন্দনটি কবিবর স্বয়ং পাঠ করিয়াছিলেন।

"সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দরী ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্রমুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্ত্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নব প্রভাতে উদ্বোধনসঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে সাদরে অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয় পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমা দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ, এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘ জীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।"

এই সভায় অনেকগুলি সময়োচিত কবিতা পঠিত হইয়াছিল তন্মধ্যে সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাটি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

আচার্য্য ত্রিবেদী

প্রাচ্যের প্রাচীন বেদ—ত্রয়ী যার নাম—
সে তিনে আয়ত্ত করি' মনীষা তোমার
হে মনস্বী! নহে তৃপ্ত; অন্তর-ক্ষুধার
খাদ্য লাগি' অন্বেষণ তব অবিশ্রাম।
প্রতীচ্য-বিজ্ঞান-বেদ—নব-জ্ঞান-ধাম—
শিখিলে শিখালে তুমি গূঢ় মর্ম্ম তার,
হে জ্ঞানী! ধ্বনিছে তব কণ্ঠে অনিবার
বিজ্ঞানের মহাযজুঃ প্রজ্ঞানের সাম।
দুর্গমে সুগম করে তোমার প্রতিভা,—
জিজ্ঞাসা-মশাল জ্বালি' চল তুমি আগে;
শিশু জিনি' চিত্ত চির-কৌতূহলী কিবা!
জ্ঞান-যজ্ঞ-শেষ-টীকা ভালে তবু জাগে!
অমূর্ত্ত বাণীর লাগি' গড় মূর্ত্ত বেদী
বিজ্ঞানে প্রজ্ঞানে ধ্যানে বরেণ্য ত্রিবেদী!

জবাব

(জাপানি গল্প অবলম্বনে)

তার নাম কোয়াঞ্জি। সে ছিল নট ;— নৃত্য করা তার ব্যবসা। রাজারাজড়ার সভা ছাড়া সে কোথাও নাচত না ; তার নাচ দেখবার জন্যে লোকে যেন পাগল হয়ে থাকত, এমনি চমৎকার তার নাচ !

পুরাণের গল্প নিয়ে সে তার নৃত্য রচনা করত। সেই জন্য দেবদেবীর মতো তাকে সাজসজ্জা করতে হত—তাঁদের মুখের মতো মুখস পরতে হত।

সেই সময় আর একজন লোক ছিল তার নাম জেঙ্গোরা। মুখস তৈরি করা তার ব্যবসা। তার মতন এমন চমৎকার মুখস দেশের মধ্যে কেউ তৈরি করতে পারত না !

কোয়াঞ্জির যখন যে মুখসের দরকার হত এই কারিগরের কাছ থেকে তৈরি করিয়ে নিত। জেঙ্গোরার হাতের মুখস পরে সে যখন নৃত্য-সভায় এসে দাঁড়াত—তখন লোকে অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে থাক্‌ত। ঠিক মনে হত যেন সেই পুরাণের গল্প থেকে মরা-লোক উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। জেঙ্গোরার মুখসের বাহাদুরিতে তার নাচ আরো জমে উঠত।

জেঙ্গোরা কারিগর ভালো ছিল বটে কিন্তু তার একটা দোষ ছিল—সে ভয়ঙ্কর মাতাল ! মদ পেলে সে আর কিছু চাইত না—হাতের কাজ তার মাটিতে গড়াগড়ি যেত।

কেউ কিছু কাজ দিতে এলে সে প্রায়ই হাঁকিয়ে দিত—কিন্তু কোয়াঞ্জির উপর তার একটু মনের টান ছিল। কোয়াঞ্জির নাচ সে দেখেচে। সে মনে মনে বল্‌ত—হাঁ কোয়াঞ্জি একটা লোকের মত লোক ;—কারিগর বটে ! সেই জন্য কোয়াঞ্জি কোনো একটা মুখস তৈরি করতে দিলে সে কোনো-রকমে মদের নেশা ঠেলে ঝেড়েঝুড়ে উঠে বসত ;—কোয়াঞ্জির জন্য মুখস তৈরি করতে করতে মদের নেশার মতোই একটা মৌতাত তার লেগে যেত।

কিন্তু একবার একটা উৎসবের সময় ভারি গোল বাধল ;—মদের নেশা জেঙ্গোরাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। উৎসবে একটা নতুন রকম নাচ নাচবে বলে কোয়াঞ্জি একটা মুখস তৈরি করতে দিয়েছিল, কিন্তু সেবার কি-যে হল জেঙ্গোরার কাজের প্রতি কোনো উৎসাহই দেখা গেল না।

দিনে পর দিন যায়, উৎসব ক্রমেই ঘনিয়ে আসচে, তবুও জেঙ্গোরা অচল। তার স্ত্রীপুত্র সবাই মিলে তাকে বলতে লাগল, কিন্তু সে যেমন নেশায় ভোর হয়ে ছিল তেমনি ভোর হয়ে রইল। শেষে যখন উৎসবের আর দুদিন মাত্র বাকি তখন কোয়াঞ্জি নিজে এসে সাধ্য-সাধনা কর্‌তে লাগল।

কোয়াঞ্জিকে দেখে জেঙ্গোরা উঠে বসল বটে কিন্তু তার হাত তখনও নেশায় কাঁপচে। সে ভালো করে বাটালি ধরতেই পারলে না। যাই হোক্‌, দুদিনের মধ্যে কোনো-রকমে সে মুখসটা তৈরি করে ফেল্লে।

উৎসবের দিন সন্ধ্যাবেলা, জেঙ্গোরা তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, মুখসটা হাতে করে কোয়াঞ্জির বাড়ি গেল। কোয়াঞ্জি তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে মুখসটা নিয়ে নিজের মুখে একবার পরে দেখলে।

কিন্তু মুখসটা বড় হয়ে গেছে—এত বড় হয়ে গেছে যে মুখে থাকে না, ঢল্‌ঢল্‌ করে খসে পড়ে।

আর সময় নেই। আজ রাত্রেই সেই নাচ;—মুখস না হলে সে নাচ হবে না। জেঙ্গোরার জন্যে সব মাটি! কোয়াঞ্জি ভয়ঙ্কর রেগে উঠল;—সে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে জেঙ্গোরার পিঠের উপর সজোরে এক লাথি মারলে। জেঙ্গোরা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তার ছেলে ছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে। বাপের এই অপমান দেখে তার সর্ব্বশরীর জ্বলতে লাগল। কিন্তু সে কি করবে? সে ছেলেমানুষ! কোয়াঞ্জির অসীম প্রতাপ! সে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ফুলতে লাগল।

নেশা করে করে জেঙ্গোরার শরীর ক্ষয় হয়ে এসেছিল—এই আঘাত সে কাটিয়ে উঠতে পারলে না, তাতেই তার মৃত্যু হল।

* * *

অনেক দিন কেটে গেছে। জেঙ্গোরার নাম তখন লোকে একরকম ভুলে গেছে; আর-একজন নতুন কারিগরের নাম তখন বাজারে জেগে উঠচে। সে নাকি চমৎকার মুখস তৈরি করে।

কোয়াঞ্জি অনেকদিন ধরে একজন ভালো কারিগরের সন্ধান করছিল। সেইই উৎসবের সময় ঠিকমতো মুখস তৈরি হয়নি বলে তার আর এপর্য্যন্ত সেই নূতন নাচটা নাচা হয়নি,—সেই জন্যে তার মনে ভারি ক্ষোভ ছিল। এই কারিগরের সন্ধান পেয়ে তার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল—সে তখনই তাকে ডেকে পাঠালে।

কারিগর যখন এল তখন কোয়াঞ্জি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলে কেমন-ধারা মুখোস তৈরি করতে হবে। কারিগর মন দিয়ে সব শুনলে, সাবধানের সঙ্গে মাপজোক সব ঠিক করে নিলে।

তারপর যখন মুখোস তৈরি হয়ে এল তখন কোয়াঞ্জি একেবারে অবাক—এ যেন ঠিক জেঙ্গোরার হাতের কাজ! এমনটা সে আশা করেনি।

সেই মুখস পরে সে নাচতে গেল; সেদিনকার নাচ অনেক দিন পরে আবার খুব জমে উঠলো। কোয়াঞ্জি মনের আনন্দে ঘুরে-ফিরে সেই নাচ বার বার করে নাচলে;—চারিদিকে বাহবা পড়ে গেল।

তার পর সেই রাত্রে সে যখন শ্রান্তক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এল তখন মুখ থেকে মুখস খুলতে গিয়ে দেখে মুখস আর খোলে না। টানাটানি করতে করতে মুখ যতই ফুলে উঠল—কাঠের মুখসটা ততই এঁটে বসে যেতে লাগল। প্রাণ যায়!

কোয়াঞ্জি হুকুম দিলে—কারিগরকে ডেকে নিয়ে আয়—সে এসে মুখস খুলুক।

কারিগর এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

কোয়াঞ্জি হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—"মুখস যে খোলে না!"

কারিগর গম্ভীরভাবে বল্লে—"কি করব হুজুর! সেবার আমার বাবার হাতের মুখস আপনার মুখথেকে খুলে পড়েছিল বলে আপনি তাঁর প্রাণবধ করেছিলেন—সেইজন্য আমি সাবধান হয়েছি—যাতে মুখ থেকে আর মুখস না খোলে! এতদিন ধরে আমি এই বিদ্যা আয়ত্ত করবার সাধনাই করিছলুম।"

এই কথা বলে সে হেসে উঠল।

কোয়াঞ্জি জ্ঞানশূন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

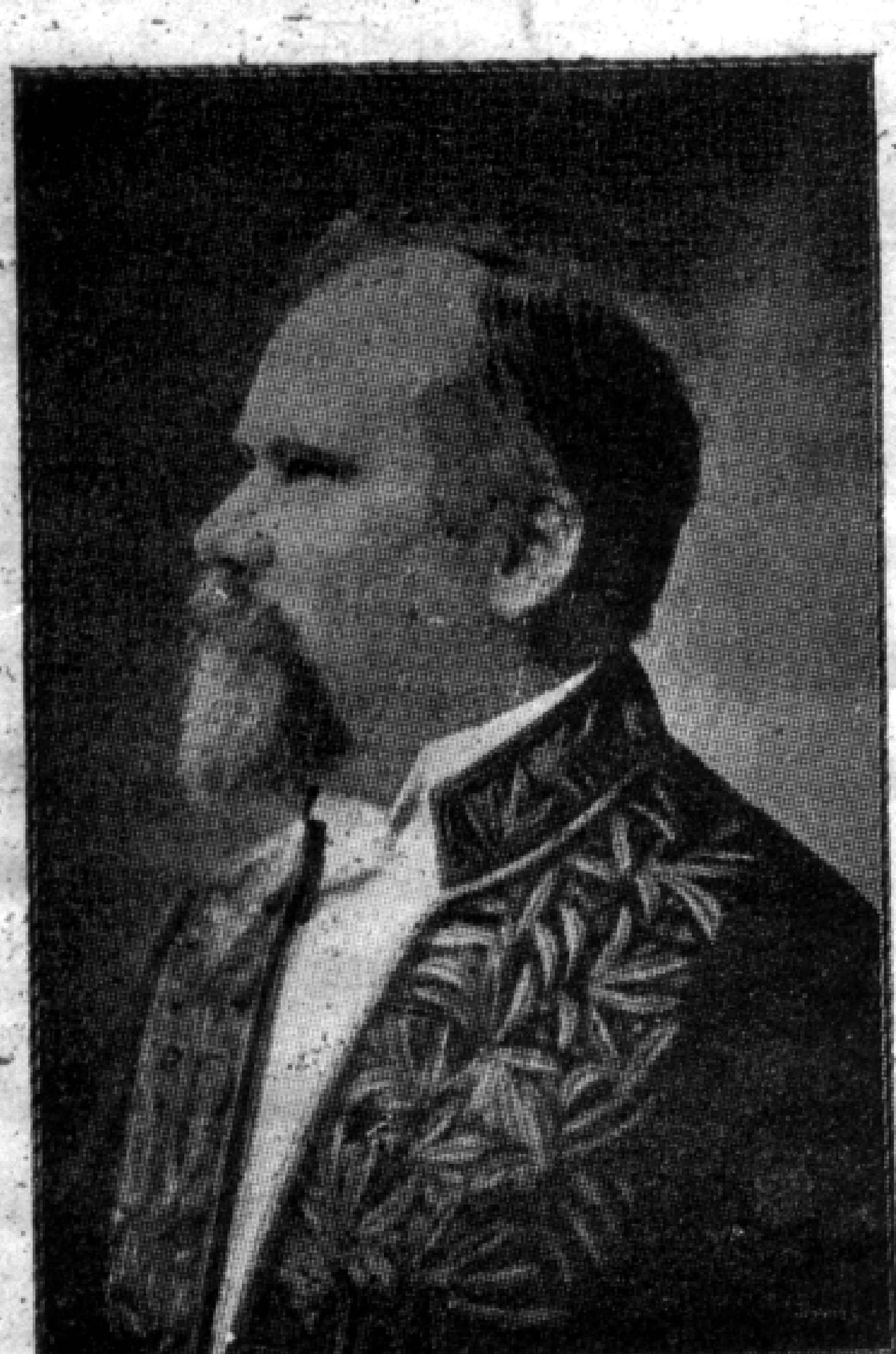
ইউরোপের সমর-অভিনেতৃ রাজাগণ



সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ



রুসিয়ার সম্রাট নিকোলাস



ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট—পয়েন্‌কার



সার্ভিয়ার রাজা



জর্ম্মান সম্রাট—কাইসার



অষ্ট্রীয়ার সম্রাট

পূজার তত্ত্ব

কর্ত্তা হাঁকিলেন—"কোথা গো গিন্নি! এই পূজোর তত্ত্বের কাপড়চোপড় সব বুঝে নাও। উঃ কদিন থেকে কি হেঙ্গামাটাই লাগিয়েছিল! ভিতর-বাড়ীর চৌকাট ত ডিঙ্গানই দায়;—বার-বাড়ীতে দু চারজন বন্ধুবান্ধবে মিলে যে নিশ্চিন্ত মনে দুদণ্ড বসে কাটাব তারও যো ছিল না। সেখানেও পঞ্চাশ বার লোক পাঠিয়ে তাগাদা!—এসগো এস, আমার কি আর কোন কাজ-কর্ম্ম নেই নাকি?"

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস যে মস্ত-একটা কাজের লোক একথা তাঁহার একজন মহাশত্রুকেও স্বীকার করিতে হইত। এমন কি তাঁহার কাজের দায়ে তাঁহার চাকরবাকরদের পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না। তিনি দিনের বেলাটা যেরূপ অবিশ্রাম ধূম-সেবনে এবং রাত্রিবেলাটা ধান্যেশ্বরী-পূজায় কাটাইতেন তাহাতে নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিও তাঁহাকে বাহবা না দিয়া থাকিতে পারিত না।

গিন্নি ভাঁড়ার ঘরে ছিলেন;—স্বামীর ডাকে বঁটি, তরকারী ফেলিয়া সোৎসুকে

দালানের দিকে ছুটিলেন। ভবি দাসী এমন সুযোগটা ছাড়ে ত সে ভবিই নয়; বিড়ালের ভাগ্যে কিছু সবদিন শিকা ছেঁড়ে না। অনেক দিন হইতে তাহার বড়ি-চিংড়ির অম্বল—আর পুঁই-চড়চড়ি ও কলাই-দাল-পোড়া ঠিক দেশের মত করিয়া রাঁধিয়া খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। যথাসম্ভব শীঘ্র ইহার উপকরণসমূহ তাহার কোঁচড়ে আবদ্ধ হইল। বাড়তি ভাগ, কিছু চালও সে সংগ্রহ করিল; ভাতটার অবশ্য তাহার কোন দিন অভাব হয় নাই তবে এ চাল গুলির বদলে একদিনকার মুড়িমুড়কির যোগাড়টা হইয়া রহিল। তখনও গৃহিণী ফিরিলেন না দেখিয়া সহসা গুড়-তেঁতুলের কথাটা মনে পড়িয়া তাহার রসনা লোলুপ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে হাঁড়িটা ছিল—সর্ব্বোচ্চ স্তরে, পাড়া একটু কঠিন, বিশেষ যদি সে সময় কেহ আসিয়া পড়ে—হাতের গুড়ের দাগটা সামলান দায় হইবে। লোভ ও যুক্তি যখন এইরূপে তাহার মনের মধ্যে যুদ্ধ-নিরত তখন সহসা কর্ত্তা-গিন্নির বাদানুবাদ শুনিয়া সে দ্বার-দেশে আসিয়া দালানের দিকে উঁকি মারিল।

কর্ত্তা দালানের একখানা তক্তাপোষের উপর বসিয়া কাপড়গুলা ভাগ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন—গিন্নি নিকটে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকখানি হাতে লইয়া ভাল-মন্দ বিচার করিয়া দেখিতে ছিলেন।

গৃহিণীর সাজসজ্জার আড়ম্বর বিশেষ-কিছু ছিল না—তাঁহার পরণে একখানি লালপেড়ে সাড়ী, হাতে দুগাছি সোনার বালা আর গলায় একগাছি সরু হার। কিন্তু মুখশ্রী এমন উজ্জ্বল সুন্দর যে এই সামান্য সাজেই তাঁহাকে সুসজ্জিত দেখাইতেছিল। সিঁথির সিঁদুরটুকু সত্যই যেন তাঁহার রূপে হাসিতেছিল। আর যে দেবতার আশীর্ব্বাদ এই সিন্দুর-রেখা—সেই স্বামীদেবতা তাঁহার স্থূলদেহ, বিরক্তি-বিকৃত মুখশ্রী এবং মদ্যগন্ধমুখর কথাবার্ত্তা লইয়া পত্নীর পার্শ্বে বেশ-একটু বেমানান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গৃহিণী মেয়ে-জামাইয়ের কাপড় দেখিয়া বলিলেন—"এখন কত রকম বারাণসী শাড়ী হয়েছে—দেখতে কত ভাল, আর দামও তেমন বেশী নয়, তাই কোন্ একখানা মেয়ের জন্য দিলে? ঐ এক বই ত আর দশটা মেয়ে নেই তোমার। আর জামাইয়ের উড়ানীখানা অন্ততঃ রেশমী দিলে ভাল হোত। জান ত গেল-বারের তত্ত্বে কত কথা শুনতে হয়েছিল। জামাই ত সেজন্য এ-মুখো হোল না—এবারও দেখছি আসবে না।"

"আবার প্যানপ্যানানি। আমি ত আর পেরে উঠিনে! তাদের পছন্দ না হয়—তত্ত্ব পাঠিয়ো না—।"

"জগৎসুদ্ধ লোক তত্ত্ব পাঠাবে,—আর আমরা পাঠাব না, কি করে যে একথা তুমি বল। তোমার তত্ত্বের জন্য ত তারা বসে নেই, পেলে বড়-মানুষও হবে না, তবে মেয়েটার তাতে নানা কথা শুনতে হবে—সেইজন্যই আমার বার বার বলা।"

"মেয়েকে ত ঢের দিয়েছি। বিয়ের সময় ত জামাই ছেড়ে কথা কয়নি। যদি চিরকালই ওদের মন যোগাব তবে আমার ছেলেদের কি হবে? তাদেরও ত লেখা-পড়া চাই, অন্নসংস্থান চাই।"

ভাবতে তাহলেও ত দুঃখ ছিল না। তোমার মদের সংস্থান ত আগে হোক্।"

আর কি রক্ষা আছে! কর্ত্তা রাগিয়া কাপড়গুলা তক্তা হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"তবে থাক, আর কিছু পাঠাতে হবে না, কোথায়রে হরে—কাপড়গুলো নিয়ে যা ত।—আমি গরীব মানুষ তোমার খাঁই মেটাতে পারব না। তোমার লক্ষপতি বাপকে বলো, তিনি কিংখাপ বেণারসী যোগাবেন এখন।—ওসব আমার কর্ম্ম না।"

কর্ত্তা ত রাগিয়া চলিয়া গেলেন। গিন্নি চোখের জল মুছিতে মুছিতে কাপড়গুলা তুলিতে লাগিলেন। ভবি তখন তাহার রসনা পরিতৃপ্তির কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। সেও অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া গৃহিণীর সাহায্যে তৎপর হইল।

লক্ষ্মীমণি সত্যই লক্ষ্মী। যাহা পাইলেন তাহা লইলেন, যাহা পাইলেন না, তাহা কষ্টসঞ্চিত সামান্য অর্থ হইতে যথাসম্ভব সংগ্রহ করিলেন। সুতী চাদরের পরিবর্ত্তে একখানা রেশমী চাদরও আনাইয়া লইলেন। অবশেষে ঘরে নানারকম মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া জামাই-বাড়ী তত্ত্ব পাঠাইয়া দিলেন। গতবারে পিতার নিকট কিছু চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবার আর চাহিলেন না;—কেন না—জামাতার মতিগতি দেখিয়া বড় ছেলেটার শিক্ষার ভার পিতাই গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিতা বড়-মানুষ নহেন। স্বামীর আয় তাঁহাপেক্ষা অনেক অধিক।

তত্ত্ব দেখিয়া শ্বশুর-বাড়ীর সকলে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—সে সকল কথা যে কন্যা সুশীলার শ্রবণ-সুখকর হইল না—তাহা বলা বাহুল্য। সুশীলা নীরবে শুনিল, নীরবে অশ্রুপাত করিয়া মনে মনে বলিল, বাবা কি সত্যি এর চেয়ে একটু ভাল তত্ত্ব পাঠাতে পারতেন না? বোঝেন না কি যে এজন্য আমায় কত সহ্য করতে হয়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে মাকে স্মরণ করিল—তাহার দুঃখিনী মা,—তাহার জন্য তাঁহাকে কত কষ্টই সহ্য করিতে হয়। মাতার কষ্টের স্মৃতির মধ্যে তাহার নিজের কষ্ট চাপা পড়িয়া গেল।

২

গতবারে সুশীলার স্বামী পূজার সময় শ্বশুড়-বাড়ী যান নাই বলিয়া মা বড় দুঃখ করিয়াছিলেন। এবারও সুশীলাকে লিখিয়া-ছিলেন—তাহারা দুজনে জোড়ে তাঁহার কাছে না আসিলে তাঁর বড়ই দুঃখ হইবে।

সুশীলা জানিত স্বামীকে রাজি করা সহজ হইবে না; শ্বশুরের প্রতি জামাতার অনু-রাগের উচ্ছ্বাস ত ছিলই না—ইহার উপর অন্য পাঁচ জনে অনবরত এই বিরাগ-অনলে আহুতি দান করিতে ছাড়িত না।

রাত্রিকালে দেখা হইবামাত্র সুশীলা স্বামীকে বলিল—

"এবারে যাবে ত?"

"কোথা?"

"কেন কাল যে সপ্তমী পূজো। আরবারে তুমি গেলে না—মা কত দুঃখ করেছিলেন, চিঠিখানা পড়না—দেখনা কি লিখেছেন?"

সুশীলা কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

স্বামী বলিল—"না আর চিঠি দেখাবার দরকার নেই। আমি যাচ্ছিনে। আদর ত খুব। তত্ত্ব দেখলুম—যা পাঠিয়েছেন—তা চাষা ভুষোরাও অমন তত্ত্ব পাঠায় না।"

"বাবার যে টাকার টানাটানি!"

"টানাটানি? কিপ্‌টে, কঞ্জুষ, মাতাল!"

সুশীলা ভাবিয়াছিল আজ আর স্বামীর কোন কথায় সে রাগিবে না, শান্ত সংযত ভাবে তাহাকে সাধিয়া অনুনয় করিয়া—যেমন করিয়া পারে কাল সঙ্গে লইয়া যাইবে। কিন্তু আর বুঝি সে সংকল্প সে রক্ষা করিতে পারে না। তবু চোখের জল কষ্টে চোখে বাঁধিয়া শান্ত স্বরে বলিল—"ধুতীখানা যেমনই হোক, চাদরখানা ত রেশমী দিয়েছেন—আর আর—সেণ্ট—চিরুণী—বুরুস—রুমাল—এসবই দিয়েছেন।"

"হায় হায়! রেশমী চাদর—তার চেয়ে একখানা সুতী দিলে তবু পরার মত হোত। আঃ ছোঃ! এ সেই মার্কামারা সস্তা বিজ্ঞাপন দেওয়া চাদর! তোমার বাপ এ তত্ত্ব পাঠালে কি করে! এমন ছোটলোকের ঘরেও বিয়ে করেছিলুম।"

সুশীলার আর ধৈর্য্য রহিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন একলাই বাপের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। তখন দ্বিপ্রহর। পিতা বাড়ীর ভিতর আহারে বসিতেছিলেন। স্ত্রীর সৌভাগ্যবশতঃ দিনের মধ্যে এইসময়টা একবার তিনি ভিতরে আসিয়া দেখা দিতেন।

দাঁড়াইল। মাতা আশীর্ব্বাদ করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—"মথুরা এলনা?"

পিতা বলিলেন—"জামাই আসেনি? তা না এলেই ভাল। তার ত আমাদের সঙ্গে কেবল পয়সার সম্পর্ক। এমন জামাইএর মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না।"

মা স্বামীকে চোখ টিপিলেন—কিন্তু কর্ত্তার কি না সেদিকে লক্ষ্য! বলিলেন—"সব সমান; যেমন বাপ তেমনি বেটা! টাকাটাই সংসারে চিনেছেন—এমন যক্ষির হাতেও মেয়ে দিয়েছিলুম।"

সুশীলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিজে স্বামীর সহিত ঝগড়া করুক,—কিন্তু অন্যের মুখে স্বামীর নিন্দা অসহ্য। হায় সতীর মত যদি এ নিন্দা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইত!

কিন্তু পশুপতি সতীর প্রাণত্যাগে উন্মত্ত হইয়া প্রলয়-উৎপাদন করিয়াছিলেন। আর তাহার পতি? হয়ত পত্নীর মৃত্যুতে সে মঙ্গলই জ্ঞান করিবে!

* * *

"মা, মা!"

"বাছা আমার, ধন আমার!"

"আর পারিনে।"

"না পারলে চলবে কেন মা? আমরা যে মা কষ্ট সইতেই এসেছি।"

"এত কষ্টের জীবনে দরকার কি মা?"

"দরকার আছে বই কি? ভগবান তোমাকে জীবন দিয়েছেন কর্ত্তব্য পালনের জন্য।"

"এমন দুঃখের জীবন নিয়ে কি মা,

"যায় বই কি ?"

"তাত দেখছি মা ; কি কষ্ট সয়েই তুমি আমাদের মানুষ করেছ।"

"মানুষ কি করেছি মা ? তা যদি করে থাকি—তবে আর মৃত্যুর কথা মনেও এন না। সহ্য করে কর্ত্তব্যপালনেই মনুষ্যত্ব। স্ত্রীলোকেরও জীবনের উদ্দেশ্য আছে। তুমি যখন তোমার ছেলেগুলিকে মানুষ ক'রে—প্রকৃত মানুষ করে তুলবে—তখন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।"

"মা আশীর্ব্বাদ কর—চরণ-ধূলি দাও, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করতে পারি। কত সৌভাগ্য যে তোমার মত মা পেয়েছি, সকল মা তোমার মত হোক্—এই প্রার্থনা করি।"

সুশীলা মাতার বক্ষে তাহার তপ্ত মস্তক রক্ষা করিল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

সমালোচনা

ধ্রুবের সাধনোপাখ্যান—শ্রীযুক্ত অনঙ্গ চন্দ্র দত্ত প্রণীত। চট্টগ্রাম ইম্পিরিয়েল প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা মাত্র। গ্রন্থখানি শিশুপাঠ্য। ধ্রুবের কাহিনী ছন্দে রচিত। লেখকের বাল্য-রচনা। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন,—"লেখাগুলি নিতান্তই কাঁচা।"

জ্যোতিষ দর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, বি, এ, এফ, আর, মেট, এস্‌প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত। ইউনিভার্সিটি প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে—এক টাকা ; সাধারণের পক্ষে—পাঁচ সিকা মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক কোন গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই; প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও আমাদিগের চোখে পড়ে নাই। গণিতের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া এ গ্রন্থে জ্যোতিষশিক্ষায় প্রথম সোপান রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা সরল, রচনা প্রণালীও সহজ, কাজেই যে উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। এগ্রন্থে আকাশ-মণ্ডল, 'সূর্য্য', 'সৌরজগৎ', 'পৃথিবী', 'চন্দ্র' প্রভৃতি গ্রহাদির স্থান ও কাল নির্ণয়, এবং তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনাও বেশ সম্যক পরিপূর্ণভাবেই সাধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মতের সহিত পাশ্চাত্য মতাদির সমন্বয় গ্রন্থকার বেশ দক্ষতার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেখকের জ্ঞান গবেষণা ও অধ্যবসায়ের প্রচুর প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। রচনার গুণে অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও ইহা পাঠে প্রচুর শিক্ষালাভ করিবেন।

নীরব সাধনা। স্বর্গগতা সুবোধবালা দেবী প্রণীত। আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। এখানি কবিতা-পুস্তক। কবিতাগুলির অধিকাংশই লেখিকার বিবাহের পূর্ব্বে রচিত। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকার জীবন ও হৃদয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। লেখিকারদুই খানি চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

মরণ

চাঁদের আলোকে ধোয়া প্রকৃতির বুকে
অশান্ত হৃদয় যেন লুটাইতে চায়;
—ওরই মত সুধাঝরা, সাদা হাসি-রাশি-ভরা
অনন্তের পরিপূর্ণ সুখে,
আকাশের দিগন্ত সীমায়।

দিবসের আলোমাখা পশ্চিমের কোণে
লালে-লাল লালে-লাল আবিরের ধূলি
তাহারি সীমার শেষে, অনন্ত শান্তির দেশে
মরণের বিশ্রাম শয়নে
—সাধ যায় এ বেদনা ভুলি!

অপূর্ব্ব এ জ্যোতি-জ্বালা সাঁঝের আলোকে
সবুজ পাথারে যেন ডুবে যায় আঁখি
থেমেছে থেমেছে সব, জীবন কল্লোল রব
মরণের ঘুম আসে চোখে;
—সাধ যায় ডুবে ভুলে থাকি!

চাঁদের আলোর মত অমনি সে সাদা
আবরণ টেনে দিই জীবনের পরে;
ঢাকা রবে ভাঙা বুক, শতকোটি ভুলচুক,
জীবনের শত হাসি কাঁদা—
ঢাকা রবে মরণের ঘরে!

নিশার কালিমা-হরা চাঁদেরই মতন
জীবনের অন্ধকার করিবে সে দূর,
নামাইয়া সব বোঝা, করিবে সরল সোজা,
পরিপূর্ণ সৌরভে মগন
অমনি সে সুন্দর মধুর!

বেদনা-কাতর হৃদি শান্তি নাহি মানে,
কোথা তুমি বন্ধু বলে ডাকে অবিরাম
কোথা তুমি মিতা মোর, কোথা তুমি দুঃখচোর,
চিরাশ্রয় আছ কোনখানে
—ব্যথিতের অনন্ত আরাম!

শ্রীনিরুপমা দেবী।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।